# ভেদ-বিভেদ

দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী
সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন

১

ভদ্রেশ্বর মণ্ডল

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

# ভূমিকা

খুবই সহজ হ'তো যদি আমরা ভাবতে পারতাম মাত্র কিছু স্বার্থান্ধ লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অনেক লোককে খেপিয়ে দিয়ে অন্য-কোনো সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, আর শুধু একমাত্র সে-কারণেই দাঙ্গা বাধে : অর্থাৎ দাঙ্গা নিজে থেকে বাধে না, তাকে বাধানো হয়। কিন্তু প্রশ্নটা না-উঠে পারে না : অল্পকিছু লোক এত লোককে খ্যাপায় কী ক'রে—কী ক'রে পারে এত লোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ ক'রে দিয়ে শুধু অমানুষিক রক্ত- ও ধ্বংস- তৃষায় তাদের উসকে দিতে। দাঙ্গা যে বাধানো হয় না, তা নয়—আমাদের দেশের অনেক দাঙ্গাই যে এভাবে বেধেছে তা সামান্য অনুসন্ধান বা সরেজমিন তদন্তেই বেরিয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালে বহু সমাজবিজ্ঞানী বা সংগঠন এ-রকম তদন্ত করেছেন—তাদের অনেক প্রতিবেদনও বেরিয়েছে—এবং তার কোনো-কোনোটায় এটা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়েছিলো কিছু লোকের উসকানিতেই এ-সব দাঙ্গার সূচনা হয়েছিলো। আর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিতে তাতিয়ে দেবার কত বিচিত্র সুযোগ আছে—কেননা নানারকমভাবেই ভাবা যায় সম্প্রদায়কে : ধর্ম তৈরি করে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বহু-বহু সম্প্রদায় তৈরি ক'রে দেয় ভাষা, জাতপাতের ভেদ, আঞ্চলিকতা। অর্থাৎ যা-কিছু আমার মতো নয়, তা-ই ভিন্ন, তাকে দেখতে হবে সন্দেহের চোখে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, বিপন্ন দুঃস্বপ্নে। আর এই উপমহাদেশে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান : সকলের বেশভূষা একরকম নয়, খাদ্যরুচি ভিন্ন, অঞ্চলভেদে জীবনযাপনের ভঙ্গি বা ছন্দও নানারকম। কিন্তু বিবিধের মাঝে মহান মিলনকে না-দেখে তবে কেন এই ছেদ-বিচ্ছেদের দ্বন্দ্বই বারে-বারে সত্য হ'য়ে ওঠে? আছে কি তবে কোনো বদ্ধমূল সংস্কার, যাতে সহজেই এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাতানো যায়, ওসকানো যায়, সহজেই লেলিয়ে দেয়া যায় পরস্পরের বিরুদ্ধে? সবই তো আর শুরু করে না ভাড়াটে গুণ্ডারা। তাহ'লে কোথায় লোকের মধ্যে উপ্ত থাকে যুযুধান বোধ, যা দাঁত-নখ বের ক'রে দেয় সহজেই, অনবরত?

আধুনিক ভারতীয় গল্প তার জন্মলগ্ন থেকেই এই নিয়ে ভেবেছে, ভেবেছে এত-সব সম্প্রদায়ের কুশল-অকুশল কোথায়। কোনো ধর্মই বলে না অন্য ধর্মের লোকদের মারো, কাটো, খতম ক'রে দাও। কবীর, নানক বা তাঁদেরই মতো মানুষরা কখনও ঈশ্বর ও আল্লাহ্‌কে আলাদা ক'রে দ্যাখেননি। এই সেদিনও রামকৃষ্ণ বলেছেন : যত মত তত পথ—এবং সব মতই মূল্যবান। আধুনিক কোনো মহানগরীতে কত ভিন্ন-ভিন্ন ও বিচিত্র গোষ্ঠীর সহাবস্থান—অথচ কোথায় তাহ'লে তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে লোভ, হিংসা, ঘৃণা, ভয় বা আদিম যত দুষ্প্রবৃত্তি? প্রশ্নটি জটিল এবং উত্তরও নিশ্চয়ই সহজ-সরল নয়। একশোর ওপর সর্বভারতীয় গল্প নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা ও দেশভাগ বিষয়ে এই-

যে সংকলন তৈরি হয়েছে, আমরা দেখতে পাবো আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষাবা, শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা তা নিয়ে কত ভেবেছেন; ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে তরুণতম লেখকরাও। সাহিত্য জীবনেরই সপক্ষে, এবং সাহিত্য নাকি আবার সমাজের দর্পণও—অন্যদিকে আছে দুঃসহ বাস্তব, সমাজের দর্পণ নয়, স্বয়ং সমাজই। সাম্প্রদায়িকতার হিংসা ও দ্বন্দ্ব কিন্তু শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত হয় না, শ্রেণীর বদলে ব্যক্তিকে কুক্ষিগত ক'বে রাখে তার ধর্ম- ভাষা- বা অঞ্চল- গত কোটর বা খোপের মধ্যেই। অথচ ভারতবর্ষেরই কোনো-এক প্রাচীন দর্শন ভেবেছিলো সৃষ্টিরহস্যের এই রূপকল্প : একদিন তিনি ছিলেন এক, তাঁর একঘেয়ে ও অসহ্য লাগলো, তিনি ঠিক করলেন বহু হবেন, বহু হলেন—তিনি একাই বহু হলেন।

উকো দিয়ে ঘ'ষে-ঘ'ষে সবাইকে এক অথবা সমান ক'রে দেয়া নয়—আমার মতো না-হ'লেই তাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নয় (শতকোটি 'আমি'কে লোকে একসঙ্গে সহ্যই বা করবে কী ক'রে?), যে-রকম করতো উপনিবেশবাদীরা : উপনিবেশের মানুষদের সংস্কৃতি কেড়ে নিয়ে চাপিয়ে দিতো ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, তাব সমস্ত লেজুড় সমেত। সে-তো সেই কবে ছিলো এক গ্রিক, যে একটা খাট তৈরি করেছিলো, সবাইকে সমান ক'রে দেবাব ফন্দি এঁটেছিলো সে, রাস্তা থেকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে আসতো লোক, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে তাকে তুষ্ট ক'রে. পরে শুইয়ে দিতো খাটে, তারপর খাটের মাপমতো না-হ'লেই, লম্বা হ'লে সে মুণ্ডুটাই উড়িযে দিতো, খাটো হ'লে টেনে-টেনে ছিঁড়তো মাথা ও পা—তাকে মাপমতো ক'রে নিতো সে। আমরা কি চাই সেই মারণকলের তৈরি নিষ্প্রাণ ঐক্য বা সমতা—না কি আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চাই মৌলিক ঐক্যের বোধ, যা হাৎড়ে বেড়িয়ে আমবা পাবো মানবিকতারই অভিজ্ঞান। এই সংকলনের গল্পগুলো খুঁজে বেরিয়েছে সেই মানবিকতাই। প্রথম খণ্ডে রইলো বাংলা গল্প. দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ভারতের অন্য-অনেক ভাষার গল্প ও এবং এই সংকলন সম্বন্ধে আলোচনা।

# সমস্যাপূরণ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিঁকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমনকি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও এক দিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন, তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা-কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, 'এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না।' তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল। প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এইসব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহার অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব, তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন —এমনকি কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, 'পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দান-প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয়-রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম-রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।'

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পবিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন, 'এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে, আমাদের সে কালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার বলিবে, তবে তোমাব বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়টা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।'

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা-মামলা হাঙ্গামা-ফ্যাসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক-প্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জাবিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রর একটা অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন, কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ

তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু, বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইল, ইহারা যেন তাঁহার দয়া-দুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, 'প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না।' উভয় পক্ষে ভাবি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এত দিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য—জমিদারের প্রার্থনা-মত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমদ্দি কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জাবিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমাব ভালো করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমাব ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইযেব মতো গ্রহণ করো—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এক কণা পাইযাছে বলিয়া ক্ষুণ্ন হইয়ো না, বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগলভতা-বশত বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিযাছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমানুষ, এ-সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

মির্জাবিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু, ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ

করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারি করিল। অছিমদ্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনা বেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু, তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন লাঠি হস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনা বেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য। যাহা হউক, বেটা যেরূপ বদমায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, 'মা গো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা!' তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিমধ্যে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই, কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পাল্কি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া 'আবশ্যক আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যান্টলুন লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটা নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এখানেই বলিয়া লই।"

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জন্যই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে, বাপু।"

বিপিন ছাড়িলেন না; কহিলেন, "অযোগ্যতার বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই—আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এত দূর পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ, বাপু!"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে-সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো।"

বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধ-পূর্বক কম্পিত-কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু, এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা ও চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেত-ওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা।

ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্প দিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এত দিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। 'যিনি যত মালা জপুন, পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা।' সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্‌বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি-অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

# দুরাশা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালেব আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিনটশ পবিযা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে-ক্ষণে টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে, যেন বিধাতা হিমালযপর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে-করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণীমাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্যসময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম, গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া-আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-সঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে-মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল; পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনো চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাশ হিন্দুস্থানিতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম

সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন কোন মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না। এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম, রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না-পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত-পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসনগ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর-উল্-মুলক আমাকে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিনটশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিনটশ পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানি রমণীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব

করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশদিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট, চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি, এক নববিকশিত বাঙালি সাহেব—দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারো দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ-হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত-বড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনরূপ দার্শনিক তর্ক না-তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে। আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না, কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্যকোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েশ করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ। ফরমায়েশ কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানি ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল, যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে-পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা-সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে-পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন, এমনসময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকারবাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষত সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে, হিন্দুস্থানি কখনো শুনি নাই, শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ-ভাষা আমিরের ভাষা—এ যে-দিনের ভাষা সে-দিন আর নাই; আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো-বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা-পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে-করিতে জোড়করে ঊর্ধ্বমুখে নবোদিতসূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে-করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমান বালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন, অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনুদেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্মপার্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে-মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে

তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারো অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না-পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন-তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদঘাটিত হইত। মূর্তি-প্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতিপুরাতন অতিবিস্তীর্ণ অতিসুন্দর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত; আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে উড়িয়া-উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুটুম্বসম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানিবাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না-দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ-কিছু দিলেন না; কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া-ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধুলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহসংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন-একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতাব গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারো দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধুলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর-সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে-খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম।

কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চবণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম; শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল।'

আমি তৎক্ষণাৎ আমাব গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিযা চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধবেব মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বাঁমচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে-নিদারুণ আঘাত লাগিযাছিল সেই আহত স্থানে আমাব সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে-অল্পে চেতনার সঞ্চাব হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আব জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনাব ভক্ত সেবিকা । আমি নবাব গোলামকাদের খাঁব কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ-সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পাবিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিযা বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনো বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ কবিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

...

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি ভাষা শুনিতেছিলাম, কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জানোয়ার"।

নবাবজাদী কহিলেন, 'কে জানোয়ার। জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা। দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।"

আমি বললাম, "তাও বটে।" বলিয়া চুপ কবিযা গেলাম।

...

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমাব বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমাব মাথাব উপব চুবমাব হইযা ভাঙিযা পডিযা গেল। মুহূর্তেব মধ্যে সংজ্ঞা লাভ কবিযা সেই কঠোব কঠিন নিষ্ঠুব নির্বিকাব পবিত্র বীব ব্রাহ্মণেব পদতলে দূব হইতে প্রণাম কবিলাম—মনে-মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনেব সেবা, পবেব অন্ন, ধনীব দান, যুবতীব যৌবন, বমণীব প্রেম কিছুই গ্রহণ কবো না, তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূব, তোমাব নিকট আত্মসমর্পণ কবিবাব অধিকাবও আমাব নাই।

নবাবদুহিতাকে ভূলুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম কবিতে দেখিযা কেশবলাল কী মনে কবিল বলিতে পাবি না, কিন্তু তাহাব মুখে বিস্মষ অথবা কোনো ভাবান্তব প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবাব আমাব মুখেব দিকে চাহিল; তাহাব পবে ধীবে-ধীবে উঠিল। আমি সচকিত হইযা আশ্রয দিবাব জন্য আমাব হস্ত প্রসাবণ কবিলাম, সে তাহা নীববে প্রত্যাখ্যান কবিল, এবং বহু কষ্টে যমুনাব ঘাটে গিযা অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেযানৌকো বাঁধা ছিল। পাব হইবাব লোকও ছিল না, পাব কবিবাব লোকও ছিল না। সেই নৌকাব উপব উঠিযা কেশবলাল বাঁধন খুলিযা দিল, নৌকা দেখিতে-দেখিতে মধ্যস্রোতে গিযা ক্রমশ অদৃশ্য হইযা গেল—আমাব ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদযভাব, সমস্ত যৌবনভাব, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভাব লইযা সেই অদৃশ্য নৌকাব অভিমুখে জোডকব কবিযা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তবঙ্গ যমুনাব মধ্যে অকাল-বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জবীব ন্যায এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন কবি।

কিন্তু পাবিলাম না। আকাশেব চন্দ্র, যমুনাপাবেব ঘনকৃষ্ণ বনবেখা, কালিন্দীব নিবিড নীল নিষ্কম্প জলবাশি, দূবে আম্রবনেব ঊর্ধ্বে আমাদেব জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লাব চূডাগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীব ঐকতানে মৃত্যুব গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতাবাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মবিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্না বজনীব সৌম্যসুন্দব শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুব প্রসাবিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিযা আমাকে জীবনেব পথে টানিযা লইযা চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতাব ন্যায যমুনাব তীবে তীবে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা, কোথাও-বা বন্ধুব বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডেব ভিতব দিযা চলিতে লাগিলাম।'

...

এইখানে বক্তা চুপ কবিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পবে নবাবদুহিতা কহিল, "ইহাব পবে ঘটনাবলি বড়ো জটিল। সে কেমন কবিযা বিশ্লেষ কবিযা পবিষ্কাব কবিযা বলিব জানি না। একটা গহন অবণ্যেব মাঝখান দিযা যাত্রা কবিযাছিলাম, ঠিক কোন পথ দিযা কখন চলিযাছিলাম সে কি আব খুঁজিযা

বাহিব করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোনটা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না-হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবাব বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে-পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে-পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিযাছে—তাহা বন্ধুব বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখেদুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধাবণ মানবেব পথে একাকিনী নবাবদুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবাব উৎসাহ আমাব নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ-অবমাননা অনেক ভোগ কবিতে হইযাছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতশবাজিব মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিযাছি। যতক্ষণ বেগে চলিযাছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পবম দুঃখেব সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিযা গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়পদার্থেব ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমাব যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।”

*এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে-মনে ঘাড নাড়িলাম; এখানে তো কোনো* মতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, “বেয়াদপি মাপ কবিবেন, শেষদিককাব কথাটা আর অল্প-একটু খোলসা কবিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয।”

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমাব ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাশ হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পাবিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু।

...

তিনি পুনরায় আরম্ভ কবিলেন, “কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈর্ঋতে, বজ্রপাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্‌বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে-সকল বীর-মূর্তি ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে-পথে, তীর্থে-তীর্থে, মঠে-মন্দিরে ভ্রমণ করিযাছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহাব নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই।—সেই ব্রাহ্মণ, সেই দুঃসহ জ্বলদগ্নি, কখনো নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বাবা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে-কথার কোনো উল্লেখ নাই; তাহার একমাত্র কাবণ তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে-একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে-বাহিরে আচারে-ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে-মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমাব ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে-কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিয়াছিলাম, নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন অনির্দেশ মহাবহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহার কোনো সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে-পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভুটিয়া লেপচাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার-বিচার নাই, ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র। বহুদিনের সাধনায় আমি যে-বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি,

ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকাবেই নিবিয়া যায়, সে-কথা আব সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা কবিব।

আটত্রিশ বৎসব পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইযাছি।”

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিযা আমি ঔৎসুক্যেব সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “কী দেখিলেন।”

নবাবপুত্রী কহিলেন, “দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লিতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।”

...

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনাব কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, “আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভযে বিজাতীযের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে, সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।”

নবাবকন্যা কহিলেন, “আমি কি তাহা বুঝি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে-ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না-হইবে তবে ষোলো-বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণেব প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভবে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আব-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন-যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।”

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “নমস্কার, বাবুজি।”

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, “সেলাম, বাবুসাহেব।” এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না-বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখবের ধূসর কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলি মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম,

তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদযভারকাতর নৈরাশ্যমূর্তিও দেখিলাম, একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের বক্তরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধবনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দু ভাষায বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কেব মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল কবিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংবাজ পুরুষগণ বাযুসেবনে বাহির হইযাছে, মধ্যে-মধ্যে দুই-একটি বাঙালিব গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আব সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস, আমি পবর্তের কুযাশাব সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপবিমাণে মিশ্রিত কবিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা কবিযাছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরেব কেল্লা, কিছুই হযতো সত্য নহে।

# মুসলমানির গল্প

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হ'ত দিনরাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলি দেবতার মুখে তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলি চোখের জলের দোহাই পাড়তে হ'ত. শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে-চলতে পদে-পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে-খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে, এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্য-বিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত পোড়ারমুখী বিদায় হ'লেই বাঁচি। সেই রকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে। কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ-মা গিয়েছিল মারা. সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হ'ত কিন্তু তা হ'ল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন ক'রে এসেছে। তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখো তো ভাই, মা-বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে, কোন সময় কী হয় বলা যায় না; আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারিদিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে, ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোনদিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চ'লে যাচ্ছিল একরকম ক'রে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেইজন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।" ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে ব'সে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন—বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল, নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটা-মোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে ব'লে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ-একটু শৌখিন ছিল, তার এক স্ত্রী আছে, আর-একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে, কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হ'ল তাদের পণ। কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ?"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে ক'রে রাখতুম জানো তো মা।"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হ'ল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে। বাজনা বাদ্যি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাতজোড় ক'রে বললে, "বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।" শুনে সে আবার ভগ্নীপতির পুত্রদের আস্পর্ধা ক'রে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।" কাকা বললে, "বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তারপর মেয়ে এখন তোমার, তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও, আমরা এ-দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।" ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।" ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে। কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার, সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই। কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল, তফাৎ যাও, আমি হবির খাঁ।" ডাকতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না, কিন্তু আমাদের ব্যাবসা মাটি করলেন কেন।" যাই হোক, তাদের ভঙ্গ দিতেই হ'ল। হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।" কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো : যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেবো।" কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।" হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ-জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।" কমলা কেঁদে বললে, "দয়া ক'রে কাকাকে খবর দাও, তিনি নিয়ে যাবেন।" হবির বললে, "বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। না-হয় একবার পরীক্ষা ক'রে দেখো।" হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা ক'রে রইলুম।" বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধ'রে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি

ত্যাগ কোরো না।” কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাকী এসে দেখে ব'লে উঠল—“দূর ক'রে দাও, অলক্ষ্মীকে, সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!” কাকা বললে, “উপায় নেই মা, আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।” মাথা হেঁট ক'রে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হ'য়ে হবিরের সঙ্গে চ'লে গেল, চিরদিনের মতো বন্ধ হ'ল তার কাকার ঘরে ফেবাব কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার-ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, “তোমার মহলে আমার ছেলেবা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পূজা-আর্চা হিন্দুঘরের আচাব-বিচার মেনে চলতে পারবে।” এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানির মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা ক'রে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে-মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানি এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ন। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানির পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয়নি কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে, সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি রক্ষাকল্পে এই রকম সমাজ-বিতাড়িত, অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকী তাকে দূর-ছাই করত, কেবলি শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম'লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে-মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হ'ত। রাজপুতানির মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে-লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা প'ড়ে গেল, তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে—“বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে-ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে-ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে-কথা আজো আমি ভুলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালবাসা পেলুম বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে-দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা; তিনি হিন্দুও নন

মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্ম-কর্ম ওর সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান ক'রে নাও আমাকে, তাতে আমাব আপত্তি হবে না; আমার না-হয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি ক'বে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদেব সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে-কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, ওর নাম হ'ল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওব কাকার দ্বিতীয মেযেব বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হ'ল পূর্বেব মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথেব মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতেব দল। শিকার থেকে একবাব তারা বঞ্চিত হযেছিল সে-দুঃখ তাদেব ছিল, এবাব তাব শোধ দিতে চায়। কিন্তু তারি পিছন-পিছন আব-এক হুঙ্কাব এল "খবরদাব।" "ঐবে, হবিব খাঁব চেলাবা এসে সব নষ্ট ক'বে দিলে।" কন্যাপক্ষবা যখন কন্যাকে পালকিব মধ্যে ফেলে বেখে যে যেখানে পেল দৌড় মাবতে চায তখন তাদেব মাঝখানে দেখা দিল হবিব খাঁযেব অর্ধচন্দ্র আঁকা পতাকা-বাঁধা বর্শাব ফলক। সেই বর্শা নিযে দাঁড়িযেছে নির্ভযে একটি বমণী। সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোব ভয নেই। তোব জন্যে আমি তাঁব আশ্রয় নিযে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয দেন। যিনি কারু জাত বিচাব কবেন না। কাকা, প্রণাম তোমাকে, ভয নেই। তোমাব পা ছোঁবো না। এখন একে তোমার ঘবে নিযে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য কবেনি। কাকীকে বোলো অনেকদিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হযেছি, সে-ঋণ যে আমি এমন ক'রে আজ শুধতে পাবব তা ভাবিনি। ওব জন্যে একটি বাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আব একটি কিংখাবের আসন। আমাব বোন যদি কখনও দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তাব মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

# সেই ছেলেটা

## জ্যোতির্ময়ী দেবী

দিল্লিব বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কুইনস পার্কের মাঝে জায়গাটা।

চারদিকে লোক যাওয়া-আসা করছে, ব'সেও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রেব বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, বোদ্দুবটা ভালোই লাগছিল।

তাদের আলোচ্য বিষয়টি হ'ল দু-একটি চাকুবি খালি হয়েছে, বয়স্কা মেয়েদেব শিক্ষা বিভাগে। মেযে চাই। মাহিনা এখন ৫০ টাকা ক'রে। পবে পাকা চাকরি হ'লে ৮০ টাকা হবে। কোয়ার্টাব পাবে। উন্নতিব আশাও থাকবে। গুণপনা বা বিদ্যাবুদ্ধি ম্যাট্রিক হ'লেই চলবে আপাতত। স্কুল বা পাঠশালা বসে দুপুরে তিন ঘণ্টা কবে —সেলিমগড়ে, বিল্লিমারনে, খাড়িবাউড়িতে. কাবোলবাগে, বাল্মীকি মন্দিরের হরিজন কলোনিতে বা অন্যত্র যেখানে হোক পড়াতে হবে। ছাত্রীদের ১৪ বছবেব ওপর থেকে ৬০।৭০।৮০ বছর বয়স অবধি চলতে পারে। ১৪ বছরেব নিচে বযস চলবে না।

দাঁড়িয়ে ছিল বরুণা গুপ্ত, সুজাতা মিত্র আব রাজকুমারী (ক্ষেত্রী) মেহেরা—তিনজনেই ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজেব ফার্স্ট ইয়ারের, সেকেণ্ড ইয়ারেব ছাত্রী।

চাকরিটার ভারি সুবিধা। সকালে কলেজ ক'রে দুপুরে একটার পর বয়স্কদের স্কুলে —'পহেলি কিতাব' আর 'দুসরি কিতাব' আব পহাড়া পড়ানো—(প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর নামতা)। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে তো এ পড়ানো 'ডাল-ভাতেব' চেয়েও সোজা। এতেই মাস গেলে পঞ্চাশটি টাকা। এরা তিনজনেই দরখাস্ত দিয়েছে।আরও কতজন দিয়েছে তা ওরা জানে না। তবে মনে হয় ওরাই ক-জন দিয়েছে। সকলে তো খবরও জানে না আর সকলের তো সময়-সুযোগও হয় না।

এরা তিনজনেই ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। চেনাশোনা আছে।

বরুণা জিজ্ঞেস করলে রাজকে আর সুজাতাকে—'তোরাও কি এখানে দরখাস্ত দিয়েছিস?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ, গুপ্তর অপিসে।'

রাজকুমারীরই বয়স সবচেয়ে কম। সে বললে, 'আমিও তো এখানেই দিলাম। সেদিন আমার কাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু গুপ্তজি কি বাঙালি? তোমাদের কেউ আপনার লোক হন কি? বরুণা বিবিজিও তো গুপ্ত? তাহ'লে তোমাদের চাকরি হবে। তাতে এবারে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছ তোমরা।'

সুজাতা হাসলে, বললে, 'না, গুপ্তজি বাঙালি নন। ইউ. পি.র লোক বোধহয়। লোকটিকে কেমন যেন লাগল। টেবিলের ওপর পা তুলে ব'সে দাঁত খুঁট্‌ছিলেন। আমরা ক-জন মেয়ে ঘরে ঢুকলাম নানা কাজে। আমার হাতে দরখাস্ত ছিল, দিলাম। তা যেমন

ব'সে ছিলেন, তেমনই ব'সে রইলেন। দরখাস্ত দেখে বললেন, আপ বাঙালি? কোন দেশে থাকেন? বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালি। বহুদিন দিল্লিতে আছি। পড়াশুনা দিল্লিতেই করেছি। হিন্দিও জানি। ভদ্রলোক বললেন, "আপকি হিন্দি জোবান অচ্ছি নেহি।" (আপনার হিন্দি উচ্চারণ ভালো নয়।) সবিনয়ে বললাম—"হ্যাঁ, আমি তো বাঙালি, কাজেই তা হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দি পড়াতে পারব। হিন্দিতেই পাশ করেছি, এখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্কুল থেকে।"

সুজাতা হাসতে লাগল। বললে, 'আমাদের কাজ পাবাব ভরসা নেই। রাজ পাঞ্জাবি, তাতে উদ্বাস্তু। তুমি পেলেও পেতে পারো।'

রাজ অন্যমনে ফুলের কেয়ারির দিকে চেয়ে ছিল। চোখে যেন জল। একটু ম্লানভাবে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললে, 'এই চাকরিটা পেলে আমাব কলেজে পড়া হবে, নইলে কাকা আর পড়াতে পারবেন না। কোনোরকমে ভর্তি হয়েছি বটে—কিন্তু বই, কলেজের মাহিনা, নানা খরচের জন্য বাড়ির কারুর মত নেই পড়ার। আমাদের তো সব ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন খুবই অসুবিধা।'

বরুণা বললে, 'তোমার মা কী বলেন? ঐ অসুবিধার জন্যেই তো আরও দরকার।'

রাজ আরও ম্লান হ'য়ে গেল। বললে, 'মা নেই—মা থাকলে...।'

বন্ধুরা বললে, 'আহা। তাহ'লে বাড়িতে কে আছে?'

'অনেক লোক। বাবা, ঠাকুমা, কাকারা, কাকিরা, তাদের ছেলেমেয়ে, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই আছে।'

ওরা কেন্দ্রের অপিসে ঢুকল। সেখানকার প্রধানার কাছে শুনল, দু-তিন দিনের মধ্যে খবর পাবে। দরখাস্তের জবাব। দুটো কাজ খালি আছে। এবং জানুয়ারির গোড়াতেই রাজকুমারী আর অন্য-একটি মেয়ে কাজ পেয়ে গেল।

সুজাতা ও বরুণা রাজের হাসিমুখ দেখে খুশি হ'ল। রাজ পেল বিল্লিমারন গলিতে একটি ছোট্ট কেন্দ্রে কাজ। সকলেই নানা জায়গায় অধিবাসিনী হ'লেও কুইন্‌স পার্কে কর্মসূত্রে আসা-যাওয়া করে।

কাজের শেষে পার্কের ওদিকের গেটে বাস্ স্ট্যাণ্ডে যায়। একসঙ্গে বাড়ির দিকের বাসে ওঠে। বাগানে বেড়ায়। চিনেবাদাম কিনে খায়। চাঁদনি চকের ঘণ্টাওয়ালার দোকানের প্রসিদ্ধ 'ডালমোটও' খায়। দইবড়া খায়। ভালোমন্দ যা-খুশি খায়।

বাস্ স্ট্যাণ্ডের আশেপাশে বাগানের ঝোপঝাড়ের পাশে অসংখ্য ভিখিরি থাকে নানারকম ধরনের।

সেদিন ওরা বাগানে রোদ্দুরে ব'সে বাদাম খেয়ে বাসের দিকের গেটে এল।

সহসা একটা ভিখিরি মেয়ে একটি ছেলের হাত ধ'রে এসে এদের সামনে দাঁড়াল, 'বিবি, কুছ দে।' ছেলেটা হাত পাতল না, মার ওড়না ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মা হাত পাতল।

বরুণা বললে সুজাতাকে, 'তোর কাছে খুচরো আছে? তাহ'লে দুটো পয়সা দিয়ে দে। আমার খুচরো নেই।'

রাজ বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিল একটু পিছনে।

সুজাতা থলে থেকে ব্যাগ বার করল।

বরুণার হাতে পয়সা দিল, নিজেও দুটো দিল।

ভিখিরি মেয়েটি পয়সা নিল। এবারে রাজ এসে পৌঁছেছে। তাকে দেখে বললে, 'বিবি, তু ভি দে কুছ।' (তুইও কিছু দে।) 'শালওয়ার কামিজ' দেখে স্বদেশিনি বলে একটু হেসে বললে, 'কুছ ওড়নে-কা দে বিবি (গায়ের কাপড়)।'

রাজও পয়সা বের করছিল, 'ওড়নেকা কুছ' শুনে একটু হাসল। 'শোনো কথা! তোর জন্য যেন ওড়না নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

তারপর ছেলেটিকে দেখে বললে, 'মুঙফলি (চিনেবাদাম) খাবি? এই নে।' নিজের ওড়নার আঁচল থেকে ছেলেটির হাতে দিতে গেল।

সুজাতা হাসল, 'ও চাইছে চুননি (ওড়না) আর রাজ দিচ্ছে মুঙফলি (বাদাম)।'

ভিখারিনি চিনেবাদাম নিতে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বললে, 'বিবি, তোর ঘর কোথা?'

রাজ আবার হাসল—'আমার ঘর দিল্লির সেলিমগড়, তুই যাবি সেখানে? ওড়না নিতে?' ঠাট্টার সুরে বলল।

ভিখারিনি বললে, 'না, তোর পিণ্ড (দেশ) কোথায জিজ্ঞেস করছি।'

রাজ বললে, 'আমার দেশ লাহোব। তোরও কি লাহোরে দেশ?'

বরুণা আর সুজাতা এবারে একসঙ্গে হেসে বলে উঠল, 'ওরে রাজ, তুই ওর দেশেব লোক কিনা জানতে চায়, কী মুশকিল। আমরা বাঙালি, তাই পয়সা দিয়েই খালাশ পেয়েছি।'

ভিখারিনি একটু থমকে গিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'আ রাজ? তোর নাম রাজ? লাহোর তোর দেশ?'

বাজকুমারী হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, রাজকুমারী। লাহোর আনারকলি বাগের কাছে, তা তোর কী হ'ল? নে পয়সা, আয়—'

ভিখারিনি ওড়না পেতে চিনেবাদাম নিতে বা পয়সা নিতে আর এগিয়ে এল না। আস্তে-আস্তে পিছিয়ে গেল ছেলের হাত ধ'রে। একবার যেন বললে, 'আ মেরি রাজ।'

ওদিকে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে, গন্তব্য পথের নম্বর মাথায়। রাজ বললে, 'কী হ'ল? নে পয়সা?'

সুজাতা বরুণা ডাকলে, বললে, 'রাজ, আয়, আমাদের বাস্ এল।'

কিন্তু ভিখারিনি কোথায়? সহসা কোন্ ঝোপের আড়ালে চ'লে গেছে। আর দেখা গেল না। পয়সা নিতে এল না আর। রাজ আবার ডাকল, 'কই রে, পয়সা নে।' কোথাও নেই। ওরা অবাক হ'য়ে গেল তিনজনেই।

বরুণা বলল, 'ও তোকে চেনে না কি?'

রাজ বললে, 'কেন?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ শুনলাম "রাজ" "রাজ" বললে যেন।'

পয়সা হাতে একটু চুপ ক'রে থেকে বাজ স্তম্ভিতভাবে বললে, 'কী জানি, তোরা নাম ধ'রে ডাকলি, তাই হয়তো শুনে ও রাজ বললে।'

আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকলে বাসে উঠে পড়ল।

## ২

বাজের বাড়ি কারোলবাগে উদ্বাস্তু কলোনিতে। সেলিমগড়ে নয়।

বাড়ি ফিরে অনেক কাজ তার। আটা মাখতে হবে। তন্দুরে রুটি হবে। উঠোনের কোণে মুখভাঙা জালাব মতো প্রকাণ্ড তন্দুরে ঘুঁটেব আগুন জ্বেলে দিয়ে সে ওড়না কামিজ বদলে বান্নাঘরে আটা মাখতে এল। সন্ধেবেলাতেই সব খাওয়া হয়ে যায় ওদের, পাঞ্জাবিদের। এক্ষুনি ভাইরা, বোনেরা, ঠাকুমা খাবে। তারপর বাবা-কাকাবাও খেতে আসবে। দেখলে, মেজো খুড়িমা 'মাহ্ কী দাল' (মাষকলাই) রান্না করে রেখেছিল, আটাও মেখেছে।

ওকে দেখে সে নিজেব অন্য কাজে গেল ছেলেমেয়ে দেখতে।

রাজ আটার থালা নিয়ে উঠোনে তন্দুরের পাশে দাঁড়াল। এক-একটা মোটা-মোটা রুটির তাল হাতে ক'রে তন্দুরের গায়ে চেপটে লাগিয়ে দিতে লাগল। সেগুলি উনানের গরম গায়ে সেঁকা হ'য়ে আগুনে প'ড়ে যায়। আর সে চিমটেতে নয়তো হাতে নেকড়া জড়িয়ে তুলে নেয়।

আড়াই সের আটার রুটি সেঁকা হ'ল। থালার মধ্যে নেকড়া জড়িয়ে সেগুলি গরম রাখল, পরে ঘি মাখাবে। পাঞ্জাবে ঘিয়ে বা মাখনে ডুবিয়ে তুলত। এখানে আর সেদিন নেই।

ভাই-বোনেরা খেতে এল। রুটি ডাল আচার আর দুধ দিয়ে খাওয়া হ'ল। দাদি বাবা কাকারা খেয়ে নিল।

দেখতে-দেখতে শীতের রাত ঘনিয়ে অন্ধকার হ'য়ে গেছে। পাঞ্জাবি পাড়ার লোকেদের খাওয়া সেরে বেড়ানোর বা জিরোনোর সময় তখন।

সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। রাজ আর কাকিরা দুজনে খেতে বসল। মেজো কাকি বললে, 'তোর মুখটা আজ ভারি শুকনো লাগছে। আর রুটিও তো কম নিয়েছিস দেখছি। কেন, অসুখ করেছে কী?'

রাজ একখানা রুটিই নিয়ে বসেছিল। ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বললে, 'না, অসুখ করেনি। তবে ভালো লাগছে না যেন।'

ছোটো খুড়ি বললে, 'আজ তাহ'লে শুয়ে পড়গে শিগ্‌গির ক'রে। আমি বাসনগুলো মেজে রাখব।'

পালা ক'রে ভাগে-ভাগে কাজ করে সবাই। তবে ওরই ভাই-বোন নিয়ে কাজ বেশি পড়ে।

শীতের রাত। সকলেরই ছোটো-ছোটো খাটিয়াতে বিছানা। দিল্লির শীত। লেপ-কম্বল নিয়ে সব ভাই-বোন ঠাকুমা-বাবা এক ঘরেই শুয়েছে।

শালওয়াব-কামিজ-ওড়না ছেড়ে রেখে ছোটো জামা আব 'কাছেডা' বা পাজামা প'রে রাজও নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল।

নিরালোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘর, কোনদিকের একটা জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার একটু আলোর চিলতে এসে পড়েছে।

বাজ সেদিকে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে ওর হাতের কর্মচক্র থেমেছে। মন যেন স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে এক জায়গায়। সেটা কোন জায়গা? মন জানে সেটা কোথায়। রাজও জানে কোথায়। কিন্তু রাজের গলা থেকে ঠোঁট দুখানা অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল হঠাৎ। ভাবতে ইচ্ছে করছে না সেই জায়গাটির কথা।

তাহ'লে কি উঠে জল খাবে? যদি ভাবনাটা ন'ড়ে যায়? উঠল, জল খেল। ঘুমের মাঝে ঠাকুমা বললে, 'কে, রাজ?'

এবারে শুয়ে পড়ল আবার। আজ আর শীত-শীত করছে না। ঘরটা যেন সব গরম হ'য়ে গেছে।

গরম হোক, শীত হোক, তেষ্টা পাক, গলা শুকোক, কিন্তু সেই জায়গাটা আর রাজের মনেব চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

রাজ বালিশে শুকনো মুখ গুঁজে যেন কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না।

অশ্রুহীন মুদিত চোখের সামনে ভেসে এল কুইনস্ পার্কের সেই জায়গা ও সেই ভিখারিনি...। ছেঁড়া বিবর্ণ ওড়না, ময়লা জামা-শালওয়ার পরা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে 'আ রাজ? মেরি রাজ' ব'লে পিছন দিকে স'রে-যাওয়া সেই ভিখারিনি।

হ্যাঁ, রাজ চিনেছে তাকে। তার নাম বলতেই যেন মনে হয় চিনতে পেরেছিল সে কে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি।

এবারে চোখে জল এল। রাজ নিঃশব্দে নিশ্বাসের মতো শব্দহীন গলায় বলল, 'মা।' হ্যাঁ, মা-ই তো যেন।

এবারে ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

## ৩

আর চোখের জলের সাগরে প্রতিবিম্বের মতো ফুটে উঠতে লাগল সেই ১৯৪৬ সালের লাহোরের দুর্যোগের দুর্দিনের ছবি।

অনেক রাত্রি তখন। কত রাত্রি কে জানে? সব ঘুমিয়েছে ঘরে-ঘরে কাকারা ঠাকুমা। মা-র ঘরে মা-বাবা ভাই-বোন ওরা সব।

সহসা এক কাকা ডাকলেন ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে—ঘরে ধাক্কা দিয়ে, 'ওঠ ওঠ সব, শিগগির ওঠ। মুসলমানরা এদিকে আসছে।'

বাবা-মা উঠলেন। ঠাকুমা কাকিরা বাড়িশুদ্ধ সব যে যেখানে ছিল, মস্ত বাড়ি বাগান, কত দাসদাসী, লোকজন, সব একে-একে জেগে উঠে নিঃশব্দে সভয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াল একত্র হ'য়ে।

খবর দিতে পুলিশের লোক এসেছে। তিন-চারখানা ট্রাকও এসেছে। এই রাত্রেই লাহোরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচতে পারে। না-হ'লে তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। 'যার যা দরকারি জিনিশ, টাকা-কড়ি-গহনা নিতে পারো নিয়ে যাও।' আরও বললে, 'বেশিক্ষণ সময় নেই। বাইরে আলো জ্বেলো না, কথা বোলো না, দেবি কোরো না। জানানাদের ইজ্জৎ, প্রাণ বাঁচাতে তারা পারবে তাড়াতাড়ি করলে। নইলে খোদা জানেন কী হবে।'

আতঙ্কে অভিভূত ঠাকুমা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তাকে বাবা আর কাকারা ধ'রে-ধ'রে নিয়ে এসে খোলা ট্রাকের উপর বসিয়ে দিলেন। সেখানেও বাস্তার অসংখ্য লোক জমেছে, সকলেই গাড়িতে ওঠবার জন্যে ব্যাকুল। ঠাণ্ডা কনকনে শীতের রাত্রি। পৌষের না মাঘের রাত্রি। পথের সবাই ভূতের ছাযার মতো নিঃশব্দে মিনতি-ভরা মুখে চেয়ে আছে পুলিশদের দিকে। যদি তাদেরও নেয়।

পুলিশবা বললে, 'আমরা সারারাত ধ'রে সকলকে যত পারব অমৃতসরের সীমান্তে পৌছে দিয়ে আসব। কিন্তু আগে কিছু বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাদের, মেয়েদের দলদের দিয়ে আসি। পরে অন্য-সবাইকে নেবো। তাই হুকুম আছে।

'ওঠ-ওঠ' করতে-করতে কাকারা কে ওকে গাড়িতে তুলে দিলেন। কাকিরাও উঠে বসেছে। ছোটো-ছোটো ভাই-বোনেরা ভয়ে শীতে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে। ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বাবা কাকারা সব উঠলেন।

পুলিশ বললে, 'গাড়ি ছাড়ছি।'

সহসা বুড়ি ঠাকুমা বললে, 'সবাই এসেছে? বিবি? বড়ি বিবি কোথায়?' (অর্থাৎ বড়োবৌ।)

বাবা বললেন, 'উঠেছে সব। ওঠেনি? ভিড় আর অন্ধকারে দেখা যায় না মানুষ।'

সহসা এক কাকা বললেন, 'না, আসেননি বিবিজি। দেখছি না তো।'

অন্ধকারে এক খুড়িও বলল, 'হ্যাঁ, তিনি ওপরের ঘরে কী আনতে গিয়েছিলেন।' অন্য-এক কাকা ডাকলেন, 'বিবিজি?' সাড়া নেই।

বাবা পুলিশকে বললেন, 'দাঁড়াও একটুখানি, তাকে ডেকে আনি।'

সহসা দূরের মোড়ের কাছে মশালের জোর আলো দেখা গেল। আর 'আল্লা হো আকবর' শোনা গেল।

পুলিশ বাবার হাত ধ'রে নিলে। বললে, 'আর নামা হবে না। তিনি পরের গাড়িতে আসবেন। হয়তো-বা অন্য গাড়িতে উঠেছেন। শীঘ্র গাড়ি ছাড়ো। ওরা এক্ষুনি এসে পড়লে আমি কারুকে বাঁচাতে পারব না। তুমিও ম'রে যাবে নামলেই।'

বাবা অস্থিরভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু পুলিশরা তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে ড্রাইভারকে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিতে বললে। বললে, 'আপনার জন্য এত লোক বিপদে পড়বে। বর্ডারে গিয়ে খুঁজে নেবেন।'

যে-সব রাস্তার আলো সব জায়গায় নেই, গলি-ঘুঁজি দিয়ে অন্ধকার, সেইসব রাস্তায় আতঙ্কে প্রাণভয়ে ভীত নিঃশব্দ মানুষদের নিয়ে তিন-চারখানা ট্রাক অন্ধকার নরকের পথের ভুতুড়ে গাড়ির মতো চলতে লাগল। সারি-সারি পায়ে-চলা অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষও চলেছে সেইসব পথে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। কারুর মনে আর-কোনো ভাবনা-চিন্তাই নেই, কোনোক্রমে অমৃতসরের সীমানায় খাশা গ্রামে পৌঁছনো ছাড়া; অনন্তকালের পিতৃলোকের বাস-করা দেশ, কত নিদ্রিত সুপ্ত স্বজনবন্ধু, যারা এখনও পথে বেরিয়ে আসেনি, ঠিক জানে না ব্যাপারটা; তারা ছাড়া ধন-ধান্য ঘরবাড়ি ঐশ্বর্য-সম্পদ চিরকালের বাস-নিবাস স্বদেশ ছেড়ে সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে—দীন দরিদ্র ভিখারি থেকে ধনী শেঠ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অবধি। এত কথা তখন রাজ ভাবতে জানত না। পরে ভেবেছে, পরে দেখেছে তাদের। পরে জেনেছে। নরক কেমন কেউ জানে না, রাজও জানে না। কিন্তু যমযন্ত্রণার ভয়ই যদি নরকের ভয় হয়, সেই আতঙ্কময় অন্ধকারময় নরকের পথের সহসা শেষ হ'ল। দম বন্ধ ক'রে ছোটো ট্রাকগুলি একেবারে সীমান্তে এসে খাশা গ্রামে দম ফেলল যেন।

কে কী ভাবছিল কেউই জানে না। রাজের কোলের উপর ছোটো দুটি ভাই-বোন নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-র কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। কাঁদেনি। তাকে ডাকেনি। তারাও কি ভয় পেয়েছিল? কীসের ভয়? রাজও কিছুই ভাবেনি। অস্পষ্ট ভাবনা—আজকে স্পষ্ট হয়েছে। সেদিন বোঝবার মতো বয়স ছিল না। দশ-এগারো মাত্র বয়স তখন।

শুধু দাদি কাঁদছিল ফোঁসফোঁস ক'রে। কাকিদের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলছিল। শুনতে পেয়েছিল রাজ—কী আনতে বৌ ওপরে গিয়েছিল? 'জেওর জেওরাত' (গহনাপত্র) 'সোনা মোতি'? ...'হায় হায়!...কী হবে সে-সব—যদি "জান" আর "ইজ্জৎ" চ'লে যায়? এমন বেহিশাব আক্কেল কেমন করে হ'ল!'

কাকা ধমক দিলেন, 'চুপ করো। পরের গাড়িতে হয়তো আসছেন।'

বাবা পাগলের মতো বসেছিলেন। পুলিশটা বাবার কাছ ছাড়েনি।

দু-ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টায় গাড়িএসে পৌঁছেছিল। একে একে সব গাড়ি থামল। প্রাইভেট গাড়িও ছিল সামনে-পিছনে কখানা। লোকেরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নামল—ঘুমন্ত শিশু বালক-বালিকাদের হাত ধ'রে—কোলে নিয়ে। জিনিশপত্র প্রায় কিছুই নেই। একবস্ত্রে অর্থাৎ যা পরেছিল তাই জড়িয়েই সব চ'লে এসেছে।

বাবা নামলেন সকলের আগে। ওদের কারুব দিকে তাকালেন না। কিছু বললেন না। শুধু অন্য গাড়িগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ডাকতে লাগলেন, 'বিবি, বিবি, বিবি, তুমি কি এসেছ এখানে?'

কেউ সাড়া দিল না। কাকারা নেমেছেন, কাকিদেরও নামিয়েছেন। ট্রাকগুলো এখনই ফিরে যাবে আরও বিপন্ন পলাতক যাত্রী আনতে। তখনও তারাভরা আকাশ। রাত্রি শেষ হয়নি। গাড়িগুলো যাত্রী নামিয়ে পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা-কাকাবা যাত্রীদের কাছে গিযে দাঁড়ালেন। ডাকতে লাগলেন 'বিবিজি' 'বিবিজি' ব'লে। ঘোমটা দেওয়া, মাথায় ওড়না দেওয়া, শাল জড়ানো চেহারা মেয়েদেব যাকেই দেখেন বাবা তাবই সামনে গিযে দ্যাখেন। যেন মনে করেন সেই বুঝি বিবিজি, ওঁদের মা। তারা অচেনা মুখে পিছন ফিরে তাঁর দিকে চায়।

তিনি অপ্রস্তুত হ'য়ে মাপ চেয়ে আবার অন্য মেয়েদের দিকে যান। ঠাকুমাও ভাঙা গলায় 'বৌটি' (বউ) ব'লে ডাকেন। কাকীরা 'জিঠানিজি' (জ্যেষ্ঠানি) 'হো জিঠানিজি' ব'লে ডাকেন। কেউ 'আ হো' (হ্যাঁ) 'এই-যে এখানে' ব'লে সাড়া দেয় না।

যাত্রীরা একে-একে সবাই যে যেখানে পারল গ্রামেব মাঝে শহরের পথে চ'লে গেল। ভোব হ'য়ে এল। ওরা ছোটোরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। কাকারা জোরে-জোরে 'বিবিজি' 'বিবিজি' ব'লে ডাকতে-ডাকতে গ্রামের বাইরে জঙ্গল খেত সব দিকে ঘুরতে লাগলেন। ভাবেন যদি অন্ধকারে এসে থাকেন—পথ আর মানুষ চিনতে না-পেবে গ্রামে কি অন্যদিকে চ'লে গিয়ে থাকেন।

যদিও মনে জানছিলেন সবাই যে, তিনি আসেননি। আসতে পারেননি। মা-র গাড়িতে ওঠা হয়নি। এখানে পথ ভোলেননি। চিরকালের মতো লাহোরেই র'য়ে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। সেই বাড়ি থেকে বেরুতে পারেননি আর। বিপদে পড়েছেন।

কিন্তু মনকে মিথ্যা আশাময় সান্ত্বনা দেয। আছে, সে আছে। আসবে। হয়তো আসবে সে পরের গাড়িতে।

পরের গাড়ি এল। আরও কত গাড়ি, হাঁটা-পথে লোক এল। সারা সকাল সারাদিন ধ'রে কত লোক এল, চেনা-অচেনা। বাবা উদভ্রান্ত মুখে ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথে মা-র মতো দেখতে সুন্দর চেহারা দামি জামা-কাপড় পরা কারুকে দেখেছ কিনা? কেউ কি হেঁটে আসছে সে-রকম?

কাকারাও সারাদিন খুঁজে-খুঁজে বেড়ালেন...ক্রমে আর যাত্রী আসা ক'মে এল। লোকমুখে শোনা গেল সেখানে মহল্লায়-মহল্লায়, পাড়ায়-পাড়ায় আগুন লাগানো, লুঠপাট শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা অপমানের ভয়ে কেউ-কেউ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। বিষ খেয়েছে। অন্যরকমে মরেছে। আর যারা তা পারেনি, তাদের 'লুঠেরা'র ধ'রে নিয়ে গিয়েছে...

রাজের চোখ এখন শুকনো। আর জল নেই। চুপি-চুপি যেন নিজের মনকে ও না-জানিয়ে ভাবে, তাহ'লে কি মা-ও পালাতে পারেনি, মরতে পারেনি? বেঁচে রয়েছে?

আবার চকিতভাবে ভাবে, না, তার হয়তো ভুল হয়েছে। ও মা নয়, অন্য-কেউ। এমন তো একরকম দেখতে হয়। আর এত রোগা, মা-র মতো ফরশাও নয়, মোটাশোটা সুন্দর দেখতেও নয়। আর ঐ ছেলেটি?...মা-র সঙ্গে ছেলেটি কেন? কার ছেলে? নাঃ, নিশ্চয়ই ও মা নয় তাহ'লে।

মনটা যেন একটু ভালো, 'তাকে' মা নয় ভাবতে। কী ক'রে মা হ'তে পারে যখন ঐ ছেলেটা রয়েছে। এবারে রাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা যেন দেখলে, লাহোরের সেই বাড়ি, সব ভাইবোন সকালে খেতে বসেছে। ইস্কুলের তাড়া সকলেরই। মা রুটি-পরোটা আচার-দুধ নিয়ে সকলকে ভাগ ক'রে দিচ্ছেন। আর হাসছেন, গল্প করছেন। শাদা শালওয়ার, রঙিন রেশমের জামা, হালকা ফিকে নীল রঙের 'চুননি' (ওড়না) পরা।

ওরা সকলেই খাচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু মা-র কাছে মা-র হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে-একটা ছেলে। সে তো ওর ছোটো ভাই নয়? কে ওটা? সেই ছেলে কি? সেইটেই তো যেন।

কী-রকম গলা শুকিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখল, অনেক বেলা হয়েছে, কেউ ঘরে নেই।

কাকি ডাকছে, 'রাজ, ওঠ, বেলা হয়েছে!'

## ৪

কারোলবাগের বাস এসে থামল চাঁদনিচকের দিকে। রাজ 'বিল্লিমারন'-এর স্কুলের দিকে তখনই গেল না। এখনও বাকি ছাত্রী সবাই আসেনি জানে। সংসারের কাজ সেরে তারা আসে।

সে কুইনস পার্কের ভিতরে ঢুকল। শীতের রৌদ্রে অনেক লোক বেঞ্চিতে ব'সে, ঘাসে ব'সে, রোদ পোয়াচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের দিকে ভিখারি-ভিখারিনিরা ও ছেলেমেয়েরা ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে নোংরা থালা ঘটি বাটিতে ভিক্ষালব্ধ রুটি-মুড়ি অন্য খাবার নিয়ে--কেউ বা গেলাসে চা নিয়ে খাচ্ছে। কারুর খাওয়া হ'য়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মাথা নিয়ে বসেছে উকুন বাছতে। কেউ-কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিপূর্ণ স্তব্ধ দুপুর।

রাজ চেয়ে-চেয়ে দ্যাখে তাদের। স্বপ্নটাও মনে আছে। ভিখারিনিকে সে আজ খুঁজে বার করবে। কাল বন্ধুরাও ছিল, আর ঠিক বুঝতেও প্রথমটা পারেনি বটে। তা আজও মনে সন্দেহ আছে, মা না-হ'তেও তো পারে? আর হয় যদি? নাঃ, সে-কথা ভাবতে মন চায় না। তবু ভালো ক'রে আজ দেখে বাড়ি ফিরবে, স্কুলে যাবে।

না। সেই ভিখারিনি আজ কোথাও নেই। আর সেই ছেলেটাও তো নেই। তাহ'লে আর-কোথাও ভিক্ষা করতে গেছে। বোধহয় আসবে সন্ধ্যার দিকে। যেমন সেদিন দেখেছিল। ফেরার সময়ে দেখতে পাবে নিশ্চয়।

তবে আজ আর অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে সে আসবে না। তাহ'লে কথা কইতে পারবে তার সঙ্গে।

সকাল-সকাল স্কুলের পড়ানো সেরে সে আবার ফিরল। তখনও বরুণা সুজাতাদের দলের কেউ বাগানের দিকে এসে পৌঁছোয়নি। বোধহয় কেন্দ্রের ক্লাস হয়নি। কলেজ সেরে তারা বয়স্ক কেন্দ্রে আসে সেলাইয়ের, বোনার কাজে।

বিকাল শেষ হ'য়ে এল। ভিখারির দলও ভিক্ষা চেয়ে বেড়াল। ঠাণ্ডা পড়বার আগেই অনেকে ফিরে গেল প্রতিদিনের মতো।

কিন্তু সেই ভিখারিনি মেয়েটি নেই, আসেনি। তাহ'লে কোনো দূর জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছে।

সহসা পিছন থেকে বন্ধুরা এসে ডাকল, 'এই রাজ, কী করছিস ওই নোংরা ঝোপের কাছে? আয় একটু "জলজিরা" ফুচকা খাই।'

রাজ চমকে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ তাদের ডাকে।

তারা হেসেই আকুল, 'কী রে, ভয় পেয়েছিস? ভূত দেখলি?'

সেও হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে "জলজিরা" কচুরি (ফুচকা) খেল। গল্প করল শুকনো-শুক্‌নো মুখে, অন্যমনস্কভাবে।

তারপর বাসে উঠল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। তার পরের দিনও গেল। তার পরের দিনও ওই ভাবেই সে খুঁজল। কিন্তু সেই ভিখারিনি আর তার সেই ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

তাহ'লে কি দরিয়াগঞ্জের মন্দিরগুলোর কাছে ভিক্ষা করতে গেছে? অথবা কেল্লার কাছে প্যারেড ময়দানের সামনে 'দাউজি' 'গোপালজি'র মন্দিরের কাছে গেছে ভিক্ষা করতে? সেখানে সন্ধেবেলা কথকতা হয়, অনেক মেয়ে আসে। মিষ্টির দোকানিরাও বেশ ভিক্ষা দেয়, রুটি-পয়সা ইত্যাদি।

ঘুরে-ঘুরে রাজের মুখ শুকিয়ে সরু লম্বা হ'য়ে যায়। ক্ষেত্রী মেয়ের অত উজ্জ্বল রঙ, সে-রঙ রোদ-পোড়া রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

কাকিরা ভাবে, চাকরি আর পড়া দুয়ের খাটুনি। আর বাড়ির কাজও তো কম নয়। যেদিন রুটি না-করে, সাবান কাচে, ইস্ত্রি করে, চরকায় সুতোও কাটতে হয় মাঝে-মাঝে। পুরোনো তুলো জমেছে অনেক, সেগুলোর সুতো থেকে "খেশ" বা সুজনি তৈরি হবে। রাজের কাজের শেষ নেই।

কিন্তু রাত্রেও ঐ ভাবনা যেন ঘুমের আড়ালেও মনে জেগে থাকে। তবে এখন যেন ওর মনে আর একটা সন্দেহ উঁকি মারে। তাহ'লে নিশ্চয় সে মা। তাই আর ও-পথে আসে না, আর সেজন্যেই সেদিনে ভিক্ষে না-নিয়েই চ'লে গিয়েছিল।

এখন রাজের নিজেকে যেন অপরাধিনী মনে হয় ভিখারিনিটার পরিচয় না-নেওয়ার জন্যে। কেন সেদিন তার 'রাজ' বলা শুনেও ও এগিয়ে যায়নি? সঙ্গিনীদের জেনে ফেলার ভয়ে অথবা কীসের সংকোচে? ওই ছেলেটার জন্যে? না, মা ম'রে গেছে বলেছিল

বন্ধুদের সেই জন্যে? অন্যকিছু সম্পর্কও তো বলতে পারত?

রাজ বিনিদ্র চোখে শুয়ে-শুয়ে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা ভিখারিনির মুখটা স্পষ্ট ক'রে মনে করবার চেষ্টা করে। চোখে জল আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে সহসা আচমকা জেগে ওঠে। মনে হয়, কী অন্যায় ক'রে ফেলেছে যেন। কখনও আর সে ভুল শুধরোনো যাবে না। কিন্তু...।

৫

সেদিন একটা শনিবারের বিকাল। রাজ তেমনি আগে এসেছে, এদিক-ওদিক ঘুরছে।

সহসা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কে। ফিরে চেয়ে দেখল, বরুণা।

বরুণা বললে, 'তোর কী হয়েছে, রাজ, কেবলই ঘুরে-ঘুরে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াস আজকাল। বাড়িতে কিছু হয়েছে? না, কোনো দরকার পড়েছে! চল, একটু ওই ঘাসে বসি।'

রাজ শুকনো মুখে ঘাসে বসে। বরুণা বলে, 'খাবি কিছু?'

সে বললে, 'না, এবারে বাড়ি যাই।'

বরুণা বললে, একটু পরে যাবো। সুজাতা আসুক। তার আগে তুই বল তো, কেন একলা ভিখারি পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। সেদিন দরিয়াগঞ্জে দেখলাম মন্দিরের সামনে। তার আগে কেল্লার ময়দানের সামনেও দেখেছি। কী হয়েছে, বল তুই। কারুকে খুঁজছিস কি?'

এবারে রাজের চোখে জল এসে পড়ল। আত্মীয় নয়, আপনজন কেউ নয় বটে, কিন্তু ওরা ওকে ভালোবাসে, ইস্কুল থেকে চেনা-জানা। এক ক্লাসে পড়া বন্ধু। হয়তো ওকে এ-কথা বলা যায়। ওরা তো আপনার লোক নয়, তাই বলা যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু দু-ফোঁটা জল এসে পড়ল চোখে।

বরুণা তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, 'কী হয়েছে বল তুই। আমি কারুকে বলবো না। বাড়িতে গোলমাল হয়েছে?'

রাজ চোখ মুছে বললে, 'না, আজ নয় পরে বলবো।'

বরুণা বললে, 'কারুকে খুঁজছিস?'

রাজ ঘাড় নাড়লে।

'কাল থেকে আমিও তোর সঙ্গে যাবো, একলা-একলা ভিখিরি পাড়ায় ঘুরে বেড়াসনি।'

এবারও রাজ শুধু ঘাড় নাড়লে।

সুজাতাও এসে পড়ল, দুজনেই চুপ করল।

পরদিন আবার বরুণা এসে রাজকে ধরল।

বললে, 'আজ কোথায় যাবি?'

রাজ একটু ভেবে বললে, 'চল, বিড়লা মন্দিরের দিকে যাই। তারপর তোদের

কালিবাড়ির কাছে যাবো।'

তাব পরদিন যমুনার তীর, তার পরদিন হনুমানজির মন্দির, যেখানে মনে হয় সেখানেই যায়, ছোটো ছেলে সঙ্গে ভিখিরি মেয়ে দেখলে চকিত হ'য়ে এগিয়ে যায়, তাবপর বিমনাভাবে ফিরে আসে।

দিল্লিব মন্দিব-পাড়া, ভিখাবি-পল্লি যেন আব বাকি রইল না।

সন্ধ্যাবেলা দুজন ফিরে এসে কোনোদিন কুইনস পার্কের কোনোখানে, কোনোদিন আজমল খাঁ বাজাবের দিকেব প্রকাণ্ড পার্কে ব'সে পড়ে ক্লান্তভাবে।

ক-দিন গেল। এবাবে সহসা বরুণা জিজ্ঞাসা করলে একদিন, 'রাজ, তুই কি সেই ভিখাবি মেয়েটাকে খুঁজছিস? যে তোকে "রাজ" বলে ডাকল—আব ভিক্ষে নিল না?'

রাজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিল। কিছু বলতে পারল না।

বরুণা তার একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিযে বললে, 'সেই মেয়েটাই তো? সে কি কেউ হয় তোব, বাজ? এক মাস হ'যে গেল, তাকেই খুঁজছিস তো? তাই না?'

বাজ মুখ গুঁজেই ঘাড নাড়ল।

বরুণা বললে, 'কে সে? আমাকে বল, আমি কারুকে বলবো না।'

রাজ তেমনি ভাবেই মুখ না-তুলে খুব আস্তে মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ পরে বললে, 'মা।'

যে-কথা কোনো আপনাব জনকে অবধি বলেনি, বাপকেও নয়, কাকাদের ভাইবোনদেরও নয়—আজ বিদেশিনি বান্ধবীকে না-ব'লে আর পারল না।

বরুণা স্তম্ভিত হ'যে গেল। 'মা?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মা তো তোর নেই বলেছিলি?'

সে তেমনিভাবেই মুখ নিচু ক'বে বললে, 'ঠিক কথা বলিনি। ও আমাব মা। সেদিন প্রথম, ও দূরে ছিল আব আমিও তোদের অনেক পিছনে আসছিলাম, চিনতে পারিনি। পরে যখন ভিক্ষা নিতে এগিযে এসে বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, তখনও অত বুঝতে পারিনি। খুব রোগা আব কালো হ'য়ে গেছে। খুব ভালো দেখতে ছিল আগে। তারপর যখন তোরা রাজ ব'লে ডাকলি, আব ও অবাক হ'য়ে যেন খুব আস্তে বললে, "আ মেরি রাজ। মেবি বিটি" বলতে-বলতে পিছিয়ে গেল, আর ভিক্ষে নিল না, তখন একটু সন্দেহ হ'ল যেন। তখন আমাদের বাস এসে গেছে। আর আমরা দাঁড়ালাম না, সেও তো এগিয়ে এল না। রাত্রে বাড়িতে গিয়ে যেন স্পষ্ট মনে পড়ল।'

বরুণা বললে, 'কিন্তু মা কি লাহোর থেকে তখন তোদের সঙ্গে আসেনি?'

বাজ মুখ তুলল। বললে, 'মা কী গহনাপত্র আনতে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেননি। লোকেরা ভয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম, মা মারাই গেছেন দাঙ্গার সময়ে।'

'তা সেদিন কেন তখুনি বললিনে? তাহ'লে তো বাড়ি নিয়ে যেতে পারতিস?'

রাজ চুপ ক'রে রইল।

সহসা বরুণা যেন সন্দিগ্ধভাবে কী ভাবে। বললে, 'আর ঐ ছেলেটা? ওটা কে তোর? তোর ভাই?'

রাজ মাথা নাড়ল। শুধু বললে, 'আমার ভাই নয়।'

এবারে যেন কী একটা কথা স্পষ্ট হ'যে উঠল বরুণার কাছে। বরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তুই বোধহয় ঠিক চিনতে পারিসনি রাজ। তোর মা ও নয়।'

রাজ সে-কথার জবাব দিল না। আর মনে-মনে বরুণাও যেন জানে তার কথা ঠিক নয়।...

কিন্তু বরুণা আবার বললে, 'তুই তখন কত ছোটো ছিলি—তোর কি আর মনে আছে মাকে? তোর নিশ্চয় ভুল হয়েছে। আর মা হ'লে তো চিনতে পেরে এগিয়ে আসত...।'

এবারে রাজ বললে, 'চিনতে পেরেছিল ব'লেই বোধহয় আর এগিয়ে এল না।' দুজনেই যেন মনে-মনে বুঝতে পারল কেন এগিয়ে এল না।

শীতের সন্ধ্যা। বাগান খালি হ'যে এসেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে গেটের ওপারে বাস এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা। ওরাও বাগান থেকে বেরুল, নিজেদের বাস দেখে উঠে পড়ল।

নামবার সময় বরুণা বললে, 'আচ্ছা, কাল আবার খুঁজবো।' তারপর সান্ত্বনার ভাবে বললে, 'কিন্তু ও তোর মা নিশ্চয়ই নয়।'

রাজ শীর্ণমুখে হাসল একটু। তার মন জানে, সে তার মা। আর জানে, তার খোঁজ আর-কোনোদিনই পাওয়া যাবে না...। কেন-যে পাওয়া যাবে না তাও যেন মন জানে।

রাজ বাড়ি ফিরল। কাজকর্ম সেরে শুতে কত রাত্রি হ'ল। তারপর নিঃশব্দে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। নিশুতি ঘর। পাড়া শহরও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

তার ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভেসে আসে জীর্ণ মলিন শালওয়ার কামিজ পরা ছেঁড়া চুননি (ওড়না) মাথায়, দীন মিনতিভরা মুখ, ভিখারিরি মতোই শীর্ণ একটি ছোটো ছেলের হাত ধরা সেই ভিখারিনি। কতদিন ভিক্ষা করছে সে? কতদিন ভিক্ষা ক'রে তার মুখের হাসি-কথা এমন ভিখারির মতো হয়েছে?

কেনই বা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল? তার বাপের বাড়ি, রাজের মামার বাড়ির সবাই তো কত বড়োলোক! এখনও মা-র বাবা মা আছে। ভাইবোনও আছে কতজন। শ্বশুরবাড়ির এদিকেও তো ওরা ছিল! কেন খোঁজ ক'রে আসেনি? নিজের বাপের বাড়ির ঠিকানা তো জানে সে। লুধিয়ানায় তাদের বাড়ি—খুব বড়ো বংশ।

'কেন'র কথা—আর সে ভাবতে পারে না। সমস্ত ভাবনা যেন জটিল হ'য়ে ওঠে তার তরুণ মনের পক্ষে। মনে হয় বাবাকে বা কাকাদের কারুকে বলে এই কথা। কিন্তু তারা যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন আগে বলোনি?

কী বলবে সে? চিনতে পারেনি ঠিক? না...কী?

মনে প'ড়ে যায় ছেলেটাকে। কী বলত ছেলেটার কথা? ছেলেটা কার? মা-র কি? মা কি আসতে পারত? তাহ'লে লুকিয়ে পড়ল কেন?

তাহ'লে ও কি মা নয়?..তাই বোধহয়। রাজ বেশ আশ্বস্ত হয় যেন মনে-মনে।

কিন্তু তার মনের কোন অতলে শীর্ণ মলিন মুখ, জীর্ণ বিবর্ণ বেশবাস, দীন করুণ নেত্র একটি ভিখারিনি নারী একটি ছোটো ছেলের হাত ধ'রে স্থির হ'য়ে তার দিকে চেয়ে থাকে কুইনস পার্কের ঝোপের সামনে—

যে তার মা। আর সে-ছেলেটা তার ভাই নয়।

# এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

## জ্যোতির্ময়ী দেবী

অন্ধকার রাত্রি। জঙ্গলের হাঁটা পথ ও বিপথ। ভালো পথের দিক তারা জানে, কিন্তু তার দরকার নেই। সে-পথে আতঙ্কের ভয় বেশি।

তারা চলেছে। ছোটোদল, বড়োদল, ভাঙ্গাদল হ'য়েও একমুখেই একই সঙ্গেই চলেছে।

না, তীর্থযাত্রী নয়। সাগব মেলা বা কেদার বদরিকাশ্রম যাত্রী নয। মেলা বা অন্য-কোনো দুর্গম পথের যাত্রীও নয।

যদিও গন্তব্য তাদের দুর্গম। কোনোরকমে যদি একবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছোয়! তাহ'লে? তাহ'লে মেয়েদের মান, পুরুষের প্রাণ আব চিরকালের ধর্ম বাঁচবে। ধনরত্ন নয়। সে তাদের নেই। ধন-ধান্য ছিল বটে।

পুরুষদেব হাতে লাঠি টাঙ্গি। পিঠে কাপড়চোপড় বা চালচিঁড়ের পুঁটলি। খালি গা, পরিধানে আঁটসাঁট ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা। নানাবকমের পুরুষ বৃদ্ধ যুবক প্রৌঢ়।

আব মেয়েদের কোলে শিশু। হাতেও শিশুর হাত ধরা। কারুর হাতে তার সঙ্গে চাল-মুড়ি চিঁড়ে-গুড়ের পোঁটলা। মাথায ঘোমটা।

নানারকমের নারী, কমবয়সীবা একেবারে ভিড়ের মাঝখানে। গুরুজনের বন্ধুজনের বেষ্টনীতে।

নীবব যাত্রা। যাত্রীরাও আতঙ্কাভিভূত।

সহসা কোন বনজঙ্গলের একদিকে রেলের তীক্ষ্ণ বাঁশির 'কু' শব্দ শোনা গেল। তাবপর আকাশে কালো ধোঁয়া। গাড়িচলাব সুদূববর্তী শব্দ।

আনন্দে মেয়েরা উলুধ্বনি দিল। আর পুরুষ কয়েকজন হরিবোল দিল।

আঃ কী হুজ্জুত লাগাইছস চুপ কর! ওরা শুনবার পাব বুঝছস না? একজন প্রৌঢ় পুরুষ ধমক দিলেন।

যাত্রীরা নীরব হ'যে গেল। কিন্তু মনে আনন্দের সীমা নেই। ক-রাত্রি হেঁটে চ'লে জঙ্গল ভেঙে নদী পার হ'য়ে আজ বুঝি কূল পাওয়া গেল। একবার টিকিট কিনে গাড়িতে বসলেই হয়। জানে দেশ গেছে। স্বজন নেই। মাটি নেই। ধন নেই। অর্থ নেই। নিঃসম্বল নিঃস্ব। তবু এক ধর্মেব এক জাতের মানুষ তো আছে। শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবে না। প্রাণ মান নিয়ে টানাটানি করবে না।

...

পঞ্চাশ-ষাট জনের জনতা এসে পৌঁছল। সীমান্তের স্টেশনের ধারে। পিছনে আরও আসছে।

এপার থেকে লোকেরা ঘিরে দাঁড়াল, 'কোত্থেকে আসছিস? পাসপোর্ট কই?'

বোকা নির্বোধ লোকগুলো পাসপোর্টেব নাম জানে। শিখেছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমনি এসে পড়তে পেরেছে তো অনেক জন। গতবছরের দুর্যোগের দিনে।

তারা বললে, 'পাসপোর্ট করতে পারিনি, মিঞা সাহেব, চ'লে যেতে দিন। আর তো আসুম না।'

মিঞা সাহেববা চুপ ক'বে থাকেন। বলেন, 'ওদের ওপারে জিগাও।' এরা ওদিকে যায়।

তারা বললেন, 'না, হুকুম নেই, ফিরে যাও দেশে।'

'সে কী?' হতবুদ্ধি লোকগুলো হাতে-পায়ে ধবে দু-দিকেব লোকদেব।

নাঃ, হাত-পায়ে ধরার চেয়ে ক্রন্দনেব চেয়ে আবও স্পষ্ট স্থূল কিছু চাই।

হ্যাঁ। দু-দিকেই চাই; বুড়ো-বড়োরা পিছন ফিবে আছেন। ছোটো-খাটোরা ইঙ্গিত-ইশারায় বক্তব্য বুঝিয়ে দেয। দু-পক্ষেবই দ্বিমত হয না।

যাবা পারল গেল, বাকিবা স্টেশনেব প্রান্তে একপাশে ব'সে থাকে।

সহসা একজন এসে তাকে জিজ্ঞাসা কবলে, 'তোব নাম কী?

জিজ্ঞাসিতেবা নীরবে ব'সে ছিল একধারে। তাদেব 'সেলামি' 'নজর' দেবার মতো কিছুই নেই। ফিরে যাবার উপায়ও নেই। কিন্তু এগিয়ে যাবাব মতো উপায়ও নেই। হেঁটে-হেঁটে সে যেতে পারত যদি যেতে দিত। তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী।

সে আশান্বিত হ'য়ে বললে, 'বাবু, আমাব নাম সুদাম ঋষি।'

'ও কে তোর সঙ্গে?'

'আমার পরিবার। আর কেউ নাই, আমরা দুজনেই আছি। যেতে দেবেন, বাবু?'

বেশ সুশ্রী বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে। সেও নতমুখে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিল।

সকলের চোখ পড়ছে। কোথায় কোন ভালো মেয়ে আছে। কোথায় কার ট্যাঁকে টাকাপয়সা আছে। দু-পারের মানুষই এক নিমেষে বুঝতে পাবে অভ্যস্ত চোখে কারা কেমন, কার কাছে কী পাওয়া যেতে পাবে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা কবলে, 'কত দিতে পারবি দুজনার জন্যে?'

সুদাম ব্যাকুলভাবে বললে, 'বাবু গো, পাঁচটি টাকা আছে, আর কিছু নাই।'

তারা হাসিতে ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। 'যা, বেটা ফিরেই যা দেশে।'

তারা সুদামের স্ত্রীর দিক চাইল।—'ওর নাম কী?'

'উযার নাম দুর্গা।'

'দুর্গা'ই বটে। তারা ভাবে। 'তোদের দুজনের জন্যে পঁচিশ টাকা লাগবে। তাহ'লে হাঁটাপথে যেতে দেবো।'

'কোথায় পাবো বাবু অত টাকা?'

সহসা দুর্গা ঘোমটা সরিয়ে স্বামীকে কী বললে। কী সুন্দর মুখখানি। বাঃ, রঙও

তো বেশ। কে বলবে মুচিব মেয়ে।

সুদাম বললে, 'কলকাতায ওর ভাই আছে, সেখানে গেলে টাকা আনতে পারি। কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দিই একলা কাব সাথে?'

যারা দুর্গাকে দেখছিল তাদের আর চোখ ফেবে না।

তারা বললে, 'তুই যা না। টাকা নিয়ে আয়। ও এখানে মাস্টাববাবুব বাড়িতে থাক।' (স্টেশনমাস্টার)।

ওবা দুজনে কাঁটা হ'যে গেল। যেন এখনি কে ছাড়াছাড়ি কবিয়ে দিচ্ছে।

সুদাম বললে, 'না থাক, বাবু। ফিবেই যাবো।'

...

দিন শেষ হ'য়ে যায। রাত্রি। মুড়িশুড়ি দিয়ে দুর্গা স্বামীব কাপড়ের সঙ্গে নিজের আঁচল বেঁধে শুযে থাকে। একটু ঘুম আসে। আবার ভযেভাবনায আতঙ্কে ভেঙে যায।

দেখতে-দেখতে এ-দলেব সব লোকেই যেভাবেই হোক এদিক-ওদিক চ'লে গেল। যারা রইলেন তারা অচেনা ভিন গাঁয়ের লোক। তবু হিন্দুই।

আবার দিন গিয়ে রাত আসে। সেই দালালরাও আসে। বলে, 'তুমি চ'লে যাও, সুদাম। টাকা নিযে এসো, আমরা তোমার বৌকে দেখবো।'

দুর্গা ভয়ে কাঠ হ'য়ে থাকে। ওরা দেখবে? ওরা কারা?

আবার দিনরাত যায়। অবশেষে দুর্গাই বলে, 'তা তুমি আমাকে মাস্টার সাহেবের বাড়ি নিয়ে রেখে এসো। যদি তিনি রাখেন তো থাকবো। তাঁর তো বিবি আছে!'

স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার কাছেই। তাঁর বিবি আছেন। দু-তিনটি ছেলেমেযে আছে।

দুর্গা একগলা ঘোমটা দিযে ভেতরে ঢুকল। আর সুদাম বাড়িতে মাস্টার সাহেবের পায়ের কাছে ব'সে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বললে, 'আপনি আমার বাপের মতন। আপনি ওরে রাখুন। আমি ওর ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে আপনাকে দেবো।'

মানুষ পাথরও হয়, আবার মানুষও হয়।

লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে স্টেশনমাস্টারেরও সবই যেন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। তবু সহসা সুদাম আর দুর্গার অসহায়তা দেখে কেমন দয়া হল।—'আচ্ছা, তুই রেখে যা আমার বিবির কাছে। কিন্তু ক-দিন হবে? এখানে তো নানারকম গুণ্ডা আছে, আমি একা সামলাতে পারব কি? আর খাবে কী? তোরা তো আমাদের কাছে খাবি না—হিঁদু তো।'

সুদাম খুশি হ'য়ে উঠে বসল।

'আমি যাবো আর আসবো। ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন। ও যা হয় ক'রে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর "মায়ের" কাছে—আপনার বিবিসাহেবের কাছে। চিঁড়েমুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু-তিন দিন বই তো নয়। মা-জানের কাছে থাকবে।'

তন্বী সুন্দরী তরুণী দুর্গা দিন গোনে। হ্যাঁ, আজ তিনদিন। আজ এসে পড়বেই সুদাম। দাদারা কলকাতায় আছে। ওর মাসি আছে। সুদামেরও পিসি আছে। সকলে মিলে কি আব পঁচিশটা টাকা দেবে না?

নাঃ, পাঁচ দিন গেল। দেখতে-দেখতে দশ দিনও কেটে গেল। সে ভয়ে ভাবনায় এবারে অভিভূত হ'য়ে যায়। কী হ'ল সুদামের? কী হ'ল? আর আসবে না? বিপদ হ'ল কিছু? সেখানকার লোকেরা ছেড়ে দেয়নি? মিঞা বাড়ির কাছাকাছি স্টেশনের ফাজিল ছোঁড়াগুলো বিবিসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। নানা গল্পের মাঝে বলে, 'বিবিসাহেব, ওকে কেন ঘরে পুষে ধ'রে রেখেছ! বিদেয় ক'রে দাও। যেখানে ইচ্ছে যাক চ'লে।' স্টেশনের কুলিগুলো হি-হি ক'বে হেসে বলে, 'সে আবার আস ্ব টাকা নিয়ে! ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচেছে ব'লে। এবার ছুঁড়িই কত টাকা বোজগার করবে, আমরাই খদ্দের দেখে দেবো!' দুর্গা ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরের এককোণ থেকে সব শুনতে পায়। বুক টিপটিপ করে। চোখ জলে ভ'রে যায়। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়।

তারা চ'লে গেলে সে বিবিসাহেবের পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে। বলে, 'তুমি আমার মা। মা-জান বলেছি তোমায়, তুমি আমায় ওদের কাছে দিও না।'

বিবি বলেন, 'নারে না, ভাবিসনি। থাক না তুই।'

কিন্তু বাত্রে অবসব হলে স্বামীকে বলেন, 'সে-লোকটা আইল না ক্যান্?

ফেইল্যা পালাইল নাকি?'

মিঞা বলেন, 'খোদায় মালুম সে-কথা। তবে আসবে। জোয়ান পরিবার, অত রূপ। যাবার সময় আমার পায়ে ধ'রে কাঁদল। তবে কলকাতা শহর। কী হয়তো বিপদ হ'ল। নয়তো টাকা পায়নি। ম্যেয়া ছেড়ে দিতে পারতাম। তা "এপাব গঙ্গা ওপাব্ব গঙ্গা"। দু-দিকেই তো টাকা দিতে লাগবো। সবাই তো সমান সাধু! জানোই তো।'

বিবি বললেন, 'আহা, জোয়ান মেয়েটা। কী হবে কে জানে। সে যদি না-আসে। কতদিন তুমি রাখতে পারবা এই হাঙ্গামা হুজ্জুতের দিনে।'

পাশেব ঘরে বিনিদ্র দুর্গা সব শুনতে পায়। তাহ'লে?

তাহ'লে কী করবে সে? ওই রাক্ষস দলের হাতেই এরা ছেড়ে দেবে ওকে? যেমন আর-আর গাঁয়ে দেখেশুনে এল, পথেও যেমন ক-বার হ'ল! মেয়েরা কাঁদল। পুরুষবা মরল। পালাল। তাহ'লে? দুর্গা কাঠ। দুর্গা পাথর।

ভাবে, পালিয়ে যাবে? কোথায় পালাবে। বাইরেও তো ওরাও আছে। গলায় দড়ি দেবে? ডুবে মরবে? নদী আছে কোথায়? পুকুর আছে কি? আছে যেন। আবার ভাবে, আসবে। সুদাম আসবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আরও ক-দিন গেল।

স্টেশনমাস্টার সাহেব আর বিবি সবাই সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠছেন ক্রমশ। সুদাম পালিয়েছে। দুর্গা আর রাঁধে না। খায় না। শুকনো দুটি চিঁড়ে-মুড়ি জলে ভিজিয়ে চিবিয়ে নেয়—বিবি বেশি-বেশি বললে।

একুশ দিনের দিন সুদাম এল। চোখ-মুখ ব'সে গেছে ভাবনায়—কিন্তু এল।

অতি কষ্টে নানা রকমের লোকের হাত থেকে টাকা কটি বাঁচিয়ে আনতে পেরেছে, কেঁদে-ককিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে।

এসে আভূমি নত সেলাম ক'রে স্টেশনমাস্টারের সামনে দাঁড়াল। ডাকল, 'সাহেব।'

সাহেব যেন চমকে ভূত দেখলেন। 'এত দেরি করলি? তিনদিন ব'লে! কী হয়েছিল?'

'টাকার জোগাড় করতে দেরি হ'ল সাহেব। তা আজকেই তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারুম? ভালো আছে তো সে?'

হাতের নোটগুলো সাহেবের সামনে ধ'বে দেয়।

তিনি নিলেন না। শুধু শুষ্ক মুখে বললেন, 'তুই কিছু খেয়ে নে। তারপর কথা বলব।'

সুদাম ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, বুঝি আবও টাকা চাইবেন। কোথায় পাবে? কোথায় পাবে টাকা?

সে সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টারে গেল।

বিবি সাহেবকেও পেন্নাম করল। তিনিও শুকনো মুখে বললেন, 'ভালো আছো তো? তা এত দেরি কেন করলে?

'সে কোথায়, মাজান?' সুদাম উৎসুক হ'য়ে এদিক-ওদিক চায়।

বিবি বললেন, 'কিছু খাওয়াদাওয়া করো। তারপব বলছি।'

'সে কি রাঁধে নাই? ওই দু'গা খাব'খন। দিতে বলুন।'

এবারে বিবির চোখে জল এল।

শুকনো কাঠ মুখে সুদাম বললে, 'সে কি নেই? ধ'রে নিয়ে গেছে তাকে?'

মিএগ্রা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'না, ধ'রে নেয়নি। সে বেঁচে নেই। জলে ডুবে গেছে।' সুদাম স্তম্ভিতের মতো উঠোনে ব'সে পড়ল।

অনেকক্ষণ—তারপর উঠে বাইরে গেল।

অকস্মাৎ তার মনে হ'ল সবাই ওরা মিথ্যে বলছে। ওরা আরও টাকা চায়, তাহ'লেই ছেড়ে দেবে। সে বেঁচে আছে। সে আছে এইখানে কারুর কাছে।

সে স্টেশনে এল। একটু কাজের নিরিবিলি হ'লে সে মিএগ্রা সাহেবের পা জড়িয়ে ধ'রে মাথা কুটতে লাগল মাটিতে, জুতোর ওপরে। কপাল মাথা ফুলে ঢিবি হ'য়ে ওঠে।

লোক জমে গেল এদিকে-ওদিকে।

সে কাঁদে আর বলে, 'সাহেব গো, ওরে দিয়া দেন। আমার আব কেউ নাই গো।'

গোলমালে ওপারের অফিসার এপারের কর্মচারী ভাগ্যনিয়ন্তারা সকলে এসে দাঁড়ালেন।

সকলেই বলে, 'সে একটা পচা পুকুরে গলায় ইট বেঁধে ডুবে মরেছে। সবাই জানে।

বেঁচে নেই রে। তোর দেরি দেখে এই করেছে।'

সুদাম ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়। কিছু বলে না। তার বিশ্বাস হয় না।

হিন্দু অফিসার বলেন, 'তুই আমার সঙ্গে ওপারে চল। এখানে থেকে কী করবি? পাঠিয়ে দেবো।'

মুসলমান অফিসার বলেন, 'সত্যি বেঁচে নেই রে সে। আমরা দেখেছি, পুলিশ জানে।' সে জন্তুর মতো ব'সে থাকে। কারুর কাছে যায় না। কোনো কথাও কানে যায় না তার।

এক-একবার বনের দিকে, যাওয়া-আসার পথে লোকের বিরাম নেই। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে দুর্গাকে খোঁজে। ওই মেয়েটি? ওই-যে ফরশা মতো রং, লালপাড় শাড়িপরা, পায়ে আলতা? ঠিক যেন দুর্গা। কিন্তু নাঃ, সহসা কী মনে হয়। ফিরে আসে স্টেশনমাস্টারের বাড়ি।

সাহেব খানা খেয়ে ব'সে ছিলেন।

'সাহেব গো, আপনি জানেন সে কোথায় আছে, মোরে বলেন। আমি তারে কলকাতায় নিয়ে গঙ্গাচান করিয়ে পঞ্চগব্যি খাইয়ে শুদ্ধ ক'রে নিমু। তারে জাতে তুলে নিমু। বড়ো কেঁদেছিল সে। যাবার দিনে।'

দুঃখিতভাবে বিবি বললেন, 'ওরে, সে নেই রে, নেই।'

তার পরদিন আবার আসে। এবারে বলে, 'মা-জান, আমি মোছলমান হবো। তাহ'লেই তো ওরা আমাকে তারে ফিরে দিবে। তুমি তাদের তাই বলো গো। মোছলমানরা তো মোছলমানের বৌরে ঘরে রাখবে না। ফিরিয়ে দেবে। মা-জান, তুমি আমার মা, সাহেবেরে বুঝায়ে বলো। সে মরেনি। সে আমারে শিগগির আসবার জন্যি বলেছিল।'

বিবি সাহেব হতবুদ্ধি। কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

শুধু বললেন, 'তুই পাগল। সে যে বেঁচে-নেই রে।'

সুদাম ফিরে গেল। পথে-বিপথে বনে-বাদাড়ে ঘোরে। রাত নেই, দিন নেই, ঘোরার শেষ নেই। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই হয়তো দুর্গা গেছে। লোকেরা নিয়ে গেছে। সেদিকে যায়। প্রতিদিনই লোক আসছে। জমছে। ভিড় করছে।

কত রকমের মেয়ে। পাৎলা চেহারা, তন্বী, জোয়ান মেয়ে। ফরশা রং। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর, মুখে পান। দূর থেকে দেখে মনে হয় ওই-তো দুর্গা। চেঁচিয়ে ডাকে, দুর্গা রে, দুগ্‌গা!'

এগিয়ে যায়। না। দুর্গা নয় তারা কেউ।

অনেক রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে স্টেশনে প'ড়ে ঘুমোয়। আবার সকাল হবার আগেই চম্‌কে ঘুম ভাঙে।

নিশুতি অন্ধকারেই উঠে পড়ে। আজ হয়তো পাওয়া যাবে দুর্গাকে।

# আচার্য কৃপালনী কলোনি

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি। এই সময় জমি না-কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি বাড়ি করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগস্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদমা, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, ঢাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতেছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ হইতে যে-সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ি ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে-জমি পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরেও বিক্রয় হইত না সেইসব পাড়াগাঁয়ের জমির বর্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই ও-সব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন। বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় ক'রে ফেললে। সিনারি নেই তো কী হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে কোথাও? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমার মনের মতো। প'ড়ে দ্যাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, হিম হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মন-প্রাণ দিয়াই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিশ পাইলে আমার মতো খুশি কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ-কাগজ কোথায় পেলে?

—বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম। লেখা আছে—

'আচার্য কৃপালনী কলোনি।'

আজই আসুন। দেখুন।। নাম রেজেস্ট্রি করুন।।।

'কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে অমুক স্টেশনের সংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিরাট নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া

স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাতত পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম রেজেস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।'

স্টেশনের নাম পড়িয়া মনে হইল কলিকাতার কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে? ভালো না?

—খুব ভালো। বীণার কাকা জমি নিয়েচেন এখানে?

—না, নেবেন। নাম রেজেস্ট্রি করেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও তো দ্যাখেননি এখনো।

—জমি দেখবো না? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরি কবিয়াছেন, কোথাও বাড়িঘর করেন নাই, জমি-বাড়ি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ি করিবেন, সম্প্রতি সে-আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও-কাগজটা আপনি দেখেচেন? ভালো জায়গা ব'লেই মনে হচ্ছে কি?

—একটু দূরে হ'য়ে যাচ্ছে না কি?

—ওর চেয়ে কাছে আর কোথায় পাবেন মশাই?

—তা বটে। স্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো শস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মত করেন তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না-দেখেই?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেস্ট্রি ক'রে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্চে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট। রাজীবনগর।

...

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়' খুশি হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক-কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু-কাঠা?

—এখন এই থাক। পনেরোই আগস্ট কেটে যাক। সীমানা-কমিশনের রায় হোক। পরে—

পনেরোই আগস্ট পার হইয়া গেল। সীমানা-কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমাব স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এসো না? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও

—অনেক লোক আসচে ময়মনসিং পাবনা নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটগুলো সব বোঝাই। এক-এক গেরস্ত বাড়িতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্চে? কোথাও তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কী জানি বাপু, অত-শত জিগ্যেস করেচে কে? বীণাদেব বাড়িই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোটো ভাই এসেচেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। নাম রেজেস্ট্রি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশি জমি বাখিব কি না, ইহাই ধার্য করিবার পূর্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমাব ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম —ব্যাপার কী? এত ব্যস্ত কেন?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার-হাজার লোক আসচে 'ইস্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ি তো ভর্তি হ'য়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কী?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশি ক'রে জমি ওইখানেই কিনে রাখুন। কত ক'রে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলেনি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস?

—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়িতে আবার দুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর স্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড়ো খারাপ হইয়া গেল। স্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই। পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্তি। যেমন জঙ্গল, তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিশাবে পাওয়া গেল। তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর-যাহাই হউক ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্চেন?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম মনীন্দ্র ঘটক? আমি যশোর থেকে আসচি। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এবং পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড়ো আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে

স্টেশনের গায়ে জমি, এ-জমিটা লইতে পারিলে নানাদিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন। তবে কি বিক্রয় করিবেন না স্থির করিলেন?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়া আছি। কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে, এই ট্রেনেই আবার—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন?

—জমিটা—

—কোন জমি?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—স্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও—

আবাব রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে-জমিটুকু, তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা, বসুন।

বসিবাব অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তাববাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন?

—জমিটাব কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হ'য়ে যাচ্ছে—

—জমিটা দেখবেন? ও কার্তিক, কার্তিক! যাও, এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাই-তো, ইহা আবার কী। ডাক্তারখানার পাশের ঘবে বড়ো-বড়ো হরফে ইংরাজিতে লেখা আছে বটে, 'দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট'।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে রাজীবনগর তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে, দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে।

কার্তিক নামের লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়াছিল। বলিল—কোন জমি বাবু?

—আরে, ওই যে বরোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি?

—আ মোলো যা। হাঁ ক'রে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? হ্যাঁ, জমি। কোথাকার ভূত?

বাড়ির চাকরটা বোধহয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহুবিজ্ঞাপিত ভূমিখণ্ডের সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না কেন?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? ইস্টিশানের কাছে যে-জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইস্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে। তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো। ইস্টিশানের গায়ে। কাগজে যে-জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে নাম রেজেস্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে-জমির জন্যে। আমি নাম রেজেস্ট্রি ক'রে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ-কথাটা আপনি ওখানে বললেন না কেন বাবু। আমি তো আর-কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু বসেছিলেন, তিনিও নাম রিজিস্টারি ক'রে নিয়ে গেলেন।

—জমি দ্যাখেননি?

—না। ডাক্তারবাবু বললে, জমি দেখে যাবেন সামনের ববিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কী বলে আবার?

—আপনি জমি দেখতে চান?

—কী বলে আবোল-তাবোল? জমি দেখবো না তো কী?

—আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি জিগ্যেস ক'রে আসি

আমি বিরক্ত হইয়া নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম বলিলাম—আপনার চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর-একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজিস্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো-কী কথা হইয়াছে জানি না, দু-টাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন? আচ্ছা, চলুন আমিই যাচ্ছি। পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য রহস্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বোধহয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ-জায়গাটি স্টেশনের খুব কাছে। স্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। স্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোন্নগর ইস্টিশানের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই?

বলিতে পারিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্তীই কি বোঝায়? কিন্তু না, দরকার নাই। পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না-দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কী! তবে সাড়ে-তিন মাইল দূর পড়লো স্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন'? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেচেন কী করবো? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি প'ড়ে থাকবে না। সব নামে-নামে রেজেস্ট্রি হ'য়ে যাচ্চে। আপনার ইচ্ছে হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না, দেখবেন না?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছা চিঠি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন—এই দেখুন। মনিঅর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না-দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না-নিলে জোর ক'রে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়ালা-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ গোরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন-বিন করিতেছে। খানিকদূর গিয়া একটা অবাঙালি কুলি বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ডে বড়ো-বড়ো করিয়া লেখা আছে—'আচার্য কৃপালনী কলোনি'।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারই নাম আচার্য কৃপালনী কলোনি! এই সেই বহুবিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড? কোথায় ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য? পঞ্চাশফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন, ওলবন আর মশাভরা ডোবার খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; মনকে অনেক বুঝাইলাম, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কী ছিল? অমুক কী ছিল? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙা-জমিই বা কোথায়? সব তো জলেডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে-কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে ছশো ক'রে কাঠা, তাই পড়তে পাচ্ছে

না। সব প্লটের নাম রেজেস্ট্রি হ'যে গিযেচে মশাই।

কিন্তু 'প্লট' বলিতে জমির টুকরো বোঝায, এখানে জমিই যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোযা স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রিসীমানায আছেন বলিযা মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?

—বেশি নয। মাইলখানেক হবে কিংবা কিছু বেশি হবে—

তাই-বা কী করিযা হয? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কী করিযা হয, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিযা আসিলাম। এই জলাভূমি আর কচুবনই হয তো ইহার পর পাইব কিনা কে জানে। মন ভীষণ খারাপ হইযা গেল।

বাড়ি আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ গা, কী-রকম দেখলে? ভালো?

বলিলাম—চমৎকার।

—বলো না, কী-রকম জাযগা? গঙ্গার ওপর?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড়ো রাস্তা করেচে?

—মন্দ নয।

বীণর কাকাকে সেদিন কিছু বলিলাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িযা বাঁচিলাম। পূর্ববঙ্গই ভালো। আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিযা ফেলিলাম।

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িযাছে।

# ভিড়

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে আসতে দেবি হ'য়ে গিয়েচে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'লো। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিবাট কিউ, টিকিটের জানালা থেকে এনকোয়ারি অফিস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সর্বাগ্রে চট ক'রে সেই কুণ্ডলীপাকানো অজগর সাপের ল্যাজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরো পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে ল্যাজটা আবো ছ-হাত বেড়ে গেল।

বহু লোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানালার কাছাকাছি যে-সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোশামোদ করছে—মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই এই উলুবেড়ের দুখানা অমনি ওই সঙ্গে—

—আমার, মশাই, একখানা অমনি কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে, সে বলছে—ও-সব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত—না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভালো। লোককে খোশামোদ করা ধাতে সয় না।

কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে—কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখে এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরো দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ-কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তত চর্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ-মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা-কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সঙ্গে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না-হয় ফিরে যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এইসব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে গেল কিউ ভেঙে। দেখি জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কী ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ-জানালা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের জানালার দিকে। সেখানে তখন ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি চলেছে। পূর্বতন কিউয়ের ল্যাজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে—তুমার জায়গা ইখানে ছিল? খবরদার—

—খবরদার!

—মু সামালকে বাৎ বোলো—

—এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা ব'য়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতিকষ্টে প্রাণপণে জন-আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম মিনিট দশেক পরে যখন টিকিটের জানালার কাছে আসবার পালা এলো, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টোয়েণ্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি-বা অতিকষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোনো কাজে এলো না। খুঁজে-খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানালা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে তত লম্বা নয়। একজন বললে —মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া ক'রে একখানা খড়গপুরের—

মেজাজ খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম—কেন বিরক্ত করো বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার ক'রে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে—নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হ'য়ে বলি—ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাৎড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ—আমার বাবু, একখানা মেচেদার টিকিট যদি ক'রে দেন, ছোটো ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু-বার গেনু—

মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি—ভাগো।

—বাবু, দেন একখানা। দু-বার গেনু—

—নেই হোগা, ভাগো। রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব সাঙ্গ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটি গাড়ি ধরতে। মেয়েদের গাড়িতে জিনিশপত্র তুলে দিলাম, কারণ চেয়ে দেখে মনে হ'লো অতিকষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়িতে। তার ওপর মানুষ কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হ'য়ে উঠেছে, এরা নিজের-নিজের জিনিশ, নিজের-নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই আগে কতবার ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হ'য়ে উঠেছে। একবার মনে আছে—সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার-ঝুড়ি থেকে খাবার বের ক'রে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাতে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীতভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে একসঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে, অথচ একটা কথা বিনিময় হয়নি তাঁদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সংকোচের সঙ্গে বললাম—না, না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

—না, সে শুনব না, খেতেই হবে এ-সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না, অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া ক'রে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সে-সব দিন। এখন একখানা কচুরির মতো তিনইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম একআনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানালার বাইরে ভিখারির ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক, কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে—বাবু তোমরা থাকতে আমরা ডুবে যাবো। সমস্ত দিন খাইনি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তব দিল—কোথা থেকে দোবো বাপু। চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা গোছের লোক ময়লা পৈতে বার ক'বে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে শুরু ক'রে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে-করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগতা, স্ত্রী-পুত্র অনাহারে মরছে। যত কাছে আসে ততই দেখলাম, আমার নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জ'মে উঠেছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর কোথায় আসছ? দেখছ ভিড়ের ঠ্যালা। না-পাবো কোথাও খুচরো যে তোমায় দোবো! খুচরোর অভাব ব'লে চা পর্যন্ত খেতে পাইনি—

গাড়ির ভিড় ক্রমশই বাড়ছে ব'লে সবাই গাড়ির দোর ঠেলে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানালা গলিয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে লোক উঠে প'ড়ে দফায়-দফায় মারামারি সৃষ্টি করছে।

—মশাই একটু স'রে বসুন না।

—কোথায় স'রে বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

—আপনি যে এতটা জায়গা জুড়ে ব'সে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়।

—তাই ব'লে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো!

—ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

—ওঃ, কেন? নবাব খান্‌জা খাঁ নাকি? কীসের ভয়? তোমার এক চালায় বাস করি?

—খবরদার! মুখ সামলে। 'তুমি'-'তুমি' করবে না বলছি! একটি চড়ে—

অতঃপর বিবাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। একপক্ষে ভাঙা ছাতা, অপরপক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত! গাড়ির লোকে 'হাঁ-হাঁ ক'রে উভয়ের মধ্যে এসে প'ড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।—এই সামান্যক্ষণ গাড়িতে থাকা, তার জন্যে কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁদুল থেকেই লোক নামতে শুরু হবে।

গাড়ি চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরবাড়ি, ধানের খেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরে হ্যাণ্ডেল ধ'রে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা প'ড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন-নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কী-ভীষণ ভিড়, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাঙ্ক, বোঁচকা, পুঁটলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে-ক'রে-হোক গাড়িতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক ব'সে আছে, তার দু-গুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যারা ঢুকতে আসে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে—আগে যাও, আগের গাড়ি খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছে, কেউ না-ভুলে বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনো গাড়িতে, দেন একটু খুলে, দিনে-রাতে এই একখানা গাড়ি।

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুংকার দিয়ে বলছে—আগাড়িওয়ালা ডাব্বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপবের তাক থেকে এক লুঙ্গি-পবা গোঁপছাঁটা মুসলমান পা দুলিয়ে নিচের বেঞ্চিতে নামবাব চেষ্টা কবলে দু-একবার ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য হ'লো না, শেষপর্যন্ত একজনেব প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা রোগামতো লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইশি মাখানো। ওকে দেখে আজকেব এই সমস্ত কলহকোলাহল-নির্মমতার প্রতীক ব'লে যেন মনে হ'লো। বিড়ির ধোঁয়ায় চাবিদিক অন্ধকাব ক'রে দিয়ে দিব্যি সে চেপে বসল সামনেব বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য-কোনো কথাই নেই, কেবল—

—মশাই, আপনাদের ইদিকে চাল কী দর?

—চল্লিশ টাকা। আপনাদের?

—আমাদেব সাড়ে-বত্রিশ দেখে এসেছি।

—সে-কোন জাযগা?

—ওই দক্ষিণে--ডাযমণ্ডহারবাব।

—মানুষ এবার না-খেযে ম'রে যাবে মশাই।

ডায়মণ্ডহাববাববাসী লোকটা বললে—ম'রে যাবে কী. মশাই, ম'বে যাচ্ছে। আমাদেব ওদিকে একদিন কতকগুলো গরিব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনেব কচু সব তুলে নিয়ে যাবো, আর কচি জামরুলপাতা।

কে-একজন জিজ্ঞেস করলে—জামরুলপাতা আবার খায নকি?

—খায না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুলগাছের আব পাতা নেই, সব সাবাড় কবেছে।

আর-একজন বললে,—এই-তো আরো দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাতে ম'রে পড়েছিল সকালবেলা।

—আজ নতুন দেখলেন আপনি? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কণ্ট্রোলের চালেব কিউতে এক বুড়ি ধুঁকতে-ধুঁকতে মারা গেল, আমাদের দোকানের সামনে।

—কীসের দোকান আপনাদের?

—কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইস্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই, দু-টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদগোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি করত, দু-আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি। চার-আনা সেবের মুড়কি, খুব ভালো মুড়কি ছিল। আর সে-সব দিন ফিরবে কখনও?

...

কী-একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ ক'রে যাত্রীদের রুখতে হবে। আবাব একদফা হৈ-হৈ চীৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয ও হুংকারের পালা শুরু হ'লো। একটি কচি ছেলের চীৎকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একজন লোক জানালা দিয়ে গ'লে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে নামিযে দিযে জানালা বন্ধ ক'বে দিলে। মনে হ'লো, বেশ হয়েছে, ওঠো জানালা দিয়ে!

মন বড়ো নিষ্ঠুর নির্মম হ'য়ে উঠেছে বিপদের মুখে প'ডে। অন্য-কারু সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজি নয়।

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম—এটা কি বন্যে নাকি?

একজন বললে—কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে! দু-খানা গাঁ একেবারে ভসিযে নিয়ে গেছে, মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে—নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর-একজন বললে—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল—

কোণ থেকে কে ব'লে উঠল—বাদ দিন চেতাবুনি। জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না-পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙ্গি-পরা লোকটি ন'ড়েচড়ে ব'সে বললে—বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম থানায় এমন-এক জ্বর দেখা গিয়েছে, যার হচ্ছে, তিনদিন-চারদিন পরে মারা পড়ছে। আর-বছর হ'লো আশ্বিনে ঝড়, এ-বছর বন্যে, আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই, বাইশ বছরের ছেলে—

ব'লেই, কোথাও কিছু নেই, লোকটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

—কী হয়েছে ছেলের?

—আর কী হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায় কলে চাকরি করি, আর-বছর ঘরদোর ঝড়ে সব প'ড়ে গেল, আবার এই বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। গাড়িশুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুংকার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোক সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কী অসহায় ওর কান্না।

—কেঁদো না ভাই, কী করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে। বাঁচা মরা কারু হাতে নয়, দাদা। নাও বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ির আবহাওয়া যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে।

সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে-নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হ'য়ে গেল।

—স'রে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোটো ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন-কে তাকে হাত ধ'রে বললে—বাবা, এখানে বোসো, কেনোরকমে হ'য়ে যাবে এখন।

...

যে লুঙ্গি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দার ব'লে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতিব উদ্রেক হ'লো। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হ'য়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র। গাডির আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কী আশ্চর্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙ্গি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। মানুষের লজ্জা হ'লো মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হ'য়ে উঠল।

এইবার যে-স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে। গাড়ির এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব'সে ছিল, সে আবেগভরে বললে,—এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে।

# শাদা ঘোড়া

## রমেশচন্দ্র সেন

দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতাব অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নিজ-নিজ পল্লিতে কিছুটা নিঃসংকোচে বাহির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।

একদিন বৈকালে শূন্য ঠিকাগাড়ির স্ট্যাণ্ডে শাদা একটি ঘোড়া দেখা গেল। ধবধবে শাদা, শবীরেব কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নাই চামবেব মতন তার সুন্দর ল্যাজের গোছাব উপর বোদ ঝলমল করে।

প্রাণীটি যেন পথভোলা এক পথিক। এ-পাড়ায আগে কেহই তাকে দ্যাখে নাই। আশ্রয হারাইয়া, আশ্রয়দাতাকে হারাইয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইযাছে। ক্ষুধার জ্বালায় খালি রাস্তা শোঁকে। তার নিশ্বাসে পথের ধুলা ওড়ে। কিন্তু বেচারি কোথাও কিছু পায় না। শুধু আবর্জনার দুর্গন্ধময় স্তূপ শুঁকিয়া-শুঁকিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়।

জানালা দিয়া দেখিয়া শীলার মা বলিলেন, আহা, বেচারি হয়তো কিছুই খেতে পায় না। সইস কোচোয়ান ফেলে পালিয়েছে।

তাঁব নববিবাহিতা মেয়ে শীলা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল কেউ হয়তো তাদের মেরে ফেলেছে।

অ্যাঁ—শীলাব মার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যায়।

এই মহিলা কয়দিনে একটা মৃত্যুও দ্যাখেন নাই। কিন্তু নিজের চোখে দু-একটা নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছেন। আর হত্যার কাহিনী শুনিয়াছেন অজস্র, হত্যা এবং হত্যার চেয়েও নির্মম।

শুনিয়া-শুনিয়া গা ঘিনঘিন করে, অরুচি হয়! আসে অনিদ্রা। তবুও মানুষ যে এত নৃশংস হইতে পারে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন, সইস কোচোয়ান বেঁচে থাকতেও তো পারে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পল্লিতে শাদা এই জানোয়ারটা যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করিল। তাকে লইয়া ছেলের দল মাতিয়া উঠিল।

একেবারে ছোটোরা দূর হইতে দেখিয়াই খুশি হয়। বড়োরা তার গায়ে হাত বুলায়। ঘাড়ে হাত দিলে ঘোড়াটাও আনন্দে চিঁহি-চিঁহি করে।

তাকে লইয়া জল্পনা চলে নানারকম। প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে, কোনো রাজার কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে। তারপরই ওঠে খাদ্যের কথা, বড়োলোকের ঘোড়া কী খায়, খায় কতটা পরিমাণ। একজন বলে, জানিস, ওরা মদ খায়, বিলিতি মদ।

নন্তে মন্তব্য করে, মদ না-খেলে আর অত তেজি হয়?

একটি ছেলের দুর্বদ্ধি হইয়াছিল। সে বলিল, ঘোড়াটা সম্ভবত ছ্যাকরা গাড়ির।

সঙ্গে-সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে। নন্তে বলে, কত ঘোড়াই না তুই দেখেছিস। তোদের বিলেত দেশে জুড়ি-চৌঘুড়ি চলে কিনা।

এই আলোচনার মধ্যেই ঘোড়ার মুখ দড়ির লাগাম পরাইয়া যমুনাপ্রসাদ তার পিঠে চাপিয়া বসিল। হাতে নিল একখানা ছোট্ট ছড়ি।

ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ, কালো রং। ছিপছিপে গড়ন। গায়ে একটা গেঞ্জি। সে বায়োস্কোপের টিকিট কিনিয়া বুকিং ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া চড়া দামে সেই টিকিট বেচে। ফুটপাতেব উপর জুয়া খেলিযা আধ ঘণ্টার মধ্যে লাভের কড়ি উড়াইয়া দেয়। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে খাঁটি খাইযা চিল্লাচিল্লি করে।

কিন্তু দাঙ্গাব এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই পল্লি বা নিকটেব দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে-আগে ছুটিয়া চলে।

গোরা সৈন্যদেব চা ও সিগ্রেট খাওযাইয়া যমুনা তাদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা তাকে ডাকে—মিলিটারি টি ক্যান্টিন।

কিন্তু এই দুই দিন আর-কিছু করাব তার অবকাশ হয় নাই। প্রায় সব-সময়ই ঘোড়ার উপব থাকে। বলে, হাম সার্জিন বন গিযা।

যমুনা কোনো কথার জবাব দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ কবে, টক-টক।

হাবুল বলিল, বাঃ রে, তুমি ঘোড়ায় চড়বে আর আমরা বসে-বসে দেখবো? তা হবে না।

যমুনা বলে, যা, মোড়ের দুকানসে পান ঔর সিগ্রেট লিয়ে আয়, তারপর চড়বি।

পয়সা?

হামার নাম করবি। বলবি যোমনাপারসাদ মাংছে।

মিনিট দুই-তিন পরে হাবুল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিলে না। বললে, পৈসা লে আও।

শালা ভেড়িকা বাচ্চা। শালার দুকান বাঁচিয়েছিলাম, জুয়াসে ভি কত পৈসা নাফা করল। আভি পানকো ওয়াস্তে দোঠো পয়সা মাংছে—বলিয়া যমুনা পানের দোকানের দিকে ঘোড়াটা চালাইয়া দিল। হাবুলের আর ঘোড়ায় চড়া হইল না।

অন্যবার এই সময়ে ছেলেরা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ভিড় করে। পটুয়া খড় দিয়া কাঠামো গড়ে, মাটি ছানে, কাঠামোয় মাটি দেয়। ছেলের দল দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া টুকিটাকি জিনিশপত্র আগাইয়া দিয়া পটুয়াকে সাহায্য করিয়া কতই না আনন্দ পায়।

এবার এখনও মণ্ডপ ওঠে নাই, ছেলেরা সারাদিন ঘোড়াটাকে লইয়া ব্যস্ত। তারা তার নাম দিয়াছে চাঁদ।-

চাঁদের রঙের ঔজ্জ্বল্য ও কান্তি দিনের পর দিন ম্লান হয়। সে পা টানিয়া-টানিয়া চলে। পিছনের বাঁ পায়ে ছোট্ট কিন্তু দগদগে একটা ঘা। শীলার বাবা হৃষিকেশবাবু পাড়ায় প্রবীণ লোক, ছেলেদের মুরুব্বি স্থানীয়। তিনি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘোড়াটাকে খেতে দিস্ তো রে?

হাবুল বলিল, নস্তেদা দিয়েছে বোধহয়।

নস্তেকে প্রশ্ন করিলে সে কহিল, আমি তো জানি না। যমুনা বলতে পারে।

স্বামীর নিকট ব্যাপার শুনিয়া শীলার মা ছেলে সন্তুকে দিয়া বাড়ির নিচের দোকান হইতে কিছু ভুষি কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা অল্প একটু মুখে তুলিয়াই আর খাইল না। সন্তুর বন্ধু খোকন বলিল, চাঁদের গলায় আটকে গেছে, আয় জল নিয়ে আসি।

দুইজনেই জল আনিল, কিন্তু একজনের ভাঁড়ের মুখ ছোটো হওয়ার এবং অপরের মগের তলায় ছ্যাঁদা থাকার ঘোড়াটার আর জল খাওয়া হইল না।

হাতের কাছে অন্য পাত্র না-পাইয়া বালক দুটি পাশের চায়ের দোকান হইতে একখানা ভাঙা ডিশে খানিকটা চা আনিয়া বলিল, খা, চাঁদু, খা। গোকুলের চা খুব ভালো, খেয়ে দ্যাখ।

কিন্তু গোকুলের চায়ের মাহাত্ম্য চাঁদকে মোটেই আকৃষ্ট করিতে পারিল না। দু-একবার ডিশ শুঁকিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

ঘোড়াটা আরও রোগা হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন জবুথবু ভাব। ঘায়ের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু যমুনার চড়ার বিরাম নাই। হৃষিকেশ তাকে কহিলেন, ঘোড়াটাকে একটু রেহাই দিও যমুনা, নইলে যে মরে যাবে।

যমুনা মদ খাইয়া বুঁদ হইয়াছিল। সে আধা-হিন্দি আধা-বাংলায় যাহা বলিল তার সারাংশ এই—যেখানে হাজার-হাজার মানুষ মরিল সেখানে সামান্য একটা জানোয়ারের জন্য আর দুঃখ করা কেন?—বলিয়াই হাসিল, শানিত ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ ক্রূর হাসি।

সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সাহায্যে হৃষিকেশ ঘোড়াটাকে সামনের ফাঁকা গ্যারেজে তুলিয়া দিলেন, সঙ্গে এক বালতি জল আর কিছু বিচালি। সবেমাত্র তাঁরা বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় চলমান লরি হইতে শান্তিরক্ষীর দল ফুকারিয়া গেল, ভিতরে যাও, ভিতরে যাও।

পরদিন সকালে দেখা যায়, গ্যারেজে তালা লাগানো, দরজার পাশেই হৃষিকেশের বালতি, অদূরে ঘোড়াটা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া। চোখে একটু দীপ্তি নাই, ল্যাজ নাড়াইয়া মাছি তাড়াইবারও শক্তি নাই। মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইবে।

সন্তু তাড়াতাড়ি চারটি ছোলা আনিয়া দিল। চাঁদ তাহা মুখে তুলিল না। নস্তে বলিল, দে তো সন্তু, দেখি আমার হাতে খায় কি না। অনেক ঘোড়াকে আমি খাইয়েছি। জানিস, আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল?

কিন্তু মূক প্রাণীটি তার এই আত্মবিশ্বাসেও আঘাত করিল। নস্তে বলিল, রোগটার

সিরিয়সিটি দেখছি খুবই।

শীলার মা দুঃখ করিতে লাগিলেন, আহা, বেচারার দেখছি দাঁড়াবার খ্যামতা নেই। কিন্তু একবার শুলে আর উঠবে না।

শীলা জিজ্ঞাসা করে, ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোয়?

হৃষিকেশ বলিলেন, কে বললে? আট-দশ দিন বাদে ওরাও একবার গড়িয়ে নেয়।

...

বেলা দশটা। কড়া রোদ যেন গায়ে চাবুক মারে। চাঁদ ছটফট করে, ছেলেরা তাকে ধীরে-ধীরে হাঁটাইয়া টেবুদের গাড়িবারান্দার তলায় লইয়া যায়। নন্তে তাদের আশ্বাস দেয়, শাদা জানোয়ারগুলোর রোদ সহ্য হয় না। ওতে ভয়ের কিছু নেই।

এই সময় বড়ো রাস্তার মোড়ে বেঁটেখাটো একটি মানুষের আবির্ভাব হয়। এদিক-ওদিক চাহিয়া লোকটি রাস্তায় ঢোকে। একগাল গোঁফ-দাঁড়ি, খালি গা, পরনে ময়লা লুঙ্গি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগটা রোদে চকচক করিতেছিল।

এমনিতেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তার উপর এই সময় এই পাড়ায় তাকে দেখিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। হৃষিকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, ইশ, ও এখন এ-পাড়ায় এল কেন?

কিন্তু লোকটির কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কী যেন খোঁজে, দীর্ঘ পথের উপর বার-দুই চোখ বুলাইয়া নেয়।

প্রথমে লক্ষ করে নাই, একটু পরে শাদা ঘোড়াটিকে দেখিয়া তার চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। দ্রুতপদে কাছে যাইয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বৃদ্ধ তাদের দেশি ভাষায় বলে, আঃ সুরাব, তোর এমন দশা হয়েছে!

পরিচিত এই স্পর্শে প্রাণীটি চঞ্চল হইয়া ওঠে। সেও চোখ তুলিয়া চায়। মানুষের চাহনির মতন অর্থপূর্ণ সেই দৃষ্টি অনেক কিছুই প্রকাশ করে। ভাষায় হয়তো ততটা বলিতে পারিত না।

বুদো ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল, এর নাম বুঝি সোরাব? আমরা ডাকি চাঁদ।

বৃদ্ধ সহিস কহিল, উ তো একই হ্যায়।

নন্তে জিজ্ঞাসা করিল, ঘোড়াটা তোমার?

না বাবু, ভাড়াগাড়ির ঘোড়া। আমি সইস। সইস কোচোয়ান দুইই।

নন্তে বলিল, তার মানেই তোমার ঘোড়া।

ঠিক হ্যায়—বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসে। তারপর কল হইতে মগটায় জল ভরিয়া আনিয়া ঘোড়ার মুখের কাছে ধরে। ঘোড়াটা জলটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলে ছেলের দল চীৎকার করিয়া ওঠে, জয় হিন্দ্‌!

সইস লুঙ্গির ভিতরে গোঁজা একটা ঠোঙায় ছোলা আনিয়াছিল। সেই ছোলা সে ঘোড়াটাকে হাতে করিয়া খাওয়াইল। ছোলা ফুরাইয়া গেলে ছেলেদের বলিল, ঔর চারঠো দানা মিলেগা বাবু?

জরুর—বলিয়া নন্তে ছুটিল। সঙ্গে ছুটিল হাবুল ও গবার দল। এক সঙ্গে ছোলা আসিল চার ঠোঙা।

জানোয়ারটা আর-একটু চাঙা হইলে বৃদ্ধ বলিল, বেমার হলে সোরাব আমার হাতে ছাড়া খায় না।

তার মনে পড়িল অনেক কথা, ঘোড়াটাকে কত টাকায় কেনা হইয়াছিল, তার বয়স তখন কত, কয়টা দাঁত উঠিয়াছিল, এইসব।

সোরাবের চলন দেখিয়া লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করিত. বাজি জিতিবার এই ঘোড়াটাকে সে ঠিকাগাড়িতে জুড়িয়াছে কেন?

নিজের কপালে হাত ছোঁয়াইয়া সে উত্তর করিত, নসীব। মানুষেব মতন জানোয়ারেরও নসীব আছে কিনা।

একটু পরে সে হৃষিকেশকে প্রশ্ন করিল, কব সব ঠাণ্ডা হোবে বড়োবাবু? ফিন ঠিকাগাড়ি চালু হোবে? রাস্তামে ডর-উর কুছ থাকবে না?

লোকটি আগের মতন শান্তিপূর্ণ দিনের কথা ভাবিতেছিল। হৃষিকেশ তার প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

হঠাৎ যেন দানবের নিদ্রাভঙ্গ হয়। অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে সে আড়মোড়া ভাঙে। ঝঞ্ঝার বেগে খবর ছুটিয়া আসে লালপট্টিতে খুনোখুনি শুরু হইয়াছে। খালের মধ্যে নদীর বেনো জলের মতন বড়ো রাস্তার জনস্রোতের একটা অংশ হু-হু করিয়া এই রাস্তায় ঢুকিয়া পড়ে। আরম্ভ হয় ছুটাছুটি, কলরব, মার-মার শব্দ।

বুড়া সহিস এদিক-ওদিক চায়, এক-একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকায়। সোরাবের চোখেও ফুটিয়া ওঠে অপরূপ করুণ দৃষ্টি, হয়তো সে তার পালকের বিপদ বুঝিতে পারে।

নন্তে সহিসকে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার।

কিন্তু অপরিচিত শত-শত হিংস্র চোখের সামনে সহিস কেমন যেন ভরসাও পায় না।

কয়েকটি লোক আগাইয়া আসে। যমুনা, নন্তে, হাবুল প্রভৃতি তরুণের দল বৃদ্ধের চারধারে কর্ডন করিয়া দাঁড়ায়। হৃষিকেশ আক্রমণকারীদের শান্ত করিবাব চেষ্টা করেন। বলেন, এ একটা নিরীহ লোক, ওকে মারবেন না।

জনতার মধ্যে হইতে নানা ভাষায় প্রতিবাদ আসে, মানুষ নেই, উ শয়তান আছে।

এর মধ্যে মেটিয়াবুরুজ ভুলে গেলেন মশায়?

টুথ-ফর এ টুথ্।

হৃষিকেশ বলিলেন, কত জায়গায় ওরা আমাদের বাঁচিয়েছে জানেন?

আমরাও ঢের বাঁচিয়েছি। ও-সব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন।

বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা, তর্ক করা শুধু নিরর্থক নয়, ক্ষতিকরও বটে। তাই যমুনা আর নন্তে বলে, চুপ করুন কাকাবাবু বলিয়াই দুজনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। যমুনা বলে,

আও, মারনেওয়ালা কোন্ হ্যায়, আও।

একটি ছোকরা চ্যাঁচাইয়া উঠিল, আমাদের শাদা ঘোড়ার সইসকে, আমাদের চাঁদের সইসকে, কেউ মারতে পারবে না।

জনতা একটুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তারপরই আবার কলরব শুরু হয়। ছেলেদের গায়ে ঢিল পড়ে।

এই সময় মোড়ের চারতলা বাড়ির ছাদে একজন চীৎকার করিয়া ওঠে, মিলিটারি আ গিয়া।

আরম্ভ হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। আশেপাশের গলিঘুঁজি, খোলা দরজা যে যেখানে সম্ভব ঢুকিয়া পড়ে। বৃদ্ধ সহিসকে পাঁজাকোলা করিয়া যমুনাপ্রসাদ হৃষিকেশের বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া যায়।

গুম গুড়ুম গুম।

গাড়ি হইতে নামিয়া সৈনিকেরা রাজপথে টহল দেয়। তাদের জুতার শব্দ ভিন্ন সারাটা পল্লিতে আর-কোনো শব্দ নাই।

সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, দরজা জানালা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়াও কেহ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে ভরসা পায় না। সবারই মুখে অজানা উদ্বেগের ছাপ।

...

ঘণ্টাখানেক পরের কথা।

প্রথমে বাহির হয় নন্তে আর যমুনাপ্রসাদ। পিছনে বৃদ্ধ সহিস। দরজা খুলিতেই তাদের চোখে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ রাজপথের রিক্ত রূপ, যেন মহাশ্মশান।

বাঁ-দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনজনেই শিহরিয়া উঠে।

এ কী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচের মধ্যে তার শাদা রঙ আরও খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর, মাথাটা ফুটপাথে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষতচিহ্ন।

বুড়া সহিস ডাকিল, মেরা সোরাব।

সোরাব কোনো উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া না-দেওয়া এই প্রথম।

সোরাব তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হীরকস্বচ্ছ আকাশেরই মতো নির্মল দৃষ্টি; সে-চাহনিতে কোনো বেদনা নাই, গ্লানি নাই। হৃষিকেশও পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঘোড়াটার চোখের দিকে চাহিয়া তিনি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

# পথের কাঁটা

## রমেশচন্দ্র সেন

'আর কতটা পথ, বাবা?' যাদবের কণ্ঠে কাতর প্রশ্ন। স্বর পাখির ছানার চিঁচিঁ-র মতন করুণ।

এগাবো-বারো বছরের ছেলে, শ্যামবর্ণ, সরু-সরু হাত পা। পেটটা বড়ো। চোখ কটা। হাঁটিয়া-হাঁটিয়া পা ভারি হইয়াছে, আর পারে না : কিছুটা পথ চলিয়াই নিশ্বাস নেয়ার জন্য দাঁড়ায়। বাপ অমনি ধমক দেয়, 'এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা। চল, চল।'

যাদবের মা বলে, 'রোগা ছাওয়ালরে অত ধমকাও ক্যান? তুমি যখন ছিলা না, ওই ত আমাগো রক্ষা করছে।'

'রক্ষা করছে না হাতি,' যাদবের বাপ পরাশর রাগে গশগশ করে। শক্তিমান পুরুষ, শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী—বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কিন্তু এই কয়দিনের দুর্দৈবে, অনাহার ও অনিদ্রায় তার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। একহাতে টিনের তোরঙ্গ, পিঠে বোঁচকা, আরেকহাতে যাদব এইভাবে চলিতে তার কষ্ট হয়। সে এক-এক বার বলে, 'কী পাপই যে করছিলাম। শেষটায় দেশছাড়া, ভিটাছাড়া হইলাম।'

তার স্ত্রী মোহিনী বলিল, 'পাপ-পুণ্য বইলা কিছু নাই। সেদিন গাঙ্গুলি ঠাকুররে খাওয়াইলাম, বামুন ভোজনের ফল ত হইল এই।'

তার গাযের রং কালো, দাঁতের উপরের পাটি ও কপাল উঁচু। চোখ দুটো বড়ো। বয়স অনুমান করা যায় না—তবে দেখিতে স্বামীর চেয়ে বড়ো দেখায়।

তাব বাঁ হাতে বোঁচকা, ডান হাতে ভাঙা বালতির ভিতর ময়লা জীর্ণ একটা লণ্ঠন, নুনের মালা, তেলের শিশি, দু-একটা ঘটি-বাটি, গরিব সংসারের সামান্য তৈজসপত্র।

চলিয়াছে কাতারে-কাতারে-মানুষ—পঙ্গু, অন্ধ, খঞ্জ, সুস্থ, বলবান, যুবা, শিশু, বৃদ্ধ, নর ও নারী। পুব হইতে পশ্চিমে বাক্স-পেঁটরা হাঁড়ি-কুড়ি বিছানার যোজন ব্যাপী বিরাট কিন্তু বিচ্ছিন্ন মিছিল। কোনো দল আগে গিয়াছে, কাহারাও-বা পিছনে আসিতেছে। মানুষগুলোর চোখে-মুখে অদ্ভুত ভীতি, সামান্য শব্দেই আঁৎকাইয়া ওঠে। মাঝে-মাঝে পিছু তাকায়। দূরে অস্পষ্ট কিছু দেখিলেই বলে, 'ঐ—ঐ—'

শুধু রুগ্ন যাদবের নয়, সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, 'পথ আর কতটা? পশ্চিম বাঙলা কত দূর?'

বৃদ্ধরা অশক্তরা এক-একবার পথের উপরই বসিয়া পড়ে। সঙ্গীরা ভয় দেখায়, 'ঐ ঐ আনসার!'

ভয়ত্রস্ত মানুষগুলো আবার চলে।

আজ কয়দিন যাবৎ একই দৃশ্য। দলে-দলে মানুষ পুব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে। দলে-দলে আসিতেছে পশ্চিম হইতে পুবে।

কিছুটা পথ যাইয়াই যাদব আবার বসিয়া পড়ে।

'তর জন্য মরুম না কি হারামজাদা?' বলিয়া পরাশর ছেলেকে রুখিয়া গেল।

মোহিনী বলিল, 'তুমি কি পাগল হইলা নাকি?'

'হইছি ত, পাগল করছে বাবুরা। দেশ ভাগ লইয়া তারা যখন মাইতা উঠছিল ও তখন নিশান লইয়া তাগো পিছু-পিছু ছোটছে। তখন মানা করি নাই?'

'ও কি বুইঝা চ্যাচাইছে, না বাবুরাই তখন বুঝছিল?'

'বোঝে নাই ক্যান? যত-সব আহাম্মক!'

এই সময় পিছন হইতে আরেকটি দল আসিয়া তাদের সহিত মিলিত হইল। সকলের আগে বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ, তার পিছনে দুইটি তরুণী। তিন জনের মুখের আদল একই রকম, দেখিলে মনে হয় ভাই-বোন। তার পর তাদের বাপ-মা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। বাপের হাত ধরা পাঁচ বছরের একটি ছেলে পরাশরের উদ্দেশে বলিল, 'থিঃ লাগে না।' (ছিঃ বাগে না।)।

পরাশর হাসিয়া ফেলিল।

ধমক খাইয়া যাদব তখনও কাঁদিতেছিল। মোহিনী তার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'অ্যাঁ, গা-গতর একেবারে পুইড়া ছাই হইয়া যাইতেছে।'

পরাশব বলিল, 'যাউক, পুইডা ছাই হইয়া যাউক। আঙার।'

মোহিনী মনে-মনে ঠাকুরকে ডাকে, 'ওইকথা শুইনো না ঠাকুর। আমি তোমারে সিন্নি দেবো। কলকাতায যাইয়া দুধ-কলাব সিন্নি।'

যাদব জল চায়। তার মা প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা কবিল, 'আপনার কাছে জল আছে?'

প্রৌঢ়া বলিল, 'জল নাই, দুধ আছে। দেবো?'

'দেন, ভালই হবে। দুধে শক্তি হয়।'

দু-তিন ঢোক দুধ গিলিয়াই যাদবের পিপাসা বাড়িয়া যায়। সে জল-জল বলিয়া কান্না শুরু করে।

পরাশর বলে, 'এই ছাওয়ালই হইছে আমার পথের কাঁটা। মরতে হবে অর জন্য। কখন আনসাররা আইসা পড়ে।'

আনসার শুনিয়া তরুণী দুটির মুখ শুকাইয়া যায়। তারা এদিক-ওদিক তাকায়; তাদের ছোটো ভাইটি কিন্তু 'আনথাল' বলিয়া হাসিয়া ওঠে।

পরাশর বলে, 'হাইসো না, খোকা। আনসার হাসির জিনিশ না।'

যুবকটি তাকে বলল, 'চলেন, আমরা আউগাইয়া যাই। জল নিশ্চয়ই মেলবে। আপনার ছাওয়ালরে আমরা ভাগাভাগি কইরা নেব'খন।'

আবার পথ চলা শুরু হয়। যুবকটির কাঁধের উপরে যাদব, পিছনে তার দুটি বোন,

তার পরে তাদের বাপ-মা—প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া; প্রৌঢ়ের হাত ধরা তার ছোট্ট ছেলে। সকলের পশ্চাতে মোহিনী ও পরাশর।

তরুণীদের একজনের হাতে টিনের সুটকেশ, অপরটির হাতে বোঁচকা; তাদের মা মোটা মানুষ, চলিতে কষ্ট হয়, তার হাতে বেশি-কোনো জিনিশ নাই, শুধু একটা পুঁটলিতে কয়েকখানি কাঁথা-কাপড়।

রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা যায় গাছের সারি। হলুদরঙা শাড়ির প্রান্তে যেন স্নিগ্ধ সবুজ একটা পাড়। মোহিনীর মনে পড়ে নিজের গ্রাম সারাতলির কথা। সেখানে নিজেদের সবুজ বাগান ছিল, ছিল টিনের ঘর, ধানের গোলা, হাল, গোরু, লাঙল। বাগানে আম লেবু তাল নারিকেলের সারি, নিচে ছোট্ট খাল, খাল যেমন ছোটো-ছোটো ঢেউ বুকে করিয়া চলে, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাদের জীবনও তেমনি চলিত।

সেই গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে হইল।

তার আগে মোহিনী ও যাদব তিনদিন জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল। পরাশর বাড়ি ছিল না। ছেলের হাত ধরিয়া মোহিনী পশুর মতন এ-জঙ্গল হইতে ও-জঙ্গলে লুকাইয়াছে।

মাঝে-মাঝে চিৎকার শোনা যাইত, 'গেলাম রে গেলাম, মরলাম। রক্ষা করো, রক্ষা করো।'

সবচেয়ে করুণ রূপী নাপতানির আর্তনাদ। মানুষ-পশুর হাতে লাঞ্ছিতা মেয়েটির সেই কাৎরানি মোহিনী কখনও ভুলিতে পারিবে না। ভোলা অসম্ভব।

একদিকে কাৎরানি, আরেকদিকে হিংস্র উল্লাস।

আকাশ এক-একবার লাল হইয়া যায়। ওঠে আগুনের বড়ো-বড়ো গোলা, মনে হয় শয়তান যেন আগুন লইয়া ফুটবল খেলিতেছে।

তিন-তিনটা দিন সে কী নরকযন্ত্রণা। সেই জঙ্গলেই যাদবের জ্বর হয়, ম্যালেরিয়া। তিনদিন পরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেরাজুল হক তাদের রক্ষা করেন। কার্যোপলক্ষে তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন। গ্রামে ফিরিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট লোক পাঠাইয়া সশস্ত্র পুলিশ আনাইলেন। হিন্দুদের বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করা হইল, জঙ্গলে-জঙ্গলে নিজে গিয়া ডাকিলেন, 'কে লুকাইয়া আছে? বাইর হইয়া আইস, ভয় নাই।'

তাঁর কথা শুনিয়া ভীত মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে। তাদের মূর্তি দেখিয়া তিনি ভয় পান, এ কী! তিন দিনে মানুষ এমন করিয়া বদলায়? তাদের তিনি মহকুমায় পাঠাইয়া দেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পরাশরের দেখা হয় সেইখানে।

কয়লার অভাবে স্টীমার বন্ধ। মহকুমা হইতে তারা রওনা হয় হাঁটা পথে। তাদের দলে এক সারাতালি গ্রামেরই ছিল সাত-সাতটা পরিবার।

পথে খাল-বিল অনেক, দুইটা বড়ো নদী। রাস্তার খেয়াঘাটে স্বেচ্ছাসেবীরা, আনসাররা ধরিল, 'গহনা নিয়া চললা কোথায়?'

'পাকিস্তানের সোনা-রূপা চুরি কইরা পালাইবা ভাবছ?'

'মাথা প্রতি দশ টাকার বেশি নিতে দেবো না। বাড়তি টাকা থুইয়া যাও।'

একে-একে অনেক জিনিশই ছাড়িয়া আসিতে হইল। কারও সঙ্গে রহিল শুধু পরনের কাপড়। যাদবের অসুস্থতার জন্য পরাশররা পিছনে পড়িয়া গেল। তারা যখন রেলস্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন হাতে ট্রেনের মাশুল দেওয়ার মতন পয়সাও ছিল না।

পথে একদল আনসার ধরিল, 'এ কী, করাত কেন? করাত ছেনি বার্তুল, এ-সব নিতে পারবা না।'

পরাশর বলিল, 'এ আমার রোজগারের হাতিয়ার। এই দিয়া ছাওয়াল বউরে খাওয়াইয়া রাখি। দোহাই আপনাগো, এগুলা রাখবেন না।'

তার আবেদনে কোনো ফল হইল না। তবে একটা জিনিশ রক্ষা পাইল—শুধু ছোট্ট একখানা শৌখিন করাত। কালো কুচকুচে হাতল, মনে হয় মেহগিনির তৈরি।

পরাশব একজন ভালো মিস্ত্রি। শুধু অন্নের জন্যই সে কাজ কবে না, করে শিল্পসৃষ্টির আনন্দে। তাদের আশেপাশে অনেক গ্রামে তার হাতের সুন্দর বহু কাজ আছে। সেরাজুল হকের বাড়িতে কাঠের মস্ত বড়ো একটা মূর্তি তার অন্যতম। দেখিলে মনে হয় জীবন্ত কোনো মানুষ উবু হইয়া পায়ের কাঁটা তুলিতেছে।

হক সাহেব খুশি হইয়া নিজের নামাঙ্কিত এই করাতখানি উপহার দেন আর দেন একখানি প্রশংসাপত্র।

জিনিশটা কোনো কাজে লাগিবে না বলিয়াই হয়তো আনসাররা ছোট্ট এই করাতখানি তাকে ফিরাইয়া দিল।

...

বেলা বাড়ে। পথের ধারে আগে তবু দু-চারটা গাছ ছিল, এখন তাহাও নাই। এ যেন ধূসর মরু, রোদ গায়ে ছুঁচের মতন বেঁধে, পায়ে বেঁধে বোদেপোড়া ঘাসের ডগা। পথ ধুলায় ঢাকা, কোথায়ও যাত্রীদের গোড়ালি পর্যন্ত ধুলায় ডুবিয়া যায়। বাস্তুহারাদের পিছু-পিছু চলে ধূলির ওড়না, তাতে সূর্যও যেন ঢাকা পড়ে। মলিন দেখায়। ধুলায় যাদবের গলা আটকাইয়া আসে, সে কাশে খুকখুক করিয়া।

তবে তাদের নূতন প্রৌঢ় সঙ্গীটি পথের কষ্টকে অনেকটা হালকা করিয়া দিল। বলিল, 'এ আর এমনকী কেলেশ? এর চাইয়াও অনেক বেশি বিপদে পড়ছি।'

পরাশর বলে, 'এর থাও বিপদ। এ আপনি কন কী?'

'হ মশয়, প্রৌঢ় বিপদের কয়েকটি গল্প করে, সবই তার নিজের জীবনকাহিনী। গল্পগুলি রোমাঞ্চকর, দিনের বেলায়ও গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয় মিথ্যা, তবু শ্রোতারা অবাক হইয়া শোনে।

এর পর সে দেয় নিজের পরিচয়। নাম তার পতিতপাবন। লোকে ডাকে ঘাতক বলিয়া। এককোপে সে বড়ো-বড়ো মহিষ কাটিতে পারে, তাই এই নামকরণ হইয়াছে।

লোকটি তাদের নিজের দেশের কথা বলে। তাদের দেশ কাছেই, এখান হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূর। সেখানে কোনো উপদ্রব হয় নাই। হিন্দু মুসলমানরা এখনও সদ্ভাবে পাশাপাশি বাস করে। তবে ভদ্রলোকরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখাদেখি চাষী-

মজুররাও যাইতেছে। তার বাড়ির সিকি মাইলের মধ্যে কোনো লোক নাই; স্বজাতি এমন একজনও নাই যে মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয়, মরার পর দেহ কাঁধে করে। দেশে থাকিবে কীসের ভরসায়? কার উপর নির্ভর করিয়া? তাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে।

সঙ্গে টাকা-কড়িও কিছু আছে, জমি কেনার মতন কিছু টাকা আর কলসিতে বীজ ধান। হিন্দুস্থানে পৌঁছিয়াই সে ধানের জমি কিনিবে, চাষ করিবে।

টাকার কথা বলায় তার স্ত্রী গলা খাঁকারি দিল। ঘাতক বলিল, 'কাশো ক্যান? আমি লোক চিনি। এনাবে বিশ্বাস করা যায়। ইনি অতি মহাশয় লোক।' তার পরই পরাশরকে বলে, 'ইনি আমার গেরিনি কুমুদিনী, লোকে ডাকে কুমুদ। আমার বাপ আর অর জ্যাঠা ছিল মিতা। লোকে কয়, আমি অরে পছন্দ কইরা বিয়া করছি।'

আর কুমুদ কয়, 'আমারে দেইখ্যা অর পছন্দ হইছিল। হইতেও পারে। এগারো-বারো বছরের মাইয়ার মনে হয়তো একটু কাঁচা রং ধরছিল'—বলিয়াই হাসে—ভারি প্রাণখোলা হাসি।

আবাব শুরু করে, 'আমার ছোটো-ছাওয়ালটির নাম হাম্বীর—ভারি বুদ্ধিমন্ত। পাঁচজনে কয়, বাপকা বেটা। মাইয়া দুইটি ছায়া আর কায়া। রোগাটি কায়া আর স্থূলটি হইল ছায়া। ছায়া মায়েব মতন।'

ছায়া লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া পড়ে। কুমুদিনী স্বামীর উদ্দেশে আবো জোরে গলা খাঁকারি দেয়।

ঘাতক বলে, 'বড়ো ছাওয়াল পেরতাপ মায়ের মতন হইলে আরো ভালো হইত। ফুলা গাল, তার মধ্যে চোখ য্যান বইসা গেছে।'

প্রতাপ বলে, 'তুমি থামো, বাবা।'

এই সময় দূরে দেখা যায়, কালো একটা রেখা। ঘাতক ঐদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাদবও চোখ মেলে। কিন্তু তার চোখ ছিল পুব দিকে, রেখাটা পশ্চিমে। সে ধুলায় ঢাকা আকাশ ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না।

একটুক্ষণ চাহিয়া পবাশর বলে, 'একদল মানুষ নাকি?'

ছায়া বলিল, 'যদি মোছলমান হয়?'

'মোছলমান?' কুমুদিনীর গলায় ধুলা আটকাইয়া গেল। মোহিনী চোখ বুজিয়া ঠাকুরের নাম আওড়াইল।

পরাশর বলিয়া উঠিল, 'দেশ ভাগ করছে! যত সব—'

কালো রেখা স্পষ্ট হয়, আরো বড় হয়। দেখা যায় সত্য-সত্যই একদল মানুষ আসিতেছে।

ধ্বনি ওঠে, 'আল্লা হো—'

নির্মেঘ আকাশে বজ্রনির্ঘোষ হইলেও পরাশররা এতটা আঁৎকাইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। প্রতাপ ছাড়া সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। ছায়া ও কায়া সমস্বরে ডাকিল, 'বাবা।'

'আল্লা হো, আল্লা—' আওযাজ ক্রমেই জোবে হয।

প্রতাপও পালটা আওযাজ কবে, 'বন্দে—'

হাম্বীব হাসিযা বলে, 'আনথাল—'

পবাশব বলে, 'এই কি হাসিব সময, খোকা?'

ঘাতক বলে, 'হাসিস ক্যান বে হাম্বীব?'

সমাজেব এই আলোড়ন ও বিপ্লব, বড়োদেব ভীতি হাম্বীবেব শিশু মনে শুধু হাসিবই খোবাক জোগায। সে আবাব হাসিযা বলে, 'আনথাল।'

মুসলমানদেব দলে ছোটো-ছোটো ছেলেমেযেই বেশি, আব বোবকাপবা কযেকটি স্ত্রীলোকে। পুরুষ ছিল দশ-বাবোটি।

প্রতাপ বলিল, 'মাইযা লোক আব কচি-কাঁচা লইযা কেউ লডতে আসে না। তোমাদেব কোনো ভয নাই, মা।'

ঘাতক বলিল, 'অবাও হযতো ঘববাড়ি ছাইড়া পুব দিকে যাইতেছে।'

পবাশব বলিল, 'গুনতিতে অবা বেশি। যদি প্রতিশোধ নেয?'

প্রতাপ বলিল, 'ঐ কযজনাবে আমি আব বাবাই কিছুক্ষণ বোখতে পাবব—কী কও, বাবা?'

ঘাতক বাহুব গুলি ফুলাইযা বলে, 'তা পাকুম, গতবে সে-জোব এখনও আছে।'

তাদেব সামনে আসিযা দাঁডায আব একদল হতভাগ্য মানুষ, চোখে সমান হতাশা, চেহাবায একই রূপ বিক্ততাব ছাপ। পুরুষেব কাঁধে গাঁটবি-বোঁচকা, বগলে বিছানা, নাবীব কোলে শিশু, হাতে বদনা। এবাও ঘব-বাড়ি হাবাইযাছে, সর্বস্ব খোযাইযাছে। কাবো বাপ মবিযাছে, কাবো ভাই, কাবো স্ত্রী। মাযেব চোখেব সামনে দুর্বৃত্তবা ছেলেকে মাবিযাছে।

দূব হইতে মানুষ দেখিযা তাবাও ভযে আওযাজ কবিযাছিল, 'আল্লা হো—'

মাথায ফেট্টি-বাঁধা একটি যুবককে দেখিযা মোহিনীব মনে পড়িল তাব জ্ঞাতি দেবব জুযানেব কথা। তাব মাথাযও ছিল ঐ বকম ফেট্টি। মহকুমায আসিযা ছেলেটি ধনুষ্টঙ্কাবে মবিযা গেল।

সামনে আসিযা একদল আবেকদলেব দিকে চাহিযা নীববে দাঁড়াইযা বহিল। দু-দলেব দৃষ্টিই শান্ত, স্থিব, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাদেব চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, 'তোমাদেবও এই দশা ভাই? এ কবলে কে? কাবা?'

প্রশ্নেব সঙ্গে ছিল সহানুভূতি, মানুষে-মানুষে দবদ। বোবকাব আড়াল হইতে নাবীব মৌন চাহনিতেও সেই সহানুভূতি ফুটিযা বাহিব হইল।

উভয দলই আবাব চলিতে আবম্ভ কবে, চলে বিপবীত দিকে। এবাব কেহ আব আল্লা হো আকবব বলিযা আওয়াজ কবে না, বন্দে মাতবম্‌ও নয়। তাদেব সহানুভূতি ধ্বনির জগৎ ছাড়াইযা বহুদূবে চলিয়া গিযাছে।

একটু পবে মোহিনী বলিল, 'অদেব কাছে জল আছে কিনা দেখলে হইত।'

ঘাতক বলিল, 'মাইয়াদের বুদ্ধিই ঐ রকম। সাধে কি কইছে, পথে নারী বিবর্জিতা।'

আরো খানিকটা পথের পর রাস্তার পাশেই ছায়া-আশ্রয় মিলিল। টলটলে জলে-ভরা বড়ো একটা দিঘি; চার পারে শাল, শিমূল, অশোক, অর্জুন গাছ। পূব পারে ধ্যানমগ্ন মুনির মতন জটাজুটলম্বিত এক বট।

চার পারে মানুষের অসম্ভব ভিড়। পূব দিকে অপেক্ষাকৃত কিছু কম। অনেকে স্নান করিতেছে। যুবারা সাঁতার কাটে; তাদের পায়ের আঘাতে জলের উপর যেন কতকগুলি শাদা ফুলের তোড়া ফুটিয়া ওঠে।

মেয়েরাও জলে নামিয়াছে, তারা পারের কাছে দাঁড়াইয়া কুলকুচা করে, মুখ ধোয়, গা মাজে।

ছোটো-ছোটো কতগুলি চুল্লির উপব হাঁড়ি কড়াইয়ে চাল-ডাল সিদ্ধ হয়। পাশেই কেহ ভাত খায়, কেহ চিঁড়ামুড়ি। আরেকদল শুধু খাওয়া দ্যাখে, জিভ দিয়া ঠোঁটের দুই কোণ চাটে।

ছেলেকে ছায়ায় শোয়াইবার জন্য মোহিনী জায়গা খোঁজে। চলে অতি সন্তর্পণে, হাঁড়ি-কুড়ি বাক্স-পেঁটরা এড়াইয়া। কিন্তু কথাটা কারো কাছে তুলিতে ভরসা করে না।

শেষটায় সুন্দরী এক তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার রোগা ছাওয়ালটার জন্য একটু জায়গা হবে? আজ কয়দিন অর জ্বর।'

তরুণী বলিল, 'জায়গা ত আমার কেনা না। কিন্তু এখানে কি বসবেন? আমার ছাওয়ালের ঘন-ঘন দাস্ত হইতাছে।'

মোহিনী বলিল, 'না, না—তা হইলে থাউক।'

শেষটায় আশ্রয় দিল এক বৈষ্ণবী। শ্যামবর্ণ, টিকলো নাক, গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গঠন ঋজু ও সুঠাম। সে নিজে রৌদ্রে সরিয়া বসিয়া গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় যাদবকে শোয়াইয়া দিল। কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া খাওয়াইল। যাদব দুই-এক ঢোঁক খাইয়াই মুখ ঘুরাইয়া নিল।

বৈষ্ণবী বলিল, 'জল ফুটাইয়া নিছি। তাই একটু গন্ধ আসে।'

একটু পরে যাদব ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈষ্ণবী বলিল, 'তোমাদের দেশে কি অত্যাহিত কিছু ঘটছে?'

মোহিনী তাদের গ্রামের হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিয়া বলিল, 'আপনাগো গাঁয়ে?'

বৈষ্ণবী উত্তর করে, 'আমার গাঁ বইলা কিছু নাই। আমার রাধাবল্লভরে নিয়া নবদ্বীপ চললাম।'

'এখানে নাকি পেটের পীড়া হইতাছে?

'সোজা পেটের পীড়া না, একেবারে বিসূচী।'

'কলোরে!'

কলেরা কথাটা কেউ মুখে আনে না। কয় দাস্ত হইতেছে।

'মরছে কেউ?'

'আমি কাউলকা আইছি, তাবপব দুইজন মরছে।'

মোহিনী বলিল, 'এখন কী করি কন দেখি? রোগা ছাওয়ালরে রোদ্দুরে নিয়া গেলে মাথায় রক্ত উইঠা মরবো। এইখানেই বা থাকি কী কইরা?'

'ভয় নাই। রাধাবল্লভ অরে বাঁচাবেন।'

বৈষ্ণবীর কাছে ছেলেকে রাখিয়া মোহিনী স্নান করিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুমুদ দুখানা ইঁট দিয়া উনান বানাইয়া তার উপর হাঁড়ি চড়াইয়াছে।

সে মোহিনীকে বলিল, 'তোমাগো দুজনের চাউলও চডাইয়া দেই? তুমি ছাওয়াল নিয়া থাকো।'

মোহিনী বলে, 'দরকাব নাই। চারটি চিড়া আছে।'

'চাউলের জন্য ভাইবো না। বাডতি চাউল আমাগো আছে। আজ দুইদিন তোমরা ভাত খাও নাই।'

মোহিনী ইতস্তত করে। স্বামীর দিকে তাকায়। সে বলে, 'আমরা বাঘা ক্ষেত্রি। আপনাবা কী জাত?'

ঘাতক বলিল, 'আমরা তেতুঁলে বিছা।'

'সে কী! তেতুঁলে বিছা ত শুনি নাই!'

'আপনাদের পালটা ঘর। আমাদেব ছোঁয়া আপনারা খাইতে পারেন।'

পরাশর বলে, 'পরিহাস করলেন বুঝি?'

প্রতাপ ধমক দেয়া উঠিল, 'তুমি চুপ করো, বাবা। এখনও জাত আর জাত। আমাগো লজ্জা আর হবে কবে?'

ফুটন্ত ভাতের গন্ধ বাহির হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারধারে ছোটো-ছোটো অনেকগুলি ছেলেমেযে আসিয়া জড়ো হয়। কেহ উলঙ্গ, কেহ নেংটি পরা, গায়ে ময়লা, চোখ বসিয়া গিয়াছে। তা'রা হাঁড়ির ভিতরের শাদা জলের দিকে তাকায়। ক্ষুধায় কারো কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, কারো চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

কুমুদিনী একটা থালায় ভাত ঢালিলে বুভুক্ষুর দল তার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সে বলিল, 'আমার সোয়ামি আর ছাওয়ালরে আগে খাওয়াইয়া লই। তারপর তোমরা পাবা। এখন একটু সইরা যাও দেখি।'

কেহ-কেহ অনিচ্ছায় দু-চার পা পিছাইয়া যায় বটে কিন্তু কে আগে পিছাইবে ইহা লইয়াও নিজেরা ধাক্কাধাক্কি করে। কুমুদিনী ধমকায়, 'এ-রকম করলে একটা কণাও দিমু না।'

গরম ভাতে হাত দিয়া হাম্বীর আঙুল পোড়াইয়া ফেলিল। কুমুদিনী ধৈর্য হারাইয়া বুভুক্ষু ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তোরা দিষ্টি না-দিলে হামুর হাত পোড়ত না। যা মড়ারা, দূর হ।'

একজনের মা কাছেই ছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'ক্যান রে, পোড়ামুখি লক্ষীছাড়া? একমুঠা চাউলের এত দেমাক! চাউল কি আমরা দেখি নাই? অমন কত চাউল হাঁসরে কাউয়ারে খাওয়াছি।'

কুমুদিনীর আর খাওয়া হয় না। সে গ্রাস দুই-তিন ভাত মুখে তুলিয়াছে, এই সময় বুভুক্ষুরা আবার তাকে ঘিরিয়া ধরে। সে নিজের খাবার বিলাইয়া দেয়। সময় কাটে। সন্ধ্যার একটু আগে দিঘির ওপারে ওঠে কান্নার রোল, 'তরে শেষে এইখানে ছাইড়া গেলাম, এই মড়ার দিঘিতে?'

পরাশর ঘাতককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আরেকজন গেল বুঝি?'

ঘাতক ইতিমধ্যেই দু-তিনবার দিঘির চার পাশ ঘুরিয়া আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে। সে বলিল, 'হ, আমরা আসার আগেও নাকি গেছে।'

পরাশর বলিল, 'এ কন কী?'

ঘাতক বলিল, 'রোজই দুই-একজন মরে। ফ্যালে পুবদিকের মাঠে, দিঘির নিচে। আমি হাড়গোড় দেখছি। যাবেন নাকি দেখতে?'

পরাশর বলিল, 'রক্ষা করেন।'

সন্ধ্যার আঁধার নামে। চারদিকের আর-কিছুই দেখা যায় না, এমনকী পাশের লোককেও নয়, এ যেন ব্ল্যাকআউটের রাত। লোকে ভয়ে আলো জ্বালে না। বিড়িখোরেরা হাতের তেলোয় আড়াল করিয়া বিড়ি ধরায়। বিশেষ প্রয়োজনে আলো জ্বালিতে হইলে তার উপর ঠুলি পরাইয়া লয়।

আঁধার-গম্ভীর এই পারিপার্শ্বিকের মাঝে গেরুয়া রঙের থলের ভিতর হইতে একতারা বাহির করিয়া বৈষ্ণবী গান ধরে,

'একতারা তোর বাজা—
আসবে সোনার রথে চড়ি
তোব হৃদয়ে রাজা।
নাই-বা থাকল শঙ্খ-ঘণ্টা
নাই-বা মালসাভোগ—
হিশাবনিকাশ কীসের ওরে,
কীসের দুঃখশোক?'

চমৎকার কণ্ঠ। তরুণীর কণ্ঠের মতন কোমল অথচ চড়া, একতারার বোলের মতন মিষ্টি। গান আঁধারের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করে, বাতাস মূর্ছনায় ভরিয়া যায়।

সে থামিলে একটি তরুণী আসিয়া বলিল, 'আরেকখানা গাও দিদি। আমার ছাওয়াল শোনতে চায়।'

মোহিনী এই মেয়েটিব কাছেই আশ্রয় চাহিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ছাওয়াল আছে কেমন?'

তরুণী বলিল, 'ভাল না। সে ওনার গান শোনতে চায়।'

বৈষ্ণবী আবার ধরে,

'আমার গৌরী হবেন রাধা
তার সুরেতে এ-বীণ আমার
থাকবে সদাই সাধা।'

শেষরাতে মোহিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরে উঠিয়া দেখে, বৈষ্ণবী যাদবের শিয়রে বসিয়া গুনগুন করিতেছে।

পাশে কুমুদিনীদের জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে কতকগুলি ভিজা চিঁড়া পড়িয়া আছে। এক চড়ুই দম্পতি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া উহা খায়। একটু দূরে সারি বাঁধিয়া পিঁপড়ারা চিঁড়া মুখে করিয়া বাসার দিকে চলে। কুমুদিনীদের জন্য মোহিনীর দুঃখ করে, বিশেষ করিয়া হাম্বীরের জন্য।

স্নানান্তে বৈষ্ণবী জল লইয়া ফিরিল। সেই জলে রাধাবল্লভকে স্নান করাইয়া তাঁর পূজা করিল। ঠাকুরকে পিতলেব কৌটার ভিতর মখমলের তোষকে শোয়াইবার সময় বলিল, 'ঠাকুর ছাওয়ালটারে সারাইয়া তোলো।'

পরাশর উঠিল বেলা করিয়া। দিঘির পাড়টা তখন আরো ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'পেরতাপ, ঘাতকদা, এরা গেল কোথায়?'

মোহিনী বলিল, 'আমি ওঠার আগেই তারা চইলা গেছে।'

পরাশর বলে, 'গেছে ত দেখতাছি সবাই। খালি আমাগো কপালেই যাওয়া হবে না।'

বৈষ্ণবী বলিল, 'সবই রাধাবল্লভের লীলা।'

পরাশর বলিল, 'থুইয়া দেন আপনার লীলা। ভারি খ্যামতার গোঁসাই তিনি।'

বৈষ্ণবী ধীরে-ধীরে রাধাবল্লভের নাম আওড়ায়।

...

সারাদিনে আসিল মাত্র দুইটি নূতন দল। পরাশর বলিল, 'পাকিস্তান শেতল হইয়া গেল নাকি?'

যাদবের অবস্থা একইরকম। আগের দিন কুমুদিনী বার্লি দিয়াছিল। আজ বার্লি নাই, যাত্রীদের কাছে চাহিয়া সাবু, বার্লি, এমনকী একটু চিনিও পাওয়া গেল না। মিলিল শুধু মুড়ি।

জলে-ভিজানো সেই মুড়ি খাইতেও যাদবের কষ্ট হয়। কণ্ঠনালীতে আটকাইয়া যায়। পরাশর হাল ছাড়িয়া দেয়। ভিজা মুড়ি গিলিতে যার কষ্ট হয়, হাঁটার কষ্ট সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া?

পরদিন আরো তিন-চারটি দল চলিয়া গেল। নতুন একটিও আসিল না। জায়গাটা ফাঁকা হইয়া গেল। যাদব চাহিল বৈষ্ণবীর গান শুনিতে—'গাও না গৌরীর গানটা।'

বৈষ্ণবী শুনাইল—

'গৌরী হবেন রাধা...'

বার-বার গাহিল।

পরাশর বৈকালের দিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে দিঘির পুবপাড়ে আসে। চারটা পাড়ের মধ্যে এইটাই সুন্দর। দেবদারু অশোক পলাশের ছাওয়ায় ঘেরা, মাঝে-মাঝে ছোটো ঝোপ।

হঠাৎ পুবের মাঠের দিকে চোখ পড়ায় দ্যাখে কতগুলি মড়ার খুলি, হাড়-গোড। শবের উপর শকুনি বসিয়া। কাকে চিলে শবের চোখ ঠোকরায়, নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

পরাশরের মনে প্রশ্ন জাগে, সবই কি বাস্তুহারাদের হাড়গোড়, না আগেও এখানে শ্মশান ছিল, লোকে শব সৎকার করিত?

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। ধীরে-ধীরে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে চলিয়া আসিল।

নির্জন জায়গা। কোণে শ্যাওড়া ঝোপের পাশে ছেলে কোলে একটি নারী ঘুমাইয়া আছে। তার কোমরের নিচের দিকে রোদ, উপরের দিকটা ছায়া। অন্ধকার মুখের উপরই বেশি, মনে হয় কে যেন একটা কালির পোঁচ টানিয়া দিয়াছে।

পরাশরের পায়ের তলায় শুকনো পাতার মরমর শব্দে শিশুটির ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে মায়ের ডান স্তনটাকে কুলপি মালাইয়ের মতন ধরিয়া চুষিতে আরম্ভ করে। দুধ না-পাইয়া কাঁদে, মাথা দিয়া মায়ের বুকে ঢুঁ মারে, চ্যাচায়। মা সাড়া দেয় না। ছেলের কচি হাতের আঘাতে তার একখানা হাত বুকের উপর হইতে নিচে গড়াইয়া যায়। হাত-পা-মাথা কলের পুতুলের মতন কাঁপে।

পরাশর একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দৃশ্যটা তার মনে দোলা দেয়। সে ভাবে, এই-যে কাতারে-কাতারে মানুষ মরণকে এড়াইবার জন্য ভিটাবাড়ি ছাড়িয়া অচিন দেশে চলিল, মৃত্যুকে তারা এড়াইতে পারিল কই? বরং পথে-পথে নূতন শ্মশানের সৃষ্টি করিল।

শিশুটি পরাশরের দিকে কচি দুখানা হাত বাড়াইয়া দেয়, হাত-পা বাড়াইয়া যেন কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

পরাশর আর থাকিতে পারে না, তাকে কোলে তুলিয়া নেয়। শিশুটি সঙ্গে-সঙ্গেই চুপ করে।

তাকে কোলে করিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে-ধীরে ঘোরে। ভাবে শিশুটির মায়ের কথা। আহা, বেচারি ওখানে একা পড়িয়া আছে। পুবের ঐ মাঠই তো ওর যোগ্য স্থান। সেখানে আর পাঁচটা শবের সঙ্গে তাকে রাখিতে পারিলে কী-ভালোই না হইত!

অন্তত পরাশরের আত্মা তাহাতে তৃপ্তি পাইত সন্দেহ নাই।

এই সময় বৈষ্ণবী আসিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি চলেন, আমাগো আস্তানা গুটাইতে হবে।'

'কেন? এত রাত্তিরে?—বলিয়াই পরাশর অদূরে বাস্তুহারাদের দিকে তাকায়। তাদের মধ্যে দ্যাখে একটা ত্রস্ত চাঞ্চল্য। তারা শলা-পরামর্শ করে, গুজুর-গুজুর করে, গাঁটারি-বোঁচকা বাঁধে। মনে হয় এখনই রওনা হইবে।

বৈষ্ণবী বলিল, 'দুইজন লোক শুইনা আইছে, বেশি রাত্রে মুসলমানেরা এখানে চড়াও হবে।'

পরাশর বলিল, 'ওঃ!'

বৈষ্ণবীর পিছু-পিছু সে স্ত্রী-পুত্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহিনী জিনিশ গুছাইতেছিল। পাশে যাদব শুইয়া। সে বাপের দিকে মিটমিট করিয়া তাকাইল। তাব চাহনি প্রশ্ন করিতেছিল, তোমার কোলে কে ও?

মোহিনী যেন রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু পরে সে বলিল, 'ফালাইয়া দেও ওটারে। অর মা কলোরেতে মবছে, সর্বাঙ্গে অর বিষ।

পরাশর চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মোহিনী বলিল, 'নিজের ছাওয়ালেরে পথের কাঁটা কইয়া গাল দিছ। এদিকে কুড়াইয়া আনছ আরেকটা বিষ-কাঁটা।'

'কাঁটাই ত, একশো বাব কাঁটা'—পবাশর কথাটা জোর দিয়া বলার চেষ্টা কবে বটে কিন্তু গলার পর্দা নামিয়া যায়। নিজেব কাজের সমর্থন পাওয়ার জন্য সে বৈষ্ণবীব দিকে তাকায়। বৈষ্ণবীও কোনো কথা বলে না।

পরাশরেব রাগ হয়, মনে হয়, কী-বিচিত্র এই মানুষের মন! পরশু দিন পর্যন্ত এখানে অনেক লোক ছিল, কলেরার বোগীই ছিল কয়েকটি। সবাই ঠাশাঠাশি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস কবিয়াছে।

আজ মানুষ কম, রোগী মোটেই নাই, আছে শুধু শেষ রোগিণীর স্মৃতিচিহ্ন, তার বুকেব মাংসেব এই দলাটুকু। সেটুকুকে এরা ভয় করে, দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়!

মোহিনী স্বামীব মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এবার বলিল, 'বেশ, অরে লইয়াই থাকো।'

পরাশব নীরব।

একটু পরে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি শোনো নাই কিছু?'

'শুনছি ত, কিন্তু এত রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে—'

মোহিনী বাধা দিয়া বলিল, 'আর-সবাই গেলে আমরাই বা থাকুম কী কইরা?'

পরাশর বলিল, 'তাও ত ঠিক।'

সন্ধ্যার আগে দুইজন বাস্তুহারা দক্ষিণের মাঠে বেড়াইতে যাইয়া শুনিয়া আসিয়াছে যে মুসলমানেরা আজ গভীর রাত্রে দিঘির পারে চড়াও হইবে! বয়স্কদের জেরায় তারা পরস্পরবিরোধী কথা বলে বটে, কিন্তু বাস্তুহারারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এখনই এ জায়গা ছাড়িয়া যাইবে।

স্ত্রীর কাছে সব শুনিয়া পরাশর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারা চললেন কোথায়?'

লোকটি উত্তর করিল, 'ভগবান যেখানে নেন। কেন, আপনি যাবেন না?'

'যাবো ত। কিন্তু এই আঁধারে, অচেনা পথে কোন ভরসায় যাবো?'

'থাকবেনই বা কীসের ভরসায়? বরং কিছু দূরে গেলে গ্রাম পাইতে পারি, হিন্দুর গাঁ।'

পরাশর বলিল, 'গাঁ-টা যদি মোছলমানের হয়?'

'দয়ালু মোছলমান থাকলে তাঁরা আমাগো বাঁচাবেন। সবাই ত আর কাঠ মোল্লা না।'

'কিন্তু এখানে যে ঝামেলা হইবো তারই বা বিশ্বাস কী?'

'আমাগো নিজের লোক শুইনা আইছে, বামুনের পায়ে হাত দিয়া তারা কইছে।'

পরাশর বলিল, 'ওঃ।'

প্রায় সবাই তখন তৈরি। বাকি শুধু পরাশরেব মালপত্র গোছানো। মোহিনী সব বাঁধিযা লইতে পারে নাই। পরাশর শিশুটিকে মাটিতে বাখিয়া গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে শিশুটি কান্না জুড়িয়া দিল।

মোহিনী বলে, 'কী-উৎপাতই না জোটাইছো!'

পরাশর কোনো উত্তর করে না। পাশের লোকটি বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি করেন, মশায়।'

মিনিট খানেক যাইতে-না-যাইতেই অপর-একজন বলিল, 'আপনার জন্য সবাই শেষটায় এইখানেই মরুম দেখতাছি। তাছাড়া জোটাইছেন একটা জ্যান্ত বিষ।'

পরাশরের ভারি রাগ হয়।

এই সময় মোহিনী বলিল, 'মালের বোঝার উপর আমি আর বোঝা বাড়াইতে পারুম না কিন্তু।'।

...

যাত্রা শুরু হয়।

পরাশর কাঁধের উপর তোরঙ্গ তুলিয়া নেয়, পিঠে বোঁচকা। এককোলে নেয় যাদবকে আরেক কোলে শিশুটিকে।

ছোটো-ছোটো দশ-বারোটি দল অন্ধকার ভেদ করিয়া চলে। পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে আলো জ্বালে না। তারা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, পা ফ্যালে আলতোভাবে।

পরাশরের বোঝা বেশি, তাই তার চলিতে কষ্ট হয়। সে পিছাইয়া পড়ে। সামনের লোকেরা ডাকে, 'পা চালাইয়া আসেন, মশায়।'

তাদের সঙ্গে দূরত্ব যতই বাড়ে, এই তাগিদও ততই কমিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর শোনা যায় না।

বৈষ্ণবীও আগের লোকদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। পরাশররা মাত্র চারজন, তারা স্বামী-স্ত্রী, যাদব ও নূতন শিশুটি।

পরাশর বরাবরই চুপ করিয়াছিল। সে শুধু একবার বলিল, 'এমন রাধাবল্লভের

জীবটাও চইলা গেল। এরই নাম বরাত।'

মাঝে-মাঝে বাজ-চিল-শকুনি ডানা ঝাপটা দেয়, হুতুম প্যাঁচা ডাকে, শিয়াল হুক্কা-হুযা কবিযা ওঠে। মোহিনীর মনে হয় এই সমস্ত অলক্ষণ কুলক্ষণের কারণ নূতন পথের কাঁটা মা-বাপ হাবা ঐ ছেলেটা। শক্তি থাকিলে সে হয়তো তাকে দিঘির পুবদিকেব মাঠে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত।

দূরে শব্দ হয়, অস্পষ্ট শব্দ—অনেকটা আল্লাহোর মতন।

মোহিনী বলে, 'ঐ ঐ—'

পরাশব ধমক দেয়, 'অত ভয় কীসের? যা হবার তা হবে।'

'হওয়ার আর বাকি রাখছো নাকি কিছু? পথের ঐ কাঁটা জোটাইয়া এখন'—

পরাশর গর্জন করিয়া উঠিল, 'বেশি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস ত বেবাক কটারে ফালাইয়া একদিকে ছুটিয়া যাবো—তোরে, যাদবরে, এই হারামজাদারে। পথের কাঁটা আর একটাও রাখুম না।'

মোহিনী ভয়ে-ভয়ে চুপ করে। তার স্বামীর পক্ষে আজ তাদের এখানে ফেলিয়া যাওয়া এমন-কিছু বিচিত্র নয়, যেমন বিচিত্র নয় ঐ হতভাগাটাকে কুড়াইয়া আনা।

সে যাদবকে ছুঁইয়া নীরবে স্বামীর পাশে-পাশে চলিতে থাকে।

# দূরের মানুষ

## অন্নদাশঙ্কর রায়

সালটা ১৯৪৭। মাসটা অকটোবব কি নভেম্বব। দিনটা বেশ পবিষ্কাব ছিল। কিন্তু বেলা ছোটো হয়ে আসছিল। দার্জিলিং থেকে শিলিগুডিতে নেমে দেখি আকাশ থেকে অন্ধকাব নেমেছে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁডিযেছিল দার্জিলিং মেল। খুঁজে বাব কবলুম আমাব নাম। একটা ছোটো কামবায দুটিমাত্র বার্থ। নিচেবটা আমাব, উপবেবটা খালি। আমি আমাব জিনিশপত্র নামিযে বেখে বিছানা পেতে দখল নিচ্ছি এমন সময একজন বেলওযে কর্মচাবী ও জনা-দুই ইংবেজ এসে উপবেব বার্থটায একটা সুটকেস চাপিযে দিযে গেলেন। তাঁদেব একজন আমাব সহযাত্রী হবেন, তা তো বুঝলুম, কিন্তু কোন জন তা ঠাহব কবতে পাবলুম না।

গাডি ছাডতে তখনো অনেক দেবি। প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘোবাঘুবি কবতে লাগলুম। বিবাট ট্রেন। বহু লোক ফিবছেন। ভিডেব মাঝখানে চেনা মুখও নজবে পডে। কালিম্পং থেকে ফিবছেন শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। তাঁব সঙ্গে ছেলেমেযে ও চাকব। চেনা নামেব কার্ড দেখলুম কযেকটা কামবাব বাইবে আঁটা। কিন্তু মানুষেব সাক্ষাৎ পেলুম না। বোধহয তাঁবাও আমাব মতো ঘুবছেন। কুশল বিনিময কবে, শেযালদায পুনর্দর্শনেব প্রতিশ্রুতি দিযে ও নিযে নিজেব কামবায ফিবছি এমন সময চোখে পডল সেই দুজন ইংবেজ প্ল্যাটফর্মেব একটেবে দাঁডিযে কথা বলছেন ও ধূমপান কবছেন। কাছে আব-কেউ নেই।

ধূমপান বললুম, কিন্তু তাঁদেব ভাবভঙ্গি থেকে অনুমান কববাব যথেষ্ট কাবণ ছিল তাঁবা আব-কিছু পান কবেছেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায কোনো দুজন ইংবেজকে এতটা মশগুল হযে চডা গলায কথা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। বাববাব তাঁবা বিদায নিচ্ছেন, হাতে হাত বাখছেন, হাত নাডছেন। তাবপব আবাব জমে উঠছেন। কথা যেন কিছুতেই ফুবোয না। মনে হলো একবাব কি দু-বাব পবস্পবকে চুম্বনও কবলেন।

অবশেষে ট্রেন চলতে আবম্ভ কবল। তখন তাঁদেব একজন লাফ দিযে গাডিতে উঠলেন, ও অপবজন ঘন-ঘন রুমাল নাডাতে থাকলেন। আমাব সহযাত্রী কিছুক্ষণ বাইবেব দিকে চেযে থেকে তাবপবে দবজাব কাছ থেকে সবে এলেন। আমাব অনুমতি নিযে আমাব পাশে বসে বললেন, "কলকাতা যাচ্ছেন, অনুমান কবি?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

"আমি যাচ্ছি কলকাতা হযে লাহোব। সেখান থেকে বাওলপিণ্ডি।"

কথায কথা বাডে। ভদ্রলোক আমাকে সিগাবেট অফাব কবলেন। আমি সবিনযে প্রত্যাখান কবলুম। মাফ চাইলুম। তখন তিনি একাই ধূমপান কবতে লাগলেন। কই, মনে তো হলো না যে তিনি আব-কিছু পান কবেছেন। দিব্যি প্রকৃতিস্থ ভাব। পানীযেব গন্ধ নেই।

আমি অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছি তাঁর হাবভাব, আঘ্রাণ করছি শুধু সিগারেটের গন্ধ, আর চিন্তা করছি যা দেখেছি তার তাৎপর্য কী। এমন সময় তিনি আপনা হতে বললেন, "সকাল বেলা আমি শিলিগুড়িতে নামলুম। সন্ধ্যাবেলা শিলিগুড়ি ছাড়লুম। এই বারো ঘণ্টা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লুম "হাঁ, দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা চিরস্মরণীয় বটে।"

"না, না। আমি সে-কথা ভেবে বলিনি।" তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দার্জিলিং যাইনি। এমনকী, দার্জিলিং শহরটাই দেখা হয়নি।"

"তাহলে—" আমি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালুম।

"তাহলে?" তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "আমাকে যিনি বিদায় দিতে এসেছিলেন তিনি আমার দাদা। বিশ বছর আমাদের দেখা হয়নি। এবারেও হতো না, যদি-না খুব-একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত।"

বলতে-বলতে তাঁর কথাব সুরে উত্তেজনার আমেজ এলো। যেন এত-বড়ো একটা অভিজ্ঞতা তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবার মতো হয়েছে।

"শুনবেন?" আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না-করে তিনি বলে চললেন, "সকালে যখন শিলিগুড়িতে নামি তখন কেবল এইটুকু জানতুম যে আমার দাদা থাকেন দার্জিলিং জেলার কোনো-এক চা বাগানে। চা বাগানের নাম জানিনে। কী করে যেতে হয় সেখানে তাও আমার অজানা। হাতে সময়ও নেই। আজকের ট্রেনে না-ফিরলে আবার ছুটি ফুরিয়ে যায়। টেলিগ্রাম করে ছুটি বাড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। রাওলপিণ্ডি এখন অন্য রাষ্ট্রে। তা ছাড়া মিলিটারি কর্তারা এ-সব ক্ষেত্রে ছুটি বাড়িয়ে দেন না, বরং শাস্তির ব্যবস্থা করেন। সেইজন্যে বলছিলুম, দাদার সঙ্গে এবারেও আমার দেখা হতো না, যদি-না খুব-একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত। আগেই বলেছি বিশ বছর আমাদের দেখা হয়নি।"

তারপরে তিনি শোনালেন কেমন করে তাঁর দাদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। "ভাবলুম দার্জিলিং শহরে গিয়ে সেখানকার প্ল্যান্টারদের ক্লাবে খোঁজ করা যাক। তাহলে অন্তত দাদার ঠিকানাটা পাওয়া যাবে। অন্তত তিনি জানবেন যে আমি তাঁর জন্যে এত-দূর এসেছিলুম। এবার দেখা না-হলে আবার কবে দেখা হতো কে জানে। আমাদের রেজিমেন্ট দু-মাসের মধ্যে ভারত ছাড়ছে। আর এ-দেশে ফিরবে না। আমরা ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা চিরকালের মতো ভারত ছেড়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের চান না।"

ওটুকু অভিমানের কথা। আমি ভদ্রতা করে বললুম, "এর ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চিরকালের মতো মধুময় হবে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আর আমাদের ঝগড়া নেই।" তিনি আবার পূর্ব প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। "এবার দেখা না-হলে আর হতো না অনেক দিন পর্যন্ত। কে জানে হয়তো

আরো বিশ বছর। আমরা ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই। ছুটি পেলে দেশে যাই, দার্জিলিং বা কলকাতা আসা হয়ে ওঠে না। দাদা যখন ছুটি নিয়ে দেশে যান তখন আমি হয়তো ছুটি পাইনে। এবার ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিনা, দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে কলকাতা এলুম মা-র সঙ্গে দেখা করতে। তিনি থাকেন কলকাতায়, দাদা থাকেন চা বাগানে। কিন্তু এমনি ব্যস্ত আমি, দাদার ঠিকানাটা মা-র কাছ থেকে নিয়ে টেলিগ্রাম করে আসতে খেয়াল হয়নি। শিলিগুড়িতে নেমে খেয়াল হলো যে ঠিকানাটা আমাব কাছে নেই, মা-র কাছেই রয়ে গেছে। কী মুশকিল!"

তিনি তাঁর কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, ট্যাকসিওয়ালাকে বললুম, চলো দার্জিলিং। ট্যাকসি চলল। আগে কখনো এ-দিকে আসা হয়নি। বেশ লাগছিল আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে উঠতে। চা গাছ দেখলেই মনে হচ্ছিল এইবার দাদার বাগান আসছে। কে জানে হয়তো হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারপর হলো কী, শুনবেন? উলটো দিক থেকে একখানা মোটর আসছিল। সরু অপরিসর রাস্তা। মোটরখানা যেই আমার পাশ দিয়ে যাবে আমি সংকেত করে বললুম, একটু থামুন। আমার ট্যাকসিওয়ালাকে বললুম থামতে। মোটরের আরোহী ইউরোপীয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, ভাগ্যক্রমে আপনি কি জর্জ হাচিনসন নামে চা বাগানেব কোনো সাহেবকে চেনেন? তিনি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলে উঠলেন, কে ও-কথা বলছে? জ্যাক? অপরিচিতের মুখে নিজের নাম শুনে আমি ভালো করে চেয়ে দেখলুম। এ কি কখনো সম্ভব যে এই লোকটি আমার দাদা? লোকটিও আমাকে ভালো করে দেখছিলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমারও। দুজনেই গাড়ি থেকে নামলুম। নেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলুম। কে জানে কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। তারপর অপরের হর্ন শুনে চৈতন্য হলো। জর্জ আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর চা বাগানের দিকে চললেন। ট্যাক্সিকে বকশিস দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁর বাগানে গিয়ে সারা দিন হৈ-হৈ করে কাটিয়ে দিলুম। এখনো মনের ভিতর তার জের চলছে। আমরা যেন বিশ বছর আগে ফিরে গেলুম। জর্জ আর আমি। তাঁর বৌ অতি চমৎকার মেয়ে। তাঁর বাচ্চারাও কী আনন্দময়। কিন্তু আমাকে পেয়ে জর্জ ওদের ভুলে গেলেন। শুধু ভাই আর ভাই। ভ্রাতৃগত প্রাণ। বলতে পারেন জগতে ভ্রাতৃস্নেহের মতো আর-কী আছে? এইটেই বোধ হয় একমাত্র সম্পর্ক যেটা ষোলো আনা নিঃস্বার্থ।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। মনে অনেক কথাই জমছিল, কিন্তু হৃদয়ভার হালকা করার মতো অন্তরঙ্গতা তখনো গড়ে ওঠেনি।

বললুম, "তারপর?"

"তারপর?" তিনি স্মরণ করে বললেন, "তারপর আমার বিদায়ের সময় আসন্ন হলো। জর্জ জানতেন এটা অবশ্যম্ভাবী। ছুটি বাড়িয়ে নেবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। আমাকে খুশি করাই হলো তাঁর একমাত্র ধ্যান। স্ত্রীকে আমার জন্যে কিছু করতে দিলেন না, নিজে সমস্ত করলেন। চায়ের পট থেকে চা ঢেলে দিলেন তিনি স্বয়ং। সঙ্গে দিলেন বাগানের

বাছাই-করা সেরা চা পাতা! নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন শিলিগুড়িতে। স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে ভালো জিনিশ যা-কিছু পাওয়া যায় অর্ডার দিয়ে আমাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। আমি যে বিশ বছর পরে এসেছি, বিশ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবো এই ভাবনাই তাঁকে অস্থির করেছিল। আমি জানতুম আমার নিয়তি আমাকে টানছে, সেইজন্যেই অতটা অস্থির হইনি। নইলে আমিও কিছু কম সেন্টিমেন্টাল বোধ করিনি। জগতে ভ্রাতৃস্নেহের মতো আর-কিছু কি আছে? মাই ব্রাদার! ও মাই ব্রাদার!"

ভদ্রলোক নিঃস্পন্দ হয়ে আবেগ দমন করতে লাগলেন।

আমিও নিশ্চল হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর ভাবছিলুম। ভ্রাতৃস্নেহের মতো কিছু কি আর আছে? তাই যদি হবে তবে আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ এমন করে আলাদা হয়ে গেলুম কেন? শুধু কি আলাদা হওয়া? লক্ষ-লক্ষ ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে, হাজার-হাজার বোন ভাইয়ের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। হা বিধাতা! ইংরেজ আমাদের ভাই নয় পর। সে কি কোনো দিন এমন শত্রুতা করেছে?

বললুম, "ভাইয়ের মতো বন্ধু আর নেই। ভাইয়ের মতো শত্রুও আর নেই।"

তিনি চমকে উঠে শুধালেন, "কী মনে করে ও-কথা বলছেন?"

যা ভাবছিলুম তা খুলে বলতে হলো। একই পরিবারে এক ভাই শিখ হয়েছে, আরেক ভাই মুসলমান, আরেক ভাই হিন্দু জাঠ বা রাজপুত। এ-রকম দৃষ্টান্ত একটা-দুটো নয় শত-শত সহস্র-সহস্র। সাতশো বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। তথাপি—

তিনি বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "বুঝেছি আপনার ব্যথা। পাঞ্জাবে থাকি, দেখেছি তো সব নিজের চোখে। ওঃ, এমন বীভৎসতা আমি জীবনে দেখিনি। বিশ্বাস করুন আমাকে, পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে আমি লড়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা আমি হাড়ে-হাড়ে জানি। কিন্তু পাঞ্জাবে যা দেখলুম তার তুলনাই হয় না। একেবারে অন্য জিনিশ।"

তাঁর মুখে শুনলুম চোদ্দই অগাস্টের পরবর্তী ইতিহাস। সে অনেক কথা! সব মনে নেই। মনও তো সব কথা সঞ্চয় করতে রাজি হয় না। এত স্থান কোথায়! তা ছাড়া যা বিষাক্ত, যা হিংস্র, তার প্রতি আমার মন স্বতঃ বিমুখ।

বললেন, "একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনুন। এটাতে আমার কিছু দোষ ছিল। তার জন্যে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। আমাদের রেজিমেন্ট আর দু-মাসের মধ্যে করাচিতে জাহাজ ধরে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আগে থেকে হিশাব-নিকাশ করে পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে। সে-ভার পড়েছে আমার উপর। কয়েক মাস ধরে আমি খাটছি। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন লোক বেশি নেই। সেইজন্যে আমি হীরালালকে ছেড়ে দিতে রাজি হইনি। চোদ্দই অগাস্টের দু-এক দিন আগে সে এসে আমাকে বলল, শুনছি ভীষণ কাণ্ড হবে। পাকিস্তানে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না। আমাকে ছুটি দিন, সময় থাকতে আমি হিন্দুস্থানে চলে যাই। আমি বললুম, হীরালাল, তুমি যদি আমাকে সাহায্য না-করো আমার হিশাব-নিকাশ করা হবে না। সময় থাকতে আমি ভারত ছাড়তে পারবো

না। রেজিমেণ্ট আটকা পড়বে। আমাদের হাইকমাণ্ড তা সহ্য করবে না। হীরালাল, তোমাকে আমি অভয় দিচ্ছি। আমি থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। কাজ সারা হলে আমি স্বয়ং তোমাকে নিরাপদে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসবো। সে বিশ্বাস করল আমার কথা। কিন্তু তার পরিবারের লোক বিশ্বাস করল না। করবে কী করে। চোদ্দই অগাস্টের দিন থেকে যে-সব কাণ্ড ঘটতে থাকল সে-সব তো তাদের চোখের উপরেই। তারা হীরালালকে এক মুহূর্ত শান্তি দিল না। হীরালালও দিল না আমাকে। একদিন সে এসে আমাকে বলল, একটা কন্‌ভয় যাচ্ছে কাশ্মীর। কাশ্মীরে আমাদের স্বজন আছে। অনুমতি দেন তো আমরা সেই কনভয়ের সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করি। একবাব সেখানে যদি পৌঁছুতে পারি তাহলে আমরা নিরাপদ। আমি বললুম, আচ্ছা, কিন্তু একটি শর্তে। তুমি নিজে তাদের সঙ্গে যাবে না। সে তা শুনে দুঃখ পেলো। কিন্তু রাজি হয়ে গেল। কন্‌ভয় রওনা হলো পরের দিন ভোরবেলা। দুপুরেব দিকে আমার কাছে খবর এলো—ওঃ, সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার!"

তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে অক্ষম হলেন। তাঁর মুখের উপর করাল কালো ছায়া।

আমাদের গাড়ি দাঁড়াল জলপাইগুড়িতে। লোকজনের শোরগোল শুনে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। ধীরে-ধীরে তাঁর ভাষা ফিরল। কালো ছায়াটা সরে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তারপরে কী হলো?"

"তারপরে খোঁজ নিয়ে জানতে পাই কন্‌ভয়ের অবশিষ্ট চল্লিশ-পঞ্চাশ জন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। প্রাণ ছাড়া বিশেষ-কিছু বাকি ছিল না তাদের। এমন জখম হয়েছে যে ডাক্তারের অসাধ্য। কন্‌ভয়ে ছিল প্রায় দুশো জন হিন্দু ও শিখ। তাদের বেশির ভাগ স্ত্রীলোক ও শিশু। মিলিটারি এসকর্ট ছিল সঙ্গে। প্রায় মাইল সাত-আট যাবার পর তারা দেখতে পায় পথের দু-পাশের গ্রাম থেকে কুড়ুল আর বেলচা আর অন্যান্য হাতিয়ার হাতে মুসলমানরা আসছে। ফায়ার করে কোনো ফল হলো না। বরং তাদের রোখ বেড়ে গেল। কন্‌ভয়কে থামিয়ে তারা এমন বেপরোয়াভাবে খুন-জখম চালালো যে মিলিটারি এসকর্টকে দস্তুরমতো বেগ পেতে হলো। তারা পিছু না-হঠলে কচুকাটা হতো। পিছু হঠতে-হঠতে তারা অবশিষ্ট জীবিতদের নিয়ে রাওলপিণ্ডি পৌঁছোয়। এর জন্যে ডেপুটি কমিশনার বিশেষ অনুতপ্ত। তাঁরই তো দায়িত্ব। চমৎকার মানুষ, মিস্টাব। —মুসলমান হলে কী হয়, সাম্প্রদায়িকতার ধার ধারেন না।"

ডেপুটি কমিশনারের প্রশংসা চলল। ভুলে গেলেন হীরালালের কন্‌ভয়ের কথা। মনে করিয়ে দিতে হলো।

"হাঁ, যা বলছিলুম। বেচারা হীরালালের সে-কী কান্না। তার মা সাংঘাতিক আহত। মাথার খুলি দ্বিখণ্ড হয়েছে কুড়ুলের আঘাতে। তার বৌদিদি মারা পড়েছেন। বৌদিদির শিশু সন্তানরাও বাঁচেনি। বলল, সাহেব, তোমার জন্যেই আমার পরিবারের লোকের এ-দশা। তুমি যদি আমাকে যেতে দিতে তাহলে কি এমন হতো! আমি বললুম, হীরালাল, তোমাকে আমি যেতে দিইনি বলেই তুমি ও-কথা বলবার জন্যে বেঁচে আছো। নইলে

তুমিও কাটা পড়তে। বরং আমার অনুতাপ হচ্ছে এ-কথা ভেবে, কেন আমি তোমার আত্মীয়দেরও আটক করিনি, কেন তোমার অনুরোধ শুনে তাদের যেতে দিয়েছি। হীরালাল, যাও, তোমার কর্তব্য করো। পুরুষের জীবনে অন্য কাজ আছে। কান্নাকাটি করা পুরুষের কাজ নয়। চলো, তোমার মা-র চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে দেখা যাক। অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাও দেখতে হবে। তোমাকে আমি কথা দিয়েছি। যথাসময়ে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেবার ভার আমার। ডেপুটি কমিশনারকে সে-ভার দেবো না। মাসখানেক পরে আমি নিজে এরোপ্লেনে করে তাকে দিল্লি পৌঁছে দিয়ে এলুম। ওহ্! তখন তার কী আনন্দ।"

আমি জানতে চাইলুম রেলপথ এখনো খোলা আছে কি না।

ট্রেন ততক্ষণে জলপাইগুড়ি ছেড়ে আবার দৌড় দিয়েছে। খেয়াল ছিল না কখন। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, "না, মাঝখানে কতক রাস্তা নিরাপদ নয়। এক রাজ্যের ট্রেন আরেক রাজ্যে প্রবেশ করে না। আকাশপথেই যাতায়াত চলছে। আমিও আকাশপথেই ফিরবো।"

আমি বললুম, "আমরা কিন্তু রেলপথেই যাতায়াত করছি। এই ট্রেন পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে কলকাতা যাবে। বোধহয় ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। ভাবতে খারাপ লাগে যে এটা এখন পররাজ্য।"

"এদিকে যে ট্রেন চলছে এই-একটা সৌভাগ্য। ওদিকে তো ট্রেনই ভালো করে চলছে না। চলবার মধ্যে চলছে শরণার্থী স্পেশাল ট্রেন। তাতে গর্ভনমেণ্টেব লাভ নেই। যাতে লাভ হয়, যেমন প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গুডস ট্রেন, এ-সব ট্রেন চললে তো রেললাইন চালু রাখা পোষাবে। প্রথম মাসে একখানাও ট্রেন রাওলপিণ্ডি দিয়ে গেল না। শরণার্থীদের স্পেশাল ট্রেন বাদ। দ্বিতীয় মাসে গেল একখানি মাত্র মালগাড়ি। অমন করে কি একটা রাজ্য চালানো যায়? রাজ্য চলে ব্যবসাবাণিজ্যের আয়ে।"

আমি এত-কথা জানতুম না। বিস্মিত হয়ে বললুম, "তাহলে আপনারা দরকারি জিনিশপত্র পাচ্ছেন কী করে?"

"পুরোনো কিছু ছিল। তাতেই কোনোরকমে চলছে। বাজারের উপর নির্ভর করলে অচল হতো।"

"আপনাদের কিছু আছে। কিন্তু সাধারণের তো নেই। তাদের অবস্থা?"

"তাদের অবস্থা অনিশ্চিত। দুধের দরকার হলো, ভাঁড় হাতে চলল দেহাতে। গিয়ে বলল, ও ভাই, দিতে পারো এক পোয়া দুধ? শহরে বসে থেকে সকালে-বিকেলে দুধ পাবে, সে-ভরসা নেই। চায়ের দুধের জন্যে শহরের বাইরে যেতে হবে।"

আমি বললুম, "এ-তো বেশ মজা।"

তিনি বললেন, "মজা। মজার কথা যদি শুনতে চান তো আমার একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। আমাদের ব্রিগেডিয়ারের বেয়ারা থাকে আপনাদের এই বাংলাদেশে। পূর্ববঙ্গে না পশ্চিমবঙ্গে, ঠিক জানিনে। মনিঅর্ডার করে তাকে একশো টাকা পাঠাতে চাইলেন

শেষ দান হিশাবে। ডাকঘরে মনিঅর্ডার নিল না। রাওলপিণ্ডি থেকে যখন দিল্লি আসি তখন ব্রিগেডিয়ার আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন দিল্লি থেকে মনিঅর্ডার করতে। দিল্লিব ডাকঘরে মনিঅর্ডারের ফর্ম পূরণ করে যেই নোটখানা বাড়িয়ে দিলুম অমনি ওবা বলল, এতে লাহোর ছাপা রয়েছে। এ-নোট এ-রাজ্যে অচল। অন্য নোট থাকে তো দিন। অন্য নোট যা ছিল তা আমার পাথেয়। মনিঅর্ডার করা হলো না দিল্লিতে। সেদিন দমদমে নেমে কাছেই একটা ডাকঘরে গেলুম আপদ বিদায় করতে। ছোটো ডাকঘর। কেরানি হয়তো অত খোঁজ খবর রাখে না। হয়তো নোটখানা রাখবে। বেশ খাতির কবে একখানা মনিঅর্ডার ফর্ম দিল আমার হাতে। আমিও বেশ খাতির করে বললুম, এই মনিঅর্ডারখানা দয়া করে পাঠিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক।"

আমি কৌতূহলী হয়ে শুধালুম, "তারপরে?"

"তারপরে বাড়িয়ে দিলুম সেই একশো টাকার নোটখানা। ছোটো মানুষটি সেখানা নিয়ে আরেকজনকে দেখাল। তিনি বোধহয় ডাকঘবের ব্রিগেডিয়াব। উঠে এসে বললেন, খুব দুঃখিত হলুম। এ-নোট তো এ-বাজ্যে চলবে না। আমি অপ্রতিভ হয়ে নোটখানা পকেটস্থ কবলুম। তারপরে সেখানাকে পাস করার জন্যে আরো দু-এক জায়গায় চেষ্টা করেছি। কেউ সেখানা ভুলেও নেবে না। এই হলো আপনার দেশ ভাগ করার মজা। কৌতুকটা আমার মতো বিদেশী মানুষের উপর দিয়ে না-হলেই ভালো হতো। এখনো সেখানা আমার পকেটে ঘুবছে। কাল কলকাতায় পৌঁছেই সেটার একটা সদগতির উপায় খুঁজতে হবে। নয়তো চলল ফিরে আমার সঙ্গে রাওলপিণ্ডি। ব্রিগেডিয়ার অবশ্য খুশি হবেন না। ভাববেন আমারই গাফিলতি। সময় থাকলে বেয়ারাকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় আনিয়ে তার হাতে নোটখানা গুঁজে দিতুম। আপনি একটা পরামর্শ দিতে পারেন?"

আমি তাঁকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করতে পরামর্শ দিলুম। তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর আমাদের গল্পগুজবের পুঁজি ফুরিয়ে এলো। রাতও হয়েছিল। কাপড় ছেড়ে যে যার বার্থে গা মেলে দিলুম। দুজনেই ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি সেটা রানাঘাট স্টেশন। কখন একসময় পাকিস্তান অতিক্রম করে এসেছি। আর ঘুম এলো না। ভোর হলো। রাতের পোশাক ছেড়ে দিনের পোশাক পবলুম। কোনোমতে দাড়ি কামিয়ে নিলুম। তিনিও তৈরি হলেন। তারপর আবার আমার বার্থে আমার অনুমতি নিয়ে বসলেন। দিনের বেলা যদিও অনুমতির আবশ্যক করে না।

"তাহলে চললেন আপনি রাওলপিণ্ডি?" বিদায়ের সুরে বললুম।

"হ্যাঁ, কলকাতা থেকে দিল্লি। সেখান থেকে লাহোর হয়ে রাওলপিণ্ডি। কিন্তু একটা ভয়ের কথা শুনছি। কাল আপনাকে বলতে ভুলে গেছি যে দিল্লি লাহোর এরোপ্লেন সার্ভিস বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে আজকালের মধ্যে। তা যদি হয় তাহলে আমাকে স্পেশাল প্লেন ভাড়া করতে হবে। তাও পাবো কি না কে জানে। দিল্লিতে আটকা পড়বো কি না ভাবছি।"

# আঙিনা বিদেশ

## অন্নদাশঙ্কর রায়

অসুখেব খবর শুনে অধিবথ একদিন দেখতে আসে। বলে, "বৌদি, দাদাব নাকি অসুখ। কী হয়েছে। কেমন আছেন।"

"জ্বব। বেশি নয়, কিন্তু থেকে-থেকে বলে উঠছেন—কী বলছেন তা তুমি ওঁর ঘবে গেলেই শুনতে পাবে। কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না। বেশি কথা বলতে দিয়ো না। ডাক্তারেব বারণ।" বৌদি সংসারের কাজে মন দেন।

অধিরথ দাদার শোবাব ঘরে ঢুকে দ্যাখে তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পায়েব শব্দ শুনে চোখ মেলে বলেন, "কে! অধিরথ! ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।"

অধিরথ ঠাওরায় ওটা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ। কিন্তু দাদাব কপালে হাত দিলে বোঝা যায় সামান্য গরম। অত কম টেম্পারেচারে কেউ প্রলাপ বকে?

"কেমন বোধ করছেন, দাদা। আমি তো দেখছি জ্বর খুব কম।" অধিরথ বলে।

"ঘুষঘুষে জ্বর। আসছে আর যাচ্ছে। ছাড়ছে না। সেইজন্যেই তো ভাবনা। কিন্তু ভেবে ফল কী? ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।" দাদা অধিরথের হাতে হাত রাখেন।

অধিরথ আশ্বাস দিয়ে বলে, "সেরে যাবে।"

"তা তো যাবেই। সেইজন্যেই তো বলি, ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।"

"ওর মানে কী হলো, দাদা!" অধিরথের ধাঁধা লাগে।

"কেন, ও তো সোজা ইংরেজি। ফ্রেট মানে কী তা কে না জানে আর পমফ্রেট যদি না-খেয়ে থাকিস তবে বলি, ওটা একরকম সমুদ্রের মাছ।"

"হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশ লাগে। কিন্তু ফ্রেট না-করে পমফ্রেট খাবো কেন? আরো তো পাঁচরকম মাছ আছে।" অধিরথ তর্ক করে।

"দূর, বোকা! ওটা-যে একটা মন্ত্র।" দাদা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

"মন্ত্রেরও তো একটা সংলগ্নতা থাকে। না এটাও একটা হিং টিং ছট!" অধিরথ কৌতূহলী হয়।

দাদা এবার বালিশে হেলান দিয়ে বসেন। বলেন, "পমফ্রেট নামে একটা সমুদ্রগামী লঞ্চ ছিল। আমার জীবনে তার নাম চিরস্মরণীয়। যখনি অকূল পাথারে পড়ি, কূলকিনারা দেখতে পাইনে তখনি মনে পড়ে যায় ওর নাম। সেবারে যেমন অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাই এবারেও তেমনি পাবো, এই ভেবে মনটাকে শক্ত করি। হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে? ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।"

"হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে?" অধিরথ কাতরভাবে বলে, "বাংলাদেশ যার নাম রাখা হয়েছে সেখানে বাঙালি বলে কেউ থাকছে কি? হয় পালিয়ে আসছে

নয় গুলি খেয়ে মরছে। শুনছি দেড় কোটি লোক না-খেয়ে মরবে।”

ভদ্রলোকের এক কথা। “ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট। হতাশারও শেষ আছে।”

“আর এপারেও তো মানুষ বলে কেউ থাকছে না। হয় ক্রিমিনাল, নয় কাওয়ার্ড। হতাশ হবো না তো কী হবো, দাদা?” অধিরথ করুণস্বরে বলে।

“তবু আশা রাখতে হবে। ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।” দাদা অভয় দেন।

“বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা?” অধিরথ দুঃখ করে। “দিল্লি গিয়ে দেখি পদে-পদে ঘুষ, পদে-পদে খোশামোদ। কেউ ফেলছে কড়ি, কেউ মাখাচ্ছে তেল। দিল্লি, সেই মোগল রাজত্বের শেষভাগের দিল্লি।”

“ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।” বলে দাদা আবার এলিয়ে পড়েন। বোঝা গেল তাঁর আবার মনে লেগেছে। তাপ বেড়ে যাবে না তো!

“থাক, দাদা, ও-সব পরে হবে। আগে তো আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। দিন সাতেক বাদে আবার আমি আসছি। তখন পমফ্রেটের গল্পটা শোনাবেন। শুনতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে।” অধিরথ আর ওঁকে বেশি কথা বলতে দিতে চায় না।

“সমস্তটা যদি বলতে যাই অফিসিয়াল সীক্রেট ফাঁস হতে পারে। যদিও দেখছি রুই-কাৎলারা সরকারের হাঁড়ির খবর ছড়াচ্ছেন, কারো গায়ে আঁচই লাগছে না। আমরা চুনোপুঁটি, তবু ইতিহাসের একটি গুরুত্বসম্পন্ন সন্ধিক্ষণে গুরুভার বহন করতে মনোনীত হয়েছি।” দাদা আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন।

পরে একদিন দাদা পমফ্রেটের কাহিনী শোনান।

## দুই

আমাদের জীবনে ওই তিনটি বছরের তুলনা নেই। উনিশশো ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ আর আটচল্লিশ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে আমি শুধু সাক্ষী বা সাক্ষীগোপাল। রঙ্গমঞ্চে আমার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু সাতচল্লিশ সালের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল, ফতেয়াবাদ জেলার শাসনকর্তা করে আপনাকে পাঠানো হচ্ছে। “না” বলবেন না। আমরা আর লোক খুঁজে পাচ্ছিনে।

ফতেয়াবাদ চিরকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, তেমনি তার পার্শ্ববর্তী ননদিয়া, তেমনি তার অপর পারের রানিমহল। ইদানীং ওদের মাঝখানে একটা লাইন টেনে বলা হয়েছে এর নাম আন্তর্জাতিক সীমান্ত। তাই বর্ডার জুড়ে অশান্তি।

তা ছাড়া রাম রহিমের বিবাদ তো আছেই। এতদিন আমরা বলতুম ওটা তৃতীয় পক্ষের কারসাজি, এখন রাম বলে ওটা রহিমের শয়তানি আর রহিম বলে ওটা রামের দুশমনি। যেন নিজের কোনো দোষ নেই। যেন একহাতে তালি বাজে।

তোর বৌদির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কলকাতা ছাড়তে, আঠারো বছর চাকরির পর এই প্রথম আমরা কলকাতায় থাকবার সুযোগ পেয়েছি, এখনো গুছিয়ে বসতে পারিনি, মাত্র চার মাস কাটিয়েছি। আবার বদলী! কিন্তু আমার ইতিহাসবোধ আমাকে

মন্ত্রণা দেয় যে, অ্যাকশান যদি দেখতে চাও তো এই তোমার সুযোগ। তুমিও একজন অ্যাকটর। তুমি নিষ্ক্রিয় দর্শক বা সমালোচক নও।

প্রত্যেকটাই আমাব পুরোনো জেলা। যেমন ফতেয়াবাদ তেমনি ননদিয়া তেমনি রানিমহল। আমাকে না-চেনে কে? আর আমিই বা কাকে না-চিনি? মিলনের দূত আমি ছাড়া আর কে হতে পারে? যাই যখন তখন এই ছিল আমার স্পিবিট। আমি যুদ্ধ করতে যাইনি, সন্ধি করতেই গেছি। রানিমহলের যিনি শাসক তিনি আমারই সিনিয়ব ডেপুটি ছিলেন, দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আর ননদিয়াব শাসকও একদা আমার সহযোগী ছিলেন। যদিও তেমন ঘনিষ্টতা ছিল না।

দেখলুম কেউ আর কাউকে এক দেশেব লোক বা আপনাব লোক বলে ভাবে না। "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" এপারেব লোকের কাছে ওপাবের লোক বিদেশী। ওপারের লোকের কাছে এপাবের লোক বিদেশী। সেই একই জেলা, সেই একই মানুষ, তবু অদ্ভুত এক ভানুমতীর খেল : একদলকে বানিয়েছে আরেকদলেব চোখে বিদেশী।

"সাব, আপনি ওপারের লোকের সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। ওরা বিদেশী। ওরা তো এই জেলাটাকে পাকিস্তানের শামিল কবতেই চেযেছিল, এখানে মুসলমান বেশি কিনা। প্রথমে তো ওদেব ভাগেই পড়েছিল। সে-সময ওদেব মূর্তি যদি দেখতেন! আব এখানকার মুসলমানদের ফূর্তি! সব পঞ্চম বাহিনী। একজনকেও বিশ্বাস নেই। প্রত্যেকের ধারণা এ-জেলা আবার পাকিস্তানেব শামিল হবে। তলে-তলে চক্রান্ত চলেছে। জানেন সার, রোজ রাত্রে এ-শহরে ওপারের ট্রাক আসে, মালপত্র পাচার করে নিয়ে যায়।" পুলিশ অফিসার বলেন।

ফতেয়াবাদ যেন আমাদের আলসাস লোরেন। একবার জার্মানি নেয় তো একবার ফ্রান্স ফিরে পায়। তাই নিয়ে মন কষাকষির বিরাম নেই। কেউ মন থেকে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।

দেশভাগের পর যেমন দু-দল বিদেশীর তথা পঞ্চম বাহিনীর আবির্ভাব হয তেমনি মাল পাচারকারীর। হিন্দু-মুসলমান একদিল হয়ে নতুন একটা ইণ্ডাস্ট্রি পত্তন করে। এমন তাদের কর্মকৌশল যে ওপারেব মুসলমান এপারের হিন্দুকে সিগন্যাল দেয় আর এপারের হিন্দু ওপারের মুসলমানকে সিগন্যাল দেয়। দেশ ভুলে, ধর্ম ভুলে দু-পক্ষই দুই রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে সিঁদ কাটে। বাতের বেলাই ওদের কর্মতৎপরতা।

একদিন পদ্মাতীরে রাত কাটিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম তাদের সিগন্যালের বাতি। সঙ্গে-সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দেয়। তখন হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই। হিন্দি পাকি ভাই-ভাই। ধরতে পাবে কার সাধ্য। ধরা কারই বা স্বার্থ। সরষের ভিতরেই ভূত। একজন কর্তাব্যক্তি বলেন, "আমরা কাপড় না-জোগালে ওরা কাপড় পরবে কী করে? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু। শাড়িই তো যাচ্ছে বেশির ভাগ।"

চালের বেলাও সেই একই যুক্তি। "আমরা চাল না-জোগালে ওরা খাবে কী? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু।" এমনি প্রত্যেকটি বিষয়ে।

এদিকে আবাব তারস্বরে চিৎকার। চাল পাওয়া যায় না, চিনি পাওয়া যায় না, কাপড়ের দাম আগুন। জোগাতে যদি না-পারি তো ধর্মঘটের হুমকি। কয়েকটা অর্ডিনান্স তখনো বলবৎ ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে নয়। আমরা বেগতিক হয়ে এই পরিস্থিতিতেও প্রযোগ করি। তখন ব্যাবসাদারদের কোপদৃষ্টিতে পড়ি। কেউ-কেউ তো খোলাখুলি শুনিয়ে দিযে যান যে বলবেন নিদান রায়কে।

একদিকে চক্রান্ত, আরেকদিকে কুচক্র। মাঝখানে আমি। দিনরাত ভূতের মতো খাটি। আর খাটাই। সত্যি আমার সবকারি সহযোগীদের তুলনা হয় না। ভারত পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁদের অনেকের মতভেদ ছিল। কিন্তু আমার নির্দেশে তাঁরা শিরোধার্য করতেন। কী জানি কেন আমাব উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল। উপরওয়ালাদের বেলা কিন্তু আমি অতটা নিশ্চিত ছিলুম না।

আসলে হয়েছিল এই যে দিল্লিতে কবাচিতে একপ্রকার দাবাখেলা চলেছিল, তার জের কলকাতায় আর ঢাকাতে। তারই জের ফতেয়াবাদে আর রানিমহলে। আমরা নিমিত্তমাত্র। তবু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো ছিল। সেটা আমি প্রাণপণে গার্ড কবেছি। একেবারে বোড়ে বনে যাইনি।

একদিন সীমান্ত পরিদর্শনে যাই। সঙ্গে পুলিশম্যান। দুজনের চোখে বাইনোকুলার। দেখতে পাই ওপারে রানিমহল শহর। আমার পুরাতন কুঠি। চোখে জল আসে।

"দেখছেন, সার, দেখছেন। কুঠির গেটের দু-ধারে দুটো কামান বসিয়েছে। গোলা ছুঁড়লে এপারেও বসে পড়বে। পদ্মা যদিও খুব চওড়া তবু কামানের পক্ষে কিছু নয়। এর একটা উত্তর দিতে হবে। আমাদেরও কামান থাকা চাই।"

তখন কি ছাই জানতুম যে ও-দুটো মোগল আমলের কামান। সাজিয়ে রাখা হয়েছে শখ করে। কিন্তু কথাটা সিরিয়াসভাবে নিই।

এর পরে শোনা গেল যে ওদের একখানা লঞ্চ আছে। লঞ্চে করে এক বিহারী মুসলমান অফিসার প্রতিদিন নদীবক্ষে পাহারাদারি করে বেড়ান। আমাদেব সওদাগরি নৌকা চলাচলে বাধা দেন। একে আটকান, ওকে পাকড়ান, তাকে চালান দেন। তাঁর মতে ওটা পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত নদীস্রোত।

নদীর মাঝখান দিয়ে দুই জেলার সীমান্তরেখা ছিল, এখন সেটা হয়েছে দুই রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা। মানচিত্র মেনে চললে নদীর যে-অংশে লঞ্চ যাতায়াত করে, স্টীমার যাতায়াত করে, যেটা বর্তমান মুখ্যস্রোত বলে গণ্য তার সবটাই আমাদের এলাকা। আমাদের এলাকায় আমাদেরি নৌকা আটক করবে এ তো একপ্রকার আক্রমণাত্মক কর্ম।

চিঠি লিখে জবাব পাওয়া গেল যে, ওঁদেব মতে দেশ যখন অবিভক্ত ছিল তখনকার আইন এখন খাটে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মুখ্যস্রোত যেখান দিয়েই প্রবাহিত হোক না কেন তার অর্ধেকটা পাকিস্তানের, অর্ধেকটা ভারতের। ঠিক মধ্যিখানে একটা লাইন টানলে দেখা যাবে যে লঞ্চ সে-লাইনের বাইরে যায়নি, নিজের এলাকার ভিতরেই থেকেছে। সীতাদেবীই গণ্ডি অতিক্রম করেছেন, রাবণ রাজা তা করেননি। রাবণের

এলাকায় পা দিলে রাবণ তো ধরে নিয়ে যাবেই।

আমি তো শুনে থ। মাটির উপর লাইন টানতে পারা যায়, জলের উপর টানা যায় কি? হয়তো বয়া ভাসিয়ে রেখে একটা আন্দাজি সীমানা দেখানো যায়। কিন্তু তাতেও কি এই উৎপাত থামবে?

দু-তরফের যেমন যুদ্ধং দেহি মনোভাব তাতে আমাদের মাঝিমাল্লাদের কোনোরকম প্রোটেকশন দেওয়া যাবে না। জোর যার নদীপথ তার। নৌকার চেয়ে লঞ্চেরই জোর বেশি। তাই লঞ্চের উত্তর হচ্ছে লঞ্চ। গান-বোটের উত্তর হচ্ছে গান-বোট। সমুদ্রপথ হলে বলা যেত, ক্রুজারের উত্তর হচ্ছে ক্রুজার। ব্যাটলশিপের উত্তর হচ্ছে ব্যাটলশিপ।

উপরে লিখলুম যে ঢাকার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না, করাচিও তার সঙ্গে সুর মেলাবে। চাই একখানা লঞ্চ। আমাদেরও লঞ্চ আছে দেখলে এ-আপদ থামবে। আমরা অবশ্য ওদের নৌ-চলাচলে বাদ সাধব না। নদী হয়েছে অবাধ নৌ-চলাচলের জন্যে। আমরা সেটা মানবো। ওরা যদি না-মানে তবে আমরাও পেছপাও হবো না।

তা ছাড়া আরো-একটা কারণ ছিল, সেটা আরো গুরুতর। সেই যে বলে, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, তেমনি এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর। কয়েকটা চর মানচিত্র বা খতিয়ান অনুসারে ফতেয়াবাদে পড়ে। এপারের লোক সে-সব চরে ধান বোনে, ধান কাটে। অন্যান্য ফসল ফলায়, ফসল আনতে যায়। পাকিস্তানের যুক্তি যদি যথার্থ হয় তাহলে তো চরে যাওয়া-আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ আর নৌকায় করে যেতে পারবে না।

আমার বন্ধু যতদিন রানিমহলের জেলাশাসক ছিলেন ততদিন তাঁর আশ্বাসের মূল্য ছিল। তিনি বলেছিলেন চাষীরা যে যার ফসল কেটে আনতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। স্থিতাবস্থা রক্ষিত হবে। সেই বাঙালি মুসলমান অফিসারটিকে বদলি করা হলো ঢাকায়। তাঁর জায়গায় এলেন এক পাঞ্জাবি মুসলিম অফিসার। তাঁর কাছে আমি দরবার করতে নারাজ ছিলুম। তাই লঞ্চের জন্যে চাপ দিই। চাপ না-দিয়ে উপায়ও ছিল না। একদিন একটি চাষী মুখ কালো করে বলে যে ওর কাটা ফসল এপারে আনতে দেয়া হচ্ছে না। ওটা নাকি পাকিস্তানের। চাষীটি এপারের মুসলমান।

আগেকার দিনে খুলনা ছিল অধিকাংশ লঞ্চের ঘাঁটি। দেশভাগের সময় খুলনা পড়ে আমাদের ভাগে, তাই লঞ্চগুলো সময় থাকতে আমরা সরাইনি। কারো মাথায় আসেইনি ও-কথা। পরে খুলনা যায় পাকিস্তানে আর লঞ্চগুলি বেহাত হয়। ওরা আমাদের লঞ্চের ভাগ আমাদের দেয় না।

একখানি মাত্র লঞ্চ ছিল কলকাতায়। সেখানাই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে আবার মাঝরাস্তা থেকে ফিরে যায়। ভাগীরথীতে জল নেই। ভাগীরথী উজিয়ে আসতে পারলে তো পদ্মায় পড়বে? আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, এমন সময় একদিন খবর পাই ভাগীরথীতীরে আমার কুঠির ঘাটে একখানা লঞ্চ এসে ভিড়েছে। ছুটে গিয়ে দেখি সমুদ্রগামী লঞ্চ। নাম তার "পমফ্রেট"। ওটা অসামরিক ব্যবহারের জন্য

নয়, নেভি থেকে আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে সাময়িকভাবে। পরিচালনা করে নিয়ে এসেছিলেন যিনি তিনি একজন নেভাল অফিসার ক্যাপটেন মালিক। আমার হাতে সঁপে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার আগে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেন। আমি লক্ষ করি যে পাটাতন লোহা কিংবা দস্তা কিংবা সেইরকম কোনো এক ধাতু দিয়ে মোড়া। তাই নদীর জলে লঞ্চ চলে কচ্ছপের গতিতে। তা ছাড়া এত রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে ভবা যে পা ছড়াবার ডেক নেই, ক্যাবিন মাত্র একটিই, তাতে আরাম করে থাকা যায় না। তাই লঞ্চ ছেড়ে দিই সারেং টাণ্ডেল সুখানির হাতে। ওরাই নিয়ে যায় পদ্মায়।

"করেছেন কী, সার। বেড়ালকে দিয়েছেন মাছের ভাব। জানেন না ওরা হচ্ছে কেয়াখালির মুসলমান লস্কর। নিমক খায় এ-দেশের, কিন্তু প্রাণ পড়ে রয়েছে ও-দেশে। দেখবেন লঞ্চ পৌঁছে দিয়েছে রানিমহলে।" ভয় দেখান আমার এক সহযোগী।

"ওরা তো কখনো বেইমানি করেনি। কববেও না।" আমি ভয় পাইনে।

ওয়্যারলেসে বার্তা পাওয়া গেল পমফ্রেট যথাকালে তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। পুলিশ চার্জ নিয়েছে। বাঁচলুম। কিন্তু নিষেধ করতে ভুলে গেলুম যে কেউ যেন আমার বিনা হুকুমে ও-লঞ্চ ব্যবহার না-করে।

পরে একদিন হতবাক হয়ে যাই শুনে, পমফ্রেট বিদেশী লঞ্চের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন এক চড়ায় আটকা পড়েছে।

কী সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। গিয়ে শুনি মহকুমা হাকিমও তাঁর দলবল নিয়ে নড়াতে পাবেননি। ডাঙায় থাকা হাতির পায়ে শিকল বেঁধে, তা দিয়ে লঞ্চের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে হাতিকে দিয়েও নড়াতে পারেননি। অবশ্য হাতিটা লঞ্চের চেয়ে কমজোরি। লোহায় মোড়া লঞ্চ কিনা। আসলে লঞ্চের গুরুভারই হয় তার কাল। হালকা লঞ্চ চড়ায় বেধে যেতো না। বিদেশী লঞ্চ তো বেধে যাচ্ছে না।

"গুপ্ত চর নয়। গুপ্তচর।" সহযোগী বলেন। "সাবোটাশ। তখনি তো মনে রাখা উচিত ছিল যে ওবা কেয়াখালির মুসলমান। ওদের কাছে ও-ছাড়া আর-কী প্রত্যাশা করা যায়? আপনি হিন্দু লস্কর আনিয়ে নিন। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়!"

আমি লস্করদের কোনো দোষ দেখতে পাইনে। লঞ্চ তো ওরা বার করেনি। যিনি বাব করতে বলেন তিনি একজন অফিসার। হিন্দু।

টেলিফোনে উপরে রিপোর্ট করি। সাহায্য চাই। উপর থেকে একদল একসপার্ট আসেন। তাঁরা লঞ্চ পবীক্ষা করতে গিয়ে দিশেহারা হন। ওঁদের নৌকা ভেসে যায় মাঝনদী ছাড়িয়ে। তখন বিদেশীরা এসে ওঁদের পাকড়াও করে রানিমহলে নিয়ে যায়। আর আমি সে-বার্তা পেয়ে সোজা কলকাতা চলে গিয়ে সেক্রেটারিয়েটে হাজির হই। নার্ভাস অবস্থায়।

"হিটলারের ডিভিজনকে ডিভিজন সৈন্য খোওয়া গেল, তাঁর নার্ভ বিগড়ায়নি। আমাদের খোওয়া গেছে একদল একসপার্ট। অত সহজে নার্ভ বিগড়াবে।" হেসে বলেন চীফ সেক্রেটারি।

লেখালেখির ফলে একসপার্টদের ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু লঞ্চ পড়ে থাকে ভীষ্মের

মতো শবশয্যায়। পাহারা মোতায়েন থাকে লঞ্চের উপরে ও-ঘাটে। যাতে লঞ্চটাও খোওয়া না-যায়। তার চেয়ে বিপদের কথা লঞ্চ যদি আপনা থেকে ভেসে যায় পদ্মা থেকে মেঘনায়, মেঘনা থেকে বঙ্গোপসাগরে। তখন শত লেখালেখিতেও ফেরৎ পাওয়া যাবে না। সমুদ্রেব মাছ সমুদ্রেই মিলিয়ে যাবে।

বাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি। পমফ্রেট চালান হয়েছে পাকিস্তানের পাক ঘরে, সেখান থেকে পাকিস্তানেব পাকস্থলীতে। না, ওরা তাকে ব্যবহার করছে আমাদেবি বিরুদ্ধে। আমাব শিল আমাব নোড়া আমারি ভাঙে দাঁতের গোড়া। না, পমফ্রেট পালিয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে, সেখানেই হারিয়ে গেছে। ফিরবে না পমফ্রেট।

এব সঙ্গে জড়িয়েছিল প্রেসটিজের প্রশ্ন। এর পবে কি আমি রানিমহলেব শাসকেব সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলতে পারব? না, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমাব মাথা হেঁট হযে যাবে। পমফ্রেট যেন আমার নিজের সম্মানের প্রতীক। ওকে যেমন কবে হোক উদ্ধাব কবতেই হবে। কিন্তু কী করে?

চবেব সমস্যাটা ইতিমধ্যে আর-সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। যা ওদের নয তা ওবা গায়ের জোরে দখল করে ভোগ কববে। আমাদের চাষীদের আমবা প্রোটেকশন দিতে পারিনে। দিতে পারিনে গয়লাদেরও। যারা চরে নিয়ে গিয়ে গোরু ছেড়ে দেয। প্রচুর ঘাস। আবহমানকাল যারা এ-সব অধিকার প্রযোগ কবে এসেছে আজ দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে তাদের অধিকারও হাওয়া হয়ে গেছে কী করে মেনে নেবো এ-কথা? তারা এখন বিদেশী বলে তাদের প্রবেশ মানা, এটাই বা কেমন কথা?

আমি পার্টিশন কামনা করিনি। তবে এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে গৃহযুদ্ধ যদি হিন্দু-মুসলমানেব ধর্মযুদ্ধের মোড় নেয় তাহলে মুসলিমপ্রধান এলাকায় কোনো হিন্দুই নিবাপদ নয, সে হিন্দুপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। তেমনি হিন্দুপ্রধান এলাকায় কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়, সে মুসলিম-প্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। এমনি করে এক-একটি এলাকায বাস করবে কেবলমাত্র মুসলমান বা কেবলমাত্র হিন্দু। তাহলে তো হিন্দুস্থান পাকিস্তান আপনা হতেই ঘটে গেল। সমগ্র দেশের উপর কংগ্রেসের বা সমগ্র প্রদেশের উপর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র বাজত্ব চলতে পারে না। ইংরেজ বিদায় নিলে তো স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিশন অবধারিত। আগে ধর্মযুদ্ধ ঠেকাও। সে সাধ্য কি কারো আছে? দুই পক্ষই যে বদলা চায়। না, হিন্দুরাও এর উর্ধ্বে নয়। কাজেই পার্টিশন সহ্য করতেই হবে।

পার্টিশন সহ্য করতে হলো এইজন্যেই যে লোক-বিনিময় কারো পক্ষে হিতকর নয়। ওটা বন্ধ করতে হবে। যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে ও নিরাপদে থাকবে। ফতেয়াবাদে মুসলমান বেশি, ফুলনায় হিন্দু বেশি। তা হোক, ওরা সমান নিরাপদ। রাষ্ট্র এখন থেকে আর হিন্দু স্বার্থ মুসলিম স্বার্থ দেখবে না, দেখবে নাগরিকমাত্রেরই স্বার্থ।

## তিন

এসেছিলুম আমি শান্তির দূত, মিলনের দূত হয়ে। হয়ে দাঁড়ালুম তার বিপরীত। চর অপারেশনের জন্যে আমি রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হই। তাঁরা বলেন, এ তো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। মিলিটারি ভিন্ন কে এর মোকাবিলা করবে? সেইসূত্রে ছোটো-বড়ো অনেক মিলিটারি অফিসার চর পরিদর্শনে আসেন। লেফটেনান্ট জেনারল, ব্রিগেডিয়ার, লেফটেনান্ট কর্নেল, মেজর। এমনি বিবিধ র‍্যাঙ্কের। মিলিটারির সঙ্গে এর আগে কখনো এতবেশি দহরম-মহরম করতে হয়নি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সে-সব কথা আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলি যে যুদ্ধ জিনিশটা একবার যারা দেখেছেন তাঁরাই সবচেয়ে যুদ্ধবিরোধী। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে আর্মির লোক যখন পেশাদার সৈনিক তখন ওরাই তো সবচেয়ে যুদ্ধপাগল সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যুদ্ধপাগল যদি কেউ থাকে তো তারাই, যারা কখনো যুদ্ধক্ষেত্রেব ধারে-কাছেও যায়নি।

ব্রিগেডিয়ার ছিলেন আমাদের হাউস গেস্ট। তোর বৌদিকে বলেন, "দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে আমি নানা দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছি। তার ফলে আমিই সবচেয়ে অহিংসাভক্ত। আমার কথা শুনুন, আপনার স্বামীকেও বলুন, ননভায়োলেন্স ইজ বেস্ট।"

এর পর লেফটেনান্ট জেনারেল বলেন আমাকে, "খানতিনেক চর দখল কবা ইণ্ডিয়ান আর্মির পক্ষে ছেলেখেলা। কিন্তু সেই ছেলেখেলায় যদি একজন জওয়ানও নিহত হয় তাহলে গোটা আর্মির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অমনি বেধে যাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। আপনি কি চান যে আমরা তার ঝুঁকি নিই? আমার পরামর্শ শুনুন, আর্মির আশা ছেড়ে দিন। তার চেয়ে রাজ্য সরকারের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে ও-ভার নিতে আহ্বান করুন।"

মহাভারতের যুগে পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। এ যুগে কি তিনখানা চর নিয়ে আর-একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে? আর আমিই হবো তার নিমিত্ত? কখনো না। আমি রাজ্য সরকারকে বলে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আনাই। তাদের সঙ্গে আসে রকমারি অস্ত্র। ওরা যেন আধা-মিলিটারি।

তা দেখে আমাদের পুলিশ সাহেব বলেন, "সার, পুলিশ কি মরতে এসেছে? খবরদার। একজনও পুলিশের লোক যদি মরে তবে যেখানে যত পুলিশ আছে ধর্মঘট করবে।"

তাঁকে এমন আবেগের সঙ্গে কথা বলতে আব কখনো দেখিনি। যেখানে সারা দেশের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি সেখানে একজন সিপাহীর প্রাণহানিটাই কি বড়ো হলো? কারো প্রাণহানি হোক এটা আমার কাম্য নয়, এমনকী অপর পক্ষের প্রাণহানিও না। কিন্তু যদি হয় তাহলে কি পুলিশের সবাই অসহযোগ করবে?

"আমাকে ভুল বুঝবেন না, সার"। তিনি বলেন, "পুলিশের কাজটা ছিল চোর-ডাকাত ধরা। ধরেছি। তারপর হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। করেছি। তারপর হলো টেররিস্টদের সঙ্গে লড়া। লড়েছি। তারপর হলো কমিউনিস্টদের রোখা। রুখেছি। এখন শুনছি কিনা ভিন্ন রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করতে হবে। এও কি

পুলিশের কাজ? চাকরিতে ভর্তি করার সময় সরকার কি বলেছিলেন এ-কথা?”

ইতিমধ্যে আরো খান ছয়-সাত লঞ্চও এসে হাজির। সব নেভি থেকে। তাদের সাধাবণ নাম ট্যানাক। অপরূপ গড়ন। কিন্তু পমফ্রেটের মতো ভারি নয়। জল কাটে না অত। গঙ্গা যেখান থেকে পদ্মা হয়ে গেছে তার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় তাদের রাখি। হ্যাঁ, লস্কররা সবাই মুসলমান। ওই কেয়াখালি ভাটিগাঁ অঞ্চলেব।

“আপনার গোটা নৌবহরটাই না একদিন ফেরার হয়, সার।” রহস্য করেন এক সহযোগী। “আবেকদিন ফিরে আসবে পাকিস্তানি গান-বোট বহর হয়ে।”

কিন্তু ওছাড়া আব-কোনো উপায়ও ছিল না। এক-একটি লঞ্চের সঙ্গে এক-এক দল সারেং টাণ্ডেল দীর্ঘকাল ধবে সংশ্লিষ্ট। ও-সব লঞ্চ অকেজো হয়ে যায় ওরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়। ওদের চাই বলেই তো আমরা সেকুলার স্টেট বরণ করেছি। এ-বাষ্ট্রে ওদেরও সমান অধিকাব ও স্বার্থ। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আমাদের জাতীয় সম্পদ। প্রত্যেকেই মূল্যবান।

বর্ডাবের চাষীরা অধিকাংশই মুসলমান। চরে গিয়ে চাষ করে তারাই। তাদেরই ফসল বিপন্ন। তাদেব স্বার্থেই তো আমার চব অপারেশন। নইলে কী আসে-যায় আমার? তা বলে লঞ্চ আমি বেহাত হতে দেবো না। প্রায় প্রত্যেকটাতে ওয়্যারলেস ফিট করা ছিল। নিয়মিত বার্তা আসত, সব ঠিক আছে।

পমফ্রেটকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলুম। তা সত্ত্বেও আমাব ভাবনার বিরাম ছিল না। এটা যদি পাকিস্তানের হাতে পড়ে তো দেমাকে ওদের আর মাটিতে পা পড়বে না। ট্রোফি হিশাবে প্রদর্শন করবে ওরা। আর যদি ইঞ্জিন ফেল করে সমুদ্রে ভেসে যায় তো লড়াই করেও ফিরে পাওয়া যাবে না।

এ-সংকটের অবসান ঘটায় উত্তরপ্রদেশের গঙ্গায় অসময়ে বন্যা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। একদিন রেডিওগ্রাম পাই, “পমফ্রেট উদ্ধার হয়েছে।” ছুটে যাই দেখতে। দেখি তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। শুনি সারেং টাণ্ডেলরা বন্যার পূর্বাভাস পেয়ে লঞ্চে উঠে বসেছিল। পমফ্রেট ভেসে উঠতেই ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়। মানুষকে ধর্মমতের দরুন অবিশ্বাস করতে নেই। যাকে রাখো সেই রাখে।

# যে বাঁচায়

## অন্নদাশঙ্কর রায়

বাইবের বাবান্দায় বসে খবরের কাগজ পডছি। হিটলাবকে নিয়েই ভাবনা। কোনদিন-না যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন! হঠাৎ কানে আসে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। চেয়ে দেখি ঘোড়া আমাব কম্পাউণ্ডে ঢুকে কুঠির রাস্তা ধবে ছুটে আসছে আমারি অভিমুখে।

ভেবেছিলুম বারান্দাব সামনেই থামবে। ও মা! আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে উঠে আসে ধাপে-ধাপে বারান্দাব উপর। ভাগ্যিশ বাবান্দাটা ছিল যেমন দীঘল তেমনি চওড়া। নযতো ঘোডাব আক্রমণে আমাকেই ঘবে ঢুকতে হতো।

ঘোড়সওয়াব লাফ দিয়ে নেমে গোড়ালিব সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে ডান হাত দিয়ে মিলিটাবি স্যালিউট করে দাঁড়ান। বলেন, 'গুড মর্নিং জজ। মর্নিং ওযাক করতে বেবিযেছিলুম। আপনাকে অমন নিবিষ্ট হয়ে কাগজ পডতে দেখে মনে হলো কিছু-একটা ঘটেছে। চেকোস্লোভাকিয়ার পবে কী? রাশিয়া?'

হেসে বলি, 'গুড মর্নিং, হাফিজ। সপ্তদশ অশ্বারোহীর একজন মাত্রকেই দেখছি। বাকি ষোলজনকে কোথায় রেখে এলেন? সেবারে আপনারা বাংলা জয় কবেছিলেন। এবার বাংলো জয় করবেন না তো?'

নবনিযুক্ত অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ মেহেদি খান বুঝতে পারেন না যে আমি সাতশো বছব আগেকাব পাঠান আক্রমণেব কথা ভেবে বলছি। বুঝিয়ে দিতেই হো-হো করে হেসে ওঠেন। তালগাছের মতো মাথায় উঁচু। বহরে ক্ষীণ। সারাক্ষণ খাকি শার্ট আর খাকি প্যাণ্ট পবতে ভালোবাসেন। সরল শাদাসিধে মানুষটি। বিনম্রতার প্রতিমূর্তি। গরিবের মা-বাপ। নিজেও থাকেন গরিবি চালে।

'তারপর?' আমি রসিকতা করে বলি, 'মর্নিং ওয়াক বললেন যে! ওয়াক করে কে? মানুষ না ঘোড়া?'

'ঘোড়ারও কসবৎ চাই, জজ। একই সঙ্গে দুজনেরই কসরৎ হয়ে যায়।' বলে হাফিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বসতে বললেও বসেন না। 'বে' রঙের বিরাট অশ্ব। লোভ হয় চড়তে। হাফিজ আমাকে আগেও সেধেছেন। আমি রাজি হইনি। অধঃপতনের ভয়ে। হাফিজ কিন্তু অকুতোভয়। ঘোড়াটাই ওঁকে ভয় করে। পাঠান কিনা।

'তাহলে আসুন, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। এক পেয়ালা চা কি কফি? এনি ড্রিঙ্কস?' আমি অফার করি।

'মাফ করবেন, জজ। ও-সব আমি খাইনে। আর এই-যে ঘোড়া এরও তর সইবে না। তাহলে লড়াই এখন বাধছে না?' হাফিজ কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করেন।

'না, তেমন কোনো খবর দেখছিনে তো।' আমি উত্তর দিই। ইতিমধ্যে জজ-গৃহিণীও

বাইবে এসেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে হাফিজ আর-একটা মিলিটারি স্যালিউট ঠুকে দেন। 'গুড মর্নিং, মিসেস বিশ্বাস।'

'গুড মর্নিং, মিস্টার খান। বসবেন না?' তিনি অনুরোধ কবেন।

'ঘোড়া বসতে চাইছে না যে। আমাকে মাফ করবেন।' বলে আবেকবাব স্যালিউট ঠুকে ঘোড়াব পিঠে উঠে বসলেন হাফিজ। ঘোড়া এক পা এক পা কবে সন্তর্পণে ধাপে-ধাপে নেমে যায়। তাবপর ছুটে অদৃশ্য হয।

'অদ্ভুত লোক!' মন্তব্য কবেন মিসেস। 'তোমাদেব সার্ভিসে এমন আজব চিড়িয়া তো দেখিনি।'

'আলাপ হলে দেখবে মানুষ চমৎকাব। কিন্তু চাকবিতে আমার মতো মিসফিট। ওঁর উচিত ছিল আর্মিতে যাওয়া। পথ ভুলে চলে এসেছে সিভিল সার্ভিসে। তোমাকে বলা হয়নি যে এখানে আসবার সময় কলকাতায় এক বন্ধুব কাছে শুনি আমাদেব সার্ভিসে একজন খাকসার যোগ দিয়েছে।' আমি আতঙ্কেব ভান কবি।

'খাকসার। তাব মানে কী? সীক্রেট সোসাইটি?' তিনি হকচকিয়ে যান।

'না, মিলিটান্ট অর্গানাইজেশন। বন্দুক নেই বলে বেলচা হাতে নিয়ে কুচকাওযাজ কবে শুনেছি। ওদের আদর্শ আদিপর্বের ইসলাম। তাবই অনুসরণে জীবনযাপন। হিংসা বাদে আব সমস্তই খুদাই খিদমদগারদেব অনুরূপ। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, কাযিক শ্রম, অল্পে সন্তোষ, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ গান্ধিপন্থীদেব সঙ্গে তুলনীয়।' আমি যতদূর জানি।

এই স্টেশনে আসাব পব আমি আবো শুনেছিলুম যে হাফিজের বাসায় গোটাকয়েক চবকা আছে। নিজেও কাটেন, অপবকে দিযেও কাটান। কেউ ভিক্ষা চাইতে গেলে বলেন, 'এসো, একটু চরকা কাটা যাক। কিছু নিতে গেলে কিছু দিতে হয়। শ্রম দাও, মজুরি পাবে। ভিক্ষা নয়, বিনিময।' যারা রাজি হয় তাবা আশাব অতিরিক্ত পায। নারাজ হলে খালি হাতে ফেরে।

হ্যাঁ, অদ্ভুত লোক। কিন্তু খাশা লোক। হাফিজ কেমন করে জানতে পেরেছেন যে আমরাও চরকা কাটি। যদিও আর পাঁচজনকে নিয়ে নয়। যেটা হাফিজ প্রাযই করেন। সেই থেকে আমার উপর ওঁর একটা অহেতুক পক্ষপাত জন্মেছে। তেমনি আমারও ওঁব উপর পক্ষপাত। হাফিজের পেছনে তাঁকে নিয়ে ক্লাবের সভ্যবা হাসি-ঠাট্টা করলে আমিই তাঁর পক্ষ নিয়ে তর্ক করি। যে যার ধর্ম পালন করবে। হাফিজের ধর্মই হলো লোকসেবা। কেউ যদি মদ না-খায়, সিগারেট না-খায়, তাতে কার কী আসে-যায়। কেউ যদি কোরানশরিফ আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলতে পারে তাতেই বা কার কী ক্ষতি? হাঁ, মেহেদি একজন হাফিজ। ওটা ওঁর নাম নয়, উপাধি। কোরান ওঁর কণ্ঠস্থ।

লক্ষ করি মুসলমানরাও ওঁকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। ছোকরা যদি সামাজিকতা দুরস্ত না-হয় তবে চাকরিটি কোনোমতে রাখবে, কিন্তু উন্নতি করবে না। ডিউটিতে অবশ্য খুঁত নেই। কিন্তু ডিউটিই কি সব? শুধু ডিউটি বাজিয়েই কি প্রমোশন হয়েছে কারো? সঙ্গে চাই একটু পালিশ। মালিশও জুড়ে দিতে পারো তার সঙ্গে।

শরীরকে পটু রাখার জন্যে হাফিজ নিয়মিত টেনিস খেলতে আসেন ক্লাবে। আর-কেউ না-থাকলে আমরা দুজনে—হাফিজ আর আমি—সিঙ্গলস খেলি। নয়তো আমরা দুজনে হই পার্টনার। ডবলস খেলি। এমনি করে আমাদের চেনাশোনা জমে ওঠে। এক-একদিন আমরা অপেক্ষমাণ সভ্যদের কোর্ট ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে নদীর ধারে বেড়াতে বেরই। গল্প জমে ওঠে। হাফিজ প্রায়ই ধর্মের প্রসঙ্গ তোলেন।

'গীতা যখন পড়েন তখন কি আপনি একটানা পড়ে যান? না একটি শ্লোককে চিবিয়ে-চিবিয়ে নিঃসত্ত্ব করে পরিপূর্ণভাবে হজম করে তাবপরে আর-একটিতে দাঁত বসান?' হাফিজ একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন। যেন আমি কতবড়ো একজন ধার্মিক।

'আমি একটানা পড়ে যাই। মানে বুঝতে চেষ্টা করি। তার বেশি নয়। একটি-একটি করে হজম করতে গেলে বছর ঘুরে যাবে।' আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি।

'না, না, ধর্মগ্রন্থ ওভাবে পড়তে নেই। পড়লে জ্ঞান হতে পারে, উপলব্ধি হয় না। আর উপলব্ধিই তো আসল।' হাফিজ শুধু মুখস্থ করে ক্ষান্ত নন।

'আপনি কি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও পড়েন?' আমি আশ্চর্য হয়ে শুধাই।

'পড়ি বইকি। তার থেকে প্রেরণাও মাঝে-মাঝে পাই। তবে আমার কাছে কোরানের মতো আর-কিছু নয়। এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।' উত্তর দেন তিনি।

'ক্ষমার কী আছে? আপনার পক্ষে সেইটেই তো স্বাভাবিক।' আমি আশ্বাস দিই।

'কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটি অভিযোগ আছে, জজ। আপনারা যখন ধ্বনি দেন হিন্দু-মুসলমান এক হো তার মানে কি এই নয় যে, হিন্দু-মুসলমান এক নয়? হিন্দুত্ব ও ইসলাম এক নয়। গীতা কোরান এক নয়। যা এক নয় তা এক হবে কী করে? এক হতে পারে কখনো? হিন্দু-মুসলমান বরাবরই দুই ছিল, বরাবরই দুই থাকবে। তাদের একত্বটা স্বপ্ন। তাদের দ্বিত্বটাই বাস্তব। দ্বিত্ব যেমন করে হোক বজায় রাখতে হবেই, নইলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আপনাদের কী? আপনারা তো মেজরিটি।' বলতে-বলতে হাফিজ গরম হয়ে ওঠেন। যেন ইসলাম বিপন্ন।

আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, হিন্দু-মুসলমান যেমন ধর্মের দিক থেকে দুই তেমনি রাজনীতির দিক থেকে এক। অর্থনীতির দিক থেকে এক। ধ্বনি যখন দেওয়া হয় তখন ধর্মের কথা ভেবে দেওয়া হয় না। রাজনীতি অর্থনীতির কথা ভেবেই দেওয়া হয়।

'আঃ! সেইখানেই তো আপত্তি। যারা ধর্মে ভিন্ন তারা রাজনীতিতে এক হয় কী করে? অর্থনীতিতেই বা এক হয় কী করে? তাদের রাজনীতি অর্থনীতিও দুই হবে। কারণ ইসলাম তো কেবল একটা ধর্মমত নয়, ইসলামের আদিপর্বে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিও তার অঙ্গীভূত ছিল। ইসলাম হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ জীবন। মুসলমানরা তো সুদ খাবে না। তারা হিন্দুদের সঙ্গে এক অর্থনীতির শরিক হবে কী করে? তেমনি, ইসলামি শরিয়ৎ যদি মানে তবে হিন্দুদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রের নাগরিক হবে কী করে?' হাফিজ আমাকে চেপে ধরেন।

আমি তো পাঠানের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাইনে। বলি, 'এটা তো ঠিক যে, আমরা একসঙ্গে সাতশো বছর বাস করেছি। দু-পক্ষকেই কিছু-কিছু ছাড়তে হয়েছে, কিছু-কিছু নিতে হয়েছে। ধর্মে না-হোক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে। ভারতবাসী হিশাবে আমাদের একটা জাতীয় সত্তা তো আছে।'

'সেখানেও আমার আপত্তি। ন্যাশনালিজম একটা নতুন ধর্ম। আপনারা সে-ধর্ম গ্রহণ করতে পাবেন, আমরা কি পাবি? আমরাও যদি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট হই তাহলে কি আরব ইরানি তুর্ক আফগানরা আমাদের কাছে এলিয়েন হয়ে যায় না? আমাদের প্রোফেটও কি তবে এলিয়েন? আপনাদের যেমন ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস আমাদেরও তেমনি হাফিজ সাদি রুমি। তাঁরাও কি আমাদের কাছে এলিয়েন? না, জজ, হিন্দু ভাইদের জন্যে আমরা আরব ভাইদের ইবানি ভাইদের পর করে দিতে পারবো না।' হাফিজ ছেলেটি অকপট।

'তাহলে কি আপনাবা আপনাদেব আরব ভাইদের জন্যে হিন্দু ভাইদেব পর কবে দেবেন? ধর্ম এক নয় বলে কি দেশ এক হবে না? জাতি এক হবে না? কই, এ-সব তো আগে কখনো শুনিনি? এ কী কথা শুনি আজ মুসলিমের মুখে। আমরা দুই সম্প্রদায় হলেও একই দেশের সন্তান। আমাদের মাতৃভূমি এক'—আমি স্মরণ করিয়ে দিই।

এই হাফিজই পরে একদিন বলেন, 'আপনি এখনো বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের সঙ্গে আমরা এক নেশন গড়ব? না, জজ, তা কখনো হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান এক নয়, দুই। এই দ্বিত্বকে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিত্বই যেমন প্রথম কথা দ্বিত্বই তেমনি শেষ কথা। হিন্দুই বলুন আর মুসলমানই বলুন, ধর্মই জনগণের জীবন। এত-যে তাদের দুঃখ-কষ্ট মেহনৎ ও দাবিদ্র্য সমস্তটাই সহ্য হচ্ছে ধর্মের জন্যে। ধর্মই তাদের শান্তি দেয়। ধর্মই তাদের মুখে হাসি ফোটায়। অথচ ধর্ম তাদের এক নয়, দুই। ধর্ম দুই বলেই নেশনও দুই। এ-যুক্তির আর খণ্ডন নেই, জজ। যদি ন্যাশনালিজম মেনে নিতে হয়।'

মুসলিম মানস কোন খাতে বইছে দূর থেকে তার আভাস পাচ্ছিলুম। কিন্তু অতটা পরিষ্কাব আর-কখনো হয়নি। আমি শিউবে উঠি। ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ কি হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র? না যুদ্ধ এড়াতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ভূমি? তখনো জিন্নাসাহেব পার্টিশনের দাবি তোলেননি। কিন্তু ইকবালের মুখে পাকিস্তানের ধ্বনি উঠেছিল।

যাক, তার দেরি আছে। ইংরেজবা তো এখনি বর্জন করছে না। আমি বলি, 'দুই যেমন সত্য একও তেমনি। আমাদের প্রচ্ছন্ন একত্বই আমাদের দ্বিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে শেখাবে। আমবা যদি হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করি তাহলে আমাদের মধ্যে একপ্রকার সংগ্রামী একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সংগ্রামকালের একতাকে শান্তিকালের একতাকে সম্প্রসারিত করব। আর ইউরোপে যদি মহাযুদ্ধ বাধে আর এ-দেশের সৈনিকরা তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাহলেও একপ্রকার কমরেডশিপ গড়ে উঠবে হিন্দু সৈনিক আর মুসলিম সৈনিক। নেশন গড়ে ওঠে একসঙ্গে লড়তে-লড়তে। অন্যান্য

দেশে তাই হয়েছে। এ-দেশেও তাই হবে।'

হাফিজ তাঁর নিজের যুক্তিতেই অটল। 'কথাটা অত সহজ নয। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সারা দেশে এমন-এক চিরস্থাযী বন্দোবস্ত যাতে হিন্দুও মুসলমানের অধীন নয, মুসলমানও হিন্দুর অধীন নয। কংগ্রেস আর লীগ যদি কোযালিশনে রাজি হতো তাহলে একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করতে পারত। ইংরেজ বিদায নিলে পরে একসঙ্গে রাজত্ব করতে পারত। কিন্তু সে-বন্দোবস্ত চিরস্থাযী হতো কি? অন্যান্য দল তাদের হটাত। তাহলে চিরস্থাযী বন্দোবস্ত বলতে আর কী বোঝায? হিন্দু ভাবত, মুসলিম ভাবত। দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হাসছেন যে! কেন নয?'

আমি বলি, 'বাংলাদেশ যদি মুসলিম ভারতে পড়ে তাহলে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুরা আমার চোখে এলিযেন হয। আমিও তাদের চোখে এলিযেন। রামকে আর কৃষ্ণকে আর বুদ্ধকে আমি এলিযেন ভাবতে পারি কখনো? গান্ধিকে এলিযেন ভাবতে পারি?'

'গান্ধি বলছেন কেন? বলুন মহাত্মা গান্ধি।' হাফিজ আমার ভুল শুধরে দেন। 'মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্ব বরাবরই প্রেরণামায। জিন্নাসাহেবের নেতৃত্ব তেমন নয। তিনি যোদ্ধাও নন। তিনি ধর্মেরও ধার ধারেন না। লোকসেবাও তাঁর মিশন নন। আমরা খাকসাররা তাঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। কিন্তু মুসলিম জনমত ক্রমে-ক্রমে তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। দেশের এখন দুই কেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধি ও কাযদে আজম জিন্না।'

হাফিজের সঙ্গে আমার প্রাযই তর্ক বাধত হিংসা-অহিংসা নিযে। হাফিজ কিছুতেই স্বীকার করতেন না যে অহিংসা দিযে দেশ স্বাধীন হবে ও তারপরে আত্মরক্ষা করতে পারবে। বেশ, তবে হিংসা দিযেই হোক। হচ্ছে না কেন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, 'তার জন্যে অস্ত্র চাই। কিন্তু অস্ত্র কোথায?'

'অস্ত্র পেলেও কি আমরা ইংরেজদের সঙ্গে পারবো? বাহাদুর শা, নানা সাহেব পেরেছিলেন? ও-সব অলীক কল্পনা।' আমি হেসে উড়িযে দিই। 'বন্দুকের বদলে বেলচা দিযেও কিছু হবে না, হাফিজ।'

'বুঝি। কিন্তু ট্রেনিংটা তো একই। আমরা ট্রেনড হযে থাকছি। একদিন বন্দুকও কেমন করে জুটে যাবে। যুদ্ধটা তো একবার বাধুক।' যুদ্ধের উপর ররাত দেন হাফিজ।

অন্য-একদিন বেড়াতে-বেড়াতে হাফিজ আমাকে বলেন, 'আপনাকে আমরা ভালোবাসি।'

তা শুনে আমি একটু চমক বোধ করি। 'আমরা' বলতে কারা? কিন্তু তা নিয়ে জেরা করিনে। শুনে যাই ওঁর কথা। ওঁর বিশ্বাস আমি গান্ধিপন্থী, আমি অহিংসাবাদী, আমি লোকের সেবা করি। আমি একজন দরবেশ কি ফকির।

'আরে, না। আমি ও-সব কিছু নই।' হাফিজকে আশ্বস্ত করি। 'আমি চাই বাঁচতে. ও বাঁচাতে। আমার মতে যে বাঁচায সেই বাঁচে। যে মারে সেই মরে। জীবনটা কি মারবার

ও মরবার জন্যে? না বাঁচবার ও বাঁচাবার জন্যে?'

'মহাত্মাও তো বলেছেন জিশুখ্রিষ্টের ভাষায়, তলোয়ার যে ধরে তলোয়ারেই সে মরে। কিন্তু আমার বংশের ধারাই যে অন্যরূপ। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন রোহিলা। রোহিলখণ্ড জয় করে নেন। জয় করতে গিয়ে যা করেন তার চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে দেখবেন হাড়ের পাহাড়। কত মানুষ যে মেরেছেন তার শুমারি হয় না। প্রাণ দেওয়া-নেওয়া আমাদের কাছে একটা খেলা। আমরা যেমন মারতে ভালোবাসি তেমনি মরতে। মরণকে আমরা নিই খেলোয়াড়ের মতো। লড়াই যেন পোলো খেলা। তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নইলে জীবনে মরচে ধরে যায়। যুদ্ধহীন জীবন কি একটা জীবন? করে লড়াই বাধছে, বলুন।' হাফিজ মনে করেন আমি সবজান্তা।

একদিন সত্যি-সত্যি বেধে যায় যুদ্ধ। হিটলার বাধিয়ে দেন। তখন হাফিজ ছুটে আসেন আমার কাছে। বলেন, 'এবার মহাত্মা কী করবেন?'

'যুদ্ধে সহযোগিতা গান্ধিনীতি নয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন।'

আমি উত্তর দিই।

হাফিজের ওটা বিশ্বাস হয়নি। শেষে যেদিন সত্যি-সত্যি কংগ্রেস পদত্যাগ করে সেদিন তিনি সকৌতুকে বলেন, 'আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন? জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিম লীগকে বখরা দিয়ে হিটলারের সঙ্গে লড়তে পারতেন।'

'তাহলে স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়ত কে?' আমি জানতে চাই।

'কেন, বোসবাবু? আবার কে?' হাফিজের হীরো হলেন সুভাষচন্দ্র।

## চার

এরপরে একদিন হাফিজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। যেতে হবে কোথায় যেন সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে। সেখান থেকে যথারীতি মহকুমা হাকিমের পদে। আর হয়তো দেখা হবে না। মানে, এই স্টেশনে। আমরা শুভকামনা জানাই।

সেদিন তিনি তাঁর জীবনকাহিনীর খানিকটা শোনান। কেমব্রিজে যখন তিনি শিক্ষানবীশ তখন একদিন পনেরো মিনিটের নোটিসে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন টেবিলে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যে অপারেশন। অতি বিপজ্জনক কেস।

অপারেশন টেবিলে শুয়ে জ্ঞান হারাবার আগে তিনি আল্লাতালার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। নিজের জন্যে একটুও হাতে রাখেন না। তাঁর আর-কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র প্রার্থনা এই যে আল্লার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। পরের দিন জেগে দেখেন বেঁচে আছেন। ডাক্তার তাঁকে অভিনন্দন করে শুধান, বাঁচলেন কী করে? এ-কেস তো বাঁচবার কেস নয়। তিন বলেন, 'খোদার ফজলে।'

'আমার প্রার্থনায় কোনো ফাঁকি ছিল না, জজ। থাকলে সেই টেবিলেই আমার মৃত্যু হতো। সেই-যে বেঁচে গেলুম সেটা মরে যাওয়ার পর নতুন করে বাঁচা। তখন থেকেই

আমি আপনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছি মানুষের সেবায়। মানুষের সেবাই তো আল্লার সেবা। আমার আয়ুষ্কাল তো শেষ হয়েই গেছল। এটা একটা বাড়তি আয়ুষ্কাল। এটা আত্মসুখের জন্যে নয়। হ্যাঁ, সেই ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, এমন রিল্যাকসড দেহ তিনি দেখেননি। বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাসে কী-না হয়!'

গান্ধিজির অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের প্রসঙ্গ ওঠে। হাফিজ বলেন, 'হ্যাঁ, উনিও একজন ম্যান অফ ফেথ। লোকে ভাবে পলিটিসিয়ান! কত-না ক্যালকুলেট করে চাল দেন। তা নয়। অন্তরের বাণী শুনে চালিত হন।'

হাফিজের সঙ্গে এই হয়তো শেষ দেখা। কিছুদিন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলুম। ছেড়ে দিলে আর-কখনো এক স্টেশনে পরস্পরকে পাওয়া যাবে না। তাই ভারাক্রান্ত মনে বিদায় দিই। বলি, 'খোদা হাফেজ।' তিনিও একটু হেসে তাই বলেন।

বছর চারেক বাদে কলকাতার পথে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে হঠাৎ একদিন পুনর্দর্শন। সেই খাকি শার্ট ও খাকি প্যান্ট পরা মানুষটি। সঙ্গে সেইরকম পোশাকে আরেকজন। নেমে এলেন ওঁরা ট্রাম থেকে বোধহয় আমাকে লক্ষ করে।

'হ্যালো, জজ! কেমন আছেন আপনি? আর মিসেস বিশ্বাস? আর ছেলেমেয়েরা?' একনিশ্বাসে প্রশ্ন করে হাফিজ।

'ভালো। ভালো। সবাই ভালো। আর আপনি? শুনেছি বিয়ে করেছেন। মিসেস কেমন আছেন?' আমি তাঁর হাতে হাত রেখে শুধাই।

'ভালো। আপনাকে একটা খবর দিই। এইমাত্র ইস্তফা দিয়ে এলুম। এখন আমি মুক্ত।' হাফিজের মনে বিষাদ, মুখে হাসি।

'ও কী? ব্যাপার কী? কেন আপনি অমন কাজ করতে গেলেন?' আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। ওঁদেরই তো রাজত্ব। মানে, মন্ত্রীর গদি।

'ডেকে পাঠিয়েছিলেন চীফ সেক্রেটারী। গেলুম সেক্রেটারিয়েটে। হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। দিলুম লিখে ইস্তফাপত্র। ব্যাস, আমি এখন খালাশ। আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আপনাকে আটকে রাখলুম।' হাফিজ বলেন।

'আমিও যাচ্ছিলুম ট্রাম ধরতে। পার্ক সার্কাসে আমার বন্ধুর ওখানে। আপনারাও আসুন না। যদি হাতে অন্য-কোনো কাজ না-থাকে।' আমি প্রস্তাব করি।

তিনজনে মিলে ট্রামে উঠে বসি। বিকেলবেলা। কিন্তু ছুটির সময় হয়নি। ফাঁকা ট্রাম। পাশাপাশি বসে আলাপ করি।

'হুজুরদের কাছে আমি এক পয়সাও চাইনি। ওঁদের কোনো কমিটমেন্টই নেই। সবটাই দায়িত্ব আমার। আমিই আমার মহকুমার লোকদের অন্ন জুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি এতদিন। আমার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হলে প্রদেশময় দুর্ভিক্ষ হতো না। এই-যে চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে, এ-হাহাকার আমার মহকুমায় নেই। কিন্তু এর জন্যে কেউ কি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে? খাদ্যমন্ত্রী আমার উপর খাপ্পা। কেন আমি দুর্ভিক্ষ ঘটতে দিইনি? কেন তাঁর পেটোয়া কালোবাজারি ও

মজুতদারদের বাড়াবাড়ি ফেঁপে উঠতে দিইনি? কেন ধানচালের রপ্তানি বন্ধ করেছি? অবাধ বাণিজ্য, অবাধ গতিবিধি, এ-সব নির্দেশ কেন অমান্য করেছি? আরে, করেছি কি আমি নিজের স্বার্থে? না জনগণের স্বার্থে?' হাফিজ জবাবদিহি চান আমার কাছে। যেন আমিই সরকার বাহাদুর।

আমি এর কী জবাব দিতে পারি। দুঃখিত হয়ে বলি, 'তা আপনি ছুটির দরখাস্ত করলেন না কেন? দুর্ভিক্ষ তো বেশিদিন থাকবে না, উজিরদের ওজারতের মেয়াদও ফুরিয়ে যাবে। তাঁরা কেউ পারমানেন্ট নন, আপনিই পারমানেন্ট।'

'ছুটি নেওয়া মানে তো পালিয়ে যাওয়া। আমি কি এসকেপিস্ট? যেখানে লক্ষ-লক্ষ প্রাণ বিপন্ন সেখানে আমার কাজ কি চাচা, আপনা বাঁচা? না ওদের বাঁচানো?' হাফিজ আবার আমার কাছে জবাব চান। আমাকে নিরুত্তর দেখে খেপে যান। বলেন, 'এই শয়তানি সরকার মানুষকে বাঁচাবে না, যদি কেউ বাঁচাতে যায় তাকে শাসাবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাটাই একটা পাপ। জজ, আপনিও দায়ী। এই ব্যাপক নরহত্যার জন্যে।'

আমি চমকে উঠি। সাফাই দিই, 'এ-ব্যাপারে আমার কী দায়িত্ব। আমি একজন জজ। আমি কি কখনো অন্যায় বিচার করেছি?'

'না, না, আপনিও দায়ী। এই সরকারের প্রত্যেকটি কর্মচারীই দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। সকলেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত।' হাফিজ তর্জনী উঁচিয়ে বলেন, 'অমন করে আপনার বিবেককে ভোলাতে পারবেন না। আল্লার দরবারে আপনার বিরুদ্ধেও ফরিয়াদ আনবে ওরা, ওই যারা কাতারে-কাতারে মরছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।'

ব্যথিত হই। বলি, 'চাকরিটা ছেড়ে দিলে আপনার সংসার চলবে কী করে? বাঁচবেন কী করে?'

'আল্লার উপরে বিশ্বাস থাকলে ও তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে তিনিই আবার বাঁচাবেন, সেবার কেমব্রিজের অপারেশন টেবিলে যেমন বাঁচিয়েছিলেন। আমার এই জীবনটাই তো উদ্বৃত্ত জীবন। এর জন্যে এত ভাবনা।' হাফিজ হেসে উড়িয়ে দেন।

সেদিন আমার বন্ধুর ওখানে দুজনাকে দু-পেয়ালা চা দেওয়া হয়। আর কিছু ওঁরা নেবেন না। বিদায় বেলায় দেখি দুটি পেয়ালার দুটি পিরিচে দুটি আনি। তাজ্জব বনে যাই। বলি, 'এটা তো চায়ের দোকান নয়, হাফিজ।'

'কিছু মনে করবেন না, জজ। আমরা খাকসার। বিনিময় না-দিয়ে গ্রহণ করিনে। নিলে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয়। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে আসি। আপনার স্ত্রীকে আমার সেলাম জানাবেন। আপনাকেও সেলাম।' এই বলে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে মিলিটারি স্যালিউট দেন হাফিজ। আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলে ডান হাত দিয়ে ঝাঁকানি দেন। গুড বাই।

জীবনে আর দেখা হয়নি। তবে ওপার বাংলা থেকে একদিন একটি ছাত্র তাঁর আদরের নিদর্শন এক থান খদ্দরের চাদর দিয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কাজ। সেই অমূল্য সম্পদের বিনিময় দিই কী করে? এখনো দিতে পারিনি।

# গণনায়ক

## সতীনাথ ভাদুড়ী

পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুব জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। পার্বত্য 'নাগর' এখানে খুব খামখেয়ালি নয়। তাই তার সোহাগের অজস্রতার উপর রূঢ় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িযে থাকতে পেরেছে, কাঠের নড়বোড়ে পুলটি। আগেকার যুগে উত্তর বাংলা থেকে উত্তর বিহারে ফৌজ পাঠাবার যে-পথ ছিল, তারই উপর ছিল এই সেতু। সেই রাস্তা এখনও পুলেব দু-দিকেই আছে কিন্তু তার সে-জলুস আর নেই। কেবল গত বছরকয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়াখোয়ার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে—বিহার আর বাংলার মধ্যে বে-আইনি জিনিশেব কেনা-বেচায়। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। এই হাটের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে আর একটা রাস্তা, মালদা জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিযা, জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। অগণিত মাল-বোঝাই গরুর গাড়ি মালদা, দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি তিনদিক থেকে পুলের সম্মুখে এসে মিলিত হয়। গত বছর হাটের ইজারাদাবেব কাছ থেকে, বকরি ঈদের আগে শান্তিরক্ষাব মুচলেকা নেওয়ার জন্য এসে, এস.-ডি. ও সাহেবের মোটরকাব যায় পথে আটকে। তারপর থেকে পথের গর্তগুলো বুজেছে।

বাইরেব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের সুধানী স্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পাব হয়ে যায় গোরু, মোষ, চিনি, ঘি; আর বাংলা দেশ থেকে আসে চাল আর ধান।

হিন্দু-মুসলমানেব মিশ্রিত জনসংখ্যা। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। গত বছবের কলকাতা, নোয়াখালি, আব বিহারের নানা প্রকাব বিকৃত খবর, তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ঠিকই; কিন্তু এব চিড়খাওয়া মনও কয়েক দিনের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার তাগিদে, পেটের ধান্দায় জোড়াতালি দেওয়া জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই পুরোনো ফাটল দিয়ে ভাঙন ধরল হঠাৎ।

সুধানী-গোলার জহুরমল ডোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলির উপর ত্রিপল বিছানো। রাতে খেয়ে-দেয়ে গাড়ি চড়লে আরুযাখোয়ায় গাড়ি পৌছুবে কাল সকালে। বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছোটো অবশিষ্টটুকু গাড়োয়ানকে দেয়। বিলট্ গাড়োয়ান খুশি হয়ে ওঠে।

'গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন মুনীমজী। একেবারে আরুয়াখোয়ায় উঠবেন। ঘণ্টায় কোশ যায় গোরুর গাড়ি, দূরের সফরে। আর ধরুন রাতবিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম। সকাল এক প্রহরের সময়, আরুয়াখোয়ায় গিয়ে দাঁতন করবেন।'

মুনীমজী আজকে খুব খুশি আছেন। তিনি যাওযামাত্র সকলেই তাঁর কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করে। পথে যার সঙ্গে দেখা হয, এমনকী কনসী এল. পি. স্কুলের গুরুজি পর্যন্ত তাঁব কাছে খবর জিজ্ঞাসা কবে। একে অতবড়ো গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম; তার উপব তাঁব মালিকেব বাড়িতে 'বিজলী'তে খবব আনাবার কল আছে। সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিযাজিব সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয, কত আওরৎ তাঁকে খুশি কববাব জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজীর কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদেব কাছে অনেকখানি।

'দেখিস বাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা কবে কী নিযে যাচ্ছিস, তাহলে বলিস, আলু; বোবাটা সম্মুখে আছে তো?'

'জি'।

'আমি পিছনেই শুই চিনিব বস্তাগুলোর উপব। সম্মুখেব দিকে চিনির বস্তাগুলো বাখতে পাবলে একটু আবামে শোযা যেত, ঝাঁকানি কম লাগত।'

'জি'।

'মীবপুবে একটু সাবধান থাকিস। ওখানকার গ্রাম এডভাইজবি কমিটির সেক্রেটারি ভাবি বজ্জাত। তাব উপর আজকাল দুনিযাসুদ্ধ সকলে সেক্রেটাবি হয়ে উঠেছে, দেখিস না? ওখানে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কবলে আমাকে ডেকে দিবি। ও-গাঁখানা দিয়ে যাবার সময় চিৎকাব কবে গান গাইতে গাইতে যাস; চুপচাপ গেলেই সন্দেহ কববে। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ। গাঁয়ের সেক্রেটাবিব দাম গড়ে টাকা দশেক। মীরপুরেরটাকে কিনতে টাকা পঞ্চাশের কম লাগবে না। সাবধান।'

'সে আর আমায় বলতে হবে না হুজুর। আপনি শুযে পড়ুন। আমি খুব হেপাজাৎ করে চালাব; খানা গর্ত বাঁচিযে।'

মুনীমজির ঘুম আর আসে না। যে-খবব তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তা শুনলে হাটসুদ্ধ লোক চমকে যাবে। এমন জবর খবর বহুকাল এ-মুল্লুকের লোক শোনেনি।...না, চিনিব বস্তার পিঁপড়েগুলো আর ঘুমতে দেবে না। ঐ হাঁদা-গঙ্গাবাম বিলটটা কি বস্তাগুলো তুলবার সময় ঝেড়েও তোলেনি!

'এই বিলট, ঢুলছিস না কি?'

'না, এই একটু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল হুজুর।' মুনীমজী জানেন যে এইবার বিলট্ আমতা-আমতা করে বিড়ি চাইবে ঘুম ভাঙানোর জন্য।... আর করেই বা কী বেচারি—সারারাত জাগতে হবে তো?...বিলট্ আবার ঐ ভাসা-ভাসা শোনা খবরটা পথের লোকদের দিতে দিতে না-যায়।

'এই বিলটা। এই নে, বিড়ি দেশলাই রাখ্। আর আজকের সুধানীতে শোনা খবরটা কাউকে বলিস না যেন।' বিলট্ এতক্ষণ খবরটি সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি। মুনীমজির কথার পর খবরটা মনে করবার চেষ্টা করে।...

'না, না, মুনীম সাহেব, সে আর আমায় বলতে হবে না। এতকাল আপনাদের নুন

খাচ্ছি, কোনোদিন খবর বলতে শুনেছেন? গরিব মানুষ, আমাদের খবর দিয়ে দরকার কী?'

প্রসন্ন মনে সে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। তারপর বাঁয়ের বলদের লেজ মুড়তে-মুড়তে তার নিকট আত্মীয়ার উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করে।

মুসহর সাওয়ের দোকানের সম্মুখে গাড়ি পৌঁছোয় প্রায় বেলা দশটার সময়।

'রাম রাম মুনীমজী!'

'জয়গোপাল! জয়গোপাল!'

মুসহর সাও আর তার ছেলে, গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির বস্তাগুলি বাড়ির আঙিনার ভিতর নিয়ে রাখে—এখনি আবার অন্য লোকেরা এসে পড়বে।...

'চার বোরা মোটে?'

'কত ধানে কত চাল, তার তো হিশাব রাখো না। ঐ আনতেই হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, মিলের ছাপমারা বোরার উপর অন্য বোরা ঢুকিয়ে, ডবল বস্তার মধ্যে কোনোরকমে আনা।'

আলুর বোরাটা দোকানের সম্মুখেই নামিয়ে রেখে, সাওজি বলে, 'এবার বলুন হালচাল।'

মুনীমজী গম্ভীর হয়ে যায়; প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে দাঁতন আনতে বলেন। সাওজি বোঝে, আজ কিছু জবর খবর আছে। একে-একে লোক জমতে আরম্ভ করে। বেশির ভাগই দোকানদার; দু-চার জন দূর গাঁয়ের লোক, যারা চালের গাড়ি নিয়ে এসেছে হাটে। অজস্র 'রাম রাম মুনীমজী'র প্রত্যভিবাদন ইঙ্গিতে সেরে মুনীমজী একমনে দাঁতন করতে থাকেন; ভাবে মনে হয়, সংসারে তাঁর দিকদারি ধরে গিয়েছে! সকলে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে,—কতক্ষণে তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হবে, কতক্ষণে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনতে পাবে।...এইবার গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন; আবার স্নানের জন্য তেল চাইবেন না তো...।

অন্য দিন হলে সাওজি স্নানের কথা তুলত; এখন ইচ্ছা করেই খবর শোনবার লোভে সে-কথা ওঠায় না। মুনীমজী বিলট্ গাড়োয়ানকে দুইজনের জন্য দই চিঁড়ে কিনবার পয়সা দেন।

'ভালো দেখে গুড়ও কিছু আনিস; চিনি তো আর পাওয়ার জো নেই এক চিমটি, এই যবে থেকে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হয়েছে।'

তারপর মুনীমজী সমবেত লোকদের দিকে না-তাকিয়ে, ট্যাঁকে কয়েকটি অবশিষ্ট খুচরো পয়সা গুঁজতে-গুঁজতে বলেন, 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' কথার সুরে মনে হয় এ একটা সাধারণ খবর, হামেশাই এ-রকম বহু জেলা পাকিস্তান হয়ে থাকে। এতক্ষণে তাঁর সম্মুখের লোকদের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়। ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে; কোনো বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদের বৈঠক

ডেকেছেন যেন।

মুহূর্তের জন্য সকলে নীরব হয়ে যায়। শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আর সকলের বুক টিপ-টিপ করে—না জানি তার জেলায় কী হয়েছে; এইবার বুঝি মুনীমজী তাঁর গাঁয়ের কথা বলবে। সাওজির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভয়ে; —তার দোকান, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার! সে সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে —'আর আমাদের আরুয়াখোয়া?'

'আরুয়াখোয়া তো পূর্ণিয়া জেলা, হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়—এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর-কারও টুঁ ফ্যাঁ চলবে না।'

হাটের দোকানদাররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মুনীমজী এক সঙ্গে সব খবর বলে ফেলেন না,—আস্তে-আস্তে টিপে-টিপে খবব ছাড়েন। এতগুলি লোক উদগ্র উৎকণ্ঠতায তাঁব দিকে চেয়ে রয়েছে, লাটসাহেবেব বেতাব-বক্তৃতাব মতো তাঁর কথার দাম আছে এখানে। এই সময়টুকুকে যত টেনে বড়ো কবা যায—এই মানসিক বিলাসের মোহ কম নয়।

দূরের হাটুরেরা চালের গাড়ি নিয়ে সকলেব চেযে আগে আসে। তাদের মধ্যে থেকেও অনেক এসে জমেছে এখানে।

অছিমদ্দি জিজ্ঞাসা করে, 'মীবপুব কোথায পড়ল, হুজুর?'

'মীরপুর কোন জেলায়?'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে অছিমদ্দি বলে, 'হরিশচন্দ্রপুর থানা।'

সাওজি বলে দেয়— 'ও হল মালদা জেলা।'

'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।'

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দি এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে আর-কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বজরগাঁব পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান আছে। সাওজি উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁব কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজির সম্মুখে যেতে-যেতে প্রশ্ন করেন —'আর বজরগাঁ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা?'

'বাবাজি, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তা করবেন না। রামজির আশীর্বাদে ওটা হিন্দুস্থানেই পড়েছে।'

'পড়বে না? বাপ-পিতাম-র আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হল। জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালেব রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে? বড়োলাট ভারি সমজদার লোক। নারায়ণ! নারায়ণ!'

নারায়ণকে প্রণাম করবার সময় অছিমদ্দির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কৌতূহল ও উদ্‌বেগের মধ্যে এতক্ষণ সকলে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন সকলেই তাব দিকে তাকানোয়, সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।...এক কাসেম ছাড়া আর সকলেই

তাকে অপরাধী মনে করছে। তার গাঁয়ের আসগর আলি পত্তনিদারই নিশ্চয় চেষ্টা করে তার গাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে।...

খবরটায় তার আনন্দ হয়েছে এইটুকু তার অপরাধ। তবুও সে বোঝে যে সে এখানে অবাঞ্ছিত। সে কাসেমকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। দূরে তাদের গাড়ির কাছে গিয়ে অছিমদ্দি একগাল হেসে বলে, 'বাপকা বেটা আসগর আলি পত্তনিদার; কথা রেখেছে। চল, তাড়াতাড়ি ধান বেচে—যা দাম পাওয়া যায়। গাঁয়ে গিয়ে পত্তনিদারের সঙ্গে দেখা করে শোকরিয়া জানাতে হবে।'

কাসেম বলে, 'এখনই ফিবে চল; ভয় করে হাটে আজ এদের মধ্যে।'

'ধান না-বেচলে ওষুধ কিনবি কী দিয়ে? একবার খরচ করে দু-জেলার চাল ধরাব পুলিশদের মন পিছু দুটাকা করে দিয়েছিস। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে আবাব ঐ খরচ করতে হবে। এদিকে রোজগারের নামে খোঁজ নেই। এখানে হাজি সাহেব হাটের ইজারাদার। ভয়টা কীসের শুনি? গোলমাল হলে লেঠেল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে না!'

কাসেম সাহসে ভর করে ইজারাদারের কাছারিতে যায়-হাজার হোক মুসলমান তো ইজারাদার সাহেব! আগে হলে কাসেমের এ-সাহস হত না কিন্তু গত বছর বিহাবেব কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কাসেম দ্যাখে যে সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত করেন। দূবের লোকদেব তখনই বাড়ি ফিরতে বলেন। 'চারিদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষাণগঞ্জ সাবডিবিশন হিন্দুস্থানে গেলেই হল। এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কী?'

কাসেম আর অছিমদ্দির মনে শেষের কথাটা ছাঁৎ করে লাগে। দুজনেই একসঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ করে ওঠে। উপস্থিত সকলে কটমট করে তাদের দিকে তাকায়। তারা তাড়াতাড়ি ইজারাদার সাহেবকে তাদের ধানটা কিনে নিতে বলে—যে-কোনো দামে হোক। নিজের 'মঝরে'র লোকের জন্য ইজারাদার সাহেব নিজের দরকার না-থাকলেও তাদের ধানটা কিনে নিতে কর্মচারীকে আদেশ দেন। 'দরটা ঠিক করে নিও, মাসুম, বুঝলে।' মাসুম পুরনো কর্মচারী—সে মনিবের ইঙ্গিত ঠিক বোঝে।

ইজারাদার সাহেব সকলকে বোঝান। 'আরে মিয়া, লাট সাহেবের কথাও বদলায় —ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পঁচিশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্সে—সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হল এ-জেলা হিন্দুস্থানে। কেবল কতগুলো টাকা অনর্থক খরচ হবে এই যা।'

হাট আর আজ জমল না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজির খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজির দোকান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলেই মুনীমজির নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাকে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর

আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দলবেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজী বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজিকে—কী জানি, কোনো মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজির স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয়; আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না-করে হাট ভালোভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আর্দ্রস্বরে মুনীমজী তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত নয়। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোল টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

খানিক পরে ইজারাদার সাহেবের সেপাই খবর দেয় যে, তিনি মুনীমজিকে ডেকেছেন। তিনি যেতেই তাঁকে এক আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান ইজারাদার সাহেব। বেতারের খবর সম্বন্ধে কথাবার্তা হওয়ার পর ইজারাদার সাহেব বলেন, 'আমার এ-হাট এবার গেল। যাক, সে তো বরাতে যা আছে হবেই। এ-সব তো এখনো অনেক কাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক-বোরা চিনি এনেছ?'

'এনেছি চার বোরা। এক বোরা সাওজিকে দিতে হবে। তোমার তিন বোরা। এবার কিন্তু সত্তর টাকা মন।'

'তাজ্জব কথা! এতদিন ছিল ষাট টাকা, আজ হঠাৎ দাম বাড়ালে চলবে কেন? আর সাওজিকে আধ বস্তা দাও—আমাকে সাড়ে তিন বস্তা। গতবারে যে চিনি দিয়েছিলে, তা ছিল একেবারে ভিজে।'

'সাওজির তো মোটে এক বস্তা—তার মধ্যেও তোমার পাকিস্তানের দাবি। সে হয় না; ওকে এক বস্তা পুরো দিতেই হবে; কথার খেলাপ যেতে পারে না। আর চিনি ভিজবে কী করে। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা। হ্যাঁ, আর দুটো করে পাটের বস্তা যে বিনা পয়সায় পাচ্ছ, তার দাম কি আমি ঘর থেকে দেবো নাকি? বললেই হল ভিজে। তার উপর মালদা আর দিনাজপুর এখন তো পাকিস্তান হল। সেখানে এখন তো খুব ক-দিন মোফিল চলবে। ঈদের জন্য চিনিও লোকে এখন থেকেই জোগাড় করবে; আড়াই টাকা সের অনায়াসে তুমি পাবে।'

...মুনীম সাহেবের কথার বন্যায় ইজারাদার সাহেবের যুক্তিস্রোত ঘুলিয়ে যায়; থই না-পেয়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। 'কী যে বলো মুনীমজি; মুসলমানের হাতে পয়সা কোথায়?'

'আচ্ছা যাও, দু-টাকা কম দিও। হ্যাঁ, তবে আর একটা কাজ করতে হবে ইজারাদার সাহেব, আমাকে খান কয়েক গোরুর গাড়ি ঠিক করে দিতে হবে। সুধানীর গোলায় চাল নিয়ে যাবে। এখানে অত রাখবার জায়গা নেই। বর্ষার দিন, বাইরে পড়ে রয়েছে। তোমার হাতে আছে অনেক গাড়োয়ান।'

'আচ্ছা, সে হয়ে যাবে সব ঠিক। ভোর রাত্রে গেলেই হবে তো?'

মাসুম এসে খবর দেয় যে, হাটের লোকেরা খেপে গিয়েছে। তারা দলবেঁধে কাছারি বাড়ির মাঠে ঢুকেছে। তারা মুনীমজিকে ফেরৎ চায়—আপনি নাকি তাঁকে আর জিন্দা ফিরতে দেবেন না।

বাইরে তুমুল কোলাহল শোনা যায়।

'লোকগুলো পাগল হল নাকি!' ভয়ে ইজারাদার সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

দুজনে এক সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা ইজারাদার সাহেবকে দেখে, হাটুরেদের সম্মুখে আগিয়ে দেয়, হাজার হোক তাদের জমিদার তো। মুনীম সাহেব এসে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। স্বর নামিয়ে সম্মুখের লোকদের বলেন, 'ওর সাধ্যি কি আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ি ফেরনি? আজকালকার দিনে বাড়ি-ঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভালো। তোমরা তো সব বোঝোই। আমি আর কী সলা দেব! নিজের-নিজের গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভালো হয় করো।...মেয়েছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁশিয়ার থাকবে। আমরা তো সুধানী বাজারেও জানানাদের রাখতে সাহস পাইনি—সব রাজপুতানায় রেখে এসেছি এই মাসে। যন্ত্রপাতির কর্ম, বলা তো যায় না, কী বলতে কী বলে। শালা লাটসাহেবের মুখ ফস্‌কে পূর্ণিয়াটা বেরুলেই তো সব চৌপট হয়েছিল—সাবধানের মার নেই।'...

রাজবংশীদের সরু-সরু চোখগুলি ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'পোলিয়া' মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে।

'আর এখন নুন কিনতে হবে না'; 'ওরে বাচ্চিদাই, কোন দিকে গেলি শিগ্‌গির আয় না', 'ওঠ নবাবপুত্তুর, এখনও জাবর কাটছে!' 'আজ দাম চাই না, খালি তুমি ওজন করে নিয়ে রাখো'...'এই টাকাটা মুনীমজি আমানত রাখবেন গোলায়, কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না'...

আতঙ্কমুখর পরিবেশ সুস্থ মনকেও দুর্বল করে তোলে। অল্পক্ষণের অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার পরই হাট নীরব হয়ে আসে।

পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়াবের রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত—এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ির পর গাড়ি আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে-দলে মেয়ে, ছেলে, গোরু, ছাগল। ছোটো ছেলেটির মাথায় পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে-ধুঁকতে চলেছে হাড়জিলজিলে কালাজ্বরের রুগি, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে-কাশতে চলেছে হেপো বুড়ি—পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি! এতদিন ছোট্টো ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মতো অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে; যদি খেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কী—এখন তাল পাকার সময়।

পূর্ণিয়া আর দিনাজপুর—দুটো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনোটাই 'নাগরে'র উপরের পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বোড়ে পুলটার উপর খুব ধকল চলেছে

আজ ক-দিন থেকে। পুলের দু-দিকে ক্যাম্প পড়েছে। মুনীমজি কলকাতার এক রিলিফ সোসাইটিকে বলে-ক'য়ে শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আরুয়াখোয়ায় একটি ক্যাম্প খুলিয়েছেন। লোকাল বোর্ডে খবর দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছেন। সব কাজ হচ্ছে মুনীমজির সহযোগিতায়।

কতলোক মুনীমসাহেবের ক্যাম্পে সুখ-দুঃখের কথা বলতে আসে। তিনি কাউকে আশ্বাস দেন, কাউকে রামজির শরণ নিতে অনুরোধ করেন, কাউকে ধৈর্য ধরতে বলেন; কারও কাছে বা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলনীতির নিন্দা করেন। তারপর রিলিফ কমিটির চিঁড়ে-দইয়ের স্লিপ কাটতে-কাটতে বলেন, 'কজন? পাঁচ; এক বাচ্চা? আচ্ছা ঐ ঝাণ্ডাওয়ালা তাঁবুতে মোহর করিয়ে সাওজির দোকানে নিয়ে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কৃতজ্ঞতায় শরণার্থীর মন ভবে ওঠে—এই বিপদের সময় মিষ্টি কথাই বা কজন লোক বলে!

পুলের ওপারে রেলিঙের উপর লাগানো হয়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লিগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসি তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চিৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান', বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্থান', এদিকের দল চ্যাচায় 'বন্দে মাতরম্', 'জয়হিন্দ'।

তিক্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হতে দেরি লাগে না। এই বুঝি কোনো কাণ্ড হয়, হয়! এদিকে গুজব ওঠে যে ওরা পুলে আগুন লাগিয়ে দেবে—যাতে জিনিশপত্র নিয়ে ওদিক থেকে আর-কেউ না-আসতে পারে। অমনি এদিককার লোক গর্জে ওঠে, 'এদিকের গোরু মোষ আর যেতে দেবো? আমরাই আগে পুলে আগুন ধরাব।' এপারের লোকদের মুনামজি ঠাণ্ডা করে; ওপারের লোকদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়—

মুনীমজী তাদের বোঝায়, 'দু-দিন সবুর করো তো। দ্যাখো না কী হয়। মহাত্মাজি কী আর চুপ করে বসে আছেন? লাটসাহেবকে দিয়ে 'কমিশন' বসিয়েছেন হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানি লোক, রাজার বাড়ির ছেলে।'

সঙ্গে-সঙ্গে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যাও সকলের মুখেই ঐ একই কথা, 'কমিশন', 'কমিশন'।

শ্রীপুরের চুয়ালাল রাজবংশীর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে। মুনীমজী সব খবর বলে না নাকি; তাই তাকে সকলে চালের গাড়ির উপর বসিয়ে সুধানী ইস্টিশনে পাঠায় 'কমিশনে'র খবর আনতে। চুয়ালাল ভয় পাবার ছেলে নয়; সে সোজা পয়েন্টসম্যান সাহেবকে 'কমিশনে'র খবর জিজ্ঞাসা করে। পয়েন্টসম্যান বলেছিল যে কমিশনের খবর তো বেরিয়েছে। তাদের মাইনে আর ভাতা বাড়বে। শ্রীপুরের লোকেরা এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি।

কমিশন। ইজারাদার সাহেবের পুরনো সেপাই ইসরাইল লাঠি ঠুকে বলে, 'কমিশন নেওয়া হয় গোলাতে, পাট খরিদের উপর 'ধর্মাদায়' বলে। কোনো মুসলমান আজ থেকে

আর এ দিচ্ছে না। বের করাচ্ছি কমিশন। আরুয়াখোয়া হাটিয়া হিন্দুস্থানে এলেই হল।'

দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবা শুকনো উরুতে তাল ঠুকে বলে, 'এই হাটের তোলা মুসলমান ইজারাদারকে কোনো লোক দিও না। ঘর দোর জমি-জিরেৎ ছেড়ে হিন্দুস্থানে এসেছি কি এমনি। সেখানে হিন্দুকে মেয়ে-বেটি নিয়ে থাকতে দেবে না শুনেছি। এখানেও আবার মুসলমানকে তোলা দিতে হবে?'...সে আরও কত-কী বলতে যাচ্ছিল, দর্পণের মা তার হাতে ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যায়...বদলোকদের চটিয়ে লাভ কী?

হাটের তোলা দেওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মুনীমজি সাওজিকে বলে, 'দেখছ, ইজারাদার সাহেব আর রাতে এপারে থাকে না। ওদিককার ক্যাম্পের খরচ কি ওই চালাচ্ছে নাকি?'

'না, চাঁদা তুলে চালাচ্ছে ইজারাদার সাহেব। গোপালপুর থানাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় কমিশনকে টাকা খাওয়াতে হবে বলে, ও আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলছে।'

মুনীমজীর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে; ইজারাদার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় না ঈর্ষায়, ঠিক বোঝা যায় না।

সাওজি আবার বলে, 'তা মুনীমজি, আমরাও হাট থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দিতে পারি, গোপালপুর থানাকে পাকিস্তান থেকে বাঁচানোর জন্য। ইজারাদার ভারি ফন্দিবাজ লোক—কমিশনকে আবার টাকা দিয়ে হাত না-করে নেয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই প্রাণটা বাঁচে, পূর্ণিয়া জেলাটাও বাঁচে।'

মুনীমজী এই হিশাবই এতক্ষণ মনে-মনে খতিয়ে দেখছিলেন। তাঁর হিশাবে ভুল না-হয়। এখন চাঁদা তুলে যা লাভের সম্ভাবনা, তার অনুপাতে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশি। এক করলে হয় একটি জিনিশ, চাঁদা তুলে চুপচাপ থাকা, যদি পাকিস্তানে যায় জায়গাটা তাহলে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে, বলা যাবে যে হাকিমদের ঘুষ খাওয়ানো গেল না; আর যদি পাকিস্তানে না-যায়, তাহলে টাকাটা নিয়ে বললেই হবে যে কমিশনকে খাইয়েছিলাম।...না, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যা রয় সয় তাই ভালো।...

'না-না, সাওজি, ও-সব হাঙ্গামায় আমি পড়তে চাই না। ওর জন্য কংগ্রেস সরকার রয়েছে, মহাত্মাজি রয়েছেন, আমার মালিক রয়েছেন। কিন্তু পুলের দু-দিকেই যে মাল আটকাচ্ছে, তার কী উপায় করা যায় বলো। বর্ষার নদী। অন্য সময় হলেও না-হয় একটা-কিছু ব্যবস্থা করা যেত।'

'দুদিককার ধান-চালের পুলিশও দেখছি, আজ ক-দিন থেকে যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা হয়ে উঠেছে। আজ দেড়শো টাকার লোভ ছেড়েছে—দেড়শো মোষ যাচ্ছিল মজঃফরপুর থেকে মৈমনসিং। ওপারের চালের অফিসারও কদিন থেকে টাকা নিচ্ছে না, এ-হাট তো উঠে যাবে দেখছি। সাধে কি আর ইজারাদার হাটে থাকার অভ্যাস কাটাচ্ছে।'

'হাকিম-টাকিম আসতে পারে, এই ভয়ে নিচ্ছে না বোধহয়। দু-চার দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। এত ভাবনা কীসের? রিলিফের কাজ তো তোমার দোকান

থেকে চলছেই। এত এখন ভাববার দরকার কী তোমার? কারবারি লোক আমরা, কোনো রকমে দু-পয়সা রোজগার করবই।'

সাওজি এ-কথায় সায় দেয় বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না...বিলিফের জিনিশের লাভের থেকে টাকায় চার আনা দিতে হবে মুনীমজিকে...কত আর থাকবে।...

'এক মানুষ হয়েছিল পাটের গাছগুলো', 'গোঁয়ার গোবিন্দ জামাই এল না' 'মেয়েটার কপালে অনেক খোয়ার আছে', 'ওলাওঠায় গাঁ যখন উজাড় হয়ে গিয়েছিল তখনও গাঁ ছাড়িনি'...নিত্য নূতন স্বরে, নূতন ভাষায় শোনা যায়...একই দুঃখগীতির পুনরাবৃত্তি।

দর্পণ সিং বাবাকে সান্ত্বনা দেয়, যাক, মেয়েদের ইজ্জৎ বেঁচেছে। বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে, 'আমার চাকর এরফান আমার ষাট বিঘা জমি পেয়ে আবে। এই হল ভগবানের বিচার!'

ইজারাদার সাহেব দিনের বেলায় কাছারি ঘর থেকে দেখে তিনরঙা ঝাণ্ডাটি...হাওয়ায় উড়ছে আর ঐ সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে নৈরাশ্য, বিদ্বেষ, আর আতঙ্কের বিষ—যার প্রতীক ঐ তিনটি রং...ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে ওপারের সবুজ পতাকার কাছের ক্যাম্পে চলে যাই। এতটুকুর মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে কত পার্থক্য। একটি তার নিজের। এর নিচে আছে শান্তি, সুখ, অনাবিল আনন্দ, 'অল হিলালে'র ছায়ার তলের নিরাপত্তা।—কিন্তু এই রাজবংশীগুলোর ভয়ে, নিজের জমিদারি ছেড়ে পালালে আর কখনও ভবিষ্যতে এ-হাট থেকে এক পয়সাও তোলা উশুল করা যাবে? কমিশনের রায় কী হবে বলা যায় না—সবই খোদার মর্জি।—

দর্পণ সিং-এর স্ত্রীকে সাওজির মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'তোমরা তো পুলের ওপারে পাকিস্তান হওয়ার পর একদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রসুন ফোড়নের দুর্গন্ধ নাকি? লোকগুলো শাক ডাঁটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি আরম্ভ করেছিল বুঝি?'

প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে সে কোনো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আপন মনে বকে চলে—'লকলকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে একদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি। সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল না কি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল।—চ্যালাকাঠ দিয়ে আসবার সময়, উনুনটা ভেঙে দিয়ে এলাম,—কী সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম,—তাতে রাঁধবে কিনা এরফানের চাচি,—আর যে-জিনিশ রাঁধবার নয় সেইসব জিনিশ।...বিপদ হয়েছে ঠাকুরের মূর্তিটাকে নিয়ে। ঐ জন্যই ছিল ভয়। ঠাকুরের অসীম কৃপা।—আমরা বোকা মূর্খ মানুষ, তাই তাঁর ভাবনা ভেবে মরি। দেখি আবার পুরুত মশাই ও-সম্বন্ধে কী বিধান দেন। এখানে ছত্রিশ জাতের মধ্যে ভালো করে যে দুটো ভোগ দেবো সে-উপায়ও রাখলে না ঠাকুর,—'

দর্পণের স্ত্রী ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে বোঝে যে দুজনেরই অজ্ঞাতে কখন সাওজির স্ত্রী তার বেনে-সুলভ হিশাবনিকাশের মন ভুলে গিয়ে

তাব হাত চেপে ধবেছে। দবদী হাতেব স্পর্শ ছাড়িযে ঠাকুবকে যুক্তকবে প্রণাম কবতেও মন চায না।...মাত্র তিন দিনেব পবিচয—কোন দূব দেশ সেই বালিযা—সেখানকাব বেনে বৌ—তাব বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে দর্পণেব স্ত্রী নিজেব মনেব গুরুভাব লাঘব কববাব চেষ্টা কবে।...

দুবদৃষ্টেব আকস্মিকতা লোকেদেব এ-কযদিন অভিভূত কবে ফেলেছিল। দিন কযেকেব মধ্যে বিপদ গা সওযা হযে যায, আতঙ্কেব তীক্ষ্ণ অনুভূতি আসে ভোঁতা হযে। গোরুব গাড়িব ভাড়া আব খাবাবেব দাম যা দ্বিগুণ হযে গিযেছিল, আবাব কমে আসে। চালেব পুলিশদেব ন্যাযনিষ্ঠ হওযাব তিন দিনেব বাতিক সেবে যায। গাড়ি-গাড়ি চাল পুল পাব হযে আসতে আবম্ভ কবে, হাজাবে-হাজাবে গোরু মোষ ওপাবে যায।

সব কাজেব মধ্যেও লোক কমিশনেব খববেব জন্য ব্যস্ত। মুনীমজী প্রথম হিড়িকেই যত চাল কিনেছেন, সব পাঠাচ্ছেন সুধানীতে; প্রত্যহ অজস্র গাড়িতে বোঝাই কবে। মুনীমজিব কথা স্বতন্ত্র, তাই তাব ভাড়া কম লাগে। লোক তাঁব কাছে এত কৃতজ্ঞ যে তিনি যদি বিনা পযসাযও গাড়ি নিযে যেতে বলেন—তাহলেও গাড়োযানবা নিজেদেব কৃতার্থ মনে কবত হযতো।...

'কিন্তু মুনীমজী সাচ্চা আদমি,—হিঁদুব ছেলে, আব এদিককাব মছলি খাওযা হিঁদু নয। বাজপুতানা, বীবেব দেশ,'—তাবা মুসলমানেব কাছে একদিনেব জন্যও মাথা নিচু কবেনি। তিনি মাগনা তোমাদেব গাড়ি নেবেন না; বেগাব গাড়ি নিতে পাবে মুসলমান ইজাবাদাব। মুনীমজি ওযাজিব ভাড়া দেবেন তোমাদেব।'

'সে-কথা আব বলতে হবে না সাওজি। কমিশনেব খবব কবে বেবোবে?'

'কে জানে। শুনছি তো দু-এক দিনেব মধ্যে। মুনীমজী বলছিল যে মুসলমানবা আবাব এতেও বখেবা লাগিযেছে।'

সাওজি, মুনীম সাহেবেব চিঠি আজ আমাব হাতে দিও।'

'তুই তো পবশু নিযেছিলি শুকদেব। আজ আমাকে দিও।'

'আমাকে' 'আমাকে'—কমিশনেব খববেব জন্য মুনীম সাহেব প্রত্যহ সুধানী গোলাতে যে চিঠি দেন, সব চালেব গাড়িব গাড়োযানই তা নিযে যাবাব সৌভাগ্য পেতে চায।

সিবিলাল সাওজিকে জিজ্ঞাসা কবে, সুধানী গোলায যে লাটসাহেবেব খবব দেওযাব কল আছে, তাতে যত খবব আসে সব কি দোকানেব লম্বা খাতায লেখা হয না কি? সেদিন মুনীমজীব চিঠি গোলায দেওযাব পব সেটা তাবা খাতায লিখে নিল; আব খাতা থেকে দেখে দেখেই জবাবেব চিঠি দিল।'

'হবে। ও-সব বড়ো বড়ো গোলাব কাণ্ডকাবখানা। আমবা আদাব ব্যাপাবি—ও-সব খোঁজ বাখি না। বামজিব কৃপায আব তোমাদেব সেবা কবে বালবাচ্চাকে দুটো খেতে দিই। মিশ্রিলাল আজ চিঠি নিযে যাবে। আব সিবিলাল, কাল মুনীমজী নিজেই যাবে সুধানীতে। তোব গাড়িতে একটা টপব দিযে নিতে পাববি না? আচ্ছা, আমি জোগাড় কবে দেব। ইজাবাদাব সাহেব তো তাব টপব দেওযা গাড়ি মুনীম সাহেবকে দিতে পাবলে

বর্তে যায়। কিন্তু মুনীমজী সে বান্দাই নয়। ও মরদ কা বেটা। ইজারাদারের কাছ থেকে এক কানাকড়ির উপকার নিতেও রাজি নয়। কাল চাই একজন বিশ্বাসী গাড়োয়ান। লোকের আমানতি টাকা চাল কেনার পরেও কিছু বেঁচেছে মুনীমজীর কাছে। সেইসব পাবলিকেব টাকা গোলায় রাখতে হবে। চোর-ছ্যাঁচড় ভরা হাটের মধ্যে কি অত টাকা বাখা যায়? গোলা থেকে পরে, গোলমাল মিটলে এই পুরো টাকা ফেরৎ দেবে সকলকে;—এক পয়সাও কেটে নেবে না। তেমন চোব গোলাই নয়; ডোকানিযাজিব গোলা—লাটসাহেব পর্যন্ত জানে।'

'মুনীমজী!' 'মুনীমজী।' যেখানে যাও কেবল মুনীমজীর গল্প।

তাঁর স্নানাহারেব পর্যন্ত সময় নেই। দিন-রাত কাজ করছেন, কী করলে শরণার্থীদের একটু সুখ-সুবিধা হয কেবল তারই চেষ্টা!

দর্পণ সিং-এব বাবাকে তিনি আগাম টাকা দেবেন বলেছেন। বুড়ো চেয়েছিল এরফানকে ঠাণ্ডা কবতে—সে কিনা রাজবংশীব মেযেকে বিয়ে করবে বলে। সব বিপদ তুচ্ছ কবেও মুনীম সাহেব এরফানকে সায়েস্তা কববার জন্য, দর্পণের ষাট বিঘা জমি কিনে নেবেন কথা দিযেছেন। আর গোলার জোতের অধীনে পনের বিঘা বন্দোবস্ত দেবেন বলেছেন দর্পণকে—অবিশ্যি কমিশনের রায়ের পর।

মুনীম সাহেবের কর্মক্ষমতায বিহাব বাংলা দুই দিককার সরকারী কর্মচারীরাই সন্তুষ্ট, কলকাতার রিলিফ সোসাইটি তাঁব প্রশংসায পঞ্চমুখ; হিন্দুবা সকলেই তাঁব কাছে কৃতজ্ঞ, মুসলমানরা তাঁর উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ নয়।

'পনেরোই আগস্ট, হিন্দুস্থান আজাদ হবে'—মুনীমজী সব দোকানদাবকে খবর দেন।

'আর পাকিস্তান?'

'হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও আজাদি দিতে হবে ঐ দিন।'

সমবেত শত-শত লোক প্রশ্ন কবতে চায়—'ওটা কি আর কিছুতেই আটকানো যায় না?' যেন এই নীরব প্রশ্নেবই উত্তর দিতে বাধ্য হযে মুনীমজী জবাব দেন, 'এই নিয়েই যদি খুশী হ'স তো নে।' মুসলমানদের প্রতি একটা দমকা উদারতাব ঝাপটায় —'*দিন কয়েক পরেই ঠেলা বুঝবি*'—কথা কয়টা জিভে আটকে যায়।

দিনাজপুব আর মালদার শরণার্থীদেব ভীতিবিহ্বল মুখে উৎকণ্ঠাব ছায়া ঘনিযে আসে। একসঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করে—'কমিশন', 'আর কমিশনের রায়?'

'ও বেরোবে দিন কয়েক পব। তবে পূর্ণিয়া জেলা, মানে এই আরুয়াখোয়া পাকিস্তানে যাবে না এ-কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।' পূর্ণিয়া জেলার লোকরা, বিশেষ করে আরুয়াখোয়া বাজারের দোকানদাররা চিৎকার করে ওঠে 'গান্ধিজি কী জয়!' ছাতা, খড়ম, গামছা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। যদু পানওয়ালা আনন্দে নাচতে-নাচতে, তার সমস্ত পানের খিলি হরির লুঠ দিয়ে দেয়।

মালদা, দিনাজপুরের অনেক লোক পূর্ণিয়া জেলায় মুনীমজীর কাছ থেকে জমি নেওয়ার কথাটা আবার তোলে।

পূর্ণিয়া জেলার এদিকটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের এলাকা। পড়তি জমি পড়ে আছে কোশের পর কোশ—অভাব পয়সার, অভাব চাষ করবার লোকের।

...এত সিকমিদার পাওয়া যাবে।—তার উপর প্রচুর সেলামি। অধিকাংশই জোত আর রায়তি জমি। ভাগ্য ভাল—না-হলে আবার মিনিস্ট্রি জমিদার ওঠাচ্ছে, কী হত বলা যায় না।—ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির ছবি মুনীমজীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের অনুনয়ের কোনো উত্তর না-দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান—নেওয়া না-নেওয়া তোমাদের ইচ্ছে, আমার ওতে কোনো আগ্রহ নেই।

'তবে একটা কথা। জমি বিলি-ব্যবস্থার কথা আসবে পরে। এখন যে এইসব শরণার্থীরা এত যে গোরু-মোষ নিয়ে এসেছে, এ তো যেখানে-সেখানে চিবকাল চর্বতে পারে না। গেরস্তরা তা চরতে দেবেই বা কেন? এদের চরবার জন্য আমি মাসিক হাবে জমি ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি—শস্তায়; কিন্তু দেওয়া চাই নগদ।'

সকলেই একটা সমস্যার সুরাহা পেয়ে তাঁর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। কার কাজ আগে হবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

এদিককার এই জয়ধ্বনি পুলের ওপারেও চাঞ্চল্য জাগায়। 'কী! কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই কিছু ঘটে থাকবে। ঘাবড়াস না।'

টিনের চোঙটা হাতে নিযে একবাল চিৎকার করে 'নারায়ে তকদীর।' অপর সকলে বলে 'আল্লাহো আকবর'—'মুর্দা না কি? জোরে বলতে পারিস না? ওপারের আওয়াজকে ডুবিয়ে দিতে হবে।' হানিফ, এক্‌বাল, আরও কয়েকজন জয়ধ্বনির কারণ জানতে বেরোয়।—

'তোরা ততক্ষণ থামিস না যেন বুঝলি।'

'কে যায় গাড়িতে?'

'শ্রীপুরের দর্পণ সিং-এর জামাই আর মেয়ে।'

'সার্চ কর গাড়ি, পাকিস্তান থেকে আবার কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছে না তো।'

সঙ্গে-সঙ্গে এরফান এসে পড়ে।—'কে, দিদিমণি? জামাইবাবু?—যেতে দাও গাড়ি। পালিয়ে যাচ্ছ কেন? আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কী, দিদিমণি? খোকাবাবু কত বড়োটা হয়েছে দেখি। ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। কিছু ভয় নেই দিদিমণি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার এসো। তোমাকে তো, জামাইবাবু, ভেবেছিলুম মরদ। তুমি আবার পালাও কেন?'

জামাইবাবু, আমতা-আমতা করে। এরফান খোকার হাতে একখানা কাগজের তৈরি লিগের ঝাণ্ডা দেয়—'কেমন সুন্দর দেখতে, না খোকাবাবু?'

তারপর সঙ্গে গিয়ে গাড়িখানা পুল পার করে দিয়ে আসে। বিদায় নেওয়ার আগে জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা করে—'রাজা হেঁটে, আর পেরজা (প্রজা) গাড়িতে।'

খবর জানার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলার যে-সব মুসলমান এক্‌বালের সঙ্গে ছিল, তারা ইজারাদারের উপর চটে আগুন হয়ে ওঠে।—ওটা চাঁদার টাকা নিশ্চয় খেয়েছে।

আজকে ওটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে—এখন আরুয়াখোয়া কাছারিতেই আছে বোধ হয়। হিঁদুরের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, ওদের দিকে রায় করে দিল না তো? আজ রাত্রে এদিকে আসতে দে না।—

মুনীম সাহেবের খবরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দুই পারের লোকের মধ্যে। দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবাও জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে—শ্রীপুর হিন্দুস্থানে আসবে এ দুরাশা যে ক-দিন জিইয়ে রাখা যায়। তার পরই তো সম্মুখে পড়ে আছে দুঃখ-বেদনাময় জীবন—যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই পুল পার হওয়ার দিন থেকেই। দীর্ঘ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির স্মৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কি সম্ভব? আর, এই দেশে? এতটা বয়স হল—'নাগর' নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জ্বরের দেশ বলেই জেনে এসেছে। আজ একে সোনার হিন্দুস্থান বলে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ করে নাচার অসংগতি বৃদ্ধের সংসারাভিজ্ঞ মনে খচখচ করে বেঁধে। কেন এমন হল তা সে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

সেবার 'নাগর' যখন ঘর-দোর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাচা বেঁধে বাঁধের রাস্তার উপর কতদিন কাটাতে হয়েছে; এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।—কিছুক্ষণ ভাববার পর যেই এরফানের কথা মনে পড়ে, অমনি ব্যর্থ আক্রোশের বেড়াজালে, সকল যুক্তিতর্কের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই উত্তেজনার মধ্যে মুনীমজি ছ'খানা গাড়ি বোঝাই করে কী-সব জিনিশ এনেছে; সে কথা সকলে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যায়।

মুনীমজীর হুকুম, আর পুলের এপার-ওপারের লোকের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি নয়। পনেরোই দুই দিকেই প্রাণখোলা উৎসব করতে হবে, যা হওয়ার হয়েছে।

নিজে এগিয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে মুনীমজি যেচে আলাপ করতে যান। এতদিন তিনি যেতেন পুলের মধ্যখানের 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' পর্যন্ত। এখন যান একেবারে ওপারের ক্যাম্পে। সকলে বলাবলি করে—আলবৎ হিম্মৎদার লোক।

মুনীমজীর মধ্যস্থতায় দুদিককার লোকের মধ্যে প্যাক্ট হয়, কোনো দলই কারও সম্বন্ধে 'মুর্দাবাদ' বলতে পারবে না—'আর পাকিস্তানের নতুন ঝাণ্ডা পেয়েছ তোমরা? না-না, এ নয়। এ তো পুরোনো, লিগের ঝাণ্ডা। নতুন ফ্ল্যাগের খবর রাখো না বুঝি? দরকার থাকে তো আমাকে বলো যত লাগে। সবরকম দামের আছে।'

এপারের লোকদেরও মুনীমজী হিন্দুস্থানের নতুন ঝাণ্ডার কথা এতদিনে বলেন।

'সে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সে কি আর আমি ব্যবস্থা করিনি? সবরকম দামের পাবে।'

সাধে কি আর লোক 'মুনীমজী' করে অস্থির হয়। যখন যেখানে যে-জিনিশটার দরকার, মুনীমজির তা নখদর্পণে।

উৎসব লেগে গিয়েছে রিলিফ ক্যাম্পের কাছে। কলকাতায় বিলট্ গাড়োয়ানের ভাই কাজ করত পাটের কলে। সেখানে নাকি পনেরোই আগস্ট খুব দাঙ্গা লাগবে, তাই সে

বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বাপ-বেটায় দু-দিন থেকে রিলিফ সোসাইটির ক্যাম্পে কাজ করে। কলকাতা-ফেরৎ ছোকরা—অজ-পাড়াগাঁয়ের নিরীহ ছেলেদের উপর খুব মোড়লি করছে। ছেলেদের সে নূতন ভূত-ভূত খেলা শিখিয়েছে —অবিশ্যি আসলে খেলাটা শিখিয়েছে রিলিফের বাবুরা।—একদল হয়েছে বেহ্মদত্যি, একদল হয়েছে মামদো ভূত। একদিককার নাম বেলগাছের দিক, আর একটা কবরের দিক; মধ্যেখান দিয়ে একটা কঞ্চির দাগের লাইন টানা। নোয়াখালিতে মবলে হবে বেহ্মদত্যি, বিহারে মরলে হবো মামদো! কবরের দিকে নূতন কোনো খেলোয়াড় এলেই মামদোরা উল্লাসে নাকিসুবে চিৎকার করে 'বিহার থেকে এসেছে রে'; আর বেলগাছের দিকে কেউ এলেই সকলে জিজ্ঞাসা করে 'নোয়াখালি নাকি?' জবাব দিতে হবে, 'না, চিৎপুর'—

ছেলেরা বিকৃত উচ্চারণে জায়গাগুলোর নাম নেয়। বড়োরা সকলেই এই তামাশা দেখে, আব ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হয়।

মুনীমজি এসে সকলকে তাড়া দেয়, 'এ-সব কী হচ্ছে? আবার একটা গোলমাল পাকাবে নাকি? পালাও সব ছোকরারা, ফের যদি আমি এই দেখি, তাহলে তোমাদের সব কটাকে পুলের থেকে 'নাগরে'ব মধ্যে ফেলে দেবো।'

তারপব রিলিফেব বাবুদেব বলেন, 'আপনাদেব কাছ থেকে আর একটু দাযিত্বশীলতাব আশা বেখেছিলাম।' তারা অপ্রস্তুত হযে যায়।

দু-দিনের মধ্যে সব ঝাণ্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। স্বজাতির লোকের ভয়ে ইজারাদার কোথায় যেন গিয়েছে—তাব সেপাই বলে পাটনায়।

নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। আতর গোলাপের ছড়াছড়িব মধ্যে পুলটি কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়--খানিকটা পাকিস্তানে, খানিকটা হিন্দুস্থানে খানিকটা শূন্যে—। উৎসবেব মধ্যেও এই পুলটির কথাই দর্পণ সিং-এর মনে হয়।—সে-ও থাকে আরুয়াখোয়ায, মন পড়ে থাকে শ্রীপুরের জমির উপর। এই পুলটিই তার দেহ ও মনেব সংযোগের সূত্র। এরই জন্য সময় মতো এদিকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে; ভগবান যদি সুদিন দেন তাহলে এই দিয়েই আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। না, ভগবান কেন, কমিশন। কমিশন কি ভগবানের চাইতেও বড়ো?...

দুই দিকের লোকের সম্মতি নিয়ে রিলিফের বাবুরা পুলের মধ্যখানে ঝাণ্ডাভূতের খেলা দেখায়। ইংরাজের মড়াঝাণ্ডা জড়ানো ছেলের দল প্রথমে চোখ মুছতে-মুছতে চলে যায় তারপর লিগ আর কংগ্রেসের পতাকা জড়ানো ছেলের দলও চোখ মুছতে-মুছতে চলে যায়। মাতৃমের গান গেয়ে। তারপর হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের নূতন জিন্দা ঝাণ্ডা নিয়ে দু-দল ছেলে কোলাকুলি করে,—দর্পণ সিং-এর বাবার মন একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।...

শরণার্থীব দল ছাড়া আর সকলে বোধহয় যখন কমিশনের কথা ভুলেছে, তখন হঠাৎ মুনীমজী খবর দেন, 'কমিশনের রায় বেরিয়েছে।' সকলে মুনীম সাহেবের কাছে ছোটে।

'শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে।'

দর্পণ সিং মুনীম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। তার মা কি বোঝে না বোঝে, হাউ-হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। তার বাবা ভগবানকে আর কমিশনকে প্রণাম করে। কমিশন তাহলে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।—

'হরিপুর থানা পড়েছে পাকিস্তানে।'

'আর মালদা?'

'তোমাদের দিকটা এসেছে হিন্দুস্থানে, শুকদেব। আর কী, মেরে দিয়েছ।'

কপালে তিলক কাটা পোড়াগোঁসাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই প্রথমে বসিকতা কবেন, 'এই আসছি। গোরুব গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখি সিবি সাওয়ের দোকানের দেওয়ালে রং দিয়ে 'কাপস্টান' লেখা। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ছ্যাঁৎ কবে মনে হল লিখেছে পাকিস্তান,—উর্দুর উচ্চাবণে উলটে। ভাবলাম তাহলে আকুয়াখোয়া নিশ্চয়ই গিয়েছে পাকিস্তানে। তারপর শুনলাম ওটা একবকম সিগাবেট।—এখন আমার খবব বলুন, মুনীমজী?'

মুনীমজী তার কথাব জবাব ইচ্ছা কবেই দেন না। বাজবংশীরা তাদের গুরুদেবেব উপর মুনীমজীর এই ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যে আশ্চর্য হয়।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কুসংবাদ জানাতেই হয। 'জলপাইগুডি জেলার তিতলিযা থানা চলে গিযেছে পাকিস্তানে।'

'বললেই হল? চলে গেলেই হল আব কী।'

পরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়েন।—ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে—শেষকালে মরলে কবরে যেতে হবে।...মন্দিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এও কি আমার কপালে ছিল।...

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার স্বস্তি পায় অধিকাংশ শরণার্থীরা। আবার সেই পুরাতন দৃশ্যের পুনবাবৃত্তি। একদিনেব মধ্যে শরাণার্থীদেব ক্যাম্প ভেঙে যায়। দূব-দূর থেকে ফিরে আসে গাড়ি, মানুষ, গোরু, মোষের মিছিল। গাডিগুলির উপব তিনরঙা ঝাণ্ডা লাগানো। মিছিলের লোকদেব মধ্যে কারও কারও হাতে হিন্দুস্থানের পতাকা, মুখে রাজ্য জয় করে ফিরবার দীপ্তি। বাঘের মুখ থেকে বাঁচবার আনন্দে মেয়েরা মশগুল।...

—দ্রুতগতিতে চলছে দুনিয়া। এতকাল যাঁবা সৃষ্টি সংসার চালিয়েছেন, তাঁরা এত দ্রুত তালের কল্পনাও করতে পারেননি। এত লোকের মন নিয়ে এমনভাবে ছিনিমিনি খেলতে সাহসও কবেননি।—সেই কথাই ভাবছে একবাল পুলের উপর থেকে পাকিস্তান ঝাণ্ডাটা নামাবার সময়।...দরকার কী ছিল ক-দিনের এই রাজত্বের? খাবার দিয়ে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল? দুশো বছর লেগে গেল ইংরেজের পতাকা সরাতে, আর তার ঝাণ্ডা সরাতে তিনদিনও সময় লাগল না। মানসিক দুঃখ-বেদনা তো এতে আছেই;

কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা হচ্ছে যে এ অপমান রাখবার জায়গা নেই। পুলের উপর, পথের উপর শরণার্থীর সারি, ওপারে হাটসুদ্ধ লোক দেখছে।—মাথা কাটা যায় অপমানে, নদীতীরের বালির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কত উৎসাহের সঙ্গে এই ঝাণ্ডা সে তুলেছিল। 'তিনদিনের ভিস্তির বাদশাগিরি শেষ হল' —রামজি সাওয়ের এ টিপপনী তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এইখানেই এখনই ওরা ওড়াবে হিন্দুস্থানের ঝাণ্ডা। কিন্তু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে যে এই ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম সে কি এইজন্য? কালই হয়তো শ্রীপুরের ছেলেরা এই ঝাণ্ডা নিয়ে এই পুলের উপর মড়াঝাণ্ডার ভূতের খেলা করবে। কার উপর অভিমান করবে—দুনিয়া যখন তার পিছনে লেগেছে...

কোনো দিকে না-তাকিয়ে একবাল ঝাণ্ডাটি নামিয়ে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায়—উত্তরের দিকে—যেখানে এ-ঝাণ্ডা এখনও মরেনি।

হানিফ নিজের নির্লিপ্ততা দেখানোর জন্যে বিড়ি ধরিয়েছিল। সে খাওয়ার আগে আধ-খাওয়া বিড়িটা পুলের উপর ফেলে যায় আর ভাবে এটা দিয়ে পুলটায় আগুন লেগে গেলে বেশ হয়।...আরুয়াখোয়া আর শ্রীপুর আলাদা হয়ে যাবে তাহলে।...সে জানে যে এ থেকে ঐ কাঠে আগুন লাগা সম্ভব নয়, তবু এটুকু ভেবেও আনন্দ পায়।

মুনীমসাহেব ওপারে ইজারাদার সাহেবের ক্যাম্প দখল করেন।

ছেলেবা পাটের খেত থেকে একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসে—কী মৎলবে লুকিয়েছিল,—আগুন লাগাবে বলে মনে হয়—

'আবে, অছিমদ্দি যে।'

অছিমদ্দি কেঁদে পড়ে।—'গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনছি পূর্বদিকে মুখ করিয়ে নামাজ পড়াবে। মুরগি জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ভাবলাম দিনমানটা পাটের খেতে থেকে, সাঁঝ হতে চলতে শুরু করব'—সে কাঁদতে-কাঁদতে মুনীম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

'ছেড়ে দাও একে। এরা আমাব চেনা লোক।'

'দয়ার শরীর হুজুরের।'

'মুনীম সাহেব কী জয়।' 'মহাত্মা গান্ধিজি কী জয়!'—জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকালে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গর্ভনমেণ্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।'

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে-মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়া-গোঁসাইয়ের খালিবাড়িতে উঠবেন, তাঁর জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন,

সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে জোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিশ দু'-দুবার করে বেচবেন। তিনি হিশেব করেন সব মিলিয়ে তাঁব কত হল। 'কমিশন' অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনেব রায়ের, কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিশেবে কোথাও ভুল হয়নি।...

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ভেসে আসছে 'মুনীম সাহেব কী জয়!'...একটু সন্দেহ মনের মধ্যে খচ্-খচ করে একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধহয় আর-একটু সুবিধে হত...হয়তো হিশেবে একটু সুবিধে হত...হয়তো হিশেবে একটু ভুল হয়ে গিযেছে। যাকগে, রামজি যাকে যা দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।...

মুনীমজী কুঠিয়ালি ভাষায় পকেটবুকে হিশাব লিখতে বসেন।

# স্বাক্ষর

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হাড়িতে ক'রে মালাই-বরফ বেচে দীননাথ। বাড়ি যশোর।

—'আজকে দুটো ফিরেছে। ভালো জিনিশ, রাবড়ি। নে, খা একটা।' দু-হাতের চেটোতে ক'রে টিনের খোলটা জোরে-জোরে ঘোরাতে লাগলো দীননাথ।

—'আর একটা?'

—'ওটা আমি খাবো।'

গ্রীষ্মের রাতে কাঁচা-বস্তির বাঁধানো দাওয়ার উপব ব'সে দুইজনে বরফ খায়। শালপাতার উপব রেখে। চেটে-চেটে, রসিয়ে-বসিয়ে। দেশগাঁয়েব গল্প ক'রে।

ধামায় ক'রে ডিম বেচে জহুরালি। বাড়ি বরিশাল।

—'মাছ পেয়েছিস আজ?'

—'চিংড়িমাছের এইটুকু ভাগা চার আনা ক'রে। জন্মের মতো ফুরিয়ে গেছে মাছ খাওয়া।'

—'নে, এই দুটো ডিম নে।' দুটো হাঁসের ডিম বাড়িয়ে ধরলো জহুরালি। 'নে, ভেঙে ফ্যাল।'

—'দাম নিবি কত?' দীননাথ বললে সংকুচিতের মতো।

—'নে, বকবক করিসনে। সেদিন রাবড়ি-ববফ খাইয়ে দাম নিয়েছিলি?' দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সে-হাসি সারল্যের বাজারে বিনি-পয়সার সওদাগিরি।

পাশাপাশি বস্তিতে তারা থাকে। শুধু তারা নয়, আরো অনেকে। সমাজের যত তলানি। যত নাজেহাল ও নাস্তানাবুদের দল। গবিব আর ছোটোলোক।

ছোটোলোক। ছোটো-ছোটো কাজ করে। ছোটো ক'বে রাখে জীবনের বৃত্ত। যাতে বড়োলোকেরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে লভ্য কুড়োতে পারে ভাবি-হাতে। যাতে তাদেরকে ঘোরাতে পারে নিজেদের স্বার্থের চক্রবৃদ্ধিতে।

বড়োলোক। কথা বলে বড়ো-বড়ো। উচ্চ মঞ্চে ব'সে উচ্চ শব্দে যারা বক্তৃতা দেয়। পুচ্ছের ভারে নিজেদেরকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে। ধুলো-কাদা বা ইট-পাটকেল লাগতে দেয় না।

পাশাপাশি থাকে জহুরালি আর দীননাথ। জীবনের কী মানে বা মূল্য কে জানে, তাবা আছে নিজেদেব ছোটো-ছোটো সুখ-দুঃখের উপায়-ফিকিরে। কী ক'রে দু-মুঠো খাবে, কী ক'রে গা ঢাকবে আস্ত কাপড়ে, কী ক'রে শিয়রে বালিশ নিয়ে ঘুমোবে অঘোর হ'য়ে। এর বাইরে আর তাদের উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই, দুটো পয়সা জমাধার ধান্দা

দ্যাখে, যাতে একথোকে পাঠাতে পারে কিছু বাড়ি-ঘরে, যাতে-বা একসময় নিজেই তারা বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে এক ফাঁকে। ততদিন ভিড়ে-ফাঁকায় তারা তাদের গাঁয়ের ছবিটির কথা মনে করে, লক্ষ্মীর মতো পরিপাটি ধানখেত, গোপালের মতো ঠাণ্ডা নদী আর প্রথম জোয়ারের কুলকুলের মতো তাদের শিশুদের কলস্বর। কে জানে কবে ডাক আসে।

পাশাপাশি হাঁটে। জহুরালি সকালে, বিকেলে দীননাথ। কখনো-বা এক-সঙ্গেই দুপুরবেলা, জহুরালির কাঁধে তরকারির ঝাঁকা, দীননাথের কাঁধে ফিতে-কাঁটা তরল-আলতার চুপড়ি। শহরের এক রাস্তায় না-হাঁটুক, জীবনের এক রাস্তায় হাঁটে। জানে না এ-রাস্তা কোথায় তাদের নিয়ে যাবে, কোন বাজধানীতে। তবু তারা হাঁটে, আস্তে-আস্তে এগোয়।

—'পানি-গামছা যখন একখানা কিনতেই হবে তখন তোর কাছ থেকেই কিনি। আছে তো তোব কাছে?' বললে জহুরালি।

—'নে, খুব ঘন বুনোট। লাভ নেবো না একপয়সা তোর ঠেঙে। ঠিক কেনা-দরে বেচছি।' বললে দীননাথ।

—'বা, লাভ নিবিনে কেন?'

—'দামেব বদলে তোর থেকে যে ডিম-তরকাবি নেবো। তোর ডিম-তরকারির জন্যে মুনফা মারবি নাকি আমার ঠেঙে?'

দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সেই হাসির উপর হঠাৎ একদিন দিক-বিদিক হ'তে ঝাঁপিয়ে পডলো আর্তনাদের ছুরি। ছিটকিয়ে পড়লো রক্তের পিচকিরি। নিরীহ পথচারীর রক্ত। নিরাপরাধের অন্তিম আর্তনাদ।

মুহূর্তে যে কী হ'য়ে গেলো দীননাথ আর জহুরালি কিছু কিনারা করতে পারলো না। চোখের সামনে দোকান-দানি পুড়তে লাগলো, লুঠ হ'তে লাগলো। গলিঘুঁজির মোড়ে নিরুদ্দেশ পথিকের বুকে-পিঠে ছুরি বসতে লাগলো। শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্ট গৃহস্থের আঙিনা পিছল হ'য়ে উঠলো শিশু-শাবকের রক্তে। কলকাতার রাস্তায় শকুনের পাখসাট।

এ তাকায় ওর মুখের দিকে, ও তাকায় এর। জহুরালি আর দীননাথ। দুজনের মুখে আর স্নেহ নেই, কোমল নিশ্চিন্ততা নেই। অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, ফুটে উঠেছে সন্দেহের কুটিলতা। কথার বদলে স্তব্ধতা, হাসির বদলে বিরক্তি।

কী ক'রে যে দুটো মুখের চেহারা বদলে যায় আস্তে-আস্তে তারা নিজেরাও যেন বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে, যখন বিকেলের দিকে তাদের বস্তিতে আগুন ধরে।

বস্তির লোক দু-দলে ভাগ হ'য়ে বেরিয়ে আসে হন্যে হ'য়ে। দীননাথ দাঁড়ায় রাস্তার এ-মোড়ে, জহুরালিরা রাস্তার ও-মাথায়। দীননাথের হাতে একখানা ইট, জহুরালির হাতে সোডার বোতল।

রশি ফেলে কে মাপবে কতখানি ব্যবধান আজ তাদের মধ্যে?

কী ক'রে যে সম্ভব হচ্ছে কে জানে, দীননাথ ইটের পর ইট ছুঁড়ছে, জহুরালি বোতলের পর বোতল। একে অন্যকে জখম করার জন্যে যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। এ-দলের একটি লোক ঘায়েল হয়, ও-দল হাঁকার দেয়; ও-দলের কেউ চোট খায়, এ-দল হুমকে ওঠে। যদি জহুরালি মরে তবে বোধহয় দীননাথ লাফায় আব দীননাথ মরলে জহুরালি নাচে।

বন্যার তোড়ে খড়কুটোর মতো ভাসছে তারা। হননেব বন্যা।

দু-দল আরো ভারি হ'য়ে উঠলো। যোগ দিলো আরো নতুন সৈন্যসামন্ত। দেখা দিলো আরো অস্ত্রশস্ত্র। কত পড়লো, কত মরলো, কত পালালো কে তাব হিশেব রাখে।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে, যুদ্ধ তবু থামে না। কখনো এ-দল এগোয়, কখনো ও-দল হঠে। মৃতের স্তূপে হোঁচট খেতে হচ্ছে, পা হড়কে যাচ্ছে রক্তের কর্দমে।

এমন সময় সাঁজোয়া গাড়ি এলো একখানা। ফাঁকা গুলি ছুঁড়লো শূন্যে। নিমেষে জনতা ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে গেলো, অতলে-বিতলে পালাতে লাগলো প্রাণপণে। আমাদের দীননাথ জহুরালি কোন দিকে ভেসে গেলো কেউ জানতে পারলো না।

কে কার খোঁজ করে!

মিলিটারি টহল দিচ্ছে ভারি-পায়ে। গুণ্ডা দেখতে পাচ্ছে তো গুলি ছুঁড়ছে। গ্রেপ্তার করছে। খানিক আগে যেখানে ছিলো সাহসের হুংকার, সেখানে এখন আতঙ্কের স্তব্ধতা।

ফাঁক বুঝে একটা অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে দুটো লোক ঢুকে পড়লো চুপি-চুপি। এমনি অনেকে লুকোচ্ছে; তাদের মধ্যে এরাও দুজন। একদলের লোক। দোতলার সিঁড়ির নিচে বসেছে ঘন হ'য়ে। সদর দরজাটা খোলা, কিন্তু যেখানে তারা লুকিয়েছে সেখানটা অন্ধকার। বুঝতে পারবে না তাদেরকে। সদব দরজা দিয়ে গুলি ছুঁড়লেও লাগবে না তাদের গায়।

সামনে দিয়ে ভারি-পায়ের বুটের শব্দ হচ্ছে। বুটের নিচেকার লোহার শব্দ। টহলদারি করছে সৈন্যরা।

ভয়ে কুঁকড়ে আরো ঘন হ'য়ে বসলো দুজনে।

—'গেছে?'

রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকজন বলল, 'গেছে।'

দুজনেরই বড়ো অস্ফুট শব্দ। ক্ষণিক নিশ্চিন্ততা এলেও কেউ কারু সান্নিধ্যের উত্তাপ থেকে স'রে যেতে রাজি নয়।

—'আমরা কি এগুচ্ছি?' যেন এখনো যুদ্ধ হচ্ছে এমনি নেশার ঝোঁকে জিগগেস করলো একজন।

—'এগুচ্ছি বৈ কি।' যুদ্ধের খতেন করছে এমনিভাবে বললে আরেকজন।

শুধু মুখ দেখেই চেনা যায় না, অন্ধকারে কণ্ঠস্বর শুনেও চেনা যায়।

জহুরালি দীননাথকে আর দীননাথ জহুরালিকে চিনতে পারলো।

একী, তারা এক দলের লোক নয়।

দীননাথ বললে, তোর চোট লেগেছে কোথায়?'

—'মাথায়, বুকে। তোর?'

—'আমারও।'

—'তোর কাছে দিয়াশলাই আছে?'

—'আছে। তোর কাছে বিড়ি?' আনন্দে উজ্জ্বল হ'লো জহুরালির কণ্ঠ।

বিড়ি ধরালো দীননাথ। কয়েক টান দিয়ে চালান করলে জহুরালিকে।

আবার দু-টান পর দীননাথ। আবার একটান পর জহুরালি। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে তারা। হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়।

—'ঐ, ঐ আসছে।'

বিড়িটা হাতের চেটোর মধ্যে লুকিয়ে ফেললো জহুরালি। যাতে এক কণা আলোও না বাইরের লোকের চোখে পড়ে। জীবনের আভাসটুকুও যাতে মুছে যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে কুঁকড়িশুঁকড়ি হ'য়ে বসেছে দুজনে। দুজনের শরীর একই যন্ত্রণায় ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

বাঁধানো রাস্তার উপরে বাজছে লোহা-বসানো ভারি বুটের শব্দ। খট খট খট।

বিড়িটা নিবে গিয়েছিলো। ধরালো জহুরালি।

তিন আঙুলের মাথা একড় ক'রে বিড়িটাকে ঘুরিয়ে ধ'রে শেষ টান দিলো দীননাথ।

আগুনের অক্ষরে এক সন্ধিপত্রে তারা স্বাক্ষর করলে।

আবার এগুচ্ছে বুটের শব্দ।

খট খট খট।

# ছেলেমানুষি

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবধান টেঁকেনি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বন্ধ প্যাসেজ বাড়ির সামনের দিকটা তফাৎ করে রেখেছে, দু-বাড়ির মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুর মধ্যে। পিছনে দু-বাড়ির ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ-সমান উঁচু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়োদের মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টেঁকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের, সুখদুঃখ, হাসি-কান্না আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালোবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দিন, অপরাহ্ণে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন-দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন—রাঁধে-বাড়ে, বাসন মাজে, স্বপ্ন দ্যাখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিমা পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদি-বা টিকতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়ে মানুষের তৈরি কোনো কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ করে দেয় ইন্দিরা আর হালিমাকে।

একদিন একটি শুভ লগ্নে দুটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মার শাড়ি ভাঁজ করে সে পরে, সিঁদুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথ ব্রাশটির মুকুট এঁটে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সে-ই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ির অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিমা দু'জনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরার, বৌকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই-আদরে বৌ-আদরে দু'জনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর-বৌ। থেকে-থেকে দু'জনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে-রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা-শরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়ে কান্না শুরু করে গীতা। তারপর থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, ওগো? ওগো শুনছ? জামাই। এই জামাই। ডাকছি যে?

হাবিব বলে, অ্যাঁ?

অ্যাঁ কি? অ্যাঁ না। বলে কী গো?

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে।

মুখ ভার করে থাকে পিসি। হালিমা বাড়ি ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, এ-সব কী কাণ্ড বৌমা?

কেন পিসিমা?

চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে, কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে? গঙ্গাজলের ছিটেও দিতে পারলে না? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধর্মো রইল না আর।

গঙ্গাজলে ধুয়েছি।—ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ-বাড়িতে নাসিরুদ্দিনের মায়েরও মুখ ভার।

ও-বাড়ি থাকলেই পারতে? এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ওরা পছন্দ করে কিনা কে তা জানে।

হালিমাও হাসি মুখেই বলে, চা না-খাইয়ে ছাড়লে না। দেরি হয়ে গেল।

তুমি তো খেয়ে এলে চা খুশি মনে। তুমি দিও তো একদিন কেমন খায়?

চা তো খায়!

সব কাজ পড়ে থাকে সংসারের, সময় মতো শুরু হয়নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়। বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোটো নাতনিকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দিনের মা আর ছোটো নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসি গল্প জুড়েছে সুখদুঃখের।

ব্যবধান টেকেনি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতোই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।

ও-মা, কী হয়েছে?

তোমার মেয়ে একটু গোস্ত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জানো। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিছু হবে না তো?—ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে কী যে বলি আমি বোকার মতো। হাবিবের কিছু হবে না, ওর হবে! খেয়েছে তো কী আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।

তাই কি বলি? হালিমা স্বস্তি পায়—বাব্বা; আমি জানি না? ও রেজ্জাক আলি সাব আর তার বিবি এসে কি দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেয়েছে, এ-সব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।

শোনো, বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নিচু গলায় বসে, হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসীর কী রাগ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোলতাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসিকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে! তখন পিসি ঠাণ্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি!

শান্ত দুপুর। ফিরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ি-শায়া-শেমেজ চাই। দুজনে তারা খড়ি দিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বলে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে-চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশপাশি একটু শোয় তাবা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরও অনেক বড়ো হয় গরমেব দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মাবে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে থাকে ছাতে হাবিব আব গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেঁকেনি। কেন যে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চাবিদিকে বোঝে না তারা, থতমত খেয়ে ভড়কে যায়, দুরু-দুরু করে বুক। সেবার মাঝে-মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইবেনের আওয়াজের জাপানি বোমার দিনগুলিতে, দূর থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশী বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্বনাশ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, শহব জুড়ে, পাড়ায় ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশি মরিয়ার মতো। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উস্কানির সোজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে-আঘাত চলেছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জুগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড়ো বড়ো কথা উথলায়নি সভায় আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশি জোর পড়েছে যে এ-পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হযতো এ-পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারিদিকে যে-আগুন জ্বলেছে। তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কি কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপনজনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে মারো, কাটো, জবাই করো, শেষ করে ফ্যালো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেক কালের মেশামিশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা শহর বলেই। পাখা সবারই পঙ্গু, মানুষকে হাঁস মুরগি করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাপটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা। হালিমা বলে মুখোমুখি জানলায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে-খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব?

আর বোলো না ভাই, ইন্দিরা বলে. মাথা ঘুরছে কদিন থেকে। এ-সব কী কাণ্ড। অ্যাঁ কি রাঁধলে?

তেমন প্রাণ-খোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মতো। গলাব মৃদু অস্বস্তির সুর দুজনেরই, চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত, আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়িতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয়-স্বজনের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয শুধু, বাড়ির মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্তত সাময়িক ভাবে।

কী যে হবে ভাবছি।

দুধে নাকি বিষ মেশাচ্ছে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওরা পায়। রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই নাকি বেশি। একটুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা দুটো পর্যন্ত।

এত লোক বেড়েছে, ডাল তরকারি ছিটেফোঁটা এক রোজ থাকে, আব এক রোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।

আজ চিঁড়ে খেযেছি নুন দিযে। গুড়ও নেই।

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নিচু করে থাকে দু'জন। ধীরে-ধীবে বন্ধ হয়ে যায় জানালাব পাটদুটি।

ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দু'বাড়িতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়োদের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয়নি বড়োদের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে বাখবে? তাদের মেলামেশার দাবি রাজনীতির ধার ধারে না, আপোষ অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ির এলাকার বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বারণ। বড়োদের মুখে অন্ধকার, বাড়িতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘন ঘন ডাক্তাব আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কী, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আযোজন করে মিলেমিশে খেলাধুলো করার। বাড়িতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরি করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশি, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হযে যায় চারিপাশ ঘেরা ছোটোখাটো একটি ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাটাপাতা যোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোটো তোলা উনুনটি আর তেলমশলা। তরকারির অনটনে সবার মন খুঁত-খুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুন। জোরালো পরামর্শ চলছে, সবকিছু দিয়ে এক কড়া

খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি সবই রাঁধা হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন'দশ বছর, এই বয়সেই বড়োদের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবি সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও শুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হা-হাঁ করে ছুটে আসে দু'বাড়ির বড়োরা। মেহেরের বাপের নিকা-বৌ নুরুন্নেসা মেয়ের বেণী ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসিমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগ্নীর ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাত-পা ছোঁড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দিনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়োদের হৈ চৈ মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কি হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে নেয় রীতিমতো হুল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইঁট হাতে ছোটোখাটো ভিড়।

কয়েক মুহূর্ত, আর কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়ার ভাগ্য—জিইয়ে রাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্বনাশ। কান্না ভুলে বড়ো-বড়ো চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে দ্যাখে বড়োদের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দু'জন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দু'জন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙন ধরে। দু'চার মিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্ম-সম্পাদক দু-জন পরামর্শ করে ভলান্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায়-পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শ-কাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে, এ-রকম তুচ্ছ ঘটনাও দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরি আসে পুলিশ ও সৈন্যের ছোটো একটি দল নিয়ে। চারিদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ-বাড়ির দরজায় ঘা মেরে, এর ওর দোকান ঢুকে, জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য, যে কোথাও গোলমাল হয়নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে? গলির মোড়ে নিতাই-এর দোকানের একপাশে তক্তপোশ পেতে চারজন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরি ফিরে যায় বাকি সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁজবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ-বাড়ি থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ির। কিন্তু কথার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপি-চুপি দু'এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ-বাড়ি ভাবে ও-বাড়ির জন্য মিলিটারি এসে পাড়ায় গেড়ে বসেছে, কী জানি কখন কী হয়। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের জেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এপাশ থেকে গীতা বলে, আসবি হাবিব?

মারবে যে?

না, পিসির ঘরে চুপি চুপি খেলব।

পিসি বকবে তো?

দুর।...রান্না করে নেয়ে আসতে পিসির বিকেল বেজে যাবে।

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নিচু লম্বাটে কোটরটি পিসি বহুদিন দখল করে আছে, তার নিচে দোতলার কল-ঘর। লম্বামানুষ এ-ঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসির নিজস্ব হাঁড়ি-কুড়ি কাঠের বাক্স কাঁথা বিছানায় কোটরটি ভবা। কুশের আসন পেতে এ-ঘরে পিসি আহ্নিক করে। আমিষ-রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসি আর এ-ঘরে আসে না।

ঘরেব মধ্যে এভাবে লুকিয়ে চুপি চুপি কী খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলবি? গীতা বলে।

লাঠি কই? ছোরা কই? প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, দাঁড়া।

গীতা চুপি-চুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তাবাপদর খুব আর ছুরি। খুরটি পুরোনো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয়!

খেলা, ছেলে-খেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

মারলি?

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলে-মেয়ে দুজন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে ভোঁতা খুর আর ভোঁতা ছুরি দিয়ে। সেই সঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্ত কান্না। ইন্দিরা পিসিমারা ছুটে আসে কলরব করে। ছুটে আসে ও-বাড়ির হালিমা নুরুন্নেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসির কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদকে ও-বাড়ির অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নিচে।

সদর দরজায় বাড়ির অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দিন হাঁকে, তারাপদ।

দুটি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসির ঘরে, একসময় একজনের বেশি দেখতে পারে না ভেতরের কাণ্ড। এক নজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে ওঠে, মেরে ফেলল। মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো।

দরজায় ধাক্কা মারতে-মারতে চ্যাচায়, খোল। খোল। দরজা খোল! খুনে ছোঁড়া দরজা

বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে। দরজা খোল।

হালিমাও এক নজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, মেরে ফেলল! ছেলেটাকে মেরে ফেলল!

দরজায় ধাক্কা মারতে-মারতে চ্যাঁচায়! খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছুঁড়ি দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে! দরজা খোল!

পিসি চ্যাঁচায়, হায় হায় হায়! সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো!

নিচে থেকে নাসিরুদ্দিন হাঁকে তারাপদ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি।

পিসিকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিবা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনীর মতো খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথা ঠেকাঠেকি হয়ে যায় দু'জনেব। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনীর মতো হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণ গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায়নি, আগে কে হার মানবে অপরেব কাছে! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসির হাঁড়িকুড়ি।

হায়, হায়! সব গেল গো, সব গেল!

নাসিরুদ্দিনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সে-ই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর-ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের-নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্য জনও মা, তার সন্তানের গায়েও রক্ত।

বাইরে আবাব ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর নাসিরুদ্দিন দু-বাড়িব এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস-কমিটি এবার কোনোমতেই ঠেকাতে পাবত না সর্বনাশ।

আইডিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দু-বাড়িতে শুইয়ে রাখা হয় হাবিব আর গীতাকে। ছুটির দিন, ঢিমে তালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দু-বাড়িতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয় বাড়ি, আনাচ কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়িতে নেই। হাবিব বাড়িতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু-বাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গম গম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এ-বাড়ি বলে বুক চাপড়ে: শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম করে রেখেছে, নয়—

ও-বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, গীতা নিশ্চয় আছে তোমাব বাড়িতে নাসির।

নাসিরুদ্দিন বলে, হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম করেছ তারাপদ।

এবাব আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আব উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উস্কানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনি একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওৎ পেতে ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে-দেখতে বাড়ি দুটির সামনে জড়ো হয় দু-দল উন্মাদ মানুষ। এরা এ-বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা ও-বাড়িতে। কিন্তু দল যখন দুটি তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না-পারলে কোনো দলেব পক্ষেই বাড়ি চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস-কমিটির চেষ্টায় শুধু দু-দশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম-সম্পাদক বলেন, আমরা তল্লাশ করাচ্ছি বাড়ি।

জনতা সে-কথা কানে তোলে না। তাদেব শান্ত বাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কযেকজন ভলান্টিয়াব। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চাব জন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওই যে হাবিব! ওই যে হাবিব! ওই যে।

আরেকজন চ্যাঁচায়, ওই তো গীতা!

সকলের দৃষ্টিই ছিল নীচেব দিকে, এ-অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারো নজরে পড়েনি যে, নাসিরুদ্দিন আব তারাপদর বাড়ির চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের কাণ্ড কারখানা লক্ষ্য করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দু'-পাশে দু-বাটির ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দু-জন চুপিচুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে উঠে, পাওয়া গেছে। দু-জনকেই পাওয়া গেছে।

সবাব চোখের সামনে হারানো ছেলে-মেয়ে দুটোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হলো বলেই যে মারামারি ঠেকান যেত, তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে, অনেকে তারা জানেও না ওদের দুটিকে নিয়েই আজকের মতো গণ্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দু-দলেরই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কী জানবার জন্য যে-কৌতূহল জাগল জনতার মধ্যে,

সঙ্গে-সঙ্গে পিস-কমিটির সম্পাদক দু'জন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুড়ে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরি বোঝাই মিলিটারি এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দিন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম করা ছেলে-মেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরাব গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

# স্থানে ও স্তানে

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো।

বুক যাব ছোটো হয়ে গেছে ভয়ে, উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা হয় ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ হয় প্রশ্নের সঙ্গে, তার ঝাঁঝ আরো বেশি।

পালাব কেন? নবহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু-একজন তাকে যারা ভালো করে চেনে, বিশ্বাস করে।—সে কী, এখন আনবেন? পনেবোই আগস্ট যাক? দু-একমাস দেখুন কী দাঁড়ায়, নিজে থাকেন আলাদা কথা, এ-সময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটেব দায়ে থাকতেই যখন হবে, দেবি করে লাভ কী। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভালো, তাতে মনেব জোর বাড়ে।—নরহরি জবাব দেয়।

স্টিমারে অসম্ভব ভিড়।—পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ-স্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গোরুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখে-মুখে নড়াচড়ায় কথা বলার ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে, একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে-মুহূর্তে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সীমাসংখ্যাহীন অচেতন আদান-প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয় বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনা যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেনে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ-বারো জন ডাকাত, সকলেই অস্ত্রধারী, দু'জনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়িতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না, ডাকাতেবা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের স্টেশন থেকে ছাড়ার পর গাড়ির গতি একবার মন্থর হয়ে আসে, লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। ঠিক ওখানে দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জন জায়গায়, গাড়ির গতি এ-রকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ৎ পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ি যারা চালায় তাদের। গয়নাগাঁটি সব সংগ্রহ করে একটি তরুণীকে সাথী করে নির্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধহয় তাদের ছিল। কিন্তু উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়েটির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে আহত কবে অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি নেমে পালায়। একদল যাত্রী হৈ চৈ করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের

গুলি তাদের ঠেকাতে পারেনি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।

এটা জানা ছিল না নরহবির, সে শুনেছিল অন্য কথা। এ-সব নিত্যকার ঘটনা আর এ-রকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেরে পড়ে থাকে বা বসে ঝিমোয়। শেষটা তাহলে সত্যি নয়।

শিয়ালদায় গাড়ি পৌঁছুল দেরিতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িযে নরহবি একবাব তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত শহরের স্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে-বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে এই শহরটির প্রতি, তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ-উত্তেজনা স্বপ্নের সমাবোহে বিয়েবাড়িব আলো আর সানাইযের তানে সুমিত্রাকে বাপের বাড়ি আনা নেওয়ার বিরহ-মিলনেব মাধুর্যে কী প্রিয় ছিল এ-শহর তার কাছে। কদ্দিন আগেও ছিল। প্রিয় আর বোমাঞ্চকর তাবই জমজমাট গৌরব। ঢাকায বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুশি হযে অনুভব কবেছে তার নিজেব চঞ্চল বক্তেব তাপ। ছাত্র-অভিযানেব জয়, লাখ নাগবিকেব মিলন-অভিযানেব জয়, ধর্মঘটের জয়, মিলিটাবি অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়, জযের পর জয়। তারপব যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নবহরিব কাছে শহরটিকে অপ্রিয় ঘৃণ্য করে তুলতে পাবেনি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতব হয়েছে।

আজ সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে, অন্তত পক্ষে নিজেব নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামাবি করে এ-শহবেব হিন্দু-মুসলমানরা। তার সে ভুল ভেঙে গেছে। এ-শহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদেব আস্তানা।

সুমিত্রার বাপের বাড়ি পর্যন্ত হয়তো পৌঁছুবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মবে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো, বাবা, এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তাবটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভালো আছেন? কবরেজের ওষুধ খেয়ে কমেছে একটু?

মা পুরী গেছেন ও-মাসে।

ওঃ! তা ভালো আছেন তো? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা পড়ছি বাবাজি, মাথা ঘুরে যায়। উডিষ্যাব ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে।

মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হলো।

বড়ো শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতী বাঙালি মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুণ্ডারা খাবলা দিচ্ছে বাঙালি মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার শুরু করেছে, কী বিপদ ভাবো তো!

মেজো শালা শ্যামল বলল, উড়িযাকে আচ্ছা কবে শিক্ষা দিযেছি আজ, জন্মে ভুলবে না। মুড়ি-মুড়কিব দোকানেব ওই অর্জুন আব সতীশবাবুব চাকবটাকে। সুধীনবাবুব ঝি আব অর্জুনেব বৌটাকে ছেলেবা ধবেছিল। তা আমবা ভেবে দেখলাম কী, যতই হোক আমবা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেযেছেলেব গাযে হাত দেওযা উচিত হবে না। ভেবে-চিন্তে তাই ছেড়ে দিলাম। জানো নবহবি, ভদ্র হযেই আমবা আজ বিপদে পড়েছি। ওদেব মেযেছেলেব ওপব যদি অত্যাচাব চালাতে পাবতাম ওবা ঠাণ্ডা হযে যেত।

নবহবিব খিদে পেযেছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদব অভ্যর্থনা হয নিখুঁত। বড়োলোক নয নবহবিব শ্বশুব, অথচ ভেজিটেবিল ঘিযে ভাজা লুচিব সঙ্গে সন্দেশ দেওযা হয তাকে জলখাবাবে। ঘবে তৈবি মিষ্টি ছানা নয, দোকানেব দামি সন্দেশ। খাবাবেব দোকান সব বন্ধ, তবু।

কাব ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিযে, তাব বাচ্চাটাব আওযাজেব মতোই যেন মনে হয। শালী সুষমা তাকে শান্ত কবছে, চুপ চুপ, শিগগিব চুপ,—মুসলমান ধবে নেবে।

পাল্টা ছড়াও শুনেছে নবহবি—চুপ, চুপ, শিখ আসছে।

তা দু-মুখী ক্রিযাব দু-মুখী প্রতিক্রিযা হবেই।

অতুল সাবধান কবে দেয, কাজ না-থাকলে বেবিযে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা কবে বলে, বেরুনো মানেই প্রাণ হাতে কবে যাওযা। এখানে হাঙ্গামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হযতো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুশকিল ওইখানে, পবিমল বলে সায দিযে, কোন এলাকাটা সেফ নয, জানাটানা থাকলেও ববং খানিকটা—

নবহবিব মুখ দেখে ছোটো শালা অমল বলে, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মাযা আছে। দবকার থাকলে বেরুবেন, যেদিক-সেদিক ঘুববেন না, ব্যাস্।

তুই তো বলেই খালাশ—পবিমল চটে বলে, জামাইবাবু জানবে কী কবে? ব্যাটাবা ট্রাম চালু বেখেছে চাদ্দিকে। নবহবিব মনে হতে পাবে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই? ব্যাটাদের এরিয়ায ভুল করে ঢুকলে সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিযায় ঢুকলে সন্দেশ খাইয়ে দাও না?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেব মতো ছোঁড়ার বিশ্রী গা-জ্বালানো কথাবার্তা।

নরহবি সবিনয়ে বলে, বেরুবো আর কোথায়, দু-একটা জিনিশপত্র কেনা। কারু সাথে দেখা করার সময হবে না। গোছগাছ করে দিনে-দিনেই স্টেশনে চলে যাবো সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি? পরিমল বলে।

চিঠি পাননি?

চিঠি তো পেয়েছি। মানে বাপু বুঝতে পারিনি চিঠির তোমার।

মাথা খারাপ না-হলে কেউ—

থাক, থাক। অতুল বলে—হবে'খন ও-সব কথা। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ও-বেলা বসে পরামর্শ করা যাবে। আজ তোমাদের যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া করো, মাথা তোমার ঠাণ্ডা হোক, ও-বেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব! এ-রাজনীতি নরহরি জানে।

আরও ঠাণ্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখার সময় ভেবেছিলুম দু-একদিন থাকতে পারব। সে-উপায় নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

স্টেশনেও ঠিক করেনি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে শহরের সন্ত্রস্ত চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিত মৃত্যুদানের ঘটনা, এ-বাড়ির হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আনছে। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এইসব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কী বলো তো? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না-পারে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে!

যে পারে সে-ই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা অনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে! শ্যামল হেসে বলে, তোমার তাড়াহুড়োটা পড়ল কীসে? টিঁকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলটপালট হচ্ছে তা চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে! এঁদের না-নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পারে আমার।

সে কী!

তাই তো স্বাভাবিক। ঘবসংসাব পেতে যারা আছে, যারা থাকতে চায়, তারা নিশ্চয় প্রেফাবেন্স পাবে। আমি বৌ-ছেলে পাঠিয়ে দেবো কলকাতায়, পালাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন?

বলেছে নাকি? তোমার তো হিন্দু আপিশ। হিন্দু হয়ে কর্তা তোমায় এ-কথা বলল?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ও-দেশের লোক হয়ে? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে, তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে?

যায় যাবে অমন কাজ! শ্যামল বলে বীরের মতো, চাকরির জন্য বৌকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সী মেয়ে বৌ একটিকে ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সী মেয়ে বৌকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন

যদি যান, আর-একটি মোটে বাড়বে।

ও-সব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কী। কলকাতায় চলে আসবে, একটা-কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ি ফেলে চলে আসব? আপনাদের তো হাজার-হাজার লোকের চাকরি যাচ্ছে চাকরি দেবে কে আমায়?

সে যা হয় হবে, উপায় কী? তাই বলে—

আপনি তো বলে খালাশ!

সুমির মতো অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ-কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধহয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোক, এর মেয়ে আর ওদের বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হলো। সুমিত্রা তাব বৌও বটে, শত-শত বৌয়ের কী হবে না হবে এ-কথাটা সে কেন টেনে আনছে তাব নিজের বৌয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এবা। একটু স্তম্ভিত হয়ে গেছে তার কথাবার্তায়।

তোমার মৎলব ভালো নয় নরহরি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকরি রাখতে চাও!

অতুল অতি কষ্টে বিবাদ সামলায় স্ত্রীর সাহায্য পেয়ে, সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই নবহরির শাশুড়ি হলুদলঙ্কা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছিল দবজাব আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকেনি, এ-বার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝনাৎ-ঝনাৎ রিঙের আওয়াজ করল তিন-চারবার পিঠে আছড়ে-আছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবাব আগে নরহরি ঘোষণা করল, হাজার-হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুমড্ এ তো জানা কথাই।

গুম খেয়ে যাবে ঠিক করেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুমড হই, আপনাদের জন্য হবো। আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথার চেয়ে তার কথায় বেশি জ্বালা ধরে বাড়ির লোকের গায়ে।

পার্কসাকাসে আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে-ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য যে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলে গায়ে জ্বালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে,—অ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে।

তুই চুপ কর! কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ায় সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধা-বাড়া খাওয়া-দাওয়া ঢিমে তালে

চলেছে। আজকের গাড়িতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নবহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ির লোক জানে শেষ পর্যন্ত নবহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু-একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে-মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি সমস্যার আগামাথা। নবহরি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে। হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালোমন্দ হিশেব করেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবে না ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে—বাঙাল তো। সে-বার ওর বড়োখোকার চিকিৎসা করছিল এ-পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের এলোপ্যাথি ডাক্তার—শ্বশুর-বাড়িতে পা দেবার দুঘণ্টার মধ্যে।

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে-চিকিৎসায় বিশ্বাস করি, সেই চিকিৎসায় মরুক।

কী কাটা-কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান না-করুন কিছু যদি ভালোমন্দ হতো ছেলেটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নবহরির? কী আপশোশটাই তাকে করতে হতো গুরুজনের কথা না-শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করার জন্য।

তাই, তাড়া না-থাকলেও রাবোটার মধ্যে খাইয়ে দেওয়া হলো নবহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওয়া হলো শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বৌদিদিদের হেফাজতে।

ঘণ্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা না-ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা ভাবল কী, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসার এ-সুবিধাটুকু না-ছাড়াই ভালো। আগে বোঝাপড়া হোক, নবহরি স্বীকার করুক এখনকার মতো বাপের বাড়িতেই সে তাকে রাখবে, তারপর, হাসিমুখে নিজেকে সে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয়নি? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না-হলে চলবে কেন মেয়েমানুষের।

এসেই ঝগড়া শুরু করলে? বেশ তুমি। পান চিবোনো বন্ধ রেখে পানরঙা ঠোঁটে হাসে সুমিত্রা, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালের ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম? আশ্চর্য হয়ে বলে নবহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায় নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবে না। তোমায় আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাই, তাতে ওদের কী?

মনে-মনে একটু চটে যায় বৈ কি সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ-মা ভাই-বোন যে গো। ভাবনা হবে না?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কী যে বলে। তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি বাস্তার লোক? বাপ-ভাই বুঝি বাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয়? আমি বুঝি বাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধা হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ, অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলট-পালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জন নিবিবিলি মাধুর্যের ভূমিকা পর্যন্ত ভাবাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যায়।

আমি তো আজকেই যাবো ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে?

তবে কী? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

ক্রমে কলহ এবং কান্না। এ-সব আগে হয়েছে অনেক, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। এ-অস্ত্রও তেমন ফলপ্রদ নয় দেখে আবার মিষ্টি হয়ে উঠে নবহরির বুক আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কত নিবিড়, কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানের পিতামাতার ভালোবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বলো, নবহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মতো করে বলল, আজ না-গিয়ে পরশু যেতে বাজি আছি। কিন্তু তোমায় যেতে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এ ছেলেখেলা নয়, নবহরি বলে, রাগ-অভিমানের কথা নয়। যদি না-যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকি জীবনটা বাপের বাড়িতেই কাটাতে হবে তোমার—বিধবার মতো।

আমায় নয় মেরে ফ্যালো তুমি।—আর্তনাদ করে ওঠে সুমিত্রা, রাত-বিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা-খুশি করবে আমায় নিয়ে, তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফ্যালো নিজের হাতে।

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নবহরি। বিষণ্ণ বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোটো একটা ছেলে কাঁদছে। এ-বাড়িতেই বোধ হয়, তার ছেলেটার মতো গলা। অন্যের কাছে থাকতে না-চেয়ে মার জন্যই বোধহয় কাঁদছে।

# জৈব

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র

"…সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা এবং ঊর্ধতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন-বিন্যাস থেকে সুরু ক'রে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিকের—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে…"

রেডিওর সুইচটা অফ ক'রে দিতে দিতে করবী বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, "নাঃ ফের সেই বক্তৃতা হ'ল। এতরাত্রে কোথায় দু' একটা ভালো গান-টান দেবে প্রোগ্রামে, তা নয়—"

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমার ডাক্তার বন্ধু বাসব মুখুয্যে চুপচাপ সিগারেট টানছিল করবীর দিকে চেয়ে, হঠাৎ বলে উঠল, "আহাহা বন্ধ করে দিলেন নাকি?"

করবী বলল, "বন্ধ করব না কি করব, যে সে লোকের যত সব বাজে বক্তৃতা শুনবেন নাকি বসে বসে?"

বাসব বলল, "বক্তৃতা বাজে কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। কিন্তু লোকটি একেবারে যে সে নয়, ইউনিভার্সিটির স্কলার, এখানকার এক কলেজের প্রফেসর—"

করবী এবার বেশ একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু মুখের জেদ ছাড়ল না; বলল, "তা হলই বা স্কলার। প্রফেসর হলেই যে—"

বাসব বলল, "কেবল তাই নয়, মৃগাঙ্ক মজুমদারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ও আছে।" করবী বলল, "ও তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি অমন মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন, সত্যি রেডিওতে আত্মীয়-স্বজন, চেনা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের গলা আমারও ভারি ভালো লাগে শুনতে।"

রেডিওটা আবার খুলতে যাচ্ছিল করবী, বাসব বাধা দিয়ে বলল, "ওকি, আবার খুলছেন নাকি? না, থাক থাক।"

এবার আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "কেন। এই না বললে তোমার কোন প্রফেসর বন্ধুর বক্তৃতা!" বাসব বলল, "তাই বলে সেই বক্তৃতা যে আগাগোড়া শুনতেই হবে এমন কথা বলিনি। তাছাড়া রেডিওতে বন্ধু-বান্ধবের গলা আমার ভালো লাগে না, আমার কান তো আর তোমার স্ত্রীর কানের মত নয়।"

হেসে বললুম, "তা তো নয়ই। তুমি বড়জোর চামড়ার স্টেথোস্কোপ কানে গুঁজতে

পাবো, কিন্তু আমার স্ত্রীর মত এমন রত্নখচিত কান তুমি কোথায় পাবে!"

বাসবও হাসল, "সে কথা সত্যি।"

কববী বলল, "তাহলে শুনবেন না আপনার বন্ধুব বক্তৃতা?"

বাসব মাথা নাড়ল, "না থাক, মৃগাঙ্কবাবুর এসব টক আমার ভাবি খারাপ লাগে। ওঁর বোঝা উচিত সুদত্তা এতে কত কষ্ট পান, অশান্তি ভোগ করেন। তাঁর মনের ওপব এগুলির প্রতিক্রিয়া—" শুধু গলায় নয়, চোখেমুখেও কৌতূহল ঝলকে উঠল করবীর, "সুদত্তা কে?"

বাসবের মুখ দেখে মনে হল কথাগুলি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

একটু গম্ভীর হয়ে বাসব বলল, "সুদত্তা মৃগাঙ্কবাবুব স্ত্রী।"

করবী বলল, "তাহ'লে স্বামীব বক্তৃতা শুনতে তাঁর কষ্ট হবে কেন, কি যে বলেন।"

প্রসঙ্গটা একটু হালকা কববার চেষ্টায় আমি বললুম, "তা ঠিক। মাথা মুণ্ড না থাকলেও স্বামীব বক্তৃতা আর তাল মান না থাকলেও স্ত্রীর গান পবস্পবের কানে বোধ হয় সব চেয়ে সুখশ্রাব্য।"

আমার এমন রসিকতাটা মাঠে মারা গেল, কারণ বাসব তেমনি গম্ভীব হয়ে রইল। করবীও আমার কথায় কোন বকম কান না দিয়ে বাসবেব দিকে চেয়ে বলল, "বিষয়টা কি বাসববাবু? অবশ্য খুব গোপনীয় হলে—"

বাসব একটু হেসে বলল, "খুবই গোপনীয়। তবু না হয় খানিকটা কৌতূহল আপনার মেটাতে পারতুম কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কাছে বলাও মুশকিল।"

কববী বলল, "কিচ্ছু মুশকিল হবে না। আমার নার্ভ আপনাদের কারো চেয়ে কম শক্ত নয়।"

বাসব একটু হাসল, "মেয়েরা প্রথম প্রথম ওই রকমই ভাবে, ওই রকমই বলে, কিন্তু শেষে দেখা যায়—"

করবী অধীর হয়ে বলল, "শেষে যা দেখা যায় তা আমরা না হয় শেষেই দেখব। কিন্তু বলতেই যদি চান গোড়া থেকেই বলুন দয়া ক'রে।"

ছাই-দানিতে সিগাবেটের ছাই ঝাড়ল বাসব, তারপর বলল, "আচ্ছা, তাহলে শুনুন। তবে গোড়া থেকে নয়, মাঝখান থেকে। কেননা গোড়ার ব্যাপারটা আমিও তেমন জানি না।—"

**দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ডিসপেনসারীতে সেদিন তেমন ভিড় নেই। কারণ আমার বেশীর ভাগ রোগীই মুসলমান, দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলতে থাকায় হিন্দুপাড়ায় তারাও আসতে পারে না, আমারও ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু চাল ডাল তেল নুনের প্রয়োজন তো আর দাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে না। আর তার জন্য টাকারও দরকার হয়। মন মেজাজ ভারি খারাপ। অন্য সময় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশ ভিড় থাকে**

রোগীর। সেদিন আটটা বাজতে না বাজতেই ডিসপেনসারী খালি হয়ে গেল। পাড়ার দু' চার জন রোগী যা ছিল প্রায়ই খাতিবেব। তাদের বিদায় দিয়ে উঠি উঠি করছি। ডিসপেনসাবীর সামনে সশব্দে হঠাৎ একখানা ট্যাক্সী এসে থামল। রোগীর সাড়া পেয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে সোজা হয়ে বসলুম, নিমেষের মধ্যে টেবিলটাকেও গুছিয়ে নিলাম একটু। ততক্ষণে ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মুখেব দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হল, একটু ইতস্তত করে বললুম, 'বসুন।'

সাতাশ আঠাশ বছরেব স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ভদ্রলোক সামনের চেয়াবে বসে বললেন, 'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারলেন না। আমরা স্কটিশে বছর দুই একসঙ্গে পড়েছিলুম।'

বললুম, 'ও ঠিক ঠিক, এবার মনে পড়েছে, আপনার নাম বোধ হয—'

'মৃগাঙ্ক মজুমদাব।'

বললুম, 'অনেকদিন পবে দেখা হল।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা হল। দেখুন, আমি খুব একটা দবকারে আপনাব কাছে এসেছি।'

মৃগাঙ্কবাবুর দিকে একটু তাকিযে নিলুম। বেশ লম্বা-চওড়া সবল চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। চওড়া কপাল। মাথাব চুল ব্যাকব্রাস করা। অস্বাস্থ্যের তেমন কোন লক্ষণ চোখে পডল না। কিন্তু অসুখ তো আব সব সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এমন কি ডাক্তারের চোখেও নয়।

'বলুন।'

ভদ্রলোক একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়।'

ডিসপেনসারীতে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। পার্টিশনের ওপাশে কম্পাউণ্ডাব বমেশ ঔষুধেব আলমারীর সামনের টুলটায় ঢুলছে। চাকর হরিদাসও কাছাকাছি নেই। কোথাও বোধ হয় মোড়ের পান বিড়ির দোকানটায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বললুম 'তাহলেও এখানে বলতে পারেন। আর যদি কোন অসুবিধা বোধ কবেন, তাহলে পাশের কেবিনে চলুন।'

একবার কেবিনেব কাটা দরজার আর একবার বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সীটার দিকে একটু তাকিযে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন 'আমার স্ত্রী রয়েছেন গাড়িতে।'

একজন মহিলা যে গাড়িতে বসে আছেন তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু যেন এইমাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তেমনি ভঙ্গিতে বললুম, 'সে কি, ওঁকে নিযে আসুন এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার হলে পরে আনব।'

বললুম, 'আচ্ছা তাহলে কি কেবিনের ভিতর যাবেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার নেই, এখানেই বলছি। She is in family way. But

we don't want it. বুঝতে পাবছেন?

বললুম, 'বুঝেছি। কতদিন হল?'

মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'Stage একটু advanced, চাব মাস চলছে।'

বললুম, 'একটু মানে বেশ advanced, এখন কিছুই কবা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মনে কিছু কববেন না, এসব কথা আপনাবা ভাবছেনই বা কেন। আপনাদেব আব কি কোন সন্তান আছে?

'না।'

'তাহলে? তা ছাড়া এ সব ব্যাপাবে আগে থেকে সাবধান হওযাই ত ভালো।'

'Precaution আমবা নিতাম।'

'Fail কবেছে বুঝি? কিন্তু দু' একটি সন্তানও হ'তে দেবেন না এই বা কোন কথা? আপনাব স্ত্রীব বয়স কত?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তেইশ চব্বিশ।'

বললুম। 'এই বযেসে দুটি একটি সন্তান থাকাই তো ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা জানি কিন্তু আমাব স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পাবছি না।'

একটু অবাক হযে থেকে বললুম, 'মাতৃত্বটা কেন যে মেযেবা আজকাল পছন্দ কবেন না বুঝি না, ওঁকে যদি এখানে আনেন ববং বুঝিযে বলতে পাবি। তাছাড়া এখন তো কিছুই কবা সম্ভব নয। কোন বুদ্ধিমান লোকই এতে বাজী হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অন্যান্য ডাক্তাববাও সেই কথা বলেছেন। আচ্ছা আপনিই ববং সুদত্তাকে একটু বুঝিযে বলুন। দেখুন আমাব মোটেই ইচ্ছে নয। কতখানি বিপদেব সম্ভাবনা তা খুবই বুঝতে পারছি। তবু ওকে নিযে বড মুশকিলে পড়েছি।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে গিযে গাড়ি থেকে স্ত্রীকে নামিযে আনলেন। লম্বা দোহাবা চেহাবাব ফর্সা সুন্দবী বধূ। বেশ স্বাস্থ্যবতী। এ অবস্থাযও তেমন কোন অবসাদ কি ক্লান্তিব ভাব নেই। অথচ কেন এসব অদ্ভুত খেযাল এঁদের হচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না।

বললুম, 'পাশেব ঘবে চলুন।'

মহিলাটিকে বেশ একটু খুশি মনে হল। যেন আশাপ্রদ খবব কিছু পেযেছেন।

তিনজনেই ঢুকলুম কেবিনে। গদিআঁটা বেঞ্চটায পাশাপাশি বসলুম।

আমি কিছু বলবার আগে ভদ্রমহিলাই কথা বললেন, 'আপনি তাহলে রাজী আছেন? আপনি পারবেন?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'কেউ পারবে না। এ সব অসম্ভব ব্যাপার আপনারা চিন্তা কবছেন কেন বলুন তো?'

সুদত্তার মুখখানা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু পর মুহূর্তেই আরক্ত মুখে উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, 'দেখুন আপনার কাছে আমি হিতোপদেশ শুনতে আসিনি। এসব উপদেশ ডাক্তাররা আজ মাস দেড়েক ধরে আমাকে শোনাচ্ছেন। কোন পথ আছে

কি না, তাই বলুন, যত টাকা লাগে—'

ভদ্রঘরের এমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার মুখে এসব কথা উচ্চারিত হতে শুনে আহত হয়ে বললুম, 'দেখুন, টাকার প্রশ্ন নয়, বৈধতার প্রশ্নও না-হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আপনার জীবনের যেখানে risk—'

'জীবনের risk!' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন সুদত্তা, 'আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়েব জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমাব, গা বমি বমি কবছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটাব মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। দয়া ক'বে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে বক্ষা করুন। চিরকালেব জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনাব কাছে।'

আমি অবাক হয়ে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি স্ত্রীর আধাহিষ্টেরিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে চুপ কবে আছেন।

একটু পরে সুদত্তাই ফের কথা বললেন, ওঁকে বল, ওঁকে সব বুঝিযে বল। কোন কথা গোপন করবার দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু সব খুলে বললেই তো আব ডাক্তারী শাস্ত্র বদলে যাবে না সুদত্তা, খুলে তো এমন আরো দু'চার জনকে বলেছি।'

'ওঁকেও বল। উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা পথ বলে দিতে পারবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু আমার দিকে চেযে ইঙ্গিতে পাশেব ঘরে আসতে বললেন। সুদত্তা বসে বইলেন কেবিনে।

আড়ালে বসে একটু ইতস্তত ক'রে মৃগাঙ্কবাবু সংক্ষেপে আমাকে বললেন, 'উত্তর ভারতে দাঙ্গার সময় আমার স্ত্রী লাহোরে ছিলেন।'

বললুম, 'আত্মীয়ের কাছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেইখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। মাস তিনেক পরে একটি ছোট্ট স্টেট থেকে সুদত্তাকে আমবা উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই ওব ফিরে আসছে না, কেবল ডাক্তাবের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করাচ্ছে। অথচ আমি বেশ জানি এ অবস্থায় ডাক্তারদের কিছু করবাব নেই, করা সঙ্গতও নয়।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, ওঁকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শান্ত রাখাই আমাদের এখন উচিত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। আমি ওকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি। We must wait for the proper time.'

বললুম, 'ওঁকে ওঁর বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিন না কেন। সেখানে হয়তো খানিকটা শান্তিতে থাকবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাপ মা নেই। দূরসম্পর্কের কাকা কাকীমা আছেন। সেখানে জোর করে পাঠিয়েছিলাম। দু'দিন বাদেই ফিরে এসেছে। তাঁরাও তো সব শুনেছেন।

এসব ঝক্কি পোহাতে তাঁরাও ভিতরে ভিতরে রাজী নন।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'অকারণে আপনাকে বিরক্ত কবলুম। আপনাব ফীজ—'

বললুম, 'ছি ছি ছি, আপনাদেব জন্যে কিছু করতে পারলে খুব খুশি হতুম কিন্তু এ অবস্থায়—। পরে যদি কোন দরকার হয়—।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দরকার তো হবেই, ওই সময কোন হাসপাতাল-এব সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাব তেমন্ কোন জানাশোনা নেই—'

বললুম, 'সেজন্য কোন অসুবিধে হবে না। কারমাইকেলেব সঙ্গে আমাব বিশেষ যোগাযোগ আছে। সময়মত সেখানেই সব ব্যবস্থা হযে যাবে। আপনি ভাববেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। একদিন আসুন না আমাদেব ওখানে। বিডন স্ট্রীটে আমাব বাসা। এলে খুব খুশি হব। সেই সব কলেজী দিনগুলিই ভালো ছিল মশাই।'

বললুম, 'সত্যি।'

...

বাসব একটু থেমে করবীর মুখেব দিকে তাকাল। করবী একটি মাসিক পত্রিকাব পাতা উলটাচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই, কিন্তু শুনবার আগ্রহ যে তেমনি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। বললুম, "তাবপর?"

বাসব আর একটা সিগাবেট ধরিযে নিয়ে বলল, "তারপর পাঁচ ছয় মাসেব মধ্যে বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ হল মৃগাঙ্কবাবুদের সঙ্গে। যত আলাপ পরিচয় হতে লাগল, মৃগাঙ্কবাবুর ওপর আমাব তত শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। সত্যি বলতে কি কলেজেব ভালো ছেলেদের সম্বন্ধে আমাব তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ফার্ষ্ট বেঞ্চ আর ফার্ষ্ট-ক্লাস ওয়ালারা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নিতান্তই তৃতীয শ্রেণীর মানুষ, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে সে ধাবণা পালটাতে শুরু করল। ওঁর নিজের সাবজেক্ট কেমিষ্ট্রি। কিন্তু রসায়নেই ওব রসের পিপাসা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও বেশ ঔৎসুক্য আছে। সাহিত্য, বাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু আমাকে যা আকর্ষণ কবল তা ওঁর পাণ্ডিত্য নয়, মৃগাঙ্কবাবুর অমায়িক ব্যবহার সৌজন্য, শিষ্টাচারেই আমি বেশি মুগ্ধ হলাম। বিশেষত স্ত্রী সম্বন্ধে যে দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পেরেছেন দেখে আরো ভালো লাগল। যতই বলি আমি নিজে হলে এমন হয়তো পারতাম না।

কথায় কথায় মৃগাঙ্কবাবু একদিন বললেন, 'সেদিন রাত্রের ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন বোধ হয়। আমি জানি ওসব হবার নয়, বিন্দুমাত্র রিস্ক আমি নিতে চাইনে। কিন্তু কি করব বলুন, সুদত্তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলুম না, ওকে দেখাবার জন্যই—'

বললুম, 'তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। না হলে আপনার মত লোক অমন একটা

অদ্ভুত প্রস্তাব—'

আবো অ্যাডভানসড স্টেজে পৌঁছে সুদত্তাও ওসব চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনিও বুঝতে পাবলেন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কবা ছাড়া আব কিছু কবা সম্ভব নয়, কেউ তাঁকে কোন বকম সাহায্য কববে না, কবতে পাববে না।

কিন্তু বাইবে নিশ্চেষ্ট বইলেন বটে ভিতবে ভিতবে কথাটা প্রাযই তাঁব মনে খোঁচা দিতে লাগল। একদিন গভীব অভিমানে বললেন, 'আপনাদেব ডাক্তাবী শাস্ত্রেব ওপব আমাব আব কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই।'

আমি চুপ ক'বে বইলুম। ডাক্তাবী শাস্ত্রেব পক্ষ নিযে ওকালতি কবতে মন সবল না। কাবণ এই ব্যাপাব নিযে তাঁব স্ত্রী যে কত কষ্ট পাচ্ছেন তা মৃগাঙ্কবাবু আমাকে সবই প্রায খুলে বলেছিলেন। সব সময একটা অশুচি অপবিত্রতাব ভাব সুদত্তা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পাবছেন না। এমনকি স্বামীব গাঢ় আলিঙ্গনেব মধ্যেও সুদত্তা শিউবে উঠতেন, কিংবা আড়ষ্ট হযে থাকতেন। স্ত্রীব ভাবভঙ্গি দেখে মৃগাঙ্কবাবুবও যে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা না আসত তা নয, কিন্তু অসীম তাঁব ধৈর্য, অদ্ভুত তাঁব বৈজ্ঞানিক সহিষ্ণুতা। স্ত্রীব স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিবিযে আনবাব জন্য মৃগাঙ্কবাবুবও চেষ্টাব অন্ত ছিল না। এব আগে সিনেমা থিযেটাব মৃগাঙ্কবাবু পছন্দ কবতেন না। নিজেব কাজ কর্মেব পক্ষে অনিষ্টকব বলে মনে কবতেন ওগুলিকে। অন্যান্য আত্মীয বন্ধুব সঙ্গে সুদত্তা দেখতে যেতেন সিনেমা থিযেটাব। কিন্তু এই ব্যাপাবেব পব মৃগাঙ্কবাবু নিজে হলেন তাঁব সঙ্গী। সুদত্তা অবশ্য বেশি বাইবে যেতে চাইতেন না। সাবা দিন বাত ঘবেব মধ্যে লুকিযে থাকতে চাইতেন। কিন্তু আমিই পবামর্শ দিযেছিলাম, ওঁকে একা থাকতে দেওযা ঠিক নয। ববং এ সময একটু হাঁটা-চলা কবা ভালো, যাতে আলো হাওযা গাযে লাগে আব মনটা প্রফুল্ল থাকে সেই দিকে লক্ষ্য বাখা দবকাব।

এসব উপদেশ অবশ্য সুদত্তা মোটেই কানে তুলতেন না। ববং এই অবস্থায শবীবেব পক্ষে যত বকম অনিযম অত্যাচাব কবা সম্ভব সবই তিনি কবতেন। সময মত নাইতেন না, খেতেন না, নানাভাবে নিজেব শবীবকে নিপীড়ন কবতেন। আমবা বুঝতে পাবতুম এই নিপীড়নেব মূল লক্ষ্য কি।

একদিন সুদত্তা বললেন, 'বাসববাবু, এমন কিছু কবা যায না, ভিতবেব জিনিসটা যাতে আপনাআপনি নষ্ট হযে যায? আমি যে আব সহ্য কবতে পাবছিনে।'

আমি বুঝতে পাবতুম এই সব কথা বলবাব জন্যই, এই সব আলোচনাব জন্যই সুদত্তা আমাকে তাঁদেব বাসায মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। মৃগাঙ্কবাবুও চাইতেন আমি তাঁদেব ওখানে যাই। সুদত্তা এসব কথা আলোচনা করুন আমাব সঙ্গে। কাবণ এভাবে সুদত্তাব মনেব ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, ওই ধবনেব চিন্তা প্রকাশেব পথ পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদত্তাও খানিকটা তৃপ্তি আব স্বস্তি বোধ কববেন।

একদিন এক কাণ্ড ঘটল। মৃগাঙ্কবাবুব মুখেই শুনেছিলাম ঘটনাটা। তাঁব দূর সম্পর্কেব এক পিসীমা থাকতেন কাশীতে। চোখেব চিকিৎসাব জন্য কলকাতায এসে

মৃগাঙ্কবাবুদেব বাসায বইলেন কিছুদিন। আমিই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওযাব ব্যবস্থা কবে দিলাম। দুই চোখেই ক্যাটাব্যাক্ট। অপাবেশন কবাতে হবে। মৃগাঙ্কবাবুব পিসীমা কেবল যে চোখেই কম দেখেন তা নয, কানেও কম শোনেন। এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা আব মৃগাঙ্কবাবুদেব ভাগ্য বিপর্যযেব খবব তাঁব কানে যাযনি।

কিন্তু চোখে যতই কম দেখুন, সুদত্তাব সন্তান সম্ভবনাটা তাঁব দৃষ্টি এডাল না।

'ক'মাস হল? বউযেব সাধটাধ দিযেছিস?'

মৃগাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ওসব আমবা মানিনে পিসীমা।'

পিসীমা বললেন, 'তা মানবি কেন। যত সব ম্লেচ্ছ খৃষ্টানেব দল। সাধ না দিলে কি হয জানিস? ছেলে 'ছোঁচা' হবে। সব সময লালা বেরুবে মুখ দিযে। কোলে নিতে পাববি নে, জামা কাপড সব নষ্ট হযে যাবে। ভালোয ভালোয সাধ দে। বউযেব যা খেতে ইচ্ছা কবে এনে খাওযা। এ খাওযানো কেবল পবেব মেযেকে নয। যে আপন জন পেটেব মধ্যে আস্তানা গেডেছে, মাযেব মুখ দিযে সে-ই এসব ভালো অভালোব স্বাদ নেবে। তা যেমন বাপেব ঘবে জন্মেছিস তেমনি তো হবি? যেমন আমাব দাদাব হাত দিযে জল গলে না, তেমনি হযেছিস তুই, কৃপণেব শিবোমণি।'

মৃগাঙ্কবাবুব বাবা কিছুদিন কলকাতায ছিলেন। এদিকে অবস্থা একটু শান্ত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে দেশেব বাডিতে গেছেন। জমি-জমা বিষয-সম্পত্তি সব সেইখানে। নিজেকেই দেখতে হয।

দাদাব পবিবর্তে তাঁব বোন মৃগাঙ্কবাবুব পিসীমাই বউযেব সাধেব বন্দোবস্ত কবলেন, ভাইপোকে ধমকে ফবমাযেস ক'বে ক'বে আনালেন সব জিনিসপত্র। নিজেব হাতে বাঁধলেন মিষ্টান্ন, তৈবী কবলেন পিঠে পাযেস। আনালেন নতুন শাডি। তাবপব সব সাজিযে ধবলেন বউযেব সামনে।

সুদত্তা পিসী শাশুডিব অলক্ষ্যে সব নর্দমায ফেলে দিলেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'পিসীমাই না হয কিছু জানেন না, কিন্তু তুমি জেনে শুনে আমাকে এমন ক'বে অপমান কবছ কেন?'

তাবপর বালিশে মুখ চেপে এই কান্না। সুদত্তা নান না, খান না, বেবোন না ঘব থেকে।

...

অপাবেশন শেষ হলেও মৃগাঙ্কবাবুব পিসীমা প্রায মাসখানেক হাসপাতালে বইলেন। যাওযাব সময বললেন, 'যদি দবকাব হয বল। এ সময একজন কাবো বউযেব কাছে থাকা উচিত। যদি বলিস আমি থেকে যাই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'না পিসীমা, তোমাকে আব আটকে বাখতে চাইনে. তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি নার্স রেখে দেব।'

পিসীমা একটু দুঃখিত হযে বললেন 'আচ্ছা, ভালোয় ভালোয সব হয়ে গেলে একটা খবর দিস। ছেলে না মেয়ে জানাস কিন্তু একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে। আহা, বাবা বিশ্বনাথ

করুন ছেলেই যেন হয় তোর ঘবে। পাকা ডালা দেব বাবার মন্দিবে। নাম রাখব বিশ্বেশ্বর।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গাড়ির সময় হল, গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

মৃগাঙ্কবাবুদেব বাড়ির একতলায আব এক ঘব ভাড়াটে থাকে। স্বামী, স্ত্রী আব শাশুড়ী। বউটি নিঃসন্তান। অনেক ডাক্তাব কবরেজ দেখান হয়েছে, কালী মন্দিবে তাবকেশ্বরে মানত রয়েছে বহু। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলী। বউটি মাঝে মাঝে সুদত্তাকে বলে, 'দিদি, একি মেমসাহেবী ঢং আপনাদের। সাত রাজার ধন মানিক আসছে ঘরে। কোন বকম সাড়া শব্দই নেই। শীত এল। জামা আর মোজা কিছু ক'বে টরে বাখুন। নইলে শেষে কিন্তু ভারি অসুবিধে হবে।'

সুদত্তা এড়িযে যাওযার চেষ্টা করে বলেন, 'ওসব কিছু দরকার হয় না আমাদের।'

বউটি বলে, 'হয় আবার না। দিদি, নিজেব পেটেই না হয় কিছু হয়নি। তাই বলে দেখিনি শুনিনি এমন তো নয়। আমার তিন বোনেব তেরটি ছেলে মেয়ে। কাঁথা টাথা না ক'রে রাখলে ভারি কষ্ট হয শেষে। আচ্ছা, আপনাব নিজের যদি আলস্য লাগে, আমাকে আনিয়ে দিন উল টুল আমি সব ক'রে দেব, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনাদের। লোকে চেয়ে পায না আর আপানারা—'

এত সব কথার পরেও সুদত্তা জিনিসপত্র আনিযে দিলেন না দেখে বউটি নিজেব স্বামীকে দিয়ে উল আনিয়ে টুপী আব মোজা বুনতে শুরু করল।

সুদত্তা স্বামীকে বললেন, 'আর তো পাবিনে। তাব চেয়ে ওদের সব খুলে বল। জগৎ সুদ্ধ লোককে জানিয়ে দাও—উঃ, জঘন্য, জঘন্য, আমি আর সহ্য করতে পাবব না—'

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু সহ্য করতে পারেন। স্ত্রীব সঙ্গে কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে কখনো তাঁব ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখিনি।

তাবপব শেষ পর্যন্ত সুদত্তার সময় এল। কারমাইকেলে আমি কিছুদিন হাউস সার্জন ছিলাম জানো বোধ হয। গেলে এখনো সবাই খাতির যত্ন করে। কোন রকম অসুবিধাই হল না। আলাদা একটা কেবিন নেওয়া হল সুদত্তার জন্য। দু'জন নার্স রাখা হল। ওয়ার্ডের ডাক্তার বোসকে আমি বিশেষভাবে বলে দিলুম খোঁজ খবর নিতে। তবু মৃগাঙ্কবাবু আমাকে অনুরোধ রলেন, 'আপনার পক্ষে যদি থাকা সম্ভব হয়, খুব উপকৃত হব—'

হেসে বললুম, 'তার দরকার হবে না। তবু আমি সাধ্য মত খোঁজ খবর নেব। ডেলিভারির পরই যাতে আমাকে ফোনে জানানো হয় তারও ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।'

স্বামীর উদ্বেগ দেখে সুদত্তাও একটু হাসলেন, 'অত ভাবছ কেন তুমি, কিছু ভয় নেই—'

সুদত্তার মুখের এই হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল। বেশ লাগল তাঁর স্বামীকে আশ্বাস

দেওয়ার ধরনটুকু। মনে হল তিনি নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছেন। উদ্বেগ অশান্তি অস্বস্তির হাত থেকে এবার মুক্তি। আগেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। ডেলিভারিব পব সন্তানটিকে নার্স অন্য ঘবে সবিয়ে নেবে, তাবপব মেথব টেথর কেউ যদি নেয দিযে দেওযা হবে তাকে, আর না হয় কোন আশ্রম টাশ্রমে। সে সব ব্যবস্থা ওবাই কববে। সেজন্য মৃগাঙ্কবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। এমন কেস মাঝে মাঝে আসে এখানে। কি কবতে হয না হয় নার্সবাই সব জানে। ওদের হাতে টাকা ফেলে দিযে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায। সে টাকা জলে যায় না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, আমাব কিছু ভালো লাগছে না বাসববাবু। জীবনে সজ্ঞানে কোনদিন কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। আব এসব নোংবামিব মধ্যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পডতে হচ্ছে।'

বললুম, 'উপায কী বলুন।'

সুদত্তা দৃঢস্বরে বললেন, 'ওঁর কথায কান দেবেন না। যা ব্যবস্থা হযেছে তার চেযে ভালো কিছু হতে পাবে না।'

হাসপাতাল থেকে নার্স আমাকে বিং করল সকালে। শেষ রাত্রে ছেলে হয়েছে সুদত্তাব। বিশেষ কোন কষ্ট পাননি মিসেস মজুমদার। সন্তানটিও ভালোই আছে। বেশ স্বাস্থ্যবান সন্তানই হয়েছে।

খববটি প্রথমাংশ ফোনে জানিয়ে দিলুম মৃগাঙ্কবাবুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন একবার দেখে আসি সুদত্তাকে।'

একটু বিরক্ত হলুম মনে মনে। আবার আমাকে কেন টানাটানি করছেন। বললুম, 'আমার তো বেলা একটাব আগে অবসর হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ একটাতেই যাব।'

তারপর আমরা দুজনে মিলে উপস্থিত হলুম হাসপাতালে। পর্দা ঠেলে নার্সের সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে মিসেস মজুমদারের কেবিনে। ঢুকেই দুজনে দোরের কাছে একটু থমকে দাঁড়ালুম। একটি নার্স সুদত্তার বেডের কাছে দামী একটি তোযালেতে জডিযে শিশুটিকে দু'হাতে মেলে ধরে টুলের ওপর বসেছে। আব সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পবিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।

কিন্তু আমাদের দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন সুদত্তা। ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখখানিতে যেন দেহের সমস্ত রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নার্সকে ধমকে উঠলেন, 'যান, যান, নিয়ে যান এখান থেকে। ওকে কে আনতে বলল আপনাকে।'

নার্সটি মুহূর্তেব জন্য বুঝি একটু হতভম্ব হয়ে রইল তারপর মুচকে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি সুদত্তার দিকেই তাকিয়েছিলাম। মৃগাঙ্কবাবুব মুখভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করবার সুযোগ পাইনি। যখন তাঁর দিকে তাকালুম কোন বিকৃতির ভাব দেখতে পেলুম না।

একটু বাদে স্ত্রীকে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ সুদত্তা!'

প্রকৃতিস্থ হতে একটু সময় লাগল মিসেস মজুমদারের, চোখ-নিচু ক'রে বললেন 'ভালো'।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমাব এত ভয হচ্ছিল।'

সুদত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ভয়ের কি আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু যেন হাসলেন, 'না এবার নিশ্চিন্ত।'

খানিক বাদে ঘর থেকে বেবিয়ে এলুম আমবা। হঠাৎ মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাসববাবু আগেব এ্যারেনজমেন্ট সব ক্যানসেল করুন। আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সে কি। তা কি ক'বে হবে। মিসেস মজুমদাবই বা তাতে বাজী হবেন কেন। না না না, ও সব কবতে যাবেন না মৃগাঙ্কবাবু, জটিলতা বাড়াবেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু সিগাবেট ধবিযে নিয়ে হাসলেন, 'জটিলতার তো কিছু নেই, মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।'

আমি প্রতিবাদ ক'বে বললুম, 'না না না, কি বলছেন আপনি। এখানকার মাতৃত্ব তো অবিমিশ্র নয়। তাব সঙ্গে সমাজ, সম্মান কত বকম কত সংস্কার, সুবিধা-অসুবিধা-বোধ জড়িযে আছে। মিসেস মজুমদাবেব যে বাৎসল্য আপনি দেখলেন, তা হয তো নিতান্তই ক্ষণিক, নিতান্তই ফিজিক্যাল।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু হাসলেন, 'সবই তো তাই।'

আমাব বাধা মানলেন না মৃগাঙ্কবাবু। তখনই নার্সদের সঙ্গে আগেব বন্দোবস্ত সব নাকচ ক'বে দিযে এলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু মিসেস মজুমদাব—'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি সব ম্যানেজ কবে নেব। আপনি ভাববেন না।'

বেশ একটু বিবক্তিব সুর মৃগাঙ্কবাবুব গলায়। মনে মনে ভাবলুম, 'আমাব ভাববার কি আছে।'

সপ্তাহখানেক বাদে স্ত্রীপুত্রকে বাড়ি নিযে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শুনলুম সুদত্তা খুব আপত্তি কবেছিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কান দেননি। বলেছিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো তুমি। না হয় তোমাব মত সুন্দব হয়নি, একটু কালোই হযেছে. তাই বলে ছেলে কেউ ফেলে দিযে যায নাকি।'

বাড়িতে পৌঁছে ফোনে আমাকে খবব দিলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে যথেষ্ট কষ্ট দিলুম আপনাকে—'

আমি বললুম, 'না না না।'

সেই সময় মজুর শ্রেণীর একটি রোগী আমার ডিসপেনসারীতে বসেছিল। সঙ্গে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটিই বড়। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই এসেছে। দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে দিলুম। ছোট ছেলেটি মার কোলে উঠেছে দেখে বড়টিও কোলে উঠবার

দাবী জানাতে লাগল। স্বামী তাকে নিজে তুলে নিল কোলে।

বললুম, 'ছেলে বুঝি তোমাব খুব বাধ্য?

ও জবাব দিল, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভারি ন্যাওটা।'

মনে মনে হাসলুম। ছেলেটি ওব স্ত্রীর আগের পক্ষের। ও আমার অনেক দিনের পেশেন্ট। ওদের সব খবরই জানি। ওর আগের স্ত্রী মাবা যাওযাব পর বর্তমান স্ত্রীকে সে বিয়ে ক'রে এনেছে। তখন বিধবা মেযেটির কোলে ছিল এই ছেলেটি। আজ সে তার মার কোল ছেড়ে দিব্যি আমাব বোগীব কোলে চড়ে বসেছে। সবই সংস্কার। যেমন মনের জোর দেখেছি মৃগাঙ্কবাবুব তাতে তাঁব পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

তারপর বছরখানেকেব মধ্যে কোন খোঁজ খবব বাখিনি মৃগাঙ্কবাবুর। ওঁরাও খোঁজ নেননি। আমিও ইচ্ছা করে দূবে সবে বয়েছি। আমার সঙ্গ খুব প্রীতিকব আব বাঞ্ছনীয নাও হতে পারে ওঁদের পক্ষে।

কিন্তু মাসখানেক আগে মিসেস মজুমদাব হঠাৎ সেদিন আমাকে ফোনে ডেকে বললেন, তিনি অসুস্থ। দযা কবে আমি যদি যাই তিনি খুব উপকৃত হবেন।

আমি বললুম, 'আচ্ছা। কিন্তু মিষ্টাব মজুমদার কোথায়?'

'তিনি একটু বাইরে গেছেন।'

হরিপাল লেনে আর একটা কল ছিল। শেষ করতে কবতে বেলা দেডটা, তারপর হাজির হলাম মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি।

পুবোন চাকব অমূল্য আমাকে গত বছব থেকেই চেনে; দেখে হেসে বলল, 'আসুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আসেন না আমাদেব এদিকে।'

খুব যে শক্ত অসুখ বিসুখ আছে এ বাড়িতে তার বকমসকম দেখে তা মনে হল না। অমূল্যর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ভাড়াটে বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে থাকেন মৃগাঙ্কবাবুরা। তার মধ্যে একখানা তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী, আব একখানা বসবাব, ভিতরের দিকের সবচেযে বড় ঘবখানায সুদত্তার গৃহস্থালী। দেখলুম অন্য দু'খানা ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। অন্দরের ঘরখানার সামনে এসে অমূল্য বলল, 'যান, মা আছেন ভিতরে।'

সাড়া পেয়ে সুদত্তাও এসে দাঁড়ালেন দোবেব সামনে, 'আসুন, ভাবলুম আপনি বুঝি এলেনই না।'

দেখতে আরো যেন সুন্দর হয়েছেন সুদত্তা, প্রথম দিককার সেই উন্মত্ততা কেটে গেছে। প্রশান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু দুই চোখের নিচে কেমন যেন বিষণ্ণতার আভাস।

বললুম, 'কি অসুখ আপনার।'

সুদত্তা একটু হাসলেন, 'এসেই অসুখের খোঁজ করছেন—'

বললুম, 'ডাক্তারদের কি কেউ সুখের দিনে ডাকে?'

সুদত্তা কোন জবাব দিলেন না।

ঘরের মধ্যে দোলনায় বছর খানেকের একটি শিশু ঘুমুচ্ছে, বললুম, 'ছেলে ভালো।'

আছে তো?'

সুদত্তা বললেন, 'হ্যাঁ, বিশুর কোন অসুখ বিসুখ নেই।'

বললুম, 'বিশু?'

সুদত্তা একটু আরক্ত হয়ে উঠে বললেন, 'পিসীমার দেওয়া নামই রাখা হয়েছে। বিশ্বেশ্বর।'

গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে বললুম, 'বেশ ভালো নাম হয়েছে। যাক অসুখ-বিসুখ কিছু নেই তাহলে। শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। খবর সব ভালো হলেই ভালো। মৃগাঙ্কবাবু বাইরে গেলেন যে হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, নাগপুরে গেছেন একটু। নতুন এক ধরনের গিনীপীগ নাকি দেখা গেছে সেখানে। তার কিছু সংগ্রহ ক'রে আনবেন।'

অবাক হয়ে বললুম, 'গিনীপীগ! গিনীপীগ দিয়ে কববেন কি তিনি?' সুদত্তা বললেন, 'ক্রসব্রীডিং নিয়ে উনি যে একসপেবিমেন্ট করছেন তাতে দরকাব হবে।'

বললুম, 'ক্রসব্রীডিং!'

সুদত্তা আমার চোখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ. বায়োলজিই তো ওঁর এখন মেইন সাবজেক্ট, হেরিডিটি সম্পর্কে—'

তারপর সুদত্তা হঠাৎ বললেন, 'আমি আব পাবছি না ডাক্তারবাবু।

একটু হাসতে চেষ্টা করে বললুম, 'বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী হলে এমন এক-আধটু উৎপাত—'

সুদত্তা তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'উৎপাত! বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী কি মানুষ নয় ডাক্তারবাবু? সে কি ইঁদুর না গিনীপীগ?'

তারপর একটু একটু ক'রে সবই খুলে বললেন সুদত্তা। তালা বন্ধ দুটো ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'বায়োলজির বই আর বোতল ভরা পোকা মাকড়ে দুটো ঘরই এখন ভরতি। বোধ হয় বিশুকেও ওর ভিতরে ভরে রাখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এনভিরনমেন্টের প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বেলায় অতখানি সর্তকতার দরকার হয় না বোধহয়।'

একটু হতভম্ব হয়ে বললুম, 'কি যে বলেন!'

সুদত্তা বলতে লাগলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন বিশুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কিছুতেই রাজী হননি। নিজের জিনিস কি কেউ ছাড়ে? মৃগাঙ্কবাবুর চোখে বিশু একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। বিশু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান। কিন্তু নিজের চোখে কিছুতে এসব সহ্য করতে পারছেন না সুদত্তা। দামী পোষাক, দামী সব খাদ্য আর খেলনার ব্যবস্থা তিনি করেছেন বিশুর জন্য। দিনের মধ্যে অন্তত তিন চার বার খোঁজ নেন ছেলের, কোলে করে আদর করেন, চুমুও খান। তারপর হঠাৎ বিশুর দিকে চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখেন আর কলম খুলে নোট নেন পকেটবুকে। নিজের চোখে ওই দৃশ্য কি ক'রে সহ্য করেন সুদত্তা?

কি বলব হঠাৎ ভেবে পেলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালুম, 'আজ একটু তাড়া আছে সুদত্তা দেবী। আজকের মত—'

সুদত্তা বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর একটু বসুন। আরো কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আবার কি?'

একটু চুপ করে রইলেন সুদত্তা, মুহূর্তের জন্য বুঝি ইতস্তত করলেন একটু, তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন এবারো আমি—। এবার আর তত এ্যাডভান্সড স্টেজ নয়। এবার আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'কি বলতে চান আপনি?'

এতক্ষণ মুখ নিচু করে কথা বলছিলেন সুদত্তা, এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। প্রথম দিনের সেই উম্মত্ত দৃষ্টি। যেন আজও তিনি ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। কি একটা অপ্রবৃত্তি আর ঘৃণায আজও যেন তাঁর সর্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠেছে।

সেদিনের মতই সুদত্তা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি যা চাই তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাব বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কম্প্যারেটিভ ষ্টাডির মেটিরিয়াল জোগাতে চাইনে।'

বাসব থেমে সিগারেট ধরাল। আমি সামান্য একটু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম, করবী তাড়াতাড়ি উঠে গিযে রেডিও খুলে দিল। বক্তৃতা নয়, গল্পও নয়, "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলুম গান।"

অনুরোধের আসর।

করবী বলল, "বাঁচলুম।"

# পালঙ্ক

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পোস্ট অফিস থেকে মকবুলই হাতে ক'রে নিয়ে এলো এনভেলপেব চিঠিখানা। ছোটো ডিঙি নৌকায ক'রে চৌধুরী-বাড়িতে সে দুধেব যোগান দিতে গিয়েছিল। সেই বাড়িতেই গাঁযেব পোস্ট অফিস, আসবাব সময পোস্টমাস্টাব তাব হাতেই রাজমোহন রায়ের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিযেছেন।

প্রশস্ত উঠোনে কোণাকুণিভাবে বাঁশের আড় টানানো। সেই আডে ঝি আর চাকরেব সাহায্যে নিজের হাতে ভিজে পাট মেলে দিচ্ছিলেন বাজমোহন। চিঠির দশা দেখে আগুন হযে উঠলেন 'হারামজাদা, এ-করছিস কি।'

মকবুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্যান, কি হইছে ধলাকর্তা?'

রাজমোহন ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হইছে! দ্যাখ, চাইয়া দ্যাখ দেখি চিঠিখানার দিকে। বলি, চিঠি কি খালেব জলে চুবাইয়া আনছিস? দুধে জল মিশাইস বইলা চিঠিতেও জল মিশাইছিস? তোর সবতাতেই জল, হারামজাদা?'

মকবুল গম্ভীর মুখে বলল, 'অমন কথা কবেন না ধলাকর্তা, আমার দুধে পানি নাই আমার নৌকায় তো পাটাতন নাই। এত কান্দাকাটি করলাম, একখানা তক্তা আপনে দিলেন না। গলুইর চারোটের কাছে রাখছিলাম চিঠি, জল লাইগা গেছে।'

রাজমোহন বললেন, 'জল লাইগা গেছে! এই বুঝি তোমার তক্তা আদায় করার ফন্দি। দ্যাখ মকবুল, তোর মতো এমন কুচক্কুইরা মানুষ পাড়ায় আব দুইজন নাই। ওকি, যাইস ক্যান? বয় বয়। তামাক খাইয়া যা।'

উত্তব ঘরের বাবান্দায় আগুন, মালসা, তামাকের ডিবে, মুসলমানদের জন্যে খুঁটিতে ঠেস দিযে বাখা আলাদা হুঁকো-কলকে। মকবুল অপ্রসন্ন মুখে গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

বাজমোহন পাট-মেলা ক্ষান্ত রেখে এবার চিঠির দিকে তাকালেন। মাস কয়েক আগে চোখেব ছানি কাটানো হযেছে। চশমা ছাড়া লেখাপড়ার কাজ কিছু করতে পারেন না। চাকবকে ডেকে বললেন, 'এই কালু, আমার চশমাজোড়া আইনা দে তো। ওই দ্যাখ, জলচৌকির উপর চশমা আর পঞ্জিকাখানা রইছে। যা, নিয়া আয়।'

সাদা নিকেলের ফ্রেমে পুরু লেনস। কাপড়ের খুঁটে কাঁচটা মুছে নিয়ে সাবধানে চশমাটা পরলেন রাজমোহন। তারপর প্রসন্ন মুখে চিঠিখানার দিকে চেয়ে বললেন, 'বউয়ের লেখা। ঠিকানাটাও অসীমাই লেখছে নিজের হাতে। বাবু সময় পায়েন নাই। তা বাবুর চাইয়া আমার বউব হাতের লেখাই ভালো, অনেক ভালো। কেডা কবে যে, মাইয়া-মাইনষের লেখা। ঠিক একেবারে পুরুষের ধরন, পুরুষের ছান্দ। টান-ঠানগুলি একেবারে পাকা। দেখছিস কালু, দেখছিস?'

তেরো-চৌদ্দ বছরের বালক চাকর কালু মণ্ডলের অক্ষর-পরিচয় হয়নি। তবু সে খামের উপর ইংরেজিতে লেখা ঠিকানাটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারিফ ক'রে বলল, 'তা ঠিকই কইছেন ধলাকর্তা, ঠাইরেনের হাতের লেখাটা খুব ভালোই। ঠাইরেন দেখতেও যেমন সোন্দর, তানার চাল-চলন, কওন-বলনও তেমনি। সেবারে যে আইছিলেন, আমারে দুইডা টাকা বকশিশ দিয়া গেলেন। নেব না, তবু জোর কইরা গছাইয়া দিলেন। আপনাদের কায়েতের ঘরের বউঝি ধলাকর্তা, রকমই আলাদা।'

বয়স অল্প হলে কি হবে, কালুব কথাবার্তা খুব পাকা। বাজমোহন একটু হেসে বললেন, 'আরে কেবল কায়েতের ঘবের মাইয়া হইলেই হয় না। ঘরখানা কেমন, বংশখানা কেমন, তা দেখবি না? চণ্ডীপুবের অম্বিকা বোসের নাতনী? এ-অঞ্চলের মধ্যে অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান গুণী মানী লোক আর ছিল না। তাঁর বাড়ির মাইয়া। আমি কি যেমন তেমন বউ ঘবে আনছিলাম?'

এবার এনভেলপের মুখখানা ছিড়ে চিঠিখানা সশব্দে পড়তে লাগলেন রাজমোহন। পডবার আগে কালুব দিকে চেযে বললেন, 'কেবল হাতের লেখা না, চিঠির মুসাবিদাটাও একবার শোন। তার মুসাবিদার কাছে উকিল-মহুরীও হাইরা যায়।'

মকবুলকেও ডাকলেন রাজমোহন, 'ও মকবুল, আয় এখানে, শোন আইসা।'

কৌতূহলী মকবুল হুঁকো হাতে উঠানে নেমে রাজমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজমোহন পড়তে লাগলেন :

শ্রীচবণকমলেষু

বাবা, অনেকদিন হয় আপনাব চিঠিপত্র পাইনে। আপনার চিঠি না পেলে আমরা বড়ই চিন্তায় থাকি। ওখানে আপনি একা একা আছেন। আমরা কেউ কাছে নেই, আপনার নাতি-নাতনীরা কেউ কাছে নেই, কেবল ঝি আর চাকর ভরসা ক'রে আপনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা একা কাটাচ্ছেন। এ-কথা যখন ভাবি, আমার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। আমরা থাকতে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে না, এ-কথা মনে হ'লে আমার দুঃখেব অবধি থাকে না। কিন্তু কি করব? আপনি তো আমাদের কথা শুনলেন না, আপনি তো পাকিস্তান ছেড়ে কিছুতেই এলেন না। অথচ বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে পাড়াপড়শীরা একে একে সবাই তো প্রায় চলে এসেছে। বাঁড়ুয্যেরা এসেছে, মুখুয্যেরা এসেছে, রাহারা এসেছে, সাহারা এসেছে। কুণ্ডুরা, নন্দীবা কেউ বাকি নেই। বলতে গেলে গ্রাম তো এখন একেবারে শূন্য। তবু আপনি এলেন না! এলেন না, তা ছাড়া ভবিষ্যতের কথাও একবার ভেবে দেখলেন না। অথচ যাঁরা আপনাব বয়সী, যাঁরা বৈষয়িক মানুষ, তাঁরা সবাই এতদিনে এখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সময় থাকতে, দর থাকতে থাকতে ওখানকার স্থাবর-অস্থাবর সব বিক্রি ক'বে দু'পয়সা হাতেও করেছেন। কিন্তু আপনি কিছু করলেন না।

শুনতে পাই, আপনি নাকি লোকেব কাছে বলে বেড়ান, বাড়ির সব জিনিশ আপনার, সব সম্পত্তি আপনার, একগাছা কুটো, এক ছটাক জমিও আপনি নাকি বিক্রি করবেন

না। মুসলমানেরা সব লুটে পুটে খাবে সেও স্বীকার, তবু আপনি কিছু ছাড়বেন না। আপনার বাড়ি, আপনার ঘর, আপনার সম্পত্তি। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করবেন। এর ওপর আমাদের কি বলবার আছে? অধিকারই বা কি?

কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করবার জন্য আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলেঘাটায় যে ঘর আমরা ভাড়ায় নিয়েছি, তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেয়াল আর মেঝে থেকে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে। সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় শুয়ে কানু, টেনু, রীণা, মীনা—আপনার অত আদরের নাতি-নাতনীদের কারো অসুখবিসুখই আর সারছে না। প্রত্যেক মাসে জ্বর-জ্বারি আর ডাক্তার-খরচ লেগেই আছে। আপনার ছেলের কাছে খাট-তক্তপোশের কথা বললে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন, বলেন, টাকা কোথায়? তা আমি বলি কি, আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানা আপনি এবার বিক্রি ক'রে দিন। দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান। আমি খাট পারি, তক্তপোশ পারি, যা হোক একটা আপনার নাতি-নাতনীদের জন্যে কিনে নিই। ওদের কষ্ট আর দেখা যায় না।

ভেবে দেখুন, এতে আপনার আপত্তির কারণ নেই, অমতেরও কিছু নেই। এ-তো আপনাদের বাড়ির জিনিস নয়। এক হিশেবে পরের জিনিস, পরের কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া। তা বিক্রি করলে আপনার সম্মানের কোনো হানি হবে না। আপনি আমার নাম ক'রেই বিক্রি করবেন। এখন পাটের সময়। মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা আছে। এই বিক্রি করার সুযোগ। তাছাড়া পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে? কারো তো আর ভোগে আসবে না। মিছামিছি উঁইয়ে কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তার চেয়ে আপনি ওটা বিক্রি ক'রে দিন। টাকাটা কানু-টেনুর প্রয়োজনে লাগুক। আপনার ছেলেরও তাই মত।

এখানে শ্রীমান শ্রীমতীরা সকলে কুশলে আছে। অফিসের কাজকর্মের চাপে আপনার ছেলে একটুও সময় পান না। তিনি পরে সময় ক'রে চিঠি লিখবেন। পত্র-পাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখবেন। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের অসীমা

সুরেন আলাদা চিঠি দেয়নি। স্ত্রীর চিঠির কোণায় এক লাইনে একটু সুপারিশ করেছে, 'আমার মনে হয় অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।'

'না, আপত্তি কিসের? কিছুতে আমার আপত্তি নাই, তোগো যা খুশি তাই কর, যা ইচ্ছা তাই কর।'

বলতে বলতে চিঠিটা সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজমোহন। চড়া গলায় চাকরকে হুকুম করলেন, 'কাউলা, পুবের ঘর খুইলা পালংখানা বাইর কইরা আন দেখি। ও জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না, ও পালং আমি আ... ফেলাইয়া দেব। তার বাপের বাড়ির সব জিনিস টোকাইয়া কুড়াইয়া তো নিয়াই গেছে! থাকবার মধ্যে আছে ওই পালং। ও জিনিস আর রাখব না। আরেক নেড়াকান্ত বউর গোলাম। তিনি আবার লেখছেন,

আপনার আপত্তি থাকা উচিত নয়। না, আমার আর কোনো আপত্তি নাই। ও পালং আমার ঘর থিকা না সরাইয়া আমি অন্নজল মুখে দেব না। যা পালং খুইলা নিয়া আয়।'

কালু বাধা দিয়া বলল, 'ধলাকর্তা, শোনেন।'

রাজমোহন বললেন, 'না, আর শোনা-শুনি নাই, কাউলা। আমার যে কথা, সেই কাজ। ও পালং ভইরা আমি পেচ্ছাব করি, পেচ্ছাব করি। ও জিনিস আমার বাড়ি থিকা দূর কইরা না ফেলাইলে আমার মনের জ্বালা মেটবে না, কাউলা, আমার বুকের আগুন নেববে না।'

এগিয়ে গিয়ে রাজমোহন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে পুবের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। এই ঘরে থাকত সুরেন আর তার স্ত্রী অসীমা। এক বছর আগেও সুরেন ছুটিতে এসে সপরিবারে এ-ঘরে বাস ক'রে গেছে। পালঙ্কখানা দক্ষিণের দুটি বড়ো বড়ো জানালা ঘেঁষে এখনো পাতা রয়েছে। গদিটাকে পুরু চট দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে রেখেছেন রাজমোহন। রোজ একবার ক'রে এসে দেখেন, উঁই-ইঁদুরে কাটল কিনা। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছেন। পুব দিকের বেড়ায় সুরেন আর অসীমার বাঁধানো ফটো। উত্তর দিকে ধানের গোলা আর স্তূপীকৃত শুকনো সাদা পাট।

রাজমোহনের পিছনে পিছনে মকবুলও এসে দোরের কাছে দাঁড়াল।

রাজমোহন বললেন, 'আয়, ঘরে আয় মকবুল, পালং খুইলা নিয়া যা।'

মকবুল বলল, 'এ পালং সত্যিই আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা?'

রাজমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, নগদ টাকা পাইলে আইজই আমি এ-জিনিস বিক্রি কইরা দেব। বিক্রি কইরা আইজই মনি-অর্ডার করব কইলকাতায়।'

মকবুল ঘরের ভিতরে ঢুকল। এ-ঘরে খাওয়ার জল নেই, ঠাকুর-দেবতার আসন নেই, কামলা-কিষাণ—সবাই এ-ঘরে আজকাল ঢোকে।

ঘরে এসে লুব্ধদৃষ্টিতে পালঙ্কখানার দিকে তাকাল মকবুল। ভারি শৌখিন দামী জিনিস। আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি। চারিদিকে চারটি পায়ায় বড়ো বড়ো বাঘের থাবা। হাত-খানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নকসার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোটো ছোটো হাতীর সারি।

মকবুল আবার জিজ্ঞেস করল, 'পালংখানা আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা? তা বউ-ঠাইরেন যে রকম খোটা দিয়া লেখছেন, তাতে আপনার মতো মানী লোকের এ-জিনিস রাখা উচিত না। তা এক কাজ করেন, ধলাকর্তা, জিনিসটা আপনে আমারে দেয়ন গিয়া।'

রাজমোহন মকবুলের দিকে তাকালেন, 'তোরে?'

মকবুল বলল, 'হ্ ধলাকর্তা। আমি মাগনা নেব না, সাইধ্য মত দাম দিয়া নেব। জিনিসটা তো আপনে আদাড়ে ফেলাইয়া দিতেই চাইছিলেন। তা আদাড়ে দেওয়াও যা, আমারে দেওয়াও তো। আমারে দিয়া দেয়ন জিনিসটা।'

বাজমোহনেব আক্রোশ তখনও মেটেনি। মনে মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয। মকবুলেব ঘবেই এ-জিনিস যাওযা উচিত। যে বকমেব মেযে তাঁব পুতেব বউ, আব যে বকম ছোটো তাব প্রবৃত্তি, তাতে তাব বাপেব বাডিব জিনিসেব এই গতি হওযাই ভালো।

মকবুলেব দিকে তাকালেন বাজমোহন, 'পাববি? নগদ টাকা দিযা নিতে পাববি জিনিস? আইজই এই মুহূর্তেই আমাব ঘব পবিষ্কাব কইবা দিতে পাববি?'

মকবুল বলল, 'পাবব ধলাকর্তা, আমি বাডি গুনা টাকা নিযা আইলাম বুইলা। আপনি পালং খোলেন ততক্ষণ।'

মকবুল শেখেব বাডি কাছেই। বাজমোহনদেব বাডিব দক্ষিণ দিকে ছোটো একটা জংলা পোডো ভিটে, তাব দক্ষিণে সরু একটা খাল। অন্য সময শুকনো খট খট কবে, এখন বর্ষাব জলে ভবে উঠেছে, সেই খালেব ওপাবে মকবুলদেব বাডি। জংলা ভিটায একটা আমগাছেব সঙ্গে আব মকবুলদেব একটা তেঁতুল গাছেব গোডায বাধা বাঁশেব সাঁকো। পাযেব নিচে এক বাঁশ আব ধববাব জন্যে উঁচু ক'বে বাঁধা আব একটা সরু বাঁশ। সেই সাঁকোব ওপব দিযে উৎসাহে প্রায ছুটে গেল মকবুল।

তেঁতুলগাছেব নিচে ছোটো একখানা ঘব। ওপবে পুবনো কবোগেট টিনেব চাল। জাযগায জাযগায মবচে ধবেছে। বেডাগুলিব খানকযেক বাঁশেব বাখাবি দিযে তৈবি, সামনেব খান-দুই পাঁকাটিব। মাটিব ভিত বর্ষাব জলে থিক-থিক কবছে। মাটি খুঁডে গোটাকযেক কেঁচো আশ্রয নেওযাব চেষ্টা কবছে ভিতবে। সামনে ভিজে স্যাতস্যাতে ছোটো একটু উঠান। খালেব জল বাডিব উপব উঠি উঠি কবছে। এখনো ওঠেনি। উঠানে বসে একুশ বাইশ বছবেব নীল বংযেব একখানা জোলাকি শাডিপবা ফর্সাপানা একটি বউ শাপলা কুটছিল। খানিক দূবে শাপলাব ফুল নিযে খেলা কবছে চাব-পাঁচ বছবেব উলঙ্গ বোগা বোগা দুটি ছেলেমেযে। কোমবে একটা ক'বে ফুটো পযসাব সঙ্গে একগাছি ক'বে কালো তাগা বাঁধা। দেহেব আব কোথাও কিছু নেই। উঠানেব পুবদিকে দিযে পাঁকাটি শুকোতে দেওযা হযেছে। তাতে জ্বালানি হবে, ঘবেব বেডা হবে। সে পাঁকাটিব আডালে একটা বোগা হাড-বেব কবা গরু খড চিবুচ্ছে আব লেজ লাডছে।

রুদ্ধশ্বাসে মকবুল এসে স্ত্রীব সামনে দাডাল, 'ফতি, ওঠ। উইঠ্যা শীগগিব টাহা বাইব কব।'

ফতেমা আঁচলখানা মাথায তুলে দিযে কালো বডো বডো দুটি চোখ মেলে সবিস্ময়ে স্বামীব দিকে তাকাল, 'এ তুমি কও কাব নাগাল? টাহা পামু কই?'

মকবুল মুচকি হেসে বলল, 'পাবিআনে।'

তাবপব নিজেই টাকাব সন্ধান দিল। বাঁশেব ছোটো শুকনো চোঙাটাব মধ্যে আছে ভাঁজ কবা কযেকখানা নোট। পাট বেচে, গাছ বেচে, গাইযেব দুধ বেচে একটি একটি ক'বে সঞ্চয কবেছে সেই টাকা। স্ত্রীকে সেই টাকা বেব ক'বে দিতে অনুবোধ কবল মকবুল।

কিন্তু ফতেমা কিছুতেই উঠতে চায় না। কেবল ইতস্তত করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে পরম অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলল, 'সেই টাহা দিয়া না তুমি গাই কেনবা, সেই টাহা দিয়া না তুমি ঘর সারাবা, সেই টাহায় তুমি না আমারে গয়না গড়াইয়া দিবা কইছিলা। ও টাহা আমি দেব না, আমারে মাইরা ফেলাইলেও না।'

মকবুল হেসে বলল, 'আরে গয়নাই তো আনতেছি ঘরে। কেবল তোর গয়না না বউ, আমারও গয়না। দুইজনে মিলা একসঙ্গে পরব। কী চমৎকাব পালং রে ফতি! তুই তোর বাপের জনমেও দেখস নাই, আমিও না।'

সবিস্তারে মকবুল পালঙ্কের বর্ণনা দিল। ধলাকর্তা রাগ ক'রে পালঙ্কখানা শস্তায় বেচে দিচ্ছেন। এ সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না। বেশি দেরি করলে হয়ত ধলাকর্তার রাগ পড়ে আসবে। হয়ত অন্য কাবো হাতে গিয়ে পড়বে জিনিসটা। মকবুলের আফসোসের আর সীমা থাকবে না। এর আগে হিন্দুরা কত খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন-বাটি বিক্রি ক'রে গেছে। জলের দামে মুন্সীরা কিনেছে, কাজীরা কিনেছে, সিকদাররা কিনে রেখেছে। মকবুল একটা জিনিসও ছুঁতে পারেনি। একটা পয়সাও তার হাতে ছিল না। এখন সুযোগ যখন হাতের কাছে এসেছে, এ সুযোগ ছাড়া মোটেই সঙ্গত হবে না। একটা জিনিসের মতো জিনিস অন্তত থাকুক মকবুলের ঘরে।

ফতেমা নরম হয়ে বলল, 'কিন্তু জিনিস যে রাখবা মেঞা, তোমার সে ঘর কই? এই ভাঙা ঘরে রাজা-বাদশার পালঙ্ক মানাবে নাকি!'

মকবুল হেসে বলল, 'মানাবে ফতেমা, মানাবে। এই কুইড়া ঘরে আমার বেগমজান, আমার দিলজানরে মানাইতেছে না?'

দুই আঙুল দিয়ে স্ত্রীর থুতনি উঁচু ক'রে ধরল মকবুল, 'আমার এই ভাঙা ঘর রাঙা হইয়া রইছে না তার রোশনাইতে? এ-ঘরে তোরে যদি মানায়, তাইলে পালংও মানাবে।'

ঘরের ভিতর গিয়ে বাঁশের চোঙাটা মেঝের ওপর উপুড় ক'রে ফেলল মকবুল। নোটে আর রেজগিতে মিলিয়ে বায়ান্ন টাকা সাড়ে দশ আনা। খুচরো টাকা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ফের সেই সাঁকোর উপর দিয়ে ছুটে চলল মকবুল। জংলা পোড়ো ভিটেয় পাড়ার ইয়াকুব চৌকিদার মাছ ধরবার দোয়াইর তৈরি করবার জন্যে বুনো লতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মকবুলকে ছুটতে ছুটতে যেতে দেখে বলল, 'অমন ঘোড়া দাবড়াইয়া চললা কই মিঞা?'

মকবুল বলল, 'আরে ভাই চকিদার নাকি? আইস আইস, তোমারে দিয়া কাম আছে আমার। কথা আছে। তোমার দোয়াইর আমি বানাইয়া দেবনে, তুমি আইস।'

চৌকিদারের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল মকবুল।

রাজমোহন ততক্ষণে পালঙ্কখানা খুলে উঠানে নামিয়েছেন। মকবুল তাঁর পায়ের কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে দিয়ে বলল, 'এই নেয়ন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'টাকা দিয়া কি হবে? এ পালং তুই এমনিই নিয়া যা। নিয়া

খালের জলে ভাসাইয়া দে গিয়া। এ-জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না।'

মকবুল বলল, 'এমনিই নিতাম ধলাকর্তা। আপনার কাছ থিকা চাইয়া নিতাম, কিন্তু এ তো আপনার জিনিস না, ঠাইরেনের বাপের বাড়ির জিনিস। টাহা আপনে ঠাইরেনেরে পাঠাইয়া দেবেন।'

একটা বিষাক্ত তীর যেন বিঁধল গিয়ে রাজমোহনের বুকে। ঠিক ঠিক, এ পালঙ্ক তো তাঁর নয়। এ তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির জিনিস। এতে রাজমোহনের কোনো অধিকার নেই। সে কথা অসীমা তো স্পষ্টই লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা চিঠিখানা ভরে ওই একটি কথাই জানিয়েছে সে। দোয়াতের বিষ, তার অন্তরের বিষ কলমের ডগায় তুলে তুলে সারা চিঠি ভ'রে ছিটিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহন চেঁচিয়ে বললেন, 'তাই দেব, তাই দেব। টাকার যখন এত খাঁই হারামজাদীর, টাকাই পাঠাইয়া দেব তারে। তুই এ-জিনিস আমার চোখের সমুখ থিকা সরাইয়া নিয়া যা মকবুল, সরাইয়া নিয়া যা। ও তো পালং না, খাট না, ও আমার চিতার কাঠ। তুই সরাইয়া নিয়া যা।'

ইয়াকুব চৌকিদারের সাহায্যে পালঙ্কখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পালাল মকবুল। এবার আর সাঁকোতে নয়, তার ভাঙা ডিঙি নৌকোয় পার ক'রে নিল।

ভারি ভারি পায়াগুলি ডাঙায় নামাতে নামাতে ইয়াকুব বলল, 'তুমি ভারি জিত জিতা গেলা মেঞা-ভাই। এ পালং-এর দাম দুইশ' টাকার এক পয়সাও কম হবে না, তোমারে আমি কইয়া দিলাম।'

কথাটা মকবুল এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার। মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মতো সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম নাই! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই, একটি জ্বালানি কূটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউখ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। সুরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে? ছাইড়া দ্যাও মোনে।'

ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা মেঞাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ-খাট আমি এমনিই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।'

তারপর একটু চিন্তা করে মকবুল বলল, 'না ভাই, ওডা কথার কথা, কাইড়া নেওয়ার চাইয়া দাম দিয়া নেওয়া অনেক ভালো। জিনিসটা নিজের হয়। কেউ কোনো কথা কইতে পারে না। কি কও মেঞাভাই? সাচা কইলাম, না মিছা কইলাম?'

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিকই কইছ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবরটা পাড়া ভ'রে ছড়িয়ে পড়ল, রাজমোহন তাঁর দামী পালঙ্কখানা জলের দামে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। যে ধলাকর্তা ভিটের একটা বাঁশ বেচেন না, গাছ বেচেন না, একগাছা খড় বিক্রি করতে পর্যন্ত যাঁর সম্মানে বাধে, তিনি অমন শৌখীন সুন্দর একখানা পালঙ্ক কিনা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দিয়েছেন।

শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, গেদু মুন্সী, ছদন মৃধা—পাড়া-পড়শীরা সবাই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

শরৎ বলল, ধলাকর্তা, আপনার কি মতিচ্ছন্ন হইছে! অমন জিনিসটা আপনি মোটে পঞ্চাশ টাকায বেইচা ফেললেন। আমারে দিলে আমি দেড়শ টাকা দিতাম।'

গেদু মুন্সী বলল, 'আরে থোও ফেলাইয়া তোমার দেড়শ। ও-জিনিস আমি আড়াই শ' টাকা দিয়া নিতাম ধলাকর্তা। আমারে কইলেন না ক্যান?'

রাজমোহন চটে উঠে বললেন, 'তোমরা যাও, চইল্যা যাও, আমারে বিরক্ত কইরো না। ও-জিনিস আমি বিক্রি করি নাই, বিলাইয়া দিছি ফেলাইয়া দিছি। তোমরা চইল্যা যাও।'

কিন্তু চলে যাওয়ার আগে ছদন মৃধা অনুনয় ক'রে গেল, 'আলমারি, চেয়ার, টেবিল, সিন্ধুক যদি কোনো জিনিস ফের বিক্রি করেন ধলাকর্তা, আমারে কবেন, আমারে আগে জানাবেন। আমি নগদ টাকা দিয়া, ন্যায্য দাম দিয়া জিনিস নেব, ঠগাইয়া নেব না।'

ছদন মৃধাব অবস্থা পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালো। পাটের কারবার ক'রে বেশ কিছু জমিয়েছে। মাঠেও প্রায় শ'খানেক বিঘা খামার। ছদন মুসলমানদের মধ্যে মানী গুণী লোক।

কিন্তু রাজমোহন তার পিছনে পিছনে প্রায় ধেয়ে গেলেন, 'তুমি চইল্যা যাও মেরধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।'

রাজমোহনের মূর্তি দেখে সবাই সামনে থেকে স'রে পালাল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ধলাকর্তাব এবার ছিট হয়েছে মাথায়। হবে না? ছেলে-বউ নাতি-নাতনীদের ছেড়ে একা একা এই শূন্য পুরীতে থাকে মানুষটি, তার মাথা খারাপ হবে না।

সকলে চলে যাওয়ার পর রাজমোহন কিছুক্ষণ নিজের মনেই গুম হয়ে রইলেন। ঠকেছেন, তিনি ঠকেছেন কোনো সন্দেহ নেই। ঝোঁকের মাথায়, জেদের বশে তিনি নিজের সর্বনাশ করেছেন। চোরের উপর রাগ ক'রে ভাত খেয়েছেন মাটিতে। মাটি খেয়েছেন।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চাকরকে ডেকে বললেন, 'কাউলা, নৌকো খোল। আমি কুমারপুর যাব।'

সোনাপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে কুমারপুর গঞ্জ। সেখানকার রেজেস্ট্রী অফিসে

কাজ করেন রাজমোহন। দলিল লেখেন। আজকাল লিখতে ভারি কষ্ট হয়। হাত কাঁপে। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট, এমন কি অপাঠ্য হয়ে ওঠে। লোকে আর তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে চায় না। কিন্তু কাজ তাঁর না করলে চলে না। কাজের জায়গায় তাঁর রোজ একবার ক'রে যাওয়া চাই। কাজের আশায় অফিস ঘরের বারান্দায় খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা চাই।

সবাই বলে, 'আর ক্যান ধলাকর্তা? এখন বয়স হইছে। এখন এসব ছাইড়া দেয়ন। এখন আর এত কষ্ট করেন ক্যান?'

রাজমোহন জবাব দেন, 'না করলে ভাত হজম হয় না হরবিলাস। না কইরা দেখছি। হজম হয় না, ঘুম হয় না, অসোয়াস্তি লাগে।'

ছোটো বৈঠাখানা নিয়ে নৌকায় যাওয়ার আগে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, নাইয়া খাইয়া নিলেন না?'

রাজমোহন জবাব দিলেন, 'না আইজ আর নাওয়া খাওয়া লাগবে না। তুই তো পান্তা ভাত খাইয়া নিছিস। তাইতেই হবে।' তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন রাজমোহন, 'কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম, এ্যা কাউলা?'

'আমি তো আপনারে বারবাব না করলাম ধলাকর্তা। আপনারে—' বলতে বলতে কালু থেমে গিয়ে বৃদ্ধ প্রভুর মুখে দিকে নির্বাক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'চলেন, ধলাকর্তা।'

ধলাকর্তা। ধলাকর্তাই বটে, যৌবনে পাড়ার মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন রাজমোহন। দীর্ঘকায় চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ, উন্নত নাক, প্রশস্ত কপাল আর আয়ত চোখ। দেখলে রাজপুত্র ব'লে মনে হত। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে চেহারার সেই জৌলুষ আর নেই, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। রঙ নিষ্প্রভ হয়েছে। সুন্দর সুগঠিত দাঁতগুলির একটি কি দু'টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর একদিক থেকে রাজমোহন ধলাকর্তা হয়েছেন। এই কয়েক বছরে তাঁর মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। ভ্রূ সাদা হয়েছে, গোঁফ সাদা হয়েছে, বুকের ওপর একরাশ লোম বগী পাটের মতো সাদা ধবধব করছে।

কালু চাকর বলল, 'ধলাকর্তা, নায় ওঠেন।'

'হ, উঠি।'

কাঁধে ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে পুরনো ছেঁড়া চটি, বগলে তালি-দেওয়া ছাতা আর লাঠিখানা চেপে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে বসলেন রাজমোহন, খাল ছেড়ে নৌকো কুমার নদীতে গিয়ে পড়ল।

রাত্রে ফিরে এসে হ্যারিকেন হাতে প্রথমেই পুবের ঘরখানায় ঢুকলেন রাজমোহন। ঘরের অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। ঘরের দিকে আর চাওয়া যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন। কিন্তু সেই খালি ঘর যেন পিছনে পিছনে ছুটে এলো। খালি ঘর যেন বুকেব মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। বুক খালি ক'রে দিয়েছে।

উত্তরের ঘরে—নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন রাজমোহন। কাপড় ছাড়লেন, হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসলেন। কিন্তু মন বসল না। পুবের ঘরের সেই খালি জায়গাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইষ্টমন্ত্রের বদলে পালঙ্কখানাকেই বারবার ক'রে মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে-যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে, এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।

পরদিন সকালে উঠে তিনি প্রথমে কালুকে দিয়ে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন। মকবুল এলো না। কালুকে বলল, তাব এখন মেলা কাজ। পরে সময় মতো ধলাকর্তার সঙ্গে সে দেখা করবে।

রাজমোহন অবশিষ্ট দাঁতগুলি কিড়মিড় করলেন, 'হারামজাদার আস্পর্ধা দেখ! আমি ডাকলাম, বলে কিনা, কাজ আছে! কাজ আমি ওয়ার বাইর কইবা দেব।'

কালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কি করবেন ধলাকর্তা? এখন ওয়াগো দিনকাল ওয়াগোই রাজত্ব। বড়া বাঁশের চাইয়া ছিটা কঞ্চির ত্যাজ বেশি।'

রাজমোহন বললেন, 'হুঁ।'

তারপর খানিক বাদে নিজেই চললেন মকবুলদের বাড়ির দিকে, ভালো ক'রে হাঁটতে পারেন না। বাতে বাঁ-পাটাকে প্রায় অকেজো ক'রে ফেলেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জল-জঙ্গল ভেঙে সেই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে রাজমোহন মকবুলের উঠানে এসে দাঁড়ালেন, 'কি করতেছিস মকবুল?'

দুধের যোগান দিয়ে এসে বারান্দায় বসে স্ত্রীকে নিয়ে গোরুর দড়ি পাকাচ্ছিল মকবুল। রাজমোহনের গলার শব্দ শুনে ফতেমা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মকবুল বলল, 'আসেন ধলাকর্তা, আসেন।'

কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আন্তরিকতা ফুটে উঠল না। অবশ্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জলচৌকিখানা রাজমোহনকে ছেড়ে দিল মকবুল, বলল, 'বসেন ধলাকর্তা, তারপর কি মনে কইরা? আমিই তো যাইতাম। আপনি কষ্ট কইরা আইলেন ক্যান আবার?'

রাজমোহন বললেন, 'আইলাম তোগো দেখতে। কেমন আছিস খোঁজ নিতে। তা ঘরখানা তো ভালোই উঠাইছিস। ছাওয়ালপান নিয়া থাকবার মতো বড়ও হইছে। তা পুরানো টিন দিছিশ ক্যান চালে। বদলাইয়া নতুন টিন দে।'

কথার ফাঁকে একবার আড়চোখে মকবুলের ঘরের মধ্যে তাকালেন রাজমোহন। পালঙ্কখানা কালই পেতে ফেলেছে মকবুল। ওর সমস্ত ঘরখানাই প্রায় জুড়ে গেছে। উঁচু পালঙ্কের নিচে হাঁড়ি-পাতিল, ফতেমার গৃহস্থালি। উপরে গদি নেই, গদি মকবুলকে দেননি রাজমোহন। তার বদলে একটি মাদুর আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা বিছিয়েছে ফতেমা। একদিকে ওয়াড়হীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ। যেন চিতা থেকে কেউ তুলে নিয়ে

এসেছে। তাঁর পালঙ্কের কি দশা করেছে এরা। এ দৃশ্য দেখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের কথায় ফিরে গেলেন রাজমোহন। বললেন, 'হ, টিন বদলাইয়া ফেলা, নইলে চাল নষ্ট হইয়া যাবে যে, জল পইড়া ঘর নষ্ট হইয়া যাবে।'

মকবুল বলল, 'বদলাব তো ধলাকর্তা কিন্তু টাকা কই? মনে কতই তো সাধ—, একটা গাই কেনব, ভালো একখান নাও কেনব—কিন্তু টাকা কই?'

রাজমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'টাকা তোর নিয়া আইছি।'

মকবুল চোখ তুলে তাকাল, 'কি কইলেন?'

রাজমোহন বললেন, 'আয়, তোর সাথে কথা আছে আমার। বুঝাইয়া কই।'

চৌকি ছেড়ে উঠানে নেমে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

কিন্তু মকবুল উঠতে চায় না। বলল, 'কয়ন কর্তা, যা ক'বার এখানেই কয়ন। নাই কেউ এখানে।'

রাজমোহন সে-কথা শুনলেন না। ওর হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে আড়ালে নিয়ে গেলেন।

চারদিকে জল, চারদিকে জঙ্গল, তিনদিকে খাল, একদিকে নদী। আশেপাশে দূরে দূবে আরো খানকয়েক মুসলমান-বাড়ি আছে। কোনোটিতে জল উঠছে। আর কোনো বাড়ি জলেব ওপরে জেগে রয়েছে। এক একটি বাড়ি যেন এক একটি দ্বীপ। পুব-দক্ষিণ কোণে ছোটো একটা বাঁশের ঝাড়। সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

মকবুল বলল, 'ব্যাপার কি ধলাকর্তা? কি কবেন, কইয়া ফেলেন।'

রাজমোহন ট্যাঁক থেকে মকবুলের দেওয়া কালকের সেই নোটগুলি বের করলেন। সেই সঙ্গে আর একখানা নতুন পাঁচ টাকার নোট। মকবুলের দিকে টাকাগুলি বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'গুইনা নে। মোট পঞ্চান্ন টাকা আছে। পাঁচ টাকা তোর ছাওয়াল-মাইয়ারে আমি মিষ্টি খাইতে দিলাম।'

রাজমোহনের বক্তব্যটা কি, তা মকবুল অনেক আগেই টের পেয়েছে। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মকবুল। চোখ দুটো ভালো নয় মকবুলের। কেমন যেন লালচে লালচে। একটু পিছিয়ে গেলেন রাজমোহন। তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান পুরুষ—গায়ের রং ঘোর কালো। যেন আস্ত একটি গাব গাছ। মাথায় তাঁর চেয়ে লম্বা। খুব চওড়া নয়, কিন্তু শক্ত চোয়াড়ে-চোয়াড়ে হাত পা। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। মুখে আবার শখ ক'রে চাপ-দাড়ি রেখেছে মকবুল। তাতে ঠিক একটা জন্তুর মতো হয়েছে দেখতে।

রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা। ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানীজ্ঞানী মানুষ। আপনাকে কি আমি অপমান করতে পরি? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দেব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাটা মনে রাইখো মকবুল শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইচ বইলা যে সকলেই লাট হইয়া গেছ, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।'

রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান। খাট বিক্রি কইরা আবাব সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ। তা কি কইলা তুমি?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-রে বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পারলা? শরম করল না?'

মকবুল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

ফতেমা এবার বুঝতে পারল, মকবুল তাকে ক্ষেপাবার জন্যেই এ-সব কথা বলছে। ধলাকর্তার সঙ্গে তার মোটেই এ-ধরনের কথাবার্তা হয়নি।

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়ামানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়ামানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইরা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা? ছাওয়ালপান লইয়া ঘর করি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মদ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক। তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।'

আঁচলটা বুঝি একটু সরে গিয়েছিল, ফতেমা তাড়াতাড়ি বুকের ওপর তাকে ভালো ক'রে টেনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে লজ্জিতভাবে বলল, 'তোমার সাথে কথা কওয়ার জো নাই। আর ও দুইডা চউখ তো না যেন—'

উপমাটা হঠাৎ ফতেমার মুখে যোগাল না।

কিন্তু মকবুল ওর কথার ভাব বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের চউখ, জুয়ান মাইনষের চউখ ওই রকমই হয় বিবি। এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না, এ-চউখের ধরনই আলাদা। দুনিয়ার অন্যায় অবিচার দেখলে রাঙ্গা হয়, আর দুনিয়ার সোন্দর জিনিস দেখলে এ-চউখে রঙ ধরে।'

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার পরে রাজমোহনের বাড়িতে ডাক পড়ল মকবুলের। উত্তর ঘরের চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দু'টি সতরঞ্চি পাতা। একটি মুসলমানদের জন্যে আর একটি হিন্দুদের। মাঝখানে তামাকের ডিবা, আগুনমালসা, গুটিতিনেক ছোটো বড়ো

হুকোঁ, দু'টি হিন্দুর একটি মুসলমানের।

পাড়ায় বর্ণহিন্দু বলতে আর কেউ নেই। যারা আছে, তার সবাই কৃষ্ণবর্ণ। শরৎ শীল, মুরারিমণ্ডল, ফটিক কর্মকার, নিবারণ রজক, এরা সকলেই রাজমোহনের অনুগৃহীত। অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছে। আর মুসলমানদের দলে আছে ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী।

মকবুল এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেদু মুন্সী মুরুব্বির সুরে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো কব নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমরা তানাব জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি। তুমি ধলাকর্তার জিনিস ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দাও গিয়া।'

মকবুল বলল, 'এমন অন্যায় কথা আমারে কবেন না, মুন্সী সাহেব। ধলাকর্তা নিজের হাতে তানার খাট আমারে ধইরা দিছেন, নিজের মুখে বিক্রি কইরা দিছেন। টাহা নিছেন আমার কাছ থিকা। ওই ইয়াকুব চকিদার তার সাক্ষী। এখন ওই খাট উনি আর ফেরত চায়ন কি বইলা?'

রাজমোহন বড়ো একখানা জলচৌকিতে গম্ভীরভাবে বসে ছিলেন। ডানদিকে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তার ফিতেটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'টাকা নিছি? ওই পালং-এর দাম পঞ্চাশ টাকা হয়? তুই কইলেই হইল?'

মকবুল বলল, 'আপনি তখন তাই কইছিলেন, ধলাকর্তা। তাছাড়া শক্তি বুইঝা জিনিসের দাম। পঞ্চাশের বেশি দেওয়ার আমার শক্তি নাই। আমি পঞ্চাশ দিয়াই নিছি।'

শরৎ শীল বলল, 'এ তো আর একটা কথার মত কথা হইল না মকবুল, তোমার শক্তি নাই আব একজনের আছে। তুমি হয় আর একশ ধলাকর্তারে গুইনা দাও, নইলে পালং নিয়া আইস।'

হিন্দুরা ঘাড় নাড়লেও মুসলমানরা একথায় কোন উচ্চবাচ্য করল না। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগল। কিন্তু সমস্যার কোন মীমাংসা হল না।

মকবুল স্পষ্টই বলল, 'এই যদি আপনাগো বিচার হয়, এ বিচার আমি মানতে পারব না। টাকা দিযা জিনিস কিনা, জিনিস আমি ফেরত দেব না। আপনারা দেওয়ানী করেন, ফৌজদারী করেন, যা ইচ্ছা করেন গিয়া।'

গেদু মুন্সী ধমক দিয়ে বলল, 'যা যাঃ! ছোট মুখে বড় কথা। বাড়ি গিয়া ভাইবা দেখ গিয়া, বিবির সাথে শলা-পরামর্শ কর গিয়া রাইত ভইরা। তারপর কাইল আইসা যা কবার কইস।'

মকবুল চলে গেলে গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা রাজমোহনকে প্রবোধ দেওয়ার সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না ধলাকর্তা। ও অমন গোয়ারগোবিন্দ মানুষ। পাড়ার কেডা ওয়ারে না চেনে? ও কি কাউর কথার বাধ্য? দেখি, বুঝাইয়া শুঝাইয়া খাট নিয়া ও যাবে

কোথায়? আপনার খাট হজম করবে ওয়ার সাধ্য কি? কিন্তু আপনেও রাগের মাথায় বড় কাঁচা কাজ কইরা ফেলছেন ধলাকর্তা। আপনেও আর আমাগো কথা কওয়ার মুখ রাখেন নাই।'

মুন্সী আর মৃধার সঙ্গে আর সবাই একে একে বিদায় নিল। শরৎ বলল, 'সব মেঞারাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা! তলে তলে সকলেবই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখেব পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যাযন, সইয়া যাযন। যখন যেমুন তখন তেমুন। আপনার তো একখানা খাট। বাড়িঘব, জমিজোত কত জনে জলের দামে বিকাইয়া দিয়া গেছে না? তাতে কি হইছে? তাতে কি তারা মইরা গেছে? মরে নাই। আপনে একখানা খাটের জন্যে আর মইবা যাবেন না, আপনি ইচ্ছা কবলে এখনো অমন পাঁচখানা খাট কিনা ঘর বোঝাই কবতে পাবেন, তা আমরা জানি না? যায়ন ঘরে যাযন, রাইত হইয়া গেছে ঘবে যাযন।'

আব এক ছিলিম তামাক টেনে শরৎ শীলও বিদায় নিল।

হ্যাবিকেনটা বড় চোখে লাগছে। আলো নিবিযে দিযে রাজমোহন অন্ধকাবে চুপ ক'বে বসে রইলেন। পুবেব ঘরেব বাবান্দায় মাদুব পেতে কালু এবই মধ্যে ঘুমিযে পড়েছে। সাবা বাড়ি, সাবা পাডাটাই নিস্তব্ধ। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, বড় একা, একা রাজমোহন। সমস্ত অপমান তাঁকে একা একাই হজম করতে হবে। কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ভারি অসহায বোধ করতে লাগলেন বাজমোহন। এই সময যদি হাবামজাদাটা বাড়ি আসত, যদি এসে তাঁব পাশে দাঁড়াত, তিনি কত বল পেতেন। কিন্তু সে আসবে না। তাকে বাজমোহন আসতে লিখবেনও না। সে যেখানে আছে সেখানেই থাক, বউ ছেলে নিয়ে সুখে থাক।

বাপ-বেটায় কত মনোমালিন্য হয়, কত ঝগড়াবিবাদ হয়, তাঁদের মধ্যে তো তা হযনি! তবু সে দূরে স'রে গেছে। তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তিব সঙ্গে রাজমোহনেব মিল নেই। রাজমোহন যা ভালোবাসেন, সে তা বাসে না। যে জমি-জায়গা, ভিটে-মাটি, ধান-পাট, গাছপালা রাজমোহনের কাছে প্রাণের চেয়েও বড়, তাব কাছে তা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। সে দেশ চিনল না, দেশের মানুষ চিনল না। চেনাব মধ্যে চিনেছে শুধু চাকরি আর শুকনো একগাদা বই। চোখের পাতা বুজে মানুষের কথা, মানুষের মানে সে বইয়েব পাতায খুঁজে বেড়ায। না, তার সঙ্গে কোন মিল নেই রাজমোহনের। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী, দেশান্তরী হয়েছে। রাজমোহন আর সে এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।

জোলো হাওয়া দিচ্ছে। বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে দেবদারু গাছটার পাতা সেই হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে। কত বড় হয়েছে দেবদারু গাছটা। রাজমোহন নিজের হাতে পুঁতেছিলেন এই গাছ। ঠিক সুরেনের বয়স গাছটার। সুরেনের মতই গাছটা রাজমোহনের চোখের সামনে বেড়েছে। কিন্তু তাঁর সমুখ থেকে সরে যায়নি।

'অনেক আপন, সে শত্তুরের চাইয়া, তুই আমার অনেক আপন দেবদারু। তোর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাইস নাই। তুই আমরা মতই ভিটামাটি আকড়াইয়া রইছিস। তোর মত আপন আমার কেউ না, সংসারে কেউ না।'

এই দেবদারু গাছটাকে কতজনে চেয়েছিল। একুশ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল গাছটার। রাজমোহন দেননি। বলেছেন, 'আমি কিনি আমি বেচি না।'

জীবনে কিছুই বিক্রি করেননি রাজমোহন। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রাজমোহনের। কেন করলেন—কেন বিক্রি করলেন পালঙ্কখানা? হঠাৎ তাঁর এ কী মতিভ্রম হল! জিনিসটা আর কি তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না? এতজনের এত জায়গা-জমি তিনি উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন, আর ভুল ক'রে বিক্রি করা নিজের জিনিসটা তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না! নিশ্চয়ই পারবেন। তাঁকে পারতেই হবে।

কিন্তু উদ্ধার করা সহজ হল না। মকবুলকে জব্দ করবার কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন না রাজমোহন। ও তাঁর ভিটে-বাড়ির প্রজা নয়, কোন টাকাকড়ি ধার নেয়নি। একটা মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় ওকে জড়িয়ে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। পাকিস্তানের আমলে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী মিলবে না। তাছাড়া মাতব্বর মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠবে।

কিন্তু বড়রকম কোন শত্রুতা না করতে পারলেও মকবুলের ছোটখাট অনিষ্ট করতে ক্ষান্ত রইলেন না রাজমোহন। ওর কাছ থেকে আধসের ক'রে দুধ রোজ নিতেন, ছেড়ে দিয়ে ওয়াহেদের কাছ থেকে নিতে শুরু করলেন। কামলা-কিষাণ খাটাতে হলে, বাড়ির কাছে ব'লে সবচেয়ে আগে মকবুলকেই ডাকতেন, সেই ডাক বন্ধ হল।

মকবুল জাতচাষী নয়, কারো কোন বরগা জমি চাষ করে না। কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে। পাটের সময় পাট কাটে, পাট ধুয়ে মেলে দেয়; ধানের সময়ও দলের সঙ্গে মিলে ধান কাটতে যায়। যখন শস্যের কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে, জ্বালানির জন্যে অন্যের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে, কাঠ চেলা ক'রে দেয়। এ সব কাজের জন্য রাজমোহনের বাড়িতে মকবুলেরই আগে ডাক পড়ত। কিন্তু এখন থেকে তিনি ওকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে লাগলেন। হিন্দুরা বেশির ভাগ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় মকবুলের কাজকর্ম এমনিতেই কমে গিয়েছিল। রাজমোহনের এই শত্রুতায় তা প্রায় বন্ধ হবার জো হল। মুসলমানপাড়ায় কামলা-কিষাণের চাহিদা কম। অবস্থাপন্ন ঘরের লোকও নিজের হাতেই প্রায় এসব কাজ সেরে নেয়। কাজের অভাবে মকবুল ভারি অসুবিধায় পড়ল।

কালুর কাছেই সব খোঁজখবব পেতে লাগলেন রাজমোহন। ডিঙি-নৌকায় তাঁকে কুমারপুরে পৌঁছে দিতে দিতে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, আইচ্ছা জব্দ হইছে শেখের পো। হাতে না মাইরা ওয়ারে ভাতে মারবাব জো করছেন আপনে। আপনার সাথে টেক্কা দিয়া ও পারবে ক্যান? আপনার এক দাঁতের বুদ্ধি রাখে নাকি ও?'

রাজমোহন তোবড়ানো গালে-খুশি হয়ে হাসেন, 'তবু তো দাঁত আমার নাই কালু। সবগুলিই প্রায় পইড়া সারছে।'

কালু আশ্বাস দিয়ে বলে, 'যা আছে তাই যথেষ্ট ধলাকর্তা। আপনার খালি মাড়ির চোটেই ও অস্থির হইয়া ওঠবে।'

...

অস্থিরতা মকবুলের মধ্যে সত্যিই দেখা দেয়। স্ত্রীর কাছে কঠিন শপথ ক'রে বলে, 'দেখি আর দুই চাইরডা দিন। শালার বুইডারে আমি খুন করব। ওয়ার চউখের সামনে লুইটা পুইটা নেব।'

ফতেমা শঙ্কিত হয়ে বলে, 'খবরদার, অমন কামও কইরো না, অমন কথাও ভাইবো না মনে।'

মকবুল বলে, 'ক্যান ভাবব না? জেল হবে, ফাঁসী হবে? হউক, একজনের পেছনে না হয় আর একজন যাব।'

ফতেমা বলে, 'কিন্তু আমরা যে পইড়া থাকব। আমরা যাব কোথায়? খবরদার, অমন কামও কইরো না। রক্ত অত গরম কইরো না। বোঝলা? ছাওয়াল হইছে, মাইয়া হইছে, মাথা এখন ঠাণ্ডা কইরা চল। ওয়াগো খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাও। তয় তো বুঝি ক্ষমতা । তয় তো বুঝি তুমি পুরুষের মত পুরুষ।'

মকবুল বলে 'হুঁ।'

ফতেমা বলে, 'হুঁ না। অমন লাফাইয়া-ঝাপাইয়া সর্দারি খেলাইতে তো সকলেই পারে। তার মধ্যে আর কেরামতি কি? আসল কেরামতি পোলাপান মানুষ করায়, পোলাপান বাচাইয়া রাখায়, দেখছ ওয়াগো চেহারা? শুগাইয়া শুগাইয়া কি দশা হইছে ওয়াগো, দেখছ? আমার সোনার সবদুল আর মজনুর দিকে একবার চাইয়া দেখ।'

রোগা হাড়-বের-করা ছেলেমেয়ে দুটিকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয় ফতেমা। আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওদের খাদ্যের অভাব যেন শুধু স্নেহ দিয়েই মেটাবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফতেমা আবার বলে, 'দ্যাখ, চাইয়া দ্যাখ!'

ছেলেমেয়েদের দিকে না চেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকেই ক্রুদ্ধভাবে তাকায় মকবুল, রুক্ষ চড়া গলায় বলে, 'ক্ষ্যাপাইয়া দিস না ফতি, আমারে ক্ষ্যাপাইয়া দিস না। আমার মাথায় খুন চড়াইস না।'

ফতেমা স্বামীর হাত ধ'রে বলে, 'না, খুনাখুনির কাম নাই, আমার কথা শোন। ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দিয়া আইস। কি হবে খাট-পালং-এ। প্যাটে যদি দুইডা ভাত থাকে, চাটাই পাইতা শুইয়াও সুখ। তাতেও ঘুম আসে।'

স্ত্রীর মুঠো থেকে রাগ ক'রে হাত ছাড়িয়ে নেয় মকবুল, তারপর আরক্ত চোখে বলে, 'খবরদার ফতি, অমন কথা কবি না, মুখ গুতাইয়া ভাইঙ্গা ফেলব। আর বারবার ধলাকর্তার পালং-ধলাকর্তার পালং করিস না আমার সামনে। ও পালং আর ধলাকর্তার না, ও পালং আমার গাইটের টাহা দিয়া আনছি আমি। চুরি কইরা আনি নাই, ডাকাতি কইরা আনি নাই। নিজের রোজগারেব টাহা দিয়া ঘরে আনছি পালং। এ জিনিস আমারই। বুঝলি?'

এগিয়ে এসে পালংখানার একটা পায়া আঁকড়ে ধরল মকবুল। যেন ওর ঘর থেকে জিনিসটা কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে বালিকাচায় দা'খানা ধার দিয়ে কাজের খোঁজে বেবিযে পড়ল মকবুল। কোথাও কাজ মিলল না। গরীব চাষী মুসলমানের গ্রাম। সকলের অবস্থাই প্রায় এই রকম। কে তাকে কাজ দেবে? মকবুল আক্রোশে অধীর হয়ে বেড়াতে লাগল। ধলাকর্তাকে সত্যি সত্যি খুন করবার সাহস হল না, তাঁব বাড়িতে ডাকাতি কববাবও সাহস হল না। শুধু দিনকয়েক ফাঁকে ফাঁকে চুরি ক'রে বেড়াতে লাগল। ঘর থেকে নয, বাগান থেকে এককাঁদি পাকা সুপুরি চুরি করল, দুটো ডাব নাবকেল চুবি করল।

রাজমোহন টেব পেয়ে বাড়ির সীমানায় দাঁড়িযে খিস্তি ক'বে গালাগাল করলেন, থানা-পুলিসেব ভয দেখালেন, মুরাবি মণ্ডলেব ছেলে মুকুন্দকে কিছু পযসা কবুল কবে সারাদিনেব জন্যে বাড়িতে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন।

সুপুরি চিবিয়ে আব ডাব নাবকেলের জল খেয়ে তো আব পেট ভরে না। মকবুল ভারি ফাঁপরে পড়ে গেল। বর্ষার এই সময়টায় সব বছরই কষ্টে কাটে। কাজকর্ম থাকে না, রোজগাবপত্রও থাকে না। ধান চাল তেল ডালেব দাম আক্রা হয। কিন্তু এবার যেন কষ্টেব মাত্রা সব চেযে বেশি। পাটেব খন্দ শেষ হযেছে। ধানেব খন্দ এখনো আসেনি। এই সময সকলেই বেকাব। থৈ থৈ বর্ষা। সকলেরই ঘরে জল, বাড়িতে জল। হাঁড়িতে চাল নেই। সকলেরই কষ্ট। তার মধ্যে মকবুলের কষ্ট সবচেযে বেশি। দু'চার টাকা যা সঞ্চয় করেছিল, পালঙ্কের পিছনে গেছে। এখন হাত একেবারে খালি, পেট একেবারে খালি। পিঠের সঙ্গে তার দিনরাত মিতালি। ছেলেমেয়েগুলি দাপাদাপি করে, বউ-এর ঝগড়ার চোটে বাড়িতে টেঁকা যায না। নিজের ছেলেমেয়েদের খাদ্য নিজেই যোগাড় কবে ফতেমা। দু' মুঠো খুদের সঙ্গে একরাশ শাপলা সিদ্ধ করে, কোনদিন বা একঝাঁক কচু। আঁচল দিয়ে খালের ঘাট থেকে টাকির পোনা ধরে, চিংড়ি মাছ ধ'রে আনে।

এর মধ্যে ধলাকর্তার চাকব কালু এল একদিন খবব নিতে, 'কি মকবুল মেযা, আছ কেমন?'

মকবুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বেশ আছি। বড মাইনষের বড় চাকর, তুই আছস কেমন?'

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানেব পর কালু আসল কথা পড়ল, 'পঞ্চাশের ওপব ধলাকর্তা আরো দশ টাকা তোমারে বেশি দিতে রাজী হইছে মকবুল। তানার পালং তানারে তুমি দিয়া দাও গিয়া, অবুঝ হইও না। বোঝলা?'

মকবুল তেড়ে প্রায় মারতে এলো, 'আমি তো বুঝছিই, তোরে এবার জন্মের বুঝ বুঝাইয়া ছাড়ব। নাম, নাম আমাব বাড়িগুনা। ফের যদি অমন কুপেরস্তাব নিয়া আসবি, ঠ্যাং বাইড়াইয়া ভাঙব, কইয়া দিলাম তোরে।'

তাড়া খেয়ে কালু পালাল তো এলো ছদন মৃধা, এলো গেদু মুন্সী। আড়ালে ডেকে নিয়ে সকলেই একই কথা বলে। পালংখানা বিক্রি ক'রে দিক মকবুল। ধলাকর্তা জানতেও

পারবে না, আর জানলেই বা কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে তো মকবুল, ছদন মৃধা পঁয়ষট্টি দেবে। গেদু মুন্সী উঠল পঁচাত্তরে। কিন্তু মকবুল ঘাড় নাড়ল। পালং সে বিক্রি করার জন্যে কেনেনি, নিজে ব্যবহার করবার জন্যে এনেছে। পালঙ্কের দর দু'চার পাঁচ টাকা বেড়ে বেড়ে পুরো একশোতে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মকবুল কিছুতেই গোঁ ছাড়ল না। পালঙ্ক সে বেচবে না কাউকে। বউ-ছেলে নিয়ে নিজে শোবে, নিজে ব্যবহার করবে।

গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা দুজনেই দাঁত কিড়মিড় ক'রে মকবুলকে অভিশাপ দিয়ে গেল, 'মর শালা, না খাইয়া শুকাইয়া মর। যাওয়ার সময় গোরে নিয়া যাইস তোর খাট।'

ফতেমাও সেদিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুমি কি! কেমুন ধারার মানুষ তুমি! এ যদি এক বিঘা জমি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফসল দেবে। এ যদি একটা গাই হইত, বোঝতাম বছর বছর দুধ দেবে; একটা গাছও যদি হইত বোঝতাম বছর বছর ফল দেবে। কিন্তু একখান শুকনো মরা কাঠ, তা তুমি ঘরে রাইখা মরতে চাও ক্যান?'

মকবুল স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, কিন্তু রাগ না ক'রে আস্তে আস্তে স্নেহকোমল স্বরে বলল, 'রাখি যে ক্যান মাগী, তা তুই বুঝবি না। মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মাইছিস, তা তোর বোঝবার কথা না। ও আমার কাছে মরা কাঠ নারে ফতি, ভারি তাজা জিনিস, ও আমার পুরুষের ত্যাজ।'

ফতেমা বলল, 'এতই যদি ত্যাজ, বাইর হও বাড়ির থিক্যা, চাকরি-বাকরি জোটাইয়া আন। শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান?'

মকবুল সে খোঁজ-খবরও নিয়ে দেখেছে, লেখা জানে না, পড়া জানে না—তাকে কে দেবে চাকরি?

স্ত্রীর কথায় পরম দুঃখে, পরম নৈরাশ্যে মকবুল শুকনো ঠোঁটে একটুখানি হাসল, 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।'

দিন দুই বাদে গরুটা বিক্রি ক'রে ফেলল মকবুল। তিন-বিয়ানো গাই। আজকাল দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধই করেছিল। ঘাস-বিচালির অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। একেবারে ভাগাড়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে মকবুল বেচে দিল ভিনগাঁয়ের লোকের কাছে। আর বেচল ছোট ভাঙা ডিঙিখানা। কিছু টাকা দিল ফতেমার হাতে, আর বাকি টাকায় একখানা ছই-ওয়ালা পুরনো নৌকো কিনল। কেরায়া বাইবে। সেই নৌকো নিয়ে ভোরে উঠে কুমারপুরে চলে যায় মকবুল। কোনদিন ভাড়া জোটে, কোনদিন জোটে না। আশায় আশায় ব'সে থাকে ঘাটে। বাড়ি ফেরে রাত দুপুরে। কোন দিন একটাকা পাঁচসিকে আনে। কোন দিন আসে শুধু হাতে। দেশের দিনকাল বড় খারাপ। দূরে দূরে কেরায়া যখন পায়, সবরাত্রে বাড়ি ফিরতে পারে না—ফেরে না মকবুল। ভিন্ন গাঁয়ের হাটে ঘাটে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়।

নৌকো নিয়ে সেদিন বাইরে চলে গেছে মকবুল, ফতেমা পাঁকাটি দিয়ে উনুন জ্বেলে রান্না চড়িয়েছে, রাজমোহন এসে উপস্থিত হলেন বাড়িতে, 'ও মকবুল, বাড়ি আছিস নাকি, ও মকবুল?'

ফতেমা তাড়াতাড়ি বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা কর্তারে বল, সে বাড়ি নাই, নাও নিয়া বাইর হইয়া গেছে। কর্তাবে পুছ কর, ওনার কি দরকার।'

কিন্তু পাঁচ বছর বয়স হ'লে কি হবে, মকবুলেব ছেলে বড হাবা। মা-বাবাব সঙ্গে দু'একটা কথা যদি বা বলে, বাবুদের সঙ্গে মোটেই মুখ খুলতে পাবে না। তাই আড়ালে থেকে ফতেমাকে কথাবার্তা চালাতে হল। বাজমোহন বললেন, 'কাসে বড় কষ্ট পাইতেছি। বাসকের পাতার রসে নাকি ভালো হয়। তোমাগো বাড়িতে বাসকের গাছ আছে। দুইডা পাতা নেব নাকি বউ?'

ফতেমা হেসে বলল, 'নেবেন না ক্যান কর্তা?—নেযন। দুইডা পাতাই তো, আপনি বারান্দায় বসেন, আমি আইনা দেই।'

'না না, আমিই নেব নে, আমিই নেব নে।'

ব'লে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসলেন রাজমোহন। ব'সে ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মোচড দিয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক, তাঁর পালঙ্ক! কিন্তু কি দশাই না ক'রে রেখেছে জিনিসটার! অমন সুন্দর সুন্দর নক্সা-করা পায়াগুলিকে তেল মেখে চুন মুছে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। আর উপরে সেই তেল-চিটচিটে চিতার ছেঁড়া কাঁথা আর বালিশগুলি। ছি ছি ছি! এত দামী জিনিস কি ওদের ঘরে মানায়! এ সব জিনিসের যত্ন কি ওরা জানে!

একথা-সেকথার পর রাজমোহন আসল কথা পাড়েন, 'তোমারে একটা কথা বলি বউ, বাগ কইরো না। মকবুলেরে বুঝাইয়া শুঝাইয়া কও, পালংখানা ফিরাইয়া দিক আমারে। ও যে দাম চায়, সেই দামই আমি ওয়ারে দেব।'

বেড়ার আড়ালে ফতেমা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'না, ধলাকর্তা, ও কথা আমি তারে কইতে পারব না। আপনে বাসকপাতা নিতে আইছেন, পাতা নিয়া যায়ন। ও সব কথা কবেন না।' ব'লে ফতেমা সেখান থেকে সরে গেল।

গালে যেন একটা চড় খেলেন রাজমোহন। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন পালঙ্কখানার দিকে। বাসকপাতা আর নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না রাজমোহনের। তবু যাওয়ার সময় ছিঁড়ে নিলেন দুটো পাতা।

বাড়িবাড়িতে পুজোর মণ্ডপ। তার মধ্যে রাধা-গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মুরলী, বামে চিরসঙ্গিনী রাধিকা। ব্রজমোহন রসরাজ শ্রীগোবিন্দ স্মিতমুখে চেয়ে রয়েছেন। স্নান ক'রে এসে সেই মণ্ডপেব সামনে খানিকক্ষণ বসে রইলেন রাজমোহন। ধ্যানমন্ত্র জপ ক'রে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'দয়াল, আমার সব মায়ার বন্ধন কাটাও, আমারে তোমার বৃন্দাবনের পথে নিয়া চল। তোমার ব্রজের রাঙ্গা ধূলায় আমার

কামনা-বাসনা, আমার লাঞ্ছনা-অপমান ঢাইকা যাউক।'

মনে হল, সবই বুঝি গেল। কিন্তু গেল কই? পরদিন ফের রাজমোহনের বাসকপাতার দরকার পড়ল। চাকরের সামনে ইচ্ছা ক'রে জোরে জোরে কাসির অভিনয় করলেন। বাসকপাতা না হ'লে আর চলে না।

ধলাকর্তার সাড়া পেয়ে আজ কিন্তু ফতেমা আর ঝাঁপের আড়ালে এসে দাঁড়াল না, কথা বলল না। দূরে এক কোণে লুকিয়ে রইল। কি জানি, আজ যদি আবার ধলাকর্তা পালঙ্কের কথা পেড়ে বসেন। রাজমোহন সে কথা বুঝলেন। বাসকগাছ থেকে আজও দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর যাওয়ার সময় ফের এসে বসলেন বারান্দায়। আর কাউকে না পেয়ে মকবুলের ছেলে সবদুলের সঙ্গেই আলাপ করতে শুরু করলেন। চোখ দুটো নিজের শাসন মানল না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালঙ্কখানার দিকে তাকাতে লাগল। মকবুলের বাসকগাছ প্রায় নিষ্পত্র হবার জো হল। কিন্তু রাজমোহনের কাসি আর সারে না, আসা আর বন্ধ হয় না।

একদিন রাত্রে ফিরে এসে মকবুল স্ত্রীকে বলল, 'শুনি কি? ধলাকর্তা নাকি রোজ আসা ধরছেন। আইসা এই বারান্দায় বইসা থাকেন?'

ফতেমা বলল, 'হ, বাসকপাতা নেওয়ার জন্য আসেন।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূর দূর। ঘোড়ার ডিম। তোরে দেখতে আসেন। তোর চান্দমুখ বুড়ার মনে ধরছে।'

ফতেমা রাগ ক'রে বলল, 'কি যে কও।'

মকবুল বলল, 'তাইলে আসল কথা কইয়া ফেল।'

ফতেমা বলল, 'কব আবার কি? আসল কথা তুমিও জান, আমিও জানি।'

মকবুল বলল, 'তা তো বোঝলাম। কিন্তু খবরদার, খবরদার। টাকাপয়সার লোভে পাছে রাজী হইস, কথা দিয়া ফেলিস। তাইলে আর আস্ত রাখব না।'

ফতেমা বলল, 'ক্ষ্যাপছ? পালং-এর কথা ওঠাবে বইলাই তো আমি তার কাছ দিয়া ঘেঁষি না। কিন্তু বুইড়ার নজর বড় খারাপ। যতক্ষণ থাকে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাইয়া চাইয়া দেখে। আমার ভালো লাগে না। যাই কও, বুকের মধ্যে কাঁপে। পোলাপান নিয়া ঘর করি। কি হইতে কি হবে। মানুষের নজরে বিষ আছে।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূর দূর। ওই ছানিপড়া চউখের নজরে কিছু হবে না। ও বিষ ধোড়া সাপের বিষ। তাতে মানুষ মরে না। তুই শান্ত হইয়া ঘুমা। আইচ্ছা, কাইলই আমি বুইড়ারে কইয়া দেব, আমার বাড়ি-মুকসুম যেন আর না হয়। হইলে পাও বাইড়াইয়া ভাঙব।'

...

কিন্তু মকবুলের নিষেধ করবার দরকার হল না। দিন দুই বাদেই রাজমোহন জ্বর আর রক্ত-আমাশয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারে না। গাঁয়ের ডাক্তার এলো চিকিৎসা করতে, বলল, 'রায়মশাই, আপনার ছাওয়াল-বউরে একটা চিঠি দেয়ন।

বুড়া বয়সে রোগটা তো ভালো না।'

রাজমোহন মাথা নেড়ে বললেন, 'না ডাক্তার, এখন না। খবর দেওয়ার সময় হইলে আমি তোমাকে কব। অফিসে নাকি তার প্রমোশনের কথা চলতেছে। এখন ছুটি নিলে সেডা আর হবে না। এখন যাউক।'

অসীমার নামে অন্য তহবিল থেকে টাকা নিয়ে পুরো দুশোই পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজমোহন। পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্ক বিক্রি হওয়ার কথা কি আর বউ বিশ্বাস করবে? ভাববে, বাকি টাকা শ্বশুর ভেঙে খেয়েছেন। ডাক্তার রোজ যাতায়াত করতে লাগল। কিন্তু অসুখ বেড়েই চলল।

এদিকে মকবুলও বড় বিপদে পড়ে গেল। হাটের দিন রাত্রে নওপাড়ার ঘাটে মাদারগাছের সঙ্গে নৌকো শিকল দিয়ে আটকে রেখে উপরে হাট করতে নেমেছিল, এসে দেখে নৌকো নেই। তালা ভেঙে নৌকো চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। নওপাড়া চোরের জায়গা। গেদু মুন্সীর শ্বশুরবাড়িও ওইখানে। তার সঙ্গে বড় বড় চোরেব সাট। বুঝতে কিছুই বাকী রইল না মকবুলের। আর এক জনের নৌকোয় কোনরকমে বাড়ি ফিরল। পরদিন থেকে সেই আগের অবস্থা, আগের চেয়েও খারাপ। এখন আর গরু নেই, নৌকো নেই, কিচ্ছু নেই। এখন বিক্রি করার মত আছে শুধু একখানা ঘর আর ঘরজোড়া একখানা পালঙ্ক।

শুয়ে শুয়ে সব খবরই শুনলেন রাজমোহন। শরৎ শীল এসে বলল, 'হবে না। আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়েছিল, তার শাস্তি পাবে না ধলাকর্তা?'

দিন কয়েক বাদে কালু এসে সেদিন চুপে চুপে আর এক খবর দিল, 'ধলাকর্তা, শোনছেন নাকি?'

রাজমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'কি?'

কালু বলল, 'তালাকান্দার আতাজদ্দি শিকদারের কাছে নাকি মকবুল পালংখানা বিক্রি কইরা দেবে। আতাজদ্দি নতুন দালান উঠাইছে। সেই দালান সাজাবে পালং দিয়া।'

রাজমোহন নিস্পৃহভাবে বললেন, 'সাজাউক।'

কালু বলল, 'দেড়শ টাকা নাকি দর উঠছে।'

রাজমোহন বললেন, 'উঠুক।'

কালু বলল, 'আইজ সন্ধ্যার পর আতাজদ্দি নাকি নিজেই নাও আর টাকার থইলা নিয়া আসবে।'

রাজমোহন পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, 'আসুক।'

সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার কাছ থেকে কয়েক ঘন্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গাঁয়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। আগে না গেলে কালু জায়গা পাবে না বসতে।

সন্ধ্যার পর বুবী ঝি পথ্যের বাটি রেখে গেল সামনে। রাজমোহন সে পথ্য মুখে

তুললেন না। রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল। রাজমোহন কেবল এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। চোখে ঘুম আর আসে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রাজমোহন। দুর্বলতায় পা কাঁপছে। হাতড়ে হাতড়ে লাঠিগাছটা তুলে নিলেন। কোমরের তাগায় চাবি বাঁধা। সেই চাবি দিয়ে ঘরের তালা আটকালেন। বাইরে এসে দেখলেন আকাশে ঘন মেঘ। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাতা কি হ্যারিকেন নেওয়ার জন্যে ফের আর ঘরে গেলেন না রাজমোহন। লাঠিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন।

মিনিট পনের বাদে মকবুলের উঠানে দাঁড়িয়ে রাজমোহন ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, 'মকবুল, এই হারামজাদা, বাইর হ,' ঘরের থিকা বাইর হ'।'

মকবুল ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠানে এসে দাঁড়াল, 'কেডা?—ধলাকর্তার গলা না? ধলাকর্তা নাকি?'

রাজমোহন দুর্বল জড়িতস্বরে বললেন, 'হ আমি। পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি?'

মকবুল অন্ধকারে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেডা কইল আপনারে?'

রাজমোহন বললেন, 'আরে তা দিয়া তুই করবি কি? এসব কথা কি গোপন থাকে? মাছিতে গিয়া কয়।'

মকবুল বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকারে অসুখ নিয়া আপনি আসলেন ক্যামনে ধলাকর্তা? পার হইলেন ক্যামনে?'

রাজমোহন বললেন, 'চারের ওপর দিয়া পার হইছি।'

মকবুল বলল, 'সর্বনাশ! আসেন, ঘরে আসেন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'আব তোর ঘরে যাইয়া করব কি? তুই তো যা করবার করছিস।'

মকবুল বলল, 'না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন দ্যাখেন আইসা।'

হাত ধ'রে রাজমোহনকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল মকবুল। গায়ে জামা নেই, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। পায়ে জুতো নেই। পরনে নেংটির মত একখানা কানি। যে চশমা ছাড়া চলতে পারেন না, ভুলে সেই চশমাটাও ফেলে এসেছেন।

ঘরে গিয়ে মকবুল স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ওঠ বউ, ওঠ। উইঠা বাতি জ্বালা। ধলাকর্তাকে দেখাই।'

পালঙ্কে প্রায় মূর্ছিতার মত পড়ে ছিল ফতেমা, স্বামীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল।

তারপর কেরোসিনের ডিবাটা জ্বেলে উঁচু করে ধরল পালঙ্কের দিকে। বাঁ হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ফতেমা। কিন্তু ছেঁড়া ঘোমটায় মুখ ঢাকা পড়ল না।

পালঙ্কের এক ধারে দুইটি শিশু প্রায় মড়ার মত পড়ে আছে।

রাজমোহন বললেন, 'তাইলে বেচিস নাই? আছে?'

মকবুল বলল, 'আছে ধলাকর্তা।'

'আতাজদ্দি বুঝি আসে নাই?

মকবুল বলল, 'আইছিল। দেড়শর ওপর আরও দশ টাকা বেশি দিতে চাইছিল। তবু ফিবাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিতে পাবছি। তবু শালাব ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্দাকাটি কবতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম—মাগী, আমাবে আইজকাব বাতখান সময় দে। অবুঝ প্যাটটাবে জোর কইরা খামচাইয়া ধইরা থাক। আইজকাব মত, আমার মান বাচা, রাখতে দে পালংখানা।'

বাজমোহন বললেন, 'মকবুল!'

মকবুল বলল, 'ধলাকর্তা!'

তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি ক'রে কোবোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধরে রইল। আর সেই ধোঁযা-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতেব দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আব কালো—দুই বঙেব দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পবস্পবের দিকে।

একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'

রাজমোহন বললেন, 'সে কি কথা, মকবুল!'

মকবুল বললেন, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?'

ব'লে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুইটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, 'খবরদার!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজেব মনেই. বলতে লাগলেন, 'এতদিন চুবি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'

# পতাকা

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র

উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচির একটা ছক কেটে রেখেছেন শচীবিলাস। গাঁয়ের নানা বয়সী উৎসাহী ছেলেদের আনাগোনার বিরাম নেই। ঝাঁড় থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে সোজা একটি তল্লা বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। নমঃশূদ্র পাড়ার গগন ঘরামি তার ধারালো দা নিয়ে নিখুঁতভাবে ছোটো-ছোটো গিঁটগুলি চেঁছে সমান করে দিয়েছে বাঁশটির। শচীবিলাস একবার তাঁর আঙুলের শীর্ণ ডগাগুলি বুলিয়ে নিলেন তার ওপর। মুখে একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

কিন্তু কেবল মুখের ভাবে নয় প্রশংসাটা ওঁর মুখের ভাষায় শুনতে চায় গগন, 'ঠিক হয়নি ছোটো কর্তা?'

শচীবিলাস মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'বেশ হয়েছে। পাকা হাত তোমার গগন। ঠিক হবে না কেন। তোমার হাতে বড়ো বাঁশের বড়ো বড়ো গিঁটগুলি পর্যন্ত তেলের মতো পালিশ হয়ে যায়, আর এ তো সামান্য একটা তল্লা বাঁশ।'

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কেটে মাথা নিচু করে নিজের হাতে চাঁছা বাঁশটির ওপর কপাল ছোঁয়াল। তারপর শচীবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে একি বললেন ছোটোকর্তা। এ কি ঘর গেরস্থালির কোনো কাজে লাগতে যাচ্ছে যে সামান্য বলছেন। এতে যে স্বাধীনতার নিশান উড়বে। বাঁশ বলতে মধু বাবুরা তো আমাকে ধমকেই দিলেন। বললেন, বাঁশ নয় ঘরামি, বাঁশ নয়, পতাকাদণ্ড।'

শচীবিলাস স্নিগ্ধ একটু হাসলেন, 'বেশ তাই বলো।'

সাদা ধবধবে একখণ্ড খদ্দরের কাপড়ে সযত্নে রঙিন তুলি বুলিয়ে দিল নীলকমল পাল। মাঝখানে শাদা জমির ওপর এঁকে দিল চরকা, দুই পাশে হরিত হলুদের ঢেউ। তারপর তুলি রেখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে ছোটো কর্তা?'

শচীবিলাস স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বেশ হয়েছে নীলকমল, চমৎকার হয়েছে।'

ছোট্ট একটি কাচের গ্লাস শচীবিলাসের মুখের সামনে প্রায় এগিয়ে ধরল ইন্দিরা, 'ওষুধটা এবার খেয়ে নিন বাবা।'

শচীবিলাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার ওষুধ।' কিন্তু পরমুহূর্তেই বিরক্তি দমন করে মেয়ের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা তুলে নিলেন শচীবিলাস। চুমুক দেওয়ার আগে সস্নেহে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'একদিন কিন্তু ওষুধ না-খেয়েও আমি ভালো থাকতাম ইন্দু।'

ইন্দিরা বলল, 'না-না, ওষুধটা খান।'

ওষুধ খেয়ে খালি গ্লাসটা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন শচীবিলাস। তাঁর মুখখানা একটু যেন ক্লিষ্ট, একটু যেন কঠিন দেখাল। হয়তো তা কেবল কটু স্বাদ ওষুধের জন্যই নয়। ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কী যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মতো সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে-মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন নিজেকে দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়। তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে? রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। তারপর ইন্দিরা হঠাৎ একসময় উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ওষুধের গ্লাস, কি চায়ের কাপ, কি তেলের বাটি। শচীবিলাস সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যান। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আজকাল আমি বুঝি খুব রূঢ়ভাষী হয়ে উঠেছি ইন্দু।'

ইন্দিরার মুখখানা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, তারপর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, বাবা, সত্যিই আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' কিংবা 'রোজই তো এই সময় আপনি চা খান বাবা।' 'বেলা যে একেবারে গড়িয়ে গেছে। এর পর চান করলে যে শরীর আপনার আরো খারাপ হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন শচীবিলাস। ইন্দিরা মিথ্যা বলেনি, সময় ভুল হয়নি তার। তবে কি শচীবিলাসেরই ভুল? না ইন্দিরার এই অভ্রান্ত সময়-জ্ঞানের মধ্যেই অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা আন্তরিক সৌহার্দ্যের অভাব মিলে রয়েছে? রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিষ্কে নয়, জ্ঞান মাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে-স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশসেবা। বিজ্ঞান নয়, ধর্ম। সূক্ষ্ম চারুশিল্প। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার-বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে। তিনি জোর করে স্বীকার করেন, 'হ্যাঁ, আমি পৌত্তলিক।' ইন্দিরা হাসে, 'এক হিশাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন, তাদের ইচ্ছামতো ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।'

ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকান শচীবিলাস। তিন বছর বয়সের মা-মরা মেয়ে ইন্দিরা। কিছুতেই কোলছাড়া হতে চাইত না। বকে, ধমকে, কাঁদিয়ে ওর পিসির কোলে দিয়ে তবে শচীবিলাস বেরুতে পারতেন। আজ তার শোধ নিচ্ছে ইন্দিরা। তার ভাষায় আজ আর আবদার নেই, অভিমান নেই, আছে কেবল শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। তাই ওষুধ খাওয়াবার দিকে ইন্দিরার লক্ষ আছে যত্ন আছে, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও যে শচীবিলাস সত্যি-সত্যি আজকের দিনে ভালো থাকতে পারেন—এতে ইন্দিরার বিশ্বাস নেই। এই উচ্ছ্বাস হয়তো তার কাছে উপহাসের বস্তু।

মহকুমা শহর থেকে শচীবিলাসের জন কয়েক কংগ্রেস কর্মী সহযোগী বন্ধু এই উপলক্ষে আজই সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবেন। এর আগের দু-তিন বছর শচীবিলাসকেই তাঁরা

আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন শহরে। তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করেছেন, তুলে ধরেছেন জাতীয় পতাকা। কিন্তু এবার ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন। ইদানীং ব্লাড প্রেশারটা বড়ো বেশি বেড়ে উঠেছে শচীবিলাসের। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্র। এ সময় পঁচিশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না। আর যে-রকম পথ-ঘাটের অবস্থা। চিকিৎসকদের শাসন হয়তো গ্রাহ্য করতেন না শচীবিলাস, কিন্তু গাঁয়ের লোকের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার তাদের মধ্যেই থাকতে হবে তাঁকে। এর আগে পর-পর কয়েক বছর তিনি দেশে থাকতে পারেননি। কখনো জেলে, কখনো-বা অন্য-কোনো জেলায় এ-দিনটি তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এত দিন বাদে নিজের গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন এসেই পড়েছেন শচীবিলাস তখন তাদের নিয়েই এবারকার উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপিত হোক। সমগ্র দেশের গৌরব শচীবিলাস, কিন্তু এই গাঁয়ের একান্ত আপনজন। এ কথা যেন ভুলে যান না তিনি। শচীবিলাস ভোলেননি, সানন্দে সম্মত হয়েছেন।

'নীরদবাবুরা বোধহয় সন্ধ্যাসন্ধি এসে পৌঁছবেন। বৈঠকখানাটা ভালো করে ধোয়ামোছা হয়েছে তো ইন্দু? রান্নাঘরে একটু খোঁজখবর নিয়ো বউঠান কি করছেন না করছেন।'

দূর সম্পর্কিত এক জেঠতুতো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ধরেই শচীবিলাসের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। ইদানীং সকন্যা শচীবিলাসই তাঁর আশ্রয় নিয়েছেন বলা চলে। ঘর সংসারের সমস্ত ভারই তাঁর ওপর। রাজনৈতিক প্রোগ্রামে বাপ-মেয়ে দুজনই যখন দীর্ঘ দিনের জন্য বাইরে চলে যান, চারুবালা একাই দু-একজন ঝি-চাকরের সাহায্যে আগলে রাখেন বাড়িঘর। পিতাপুত্রীর কারোরই রাজনীতির ধার তিনি ধারেন না। নিজের ঘরকন্না নিয়েই মশগুল। অবসর সময় কাঁথা সেলাই করেন, আসন বোনেন কিংবা সুর করে পয়ার ছন্দে বসে-বসে পড়েন রামায়ণ, মহাভারত আর চৈতন্যচরিতামৃত।

কী-একটা কাজে এ-ঘরে এসেছিলেন চারুবালা। দেবরের কথা কানে যেতে বললেন, 'স্বদেশী বন্ধুদের বুঝি স্বদেশী হাতের রান্না ছাড়া চলবে না ঠাকুরপো? তাই বউঠানে বিশ্বাস নেই, দেশোদ্ধারিণী মেয়েকে পাঠাচ্ছ রাঁধতে।'

শচীবিলাস বললেন, 'কী-যে বলছ বউঠান, ইন্দু আবার রাঁধতে পারে নাকি, তোমাকে জোগান দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছিলাম।'

চারুবালা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কথা শোনো। রাঁধতে আবার কোন্ মেয়ে না-পারে? আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আর চুল বাঁধত, আর এ-কালের মেয়েরা তার বদলে না-হয় রাঁধে আর দল বাঁধে। এমন-কোনো কাজ নেই যা ইন্দু না-জানে। আজকের সব রান্না ওকে দিয়ে আমি রাঁধাব দেখে নিয়ো।'

ইন্দিরার রান্না শচীবিলাসের একেবারে অনাস্বাদিত নয়। কাছে থাকলে দু-একটা তরকারি প্রায়ই তাঁর জন্য সে রেঁধে দেয়। খেতে ভালোই লাগে শচীবিলাসের। কিন্তু মুখে তা তিনি স্বীকার করেন না। আজও করলেন না, 'তা রাঁধাতে চাও রাঁধাও। কিন্তু

নুনের বৈয়ম আর লঙ্কার গুঁড়োর কৌটোটা একটু দূরে সরিয়ে রেখো বউঠান। মেয়ের কথার মধ্যে নুন-ঝালের পরিমাণ এত বেশি যে ঝোলে তার কিছু কম পড়লেও এসে যাবে না।'

শচীবিলাসের বন্ধুদের সঙ্গেও ইন্দিরা অসংকোচে, কুণ্ঠাহীনভাবে বিতর্ক চালায়, তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের ওপর ইন্দিরা যে তেমন শ্রদ্ধা পোষণ করে না তা চারুবালাও লক্ষ করেছেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগে না। শত হলেও তাঁরা ইন্দিরার বাপের বয়সী, অনেকে ইন্দিরার বাবার চেয়েও বেশি নামকরা লোক। কতবার জেল খেটেছেন দেশের জন্য। নিজের বাবার সঙ্গে যা-ই করুক বাইরের ওইসব প্রবীণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইন্দিরার মতো একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ের অমন অসহিষ্ণু উত্তেজিত আলোচনা করা চারুবালার চোখে বিসদৃশই লেগেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্দিরার অপ্রতিভ আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হল চারুবালার। শচীবিলাসের কথার জবাবে বললেন, 'কিন্তু সারা গায়ে তোমাদের নিশ্চয়ই কাটা ঘা আছে ঠাকুরপো। না-হলে নুন-ঝালের ছিটাকে অত ভয় কেন? আয় ইন্দু, তোর চুল বেঁধে দি। চুলগুলিকে কেমন বাবুইর বাসা করে রেখেছে দেখ। আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস যা হোক।'

ইন্দিরাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেলেন চারুবালা। শচীবিলাসের মনে হল এমন স্নেহের ভঙ্গিতে, এমন আদর করে আজকাল তিনিও তো আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না। কেবল ইন্দিরার দোষ দিলেই বা চলবে কেন। তিনিই কি তেমন ভাবে বুঝে দেখতে চেষ্টা করেন ইন্দিরার যুক্তি, ইন্দিরার বক্তব্য? শুনতে-না-শুনতে তিনিও কি ইন্দিরার মতই উত্ত্যক্ত আর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন না? দলগত মতভেদ কি এতই দুরতিক্রম্য যে বাপ মেয়ের সম্পর্ককেও তা স্পর্শ করে? তরুণ-তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়?

নিরুপমের কথা মনে পড়ল শচীবিলাসের। সামান্য মতানৈক্যের জন্য নিরুপমকে ইন্দিরা প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরুপমও সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে ইন্দিরার সঙ্গে, কিন্তু নিরুপমও তো বামপন্থী। সেও তো বিপ্লববাদী। ত্যাগ স্বীকার দেশের জন্য সেও তো করেছে। তবু তাকে সহ্য করতে পারেনি ইন্দিরা। অত্যন্ত অনায়াসে তার প্রেমকে সে অস্বীকার করেছে। একদিন শচীবিলাসও তো বামপন্থী ছিলেন, চরমপন্থী ছিলেন তাঁর আমলে। ফাঁসি যেতে-যেতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে-সঙ্গে বদলে চলে। এ-যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

...

সন্ধ্যার পর মোটরে করে শচীবিলাসের বন্ধুরা এসে পৌঁছলেন। প্রত্যেকেই এতদঞ্চলের প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী। এদের অনেকের সঙ্গেই শচীবিলাস একত্র কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন একসঙ্গে। মোটরের ধুলো উড়ে এসে লেগেছে ওদের জামা কাপড়ে। চশমার

কাচে পুরু হয়ে ধুলোর পর্দা পড়েছে। শচীবিলাস নিজের হাতে ঝেড়ে দিলেন বন্ধুদের কাপড়েব ধুলো। ইন্দিরা ট্রেতে কবে কাপ আর চায়ের কেটলি নিযে এল সাজিয়ে।

শরীবেব প্রতি তেমন লক্ষ রাখছেন না বলে শচীবিলাসকে অনুযোগ কবলেন বন্ধুরা। সঙ্গে-সঙ্গে অনুরোধ জানালেন কালকের প্রোগ্রামটা একটু সকাল-সকাল সেবে ফেলতে। আবো-কযেকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ভার পড়েছে তাঁদের ওপর। এ-যাত্রা এখানে বেশিক্ষণ দেবি করলে লোকে অতিবিক্ত বন্ধুবাৎসল্যের অপবাদ দেবে।

শচীবিলাস হেসে বললেন, 'মাভৈঃ, এখানকাব অনুষ্ঠান সূর্যোদয়েব আগেই না-হয় শেষ করা যাবে।'

বন্ধুদের জন্যে প্রোগ্রামটা সামান্য একটু অদল বদল করলেন শচীবিলাস। পুবেব আকাশে রক্তবর্ণ সূর্য যখন গোল হয়ে দেখা দেবে মাঠের মতো বিস্তৃত শেখেদেব চটান জাযগাটায় ত্রিবর্ণবঞ্জিত জাতীয পতাকা উত্তোলিত হবে এ গাঁয়ের। সংকল্প বাক্য পাঠ এবং আনুষঙ্গিক বক্তৃতাব পব অল্পবয়সী ছেলে মেযেদের শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। ছেলেদেব হাতে থাকবে পাকাটিব ডগায় ছোটো-ছোটো জাতীয পতাকা। ঠিক যেমন এ-গাঁয়ের বার্ষিক নগব সংকীর্তনের সময থাকে। মেযেদেব হাতে থাকবে শঙ্খ। সকলের হাতে হয়তো শঙ্খ দেওয়া সম্ভব হবে না, অত শঙ্খ গাঁয়ে নেই। কিন্তু মুখে-মুখে হুলুধ্বনি তো প্রত্যেকেই দিতে পারবে। দূরে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে গৃহস্থ বধূবা কিশোর-কিশোরীদেব এই শোভাযাত্রা আধো ঘোমটার আড়াল থেকে চেয়ে দেখবে। বারকোষ থেকে কেউ-বা ছিটোবে ফুল, কেউ-বা পিতলেব থালা থেকে খেজুর পাটালিব টুকরো ছিটিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে-কুড়িয়ে মুখে পুরবে আর সুমিষ্টস্বরে বলে উঠবে 'বন্দেমাতরম'। নিজের পরিকল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান শচীবিলাস। তারপর বিকালের দিকে সভা বসবে সমস্ত গাঁয়ের। আবৃত্তি হবে, সংগীত হবে, গাঁয়ের ভাষায় বক্তৃতা করবে গগন ঘরামি আর নীলকমল পালের দল। সহযোগী বন্ধুদের তিনি ততক্ষণ ধবে বাখবেন না। রাত্রে জাতীয় দেশাত্মবোধমূলক অভিনয করবে ছেলেরা। তাঁর উঠোনে সে-জন্য থিয়েটার মঞ্চ আগে থেকেই তারা তৈবি করে রেখেছে।

বন্ধুদের ডেকে সদ্য তৈরি জাতীয় পতাকাটা দেখিয়ে আনলেন শচীবিলাস। সবুজ কাঁচা বাঁশের সঙ্গে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত খদ্দরের কাপড় মজবুত সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। একেবারে গাঁয়ের প্রথায় তৈরি নিশান। বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করলেন, চমৎকার হয়েছে। সত্যিই—রুচি আছে শচীবিলাসের।

অনেক রাত্রে শুয়েও রাত্রে শচীবিলাসের বহুবার ঘুম ভেঙে গেল। শেষের দিকে একটু তন্দ্রার মতো এসেছে কী-একটা গোলমালে শচীবিলাস চমকে উঠলেন। ব্যাপার কী, কান খাড়া করে শুনলেন কিন্তু কথাবার্তার মর্ম যেন সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। পাড়ার ছেলেদের গলা। সবাই তাঁর উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ফলে তাদের উত্তেজনাটাই বোঝা যাচ্ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

শচীবিলাস বিছানা ছেড়ে নেমে এলেন উঠোনে, কী হয়েছে বিনয়, সবাই একসঙ্গে চেঁচিও না, যে-কেউ একজন এসে বলো।'

বিনয়ই এগিয়ে এল, 'মকবুলরা বলছে তাদের চটানে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে দেবে না। আমরা যে-শামিয়ানা টানিয়েছিলাম রাত্রে এসে তারা তা খুলে ফেলেছে। ছেলেরা ভোর হতে না-হতেই এম. ই. স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চগুলি মিটিং-এর জায়গায় টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, শেখ আর সিকদার বাড়ির লোক এসে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ার টেবিল তারা পাততে দেবে না ওখানে। কিছুতেই নাকি সিটিং হতে দেবে না। আপনি একবার হুকুম দিন জেঠামশাই, দেখি ওরা কেমন করে না-দিয়ে পারে।'

অতুল বলল, 'কেবল শেখ আর সিকদাররাই হবে কেন, চরকান্দির সমস্ত মুসলমানই এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। পীরপুরের সেই বুড়ো মৌলবীকেও দেখলাম। বোধহয় তারই কারসাজি এ-সব, কুবুদ্ধি দিয়ে রাতারাতি সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

শচীবিলাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এ কী বিভ্রাট, এমনভাবে বাধা আসবে এ-যে তিনি কল্পনায়ও আনতে পারেননি।

পিছনে-পিছনে ইন্দিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের কথায় হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ অতুলদা। একজনের কুবুদ্ধিতে রাতারাতি গাঁশুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরতে পারে না। মাথা আর মুখ ওদের ঘুরেই ছিল।'

অতুল রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ঘুরেই ছিল? তোমাকে ওরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে বুঝি ইন্দিরা?'

ইন্দিরা বলল, 'না, অতুলদা, তোমাদের মতো ওরাও অতখানি বিশ্বাস আমাদের করতে চায় না। আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হত।'

শচীবিলাস ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কী হত না-হত সে-কথা এখন থাক। কী-হবে এই মুহূর্তে সেই কথাই ভাবো।'

শচীবিলাসের বন্ধুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা সব শুনে তাঁরাও হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। কোনো একটা মীমাংসায় আসতেই হবে। কিন্তু পথটা কী?

অতুল আর বিনয়ের দল ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমানদের বাধা তারা মানবে না। ওখানেই আজ উঠবে দেশের জাতীয় পতাকা। এ-পতাকা কোনো সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। ওরা ভুল করছে বলে সে-ভুলকে প্রশ্রয় দিয়ে চলবে না। সে-ভুলকে জোর করে ভাঙতে হবে।

কিন্তু শচীবিলাস অত সহজে মন স্থির করতে পারলেন না। কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ করেছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ করে নানারকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে-আবডালে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে-মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে-গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে

তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালি দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িকভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ-গাঁকেও রক্ষা করা গেল না। হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত-দিন সতর্ক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে-বাড়িতে। একহাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আরেক হাতে উত্তেজিত মুসলমান জনসাধারণের হাত ধরেছেন। যে-জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ-অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে শুরু করেছে। কৌতুকে কৌতূহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে-সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ করে আবার হঠাৎ এ কী বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ-কোন্ সূচনা দেখা দিল আজ। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলেন শচীবিলাস। তারপর ছেলের দলকে বললেন, 'আচ্ছা চলো, দেখি গিয়ে ওরা কী চায়।'

বিনয়ের দল জাতীয় পতাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, শচীবিলাস বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা রেখেই এসো বিনয়। আগে দেখি ওদের উদ্দেশ্যটা কী।'

বিনয় আর অতুলরা অসন্তুষ্টভাবে শচীবিলাসের অনুসরণ করল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও যে কেউ খুশি হলেন না সে-কথা শচীবিলাস বুঝতে পারলেন।

শচীবিলাসের বাড়ির নিচেই বড়ো একটা চটান। ওপারে মুসলমান পাড়া। শেখেদের বাড়ির বসির ছিল শচীবিলাসের দোস্ত। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জায়গাটুকুর খানিকটা অংশ কিনে রেখেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সমস্তটুকুই কিনবেন। কিন্তু বসির শেখ ছাড়েনি। বলেছে, 'অত লোভ কেন দোস্ত। ঘোড়-দৌড় দেখতে গিয়ে ছেলেবেলায় কতবার মামা-বাড়িতে এক কাঁথার তলে দুজনে রাত কাটিয়েছি মনে পড়ে? আর একখানা জমি দুজনে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে পারব না? ভোরে উঠেই তোমাকে একেবারে মুসলমানের জমিতে পা দিতে হয়, ঠাকুরুনরা কাঁথা-কাপড় মেলবার জায়গা পান না, এই জন্যই অর্ধেকটা বেচে দিলাম তোমাকে। নইলে জমি বেচবার তো আমার দরকার ছিল না। ভয় নেই, সীমানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে যাব না তোমার সঙ্গে।'

শচীবিলাস বলেছিলেন, 'আমরা না-হয় কাজিয়া মোকদ্দমা না-বাধালাম কিন্তু আমাদের ছেলেরা? তারা যদি বাধায়?'

হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়েছিল বসির শেখ, 'তারা যদি বাধায় তার মজাও তারাই ভোগ করবে। তুমি আমি সেজন্য ভেবে মরি কেন দোস্ত।'

বসির শেখকে বেশিদিন ভাবতে হয়নি। অল্পবয়সেই সে চোখ বুজেছিল। কিন্তু এতদিনে ভাববার পালা এসেছে শচীবিলাসের।

বসিরের ছেলে মকবুল আর মনসুরও কোনো দিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধায়নি।

কাকা বলে ডেকেছে, সমীহ্ করে চলেছে সবসময়। বর্গা চষেছে তাঁর খেতের। পাটের যখন দর ছিল এই চটানটুকুতেও তাবা পাট বুনেছে। ধুয়ে শুকিয়ে ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে শচীবিলাসকে। ইদানীং ফসল না-হওয়ায় জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। গোরু-ছাগলে চবে, পাড়াব ছেলেরা খেলাধুলা করে। আর বছর-বছর গাঁয়ের লোক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনেব দিনে জাতীয পতাকা তুলতে আসে এখানে। কয়েক বছর শচীবিলাসও নিজের হাতে তুলেছেন। মকবুল-মনসুরবা জায়গা নিয়ে কোনো আপত্তি করেনি, ববং তারা এসে সমান ভাবে কামলা খেটেছে, দুর্বাঘাসের ওপর বসে শচীবিলাসের বক্তৃতা শুনেছে, তাদের বউ-ঝিরা বেবিযে এসে গাছ-গাছালিব আড়াল থেকে ঘোমটা তুলে রঙ্গ দেখেছে ছোটোকর্তাব। এতদিনের মধ্যে কোনোদিন কোনো আপত্তি ওঠেনি, কোনো নালিশ অভিযোগ আসেনি কোনো পক্ষ থেকে। আজ সাম্প্রদাযিকতার বিষপাম্পে সমস্ত কিছু কলুষিত হয়ে উঠেছে। সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সৌহার্দ্য নেই। শচীবিলাসেব সমস্ত অন্তর বেদনায বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

চটানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মুসলমান জনতা ভিড় করে রযেছে। উত্তেজিতভাবে তাবা কী যেন বলাবলি কবছে নিজেদেব মধ্যে। শচীবিলাস এগিযে গেলেন সেখানে। ডাকলেন 'মকবুল, মনসুর, এদিকে এসো।'

পিছন থেকে কয়েকটি মুসলমান ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'মকবুল মনসুর নয়, মকবুল মিঞা, মনসুব মিঞা।'

শচীবিলাস ম্লান একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, মকবুল মিঞা এদিকে একবার আসুন।'

মকবুল এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন কাকাবাবু। ওই ফাজিল ছোকরাদের কথায় কান দেবেন না। মিঞা কেন, আমাকে শুধু মকবুল বলেই ডাকুন। আমি আপনার ছেলের মতো।'

শচীবিলাস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ছেলের মতো এ-কোন্ কাজটা করলে তুমি। বছর-বছর ধবে এখানে আমরা জাতীয় পতাকা তুলছি, আজ হঠাৎ তোমাদের আপত্তির কী কারণ ঘটল। আর আপত্তিই যদি ছিল আগে জানালে না কেন। কেন শামিয়ানা, আব চেয়ার টেবিলগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে তছনছ করে দিলে।'

মকবুল বলল, 'আজ্ঞে সব ওই বদমাস ছোকরাদের কাণ্ড। ওরা খেপে গিয়েছে।'

শচীবিলাস চোখ গরম করে বললেন, 'আর খেপিযে তুলেছে তোমাদের ওই বদমাশ মৌলবী।'

মুসলমানদের মধ্যে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল। দু-হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে মকবুল একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল শচীবিলাসের সামনে, বলল, 'মৌলবী নয় কাকাবাবু, মৌলবী সাহেব। তিনি এখানকার সালার সাহেব আমাদের, নেতা, আপনি যেমন হিন্দুদের।'

শচীবিলাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেবল হিন্দুদের! আমি কি তোমাদেরও নই?'

মকবুল চুপ করে রইল।

শচীবিলাস আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ কী বলেছেন তোমাদের মৌলবী সাহেব?'

মকবুল বলল, 'বলেছেন, ও-নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ-মার্কা লিগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুণাহ্ হয়। ও-নিশান এখানে আমরা উড়তে দিতে পারি না।'

শচীবিলাস প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। এ-নিশান কেবল হিন্দুর নয়, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই। এ-নিশান ভারতের একমাত্র জাতীয় পতাকা। একে অসম্মান কোরো না মকবুল।'

কিন্তু সমস্ত মুসলমান জনতার কোলাহলে শচীবিলাসের কণ্ঠ ডুবে গেল। তাঁর শেষের দিকের কথাগুলি মোটেই শোনা গেল না।

হিন্দু যুবকের দল একদিকে রুখে দাঁড়াল আর একদিকে মুসলমানেরা। সংখ্যায় তারাই বেশি। মুহূর্তে-মুহূর্তে তাদের দল স্ফীত হতে লাগল। পিছনের দিকে লাঠি আর খেজুর গাছ কাটা ছ্যানি দেখা গেল কারো-কারো হাতে। এখানে কিছুতেই তে-রঙা নিশান তারা ওড়াতে দেবে না।

বিনয় শচীবিলাসের কানের কাছে এসে বলল, 'অনুমতি করেন তো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ি গোটা কয়েক। ভয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।'

শচীবিলাস মাথা নাড়লেন, 'না বিনয়, ও-সব নয়।'

বিনয় বলল, 'তবে কি জাতীয় পতাকা এ গাঁয়ে উঠবে না আজ? প্রাণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? অপমান করব জাতীয় পতাকার?

শচীবিলাস বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। জাতীয় পতাকা আজ আমরা তুলবই এখানে।'

বন্ধুরা বললেন, কাজটা সমীচীন হবে না শচী। ফের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোনোরকম সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এখন। চলো বরং অন্য স্থান দেখি, গাঁয়ে তো আরো-অনেক জায়গা আছে।'

ইন্দিরা বলল, 'তা আছে। কিন্তু গাঁয়ের অনেক মানুষই তাহলে এখানে পড়ে থাকবে। স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনে গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকেরই কোনো অংশ থাকবে না।'

শচীবিলাস কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তাহলে করতে চাও কী? ওদের ওই ভ্রান্ত ধারণার, অবুঝ আবদারের প্রশ্রয় দিতে চাও?'

ইন্দিরা বলল, 'আপাতত এক-আধটু তো দিতেই হবে বাবা। কেবল কি ধমকেই ফল হবে? আচ্ছা, দেখি, আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে।'

স্তব্ধ বিমূঢ় ভঙ্গিতে, শচীবিলাস দাঁড়িয়ে রইলেন। পতাকা উত্তোলনে ঠিক এ-ধরনের

বাধা তিনি কোনোদিন পাননি। কতবার পুলিশের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, পতাকার কাপড় তারা ছিঁড়ে ফেলেছে, দণ্ড ভেঙেছে পিঠের ওপব। কতবার কারাদণ্ড নিতে হয়েছে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে। কিন্তু কোনোবার নিরুদ্যম হয়ে পড়েননি শচীবিলাস, নিরুৎসাহ হননি। দু-চার দশ জন পুলিশ দেশের স্বাধীনতাকে আটকে রাখতে পারবে না, তাদের দু-চার দশ হাজার অভিভাবকরাও নয়। কিন্তু আজ আইনের বাধা নেই, পুলিশের দল এসে পথ রুখে দাঁড়ায়নি। কিন্তু দাঁড়িয়েছে আবেক শ্রেণী। তারা দু-চার দশ জন নয, দু-চার দশ হাজারও নয়, অনেক-অনেক বেশি। তারা পর নয়, নিতান্ত আপনার জন, তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে দেওয়া যায় না, রাগে-অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গের তারা প্রত্যঙ্গ। অথচ তারাই আজ পথেব বাধা হয়ে দাঁডিয়েছে। তারাই ছিনিয়ে নিচ্ছে স্বাধীনতা পতাকা শচীবিলাসের হাত থেকে। এর চেযে মর্মন্তুদ আর কী হতে পারে, এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক?

...

ইন্দিরাকে নিজেদের দলের মধ্যে দেখে মুসলমানরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এই স্বদেশী মেমসাহেবটি তাদের কাছে এক বিস্ময় আর কৌতূহলের বস্তু। কখনো-কখনো কৌতুকও তারা বোধ করে। ইন্দিরা আর শচীবিলাস প্রায়ই দেশে থাকেন না। কিন্তু কলকাতা থেকে দেশে যখন ফেরেন সারা গাঁয়ে একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। আর-কোনো হিন্দুর ঘরের মেয়ে এমন করে মাঠে-ঘাটে বেরোয় না এ-অঞ্চলে, বক্তৃতা করে না, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে না সকলের সঙ্গে। কিন্তু ইন্দিরা সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম। অত্যন্ত সাহস তার, সোমত্ত পুরুষদের প্রায় গা ঘেঁষে সে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রেখে কথা কয়। সে-কথার বেশির ভাগই হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। ভারি মধুর ইন্দিরার বলবার ভঙ্গি। রক্তিম চমৎকার পাৎলা দুটি ঠোঁট। তাকে দেখে লোভ হয় মকবুলের। কী যেন আছে এই মেয়ের মধ্যে। বহুদিনের পুরোনো পীরগাঁয়ের সেই পোড়ো মসজিদটার মতো। বাইরে এখনো তার গায়ে চমৎকার সব কারুকার্যের চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয় না। সেই পোড়ো মসজিদের ভিতরকার রহস্য দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে কিন্তু অভ্যন্তরে টেনে নেয় না। ছোটো কর্তার মেয়ে এই অপূর্ব খাপসুরৎ ইন্দিরাও তেমনি।

...

খানিক বাদে ইন্দিরা ফিরে এল। মুখে তার বিজয়িনী হাসি। সে জিতেছে। সন্ধি করতে পেরেছে, সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে এই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে। শচীবিলাসদের কাছে ফিরে এসে ইন্দিরা বলল, 'ওদের রাজি করিয়েছি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ওরাও যোগ দেবে। আর এখানেই হবে সেই অনুষ্ঠান, অন্যত্র যেতে হবে না।'

শচীবিলাস সাগ্রহে বললেন, 'যোগ দেবে?'

শচীবিলাসের বন্ধু সহযোগীরা বললেন, 'কি শর্তে?'

ইন্দিরা বলল, 'ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আপাতত ওড়ানো হবে না।'

পিতৃবন্ধুরা শ্লেষ করে উঠলেন, 'তবে কী ওড়াতে হবে? চাঁদ মার্কা না কাস্তে-হাতুড়ি-মার্কা নিশান বুঝি?'

ইন্দিরা মৃদু হেসে বলল, 'না তাও নয়। কোনো নিশানের কথাই আজ উঠবে না। আজ প্রতীকের দরকার নেই আমাদের, তার বদলে মানুষকে পেয়েছি।'

অনেক আপত্তি উঠল। বিনয়ের দলের কেউ-কেউ চলেও গেল জায়গা ছেড়ে। কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করে শচীবিলাস শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন একটা টেবিলের ওপর, 'বন্ধুগণ।'

তাঁর কণ্ঠস্বব রুদ্ধ হয়ে এল। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শচীবিলাস আবার উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধুগণ!'

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁব মনে হল আজকের দিনে শূন্য তাঁর হাত। দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। লোকে কানাকানি করছে এটা তাঁর নিতান্তই সন্তানবাৎসল্য। তিনি জানেন তা ঠিক নয়। এ তাঁরই স্বদেশ আর স্বজনবাৎসল্যও বটে। বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য একটু চোখ বুঝলেন শচীবিলাস। আর আশ্চর্য, সঙ্গে-সঙ্গে মুখে তাঁর গভীর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর-কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো বেদনা নেই তাঁর অন্তরে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে-দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটায় খদ্দরের পবিত্র শুভ্রতা আর দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ।

# উস্তাদ মেহেরা খাঁ

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চার পুরুষ ধরে এঁদের গানবাজনার শখ। প্রথম যিনি, তিনি নাকি ছিলেন অদ্বিতীয় তবলচি। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি আসবে বসলে বুক দুরু দুরু কবত দিল্লি লক্ষ্ণৌযেব সব নামজাদা ওস্তাদদেব। একবাব বেতালা হলে আব রক্ষা ছিল না, হাতখানা বাঁয়ার ওপরে না নেমে সোজা গিয়ে নামত অসতর্ক গাইযেব গালে। যখন বাজাতেন তখন আঙুলগুলো তাঁর চোখে পড়ত না, তবলা-লহরা শুনে মনে হত যেন দ্রুত জলদে সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে।

দু' বছরের ছেলেকে কোলে বসিয়ে তবলার পাঠ দিয়েছিলেন তিনি। ছেলে বাপের চাইতেও বড় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি আর তবলা বাজাতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে নিবিড় ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, সঙ্গত করবাব মত একটা গাইয়েই নেই, ও বাজিয়ে আর কী করব।

বোধ হয় সেই দুঃখে নিজের ছেলেকে তিনি আর তবলা ধরালেন না। তবু হয়তো বা রক্তের সংস্কারে নিজের তাগিদেই তৃতীয পুরুষ ধরলে সেতার আর গান। আর সেই সময়েই আবির্ভাব হল উস্তাদ মেহেরা খাঁয়েব। মেহের আলীর সংক্ষেপ হয়েছে মেহেরা, অতিরিক্ত আকারটার তিনি প্রতিবাদ করেন না, লোকেও নিরঙ্কুশ।

এখন চতুর্থ পুরুষের যুগ চলছে। আগের তিন পুরুষের চাইতে একেবারে আলাদা। বাঁশি বাজায়, বাজায় মিলিত বাজনা গীটার। আকারে প্রকারে পুরোদস্তুর হাওয়া লেগেছে আধুনিক কালের। পূর্বপুরুষেরা মাত্র সরস্বতীর বীণাপাণি রূপটাই দেখেছিলেন, কিন্তু বিচিত্র ব্যতিক্রমের মতো চতুর্থ পুরুষ তাঁর জ্ঞানপদ্মের দুটি চারটি পাঁপড়িও সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, যে নরোত্তম চৌধুরী গাড়িতে চেপে বসলে চাকা খসে পড়বার আশঙ্কা হত, তাঁর বংশধর বলে বিশ্বাস করা শক্ত।

শুধু উস্তাদ মেহেরা খাঁ কোলের কাছে টেনে নেন তানপুরাটা। গুন গুন করে গান করেন দাদুর পদ :

> "ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি,
> যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি—"

"যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি।" যে দিন যায় সে আর ফিরে আসে না। একথা উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের চাইতে কে আর বেশি করে জানে!

কোথা থেকে কোথায়! নিজের কাছে নিজেকেই এখন একটা অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয় উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের। কপালের ওপরে কতগুলো রেখা ফুটে ওঠে এলোমেলো ভাবে, বাইরে যে চোখ তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনের ভেতরে তা যেন

ঝলমলিয়ে ওঠে দৃষ্টি-প্রদীপের আলোতে। শুধু তাও নয়। বাইরে ক্রমশ সমস্ত আবছা হয়ে আসছে বলেই বোধ হয় মনের নিভৃতে আপাত বিস্মরণগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাস্বর হয়ে উঠেছে অন্তর্মুখিনতার দীপ্তিতে।

ঘরের দাওয়ায় সতরঞ্চ পেতে চুপ করে বসে ছিলেন উস্তাদজী। একপাশে সেতারটা পড়ে আছে। বাজাবার জন্যে নয়, কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। যখন বাজান না, তখনও অন্যমনস্কভাবে সেতার কিংবা তানপুরার ওপরে একখানা হাত ফেলে রাখেন তিনি। অন্ধের লাঠির মতো ওরা হাতের কাছে না থাকলে কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে, বোধ হয় নিরাশ্রয়। অথবা সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে সুরলক্ষ্মীর কাছ থেকে যে সম্পদ তিনি পেয়েছেন, কৃপনের ধনের মতো সে সঞ্চয়কে তিনি চোখের আড়াল করতে পারেন না।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে—বিয়ের আয়োজন চলেছে কোথাও। উস্তাদজী উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বেহাগ ধরেছে লোকটা। বেশ বাজাচ্ছে—শিক্ষা আছে মনে হয়। কিন্তু এ কি! মেহেরা খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাল কাটল। আবার, আবার, আরে আরে এ কী হচ্ছে! উত্তেজনায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি—পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজকে মিশিয়ে ফেলল যে!

নৈরাশ্যে এবং ক্ষোভে উস্তাদজী আবার এলিয়ে দিলেন নিজেকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বেওকুফ, বেতমিজ!

এটা বাঁধা গালাগালি। যে কোনো বিরক্তি আর অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ার মতো ওই দুটি কথা বেরিয়ে আসে উস্তাদজীর মুখ দিয়ে। কথা দুটো শিখেছিলেন গুরুদেব আল্লাবক্সের কাছে, শিষ্যেরা ভুলচুক করলে গর্জে উঠতেন তিনি : বেওকুফ বেতমিজ কাঁহাকা। গুরুর অন্যান্য দোষগুণের সঙ্গে শিষ্যও এ দুটি আয়ত্ত করেছেন উত্তরাধিকারের সূত্রে।

শানাইওয়ালার বাজনাটা যেন ছুরির খোঁচার মতো এসে ঘা দিচ্ছে কানে। মেহেরা খাঁ আবার বললেন, বেতমিজ, বেওকুফ!

এরই ভেতরে শঙ্কর কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে গাল দিচ্ছেন ওস্তাদজী?

মেহেরা খাঁ মুখ ফেরালেন। কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, আও বেটা, বৈঠো।

পাশের সতরঞ্চে বসল শঙ্কর। তারপর আবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু গাল দিচ্ছেন কাকে?

ভ্রূকুঞ্চিত করলেন উস্তাদজী। বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

—কী?

ওই শানাই?

—ওঃ! শঙ্কর হাসল—ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। বললে, ভুল বাজাচ্ছে বুঝি?

—শুধু ভুল! আর একটা ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি করলেন উস্তাদজী : যা তা তাল কাটছে,

সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজ মিশিয়ে বেইজ্জৎ করে দিয়েছে। একেবারে। কান ধরে দুই থাপ্পড় দেওয়া উচিত বেকুফের।

শঙ্কর বললে, ভুলটা কিন্তু আপনারই উস্তাদজী।

উস্তাদজী প্রায় সিংহের মতো হুঙ্কার করে উঠলেন: আমার ভুল? কোন্ বেতমিজ—

হাসিমুখেই শঙ্কর বাধা দিলে। বললে, আপনি বুঝতে পারেননি।

—আমি বুঝতে পারিনি। এবার আর ক্রোধ নয়, বিস্ময়ে আর বেদনায় মেহেরা খাঁ যেন হতবাক হয়ে গেলেন: এই চল্লিশ বছর ধরে আমি তবে কী করেছি।

উস্তাদজীব বেদনার্ত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি বোধ করল শঙ্কর। কোমলভাবে বললে, আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু এ তো তা নয়। ও লোকটা বেহাগ বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে আধুনিক একটা গান।

—ওঃ, আধুনিক গান। মুহূর্তে উস্তাদজী যেন নিভে গেলেন! একবার অসহায় দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত ভাবে। কিছু একটা বলা উচিত, কোনোরকম একটা আশ্বাস দেওয়া উচিত উস্তাদজীকে। কিন্তু কোনো কথা মুখে এল না তার। মৃদু একটা নিশ্বাস চেপে নিয়ে শঙ্কর চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

আধুনিক! আধুনিক কাল—আধুনিক গান! সেতারের ওপর হাতটা অস্থির হয়ে উঠল মেহেরা খাঁব, ঝনাৎ করে সাড়া দিয়ে উঠল তারগুলো। উস্তাদজীর মনে হল আহত যন্ত্রণার একটা আকস্মিক আর্তনাদ যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে সেতারটা থেকে। এতদিন ধরে ওর তারে তারে জেগেছে বিশুদ্ধ সুরে লয়ে বিস্তারে নানা রাগ-রাগিণীর আলাপ; ওর তারে তারে ভৈরোঁ পূরবীর প্রশান্তি পড়েছে ধ্যানমূর্ছিত হয়ে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মেঘমেদুর নীলিম দিনের বাদল মৃদং; প্রতিধ্বনিত হয়েছে, গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় ওর মৃদু করুণ মীড় আহ্বান জানিয়েছে লোকান্তপারের অশরীরীদের—তাদের নিঃশব্দ নিশ্বাস যেন অনুভব করতে পেরেছেন উস্তাদজী; ওর দ্রুত কঠিন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন বিলসিত হয়ে গেছে সুরের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎলেখা, ওর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জ্বলেছে সুরের মশাল।

কিন্তু আজ। এই মুহূর্তে উস্তাদজী যেন ওর আহত বুকের ভেতর থেকে অসহায় আর্তনাদ শুনতে পেলেন একটা। ও কি শুধুই আর্তনাদ, না মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি?

.আধুনিক কাল। হ্যাঁ—যুগ বদলেছে বইকি। যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি। যে দিন গেছে সে আর ফিরবে না। প্রবাহিত হয়ে চলে গেল যে সময় উজানের মুখে সে আর ফিরে আসবে না কোনো দিন।

আত্মমগ্ন দৃষ্টিটা তুলে ধরলেন মেহেরা খাঁ। কাল বদলায়, মানুষ বদলায়; কিন্তু যে পৃথিবী, যে প্রকৃতি থেকে তার বিন্দু বিন্দু মাধুর্যের মতো ক্ষরিত হয়েছে সুর আর সঙ্গীত, কই সে পৃথিবী তো বদলায়নি! আশ্চর্য সবুজ আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে দূরের বনরেখাকে, সকালের রোদে ঝলমল করে উঠেছে সামনে খালের ঘোলা জলটা, ওই শানাইয়ের

অস্বস্তিকর ভুল বাজনাটাকে ছাপিয়েও দোয়েলের শিস্ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছিলেন আজও তা তেমনিই আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি তার। শুধু সময় বদলেছে—বদলে গেছে মানুষ।

বদলে গেছে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা ভাবতে গিযে নিজেই চমকে উঠলেন উস্তাদজী। বদলাবেই তো—উপায নেই, রোধ করা যাবে না তাকে। মেহেরো খাঁ নিজেই কি কম বদলেছেন? চল্লিশ বছর আগেকার একখানা ভুলে যাওযা মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল মনের কালো অন্ধকারের ওপরে। আজকে কি ওই হারানো মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

বাইরের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফিরে এল নিজের ভেতরে—সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল সেখানে। একটা পোড়ো বাড়ির মতো অসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ—ভাঙা খেলনার টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। নানা রঙ, নানা আকার। ছেলেমানুষি কৌতুক বোধ হয়, অকাবণ কৌতূহলে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই ভাঙা টুকরোগুলোকে, জোড়াতাড়া দিয়ে দেখতে ইচ্ছে কবে—

সন্ধানী আলোর অর্থহীন সন্ধান এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, শিউরে উঠল আলোকবৃত্তটা। জীবনের সব কিছুই খেলনা নয়, সব কিছুই ভাঙা খেলানাব টুকরো নয়। ওই আলোকবৃত্তটার ভেতরে ছায়াবাজির মতো কতগুলো বিশৃঙ্খল ছবি ফুটে উঠছে। উস্তাদজী চোখ বুজলেন। হ্যাঁ—চেনা যাচ্ছে বইকি। একটা শহব—মস্ত বড় শহর। তার নাম দিল্লী।

হাতীর মতো অতিকায় চেহারা, টুকটুকে রঙ—ফুলো মস্ত গাল দুটো থেকে যেন ফুটে পড়ছে রক্ত, লাল লাল চোখে নেশার জড়তা। উস্তাদ আল্লাবক্স। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পাহাড়ের মতো। পাঁচটা হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুলে ফরাসের ওপরে তাল বাজিয়ে চলেছেন তিনি। হঠাৎ পাহাড়ের মতো অত বড় শরীরটাতে যেন ভূমিকম্পের দোলা লাগল, বিশাল পুরুষ পিঠ খাড়া করে উঠে বসলেন তাকিয়া ছেড়ে। তারপরে মস্ত বড় একখানা হাত সস্নেহে নেমে এল মেহেরো খাঁয়েব কাঁধের ওপরে। আল্লাবক্স বললেন, সাবাস বেটা, সাবাস। তোর জন্যে আজ আমাব অহঙ্কার হচ্ছে। আল্লাবক্স খাঁ একদিন থাকবে না, কিন্তু সেদিনও লোকে নাম করে বলবে উস্তাদ মেহেরালী খাঁ তারই শিষ্য।

জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার সেদিন পেয়েছিলেন মেহেরো খাঁ, চোখে তাঁর ছলছল করে উঠেছিল অশ্রু। আনন্দে, আবেগে যেন বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পাঁচ বছর বয়সে যে সাধনা শুরু করেছিলেন, আজ পঁচিশ বছর বয়সে তা সার্থক হলো। তানপুরা ফেলে দিয়ে তিনি উস্তাদজীর পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিলেন, হিন্দু শিষ্যদের মতো তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় মেখেছিলেন তিনি।

গুরু জয়পত্র দিলেন, করলেন আশীর্বাদ। সেদিন মন ভরে গিয়েছিল মেহেরো খাঁয়ের, বুক দুলে উঠেছিল গর্বের উল্লাসে। সামনে পড়ে আছে পৃথিবী। জয় করতে হবে তাকে,

নিজেকে প্রমাণিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠা কবতে হবে 'সারে হিন্দুস্তানের' জ্ঞানী-গুণীর দববারে। গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, কেউ আগলে দাঁড়াতে পাববে না তাঁর জয়যাত্রার পথ। কিন্তু—

কিন্তু জীবনে কত বড়ো পরাজয় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা কবছে, সে কি কল্পনাও কবতে পেবেছিলেন মেহেরা খাঁ?

হঠাৎ নড়েচড়ে তিনি নিজেকে সজাগ করে নিলেন। যে স্রোত আর ফিববে না, কী হবে তাব কথা ভেবে? ঠিক কথা, আধুনিক কাল। মনের অন্ধকাবে খানিকটা ছায়াবাজিব মতো আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হযে ওঠা সেই দিল্লী শহর আবার ডুব দিয়েছে অবচেতনার গভীরতায়। যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা হারিযে গেছে, চিরদিনেব মতোই হারাতে দাও তাকে। এ শহর দিল্লী নয়। বাংলা মুলুকের ছোটো একটি গ্রাম—যার নাম নরোত্তমপুব। এখানে বাগ-বাগিচা নেই, নবাবী কেল্লা নেই, নেই হীরামহল, মোতিমহল, চকবাজাব আব জনতা। এখানে শুধু উজ্জ্বল নীল আকাশ, এখানে দোয়েলেব শিস, এখানে জলে ঝলমলে রোদ, এখানে সবুজ বনরেখাব সুস্নিগ্ধ নিবিডতা।

এই ভালো—এরই তো প্রয়োজন ছিল। কাল বদলাচ্ছে—বদলাক। মেহেরা খাঁয়েবও তো বদলাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে কি তিনিই বাঁচতে পারতেন?

সেতারটাকে এবারে কোলের ওপরে তুলে নিলেন তিনি। সযত্নে হাত বোলালেন তারগুলোব ওপবে, যেন পরিচর্যা করতে চাইলেন তাঁর নিভৃত সেই ব্যথাব কেন্দ্রলোকটাকে। একে ব্যথা দেওয়া চলবে না, দুঃখ দেওয়া চলবে না একে। এই সেতার মেহেরা খাঁয়ের আশ্রয়, আশ্বাস। পৃথিবীব পথে এই তো তাঁর চিরদিনের সহযাত্রী। তাই সেদিনেব সেই পরম ব্যথার মুহূর্তেও—

উস্তাদজী চকিতে সংযত কবে নিলেন নিজেকে। বেওকুফ—বেতমিজ মন! একটুখানি ফাঁক পেলেই নিষেধ ভেঙে বেরিযে পড়তে চায়, সামলানো যায় না! দ্রুত আঙুলে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন মেহেবা খাঁ। তারপর গুন গুন করে ধরলেন 'রুইদাসেব' পদ :

"নিত প্রভাত ভব তিঁবির ছুটে
অন্তর তিঁবির ছুটত নাহি।
সত্যরূপ প্রেমরূপ পহুঁ
পৈঠহু আন্তর মাহি—"

আধুনিক কালের মানুষ শঙ্কর। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতী বাজনা গীটার। কিন্তু এ-বাজনার পাঠ সে নেয়নি উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের কাছ থেকে। ছেলেবেলায় কিছুদিন উস্তাদজী তাকে সেতার শিখিয়েছিলেন, তার পরেই সে চলে গেল কলকাতায়। তার শিক্ষা কলকাতাতেই।

কলকাতা। নতুন দিনের নতুন শহর। পুরনো কালের দিল্লী আগ্রার মতো বনেদীয়ানা তার নেই; সোনা রুপোর জরি দিয়ে কাজ করা সেকেলে জাব্বাজোব্বা নেই, তার মাথায়

নেই হীরেমুক্তো অপহৃত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নবাবী তাজ। তার আমদরবার, দেওয়ান-ই-খাস আর শিশমহলে ঝঙ্কৃত হয় না মিঞাকি মল্লার আর বিলাসখানী টোডীব করুণ অনুরণন। তার আকাশ-বাতাসে শোনা যায না স্বপ্ন-গভীব অতীতেব পদসঞ্চার। কলকাতা নতুন, কলকাতা আধুনিক। তাব আকাশ ছোঁয়া লোহায় গাঁথা উদ্ধত নিরলঙ্কাব বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই বিস্মৃত দিনের শিল্পীদের কারুকৃতার্থ দেওয়ান-ই-খাস আর চামেলী-মহলের। তার নিরাভরণ বিশালতায আলাপ আর বিস্তারের অলস ধ্যানগভীব ব্যাপ্তি নেই কোনোখানে, সেখানে সংক্ষিপ্ত আধুনিকতা, বাহুল্যহীন অগভীর আধুনিক গান।

তাই শঙ্কবের বাবা জগন্নাথ চৌধুবী যে দৃষ্টি দিযে বিচার কবেছিলেন উস্তাদ মেহেরা খাঁকে, শঙ্কর তা কবে না। নবাবী আমলের পুবনো জাব্বাজোব্বার আতিশয্য কৌতূহল জাগায কিন্তু আকৃষ্ট করে না শঙ্করকে। মনের দিক দিয়ে এক ধবনের করুণাই আছে তাব উস্তাদজী সম্পর্কে। তাই রাগিণী শুরু করবাব আগে দেড় ঘণ্টা ধরে তাব আলাপ-বিলাপের পর্ব খানিকটা অসহ্য প্রলাপেব মতো মনে হয শঙ্কবেব. মাথা ঘুরতে থাকে, বোঁ বোঁ করে একটা অস্বস্তিকর শব্দ বাজতে থাকে কানের ভেতবে। তবু ভদ্রতার খাতিরে বসে বসে ওই উৎকট 'ম্যাও ম্যাও' আব 'মারি ঘং' শুনতে হয় তাকে, তারপর বিনীত হাসিতে বলতে হয, হাঁ উস্তাদজী, গান তো একেই বলে। আজকালকার গান কি আর গান!

উস্তাদজী খুশি হন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে সান্ত্বনা এই যে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখেব দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আজকাল, আবছা আর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই শঙ্করেব মুখে-চোখে অলক্ষ্যপ্রায কৌতুকের ইঙ্গিতটা দেখতে পান না তিনি। সংশয় আর আবেগের মধ্যকেন্দ্রে দুলতে থাকে উস্তাদজীর মন। তানপুরায় একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তবে তোমাকে তুলসীদাসী ভজন শোনাই একখানা।

শঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। উস্তাদজীকে সে চেনে বিলক্ষণ। তাঁর ভজন আধুনিক ভজন নয়, আলাপ, বিস্তার এবং হা হা করে গিটকিরির সে ভজনের সঙ্গে ধ্রুপদের বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না শঙ্করের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে বলে, এখন ভজন থাক উস্তাদজী, ভীমপলশ্রীর পবে ভজন তেমন জমবে না।

পালাবার ছুতোটা বুঝতে কষ্ট হয় না মেহেরা খাঁয়ের। একটা নিশ্বাস চেপে নিয়ে তানপুরাটা সরিয়ে রাখেন তিনি।

বাপের গুরুদেবকে চটানো চলবে না, অন্তত যতটা সম্ভব লোক-দেখানো শ্রদ্ধাটাও করতে হয় তাকে। কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করে শঙ্কর। 'আবোল-তাবোল' উদ্ধৃত করে বলে, "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—"

মাঝে মাঝে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শঙ্করের স্ত্রী রমা।

—ওঁকে এভাবে ঠাট্টা করা উচিত নয় তোমার। কতবড়ো ওস্তাদ উনি, বাবা কত শ্রদ্ধা করতেন ওঁকে। সাধনা করে উনি শিখেছেন, তোমাদের মতো ফাঁকির করবার ওঁর নয়।

তর্ক করবার উৎসাহে পাঞ্জাবির আস্তিনটা গুটিয়ে নেয় শঙ্কব : ওস্তাদ উনি নিশ্চয়, কিন্তু উনি যা করেন তা জিমনাস্টিক, তাকে গান বলে না।

রমা প্রশ্ন করে : তা হলে তুমি গান বলো কাকে?

—আমি তাকেই গান বলি যা কথা আর সুরের সমাবেশে অধিকার করে মনকে, দুলিয়ে দেয় প্রাণ। জানো এ সম্বন্ধে কী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কী লিখেছেন দিলীপ রায়?

রমা জানে না। এবং জানে না বলেই সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি ওঁর গান গানই নয়?

শঙ্কর হাসে: একটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, আর একটা ববীন্দ্রনাথের কাব্য।

—তার মানে?

—মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কাব। উনি গান শেখেননি, শিখেছেন গানেব ব্যাকরণ। সেও অবশ্যি সেকালের ব্যাকবণ, কিন্তু সে কথা থাক। আসল ব্যাপাবটা কী জানো? ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, বাহাদুরি পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্যরচনা করা যায় না। ওর জন্যে চাই আলাদা কবিপ্রতিভা, আলাদা একটা রসিক মন। সে মন ওঁর নেই।

রমা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, বলে, ও। কিন্তু এই যে তোমাদের সব একঘেয়ে গান? চাঁদ, রজনীগন্ধা, বিরহের বালুচর, উদাসী পথিকের আকুল বাঁশির ডাক, আমি ভালোবাসার ভিখারী, প্রেমের চকোর—এগুলো বুঝি সব উঁচুদরের কবিতা?

মেয়েমানুষের বেশি তর্ক করাটা শঙ্করের পছন্দ হয় না, অন্তত এদিক থেকে চৌধুরীবংশের ঐতিহ্যটাকে কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে শঙ্কর। বিরক্ত হয়ে বলে, যা বোঝো না তা নিয়ে কেন বাজে তর্ক করতে আস বলো তো?

—তর্ক করতে যাব কেন? ওস্তাদজীকে তোমরা অসম্মান কর, এইটেই আমার ভালো লাগে না।

শঙ্করের গলার স্বর রূঢ় হয়ে ওঠে এবারে: অসম্মান কে ওঁকে করেছে? এ হলো সমালোচনা। আর সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে।

—কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করাকে কি সমালোচনা বলে?

শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েই রমা বুঝতে পারে বজ্র-বিদ্যুৎ আসন্ন হয়ে এসেছে। সুতরাং ঝড়ের জন্যে আর অপেক্ষা না করে বুদ্ধিমতীর মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রমা। পেছন থেকে সাপের গর্জনের মতো শঙ্করের চাপা স্বর শুনতে পাওয়া যায়: ইডিয়ট!

ইডিয়ট বলুক শঙ্কর, যা মুখে আসে, যা খুশি তাই বলুক। কিন্তু মনের দিক থেকে গভীর আর নিবিড়ভাবে উস্তাদজীকে শ্রদ্ধা করে রমা, ওঁর সম্বন্ধে একধরনের সস্নেহ দুর্বলতা আছে তার। তা ছাড়া পুরুষ বলে যে জিনিসটা এড়িয়ে গেছে শঙ্করের চোখ, ঠিক সেইটেই ধরা পড়ে গেছে রমার দৃষ্টিতে। তার সন্দেহ হয় কোথায় গভীর একটা বেদনার জায়গা আছে উস্তাদজীর—কোথায় একটা—

মনে পড়ে তার বিয়ের সময়ের কথা। মস্ত আসর বসেছিল এ-বাড়িতে, বহু জ্ঞানী-গুণীকে কলকাতা থেকে আমদানি করেছিল শঙ্কর। ঝকঝকে আধুনিকের দল, মধুক্ষরা

কণ্ঠ, কাব্যসঙ্গীতের চটুল উচ্ছল মায়া বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিল তারা। আর সেই নতুনদের মাঝখানে কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল উস্তাদজীকে, মনে হচ্ছিল কী অদ্ভুতরকম বেমানান। পাকা, চুল, পাকা দাড়ি, ময়লা পাজামা, অতিরিক্ত দীর্ঘ দেহ বলে একটু কোলকুঁজো, মিটমিটে চোখের দৃষ্টি। মাথা নিচু করে গান শুনছিলেন। হঠাৎ শঙ্কর বললে, উস্তাদজী, এবারে আপনি আমাদের কিছু গান শোনান।

যেন চমকে উঠলেন উস্তাদজী, যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। কেমন ভারী ভারী জড়তাভরা গলায় উস্তাদজী বলেছিলেন, আমি?

—আপনি না গাইলে কি আসর হয়?—তানপুরাটা ঠেলে শঙ্কর এগিয়ে দিয়েছিল উস্তাদজীর দিকে।

অনাসক্তভাবে তানপুরা তুলে নিলেন তিনি, তারপর গান শুরু করলেন। গান তিনি কি গেয়েছিলেন বা কেমন গেয়েছিলেন তা বোঝবার ক্ষমতা সেদিন ছিল না রমার। তবে ঘোমটার আড়াল থেকে সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখেছিল তাঁর ঘন ঘন মাথা নাড়া—আর অবাক হয়ে ভেবেছিল কী অসাধারণ গলাব জোর! খানিক পরেই আধুনিকদের মুখে ফুটে উঠেছিল চাপা বাঁকা হাসি, পান চিবুতে চিবুতে একে একে তারা বেরিয়ে গিযেছিল প্রায় সকলেই। আর তবলচী কয়েক মিনিট পরে সেই যে হাত তুলল, আর বাজায়নি। শুধু নির্নিমেষ চোখে অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল উস্তাদজীর মুখের দিকে।

কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই উস্তাদজীর। কে গেল, কে রইল কোনো কিছু তিনি লক্ষ্য করলেন না, নিজের মনেই ঝাড়া দেড়ঘণ্টা তিনি গান করে গেলেন। গান যখন শেষ হলো, তখন তবলচী এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল। বিহ্বলভাবে বলেছিল, আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন? কলকাতায় চলুন।

উস্তাদজী শুধু মৃদু হেসেছিলেন, উত্তর দেননি।

তবলচী বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মুখে একখানা টোড়ী শুনতে চাই।

—টোড়ী!—শান্ত ঘুমন্তপ্রায় উস্তাদজী হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন একটা, বলেছিলেন, না, না, টোড়ী নয় টোড়ী নয়!—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যেন ভয় পেয়েছেন তিনি, যেন পালিয়ে যাচ্ছেন।

তবলচী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল—কী আশ্চর্য, এমন একটা রত্ন এই অন্ধকারে পড়ে আছে!

আর ঘোমটার আড়ালে সেই মুহূর্তে রমা একটা কিছু অনুমান করেছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হচ্ছে সে অনুমানটা বোধ করি মিথ্যে নয়। আর সেই থেকেই উস্তাদজী সম্বন্ধে একটা মৃদু সহানুভূতিতে ভরে আছে রমার মন।

...

দেউড়ির পাশে ছোটো একখানি ঘর। আজ পনেরো বছর আগে এই ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর নড়ে বসবার দরকার হয়নি। অল্প

প্রযোজন, আয়োজন আবো অল্প। একাট ছোটো খাট, ছোটো বিছানা, টুকিটাকি দু-চারটি জিনিসপত্র। একটি সেতার, দুটি তানপুরা। স্তব্ধ শান্তিতে আচ্ছন্ন হযে আছে ঘরটি।

কোলেব ওপব সেতাবটা টেনে নিযে টুং টাং কবছিলেন উস্তাদজী। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ছাযা ঘনাচ্ছে ঘবেব ভেতরে। আলো জ্বালাননি মেহেরা খাঁ, এক-একটি সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে ভালো লাগে না তাঁব। অন্ধকাবের আড়ালে সমস্ত মনটা যেন কেন্দ্রগামী হওযাব সুযোগ পায, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াব অবকাশ ঘটে। উস্তাদজী অনুভব করেন, সেতাবেব প্রতিটি ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনেব গভীবে মণিপদ্ম একটিব পর একটি দল মেলেছে তাব, আব তাদের ওপব ফুটে উঠছে একটির পব একটি বিদ্যুৎদীপ্ত রাগ-বাগিণীব মূর্তি,—বাজছে কেদাবা, ভীমপলশ্রী, সোহিনী, ছাযানট, নটমল্লার, টোড়ী—

টোড়ী! উস্তাদজীব চমক লাগে। বীণাবাদিনী একটি নারীমূর্তি, তার কণ্ঠ থেকে বিরহের করুণ সঙ্গীত ঝরে পড়ছে আকাশ বাতাস বনবনান্তকে আচ্ছন্ন বিবশ করে দিয়ে। তাব সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে একটি বনেব হবিণী, তারও নীলিম আয়ত চোখ ছলছল করছে অশ্রুতে।

এই তো টোডী বাগিণীর রূপ। কিন্তু শুধুই কি রাগিণীব রূপ? শহব দিল্লী নয়—ছায়াবাজির মতো আর একটা শহরের ছবি মনের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে—যার সামনে নীল সমুদ্রেব দোলা চলেছে অশ্রান্ত আনন্দে। তার নাম "মুম্বই"—লোকে যাকে বলে বোম্বাই। খোলা জানালা দিযে সেদিনও তো তেমনি চোখে পড়ছিল ওই নীল সমুদ্রের চঞ্চলতা, চাঁপাফুলের মতো ললিত অঙ্গুলি-বিন্যাসে যে "মিঞাকি টোড়ী" বাজিয়ে চলেছিল, তারও চোখে ছিল সমুদ্রেব অতলান্ত অশ্রুব ইঙ্গিত, তাব নাম—

তাব নাম আশিক বাঈ।

কিন্তু ঝুটা, সব মিথ্যে। মিথ্যে আশিক বাঈ, মিথ্যে তার প্রেম। টোড়ী রাগিণী শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ভালোবাসে, সে কি ঠকায় কখনো? 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে সব কুছ হ্যায় ঝুটা'—

ঘরের মধ্যে অন্ধকাব আরো গভীর হয়ে আসছে। তবু তারই ভেতরে আচমকা উস্তাদজীর মনে হলো দবজার কাছে কার যেন ছায়া পড়েছে।

—কে ওখানে?

মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, আমি উস্তাদজী।

—ওঃ। কিন্তু এভাবে না এলেই ভালো করতিস বেটি—

—এ ছাড়া যে উপায় নেই উস্তাদজী।

—কিন্তু বেটি, এ লুকোচুরি বড়ো খারাপ! এ অন্যায়।

—কিছু অন্যায় নয়। আমি আলোটা জ্বালি।

কেটে যাচ্ছিল অভ্যস্ত দিন। শঙ্কর বাজাচ্ছিল বাঁশি আর গীটার—উস্তাদ মেহেরা খাঁ নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাঁর তানপুরা আর সেতারে। বয়স বাড়ছিল উস্তাদজীর, ক্ষীণ হয়ে আসছিল চোখের দৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে বিস্মরণগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল মনের

নেপথ্যলোকে। আজ বিশ বছর আগে উস্তাদ আল্লাবক্স মারা গেছেন, কিন্তু গভীর রাত্রিতে মালকোষ বাজাতে বাজাতে রোমাঞ্চিত মেহেবা খাঁ স্পষ্ট অনুভব কবতেন যেন বিশালকায় পুরুষ পাশে এসে বসেছেন। গোলাপী রঙেব ফুলো ফুলো গাল, মেহেদী-রঙানো পাকা দাড়ি, দু চোখ নেশায় আবক্ত। সস্নেহে একখানা অশরীরী হাত তিনি বেখেছেন মেহেরা খাঁব কাঁধেব ওপবে, জড়িত স্বরে বলেছেন, সাবাস বেটা, তোব জন্যে আমাব অহঙ্কাব হচ্ছে।

"যো দিন যাওযি যো বাহুড়ি ন আওযি।" যে দিন চলে যায সে আব ফিবে আসে না। স্রোতের মুখে যে সময় ভেসে চলে গেল, উজানেব ধারায় জীবনে তাব প্রত্যাবর্তন হবে না কোনোদিন। নাই বা হলো, ক্ষতি কী তাতে। দিন বদলাচ্ছে বদলাক, কাল বদলাচ্ছে,—তাকে বদলাতে দাও। আজ দাদুর ওই পংক্তিটাব একটা নতুন অর্থ যেন পবিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁব কাছে। যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। লাভ নেই অকারণ বেদনায় নিজেকে আহত আব পীড়িত কবে।

আশ্চর্য, সেই শহব বোম্বাইযেব কথা ভাবতে গিয়ে তেমন করে আর যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা আর্তনাদ কবে ওঠে না। সেই নীল সমুদ্রের দোলায় আব দুলে ওঠে না অতলান্ত অশ্রুব আভাস। মানুষ বদলায—আশিক বাঈও বদলে গিয়েছিল—প্রেমের প্রতিদান দিতে সে বাজী হয়নি, দেওয়ানা হতে হযেছিল তাঁকে। কিন্তু আজ—এই এতদিন পরে নিজেকে যেন নতুন কবে আবিষ্কার করছেন উস্তাদজী। টোডী রাগিণী মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় ভালোবাসা আব বিরহের অশ্রু। এক আশিক বাঈ যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, হাজারজনের চোখে তার প্রেম সত্য হয়ে বইল। সে প্রেমে উস্তাদজীর হয়তো অধিকার নেই, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনে তা তো সার্থক হয়ে উঠবে। একজনের বিরহ-অশ্রু যদি সত্য না-ই হয়, তবু আরো হাজার হাজাব ভাগ্যবানের জীবনে টোডী রাগিণী চিরন্তন হযে রইল।

আশিক বাঈকে পাননি উস্তাদজী, কিন্তু আর-একজনকে পেয়েছেন। কন্যার মতো নিবিড় স্নেহ দিয়ে তাকে প্রাণ খুলে শেখাচ্ছেন মেহেরা খাঁ, সমস্ত সম্বল দিতে চাইছেন উজাড় করে। যাকে দিতে চেয়েছিলেন সে নিতে পারল না। চোখের সামনে পৃথিবীর আলো যখন দিনের পর দিন নিভে আসছে তখন গভীর ব্যথার সঙ্গে এই কথাই বারে বারে মনে হতো—তাঁর এতবড়ো সুরেব ঐশ্বর্যকে কৃপণের সম্পদের মতোই আগলে গেলেন তিনি, কারো কোনো কাজে লাগল না। কিন্তু আজ সে অতৃপ্তি কেটে গেছে। পিয়ারীকে যা দিতে পারেননি, বেটীকেই তা দিয়ে যাবেন।

কদিন থেকে ভারী প্রসন্ন আছে উস্তাদজীর মন। আর ক্ষোভ নেই, বেদনা নেই আর। এতদিন ধরে যেন একটা বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি, দেবার মানুষ ছিল না। শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী কিছু নিয়েছিলেন, শঙ্কর একেবারেই নিতে পারল না। কিন্তু এমন আশ্চর্যভাবে আর একজন এসে হাত পেতে দাঁড়াবে এ কি কল্পনাতেও ছিল উস্তাদজীর?

সকালে ঝিলিমিলি রোদ উঠেছে। ঝিলমিল করছে খালের জল। সবুজ অরণ্যে শিস দিচ্ছে দোয়েল, বসে বসে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিলেন তিনি।

সকালবেলাতেই এখানকার পোস্ট অফিসে ডাক আসে। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় খববেব কাগজের সন্ধানে। আজও সে কাগজ পড়তে পড়তে ফিরছিল।

উস্তাদজী ডাকলেন, শঙ্কর?

শঙ্কব মুখ তুলল। সে মুখে যেন মেঘের বঙ। দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কার ভারে থমথম করছে। কিন্তু বযেস বেড়েছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে উস্তাদজীর। শঙ্করের মুখেব চেহারা তিনি ভালো করে দেখতে পেলেন না।

উস্তাদজী আবার ডাকলেন, একটা ভৈরোঁ শুনবে শঙ্কব?

—এখন নয় উস্তাদজী, অনেক কাজ—শঙ্কর যেন তাঁকে এড়িয়েই বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শুধু শঙ্করের মুখেই মেঘের রঙ ধরেনি—ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরেছে দেশের আকাশে। কলকাতায় কিছুদিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হয়েছে হিন্দুমুসলমানের। প্রাসাদপুবী কলকাতা, আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দববনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানোযারের ক্ষুধিত পদসঞ্চার।

এ-খবব উস্তাদজী বাখেন না, এ-সমস্ত তাঁর সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের বাইরে। নিজেব ছোটো ঘবটি—নিঃসঙ্গ নিবালা জীবন, তাঁর সেতার আর তানপুরা, স্বপ্নের গভীরে শহর মুম্বই আর শহর দিল্লী। এতদিন এ-খবর তাঁকে কেউ দেয়নি, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সজাগ ছিল না কেউ। কিন্তু আপাতত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটেছে।

কাগজ নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে শঙ্কর, এমন সময় চার-পাঁচটি ছেলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তার চারদিকে।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে শঙ্করদা।

—আমার সঙ্গে?

—হাঁ, খুব জরুরি কথা।

ওদেব মুখেব দিকে তাকিয়ে শঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—ব্যাপারটা কিহে?

চাপা গলায় একজন বললে, এখানেও লাগবে।

—সে কী!—শঙ্করের শরীরেব ভেতর দিয়ে চমকে গেল একটা শীতল শিহরণ: কী লাগবে?

—দাঙ্গা।

—বলো কী!—শঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠিকই বলছি।—বিশ্বস্ত স্বরে ওদেরই আরেকজন বলে গেল, বাইরে থেকে বিস্তর লোকজন এসেছে আশে পাশে। খালপারের মসজেদে রোজ ওদের গোপন জমায়েৎ

হচ্ছে। গভীর রাত্রে মশাল জ্বেলে লাঠি খেলছে সব। কাল দেখেছি নুরু মিযার বাঁশঝাড় থেকে লাঠি কাটছে।

—শুধু কি তাই?—আর একজন বললে, রাম জেলের কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলেছে চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ি লুটপাট করে নেবে।

বিবর্ণ মুখে শঙ্কর বললে, তবে আর কী হবে। তোমরাও তৈরি হয়ে যাও।

—তৈরি আমরা আছিই। কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে শঙ্করদা, বিভীষণ রয়েছে আপনার বাড়িতে।

—আমার বাড়িতে! আকাশ থেকে পড়ল শঙ্কব: সে আবার কী!

—ওই উস্তাদজী!

—উস্তাদজী! শঙ্কর এবাবে হো হো করে হেসে উঠল: মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের! আজ পনেরো বছব ধরে এ-বাড়িতে উনি আছেন—আমাদের একেবারে আপনার জন।

—ও কেউটে সাপেব জাত শঙ্করদা। সব সমান। কলকাতায় কী হলো জানেন না?

শঙ্কর তবু হাসছিল : উনি গুরুজন, বাবাব গুরু। ওঁব সম্বন্ধে এ-সব কথা ভাবলেও পাপ হয়।

ছেলেরা চটে উঠল : আপনাব পাপ পূণ্য নিয়ে তবে আপনি থাকুন। আমাদের কাজ আমরা কবলাম, সাবধান করে দিলাম আপনাকে। পবে যদি কিছু একটা হয় আমাদেব দোষ দিতে পারবেন না।

হাসিমুখেই শঙ্কর কথাটাকে উড়িযে দিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হাসিটা তার শুকিয়ে আসতে লাগল। দিনের পর দিন একই কথা একই আলোচনা। চারদিকে একটা নিঃশব্দ অনিবার্য প্রস্তুতি যে চলেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজের চোখেই শঙ্কর দেখেছে খালপারের মসজেদে গভীর রাত্রে মশালেব আলো—লাঠির ঠকাঠক শব্দ, দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে টুকটাক খবর আসছে সব সময়ে। আর চোখ বুজে থাকা চলে না।

এতদিনে একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হলো শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল : উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।

আজকাল তাই শঙ্কব একটা বিচিত্র নতুন চোখে তাকায় উস্তাদজীর দিকে। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, নবাবী আমলের আতিশয্যের প্রতি সকৌতুক কৌতূহল নেই কোথাও। আছে সন্দেহ, আর আছে বিশ্লেষণ।

কিন্তু উস্তাদজীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ তিনি বুঝতে পারেন না। একটা ছেলেমানুষি খুশির অকারণ জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে, কেটে যাচ্ছে সেই ধ্যানপ্রশান্ত নির্লিপ্ততা। ডাক দিয়ে বলেন, আও বেটা, তোমাকে একখানা জৌনপুরী শুনাই।

শঙ্কর সংক্ষেপে জবাব দেয়, কখনো জবাব দেয় না। নিজের আনন্দে উস্তাদজী একটাব পর একটা রাগিণী বাজিয়ে চলেন, যেন বিস্মৃত যৌবন ফিবে এসেছে তাঁর। আর কালো মুখ করে শঙ্কর চলে যায় বাড়ির ভেতরে, উস্তাদজীর এই খুশি, এই আনন্দ —তাকে আরো বেশি সন্দিগ্ধ করে তোলে।

বমা একদিন জিজ্ঞাসা কবলে, ব্যাপার কী? দিনরাত এত সব কী ভাবো?

ইতস্তত করে শঙ্কর বলে ফেলল।

প্রথম কথাটা শুনে যেভাবে শঙ্কব হেসে উঠেছিল, ঠিক তেমনি করেই হেসে ফেলল রমা। বললে, তোমার মাথা খারাপ। এমন অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করলে কেমন কবে?

যে জিনিসটা মনেব দিক থেকে অবিশ্বাস করতে পাবলেই বেঁচে যেত শঙ্কর, ঠিক সেই কথাটা রমার মুখে শোনামাত্র একটা ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল তার ভেতবে। ঝনঝনিয়ে উঠল চৌধুরীবংশের আভিজাত্য—প্রতিবাদ অসহিষ্ণুতা; বিশেষ কবে স্ত্রীলোকেব প্রতিবাদ।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শঙ্কবেব, বিতৃষ্ণ বিকট হয়ে উঠল কণ্ঠস্বব: তুমি চুপ কর।

—চুপ কবব? কেন? তুমি কি পাগল?

—যা জানো না তা নিযে তর্ক করতে এসো না। বিশ্বাস আছে ওদের? হযতো এসে ঘুমের মধ্যে ঘ্যাঁচ কবে ছোরা বসিযে দেবে।

—কিন্তু—

—আর বাজে বোকো না—নিজের কাজে যাও—

কথাটা বলে দুম দুম করে শঙ্কর নিজেই সরে গেল, আর পাংশু বিশীর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা।

একটা পাশার আড্ডা আছে গ্রামে। সন্ধ্যার দিকে শঙ্কর রোজ যায় সেখানে, ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা বাজে। আপাতত পাশাখেলা বন্ধ হযে গিয়ে সেখানে লাঠিখেলা শেখানো হচ্ছে।

পাশাব ভেতরে তবু নিজেকে ভুলে থাকবার একটা উপায় ছিল, কিন্তু সে পথ এখন বন্ধ। আর ভালো লাগে না, সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ঘরশত্রু বিভীষণের আশঙ্কাটা একটা ক্ষয়রোগের মতো দিনের পর দিন যেন কুবে কুরে খাচ্ছে তাকে। রাত্রে ঘুম আসে না, উত্তেজনায় আর অস্বস্তিতে যেন তার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। কিছু একটা করা দরকার, উস্তাদজী সম্পর্কে কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী করা সম্ভব?

বিদায় করে দেবে বাড়ি থেকে? না, সেও অসম্ভব। পনেরো বছর আগে যে গৌরবে মেহেরা খাঁ এ-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আজ তাঁকে সেই গৌরব থেকে অপসারিত করা অসাধ্য শঙ্করেব পক্ষে। শ্রদ্ধা না করুক—ভয় করে তাঁকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত ছোটো মনে হয় নিজেকে। তাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কিছু তাঁকে

বলবে এতবড় স্পর্ধা নেই তার।

ভারি ক্লান্তি লাগছে, অসহ্য একটা অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে শবীর, পুড়ে যাচ্ছে মন। আজ তাই অসময়ে, সন্ধ্যাব পরেই বাড়ির দিকে ফিরছিল শঙ্কর।

কিন্তু দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই উৎকর্ণ একটা কুকুরের মতো থমকে দাঁড়াল শঙ্কর—যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় তার আসন্ন কিছু একটাব সংকেত পেয়েছে। উস্তাদজীব ঘরের দবজা বন্ধ, কিন্তু সেখানে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে না? হ্যাঁ—ঠিক, কোনো ভুল নেই।

শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন পাথর হযে গেল, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস কবতে লাগল হৃৎপিণ্ড, চোখে মুখে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল বক্তেব কণা। আর ভুল নেই।

এগিযে এসে শঙ্কর কঠিনভাবে ঘা দিলে দবজায়: উস্তাদজী উস্তাদজী।

এক মুহূর্তেব স্তব্ধতা। তার পরেই ঘবেব ভেতবে টের পাওয়া গেল একটা অস্পষ্ট চঞ্চলতার শব্দ। তার পরেই পেছন দিকেব দবজা খুলে কে যেন ছুটে বেরিযে গেল।

শঙ্কর ঘুরে গিয়ে তাকে ধববাব চেষ্টা কবল, কিন্তু তাব আগেই সে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হিংস্র বাঘেব মতো মুখ কবে উস্তাদজীর ঘবে ঢুকল শঙ্কব।

ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার ওপরে বসে আছেন উস্তাদজী। তাঁর চোখে মুখে শঙ্কার ছাপ। কোলেব ওপর পড়ে আছে সেতারটা।

শঙ্কর কঠোর স্বরে বললে, ঘরে কে এসেছিল উস্তাদজী?

উস্তাদজীর ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল।

—কে এসেছিল?

—আমি বলতে পারব না।

ঘৃণায় আর ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল শঙ্করের মুখ: আমি জানতে চাই।

আবহাওয়াটা লঘু করবার চেষ্টা করলেন উস্তাদজী, ম্লানভাবে হাসলেন একটুখানি : তোমার বাপকে আমি হুকুম করতাম আর তুমি কিনা আমাকে হুকুম করতে চাও?

বীভৎস গলায় শঙ্কর বললে, চালাকি চলবে না। বলতে হবে আপনাকে। উস্তাদজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি সত্যবদ্ধ—বলতে পারব না। আর তা ছাড়া সে জেনে তোমার কোনো দরকার নেই। নিজের কাজে যাও বেটা।

শঙ্কর বললে, বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। দুধ দিয়ে বাবা কালসাপ পুষেছিলেন। আমার ঘরে বসে আপনি আমারই সর্বনাশ করতে চাইছেন।

তীরের মতো সোজা হয়ে উস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠলেন : বেওকুফ, বেতমিজ, কী বলছ তুমি!

—বলছি আপনি বেইমান। আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই।

বেইমান! উস্তাদজীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন সরে গেল, সাদা হয়ে গেল কাগজের টুকরোর মতো। সিংহের মতো চিৎকার করে উঠলেন তিনি : চোপরাও বেতমিজ।

শঙ্কর পাথরের মতো শক্ত স্বরে বলল, আমি চুপ করব, কিন্তু আজই আপনাকে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে উস্তাদজী।

ক্রোধে অপমানে উস্তাদজী থরথর করে কাঁপতে লাগলেন : তুমি—তুমি আমাকে এমন কথা বললে!

শঙ্কর বললে, বললাম। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি বেইমান।

উস্তাদজী বসে পড়লেন। একটা কথা বললেন না, চাইলেন না একটা কৈফিয়ৎ। তার পরেব দিন সকালে আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। চল্লিশ বছর আগে আশিক বাঈ যাঁকে দেওয়ানা করে দিয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে আবাব তিনি 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে' বেরিয়ে পড়লেন বার্ধক্য-শিথিল, ক্লান্ত পদক্ষেপে।

কিন্তু দিওয়ানা হতে চাইলেই কি হওযা যায়? এতদিন পরে কখন যে নিবিড় হয়ে মনেব ভেতরে ফাঁস পড়ে গেছে উস্তাদ মেহেরা খাঁ তা কি ভাবতেও পেরেছিলেন? যাকে তিনি ভেবেছিলেন মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তা আবার এমনভাবে ফিরে এলো কী করে?

'যো দিন যাওয়ি বাহুড়ি সো আওয়ি।'

যে দিন যায় সে আবার ফিবে আসে। আবার নতুন করে মনের কাছে ফিরে এসেছে আশিক বাঈ। সব রাগ-রাগিণীর পাঠ তাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন, শুধু দিতে পারেননি টোড়ী। ব্যথা ছিল, বেদনা ছিল; ছিল নিজের ভেতরে নিভৃত দুঃখ সম্ভোগের মোহ। কিন্তু আর সে মোহ নেই, সে দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। যাকে তিনি সব ধরে দিলেন, আজ তাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য, তাঁর টোড়ী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই দেওয়ানা ফকিরের।

বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা-কলঙ্কিত কলকাতায়—নেমেছে শোকের মতো শ্রাবণের রাত্রি। তানপুরা-কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী। পা টলছে, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনদিন খাওয়া হযনি। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে শরীর যেন লুটিয়ে পড়ছে তাঁর। এ নরোত্তমপুর নয়, নবাবী আমলের বাগবাগিচা আমদরবারের শহর দিল্লী নয়। এ-কলকাতা —আধুনিক, উদ্ধত। এখানে উস্তাদজী কোথায় খুঁজে পাবেন তাঁর আশিক বাঈকে—কেমন করে তার হাতে তুলে দেবেন তাঁর শেষ অর্ঘ্য?

নির্জন পথ—অন্ধকার। হঠাৎ দুদিক থেকে দুজন গুণ্ডা চেহারার লোক এসে তাঁর হাত ধরল।

—এই মিঞা সাহেব, যাবে কোথায়?

অদ্ভুত আবিষ্ট চোখে উস্তাদজী তাকালেন।

—বলতে পারো ভাই, এখানে শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি কোথায়?

—শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ী—লোক দুটো হিংস্র জন্তুর মতো হেসে উঠল শব্দ করে: খুব কাছেই। পাশের এই অন্ধকার কানাগলিটার ভেতরে। সদর রাস্তাতেই পৌঁছে দিতে পারতাম, কিন্তু কানাগলিই সুবিধে—শর্ট কাট্। চলে এসো।

নির্জন পথ। শ্রাবণেব অশ্রুধাবাব মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি। উস্তাদ মেহেবা খাঁব শেষ অর্ঘ্য আব পৌঁছল না। কিন্তু বেশিদিন লুকোচুবি তো চলবে না শঙ্কবেব কাছে। একদিন বুঝতে পাববে শঙ্কব—একদিন জানতে পাববে টোড়ী বাগিণীব পাঠ শেষ না কবেও কত ভালো সেতাব শিখেছে বমা। নিভৃত অন্ধকাব ঘবে তাব সেই একনিষ্ঠ সাধনা, তাব গুরুব আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

# ইজ্জৎ

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমুদ্র অনেক দূরে। সেখানে ঝড়, সেখানে সাইক্লোন। আর এখানে, এই একটুকরো গ্রাম যেন প্রবালদ্বীপ। এর চারদিকে সহজ অশিক্ষা আর অজ্ঞতার শান্তি একটা স্তব্ধ লেগুনের মতো প্রবাল-বলয় দিয়ে ঘেরা।

উপমাটা দিয়েছিল গ্রামের ডাক্তার এবং আশপাশের চারখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র এল. এম. এফ ডাক্তার জয়নুদ্দীন মিঞার ছেলে মইনুদ্দীন। সে তখন কলকাতার কলেজে বি. এ. পড়ত। তারপর সাত-আট বছর পার হয়ে গেছে। সে এখন দূরের মফঃস্বল শহরের উঠতি উকিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, একজন নামজাদা নেতা। শান্ত, স্তব্ধ লেগুনের চাইতে মাতাল সমুদ্রের গর্জনই তার ভালো লাগে বেশি।

দূরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব। আত্মঘাত আর অপঘাতের রক্তে লাল হয়ে গেল নীল সমুদ্রের জল। প্রবাল-বলয় ভেঙে পড়ল, লেগুনের নিস্তরঙ্গ জলে দেখা দিল মত্ততার আক্রোশ।

ব্রাহ্মণত্বের বিজয়গর্বে প্রায় আধ-হাতখানেক একটা টিকি মাথার ওপরে গজিয়ে তুলেছে জগন্নাথ সরকার। সেইটেই দুলিয়ে সে বললে, নাঃ, এর প্রতিবিধেন করতেই হবে। এমনভাবে চললে দুদিন বাদে সব বাছাধনকেই যে কলমা পড়তে হবে সেটা খেয়াল রেখো।

তরণী মণ্ডল বললে, তা হলে লাঠি ধরতে হয়।

—তাই ধরতে হবে। নিজের মান নিজে না রাখলে কে রাখবে তাই শুনি? গায়ে যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত আছে, ততক্ষণ এ-ঘটতে দেব না, পরিষ্কার বলে রাখলাম।

কুকুরের ছানার বেঁড়ে একটা ল্যাজের মতো জগন্নাথ সরকারের মাথার ওপরে টিকিটা নড়তে লাগল।

ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে একটু বেশি মাত্রাতেই সচেতন জগন্নাথ সরকার। খাঁটি ব্রাহ্মণদের কাছে স্বীকৃতিটা নেই বলেই নিজেকে আরো বেশি করে প্রমাণ করতে চায় সে, প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমুদ্রের ওপারে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশ জুড়ে যেখানে ব্রাহ্মণত্বের বিজয়পতাকা উড়ছে, অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-গর্বিত জগন্নাথ সরকারের কোনো পার্থক্য নেই সেখানে। তাই নিজের ছোটো গণ্ডীটির ভেতর নিজেকে সে বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের মহিমায় স্থাপিত করে রাখতে চায়। ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করে কাচা লাল্‌চে রঙের মোটা পৈতের গুচ্ছটা বাগিয়ে ধরে বলে, হেঁ হেঁ বাবা, খাঁটি কাশ্যপগোত্র, রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তান। একটু তপ-তপিস্যে বজায় রাখলে যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারতুম।

কিন্তু তপ-তপস্যাটা এখন আর হয়ে ওঠে না বলেই কাউকে আর ভস্ম করাটাও সম্ভব নয় রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তানের পক্ষে। আর মনুপরাশরেব সঙ্গে যতই আত্মীয়তা সে দাবি করুক না কেন, আসলে সে এখন অন্ত্যজ, সে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ।

কোন সাত না দশ পুরুষ আগে অক্ষত-কৌলীন্য স্বনামধন্য রামকিষ্ট ঠাকুরের কোনো বৃদ্ধ প্রপৌত্র লোভ বা অভাবের তাড়নায় নমঃশূদ্রের যাজনা করেছিল। সেই থেকে তারা পতিত। হিন্দুত্বের চিবন্তন বৈশিষ্ট্য সে পতনকে ক্ষমার চোখে দেখেনি, বিচারও করেনি। একটু একটু করে দিনের পব দিন ঠেলে দিয়েছে পিচ্ছিল পথে, এখন তারা নমঃ-র বামুন।

পৈতে আছে, উপনয়নের ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কাবের ভাঙাচুরো অর্থহীন অসঙ্গতিগুলোও জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে। শিক্ষাদীক্ষা নামেমাত্র, জগন্নাথ সরকার নামটা কাঁচা হাতে সই করতে পাবে, তাতে মাত্রা দিতে জানে না, লেখাটা দেখলে নাগরী বলে মনে হয। চেহাবায ব্রাহ্মণের আর্যত্বের দীপ্তি কোথাও খুঁজে পাওযা যাবে না। রোদে-পোড়া কালো বঙ, লাঙল ঠেলে চওড়া চওডা হাত দুটো লোহার মতো শক্ত আর কড়া পড়া, পিঠে খড়ি, তামাটে বঙের খাড়া খাড়া চুল, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে যেমন হয়, তেমনি লালচে আর ঘোলাটে বর্ণের চোখ। বড়ো বড়ো অসমান দাঁত, তার দুটো আবার হিন্দুস্থানীদের অনুকরণে রুপো-বাঁধানো। শুধু কুকুরের বেঁড়ে ল্যাজের মতো মাথায় টিকিতে ব্রাহ্মণের জয়গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

নমঃশূদ্রদের বিয়েতে, ক্ষেত্রপালের পূজোয় সে-ই মন্ত্র পাঠ করে। সে মন্ত্র বিচিত্র। খাঁটি প্রাদেশিক বাংলার ঘাড়ে কতগুলো অনুস্বার-বিসর্গ চাপিয়ে সেগুলোতে দেবমহিমা আরোপ করা হয়। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া গেছে প্রয়োজনমতো তার সঙ্গে নতুন মন্ত্রও জুড়ে নেয় জগন্নাথ সরকার। মোটের ওপর পশার আছে এবং সেজন্যে আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি সজাগ।

আজ সেই আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে।

বাইরের সমুদ্রে ঝড? কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার। সমস্ত দেশজোড়া একটা অতিকায় ছোরার ঝলক এখানকার আকাশেও বিদ্যুৎচমকের মতো খেলা করে গেল।

অনেকদিন আগে এখানে এক ফকিরের আবির্ভাব হয়েছিল। ফকির নাকি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা; সমস্ত হুরী-পরী-জিন ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। হাতে একমুঠো ধুলো নিয়ে তিনি ফুঁ দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে যেত খাসা কিস্‌মিস্‌ মনক্কা, কখনো কখনো একেবারে সেরা মোগলাই পোলাও। কতগুলো ঘাসপাতা একসঙ্গে জড়ো করে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন ফকির, দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে যেত চুনি, পান্না, হীরে-জহরৎ। সে সব হীরে-জহরতের শেষ পর্যন্ত কী গতি হয়েছে ইতিহাসে তা লেখা নেই, তবে ফকিরের মহিমা লোকের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর সবচাইতে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা এই যে, এহেন করিৎকর্মা মহাপুরুষ কী মনে করে এই অজগর বিজেবনেই তাঁর দেহরক্ষা করলেন।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গ্রামের লোক তাঁর শেষকৃত্য করলে। তাঁর সমাধির ওপর রচনা করলে ছোটো একটি গম্বুজ। এখন সে গম্বুজ আর নেই, কয়েকখানা শেওলাধরা ভাঙা ইঁট ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু তাই বলে ফকিরের মহিমায় হ্রাস হয়নি বিন্দুমাত্রও। পুরোনো মদের মতো যতই দিন যাচ্ছে সে মহিমা ততই অলৌকিক হয়ে উঠছে।

ফাঁকা মাঠের ভেতরে টিলার মতো একটুখানি উঁচু জমির ওপরে ফকিরের সমাধি। তা থেকে একটুখানি এদিকে সরে এলে একটা জংলা বটগাছ—এলোমেলোভাবে জটা নামিয়েছে চারপাশে। বহুদিনের পুরোনো গাছ—হয়তো ফকিরের সমসাময়িক, হয়তো তার চাইতেও প্রবীণ। মোটা মোটা ডাল থেকে শিকড় নেমে ঢুকেছে মাটির নিচে—বচনা করেছে কতগুলো স্তম্ভের মতো। সব মিলিয়ে গম্ভীর থমথমে একটা আবহাওয়া। নিবিড় নীলাভ ছায়ার আচ্ছন্নতা, ভিজে ভিজে মাটি, কোটরে কোটরে প্যাঁচার আস্তানা। এইখানে ডাকাতে-কালীর থান।

ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে ডাকাতে-কালীর ইতিহাস একই প্রাচীনতার ঐতিহ্যে গাঁথা। কোনো এক নামজাদা ডাকাত এখানে অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দিয়ে বেরুত ডাকাতি করতে। এইখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন করে সাধনা করতেন রক্তচক্ষু এক মহাকায় তান্ত্রিক। অনেক নরবলির রক্ত এখানকার মাটিতে মিশিয়ে আছে, অনেক নরমুণ্ড লুকিয়ে আছে এর মাটির তলায়। সুতরাং এখানকার হিন্দুদের কাছে ডাকাতে-কালীর একটা নিশ্চিত ভয়ঙ্কর মর্যাদা আছে। এই গ্রাম তাঁরই রক্ষণাধীনে এবং তাঁর কোপদৃষ্টি পড়লে দেখতে দেখতে সবকিছু উজাড় হয়ে যাবে।

সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতবড় মাঠের ভেতরে এঁরা দুজন পরস্পরের প্রতিবেশী। ফকির আর ডাকাতে-কালী। এতকাল পরম নিশ্চিন্তে এবং নীরবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলেন। 'এক কম্বলে দশজন ফকিরের জায়গা হয়'—এই প্রবন্ধটির জন্যেই বোধ হয় এতকাল ফকির কিছুমাত্র আপত্তি করেননি এবং এত কাছাকাছি যবনের আস্তানা থাকাতেও কালী জাত যাওয়ার আশঙ্কা রাখতেন না। বেশ ছিল।

কিন্তু সমুদ্রে ঝড় এলো। প্রবাল-বলয় ভেঙে দোলা জাগিয়ে দিলে নিদ্রিত প্রবাল-দ্বীপে।

মাইল-দেড়েক দূরে মাঝারি গোছের একটা মাদ্রাসা। মাঝখানে একদিন এক মৌলবী সেখানে এসে 'ওয়াজ' করলেন। কী বক্তৃতা দিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু পরের দিন থেকেই আবহাওয়াটা বদলে গেল একেবারে। তারও দুদিন পরে মুসলমান-পাড়ার 'ধলা মস্তাই' এসে জগন্নাথ ঠাকুরকে জানিয়ে গেল, এবার ডাকাতে-কালীর থানে পুজো করা চলবে না।

—কারণ?

কারণ, ওখানে ঢাক-ঢোল বাজে। ওখানে ভূত পুজো হয়। তাতে সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত

হয় ফকির সাহেবের। জগন্নাথ ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করলে। বরাবর ওখানে পুজো হয়ে আসছে। এতকাল ফকির সাহেবের যদি কোনো অসুবিধে না হয়ে থাকে, এবারেই বা হতে যাবে কেন?

ধলা মন্তাই হাসল, বললে, তা হোক, অত বুঝি না। তবে এইটে বলতে পারি যে, এবারে ওখানে আর পুজো হতে দেওয়া যাবে না। ওতে আমাদের ধর্মের অপমান।

—কিন্তু আমাদেব ধর্মেরও তো অপমান হচ্ছে।

—ভূত পুজো আবার কিসের ধর্ম? ধলা মন্তাইয়ের চোখে হিংসা চকচক করে উঠল: একটা কথা বলে যাই ঠাকুর। এ এখন আমাদের রাজত্ব। আমরা যা বলব তাই করতে হবে। এখন বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে।

গ্রামে দুজন মন্তাই। একজন রোগা আর কালো, নিরীহ নির্জীব লোক, সে শুধুই মন্তাই। ধলা মন্তাইয়ের রঙ ওরই ভেতরে একটু ফর্সা, লম্বা তাগড়া চেহারা, চিতানো বুক। মুসলমান-পাড়ায় সে সব চাইতে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, নামকরা দাগী। তাই ধলা মন্তাইয়ের শাসানো শুধু কথার কথাই নয়।

—যা বললুম ভুলো না ঠাকুর। পরে গোলমাল হতে পারে।—আর একবার সাবধান কবে দিয়ে দলবল নিয়ে ধলা মন্তাই চলে গেল।

তখনকার মতো জগন্নাথ ঠাকুর চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ কবে থাকা মানেই চেপে যাওয়া নয়। ঘা লাগল ব্রাহ্মণের আত্মমর্যাদায়, কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁড়ে টিকিটা উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠল সজারুর কাঁটার মতো।

নমঃশূদ্রদের গ্রাম। এমনিতেই জাতটা একটু সামরিক, চট করে ভয় পেযে পিছিয়ে যাওয়ার মতো নয়। সমাজের সব চাইতে নিচের তলায় পড়ে থাকে বলেই ধর্মের ওপরে আস্থাটা বেশি; শূদ্র-শক্তির বলিষ্ঠ সহজ সংস্কারে একবার যাকে মেনে নিযেছে তার কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানের আঘাত পেয়েও তাকে ছাড়তে জানে না। যুগ-প্রবাহিত রক্তধারায় শম্বুকের নিষ্ঠা, একলব্যের দৃঢ়তা। সমাজের ওপরতলার মানুষদের মতো ধর্মটা ওদের অলঙ্কারমাত্র নয়, একেবারে নিচের তলায় থেকেও ধর্মকে ওরা অহঙ্কার বলে আঁকড়ে রেখেছে।

সুতরাং নমঃ-র বামুন জগন্নাথ সরকার ক্ষেপে উঠেছে।

—পুজো আমরা করবই। তার পরে যা হওয়ার হোক।

একজন বললে, তাহলে সড়কি-টাঙ্গীতে শান দিতে হয়।

জগন্নাথ সরকার হাঁটু চাপড়ে বললে, আলবৎ। খুন-খারাপী দুটো-একটা হয় তো হোক, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করে তো ফকির-টকির সবসুদ্ধ উড়িয়ে দেবো।

শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহী একজন উঠে দাঁড়াল। রক্তের ভেতরে চনচন করে উঠেছে নেশা। খুন-খারাপীর নেশা। হিংস্র জন্তুর চৈতন্যের ভেতরে যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে আদিম অরণ্যের আহ্বান। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সে বিকট গলায় একটা হাঁক পাড়ল:

জয়, কালী মাইকি জয়—

সমবেত জয়ধ্বনি উঠল: কালী মাইকি জয়—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরের মুসলমান-পাড়া তার জবাব পাঠিয়ে দিলে: আল্লা-হু-আকবর—

জগন্নাথ সরকারের নেতৃত্বে শেষ হলো ওদের সভা, ধলা মন্তাইয়ের সভাপতিত্বে শেষ হলো মুসলমান-পাড়ার 'ওয়াজ'। সমস্ত মুসলমান-পাড়া আল্লার নামে কসম নিয়েছে, জান দেবে তবু এবার পুজো করতে দেবে না। ইসলামের ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে যে করে হোক ওই ভূতপুজো বন্ধ করতে হবে।

আসন্ন ঝড়ের সংকেতে আকাশ থমথম করতে লাগল।

মুসলমান-পাড়ার যিনি আদত মাথা, তিনি হাবিব মিঞা।

নধর গোলগাল চেহারা, টুকটুকে রঙ। সৌখীন মেজাজের মানুষ। দিল্লী থেকে প্রতি সপ্তাহে সুর্মা আসে, তাঁর নিজের এবং তাঁর আদরের লালবিবির জন্যে। কানে থাকে আতরভরা তুলো এবং মুখ থেকে বেরোয় মশলা-দেওয়া পানের গন্ধ। পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে হাবিব মিঞার, কিন্তু মনের তারুণ্য এতটুকু ফিকে মারেনি আজ পর্যন্ত। এ অবধি বারোটি বিবি তাঁর হাত ঘুরে গেছে, এখন যে চারটি আছে তার প্রথমটি হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম, বাকি তিনটি আনকোরা নতুন। পুরোনো জিনিস বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারেন না হাবিব মিঞা, কিন্তু বড়ো বিবিকে তালাক দেবার কল্পনাও তিনি করতে পারেননি কখনো। আজ বত্রিশ বছর ঘর করে কেমন একটা মায়া বসে গেছে, তা ছাড়া ধান-পান গরু-গোয়ালের নিপুণ তদারক করতে এমন আর একটি প্রাণী দুর্লভ।

বড়ো বিবি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, মাঝখানের দুটি ছায়ামূর্তির মতো অবান্তর। মহিষীর মর্যাদা যে সগৌরবে ভোগ করে থাকে সে হলো ছোটো বিবি বা লালবিবি। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, ছিমছাম চেহারা, মাজা শামলা রঙ। আদরে আবদারে অভিমানে হাবিব মিঞার সমস্ত মন-প্রাণকে একেবারে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যে লালবিবিকে চোখের আড়াল করতে পারেন না তিনি। তাই কানের গোলাপী আতর আজকাল আরো বেশি করে গন্ধ ছড়ায়, শহর থেকে জর্দা কিমাম আনানোর খরচটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, চোখের কোলে কোলে আরো গাঢ় হয়ে পড়ছে সুর্মার রেখা। আগের চাইতে আজকাল আরো বেশি করে হাসেন হাবিব মিঞা, ভুঁড়িটা আগের চাইতে আরো বেশি দোল খায়, গালের গোলাপী রঙে আরো বেশি করে যেন যৌবনের আমেজ।

তা সুখী হওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার আছে বইকি হাবিব মিঞার। মস্ত জোত, ক্ষেতির সময় বারোখানা লাঙল নামে। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, ফুড কমিটির সভাপতি। যা যা দরকার কোনোটার অভাব নেই।

সব ভালো, তবে সন্ধের দিকে একটু আফিং খান। হজমের গোলমালের জন্যে ধরেছিলেন গোড়াতে, এখন পাকাপাকি নেশা হয়ে গেছে। ঘণ্টা-দুতিন চোখ বুঁজে নিশ্চিন্তে

ঝিমুতে মন্দ লাগে না একেবারে। নেশার আমেজের সঙ্গে নবযৌবনা লালবিবির ধ্যানটা একটা মধুর আরামে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বলা বাহুল্য, এই সময় বেরসিকের মতো কেউ ডাকাডাকি করলে ভালো লাগবার কথা নয়। হাবিব মিঞার মেজাজটা যতই ভালো হোক না কেন, ইচ্ছে করে রসভঙ্গকারী বেয়াদবকে পায়ের চটিটা খুলে ঘা-কতক পটাপট বসিয়ে দিতে। খাঁটি সৈয়দেব বংশধব হিশেবে গর্জন করে উঠতে ইচ্ছে হয়: চুপ রহো গোলামকা বাচ্ছা—

আপাতত মগজেব ভেতবে সেই সৈযদেব মেজাজটা পাক খাচ্ছিল। হাবিব মিঞা গাল দিয়ে উঠলেন না বটে, কিন্তু চোখ না মেলেই দুরস্ত জবানীতে আমিরী ভাষায় প্রশ্ন করলেন: আবে কৌন চিল্লাতা?

—আমি ধলা মন্তাই, জনাব।

এ এমন একটা লোক যাকে হুঙ্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া চললে না, দেখানো চলে না আমিরী মেজাজের উত্তাপ। অত্যন্ত বদরাগী গোঁয়ার লোক—ক্ষেপে গেলে সৈয়দ মৌলবী কোনোটাই মানবে না। সুতরাং অত্যন্ত অনিচ্ছায এবং গভীর বিবক্তিব সঙ্গে চোখ মেলতে হলো, লালবিবির রঙীন স্বপ্নটা আপাতত মিলিয়ে গেল বাতাসে।

জোর করে মুখে হাসি টেনে আনলেন হাবিব মিঞা: তারপর কী খবর?

দাওয়ার সামনে চাটাইটাব ওপরে বসল মন্তাই: আজ্ঞে বাবণ করে দিলাম।

—তারপর?

—গণ্ডগোল পাকাবে। বিকেলে দেখেছি দল বেঁধে জটলা করছিল।

—তোমরা কী করবে? ভয় পেয়ে সব পিছিয়ে যাবে নাকি ছাগীর বাচ্চার মতো?

—আল্লার কসম!—পিঁজরাব পোষ-না-মানা বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন করলে ধলা মন্তাই : আমি জাত-পাঠান জনাব। ধরে ধরে এক-একটাকে কোতল করে দেব তা হলে।

হাবিব মিঞা কণ্ঠস্বর বিশ্রস্ত শোনালো : সব ওই ব্যাটা ঠাকুরের জন্যে। ও-ই হচ্ছে ওদের মাথা।

—মাথার মাথাটা কেটে নিতে আমার এক লহমা সময় লাগবে না জনাব। তারপরে লাশ গুম করে দেব মধুমতীর জলে। কাকে অবধি টের পাবে না।

—সাব্বাস।

হাবিব মিঞা চুপ করে গেলেন। মুখে আবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল, কিন্তু এ-হাসি জোর-করা নয়, সহজ প্রসন্নতার। এতদিনে কাজ হাসিল হবে মনে হচ্ছে। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে। নিজে থেকে কিছু করতে গেলে অনর্থক দাঙ্গা-ফৌজদারীর ঝামেলা বাধত, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা যেমন নিরাপদ তেমনি মোক্ষম। জগন্নাথ ঠাকুরকে ভালো করেই জানেন হাবিব মিঞা, সহজে তার ন্যায্য দাবি থেকে বাঁধের দেড় বিঘে ধানী জমি ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু যে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে জগন্নাথ ঠাকুরের মাথাটা উড়ে যাবে ধড় থেকে এবং তারপরে—

একেই বলে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ভাগ্যিস মৌলবী সাহেব এসে সেদিন ওই রকম গরম গরম বুলি শুনিয়ে গেলেন, নইলে কি এমন সুযোগ মিলত কোনোদিন! মনে মনে নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন হাবিব মিঞা, তারিফ করলেন নিজেকে। সকলকে লেলিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ সংসারে আর কী আছে।

ধলা মন্তাই বললে, মামলা-মোকদ্দমা যদি বাধে তা হলে আপনি তো আমাদের পিছে আছেন জনাব?

—আলবৎ।—হাবিব মিঞা সোৎসাহে বললেন, সে-কথা কি আর বলতে হবে।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, বক্তব্যও নেই। তবু দ্বিধা করতে লাগল ধলা মন্তাই, আঙুল দিয়ে চাটাইটাকে খুঁটতে লাগল। আরো কী একটা তার বলবার আছে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না, বলতে পারছে না সহজ স্পষ্ট ভাষাতে। বাধা আছে, সংকোচ আছে।

—জনাব।

—কী বলছিলে?

—বলছিলাম—মন্তাই আবার চুপ করে গেল।

এতক্ষণে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল হাবিব মিঞার। লক্ষণটা খারাপ। সাধারণত এই সব নীরবতার ভূমিকার পরেই আসে প্রার্থীর দরবার—দু'কাঠা ধান চাই, দু'কুড়ি টাকা ধার চাই। এতবড়ো জোয়ান মানুষটা এমন সংকুচিত হয়ে গেলেই সন্দেহ দেখা দেয়।

—কী বলবে, বলেই ফেল না মিঞা।

—জী—চোয়াড়, রুক্ষদর্শন লোকটাব মুখচোখ লজ্জিত আব করুণ হয়ে উঠল: জী, ঘরের জরু বিটির যে ইজ্জৎ রইল না।

—ইজ্জৎ রইল না! বল কি হে? তোমার ঘরের ইজ্জতে হাত দেবে এমন বুকের পাটা কার আছে?

—আজ্ঞে সে কথা নয়। কারো হাত দিবার ব্যাপার নয়, দু-একখানা কাপড়—

—কাপড়!—হাবিব মিঞা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন: কাপড়!

—জী, যদি ব্যবস্থা করতে পারেন—

—তুমি ক্ষেপে গেলে মন্তাই?—হাবিব মিঞার বিস্ময় আর বাধা মানল না: সরকারী চালান যা এসেছিল সে তো ছ' মাস আগে লোপাট, একফালি কানি অবধি তার পড়ে নেই। আশমানের চাঁদ যদি চাও তাও টেনে নামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কাপড় নয়।

—কিছুতেই কি উপায় হয় না, জনাব?

—না, কোনো উপায় হয় না।—হাবিব মিঞা মুখ বিকৃত করে বললেন, শালার কণ্ট্রোল হয়ে সব সর্বনাশ করে দিয়েছে রে। সব গুণাহ আর সব না-পাক, দেশটা জাহান্নামে যাবে, বুঝলি?

কিন্তু দেশ জাহান্নামে যাক বা না যাক সেজন্যে মন্তাইকে খুব উৎকণ্ঠিত দেখা গেল না। একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আদাব জানিয়ে নেমে গেল

অন্ধকারে।

হাবিব মিঞা আবার ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলেন। কিন্তু আর আমেজ এলো না, নেশাটা বিলকুল চটিয়ে দিয়েছে লোকটা। তা হোক, তা হোক। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে —এইটেই লাভ। দোষের মধ্যে কাপড়ের জন্য বড্ড ঘ্যান ঘ্যান করে। কাপড়? হাবিব মিঞা মৃদু হাসলেন। কাপড় আছে বইকি। কিন্তু জোড়া বত্রিশ টাকা, মন্তাইয়ের পক্ষে তা আকাশের চাঁদের চেয়েও দুরধিগম্য।

...

অন্ধকার ধানক্ষেতের আল বেয়ে এগিয়ে চলেছে মন্তাই। সদর বাস্তা দিয়ে গেলে ঘুরতে হয় খানিকটা, এইটেই সোজা পথ। দুপাশে ফলন্ত পাকা ধান পায়ের ওপরে পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। বাতাসে ধানের গন্ধ। ওই গন্ধে বুকটা ভরে যায়, কেমন শিরশির করে ওঠে রক্ত। আছে, সব আছে। এই ধান, ক্ষেতভরা এত মধুগন্ধী ধান একদিন ওদেব সব দিত, দিত কাপড, দিত মুখের ভাত, বৌ-ঝিকে গড়িয়ে দিত রুপোর পৈঁছে। সে ধান আছে, তেমনি মাতাল-করা গন্ধ আছে তার। আশ্চর্য, তবু কিছু নেই। বৌ-বেটির পবনে কাপড় জোটে না, পেট ভরে না ভাত খেয়ে, কন্দ আর কচু খুঁড়ে বেড়াতে হয় শুয়োরের মতো। আল্লা!

অন্ধকারে ধাক্কা লাগল একটা। আল থেকে হডকে ধানক্ষেতের ভেতর নেমে পড়ল মন্তাই।

—কে? চোখে দেখতে পাও না—রাতকানা নাকি?

অন্যদিক থেকে যে আসছিল সেও থমকে দাঁড়িযে পড়ল।

—রাগ করো না ভাই, আঁধারে মালুম হয়নি।

—আরে, জগন্নাথ ঠাকুর যে!

জগন্নাথ ঠাকুর চমকে উঠল। আঁতকে পিছিয়ে গেল তিন পা। ঝড়ের সংকেতে থমথম করছে আকাশ, স্তব্ধ অন্ধকারের নির্জনতায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। মন্তাইয়ের আক্রমণের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে জগন্নাথ সরকার।

বুঝতে পেরে এত দুঃখের ভেতরেও হেসে উঠল মন্তাই।

—ভয় পাচ্ছ কেন ঠাকুর? এখানে তোমার সঙ্গে মারামারি করব না। যা কিছু লড়াই-কাজিয়া তা হবে তোমাদেরই ওই কালীর থানে, তখন দেখা যাবে কার কলিজার জোর কত! তা এত রাত্রে চলেছ কোথায়?

জগন্নাথ ঠাকুরের গলায় স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল: হাবিব মিঞার কাছে।

—হাবিব মিঞার কাছে!—আশ্চর্য হয়ে মন্তাই বললে, সেখানে কেন? মিটমাটের জন্যে?

—মিটমাট? কিসের মিটমাট?—জগন্নাথের গলার আওয়াজ উগ্র হয়ে উঠল: তোমরাও মরদ, আমরাও মরদ,. লাঠিতেই মিটমাট হবে। সেজন্যে নয়, যাচ্ছি দুখানা কাপড়ের জন্যে।

—কাপড়?

—হ্যাঁ, কাপড়। মান সম্মান আর রইল না মিঞা। বউ দুদিন ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। বলছে কাপড়ের যোগাড় না করলে গলায় দড়ি দেবে।

মন্তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কাপড় পাবে না ভাই, তার চেয়ে বউকে গলায় দড়ি দিতে বলো। আমাকেও তাই করতে হবে।

মন্তাই আর দাঁড়াল না, হেঁটে চলে গেল হনহনিয়ে। ধানক্ষেতের ভেতরে চুপ করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল জগন্নাথ—কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে যেন।

...

দিনের আলোয় দেখা গেল সমান উৎসাহে দু দলই পাঁয়তারা কষছে।

কালী মাইকি জয়—আল্লা-হু-আকবর! রক্তপাত আসছে আসন্ন হয়ে। কোনোবার এ সময় ডাকাতে-কালীর থানে পুজো হয় না, কিন্তু এবার কী মানত আছে জগন্নাথ ঠাকুরের, তাই আগামী অমাবস্যায় পুজো তার না করলেই নয়। মূর্তি তৈরি হচ্ছে কুমোরপাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে শান পড়ছে টাঙ্গী-সড়কি-ল্যাজাতে। এবারে এসপার ওসপার যা হোক কিছু হয়ে যাবে একটা।

এরা দাঁড়ায় ডাকাতে-কালীর থানের পাশে, ঝুরি-নামা বটগাছের শান্ত স্যাঁতসেঁতে রহস্যঘন ছায়ায়। অন্ধকার কোটরে আগুনের ভাঁটার মতো ধকধক করে প্যাঁচার চোখ। এই নীলাভ বিচিত্র ছায়ায়, এই গা ছমছম-করা অস্বস্তিভরা পরিবেশের ভেতরে দাঁড়িয়ে ওদের রক্তের আদিমতার সাড়া আসে। মনে পড়ে যায় অমাবস্যায় নরবলি হতো এখানে, থকথকে রক্ত চাপ বেঁধে থাকত মাটিতে। এখনি আধ হাত জমি খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে নরমুণ্ড, দেখা দেবে কবন্ধ-কঙ্কাল। ডাকাতে-কালী আজ আবার নতুন করে নরবলি চাইছেন।

ওপারে ফকিরের দরগার সামনে দাঁড়ায় ধলা মন্তাইয়ের দলবল। সমানে শানানো চলছে ল্যাজা-সড়কিতে, বাঁশঝাড় উজাড় করে লাঠি কাটা হচ্ছে, তবে আপাতত শুধু ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া। যত খুশি ঘরে বসে মূর্তি তৈরি করো, যত খুশি দল পাকাতে থাকো। কিন্তু থানে মূর্তি বসিয়ে ঢাকে একটা কাঠি দিলেই হয়। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে —সব তৈরি আছে ভেতরে ভেতরে।

চোখ শাণিত করে দেখে ধলা মন্তাই, অন্যমনস্কভাবে থুতনির নিচে ছোটো দাড়িটা আঁচড়াতে থাকে। ওদিকে কুকুরছানার বেঁড়ে ল্যাজের মতো টিকিটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ঠাকুরের মাথায়।

আচমকা চিৎকার ওঠে: কালী মাইকি জয়—

ওদিক থেকে সমান উৎসাহে আসে তার প্রতিধ্বনি : আল্লা-হু-আকবর—

মনে হয় এখনি দাঙ্গা শুরু হলো বুঝি। কিন্তু দু'দলই জানে—এখনো সময় হয়নি। এ শুধু পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া, চালাকি চলবে না। আমরাও সতর্ক আছি, আমরাও

আছি প্রস্তুত হয়ে। শুধু দেখে যাচ্ছি—শুধু হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি। যথাসময়ে দেখা যাবে কে কতবড় মরদ।

মুখোমুখি দু'দল। সমান সামরিক, সমান উৎসাহী। দু-চারটে খুনজখমে কোনো পক্ষেরই আপত্তি নেই। জমি নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে যা হামেশাই ঘটে থাকে, ধর্মের জন্যে তার চাইতে আরো কিছু বেশি মূল্য দিতেই রাজী আছে ওরা।

অমাবস্যা যত বেশি এগিয়ে আসছে, চিৎকারের মাত্রা বেড়ে উঠছে তত বেশি। দিনের বেলা পাঁয়তারা কষে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে যায় জগন্নাথ আর মন্তাই। দিনের দুই বীরপুরুষ নেতা সন্ধ্যাবেলায় আশ্চর্যভাবে অসহায়। এ এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। শুধু পরাজয়কে মেনে নিতে হচ্ছে—স্বীকার করে নিতে হচ্ছে পৌরুষের মর্মান্তিক অপমানকে। মন্তাইয়ের বৌ শাসায়: একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। ঘরের ভেতরে বিনিয়ে বিনিয়ে শোনা যায় জগন্নাথের বৌয়ের কান্না: এবারে তার গলায় দড়ি না দিয়ে আর উপায় নেই।

গুম হয়ে দুজনেই বসে থাকে। দুজনের অবচেতন মনেই হিংস্র সাপের মতো একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পাক খেয়ে ওঠে : কেমন হয় হাবিব মিঞাকে খুন করলে?

কিন্তু শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।

সকালবেলায় দলবল নিয়ে মন্তাই সবে হাবিব মিঞার বাড়ির দিকে এগিয়েছে, এমন সময় বিশ্রী একটা কান্নার শব্দে পা আটকে গেল সকলের। কান্নাটা আসছে হাবিব মিঞার বাড়ি থেকেই।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সকলে।

সর্বনাশ ঘটে গেছে। কাল রাত্রে একটু ভালোরকম খানা-পিনার ব্যবস্থা হয়েছিল —তৈরি হয়েছিল মাংস-পোলাও। কিন্তু সৈয়দী আমিরী খানার ঝাঁঝ হেলে-চাষার মেয়ে লালবিবি বরদাস্ত করতে পারেনি। শেষ রাত্রে বারকয়েক ভেদ বমি করে তার হয়ে গেছে।

পাগলের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন হাবিব মিঞা, তিন বিবি নাকিসুরে কাঁদবার পাল্লা দিচ্ছে সমস্বরে। এই সুযোগ। এই কান্নার উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে লালবিবির সৌভাগ্যটা জুটবে কার কপালে।

সমস্ত মুসলমান-পাড়া শোকে বিমূঢ় আর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শোকটা প্রকাশ করতে না পারলে ভবিষ্যতে অসুবিধের সম্ভাবনা আছে। ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সবাই। গত মন্বন্তরেও বুঝি দেশের এতবড় সর্বনাশ হয়নি।

মহাসমারোহে কবর খোঁড়া হলো আল্লাতলীতে। তিন বিবি এসে 'মুর্দা-গোসল' করালো, পড়া হলো 'জানাজা'র নামাজ। চমৎকার রঙীন শাড়ি আর ধবধবে চাদরে 'কাফন' করা হল, হাবিব মিঞার বড় আদরের লালবিবি ঘুমিয়ে রইল মাটির তলায়।

দূরে দাঁড়িয়ে হিন্দুরা বিমর্ষ মুখে এই শোকানুষ্ঠান দেখতে লাগল। মনে হল, হাবিব মিঞার শোকে তারাও অভিভূত হয়ে পড়েছে, তাদের গলায় একটিবারও কালীমায়ের জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল না। হাজার হোক, ফুড-কমিটির সেক্রেটারী হাবিব মিঞাকে

চটানো চলে না।

কেলেঙ্কারিটা হল সেই রাত্রেই।

কে একজন বেশি রাত্রে বেরিয়েছিল ছাগল খুঁজতে। সে এসে চুপিচুপি খবর দিলে হাবিব মিঞাকে। বাঁধের ওপর থেকে দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কারা যেন আল্লাতলীতে কবর খুঁড়ছে লালবিবির।

জিন? না, জিন নয়। নিশ্চয় মানুষ। জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া দেখতে পাওয়া গেছে। জিন হলে ছায়া পড়ত না।

এক হাতে দোনলা বন্দুক আর এক হাতে টর্চ নিলেন হাবিব মিঞা। ডেকে নিলেন দলবলকে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল দলটা।

সংবাদটা নির্ভুল। দুজন লোক। একজন শাবল মারছে, আর একজন মাটি তুলছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কাফনের কাপড় চুরি করবে।

—ধর, ধর, শালাদের—

লোক দুটো পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না! কবরখানার উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি আর গর্তে পা পড়ে দুজনেই ধরা পড়ে গেল। তখন দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোটা এক টুকরো মেঘে ঢাকা পড়েছে, কাফন-চোরদের চিনতে পারা গেল না।

—কোন শালা হারামীর বাচ্ছা মুর্দাকে বেপর্দা করতে চায়?

জোরালো টর্চের আলো ফেললেন হাবিব মিঞা।

শুধু লোক দুটো নয়—দলসুদ্ধ সবাই পাথর হয়ে গেছে। টর্চটা খসে গেল হাবিব মিঞার হাত থেকে। একজন সাঁচ্চা মুসলমানের বেটা ধলা মন্তাই, আর একজন বামুন ঠাকুর জগন্নাথ—মুসলমানের মুর্দা ছুঁলে যাকে গঙ্গাস্নান করতে হয়। ধলা মন্তাইয়ের হাতে শাবল, জগন্নাথের কনুই পর্যন্ত গোরের মাটি।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিলেন হাবিব মিঞা। বিকৃত বিকট গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন : মার, মার, মেরে শালাদের তক্তা করে দে। দু শালাই কাফের —ইবলিশের বাচ্ছা!

কিন্তু লোকগুলো সব যেন পাথর হয়ে গেছে। মারবার জন্যে কারো হাত উঠল না, এমন কি আঙুলগুলো এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। শুধু সকলের বিস্মিত বিমূঢ় মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে : ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?

# দাঙ্গা

## সোমেন চন্দ

লোকটি খুব তাড়াতাড়ি পল্টনের মাঠ পার হচ্ছিল। বোধহয় ভেবেছিল, লেভেল ক্রসের কাছ দিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডে প'ড়ে নিরাপদে নাজিয়াবাজার চ'লে যাবে। তাহার হাতের কাছে বা কিছু দূরে একটা লোকও দেখা যায় না—সব শূন্য, মরুভূমির মতো শূন্য। দূরে পিচ-ঢালা পথের ওপর দিয়ে মাঝে-মাঝে দুই-একটি সুদৃশ্য মোটরকাব হুস ক'বে চ'লে যায় বটে, কিন্তু এত তীব্র বেগে যায় যে মনে হয় যেন এই মাত্র কেউ তাকেও ছুরি মেরেছে, আর সেই ছোরার ক্ষত হাত দিয়ে চেপে ধ'রে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। নির্জন রাস্তার ওপব মোটর গাড়ির এমনি যাতায়াত আরো ভয়াবহ মনে হয়। দূরে গবর্নর হাউসের গর্বময় গাম্ভীর্য মানুষকে উপহাস করে। পথের পাশে সারি-সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। মাঠের ওপর কয়েকটা কাক কীসের আশায় হেঁটে বেড়াচ্ছে! অনেক দূরে একটা ইঁদুরের মতো ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে কে? একটি সৈন্য। ঐ সৈন্যটি আজ তিনদিন ধ'রে এক জায়গায় ডিউটি দিয়ে আসছে।

লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়ল। তার পরনে ছেঁড়া-ময়লা একখানা লুঙি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটি গামছা, মাথার চুলগুলি কাকের বাসার মতো উশকোখুশকো, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে, কোনো গ্রামবাসী মনে হয়।

এমন সময় কথাবার্তা নেই দুটি ছেলে এসে হাজির, তাদের মধ্যে একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বের ক'রে লোকটার পেছনে একবার বসিয়ে দিল। লোকটা আর্তনাদ ক'রে উঠল, ছেলেটি এতটুকু বিচলিত হ'লো না, লোকটার গায়ে যেখানে-সেখানে আরো তিনবার ছোরা মেরে তারপর ছুটে পালাল, কুকুর যেমন ল্যাজ তুলে পালায় তেমনি ছুটে পালাল। লোকটা আর্তনাদ করতে-করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়ল, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে, টাটকা লাল রক্ত, একটু আগে দেখেও মনে হয়নি এত রক্ত ওই কঙ্কালসার দেহে আছে।

মিনিট দশেক পরে এক সৈন্য বোঝাই গাড়ি এল, সৈন্যরা বন্দুক হাতে ক'রে গাড়ি থেকে পটাপট নেমে সার্জেন্টের আদেশে হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই ধরল। হিন্দি বুলি ছেড়ে, সিগার খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে সার্জেন্টদের শ্বেতবর্ণ মুখ আরক্ত হ'য়ে এল। যারা এদিকে জেলের ভাত খেতে আসছিল তাদের থামিয়ে দিল। 'উধার মৎ যাইয়ে বাবু, মৎ যাইয়ে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় অর্ধেকটা ঘেরাও হ'য়ে গেল, ছোটো-ছোটো গলি এবং সমস্ত রাস্তার মাথা সশস্ত্র পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ ঢুকতে পারবে না, কেউ বেরুতেও পারবে না, শৃঙ্খলিত ক'রে একটা সাময়িক বন্দীশালা

তৈরি হ'লো।

কিন্তু শৃঙ্খলের ভিতরেও সংগ্রাম হয়। এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হ'লো। সকলেই এখানে-সেখানে ছুটোছুটি করতে লাগল, চৌদ্দ বছরের বালক থেকে আরম্ভ ক'রে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত। এমন দৃশ্য শহরের জীবনে অভিনব।

লাইনের পাশে যাদের বাসা তাদেব পালাবার আর অবসর কোথায়? তাদের মুখ চুন হ'যে গেল. কেউ হিন্দুত্বে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বীবের মতো অগ্রসর হ'লো। এক রিটায়ার্ড অফিসাব ভদ্রলোক একটা ব্যাপার কবলেন চমৎকার।

বাক্স থেকে বহু পুরোনো একটি পাতলুন বের ক'রে সেটা প'রে এবং তার ওপর একটা পুবনো কোট চাপিয়ে এক সুদর্শন যুবকের মতো ওপর থেকে নিচে নেমে এলেন, তাঁর শবীবের ভিতর আগের সেই তেজ দেখা দিয়েছে, যখন ওপরওয়ালা অনেক সাহেবসুবোকেও ব'কে-ঝ'কে নিজের কাজ তিনি ক'বে যেতেন। সেই দিন আর এখন কই, হায়, সেই দিনগুলি এখন কোথায়!

ভদ্রলোক নিচে নেমে এলেন, পাতলুনের দুই পকেটে কায়দা ক'রে দু হাত ঢুকিয়ে দুই-পা ফাঁক ক'রে গেটের ওপর দাঁড়ালেন। ঐ যে, রক্তবর্ণ সার্জেন্টটি এদিকেই আসছে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে বডোবাবুসুলভ ইংবিজি আরম্ভ ক'রে দিলেন।

শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভা সেনেব ব্যাপার আরো চমৎকার। সে-তো মেয়েদের কোন ইস্কুলে চাকরি করে। শহর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বলে প্রচুর ছুটি উপভোগ করছিল, আজও এইমাত্র দুপুরের রেডিও খুলে বসেছে। ছুটির দিন ব'লে একটা পান চিবুচ্ছে। ভোরবেলা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছোটো ভাইকে গাধা ব'লে শাসিয়েছে, খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কিছু ভেবেছে আর এখন বসেছে রেডিয়োর গান শুনবে ব'লে। তাব চোখে চশমা, একগাছি খড়ের মতো চুল সযত্নে বাঁধা। আঙুলগুলি শুকনো হাড়ের মতো দেখতে, আর শরীরের গঠন এমন হ'য়ে এসেছে যে যত্নবতী না—হ'লেও চলে। এমন সময় বাইরের রৌদ্রে গুর্খাদের বন্দুকেব সঙিন ঝলমল ক'রে উঠল, তাদের শ্বেত অধিনায়কের গর্বোন্নত শির আরো চোখে পড়ে, এবং বুটের খটমট আওয়াজ। সুপ্রভা সেন আর তিলমাত্র দ্বিধা না-ক'রে নিচে চ'লে গেল, বসনে এবং ব্যবহারে বিশেষ যত্নবতী হ'য়ে সাহেবের সম্মুখীন হলো!

মুহূর্তে এই গল্প লাফিয়ে চলল এবং সুপ্রভা সেনের অনেক খ্যাতি ও অখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

লাইনের পাশে কোনো বাড়িই খানাতল্লাসির হাত থেকে রেহাই পেল না।

রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় যেমন খানাতল্লাশি হয় তেমন অবশ্য নয়, তল্লাশি হয় শুধু মানুষের।

ভিতরের দিকে তেমনি ছুটোছুটি, একবার এদিকে একবার ওদিকে। কিন্তু সকলের মুখেই হাসি, বিরক্তি বা রাগের চিহ্নমাত্র নেই। অশোকের দেখে রাগ হ'লো, এই ব্যাপক ধরপাকড় আর ব্যাপকতর ঘেরাও মানুষের কাছে একটা স্পোর্টস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অধঃপতন বা পচন একেই বলে। অশোকেব ইচ্ছে হয় চীৎকার ক'রে বলে, 'আপনারা কেন হাসবেন? কেন হাসছো তোমরা?'

একটা জায়গায় কিছু লোক জমা হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেঙে গেল। লোকগুলির মুখে হাসি আর ধরে না। তারা আর-কিছুতেই সিরিয়াস হতে পারছে না। অশোকের মনে হলো, এরা একেবারে জর্জরিত হ'য়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একটা ফেবিওয়ালা যাচ্ছিল পুরোনো কাগজের বোঝা নিয়ে। তাব পায়ে একটা ময়লা কাপডেব প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে হঠাৎ থেমে বললে, বাবুবা হাসছেন! হাসুন, আপনাদেরই দিন পড়েছে, গর্বনমেন্টের যেমন পড়েছে। 'দিন পড়েনি শুধু আমাদের, আমরা মববো, মরবো!'

অশোক মন্থর পায়ে হেঁটে বাসায় গেল। এই মাত্র আর-একটা ঘটনাব সংবাদ পাওয়া গেছে! দোলাইগঞ্জ স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হ'য়ে এক বৃদ্ধ যাচ্ছিল—ঘটনার বিবরণ শুনতে আর ভালো লাগে না। কখনও নিজেকে এত অসহায় মনে হয়।

অশোকের মা খালি মাটিতে প'ড়ে ভয়ানক ঘুমুচ্ছিলেন, ছেলের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, 'যা শিগগির, বেরিয়ে যা, বেরিযে যা বলছি। একশোবার বলেছি যে, যা বাপু মামাবাড়িতে কিছুদিন ঘুরে আয়, মারামারিটা কিছু থামলে পরে আসিস, না তবু এখানে প'ড়ে-থাকা চাই, একটা ছেলেও যদি কথা শোনে! মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকা চাই, শহরের মাটি এমন মিষ্টি, না?'

অশোক হেসে বললে, 'এত কাজ ফেলে কোথায় যাই বলো?'

—'হুঁ কাজ না ছাই! কাজের আর অন্ত নেই কি না! তোদের কথা শুনবে কে বে? কেউ-না। বুঝতে পেরেছি তোদের কতখানি জোর, কেবল মুখেই পটপটি, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা!'

—'জানো, কংগ্রেস মিনিসট্রির সময় কানপুরে কী হয়েছিল? আমরা দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলুম।'

মা দুই হাত তুলে বললেন, 'হয়েছে। অমন ঢের বড়ো-বড়ো কথা শুনেছি। তোদের রাশিয়ার কী হ'লো শুনি? পারবে জার্মানির সঙ্গে? পারবে?'

অশোক বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'পারবে না কেন, মা? বিপ্লবের কখনও মরণ হয়?'

মা হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন, একটু পরেই চুপি-চুপি বললেন,

—'হ্যাঁ-রে, একী সত্যি?'

—'কী মা?'

—'ঐ যে উনি বললেন, জার্মানি রাশিয়ার সব নিয়ে গেছে, একেবারে আমাদের দেশের কাছে এসে পড়েছে?'

অশোক হো-হো ক'রে হেসে উঠল, 'এঁরা হিটলারের চেয়েও লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেন।'

এমন সময় অজু মানে অজয় এসে হাজির। অজু অশোকের ছোটো ভাই। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'নবাব বাড়ি সার্চ হ'য়ে গেছে।

' অশোক চোখ পাকিয়ে বললে, 'এটি কোত্থেকে আমদানি, শুনি?'

—'বাঃ রে, আমি এইমাত্র শুনলুম যে!'

—'তোমার দাদারা বলেছে নিশ্চয়?'

অজু একজন 'হিন্দু সোসালিস্ট'। সম্প্রতি দাঙ্গার সময় জিনিশটির পত্তন হয়েছে। এই বিষয় শিক্ষা নিতেই সে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করে। উচ্চ স্বরে মানুষের সঙ্গে তর্ক করে, হিটলারের জয়গান করে, হানাহানিতেও প্রচুর আনন্দিত হয়।

—'বাঃ রে, আমি নিজের কানে শুনেছি! একটা সোলজার আমায় বললে,—'

—'তোমায় কচু বলেছে!'

অজু কর্কশ স্বরে বললে, 'তোমরা তো বলবেই—' তারপর মৃদুস্বরে—'তোমরা হিন্দুও নও, মুসলমানও নও—'

'—আমরা ইহুদির বাচ্চা, না-রে?' অশোক হা-হা করে হে'সে উঠল বললে, 'সার্চ হোক বা না-হোক, তাতে রিজাযেস করবারই বা কী আছে, দুঃখিত হবারই বা কী আছে? আসল ব্যাপার হলো অন্যরকম। দেখতে হবে এতে কার কতখানি স্বার্থ রয়েছে।'

অজয় চুপ ক'রে ছিল, সে খুক-খুক ক'রে হেসে উঠল।

দুপুর আস্তে বিকেলের দিকে এগিয়ে গেল।

অশোক রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পেল, এই মাত্র পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। লোকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এই অঞ্চলেরই অধিবাসী যারা বাইরে ছিল, অনাহারে তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই মুখের হাসিটি শুকোয়নি ভিতরে এবং বাইরে যারা ছিল তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার বর্ণনা চলতে লাগল। ওদিকে দুই গাড়ি বোঝাই ভদ্রলোকদের ধ'রে নিয়ে গেছে। একজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসে ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

—'কার আবার স্বার্থ থাকবে? স্বার্থ রয়েছে হিন্দু আর মুসলমানের।' এই ব'লে অজয় অন্যদিকে চেয়ে একটা গান গাইতে লাগল।

মা ব'লে উঠলেন, 'তোরা ভাইয়ে-ভাইয়ে এমন ঝগড়া করিস কেন বল তো? আমাদের সময় আমরা বড়ো ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে কথা কইতাম না, মুখে-মুখে তর্ক করা দূরের কথা! কিন্তু দাদা আমায় যা ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় অনেক শীতের রাত্তিরে আমরা এক লেপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়েছি।'

অশোক গালে হাত দিয়ে বললে, 'হয়েছে। এবার ভাইয়ের গল্প আরম্ভ হ'য়ে গেছে, আমাদের তাহ'লে উঠতে হয়।'

...

তারপর আস্তে-আস্তে সন্ধ্যা এগিয়ে এল। এবার তবে বাসায় ফিরতে হয়। কিছুপরেই সান্ধ্য আইন শুরু হ'য়ে যাবে। রাস্তাঘাট নির্জন হবার আগে একটা মস্ত ঠেলাঠেলি আরম্ভ

হ'য়ে গেছে। পুলিশগুলো মানুষের শরীর সার্চ ক'রে নিচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা একেবারে হাত তুলে দাঁড়িয়ে যায়। এক ভদ্রলোক একটা পেন্সিল কাটা ছুরি নিয়ে ধরা পড়লেন। সকলে তাঁর নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করতে ছাড়ল না। ওদিকে সমস্ত দোকানপত্র আস্তে-আস্তে বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। একটু আগেও রাস্তার পাশে একটা মেলা বসেছিল যেন, এখন সকলেই শেষ ডাক দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। রিটায়ার্ড অফিসাররা নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরম স্নেহের দৃষ্টিতে সেই অস্থায়ী হিন্দু দোকানদারদের দিকে বার-বার তাকাচ্ছেন, ওদের এখন পুত্রবৎ মনে হচ্ছে, অথবা যেন বোমা-বিধ্বস্ত লণ্ডন নগরীর অসংখ্য রেফিউজি।

অশোক বাসার কাছে গিয়ে দ্যাখে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বললেন, 'বাবা আশু, তোর বাবা তো এখনও এল না।' তারপর ফিসফিস, ক'রে —'তাছাড়া আজ আবার মাইনে পাবার দিন।'

কিছুমাত্র চিন্তার চিহ্ন না-দেখিয়ে অশোক তৎক্ষণাৎ বললে,

—'আহা, অত ভাবনা কীসের—? এখনও তো অনেক সময় আছে।'

—'অনেক নয় আশু, সাতটা বাজতে আর আধঘণ্টাও বাকি নেই।'

অশোক আবার রাস্তায় নেমে এল, পেছনে ছোটো ভাই নীলু মা-র আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, বেলাও মা-র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ক্রমেই লোক ক'মে আসছে। যারা কিছুদূরে আছে তাদের দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই ছোটো-ছোটো সৈন্যদল মার্চ ক'রে গেল। আকাশের রঙ ক্রমেই ধূসর হ'য়ে আসছে। রাস্তা আর দালানের গায়ে ছায়া নেমেছে। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে।

এই সাতটা বাজল। অশোক ফিরে এল।

মা এখনও বাইরের দরজার চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি ভোরের তারার মতো করুণ। 'আশু এখন উপায়?' —মা ভাঙা গলায় বললেন। তাঁর চোখ জলে ভ'রে এসেছে।

অশোক কিছু বললে না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খালি তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়ল। তার মুখ কুঞ্চিত হ'য়ে এসেছে, চোখের ওপর একটা বিষম দুর্ভাবনার চিহ্ন স্পষ্ট। হয়তো এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হ'তে চলেছে সে। নীলু তার হাত ধ'রে ডাকল, 'বড়দা, ও বড়দা? বড়দা, বড়দা গো? বাঃ রে কথা বলে না! ও বড়দা? বাঃ রে! বাঃ রে!'

নীলু কেঁদে ফেলল, 'বাবা গো' বলে নাকিসুরে কাঁদতে লাগল।

ওদিকে মা-ও কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। বেলা তাঁর পাশে ব'সে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এছাড়া সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। অন্ধকার নেমেছে রাস্তায়। ঘরের অন্ধকার আরো সাংঘাতিক। আলো জ্বালাবে কে? ঘরের আবহাওয়া ভুতুড়ে হ'য়ে উঠেছে। বাইরে ঘন-ঘন বাসের হর্ন শোনা যায়। সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। যেন কোনো যুদ্ধের দেশ। অথবা কোনো সাম্রাজ্যবাদের শেষে শঙ্খধ্বনি, বার্ধক্যের বিলাপ।

পাশের বাড়িতে ভয়ানক তাশের আড্ডা জমেছে। বেশ গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আড্ডা ছেড়ে টর্চ হাতে করে বিমল এল। বিমল ছেলেটিকে ভালোই মনে

হয়, কথাবার্তায় অনেক সময় ছেলেমানুষ। অনেক সময় পাকাও বটে। সে বললে, 'অশোকবাবু, চলুন।'

অশোক প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। খালি পায়েই সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিমল টর্চ জ্বালিয়ে এগুতে লাগল। মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, কোনো পুলিশ আসছে কিনা! বাড়িটা বেশি দূরে নয়। অলিগলি দিয়ে নিরাপদেই যাওয়া যায়। বিমল যথাস্থানে গিয়ে ডাকল, 'সূর্যবাবু? সূর্যবাবু বাড়ি আছেন?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে।'

—'আমরা। দরজাটা খুলুন।'

সূর্যবাবু নিজেই এসে দরজা খুললেন, হেসে বললেন, —'কী ব্যাপার?'

বিমল বললে, 'আমরা আপনার ফোনে একটু কথা বলতে পারি?'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' সূর্যবাবু সাদরে ফোন দেখিয়ে দিলেন। বিমল স্টীমার অফিসে ফোন করল, অনেকক্ষণ পরে কে-একজন লোক এসে বলল, 'সুরেশবাবু কে? সুরেশবাবু টুরেশবাবু ব'লে এখানে কেউ নেই। ও, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ভুল হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন করুন। আমি খুঁজে আসছি।'—বিমল অনেকবার ডেকেও আর-কোনো উত্তর পেল না। ফোন রেখে অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, আবার আসব'খন।'

অশোক ফিরে এল। দরজার কাছে মার জলভরা চোখ ছলছল করছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। অশোক বললে, 'পরে যেতে বলছে।' এই শুনে মা আবার ভেঙে পড়লেন, ভগ্নস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে-মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে।

'সেজন্যে আমার গর্বের আর সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম, আমার কোনো ভয় নেই।'

এমন সময় পাশের ঘরে আলো দেখা গেল—আলো নয় তো আগুন। কাগজ পোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অশোক গিয়ে দেখলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি স্তূপীকৃত ক'রে অজয় তাতে আগুন দিয়েছে।

অশোক তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, 'এ-সব কী করছিস?'

—'কী করবো আবার। মড়া পোড়াচ্ছি!'

—'অজু তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হ'য়ে যায়নি, তখন একটু পড়াশোনা কর। তারপর পলিটিক্স করিস্।'

—'দাদা, তোমার কম্যুনিজম রাখো। আমরা ও-সব জানি।'

—'কী জানিস, বল্?' অশোকের স্বরের উত্তাপ বাড়ল।

—'সব জানি। আর এও জানি তোমরা দেশের শত্রু—

—'অজু, চুপ করলি?'

অজয় নিজের মনে গুম্‌গুম করতে লাগলো!

অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'ফ্যাসিস্ট এজেন্ট! বড়োলোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন হিন্দু মুসলমান ভাই-বোনরা ব'লে গাধার ডাক ছাড়বি? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে? পেট মোটা হবে কার? স্টুপিড, জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনেব কথা? জানিস আয়ারল্যাণ্ডের কথা, মূর্খ?—' কিন্তু একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে হঠাৎ অশোক থেমে গেল, পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, মা আরো অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।

...

কয়েকদিন পরে। অশোক বাইকে চ'ড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মিটিংএ যোগদান করতে যাচ্ছিল। এক জায়গায় নির্জনপথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল ব'লে রক্তটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়নি, এখনও খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এল, সবকিছু মনে প'ড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগল, ভাবল এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?

# ত্রাণকর্তা

## নবেন্দু ঘোষ

দুঃসংবাদটা এ-পাড়াতেও পৌঁছেচে, দাঙ্গার দুঃসংবাদ। থমথম করছে রাস্তাঘাট। লোকজনের চলাচল নেই, নেড়ি কুকুরগুলো পর্যন্ত আজ অদৃশ্য। কেবল গলির মুখে-মুখে দুঃসাহসী ছেলে-ছোকরারা সিগারেট টানতে-টানতে জটলা পাকাচ্ছে।

ও-পাড়ায় আগুন জ্বলছে, রক্তের ধারাতে কাটা মাথাগুলো ছিটকে পড়ছে, ষোড়শী কুমারীর স্তন কর্তিত হচ্ছে, সুকুমার শিশুরা সিমেন্টের মেঝেতে আছড়ে পড়ছে, নরকের ঘোর কালো অন্ধকারে আজ ও-পাড়ায় শয়তানের অভিষেক হচ্ছে। সে-সংবাদ ভেসে এসেছে এ-পাড়ায়, মৃদু বাতাসের ধমনী বেয়ে সেইসব ভয়াবহ ঘটনাবলী এখন পল্লবিত হ'য়ে এ-পাড়ায় এসে থেমেছে।

সবাই চোখে অন্ধকার দেখছে। কোথা থেকে যেন দুরন্ত ভয়ের বন্যা এসে তাদের আচ্ছন্ন করেছে। ভয়, অব্যক্ত ভয়। ভয় বুকের মাঝে দুর-দুর ক'রে উঠছে, ভিড় ক'রে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করছে। ভয়, কুৎসিত ভয়। ভয়ে সংসার বিস্বাদ মনে হচ্ছে।

মেয়েরা সব চুপচাপ কাজ ক'রে যাচ্ছে। আজ আর বেশি পদ নয়, শুধু ভাতে ভাত, বাস; কেবল ছেলেমেয়েগুলো বোঝে না বেশি কিছু। মাঝে-মাঝে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, দুড়দাড় ক'রে সশব্দে সিঁড়ি দিয়ে চলাফেরা করে, নিজেদের মধ্যে চ্যাঁচামেচি করে। কিন্তু সহসা প্রহরীর মতো বয়স্করা গ'র্জে উঠে বলে, চুপ, চ্যাঁচাবি তো থাপ্পড় মেরে মাথা উড়িয়ে দেবো—'

অথচ নিজেদের মাথা বাঁচাবার মতো কোনো আশাই খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

দরজা বন্ধ ক'রে যেখানে-সেখানে গল্প চলছে: কী করা যায়, কী করা যায়? শুধু দুঃসংবাদ নয়, দারুণ দুঃসংবাদ এসেছে যে আজ রাতেই নাকি ও-পাড়ার ওরা এসে এ-পাড়া আক্রমণ করবে। মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমেছে সে-খবর পেয়ে: কী করা যায়, কী ক'রে বাঁচা যায়?

এ-পাড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যারিস্টার মিস্টার বোসের বাড়ি তখন আলোড়িত। অরুণ চুপি-চুপি বেরিয়ে যাবার ফিকিরে ছিল। ঘরের মধ্যে ব'সে-থাকা কি পোষায় বেশিক্ষণ?

কিন্তু মিস্টার বোস আজ চারদিকে নজর রেখেছেন: কার সাধ্য যে লঙ্কাপুরীতে কেউ প্রবেশ করবে বা সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন কবলেন।

'এমনি—একটু দেখতে।'

'এমনি। কোনো দরকার নেই। তোমার কি জানা নেই যে কী হচ্ছে এই শহরের বুকে?—যাও, ঘরে গিয়ে বোসো।'

অরুণ ফিরে গেল ঘরে।

মেয়ে রুবি এসে দাঁড়াল। দুশ্চিন্তায় তার ডাগর-ডাগর চোখের নিচে কালো ছায়া পড়েছে, কোঁকড়ানো চুলের অরণ্যে নেমেছে বিশৃঙ্খলা, দুধে-আলতা দেহবর্ণে দেখা যাচ্ছে একটা পাণ্ডুর প্রলেপ। তার মনটা খাবাপ হ'য়ে গেছে, ভয় এসে বাসা বেঁধেছে তার মনে। সিনেমা, পার্টি আর পিকনিকে যাওয়া হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেছে, পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে গিয়ে মধু পানেব ভ্রমরীবৃত্তি আজ হঠাৎ যেন কর্পূরের মতো উড়ে গিয়েছে রুবির মন থেকে।

'বাবা—'

'কী বলছো?'

'আমাদের মেসোমশাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

মানে ভবানীপুর। যেখানে হিন্দুরা আছে সংখ্যায় অগণন, যেখানে এখনও হয়তো ক্রেপ সিল্কের শাড়িটা প'রে, বেণী দুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়।

মিস্টার বোস অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন, 'মেসোমশাইয়ের বাড়ি? এখন? অসম্ভব। রাস্তা দিয়ে না-যাচ্ছে একটা লোক, না-চলছে একটা গাড়ি, ঘন-ঘন এলাকা পার হ'তে হবে, মড়া আর রক্তের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে, সবচেয়ে বড়ো কথা অতর্কিতে আক্রমণ—যা বাঁচাবার জন্য তোমরা ভবানীপুর যেতে চাইছো, সেই প্রাণই যাবে মাঝপথে। অসম্ভব—বাজে কথা না-ব'লে ঘরে গিয়ে ব'সে থাকগে রুবি—'

কিন্তু কী ক'রে ব'সে থাকে রুবি? ওর ভয় করছে। মাঝে-মাঝে কোলাহল ভেসে আসছে দূর থেকে। বিশ্রী কোলাহল। কাল রাতে পুবদিকের আকাশে আলোকসমারোহ দেখেছে সে। কানে এসেছে নানা পাশবিকতার কাহিনী। আর সবকিছু ছাপ রেখে গেছে তার মস্তিষ্কের কোটরে—দপদপ ক'রে উঠছে সেইসব কথার বোঝা। তার দুধে-আলতা দেহবর্ণের নিচে যে পাৎলা-পাৎলা নীলচে শিরাগুলো লাফাচ্ছে তাদের দেখলেই তার বিক্ষুব্ধ ভয়ার্ত মনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অরুণ আর রুবিকে ধমক দিলে চলবে। কিন্তু মিসেস বোস? মেদভারে-আনত বিপজ্জনক দেহটাকে নিয়ে যাঁর মনটা সারাক্ষণ তিক্ত হ'য়ে আছে তাঁর মনে এই দাঙ্গার দুঃসংবাদ যে আরো-ভয়ংকর বিস্ফোরকের সৃষ্টি করেছে সে-বিষয়ে আর-কারো সন্দেহ থাকলেও মিস্টার বোসের নেই। তাই মিসেস বোস যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন মিস্টার বোস একটু সংকুচিত হ'য়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মিসেসকে ধমক দিতে গেলে উলটো ধমকই খেতে হবে তাঁকে।

'শুনছো—আমি আর পারছি না—এই সাসপেন্‌স, এই ডেনজার, এ অসহ্য—'

'কিন্তু কী করি—টেল মি হোয়াট অ্যাম আই টু ডু ডিয়ার?' মিস্টার বোস ক্ষীণকণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

'কিছু-একটা করো—ফর হেভেন্‌স সেক। চুপ ক'রে ব'সে থেকো না—'

'চুপ ক'রে আমি ব'সে নেই। আমি ভাবছি। তাছাড়া দুটো রাইফেল আছে, পাঁচশো

কার্তুজ আছে, দারোয়ান, বেয়ারা, চাকর আর ড্রাইভার আছে—তোমার ভয় পাবার কী আছে?'

মিসেস বোস সোফার উপর কাৎ হ'য়ে পড়লেন, তাঁর দুটো চোখের নীলাভ তারায় একটু স্ফুলিঙ্গদীপ্তি হঠাৎ ঝিকমিক ক'রে উঠল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার ও-ফিরিস্তি থামাও, প্লীজ—হাজার-হাজার লোকের সামনে কাগজের মতো উড়ে যাবে তোমার সমস্ত জারিজুরি—পাঁচশো কার্তুজ দিয়ে কি তুমি সবাইকে রুখতে পারবে? তুমি কি অক্ষয় তূণের অধিকারী? না-না বাপু, আমার সাহসে কুলোচ্ছে না—যে-কোনো মুহূর্তে আমি হয়তো ফেইণ্ট করতে পারি—'

ঠক ঠক ঠক। দরজায় কারা যেন করাঘাত করছে।

'হুজৌর—' দারোয়ানের হাঁক শোনা গেল।

'কোন হ্যায় তেওয়ারি?'

'মহল্লাকা বাবু লোক ভেট মাঙতা হ্যায়।'

'বৈঠাও। শোনো, তোমরা উত্তেজিত হ'য়ো না। দেখা যাক না কী হয়। বাড়িতে এখন ডিফেন্স কমিটির মিটিং বসবে, এত-বড়ো পাড়া, কত লোক আছে এখানে, আর তারা প্রত্যেকেই লড়াই করবে—তবে? ডোণ্ট বি নার্ভাস মাই-ডিয়ার। যদি সে-রকম মুহূর্ত আসে তবে তো রিসক নেবোই—গাড়ি তো সবসময়ই তৈরি থাকবে—'

...

অভিজাত ও ভদ্রপাড়ার শেষে, ও-পাড়া আর এ-পাড়ার মাঝখানে একদল লোক থাকে যারা এ-পাড়ার সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত মনে করে। তারা জাতে ডোম। ছোটো-ছোটো পায়রার খুপরির মতো তাদের বস্তির ঘরগুলো, কোনোমতে মাথা গুঁজে জীবনের বোঝাটাকে ব'য়ে বেড়ায় তারা। রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, জল ঢালে, নালি নর্দমা আর পায়খানা পরিষ্কার করে, ম্যানহোলে নেমে ময়লা তোলে, করপোরেশনের গাড়িতে চ'ড়ে আবর্জনা সংগ্রহ ক'রে আনে। মাটির বাসা আর কলাই-করা থালায় তারা কাঁকর মেশানো ময়লা চালের ভাত খায়, লাল কেরোসিনের টিমটিমে আলোতে ব'সে রাতের বেলায় মত্ত কোলাহল করে। এ-পাড়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত মনে করলেও ভদ্র ও অভিজাতের কাছে কিন্তু ওরা এ-পাড়ার লজ্জা।

ও-পাড়ার সামনে এ-পাড়ার সীমান্ত রচনা ক'রে যারা আছে তারা সংখ্যায় শ-দুই হবে। আর এই শ-দুই লোক উঠতে-বসতে যার কথা শোনে সেই সর্বশক্তিমানের নাম ঝগরু। সে যদি তার লোকদের দিনকে রাত বলতে বলে তাহ'লেও তারা অম্লান বদনে তা-ই বলবে—এমনি প্রভাব ঝগরুর। ঝগরু তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র নেতা, সর্দার।

ঝগরুর অনুচররা এসে তার কাছে বসেছিল। ও-পাড়ায় কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার ছিটেফোঁটা তারা দেখতে পেয়েছিল, শুনেছে সবকিছুই; দু-একজন যারা ভয়ার্ত খরগোশের মতো কোনোমতে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ও-পাড়ার ব্যূহ থেকে, তাদের তারা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, আজ কী

হবে? আজ বাতাসে যে-গুজব ভাসছে তা যদি সত্যি হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তারা কী করবে?

পেঁয়াজি আর তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছিল ঝগরু। তার আসবারুণ চোখের অতি-সূক্ষ্ম শিরাগুলো তখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, ঝিরঝিরে মৃদু বাতাসে দেহটা যেন ফাঁপা বেলুনের মতো উড়ে যেতে চাইছে। বৌ সুরতিয়ার গুরু নিতম্বের দিকে তাকিয়ে উগ্র ধরনের একটা রসিকতার জন্য মনটা প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠেছে, এমনি সময় ও অবস্থায় ওরা এসে ভিড় ক'রে এই বাজে খবরটা দেওয়ায় ঝগরুর মেজাজ ভারি চ'টে গেল।

বিরক্তির সুরে সে বলল, 'আরে যা, যা ভাগ। যা হোনে কা হোগা, উলোগ হামলা করেগা তো ক্যা হ্যায়?'

রংলাল বলল, 'লেকিন কুছ তো করনা হোগা—'

ঝগরু ধমক দিল, একটা হাত নেড়ে বলল, 'নশাকো খারাব কর দিয়া তু লোগ। অরে, ইসমে সোচনে কি কোনসি বাত হ্যায়? আয়েগা তো লড়াই করোগে। অওর ক্যা? অসলি বাত সুনো—সবকোই তৈয়ার রহো হাথিয়ার লেকে—যব ডঙ্কা বাজেগা তব কুদ পড়োগে—ব্যস।'

'লেকিন সর্দার—'

'ভাগ সালে সব—লবনি লেকে বৈঠা হ্যায়, থোড়া মজা চিখে দে—যা, অব তোহনি সব ঘর যা—'

সবাই চ'লে গেল।

পেঁয়াজি চিবোতে-চিবোতে ভাঁড়ে চুমুক দিতে লাগল ঝগরু। ধীরে-ধীরে উগ্র-একটা অনুভূতি ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো ডাক ছাড়তে লাগল তার কানের মধ্যে, নিশ্বাসটা ঘন হ'য়ে উঠল, চোখের পাতা দুটো ভারি হ'য়ে উঠল আর দৃষ্টিটা হ'য়ে এল ঝাপসা। নেশা হ'ল ঝগরুর। নেশার ঘোরে সুরতিয়াকে দেখে অবাক হ'য়ে যায় সে। সুরতিয়া হঠাৎ যেন ভয়ংকর রূপসী হ'য়ে উঠেছে, দুর্লতা রাজকন্যার মতো অপরূপ মনে হচ্ছে তাকে।

'সুরতিয়া—এগে—'

'কী হো?'

'ইধার আ—আনা—'

'উ-হুঁ—'

'থোড়া তাড়ি পিব?'

'ন্না-ন পিবুয়া হাম।'

নেশার ঘোরে হঠাৎ রাগ হ'ল ঝগরুর, একরোখা হ'য়ে উঠল সে সুরতিয়ার কথা শুনে।

'আইব কিনা—বোল হারামজাদি—'

'ন্না—হাম ন আইবুয়া, হামার কাম ছে—'

'তব মজা দেখ লে—'

উঠল ঝগরু। শিশুর মতো অসমান পদক্ষেপে সে সুরতিয়ার কাছে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল, দু-হাতে তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিল।

চীৎকার ক'রে উঠল সুরতিয়া, 'মর যাম—সব হাড্ডি টুট যাই হামার—'

বৌকে বুকে টেনে নিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠল ঝগরু, 'ডর হোতা হ্যায়—ডরো মত রে ছৌড়ি—লে, গোদিমে বৈঠ—'

কিন্তু নেশা জমেছে ঝগরুর—সে পারবে কেন সুরতিয়ার মতো সবলা নারীকে আটকে রাখতে? হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল সুরতিয়া।

বেলা দশটা-এগারোটা, অন্যদিনেব মতো স্বাভাবিক অবাস্থা থাকলে আজ হয়তো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত ঝগরু। কিন্তু আজ যখন দাঙ্গার অজুহাতে কাজ নেই তখন একটু ফূর্তি না-ক'রে পারে না সে।

নিজের মনে হাসে ঝগরু, 'ভাগ গৈল—ছৌড়ি ভাগ গৈল—' সে ভাবে। একটা-কিছু করতে হবে। তাড়ি শেষ হয়েছে, নেশা জমেছে, সুরতিয়াও পালাল। কিন্তু একটা-কিছু করতে হবে তো? কী করা যায়, কী?

হঠাৎ এককোণ থেকে পুরোনো ঢোলটা টেনে নিয়ে প্রাণপণে পেটাতে লাগল ঝগরু। সে গান গাইবে। সে-গান শুনে যে-ই ঘাবড়াক, ঝগরু দমবে না। তার গানের শখ চেপেছে, সুতরাং সে গাইবেই।

দমাদম ঢোলে ঘা দিয়ে গাইতে শুরু করল ঝগরু। দুর্বোধ্য গানের কথার মধ্যে মাত্র একটা লাইন সে বারংবার গাইতে লাগল—

'ছপ্পর পর কৌয়া নাচে বগ্‌বগুলা,
হাঁ-হাঁ, বগবগুলা—'

সে-কী সুর! সে-কী তান ও বিস্তার! সে-কী অপূর্ব দরদী কণ্ঠস্বর! সমস্ত ডোমপাড়া সচেতন হ'য়ে উঠল যে ঝগরু গাইছে, ঝগরুর নেশা হয়েছে।

সশ্রদ্ধ সুরে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সর্দার গাওত হ্যায় জি—গাওত হ্যায়।'

...

ডিফেন্স কমিটির মিটিং বসেছে মিস্টার বোসের বাড়িতে। সভাপতি হয়েছেন তিনিই।

পাড়ার প্রায় সব বড়ো মাথারাই এসে জড়ো হয়েছেন। প্রবীণ অধ্যাপক নিবারণ মুখুজ্যে, উকিল হরিদাস মিত্র, ডাক্তার সন্তোষ দত্ত (এম-বি., এফ-আর-সি-এস.) এবং লৌহব্যাবসায়ী সুকুমার রায়। আর এসেছে সরস্বতী অর্কেস্ট্রা পার্টি, তরুণ ব্যায়াম সমিতি ও এভারগ্রীন ড্রামাটিক ক্লাবের ছোকরা সভ্যেরা। মিস্টার বোসের ভেতরের বারান্দায় বড়ো শতরঞ্চি পাতা হয়েছে। তারই ওপরে সবাই ঘন হ'য়ে ব'সে একাগ্র মনে আলোচনা করছে। কোণের ঘরটার পরদা সরিয়ে রুবি দেখছে সবাইকে ঘরে ব'সে-ব'সে। নেহাৎই কৌতূহল। রুবি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না, পার্টি সিনেমা আর পিকনিকের অভাবটা বড়ো দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল। এমনি সময়ে এই মিটিং। আর-কিছু না-হোক বহুরকমের

মানুষ তো দেখা যাবে। আর রুবি শুধু দ্যাখেই না, দেখে বিচারও করে, বিচার ক'রে আনন্দ পায়।

মিস্টার বোস কথা বললেন, সভাপতি-সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ও ভারি গলাতে বললেন, 'কাল থেকে শহরের বুকে যা আরম্ভ হয়েছে তা আপনারা সবাই জানেন ও দেখেছেন। বেশি-কিছু বলা বা বক্তৃতা দেবার সময় এটা নয়, আমার সে-যোগ্যতাও নেই। আমি শুধু আপনাদের এটুকুই বলতে চাই যে আমাদের, বিশেষত বাঙালিদের, জীবনে একটা দুর্দিনের শুরু হয়েছে। আজ আমাদের এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে দল বেঁধে দাঁড়াতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইট ইট অ্যাণ্ড স্টপ ইট—মানে এই বিকারকে থামাতেই হবে। আজ বর্ণ ও জাতির ভেদাভেদ, উচ্চ ও নীচের পার্থক্য, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের প্রভেদ সব ভুলে যেতে হবে—শুধু একটিমাত্র কথা মনে রাখতে হবে—আমরা হিন্দু-আর-কিছু নয়।'

মিস্টার বোস থামলেন, রুমাল বের ক'রে উত্তেজনা-প্রসূত ঘামকে মুছলেন, সিগারেট কেস থেকে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট বের ক'রে উপস্থিত প্রবীণদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজেও একটি ধরালেন। ইতিমধ্যে তাঁর সারগর্ভ কথাগুলোর প্রশংসা সভার মধ্যে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে আর রুবির চোখের তারাতে দেখা দিয়েছে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রদীপ্তি।

লৌহব্যাবসায়ী বললেন, 'যথার্থ—আপনার কথা অত্যন্ত মূল্যবান। জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নিয়ে মাথা ঘামাবার দিন এখন গেছে—এখন থেকে আমরা সবাই সমান, সবাই হিন্দু।'

মিস্টার বোস বললেন, 'এবার তবে কার্যপদ্ধতি স্থির হোক।'

'ঠিক—ঠিক।' সবাই সমস্বরে সায় দিল ও ঝুঁকে পড়ল।

প্রবীণ অধ্যাপক বললেন, 'পাড়াকে চারটি দলে ভাগ করা হোক, একেকদল একেক দিকে দৃষ্টি রাখবে।' উকিল বললেন, 'সিগনালিং ও বিপদসূচক সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য সাইরেন বা শঙ্খের ব্যবস্থা করা হোক।'

ডাক্তার বললেন, 'একদল যুবক পালা ক'রে রাত জাগবে ও পাহারা দেবে, কোনো বিপদের সূচনা দেখলেই তিনবার শঙ্খধ্বনি করবে ও সঙ্গে-সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠবে। পাড়ার চারদিকে, চারটে প্রান্তদেশের বাড়িগুলোতে লাল বাতি থাকবে, যেদিক থেকে বিপদ আসবে সেদিকের বাতিটাই জ্ব'লে উঠবে।'

ব্যাবসায়ী বললেন, 'আর ওপরতলায় বা ছাদে মেয়েরা, শিশুরা ও বৃদ্ধেরা ইটপাটকেল নিয়ে থাকবে। নিচের তলায় থাকবে অন্যান্য পুরুষেরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে।'

প্রত্যেকের প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল। ডিফেন্স কমিটির মিটিং বেশ এগোচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ যতীন ব'লে একটি ছোকরা বিপদ বাধাল। ছেলেটা খদ্দরটদ্দর পরে, রুক্ষ-রুক্ষ কথা বলে, মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটে।

সে বলল, 'সবই তো করলেন, কিন্তু ওরা যদি এসে আক্রমণ ক'রে বসে তখন তাদের সামনাসামনি কে লড়বেন?'

যেন বোমা ফাটল। ধোঁয়ায় যেন সবদিক আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। ঠিকই তো, এ-কথা তো ক্ষণ-তড়িতের মতোও মনে উদিত হয়নি। সত্যি, এ ভাববার কথা।

ব্যাবসায়ী বললেন, 'কেন? সবাই লড়বো, সবাই নেমে পড়বো।'

প্রবীণ অধ্যাপক মাথা নাড়লেন, 'কথাটা সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। একদল লোককে সর্বদা নিচের রাস্তায় থাকতে হবে, শত্রুর আক্রমণের সঙ্গেই লড়বার জন্যে। অর্থাৎ প্রাণ দেবার জন্যে তাদের সর্বক্ষণই তৈরি থাকতে হবে। সব সক্ষম লোকেরা কি তা থাকবে বা থাকতে পারবে?'

আবার বিস্ফোরণের মতো ধোঁয়া। সত্যি, আসল সংগ্রামটা কারা-কারা করবে? যদি ভয় সত্যি হয়, হাজার-হাজার মানুষ যদি এসে আচমকা আক্রমণ ক'রে বসে, তখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একেকটা বাড়িতে ব'সে ইটপাটকেল আর লাঠি ঘুরিয়ে কি পাড়া বাঁচবে?

যতীন বলল, 'এমন নিখুঁত একটা মিটিং ও ব্যবস্থা ক'রেও আমরা বাঁচতে পারবো না। সুতরাং কী করবেন ভাবুন—

মিস্টার বোস বুদ্ধিমান লোক: লবণ সমুদ্রের পরপার থেকে ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে আসার পর থেকে তাঁর সেই বুদ্ধি আরো ক্ষুরধার হ'য়ে উঠেছে। তিনি দেখলেন যে যতীন যখন খটকাটা বাঁধিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সে সমাধানের পথটাও জানে। আর সত্যি, অত্যন্ত গুরুতরই বটে কথাটা।

মিস্টার বোস বললেন, 'যতীনের কথার যুক্তিকে আমি খণ্ডন করার মতো কিছু পাচ্ছি না, অতএব আমার অনুরোধ যে যতীনই এ-বিষয়ে আমাদের পথ দেখাক—'

যতীন মুচকি হেসে মাথা নাড়ল, 'বেশ, সে-সমস্যার সমাধান আমি করছি। ও-পাড়া আর এ-পাড়ার মাঝে যে-সব গরিব লোকগুলো রয়েছে তাদের খবর কি আপনারা জানেন?'

'ডোমেরা?'

'হ্যাঁ। ওরা ও-পাড়ার নয়, নিজেদের তারা এ-পাড়ার হিন্দুদের দলেই মনে করে, এ-পাড়ার মুখে যে-শিবমন্দিরটি রয়েছে, তাতে তাদের প্রবেশাধিকার না-থাকলেও সেই মন্দিরের বিগ্রহকেই পুজো করে। অর্থাৎ তারা হিন্দু—'

মিস্টার বোস সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে হাসলেন, 'দি আইডিয়া।'

যতীন ব'লে চলল, ওরা অল্প খায়, অল্প পরে, তবু ওরা শক্তিমান। আমরা যে-বৃত্তিটা হারিয়ে ফেলে আজ এত লোক হ'য়েও অসহায় বোধ করছি, ওদের সেই বৃত্তিটা সম্পূর্ণ সজাগ আছে। সুতরাং, যদি সত্যিকার ডিফেন্স কমিটি করতে চান বা বাঁচতে চান, তবে ওদের ডেকে পাঠান। আর ফাণ্ড তুলুন—এখুনি।'

ব্যাবসায়ীর হিশেবি মন নাড়া খেল। 'ফাণ্ড কেন-হে?'

'যে-গোরু দুধ দেয় তার চাঁট খাওয়া ভালো।' যতীন হাসল।

'মানে? খুলে বলো বাপু—' ব্যাবসায়ী বিরক্ত হলেন।

'মানে তো খুব সহজ। ওদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে, ভালো খাবার দিতে হবে, মদ খাওয়াতে হবে।'

মিস্টার বোস সমর্থন ক'রে বললেন, 'কথাটি ঠিক। যারা প্রাণ দেয় তাদের দাবিও মানতেই হয়।'

যতীন জোর দিয়ে বলল, 'আর বেশি ভেবে সময় নষ্ট কববেন না। অত্যাচারকে শক্তির দ্বারাই দমন করতে হয়। সুতরাং আমাদের তৈরি থাকতেই হবে। আর আজকে যে ওরা আক্রমণ করবেই এ-বিষয়ে যেন আপনাদের কোনো সন্দেহ না-থাকে।'

নোট আর মুদ্রার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই পঞ্চাশ টাকা উঠল, আরো টাকা পরে পাওয়া যাবে। কিছু টাকা খাটিয়েই যদি নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়া যায় তবে কে আপত্তি করবে? প্রাণেব চেয়ে দামি আর কী আছে? তা-ই ভালো—খাক ওবা। ভালো খাবার আর ধেনো মদ। এমন বেশি-কিছু নয়। হয়তো আজ রাতেই আক্রমণ হবে। রাতের অন্ধকারে যেন নরক থেকে উঠে আসবে হিংসান্ধ পশুব দল—তখন যারা এই অতি-দামি প্রাণ দিয়ে আর রক্ত ঢেলে তাদের বাঁচাবে তাদের কি এতটুকু সেবা তারা করবে না? নিশ্চয়ই করবে। এ একটা মহৎ কাজ। শুধু বাঁচার আনন্দ নয়, মহৎ কাজের মহৎ আনন্দটাও লাভ হবে এই টাকা ঢেলে। সুতরাং ওরা খাক, মাতাল হোক।

...

ঝগরুর হঠাৎ ক্লান্তি এল। ঢোলটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'হমার নশা বিগড় গেল—'

কাজ নেই আজ। বাড়িতে ব'সে-ব'সে আর কতক্ষণ ভালো লাগে? ভালো লাগে তাড়ি থাকলে। তা ফুরিয়েছে। সুরতিয়া একটু রঙ্গরস করলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু ছোঁড়ি পালিয়ে গেল, বোধহয় তার কাজ আছে। আর ও-সব রঙ্গরসও আজকাল বেশি ভালো লাগে না, যা ভালো লাগে তা মদ। এই নেশা কেটে-যাওয়া, সমস্ত দৃষ্টি স্বচ্ছ-হ'য়ে-আসা, স্তিমিত চেতনায় বাস্তবের স্পর্শ লাগা, মোটেই ভালো লাগে না ঝগরুর। জীবন বলতে যা বোঝায় সেইটেই তার কাছে অস্বাভাবিক—তার কাছে স্বাভাবিক হচ্ছে মদ খেয়ে নেশা করা, মাতাল হ'য়ে মারামারি করা, উলঙ্গ হ'য়ে অশ্লীল গান আর নৃত্য করা, বমি করা আর ঝিম মেরে প'ড়ে-থাকা।

বিশ্রী লাগছে। আবার তাড়ি খেতে হবে। ফিকে-হ'য়ে-আসা নেশাকে আবার গাঢ় ক'রে নিতে হবে।

'সুরতিয়া—আগে সুরতিয়া—'

'কী কহইছ জি?'

'দো আনা পয়সা দে ভাই।'

'না হ্যায়।'

ঝগরু লাফিয়ে উঠল, গর্জন ক'রে বলল, 'চুপচাপ দেবুয়া কি নেহি বোল, জ্যাদা টাঁয়টোঁয় মত কর সুরতিয়া—'

সুরতিয়াও সমানে ঝংকার দিয়ে বলল, 'টাঁয়ভি না কইরেছি, টোঁয়াভি না কইরেছি —বাত পাক্কা বৌলেছি কি পয়সা না হ্যায়।'

'হারামজাদি কাঁহাকা—' হঠাৎ ঝগরু সুরতিয়ার ছোট্ট বেণীটা ধ'রে টান দিল, তার পিঠে জোর ক'রে বসাল কয়েক ঘা।

'আইগে মাইয়া গো—মার ডালা বে—' সুরতিয়া চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। তার অত-জোর চ্যাচানোটা উচিত হয়নি, কিন্তু সুরতিয়ার ধরনই আলাদা—তিলকে তাল করাই তার পুরাতন রীতি।

'বোল পয়সা দেবুয়া কি নেহি, বোল চুড়ৈল কঁহিকা—'

ডোমপাড়া আবার সচেতন হ'য়ে উঠল, সশ্রদ্ধ সুরে আবার তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সর্দার জরুকো পিটত হ্যায় জি, পিটত হ্যায়—'

ঠিক সেই সময়েই দু-তিনজনের ডাক শোনা গেল, 'ঝগরু আছো, ঝগরু—'

সুরতিয়ার চীৎকারের চোটে সে-ডাক শোনা যায় না। আবার শোনা গেল সেই ডাক, এবার আহ্বানকারীদের কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় চড়েছে, 'ঝগরু সর্দার আছো, ঝগরু?'

সুরতিয়া কান্না থামাল, বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কৌন সব তুমকো বোলাওয়ৎ হ্যায় জি'—

'হামকো?'

'হাঁ। ভদ্দরলোগ।'

'ভদ্দরলোগ!'

সে হঠাৎ সংযত হবার চেষ্টা করতে লাগল, বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তিনজন অপরিচিতের সামনে। তাদেব মধ্যে যতীনও ছিল।

'তুমিই ঝগরু?'

'হাঁ, হামিই সেই।'

'তোমাকে ডাকছে।'

'কৌন ডাকছে?' কিছু বুঝতে পারল না ঝগরু।

'বোসসাহেব, ব্যারিস্টার। চেনো না তাঁকে?'

ঝগরুর চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল, মাথা দুলিয়ে বলল, 'আয়রে বাপ, কেন চিনবো না তাকে? চিনছি হামি—'

'তিনি ডাকছেন তোমায়—এখুনি—'

'হামকে? আয়রে বাপ, হামি তো ঝগরু ডোম আছি, হামাকে কেনে?'

'দরকার আছে। যাবে না?'

'হাঁ-হাঁ,যাবে বৈকি, জরুর যাবে। ব্যারিস্টার সাহেব বুলিয়েছে, আয়রে বাপ—'

'সেলাম হুজুর, সেলাম বাবুলোগ—'

ঝগরু এসে দাঁড়াল পাড়ার ডিফেন্স কমিটির সামনে। তখনও তার বেশ নেশা রয়েছে, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলতে লাগল সে। সবাই তাকাল তার দিকে। কেশবিরল মাথায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম চকচক করছে তার, ছোটো-ছোটো চোখের তারা দুটো এদিক-ওদিক ঘুরছে কৌতূহলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, গায়ে একটা মোটা কাপড়ের ফতুয়া, বাঁ গালে একটা ফোঁড়ার চিহ্ন। এই ঝগরুর চেহারা।

রুবি এসে আবার পরদার পাশে দাঁড়িয়েছে। নাকটা কুঁচকে সে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'হাউ আগলি অ্যাণ্ড ডার্টি—'

সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে ছুঁচের মতো বিঁধছে ঝগরুর গায়ে।

সে হেসে বলল, 'হুজুর মাপ করবেন, হামি একটু তালের রস খেয়ে মাতোয়ালা হয়েছে—'

মিস্টার বোস সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তুমিই ঝগরু?'

'জি হাঁ—ঝগরু ডোম।'

'তুমি মাতাল হয়েছো?'

'আগিযা হাঁ—'

'তুমি মদ খেতে ভালোবাসো?'

মাথা নিচু ক'রে হেসে বলল ঝগরু, 'আগিয়া হাঁ হুজুর।'

কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন মিস্টার বোস, 'তুমি ডোমদের সর্দার?'

'জি—'

'তবে শোনো ঝগরু, তোমাকে এবং তোমার লোকদের আমরা মদ খেতে দেবো —যত চাও। কিন্তু মদের জন্যই নয়, খাবার জন্যও টাকা দেবো তোমাদের।'

ঝগরু কি স্বপ্ন দেখছে? সে থতমত খেয়ে গেল, তাকাল চারদিকে। না, সব সত্যি মনে হচ্ছে। সে কি বেশি নেশা করেছে? দূর, এক লবনি তাড়িতে তার গলাও ভেজে না। মিথ্যে নয়, সবই সত্যি, বাস্তব।

'হুজুর বড়ো মেহেরবান, লেকিন—'

মিস্টার বোস বাধা দিয়ে মাথা নাড়লেন, 'বলছি। দাঙ্গা হচ্ছে, জানো তো ঝগরু?'

ঝগরু মাথা নাড়ল।

'আজ রাতে হয়তো ওরা আসবে।'

'জি—'

'আমরা হিন্দু, তোমরাও হিন্দু।'

'আগিয়া—'

'হিন্দুকে হিন্দু না-বাঁচালে কে বাঁচাবে, বলো?'

'জরুর, জরুর, হুজুর।'

'যদি ওরা আসে তোমরা লড়বে তো? আমরা—আমরাও অবশ্য যোগ দেবো, সবাই এক-সঙ্গেই লড়বো।'

হঠাৎ মিস্টার বোস দেখলেন যে উপবিষ্ট সবার মাঝে ঝগরুই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ও-কী? তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, ঝগরু? বোসো বোসো—'

আশ্চর্য হ'যে গেল ঝগরু, আকস্মিক এই অভ্যর্থনায় হকচকিয়ে গেল সে, আমতা-আমতা ক'বে বলল, লেকেন—'

'কিছু না, কিছু না, লজ্জা কোরো না, বোসো—'

'হামি ডোম আছি, হুজুর—'

'ডোম?' মিস্টাব বোস চোখ কপালে তুললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, 'ডোম, তাতে কী? তুমিও আমাদেব মতো মানুষ, আমাদেরই মতো হিন্দু—বোসো. বোসো ভাই—'

হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে তিনি উঠে এগিয়ে এলেন, বিস্মিত ঝগরুর হাত ধ'বে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ঝগরু কথা বলতে গেল, কিন্তু কথা বেরোলো না তাব গলা দিয়ে। কড়া নেশা ক'রেও যে অনর্গল কথা ব'লে যায়, আজ সেই ঝগরু বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায়, অনাস্বাদিত এক আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলল।

নোটের খশখশ শব্দ শোনা গেল।

একটু বাদেই সেখান থেকে বেরোলো ঝগরু।

বাড়ি ফেরবার সময় বস্তির নিকটবর্তী শিবমন্দিরের সামনে দিয়ে চলতে-চলতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছে। মন্দিরের নোনা-ধরা দেওয়ালেব উপর হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে একবার হাসল। বিড়বিড় ক'রে তারপর বলল, 'শিউজি—তু বড়া ভালা আছে, বড়া ভালা—'

...

বস্তির সবাই হঠাৎ উৎসবে মেতে উঠল, রামপ্রসাদ সিংয়ের ভাটিখানা একঘণ্টায় উজাড় হ'য়ে গেল। নিঃশেষ হ'য়ে গেল বানোযারা হালুয়াই আর তেওয়ারির দোকানের খাবার।

মাঝে-মাঝে কোলাহল ভেসে আসে। উন্মত্ত তাণ্ডবের ধ্বনি—'আল্লা-হো-আকবর!' দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মতো সে-ধ্বনি মাথার ওপর দিয়ে তরঙ্গ গর্জনের মতো গড়িয়ে যায়।

মাঝে-মাঝে দু-একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। আর গভীর রাত্রির এই নিঃশব্দ ও অন্ধকার মুহূর্তে ডোমপাড়ার সর্দার জেগে ব'সে থাকে। তার দু-চোখ সামনের দিকে প্রসারিত, কান রয়েছে সমস্তরকম শব্দ ও প্রতিশব্দের দিকে।

রাত একটা নাগাদ যুদ্ধ ঘোষণা করল ওরা।

'আল্লা-হো-আকবর—'

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ—'

ঢোলকে ঘা দিল ঝগরু। ডুম ডুম ডুম ডুম।

সমস্ত ডোমপাড়া জেগে উঠল। নিঃশব্দে ছুটে বেরোলো, সবাই একত্রিত হ'ল।

ওরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে এল। এল মশাল জ্বালিয়ে। নরকের একটা বিভীষিকাময় অংশও নেমে এল তাদের সঙ্গে। আদিম অরণ্যের যত রক্ত-তৃষাতুর অশরীরী সবাই যেন আজ ওদের মস্তিষ্কের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে।

শিবমন্দিরটাকে লক্ষ্য ক'রেই ওরা প্রথমে এগিয়ে এল, উদ্দেশ্য মন্দির ধ্বংস করার পর পাড়াকে ধ্বংস করবে।

সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। সাইরেন বাজতে লাগল, অট্টালিকা শীর্ষে লাল বাতিগুলো থেকে আতঙ্কের রক্তদ্যুতি বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল, ছেলেমেয়েদের কান্না শোনা গেল, দুড়ুম-দাড়াম ক'রে দরজা-জানালা বন্ধ হ'তে লাগল, ধাবমান পদশব্দ ধ্বনিত হ'ল, আর ধ্বনিত হ'ল শঙ্খ। সমস্ত পাড়া ভয়ার্ত হুংকার ছাড়ল, 'বন্দেমাতরম'—যে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেশকে মুক্ত করতে চায় ওরা, আজ সেই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ওরা দেশের লোককেই মারতে চাইল।

ঝগরুর ঢোলক তখন থেমেছে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে ওরা।

'শোরগোল মত কর ভাই—নজদিক আনে দে—' ঝগরুর নির্দেশ ধ্বনিত হ'ল।

'আল্লা-হো-আকবর—'

হঠাৎ বন্যার মতো ওরা সবাই ধেয়ে এল। মশালের আলোতে মধ্যাহ্নের সূর্যালোকের মতো ওদের ঝকঝকে ছোরা আর তরোয়াল ঝলসে উঠল।

ঝগরু দুলছিল ওদের বাজনার তালে-তালে, এবার বলল, 'অব লগ যা ভাই—জঞ্জাল সাফ কর্—'

ধ্বনি উঠল ঝগরুর দলের।

যে-শিবমন্দিরের ভেতরে কোনোদিন ঢুকতে পারেনি তারা, যে-শিবঠাকুরের মন্দিরের নোনা-ধরা দেওয়ালের ওপর হাত বুলিয়ে আর মাথা ঠুকেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে তারা, যে-নির্বাক প্রস্তর দেবতা তাদের এই বঞ্চিত দুভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদই জানায়নি, আজ ঝগরু সেই দেবতারই জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

'হর-হর মহাদেও—জয় শিউজিকি জয়—'

তারপর যেন দুটো পাহাড়ে সংঘর্ষ ঘটল। মাটির পাহাড় নয়, আদিম পৃথিবীর লৌহকঠিন পাথরের পাহাড়।

রক্তের ঢল নামল। হাত, পা, মাথা ছিটকে-ছিটকে পড়ল। চূর্ণীকৃত মাথা থেকে ঘিয়ের মতো ঘিলু গড়াল, বুকের ভেতরকার রক্তমাংসকে চুম্বন ক'রে ধারালো ছোরারা বিজয়ী হ'য়ে বেরিয়ে এল।

মাথার ওপরকার অনন্ত নীলাকাশে অনেকগুলো নক্ষত্র তখন কাঁপছে। নিঃশব্দে লঘু মেঘের টুকরোগুলো ভেসে যাচ্ছে। কোথাও নিশ্চয়ই এই রাতের অন্ধকারে ফুল

ফুটছে, কোনো শিশু ঘুমোচ্ছে, কোনো প্রেমিক তার প্রেয়সীকে বুকে টেনে নিয়ে নিথর হ'য়ে প'ড়ে আছে, নিশ্চয়ই মানুষেরা কোথাও এখন স্বপ্ন দেখছে, গান গাইছে, পরস্পরকে ভালোবাসছে। অথচ—

...

দাঙ্গা থেমেছে। ওরা হার মেনে পিছু হ'টে গেছে। ঝগরুর দল ওদের আস্ফালনকে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে। শিবমন্দির অক্ষত রয়েছে।

কিন্তু মরেছে অনেক। ওরাও মরেছে, এরাও মরেছে। এরা, মানে ডোমেরা। ভদ্র বাবুরা পেছনের ঘাঁটি আগলে ছিল, বিপদ ততদূর এগোয়নি। এগোলে ওরা নাকি নিশ্চয় যুদ্ধ করত. প্রাণ দিত।

পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে প'ড়ে আছে শবদেহ। বাতাসে চাপ-চাপ রক্তের তাজা গন্ধটা বেশ ভালো ক'রে পাওয়া যাচ্ছে।

মিস্টার বোসের বাড়িতে গেলে দেখা যাবে যে বাইরে তাঁর মোটরটা এসে দাঁড়িয়েছে আসন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট আলো-আঁধারে। আর তারই পাশে আছে একটা মিলিটারি ট্রাক, তাতে চারজন সৈনিক।

মিস্টার বোস দ্রুতকণ্ঠে বললেন, 'কই, তোমরা কি তৈরি, রুবি? শিগগির এসো--মিলিটারি এসর্কট আর-বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না।'

রুবি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, উই আর রেডি। চলো, মা। জানো বাবা, মা টের্‌রিব্‌ল শক পেয়েছেন।'

সবাই বেরোলো।

মিস্টার বোস বললেন, 'স্বাভাবিক, কোয়ায়েট ন্যাচারাল। আমিও কি সুস্থ আছি ভাবছো? ভগবান বাঁচিয়েছেন ব'লেই রক্ষা পেলুম, চলো, হারি আপ—'

গাড়িতে চড়লেন মিস্টার বোস।

গাড়ি ছুটল। ওঁরা ভবানীপুর যাবেন।

অরুণ বলল, ঝগরুই বাঁচালো বাবা—উঃ, লোকটা সাংঘাতিক ফাইট দিয়েছে—'

মিস্টার বোস সিগারেট ধরালেন, এতক্ষণ সে-রকম মানসিক অবকাশ তাঁর ছিল না, ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'হুঁ—এ ওদেরই কাজ, এ কি তোমরা পারতে কখনও? সারটেনলি নট। যাক, লোকটাকে টাকা-পয়সা আমরা ভালোই দিয়েছি। হি ওয়াজ ওয়েল-পেইড।'

রুবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, বাঁচা গেল, পিকনিক পার্টি আর সিনেমা তাহ'লে জীবন থেকে মুছে যাবে না, প্রজাপতির আয়ু তবে শেষ হয়নি।

ওদের গাড়ি দূরে মিলিয়ে গেল।

...

তখন ডোমপাড়ায় মহাভারতের নারীপর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বহু, বহু নারী হারিয়েছে তাদের বাপ, ভাই, স্বামী ও পুত্রদের। আগুনের শিখার

মতো কাঁপতে-কাঁপতে একটা বিলাপের ধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে।

সুরতিয়াও কাঁদছে। ঝগরু মারা গেছে।

হ্যাঁ, ঝগরু মারা গেছে, কারণ মিস্টার বোসদের বাঁচাবার জন্যই তো ঝগরুর মতো মানুষরা চিরকাল জন্মায় আর মরে। পঞ্চ নিষাদ বান না-দিলে তো রাজপুত্র পাণ্ডবেরা বাঁচতে পারত না।

# উলুখড়

## নবেন্দু ঘোষ

আজিজ চুপ ক'রেই রইল। জোহরাকে সে চেনে: সে জানে যে জোহরা যখন রেগে যায় তখন তাকে কিছু না-বলাই ভালো, এমনকী সে যদি অন্যায় কথাও বলে তবু তা নীরবে শুনে-যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে যারা বড়ো হয় তারা দুঃখে, অভাবে, স্বপ্নশেষের ব্যর্থতায় মাথা ঠিক রাখতে পারে না। জোহরারও সেই অবস্থা। শৈশবে-কৈশোরে সে লায়লা-মজনুর, শিরিন-ফারহাদের কাহিনী পড়েছিল, পড়েছিল আরব্য-রজনী ও হাতেম তাই-এর কাহিনী, আর সেই-সব কাহিনী প'ড়ে-প'ড়ে সে মনের মধ্যে হাওয়াই কেল্লা তৈরি করেছিল, অনেক অসম্ভবকে তার জীবনে সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বেচারা আজিজ: ট্র্যামের কনডাক্টর আজিজের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে সেই হাওয়াই কেল্লা হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছে, সেই-সব বহু বিচিত্র স্বপ্ন আজ ধোঁয়ার মতো কোথায় উড়ে গেছে।

তবু চলছিল। বাস্তব যতই রূঢ় হোক, অসহ্য হোক, বেঁচে-থাকার একটা আনন্দ আছে। কঠিন পরিশ্রমের পর, বস্তির একটা স্বল্প-পরিসর নোংরা ঘরে, কেরোসিনের ডিবার ধোঁয়াটে অস্পষ্ট আলোতে জোহরার অতীত-স্বপ্ন আজিজের চোখেই ঘনায়। আজিজ অবাক হ'য়ে যায়। এ কী-স্বপ্ন দেখছে সে! জোহরা কি সেই-সব বিচিত্র বিচিত্র কাহিনীরই কোনো-একটি নায়িকা। আর তার পাশে তার মেয়ে রাবেয়া যেন বেহেস্তের এক ছদ্মবেশী পরি। আশ্চর্য! আর জোহরা! অবশ্য স্বপ্ন দ্যাখে না সে, অল্প আয়ের সংসারের খুঁটিনাটি তো আজিজ তার চেয়ে বেশি জানে না। সে-শুধু জোহরাই জানে যে তিনটি পেট চালাতে আজকালকার এই বাজারে কী বেগ পেতে হয়। তবু চলছিল, গড়িয়ে-গড়িয়ে, থিতিয়ে-থিতিয়ে, বেঁচে থাকাটাকেই একটা বড়ো ব্যাপার মনে ক'রে, পরস্পরকে ভালোবেসে।

কিন্তু হঠাৎ সেই বেঁচে-থাকার ব্যাপারটাই সন্দেহজনক হ'য়ে উঠল এবং তা সন্দেহজনক হওয়ায় ভালোবাসাটা পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠল, মনে হ'ল যে যাদের আজিজ ভালোবাসবে তাদের সে যদি পেট ভ'রে না-খাওয়াতে পারে তাহ'লে সে-ভালোবাসা যেন একটা অপরাধ। কেন? স্ট্রাইক—ধর্মঘট। ট্র্যাম কম্পানির শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। কম্পানির শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাফিলতি ও অবিচার আর সহ্য করা যায় না, আর সহ্য হয় না দীনভাবে তাদের হীন প্রাণকে বাঁচিয়ে-রাখা।

ধর্মঘট চলছে। একদিন দু-দিন ক'রে আজ দু-মাস অতিক্রান্ত হ'তে চলেছে। দিনের পর দিন কাটলে, সঞ্চিত যা-কিছু ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল, অবশেষে দিন পনেরো বাদে পেটে টান পড়ল। তখন অনন্যোপায় হ'য়ে আজিজ একটা কাজ শুরু করল। যা-কিছু শেষ সম্বল ছিল তাই দিয়ে সে কিছু মনিহারি জিনিশ কিনে শিয়ালদার মোড়ে

গিয়ে ফুটপাথের ওপর বিছিয়ে বসল, হিশেব ক'রে দেখল যে দৈনিক টাকাখানিক লাভ হ'লেই তার বেশ চ'লে যাবে। তাছাড়া উপায় কী, ধর্মঘট যে অনেকদিন চালাতে হবে তা তারা বুঝতে পারছে, তাছাড়া অন্যান্য সবাই কিছু-না-কিছু একটা উপার্জন করার চেষ্টায় আছে। বাঁচতে হবে তো, অন্তত এই ধর্মঘটটায় জেতবার জন্যই বাঁচতে হবে।

তবে মাঝে-মাঝে মনে একটা প্রশ্ন জাগে: কতদিন? মালিকেরা এবাব ভেবেছে যে যতদিন লাগবাব লাগুক, না-খাইয়েই শ্রমিকদের তাবা শায়েস্তা কববে। তাই প্রশ্ন জাগে মনে: কতদিন? আর আজ জোহ্‌রা যে-সব কথা উত্তেজিতভাবে তাকে বলছে তাবও মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন বাবংবার ধ্বনিত হচ্ছে। কতদিন, আব-কতদিন?

জোহবা, হঠাৎ থামল, কী ভেবে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কাল বিশ তারিখ, হ্যায় না?'

—'হাঁ।'

—'কাল সবকো কামমে শবিক হোনেকা ওয়াস্তে কম্পানি নে নোটিস জারি কি হ্যায়?'

'হাঁ'—আজিজ জোহবাব কথাব মোড় ঘুবে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল।

—'তব তুম যা বহে, হো না?'

মাথা নাড়ল আজিজ, কথাব মোড় আবার ঘোরাবাব জন্য সে বাবেয়াকে ডাক দিল —'বেটি—এদিকে আয়, আয়—'

পাঁচ বছরের রাবেযা তখন একটা কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। বহুদিনের পুরোনো পুতুল, ছিঁড়ে গেছে, তবু তাই নিয়েই খুশি আছে রাবেয়া। সেই পুতুলকে নিযেই তার সময় কেটে যায়, সারাক্ষণ সে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে-বাপ তাকে চোখের মণির চেয়েও দুর্মূল্য মনে করে তাকেও অনেক সময় ভুলে যায় রাবেয়া। আজিজ হাসল মেয়ের আত্মসমাহিত ভাব দেখে।

—'এদিকে আয় বেটি—ইধার আ—' আজিজ আবার ডাকল।

কিন্তু জোহরা স্বামীর মাথা নাড়ার অর্থ বোঝেনি। এমনভাবে মাথা নেড়েছিল আজিজ যার অর্থ এক সঙ্গে 'হ্যাঁ' এবং 'না' হ'তে পারে। বাঁকা ভুরু দুটোকে আরো-কুঁচকে সে আবার জিজ্ঞেস করল—'ক্যা, তুম নেহি যাও গে?'

আজিজ এবার সোজা তাকাল স্ত্রীর দিকে, মৃদুকণ্ঠে বলল—'নেহি।'

—'লেকিন কিঁউ?'

মেয়েকে কোলের কাছে টেনে আজিজ বলল—'কিঁউ তুম তো জানতি হো।'

—'তোমরা হার মানবে না, এই তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু ক-দিন চলবে এমনিভাবে? ক-দিন?'

—'যতদিন চলবার চলুক—যতদিন ওরা হার না-মানে, ততদিন।'

—'তব খাওগে ক্যা?' জোহরা এবার চেঁচিয়ে উঠল, যেন চেঁচিয়েই সে স্বামীকে

হার মানাবে, ট্র্যাম কম্পানির কাছে তার স্বামী হার মানে না ব'লে যে তার কাছেও হার মানবে না এ-কথা ভাবতে জোহরার রাগ আরো বেড়ে যায়। সে না-হয় বুঝল সব, কিন্তু কথায় হার মানতে দোষ কী?

কিন্তু জোহরার চিন্তাটা তো সরব নয়, তাই আজিজ ও-ধার দিয়ে গেলই না, বলল— 'কেন, তোমায় কি না-খাইয়ে রেখেছি?'

জোহরা অবাক হবার ভান করল—'এমনিভাবে রাস্তায়-রাস্তায় জিনিশ বিক্রি ক'রে বেড়াবে? পেট ভরবে তাতে?'

আজিজ হাসল— 'না-হয় আধপেটা খাবো।'

কথা খুঁজে পেল না জোহরা, খানিকক্ষণ ক্রোধে সে চুপ ক'রে রইল, দুটো চোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল তার, তারপরে বলল—'তব তুমহারা যো খাইস্ করো—ভিখ মাংগো, ভুখ্খে মরো—দিল মে যো হ্যায় বহি করো—' ব'লেই সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে নয়, গেল রান্নাঘর ব'লে যে খুপরির মতো ছোট্ট ঘরটা সেখানে, সেটাই জোহরার গোঁসাঘর।

বিবির যাওয়ার ভঙ্গি দেখে নীরবে হাসল আজিজ। রাগ করতে সে পারল না, একটা কথা ব'লে জোহরার রাগকে আরো বাড়াবার মতো দুঃসাহসও তার হ'ল না, তাই সে শুধু হেসেই থেমে গেল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল— 'কী বেটি, তোর পুত্‌লা কেমন আছে?'

ঘাড় বেঁকিয়ে রাবেয়া গম্ভীরভাবে বলল—'ভালো।'

মেয়ের দিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকাল আজিজ: পুতুলের মতোই রাবেয়ার জামা আর পাজামাটা ছিঁড়ে গেছে, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রুক্ষ চুলগুলো দেখে বুকটা হু-হু করে তার। ছোটো-একটা নথ-লাগানো ময়লা মুখটায় একজোড়া জ্বলজ্বলে তারার মতো দুটো চোখ। আর দুটো লালচে ঠোঁট। আজিজের দরিদ্র সংসারে একটিমাত্র ঐশ্বর্য ঐ মেয়েটা। প্রথম যৌবনের সেই উজ্জ্বল, রঙিন দিনগুলো আর নেই, তখন জোহরাই ছিল সব। আজকাল রাবেয়াই সব। অথচ—

'—বেটি—'

—'আব্বাজান?'

—'তোর একটা নতুন পুতুল হ'লে বেশ হয়, তাই না?'

—'হ্যাঁ—' মৃদুকণ্ঠে বলল রাবেয়া।

—'দেবো—শিগগিরই এনে দেবো তোকে। যেদিন আমাদের ধর্মঘট থামবে, সেদিন আমার প্রথম কাজ হবে তোকে একটা নতুন পুতুল এনে দেওয়া, বুঝলি?'

রাবেয়ার দু-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বাপের গলা জড়িয়ে ধ'রে সে বলল —'সত্যি?'

'হাঁ, বেটি-জরুর। আচ্ছা, তখন এই পুরোনো পুতুলটা দিয়ে কী করবি? ফেলে দিবি?'

রাবেয়া চট ক'রে জবাব দিল না। সে তাকাল ছেঁড়া পুতুলটার দিকে, একবার হাত বুলোল তার গায়ে, পরে মাথা নেড়ে বলল—'উহু, নেহি। এও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।'

এতদিনকার পুতুলটা—সুখদুঃখের কত মুহূর্তের সঙ্গী। আজ একটা নতুন পুতুল এলেই কি এর দাম ক'মে যাবে! উঁহু। রাবেয়া অকৃতজ্ঞ নয়। না, পুরোনাটাও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।

—'আচ্ছা বেটি—তুই খেলা কর, আমি এবার যাই।'

—'কাঁহা আব্বাজান?'

—'কুছ রুজি রোজগারকা বন্দোবস্ত করনে—' তারপর সে তার হারেমের গোঁসাঘর মানে খুপরির মতো রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—'আ জি, শুনতে হো?'

জবাব এল—'নেহি।'

—'খপা ন হো বিবি—ম্যয় চলতা—'

জবাব নেই।

—'শুনা জি—রাবেয়াকে বাপনে অব চলা—'

জবাব এল—'ম্যয় নেহি শুনতি—'

আজিজ সশব্দে হেসে বলল—'ব্যস-ব্যস, কাফি শুনি—অব ম্যয় চলা।'

ঘরের কোণ থেকে দুটো বড়ো পোঁটলা মতো তুলে নিয়ে সে একবার মেয়ের চিবুকটা ধ'রে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ পেছন-পেছন জোহরা এগিয়ে এল না, কিন্তু পাঁচ বছরের রাবেয়া তার ছেঁড়া পুতুলটাকে বাঁ হাত দিয়ে বুকে চেপে ধ'রে এগিয়ে এল দরজা পর্যন্ত। দরজায় হেলান দিয়ে সে ঠিক মায়ের ভঙ্গিতেই তাকাল বাপের গমন-পথের দিকে। তার কচি মুখে একটা গম্ভীর ভাব, যেন তার বয়স নেহাৎ কম নয়, যেন মানুষের দুঃখ-কষ্টের সমস্ত ইতিহাসই সে জেনে ফেলেছে।

চলতে-চলতে একবার পেছন ফিরে তাকাল আজিজ। নেহাৎই অভ্যাস। তাকিয়ে সে যা দেখল তাতে তার বুকটা ফুলে উঠল, দুলে উঠল, চোখে জল এল। তার আর দুঃখ করার নেই। অনেক দুঃখ পেয়েছে সে, অনেক লড়াই করেছে, হয়তো আরো দুঃখ পাবে, আরো লড়াই করতে হবে। কিন্তু সমস্ত দুঃখের মাঝে একটা অপরূপ ফুল ফুটেছে তার জীবনে। ঐ মেয়েটা। তার দেহেরই একটা অংশ। কাঁটার বেদনাকে যেমন একটা রক্তগোলাপ ভুলিয়ে দেয় তেমনিভাবে ঐ মেয়েটা তার দুঃখদীর্ণ জীবনকে সার্থক ক'রে তুলেছে। জোহরার পরে আরেকজন তবে দেখা দিয়েছে যে আজিজকে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

...

শিয়ালদা আর বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে বাঁদিককার ফুটপাথের একপাশে আজিজ বসল,

পোঁটলাদুটোকে খুলে বিছোল, জিনিশপত্রগুলোকে সাজাল। পেনসিল, ব্লেড, ন্যাপথালিন, ছুঁচ, বোতাম, খেলনা, বল, উর্দুতে লেখা ছোটো-ছোটো গান আর গল্পের বই, চিরুনি, জুতোর কালি, জিভছোলা—এমনি নানা জিনিশ। লাইসেন্স নেই, তবে টহলদারি পুলিশদের দু-এক আনা দিলেই সব ঠিক থাকে।

তার আশেপাশে আরো নানা রকমের বিক্রেতা। জুতোপালিশ করনেওয়ালা দুজন, একজন লুঙ্গি-বিক্রেতা, দু-তিনজন কমলালেবু বিক্রি করছে, একজন একঝুড়ি ডাব নিয়ে বসেছে, এমনি আরো কয়েকজন আছে। সারা জীবন ধ'রে, দিনের পর দিন, ওরা এমনি ফুটপাথে ব'সে জিনিশ বিক্রি করে, সংসার চালায় এমনি জীবিকাকে অবলম্বন ক'রে। ওদের কোনো ঘর নেই, মাথার ওপর নেই কোনো আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের আগুন আর বর্ষার জল দেখে ওদের জীবনসংগ্রাম থেমে যায় না। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে, ভেঙে-চুরে, ওরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

খেয়ে-দেয়ে এসেছে আজিজ। একেবারে সন্ধের সময় বাড়ি ফিরবে ব'লে ও-পাট সে চুকিয়ে বেরিয়েছে। এখন অফিসটাইম। জনস্রোত ক্ষিপ্রগতিতে ব'য়ে চলেছে। মানুষের জীবন-নদীর এ এক বিচিত্র রূপ। বাসে ঝুলতে-ঝুলতে চলেছে সবাই, জায়গায় কুলোচ্ছে না। সে-অবস্থাতেও গেলে তো হ'ত, কিন্তু তা-ই বা হচ্ছে কোথায়? বেশির ভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে। প্রায় দৌড়োতে-দৌড়োতেই বলা চলে। কেন? আগে তো এমন হ'ত না।, শতকরা প্রায় নব্বই জন লোকই কোনো-না-কোনো কিছুতে চ'ড়ে যেত। তবে? আজিজ তাকাল রাজপথের দিকে। ট্রাম লাইন। দু-মাস আগে সেগুলো চকচক করত এ-সময়টাতে, তার খাঁজে-খাঁজে আজ ময়লা, আজ তার দীপ্তি অন্তর্হিত। আজিজ তার বুকের ওপর হাত রাখল। সেফটিপিনে আঁটা একটা লাল কাগজ—তাতে লেখা 'ধর্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। আজ ট্রাম চলছে না, দু-মাস ধ'রে চলছে না। লক্ষ-লক্ষ নাগরিকের সেবা ক'রেও তারা সসম্মানে বাঁচতে পারছে না ব'লে আজ ট্রাম চলছে না। আজ ইলেকট্রিকের তারে বিদ্যুতের আগুন জ্বলছে না, পিচের পথ কাঁপছে না, শব্দ উঠছে না খটাংখট ঘটঘট, ঘণ্টা বাজছে না টং টং টং। আজ সব শান্ত, স্তব্ধ। শুধু বাসগুলো একা তাল সামলাতে গিয়ে খ্যাপার মতো ছুটোছুটি করছে, রিকশাওয়ালার গলদঘর্ম হচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ি আর ট্যাক্সী যা-ইচ্ছে-তাই দর হাঁকছে। আজ সব নীরব। ট্রাম চলছে না। *এবং তাদের সম্মান না-করলে ট্রাম চলবেও না, একটাও না।*

জিনিশপত্রের সামনে চুপ ক'রে ব'সে থাকে আজিজ। বড়ো অদ্ভুত লাগে তার এই নতুন বৃত্তিটাকে। অন্যমনস্কভাবে সে তাকায় চারদিকে। অনতিদূরে শিয়ালদা স্টেশন। তার ওপরকার আকাশে কালো ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ। শিয়ালদা ট্রাম ডিপোর দেয়ালের পাশে একটা মস্তবড়ো বিজ্ঞাপন—তাতে একটি সুদর্শনা নারীর মুখ। ও-ফুটপাথের একজন ফলওয়ালা তার আপেলগুলোকে মুছছে। বেলা বাড়ছে। চৈত্রমাসের রোদ যেন উত্তপ্ত ছোরার মতো।

—'ওহে, পেনসিলগুলো কত ক'রে?'

আজিজের চমক ভাঙল। একজন ক্রেতা।

এমনি আরো-অনেকে আসে।

—'ব্লেডের প্যাকগুলো কত ক'রে—ঐগুলো?'

—'এক টাকা—'

'এক টাকা। বলো কী হে—অ্যাঁ?'

এমনি আরো-অনেক ক্রেতা আসে। কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

সময কেটে যায়। একটা-দুটো জিনিশ বিক্রি কবে আজিজ, আবাব অন্যমনস্ক হ'য়ে তাকায় চারদিকে। বেলা বাড়তে থাকে। অফিসটাইমেব ভিড় একটু কমেছে-তবু জনতা কম নয। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে রৌদ্রের প্রখর তেজ আবো বেড়ে যায়, তেলের মতো ঘাম বেরোয সাবা গা দিয়ে, জ্বালা করে, কানদুটো গবম হ'যে ওঠে। সংগ্রাম। একটা সংগ্রামকে জযযুক্ত কবাব জন্যই এই সংগ্রাম কবছে আজিজ এবং তাব সহকর্মীরা। কুড়ি তাবিখ। কম্পানি নোটিস দিয়েছে যে ঐ তাবিখে যাবা-যারা যোগ দেবে না তারা বরখাস্ত হবে। নীববে হো-হো ক'বে হাসে আজিজ। তাকায পেছনকাব দেযালের দিকে, যাব ওপর প্রাচীরপত্রে লেখা আছে যে দালাল দিযে ট্র্যাম চলবে না, ট্র্যাম জ্বলবে। গুলিবারুদকে ভয় করে না তারা, দরকাব হ'লে ঐ লোহার লাইনের ওপর রক্তেব বাঁধ তৈরি কববে তাবা। সত্য জয়ী হবেই, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই।

—'দো-দো আনা লে যানা, মিঠা কেঁওলা খা যানা—'

আজিজ তাকাল। একজন কমলালেবু বিক্রেতা সুর ক'বে আউড়ে যাচ্ছে—ক্রেতাদেব আকৃষ্ট করার জন্য। ঝকঝকে মসৃণ কমলালেবু। আজিজ একটা কিনবে তার রাবেযাব জন্য। কী-রকম খুশি হবে মেয়েটা! কল্পনা ক'রে হাসে আজিজ।

—'রসগুল্লাভি হার মানা, শ্বশুরবাড়ি লে যানা, দো-দো আনা লে যানা—' এক ভাবে সুর ক'রে আওড়াচ্ছে লোকটা আর বাস্তার লোকেরা হাসছে তাব কথায়।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল আজিজের মাথায়। এইসব জিনিশ বিক্রি ক'রে তাব যা আয় হয তাতে আর চলে না। অথচ ধর্মঘট যে কতদিন চলবে তার স্থিরতা নেই। আরো-কিছু উপার্জন করতে হবে। কী ক'রে? আচ্ছা, ঐ লোকটার মতো সেও যদি কমলালেবু বিক্রি করে? হুঁ, মন্দ হবে না। সে হয়তো চ্যাঁচাতে পারবে না এমনভাবে, তবু কিছু তো বিক্রি হবেই। ঠিক, তা-ই করবে সে। মনস্থির ক'রে ফেলল আজিজ।

লুঙ্গি বিক্রেতা অনেকক্ষণ ধ'রে চুপচাপ ব'সে ছিল, তার আজ তেমন বিক্রি হচ্ছে না। আজিজের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'বড়ো গরম, না মিঞা?'

—'হাঁ—'

'হুঁ—' লোকটা স্বল্পভাষী।

খট খট খট। হঠাৎ একজন পুলিশ এসে দাঁড়াল পেছনে। কেউ তাকে আসতে দ্যাখেনি, তাই হঠাৎ তাকে দেখে সবাই একটু হকচকিয়ে গেল। পুলিশের এই আকস্মিক উপস্থিতি বড়ো সন্দেহজনক ব্যাপার তাদের কাছে। আর সবচেয়ে বেশি ঘাবড়াল আজিজ।

পুলিশটি বোধহয় আজিজের মুখ দেখেই টের পেল ব্যাপারটা, সে সোজা তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল—'কেঁও মিঞা, লাইসিন হ্যায়?'

আজিজ নিরুত্তরে তার বুকের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ করল, যেখানটায় একটা লাল কাগজের উপর ছাপা ছিল, 'ধর্মঘটী ট্র্যাম শ্রমিক।' তারপরে সে হাসল, খুব বিষণ্ন ভঙ্গিতে, যেন সেই লাল কাগজের টুকরো আর হাসি দিয়ে সে পুলিশকে জয় করবে।

কিন্তু পুলিশটি বিগলিত হ'ল না, রূঢ় ভাবে সে আবার বলল—'উ-সব না জানেহে, লাইসিন দিখলাও না তো—'

অসহায় দৃষ্টিতে আজিজ এদিক-ওদিক তাকাল, লুঙ্গিবিক্রেতার সঙ্গে তার একবার দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। হঠাৎ লুঙ্গি বিক্রেতা এগিয়ে এল।

—'এ সিপাইজি—'

—'ক্যা—'

—'এই দ্যাখেন লাইসেন্স—'

—'উ তো তুমহারা—'

—'হ্যাঁ, এই জিনিশও যে আমার। ও আমার কর্মচারী—'

পুলিশটি কটমট ক'রে তাকাল লুঙ্গি বিক্রেতার দিকে, তারপর আজিজের দিকে, তারপর বিড়বিড় ক'রে কী-সব ব'লে সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

আজিজ নিঃশব্দে একবার তাকাল লুঙ্গি বিক্রেতার দিকে, তারপর তার একটি হাত চেপে ধরল, তার চোখে কৃতজ্ঞতার আলো জ্বলে উঠল। লুঙ্গি বিক্রেতা মৃদু হাসল আর মাথা নাড়ল, কিন্তু কিছু বলল না।

সমস্ত পৃথিবী যেন অপরূপ হ'য়ে উঠল আজিজের কাছে। না, আর একা নয়। তারা জিতবে। সে তাকাল। একটা বাস থেমেছে। একজন ট্র্যাম শ্রমিক চাঁদা সংগ্রহ করছে একটা টিনের কৌটো নিয়ে। দিচ্ছে, লোকেরা সাহায্য করছে। আজিজ হাসল। জিতবে, তারা জিতবে। ইংরেজ মালিক তাদের বিরুদ্ধে, স্বজাতি ও স্বদেশী মন্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে, তবু তারা জিতবে। কত নির্যাতন আর শোষণ করবে ওরা? দুনিয়ায় গরিব আর মজুরই বেশী, তাদের কতদিন দাবিয়ে রাখবে? ধীরে-ধীরে তাদের মতো সবারই চোখ খুলবে, তাদের সংগ্রাম সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে, শেষে একদিন তারাই গড়বে নিজেদের ভাগ্য। আলবৎ জিতবে আজিজেরা, আলবৎ!

...

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরল আজিজ। বৈঠকখানা অঞ্চলের একটা বস্তির মধ্যে তার ছোট্ট ঘরটা। ঘরের ভিতর কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। গন্ধযুক্ত কেরোসিনের ধোঁয়া আর স্বল্প আলো। তারই মাঝে আজিজ ইন্দ্রজাল ঘটতে দ্যাখে। একটা দড়ির খাটিয়া, ময়লা ছেঁড়া বিছানা, দু-একটা উর্দু বই, দুটো পুরোনো ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালের দড়িতে কয়েকটা পাজামা, লুঙ্গি, শার্ট ও ইউনিফর্ম, দুটো টিনের বাক্স আর কয়েকটা বাসন, কোণে একটা জলের কলসি আর দুটো মগ, একটা বদনা। ইন্দ্রজাল দ্যাখে আজিজ। কোন-একটা ভুলে-

যাওয়া দেশের শাহজাদা সে, এই তার রঙমহল শিসমহল আর ঐ কেরোসিনের ডিবাটা যেন হাজার মোমের বাতির চেয়েও ভাস্বর।

—'রাবেয়া—' আজিজ ডাকল।

ছোটো-ছোটো পায়ের শব্দ ধ্বনিত হ'ল, ছুটে এল মেয়েটা তার রুক্ষ চুল দুলিয়ে।

—'আব্বাজান—' মেয়েটা বলল।

—'দ্যাখ, কী এনেছি বেটি—'

—'কী?'

—'চুপ ক'রে দাঁড়া তবে—কেমন?'

—'আচ্ছা—'

পকেট থেকে কমলালেবুটা বার করল আজিজ, তাকাল মেয়ের দিকে, তার দু-চোখের ঔজ্জ্বল্যকে লক্ষ ক'রে হাসল, তারপর মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল সে।

—'লে বেটি, লে—'

কিন্তু মেয়েকে স্পর্শ ক'রেই চমকে উঠল আজিজ। রাবেয়ার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, গরম বালুর মতো।

—'বেটি?'

—'আব্বাজান!'

—'কী হয়েছে তোর?'

জোহরা এসে ঘরে ঢুকল, মেয়ের হ'য়ে জবাব দিল—'বুখার—আজ বিকেল থেকে হয়েছে—'

হঠাৎ যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়ল আজিজ: মেয়েটার একটা-কিছু হ'লেই সে কাতর হ'য়ে পড়ে, তার চোখের সামনেকার সবকিছু অন্ধকার হ'য়ে আসে।

—'বুখার! তাহ'লে কী হবে, জোহরা?'

জোহরা স্বামীকে চেনে, সে কাছে এসে স্বামীর গায়ে হাত রাখল, হেসে বলল—'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? ছেলেমেয়ের কি বুখার হয় না? হয়েছে, আবার সেরেও যাবে—'

—'ডাক্তারের কাছে যাই?'

—'এখনই? এই খেটে এলে, আর—ব্যস্ত হচ্ছো কেন, কাল সাকলে যদি বুখার না-থামে তখন না-হয় হাকিমকে বোলো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে পড়ল আজিজ, তাকাল মেয়ের দিকে। রাবেয়া কমলালেবুটা নিয়ে ব্যস্ত।

—'বেটি—'

—'উঁ?'

—'খুব তকলিফ হচ্ছে?'

—'উঁহু—'

—'আচ্ছা বেটি, তোব পুতলা কোথায়? কী করছে সে এখন?'

—'সে এখন নিদ যাচ্ছে, ওবও তবিয়ৎ খারাপ। আমাব তবিযৎ ঠিক না-থাকলে তাবও খারাপ হ'য়ে যায—'

আজিজ আব জোহ্‌রা হাসল।

মেয়েব একপাশে বসল আজিজ, আরেকপাশে বসল জোহরা। ব'সে-ব'সে তাবা অনেকক্ষণ ধ'বে কথাবার্তা বলল। সংসাবেব খুঁটিনাটির কথা, অভাব-অভিযোগেব কথা।

হঠাৎ জোহবা একসময়ে প্রশ্ন কবল—'তাহলে তুমি কাল কাজে যোগ দেবে না?'

—'না, জোহ্‌বা—' আজিজ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল।

—'লেকিন—'

আজিজ জোহ্‌বাব একটা হাত চেপে ধবল। —'জোহ্‌বা—'

জোহ্‌রা থেমে গেল, তারপবে মৃদু হাসল—'বুঝেছি। যাক. কিছু মনে কোবো না। লোভী, বড়ো লোভী আমি'

জোহ্‌রাব হাতে মৃদু একটা চাপ দিল আজিজ, আব একটু হাসল।

—'যাই, রুটি বানাইগে—' হঠাৎ জোহ্‌বাব অসমাপ্ত বান্নার কথাটা মনে পড়ল।

—'জোহ্‌বা!'

—'কী?'

—'তুমি কি এখনও রাগ ক'রে আছো?'

—'না।'

জোহ্‌রা চ'লে গেল, মেযেকে কোলে নিযে চুপ ক'রে ব'সে রইল আজিজ। জোহ্‌বার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। সাধারণের জীবনদর্শন। কিন্তু সে কী ক'রে জোহ্‌রাকে বোঝাবে যে আর সহ্য করা যায় না, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয স্বার্থবানেবা কোটি-কোটি লোককে বঞ্চিত ও হতভাগ্য ক'রে রাখছে? সে কী ক'বে জোহ্‌রাকে বোঝাবে যে তারা সেই-সব রাজা আর নবাব বাহাদুরদেব, মালিক আর জমিদারদেব ধ্বংস করবে?

পরদিন সকালে রাবেযাব জ্বর কমল না, ববং বাড়ল। আজিজ দৌড়োল হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে। হাকিম তাকে আশ্বাস দিল যে ব্যাপার এমন-কিছু নয়, ও সেরে যাবে। এক শিশি ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরল আজিজ, মেয়েকে খাওয়াল, তার কাছে এসে বসল, নানা কথায মেয়ের মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তারপর একসময়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় নিযে দাঁড়াল।

—'খাবে?' জোহ্‌রা প্রশ্ন কবল।

—'হুঁ।'

—'বোসো।'

খেতে বসল আজিজ।

—'কোথায় যাবে এখন?' আড়নয়নে তাকাল জোহ্‌রা। সে তার স্বামীকে চেনে।

সে জানে কী জবাব দেবে সে, কোথায় যাবে আজিজ। তবু মুহূর্তের জন্য ভাবতে ভালো লাগল তার যে আজিজ হয়তো বলবে যে সে কাজে যোগ দেবে, সে জোহবার উপদেশকেই মেনে চলবে। আব তাব এই আনুগত্য প্রকাশিত হ'লে জোহরার হৃদয়টা অদ্ভুত একটা আত্মতৃপ্তিতে ভ'বে উঠবে, চোখে-মুখে ঝলসে উঠবে বিজয়িনীব গর্ব।

কিন্তু আজিজ যা বলল তা এই—'কোথায় যাবো আবার? শিয়ালদাব মোড়ে আজ আবার কিছু কমলালেবু বিক্রি কবব—বেশ লাভ হয় ওতে। গবমেব দিন, লোকে পিয়াসের জ্বালায় কিনবেই এক-আধটা। কাল আমি করিম মিঞাব সঙ্গে কথা বলেছি—একশো কমলালেবু সে আমায় বিক্রি কবতে দেবে—জমা লাগবে না কিছুই।'

বলতে-বলতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল আজিজ।

জোহরা তাকাল স্বামীর দিকে। সে কি নিবাশ হ'ল? স্বামী তাব কথায় কান দিচ্ছে না ব'লে সে কি আবার রেগে যাবে আজ? কিন্তু না, কোনো জ্বালাই তো সে অনুভব কবছে না। তাব স্বামী সমস্ত বাধাকে জয় ক'বে সৈনিকেব মতো অবিচলিত বয়েছে জেনে, তাব কাছে হাব মানল না দেখে জোহবা হঠাৎ খুশিই হ'ল। স্বামীকে হারাবাব আত্মগর্বের থেকে স্বামী যে অপরাজেয় এই স্বামীগর্বই তাব যেন বেশি হ'ল। নিজের মনকে দেখে খুশি হ'ল, আশ্বস্ত হ'ল। তবু তর্ক করাব ঝোঁকটা সে এড়াতে পারে না যে। সে বলল-—'কিন্তু লিগের মন্ত্রীরা যে-কথা বলেছেন তা কি মিথ্যে?'

আজিজ মুখ তুলল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—'সব মিথ্যে, জোহ্‌রা সব ঝুটা। ওবা পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানেব কথা ভাবছে, ভাবছে নিজেদেব পেট মোটা করার কথা, নিজেদের জববদস্ত আর দৌলৎমন্দ কবার কথা। পাকিস্তান কথাটা শোনায় ভালো, হ'লে ওদেরই লাভ, আমরা যে কে সে-ই থাকব। তাই ও-সবে ভুললে আমাদেব দুঃখ কোনোদিনই দূর হবে না, জোহরা—'

—'তাহ'লে তোমরা কী করবে?'

—'যা কবছি—লড়াই। গবিবেবা এক জাত—তাতে হিন্দু-মুসলমান নেই—'

জোহরা চুপ ক'বে গেল।

খাওয়া শেষ ক'বে উঠে গেল আজিজ।

পোঁটলা নিয়ে সে যখন বেরোবার উপক্রম করছিল এমনি সময়ে ডাকল রাবেয়া।

—'আব্বা।'

—'হাঁ, বেটি?'

—'শুনো—'

—'হাঁ-হাঁ, বোলো বেটি—' রাবেয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল আজিজ—'ক্যা বাৎ হ্যায়, বেটি?'

—বোলুঁ?'

—'বোলো-বোলো—' মমতায়, স্নেহে কণ্ঠ আর্দ্র হ'য়ে এল আজিজের। মেয়ের জ্বরোত্তপ্ত ললাটের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

রাবেয়া তাকাল, ক্ষীণ হাসি হেসে বলল—'নয়া পুতলা আজ লাও গে?'

—'আজ বেটি—আজ!'

—'আজ না-হোয় তো কাল?'

—'হাঁ-হাঁ, লাউঙ্গা—'

আজিজ ছোটো-ছোটো চুমু এঁকে দিল মেয়ের ললাটে, তারপর উঠে বলল—'আনব, বেটি। এবার তুমি ঘুমোও, কেমন?'

—'আচ্ছা—' মাথা নাড়ল রাবেয়া। নতুন পুতুল আসবে, আর কী চাই। মুখে তার হাসির আভাস দেখা গেল, দেখা গেল একটা চাপা উত্তেজনা।

জোহরা তাকিয়ে-তাকিয়ে বাপ-মেয়ের এই ছবিটি দেখল। তার চোখ দুটো একটা অপরিচিত অনুভূতিতে জ্বালা করতে লাগল। ছোটোবেলার রূপকথা তার জীবনে সত্য হয়েছে—হয়তো অন্যভাবে, তবু তা সত্যই হয়েছে। তার পুরুষ, তার ঐ ননীর মতো, চাঁদের মতো মেয়েটা—এরা কি ঐশ্বর্য নয়? না, জোহরার দুঃখ করবার কিছু নেই।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

চলতে-চলতে সে তাকাল চারিদিকে। আবার সেই ছবি। অফিসমুখি জনতা। ভর্তি বাস। ত্রস্ত পদক্ষেপ। আর ওদিকে লোহার লাইনে চাকচিক্য নেই, তার খাঁজে-খাঁজে ধুলো। বিদ্যুতের তারে আগুন জ্বলছে না, শব্দ হচ্ছে না ঘটাং ঘট ঘট ঘট, বাজছে না টং টং টং। ট্র্যাম চলছে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে তা থেমে গেছে। অন্যায় দূর হ'লেই আবার তা চলবে। লিগ? মন্ত্রিসভা? হাসল আজিজ। সে খুব চিনেছে তাদের। মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে তারা, নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্য সাধারণ মুসলমানের হাতে তারা ধারালো ছোরা গুজে দিয়েছে। শুধু আজিজের মতো শ্রমিকেরাই তাদের সেই ছোরাকে গ্রহণ করেনি, তাঁরা জানে ওদের মৎলব কী? তাই ও-সব ভাঁওতায় তারা ভুলবে না। আজ কুড়ি তারিখ। কম্পানির নোটিস। কিন্তু কার সাধ্য ট্র্যাম চালাবে? শিয়ালদার ট্র্যাম ডিপোতেই আজ আজিজের ডিউটি। সে তার জিনিশপত্র বিক্রি করবে আর লক্ষ রাখবে। যদি কেউ চালায় তবে বাধা দেবে। ইউনিয়নের নির্দেশ সে কাল রাতে পেয়েছে। যদি দরকার হয় তবে খুন ঢালবে আজিজ। জানোয়ারের মতো দিনের পর দিন বেঁচে-থাকার চেয়ে বাহাদুরের মতো খুন ঢালা ঢের ভালো।

খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরল আজিজ। কুড়ি তারিখের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল সে। তারা জিতেছে আজ। সংগ্রাম শেষ হয়নি, তবু আজ একটা যুদ্ধক্ষেত্রে তারা তাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। আজ একটা ট্র্যামও চলতে পারেনি। একটাও না। সাধারণ মুসলমানদের দাঙ্গার নামে উসকে তাদের ধর্মঘটকে মাটি করতে চেয়েছিল সদাশয় দেশী সরকার—কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারা আরেক ধাপ এগিয়ে গেল তাদের আসন্ন বিজয়ের দিকে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে মনের আলোটা দপ ক'রে নিভে গেল।

মুখ শুকনো ক'রে রাবেয়ার পাশে ব'সে আছে জোহরা। স্বামীকে দেখে যেন স্পন্দন ফিরে পেল সে।

—'কী হয়েছে, বিবি—অ্যাঁ?' আজিজ শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্ন করল।

ঠোঁট নড়ল জোহ্‌রার, বলল—'রাবেয়া—'

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। চোখ বুজে নিঃঝুমের মতো শুয়ে আছে রাবেয়া। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

—'কী হ'ল রাবেয়ার—এখন জ্বর কী-রকম?'

শুষ্ককণ্ঠে জোহ্‌রা বলল—'জ্বর আবো বেড়েছে, শির ধুইয়ে দিয়েছি, তবু জ্বর ক্রমশ বেড়ে চলেছে—'

—'সকালের দিকে তো একটু কম ছিল—'

—'হুঁ—'

—'তাহ'লে—কী করি?'

—'হাকিমের কাছে যাও।'

—'তাই—তাই যাই—তুমি, তুমি ততক্ষণ একটু জলপাটি দাও ওর শিবে, কেমন?'

—'আচ্ছা—'

উত্তেজিতভাবে আবার ঘব থেকে বেরুল আজিজ। হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে গেল। হাকিম আবার তাকে অভয় দিল। এমন কী ব্যাপার আজিজ, ঘবড়ো মৎ বেটা, ঠিক হো যায়েগা। আরো দুটো শিশি দিলে হাকিম। দাম একটাকা। ট্যাঁকের সবকিছু বের ক'রে দিয়ে-থুযে রইল ছয় আনা। আজ লাভ হয়েছিল পাঁচ সিকা মতো, কালকের দু-আনা ছিল। রাবেয়ার পুতুল কেনা এখন অসম্ভব। আহা, বেচারি মুখ ফুটে চেয়েছিল। দিতে হবে কোনোমতে পরে, বুখারটা কমুক।

কিন্তু চার-পাঁচ দিন পরেও তা কমল না। সকালের দিকে জ্বর কম থাকে, আশা হয় যে একেবারেই ছেড়ে যাবে, কিন্তু যেই বেলা বাড়তে থাকে জ্বরও তেমনি ওপরে চড়তে থাকে।

হয়রান হ'য়ে পড়েছে আজিজ। মেয়ের এমন অসুখ, কিন্তু পয়সা পায় কই? বাড়িতে জোহ্‌রা একা ঘাবড়ে যায়, কিন্তু থাকবার উপায় কই? পোঁটলা নিয়ে আর ঝুড়ি নিয়ে তাকে শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে বসতে হ'ল। মনিহারি জিনিশ আর কমলালেবু। এই বিক্রি ক'রে তাকে সংসার চালাতে হবে, রাবেয়াকে সুস্থ করতে হবে, নিজেদের ধর্মঘটকে চালু রাখতে হবে জিত না-হওয়া পর্যন্ত।

সেই কমলালেবুওয়ালার মতোই অভ্যস্তকণ্ঠে সেও হাঁকে— 'দো-দো আনা লে যানা —মিঠা কেঁওলা লে যানা—'

সেই লোকটা হাসে, বলে—'এ ইয়ার টেরাম কম্পানি—'

—'হাঁ, ইয়ার?'

—'ই তো মেরা বাৎ হ্যায়—'

—'বেশখ— বড়া মিঠা বাৎ হ্যায়—'

লোকটা আর আপত্তি করে না, কেবল হাসে, তারপর বলে—'আচ্ছা, আও, দোনো

মিলকে চিল্লাবে—'

লুঙ্গিওয়ালা বিড়ি টানতে-টানতে সায় দেয়—'হুঁ—তাই ভালো—কাজিয়া কোরো না—'

ওবা একসঙ্গে হাঁকে—'হাঁ, দো-দো আনা লে যানা, রসগুল্লা ভি হাব মানা—'

সন্ধ্যা হ'লে দ্রুতপদে বাড়ি ফেরে আজিজ। দুরু দুরু বুকে। হয়তো আজ রাবেয়ার জ্বর থেমেছে। হযতো।

কিন্তু 'হযতো'টা হয না। বাবেযাব অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যেতে থাকে। হাকিম নিজামুদ্দিনকে পয়সা দিয়ে যে-ওষুধ কিনেছে আজিজ, তার ফল একটুও ফলে না দেখে সে হতাশ হ'য়ে পডল। অবশেষে বস্তিব বুড়ো আহসান আলির কাছে পরদিন গেল সে।

—'কী কবি, চাচা?' মেযেব কথা ব'লে পবামর্শ চাইল আজিজ।

বুড়ো আহসান অনেকক্ষণ ভাবল, পবে বলল—'তুমি পটলডাঙ্গাব মোড়েব ডাগদার বায়কে দেখাও, বেটা—লোকটার জ্ঞান আছে।'

—'হাঁ?'

—'হাঁ!'

—'আচ্ছা।'

ইউনিযন ফাণ্ড থেকে গোটা তিনেক টাকা পেয়েছিল আজিজ। তার ওপব ভরসা ক'রে মেয়েকে কাঁথায় জডিয়ে, কোলে নিযে সে ডাক্তাব রায়েব ওখানে গেল।

...

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধ'রে দেখল রাবেয়াকে, তারপরে বলল—'জ্বরটা খারাপ হে মিঞাসাহেব—প্যারাটাইফয়েড—'

—'জি?'

—'ঘাবড়ো না—ভালোভাবে চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।'

—'সারিয়ে দিন ডাগদারবাবু—দোহাই—' ছেলেমানুষের মতো হাত জোড় করল আজিজ।

ডাক্তার হাসল—'তুমি কি পাগল নাকি হে, অত ভয়ের কিছু নেই—ভালো ক'রে চিকিৎসা হ'লেই বিপদ কেটে যাবে—'

পকেট উজাড় ক'রে ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরল আজিজ।

রাস্তায় কানের গোড়ায় রাবেয়ার ক্ষীণ কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল— 'আব্বাজান—'

—'বেটি!'

—'মেরি নয়া পুতলা?'

নতুন পুতুল। লজ্জা পেল আজিজ। কিন্তু কী করবে সে? হাকিম-ডাক্তার আর ওষুধ-পথ্যেই তো সব বেরিয়ে যাচ্ছে, পুতুল কেনে কী ক'রে?

তবু মেয়েকে আশা দিতে হবে, সত্য কথায় মেয়েটা খুশি হবে না। ওর এতটুকু

আশা, এত ছোটো একটা দাবি যদি না-মেটে তাহ'লে দুঃখ পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

—'দেবো-দেবো, বেটি, নিশ্চয়ই দেবো।'

হ্যারিসন রোড ধরে এগোচ্ছিল আজিজ। এমনি সময় হঠাৎ সে লক্ষ কবল যে রাস্তায় যেন লোক চলাচল হঠাৎ অতিমাত্রায় দ্রুত হ'য়ে উঠেছে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গাড়ি-ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, বাস চলছে না, ট্যাকসিগুলো সবেগে ছুটে যাচ্ছে আর মানুষেরা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটছে।

—'ব্যাপার কী?'

পার্শ্ববর্তী লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল—'ক্যা হুয়া ভাই?'

লোকটি বোধ হয় হিন্দু, সে চলতে-চলতে কটমট ক'বে তাকাল আজিজেব দিকে, তাবপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল—'কী আবার? দাঙ্গা।'

—'দাঙ্গা!' কুড়ি তারিখে যা করতে পারেনি কর্তারা, সেই দাঙ্গা লেগে গেল! হঠাৎ আজিজের মনে প'ড়ে গেল যে আঠাশ তারিখেব সাধারণ ধর্মঘটকে পণ্ড করল এই দাঙ্গা।

বিবর্ণ হ'য়ে সে বলল—'আবার দাঙ্গা!'

লোকটি শ্লেষ ভরে বলল—'হ্যাঁ, উপায় কী, তোমরাই তো ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছ মিঞা—'

আজিজ মাথা নাড়ল, নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখাল বুকের ওপরে যেখানে লাল কাগজে লেখা আছে 'ধর্মঘটী ট্রামশ্রমিক'। ম্লানভাবে হাসল সে, যেন বলতে চাইল যে আমরা অন্য লোক ভাইসাব, আমরা হিন্দুস্থানেরও নই, পাকিস্তানেরও নই, আমরা ভুখা মজদুর, আমরা বিত্তহীন শ্রমিক, আমরা গরিব উলুখড়। যারা ছোরা চালায় আর ছোরা খায় তারাও তাই, শুধু ওরা কেউ জেনেও জানে না যে এ-রক্তপাতে ঘাতক আর নিহতের কোনো লাভ নেই, লাভ শুধু কয়েকজন তখ্‌ৎওয়ালাদের যারা ওপরে ব'সে দুরবিন দিয়ে যুদ্ধের মানচিত্র দ্যাখে আর দুষ্টগ্রহের মতো মূর্খ জনগণকে সর্বনাশের দিকে তাড়ানা করে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল আজিজ। সঙ্গে রাবেয়া। কোনো উন্মুক্ত রক্ত লোভাতুরের মুখোমুখি দাঁড়ানো তার চলবে না।

...

জোহরা সামনে এসে দাঁড়াল—'না, আজ তোমার যাওয়া চলবে না।'

—'মানে? কেন?' বুঝেও না-বোঝার ভান করল আজিজ।

জোহরার মুখে-চোখে শঙ্কার ছাপ, বিরক্ত হ'য়ে তিক্তকণ্ঠে সে বলল—'কেন অমন করছো বলো তো?'

—'তুমিই বা কেন অমন করছো?'

—'দাঙ্গা লেগেছে, তার মধ্যেই যাবে?'

—'না-গেলে চলবে কী ক'রে?' রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে আজিজ বলল—'মেয়েটার অসুখের কথা মনে নেই? আর এদিকে পকেটও যে শূন্য তাও তো জানো।'

—'তা হোক—তবু—'

—'তুমি পাগল জোহ্‌রা—'

—'আর তুমি উন্মাদ—'

—'মানলাম, তবু আমাকে যেতেই হবে। আমি অনাহারে থাকতে রাজি আছি, কিন্তু আমার ঐ চিবাগকে আমি ভুখ আর বিমারিতে মরতে দিতে পারি না, বিবি। না, আমায় তুমি আটকো না। আল্লা আমার মদৎগার আর—আর দশ বৎসরের পুরোনো মজদুর আমি, আমায় কেউ মারবে না। কারণ সবাই জানে যে আমরা একতরফা কারো সুখ চাই না— আমরা চাই সবার সুখ, সবার শান্তি—'

জোহ্‌রা মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কড়া পর্দা না-থাকলেও সে পর্দা মানে। বাইরের পৃথিবীটা ছোটো হ'যে তার এই ছোট্ট ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। বড়ো-বড়ো নেতাদের সে নাম শুনেছে, কিন্তু কারো বক্তৃতা শোনেনি। আজ একসঙ্গে আজিজের এতগুলো কথা যেন তাকে অভিভূত ক'রে দিল। কিছুই আর বলতে পারল না সে, শুধু নির্বাক হ'য়ে দেখল যে মেয়ের দিকে-একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পোঁটলাগুলো নিয়ে আজিজ বেরিয়ে গেল।

...

আজিজ বেরিয়ে গেল।

বস্তির লোকে উত্তেজিত আলোচনা করছে, দল বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে। দু-একজনের হাতে লাঠি-সোঁটাও দেখা গেল।

বুড়ো আহ্‌সান আলি পেছন থেকে ডেকে বলল—'এই দাঙ্গায় কোথায় যাচ্ছিস, বেটা?'

আজিজ মৃদু হেসে বলল—'আমি তো দাঙ্গাবাজ নই চাচা, যে ব'সে থাকলেও খেতে পাবো। তাছাড়া আমার বেটির অসুখ, আজ কিছু রোজগার করতেই হবে।'

এগিয়ে গেল আজিজ। পেছনে কয়েকজন একটা কঠিন মন্তব্য করল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

হ্যারিসন রোডে পড়ল সে। রাস্তা প্রায় জনহীন বলা চলে। মাঝে-মাঝে দু-একটা ট্যাকসি চ'লে যাচ্ছে ঝড়ের মতো। গলির মুখে-মুখে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী জনতা। শিয়ালদার মোড়ে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ এসে ঘাঁটি করেছে। দুই ফুটপাথ দিয়ে অল্প-অল্প লোকজন চলাচল করছে। ডান ফুটপাথে হিন্দুস্থান, বাঁ ফুটপাথে পাকিস্তান। খাঁ-খাঁ করছে রাস্তাঘাট, থমথম করছে সব। খর রৌদ্রতাপে আকাশ মরুভূমির মতো, রাস্তা গরম তাওয়াব মতো, বাতাস লু-এর মতো। সেই বাতাসে টের পাওয়া যায় মানুষের বন্য হিংস্রতাকে, রক্তমাখা ছোরাকে দেখা যায় শূন্যতার দর্পনে। আর অদৃশ্য তুষার-স্রোতের মতো নিরন্তর ভেসে আসছে কুৎসিত ভয়ের স্রোত, তার স্পর্শে চেতনায় সাইরেনের মতো আর্তনাদ উঠছে, পা অসাড় হ'য়ে পড়ছে।

জোর ক'রে তবু এগোল সে শিয়ালদার মোড়ে, বাঁদিক ঘেঁষে সে বসল। উত্তেজিত

কোলাহল ভেসে এল রাজাবাজার আর মানিকতলার দিক থেকে। সশস্ত্র পুলিশবাহী লরি চ'লে গেল কয়েকটা। ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে তীরের মতো একটা ফায়ার-ব্রিগেড ডানদিকে চ'লে গেল। ডানদিকের একটা গলিতে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে তখনও খেলা করছে। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর কোনো ভয় ডর নেই। রাবেয়ার অসুখ। একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু কোত্থেকে দেবে সে? কোত্থেকে?

নাঃ, রাস্তা ক্রমশ আরো জনহীন হ'য়ে পড়ছে। কোলাহল। একটা মোটরভ্যানে ঘোষণা ক'রে গেল যে সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হ'লো।

উঠল আজিজ। বাড়ি না-ফিরে আর উপায় নেই। মোট বিক্রি হয়েছে দু-টাকা। লাভ আনা ছয়েক। মাথা ঘুরে যায় তার। যদি দাঙ্গা এমনিভাবেই চলে তাহ'লেই হয়েছে। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। স্বার্থপর অন্ধদের কল্পনা। সাম্যবিরোধী ধর্মান্ধদের লড়াই। নিরীহের প্রাণহরণ ক'রে তাদের সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরি করছে। কিন্তু কতকাল? কতকাল?

বাড়ির দিকে ফেরে আজিজ। চলতে-চলতে এদিক-ওদিক, সামনে-পেছনে তাকায়। সন্দেহজনক কেউ নেই তো? চলতে-চলতে বুকের ওপরকার সেইখানে হাত রাখে যেখানে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা লাল কাগজের ওপরে লেখা আছে, 'ধর্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। যেন একটি অক্ষয়কবচ ওটা, যেন ভূতপ্রেত দৈত্যদানা আর তাদের মতো অস্বাভাবিক মানুষেরা ওটাকে দেখেই পালিয়ে যাবে।

...

দু-দিন কাটল। জ্বর কমেনি রাবেয়ার। দু-দিন কেটেছে, অথচ দাঙ্গা থামেনি। মনে হচ্ছে আরো বাড়বে, বাড়তে-বাড়তে ষোলোই আগস্টের পর্যায়ে দাঁড়াবে। দু-দিন কেটেছে, আর এই দু-দিন আজিজ কিছুই উপার্জন করতে পারেনি। কেবল ঘরের মধ্যে নিষ্ফল হতাশায় পায়চারি করেছে, মেয়ের পাশে গিয়ে বসেছে, বস্তির লোকদের উত্তেজিত ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে সতর্ক করেছে যেন তারা ভুল না-করে, জ্ঞান না-হারায়। এই বস্তির লোকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। তার কথায়, আহ্সান আলির সদুপদেশে ফল ফলেছে, তারা কোনো গোলমালে যোগ দেয়নি।

কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কী করবে আজিজ? ডাক্তার? ডাক্তারের কাছে যাবে কী ক'রে?

ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবল আজিজ। রোগশয্যায় মিশিয়ে আছে রাবেয়া, তার পাঁচ বছরের চিরাগ, তার বেদনাকণ্টকিত জীবনের রক্তগোলাপ। পুতুল—একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা, অথচ—না, ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে কোনোমতে।

একটা ধুতি প'রে সে বেরিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট বাদে, অতি সন্তর্পণে সে ডাক্তার রায়ের বাইরের ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার রায় চমকে উঠল, বলল—'তুমি!'

—'জি—'

—'কী চাই?'

—'বেটির অসুখ আরো বেড়েছে, ডাগদারবাবু—'

—'বেড়েছে?'

—'জি—ওকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাগদারবাবু— দোহাই আপনার—'

—'হুঁ—দাঁড়াও—'

সব শুনে প্রেসক্রিপশন লিখল ডাক্তার রায়, তারপর আজিজের দিকে তাকিয়ে বলল—'এবার তাড়াতাড়ি চ'লে যাও—এ-পাড়ায় আসতে তোমার ভয় হ'লো না?'

—'লেড়কির জন্যে—ইয়ে—তাছাড়া আমি তো মজদুর, ডাগদারবাবু—' ম্লানভাবে হেসে সে নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

ডাক্তার রায় হাসল—'ও-সব কথা ভুলে যাও, এখন লোকেরা ও-সব বাছবিচার করে না—'

ম্লানভাবে হাসল আজিজ, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার রায়কে সেলাম জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

...

ঘরের ভেতব থেকেই আজিজ শুনতে পাচ্ছিল ওদের আলোচনা। বাস্তায় ওরা জটলা পাকাচ্ছিল।

জোহ্‌রা বিবর্ণমুখে বলল—'এত লোক খুন-জখম হয়েছে। অ্যাঁ! বস্তিতেও আগুন ধরানো হচ্ছে?'

আজিজ শুষ্ককণ্ঠে বলল—'কুত্তাশালাবা এইসব কবছে—খুনের নেশা। সবাবের নেশার মতো, নেশা না-কাটলে ওরা বুঝতে পারবে না যে কী করছে ওরা। কিন্তু ও-কথা থাক বিবি, এখন মেয়ের দিকে তাকাও—'

জোহ্‌রা নির্বাক হ'য়ে গেল, স্বামীর বেদনার্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে মেয়েব দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সত্যি, বড়ো রোগা হ'য়ে গেছে মেয়েটা।

মেয়ের রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে আজিজের দু-চোখে জল এল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে রাবেয়ার সাবা দেহ, চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গিতে প'ড়ে আছে সে, যেন একটা আহত পাখির ছানা। তার দু-চোখের কোলে গভীর কালো ছায়া, গালটা একটু ভেঙে গেছে, হাত-পাগুলো শীর্ণ। তার রুক্ষ চুলগুলোর ওপব হাত বুলোতে-বুলোতে আজিজ কেঁদে ফেলল।

মেয়ের কানের সামনে মুখটাকে নিযে সে ডাকল—'বেটি—রাবেয়া—মেরা মাঈ—'

রাবেয়া চোখ মেলল, বাপকে দেখে শীর্ণ হাসি হাসল, বাপের চোখের জল দেখে অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করল—'রোঁতে কিউ, আব্বাজান?'

জোহরা মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে আর এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না, তারও বুক ঠেলে কান্না আসছে।

আজিজ মাথা নেড়ে জবাব দিল—'আঁখমে কুছ গিরা হোগা—আচ্ছা বেটা, ক্যায়সি

হো আভি?'

মাথাটা বাঁদিকে কাৎ ক'রে ললাটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে রাবেয়া বলল--'আচ্ছি হুঁ—'

তারপরে হঠাৎ কী মনে পড়ায় সে আবার হেসে বলল—'আব্বাজান—'

—'হাঁ, বেটি?'

—'মেরা নয়া পুতলা?'

লজ্জায় ফ্যাকাশে হ'য়ে সবেগে মাথা নাড়ল আজিজ—'লাউঙ্গা—তুমহাবা নয়া পুতলা আ যায়গা বিটিয়া—'

—'আচ্ছা—' আশ্বস্ত হ'য়ে রাবেয়া চোখ বুজল।

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। একটা পুতুলের দাবিকে সে মেটাতে পারছে না! তাব রাবেয়া, তার চিরাগ, তার দুঃখদীর্ণ জীবনবৃক্ষের একটিমাত্র ফুল। যদি হঠাৎ রাবেযা ম'রে যায! ছিঃ—এ কী ভাবছে সে! কিন্তু সত্যি, যদি রাবেয়া তাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যায় তাহ'লে তো তার এই নতুন পুতুলের সাধটা অপূর্ণই থেকে যাবে। তাই কি হবে, তাই কি হ'তে পারে কখনও?

সে উঠে দাঁড়াল।

—'কোথায় যাচ্ছো?' জোহ্‌রা প্রশ্ন করল।

—'আসছি।'

গেল সে আহসান আলির কাছে। কয়েকটা টাকা ধার করবার জন্য।

শিয়ালদার মোড়ে কতকগুলো দোকান দরজাগুলোকে একটু ফাঁক ক'রে রেখেছিল। দু-একজন নিতান্ত অভাবে প'ড়ে জিনিশপত্র কিনে নিযে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে সে একটা পুতুল চাইল। দোকানি তাকে সন্দেহের চোখে আড়নয়নে তাকাতে লাগল পুতুল বের করতে-করতে। নানা বকমের পুতুল। নানা দামের—তারই মধ্যে একটা মেযে-পুতুল সে দেড় টাকা দিয়ে কিনল, বেশ পছন্দ হ'ল তার পুতুলটা। রাবেয়াও নিশ্চয় খুশি হবে। এর আগে পুতুলটার দাম ছিল মাত্র ছ-আনা, এর দেড় টাকা। আশমান-জমিন তফাৎ। পুতুলটা পেলে রাবয়োর রোগশীর্ণ মুখটা কেমন জ্যোতির্ময় হ'য়ে উঠবে তা-ই কল্পনা ক'রে খুশি হ'য়ে উঠল আজিজের মন। না, রাবেয়া সেরে উঠবে। খোদা, তোমার দয়ার সীমা নেই, তুমি রাবেয়াকে সুস্থ ক'রে তোলো।

সাবধানেই আসছিল সে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল যে, ও-পাশের ফুটপাথ থেকে কে-একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবেগে। থমকে স'রে দাঁড়াবার আগেই ব্যাপারটা ঘ'টে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘ'টে গেল তা। আকস্মিক।

একটা ছোরা আমূল ব'সে গেছে আজিজের পিঠে, সেই অবস্থাতেই ছোরাটাকে ছেড়ে দিয়ে আততায়ী পালিয়ে গেল।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করল আজিজ। দূরে যারা দেখতে পেয়েছিল তাবা হৈ-হৈ

ক'রে উঠল। ত্রস্ত পদক্ষেপ।

ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল আজিজ, পিঠে আর বুকে একটা প্রচণ্ড জ্বালা। বেদনা। পিঠে হাত দিতে গিয়ে হাতেব পুতুলটা ছিটকে প'ড়ে গেল। বেদনায়, যন্ত্রণায় থরথর ক'বে কাঁপতে-কাঁপতে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। প'ড়ে গিয়ে তাকাল পুতুলটার দিকে, এগিযে সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পুতুলটা ছিটকে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছে। হতাশ, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে, সে একবার পুতুলটার দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকাল, হাত রাখল সেই জায়গাটায় যেখানে সেফটিপিনে আঁটা লাল কাগজটার ওপব লেখা আছে 'ধর্মঘটী ট্র্যাম শ্রমিক'।

যেন সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পাবল না। অসহ্য যন্ত্রণায সবকিছু একেবারে অন্ধকার হবার আগে অস্পষ্ট গোঙানির সঙ্গে সে একটু পাশ ফিরল আর বুকের ওপবকাব সেই লাল কাগজটা তার নিজেরই বক্তে আরো লাল হ'য়ে উঠল।

# ভূস্বর্গ অচঞ্চল

## ঋত্বিক ঘটক

চরম শীত পড়েছে আজ।

আশ্চর্য। এই কথাটাই বাবে-বারে মনে হচ্ছে মকবুল শেরওয়ানীর। বড়মূলার সরু প্রধান বাস্তাটা, পাশের কাঠেব দোতলার বিবর্ণ সাইনবোর্ড-গুলো, রাস্তা-বোঝাই উল্লসিত হানাদাবেব দল,—এসব পেবিয়ে দূরের দুর্নিরীক্ষ্য তুষারাবৃত পর্বতশিখরটাব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন যেন!

বড়মূলাব বাস্তায় ববফ পড়েছে গতরাতে। কলার-ওলটানো মোটা ওভারকোট পবা আফ্রিদি আব মোমেনদের ভাবি বুটের তলায় সে বরফ মলিন, কাদা-মাখা। পাহাড়ের দিক থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে আনেন শেরওয়ানী। হানাদারগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা, জায়গায়-জায়গায় তুষারদষ্ট মুখওয়ালা পাখতুনগুলো কথা বলছে, মুখ দিয়ে তাদেব ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দেখে কেমন মায়া লাগে তাঁর। ওরা যেন মানুষ নয়, বিবর্তনের প্রথম আমলের বাসিন্দে। জাভাম্যান বা প্যালিওলিথিকদেব সমগোত্রীয়।...ওপাশটাতে রাইফেল কাঁধে ফেলে কয়েকটা হানাদার সিগারেট টানছে। একদিকে একটা গোলায় ধসা বাড়ির একটা দেওয়াল সমেত ভিতটা দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো বড়ো-ছোটো কাঠ পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কতকগুলো ক্ষুধার্ত কাশ্মীরী ছেঁড়া শালোয়ার আর মোটা কম্বল গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে একধারে কুকুরের মতো জড়ো হয়ে।

লুঠ-হওয়া মেওয়ার দোকানের সিঁড়ির ওপর হাতে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় বসে এ-সমস্তই লক্ষ করছিলেন মকবুল শেরওয়ানী।

তাঁর পাশে আহমদজান। লোকটা ডাল হ্রদে মাছ ধরে দিন কাটাত। চারিদিকে পাহাড়-ওঠা শান্ত নিস্তরঙ্গ ডাল হ্রদে ভোরের কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে আহমদজান বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথত। ন্যাশনাল কনফারেন্সের আহ্বানে উপত্যকার শেষে এসে পড়েছে। রোগা ছোটো মানুষ, কিছু ভিতু, কিছুটা লাজুক। লড়াই-এর একেবার কিছু বোঝে না। গেরিলাদের ঘাঁটিতে বসে-থাকাই তার একমাত্র কাজ ছিল। কাল শেষরাতে যখন হঠাৎ হানাদারেরা এসে পড়ে সামনেব টিলার ওপর দিয়ে, তিনি আর এই আহমদজানই ধরা পড়ে যান। লোকটা দু-হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে তাতে মাথা রেখে মৃদু কাঁপছিল। পুরু নোংরা কম্বলে শীত বুঝি মানে না।

কাল শেষ রাতে মেয়েদের ধর্ষণের কাহিনী অনেক শুনেছেন, অনেক অত্যাচারিতা নারীকে দেখেছেন শেরওয়ানী। কিন্তু ভোর রাতে আসার পথের ঘটনাটা শিরায়-শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটিকে বড়মূলার মাইলখানেক ওপরে তাঁরা দেখতে পান। রাস্তার

ধারের একটা নয়ানজুলির মধ্যে পড়েছিল সে। সমতালে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে আসার চেষ্টা করছিল মেয়েটি। সে ছিল সন্তানসম্ভবা। ছেঁড়া শালোয়ার আর জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, রক্তমাখা দোপাট্টা মাটিতে লুটোচ্ছিল। ঐ শীতে প্রায় অনাবৃত দেহে পড়েছিল কতক্ষণ, কে জানে। ঠোঁট দুটো তার শীতে নীল হয়ে গিয়েছিল...। কী বীভৎস দৃশ্য! রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছিল, নড়বার শক্তি তার আর ছিল না, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। এদের দেখে তার সে কী ভয়-ব্যাকুলতা। কয়েকটা 'আজাদ কাশ্মীর' বাহিনীর সেনানীরা মেয়েটাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে, একজন একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে জঘন্য একটা কথা বলে, সবাই হেসে ওঠে। ওঁরা চলে-আসার খানিক পরেই মেয়েটা নিশ্চয় মরে গিয়েছে।

আজাদ-কাশ্মীর। এরাই বটে। এর মধ্যে উপজাতি আছে, আমেরিকান-ব্রিটিশ সায়েব আছে, পাকিস্তান ফৌজের সৈন্যরাও আছে। নেই কেবল কাশ্মীরী। মুসলিম কনফারেন্সের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের খুব কম লোকই ও-দলে যোগ দিয়েছে। আর এরা কাশ্মীরকে আজাদ করছে এই ভাবে, এই মা-বোনদের ধর্ষণ কবে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, অসহায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। মুসলমান এরা নয়, আজকের মেয়েটার মতো বেশির ভাগ ধর্ষিতাই মুসলমান, বিতাড়িত লুণ্ঠিত অসহায়রাও মুসলমান। এরা মানুষই নয়; পশু, পিশাচ, সব। অর্থ, আর নারীদেহ, এছাড়া আর-কিছু এদের মনে সাড়া জাগাতে পারে না। —গভীর ঘৃণা আর অনুকম্পা হয় শেরওয়ানীর।

অক্টোবর মাস। শীতের সুবিধেটা এরা পুরো গ্রহণ করেছে। সামনের মাস কটা এ-রকমই যাবে। তারপর কাশ্মীর দেখবে। শের-ই-কাশ্মীর দেখবেন।—প্রতিশোধেব সেই পরম দিনে বেঁচে যে থাকবেন না তিনি, তা শেরওয়ানী জানেন। একবার ধরেছে, উৎপাতকারীদের নেতা মকবুল শেরওয়ানীকে ওরা আর ছাড়ছে না। তাতে আর কী হয়েছে! এই তো স্বাভাবিক। তাঁর খালি মায়া হচ্ছে আহমদজানের জন্য। বেচারা ডালহ্রদ তীরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ও এ-কাজের উপযুক্তই নয়। কেমন যেন নেতিয়ে-পড়া লোক। গেরিলাদের জন্য যে-ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন, তার কিছুই ছিল না লোকটার মধ্যে। ওর দিকে তাকান তিনি। কেমন আচ্ছন্নের মতো মাথা গুঁজে বসে কাঁপছে।—কাঁদছে নাকি?

তা পারে। মকবুল শেরওয়ানী বিরক্ত হয়ে ওঠেন। লোকটা মরবেই। মিছিমিছি খানিকটা হাতে পায়ে ধরাধরি করে বুটের বাড়ি খাবে। হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মারেন তিনি ওকে, আহমদজান মুখ তুলে তাকায়, না, কাঁদছে না। তবে চোখ দুটো কেমন চক্‌চক্ করছে আর থুৎনিটা থরথর করে কাঁপছে। শীতে ব্োধহয়।

বলেন শেরওয়ানী, "কী আহমদজান। শীত করে নাকি?"

অন্যমনস্কভাবে ও বলে, "হু। আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে সরকারি বাহিনী এখানে আসতে পারে?"

লোকটা ভয়ই পেয়েছে। তিনি বলেন—"এই তো শীতের শুরু। তাছাড়া

হানাদাররাও সবে আক্রমণ করেছে। গোটা শীতের মধ্যেও অন্যদের দলের না-আসারই সম্ভাবনা। এখানে আসতে অন্তত পক্ষে মার্চ-এপ্রিল তো বটেই।—আমাদের কোনো আশা নেই।" যোগ করেন তিনি।

—"আমি সে কথা বলছিলাম না।" আহ্মদজান হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে তাঁর দিকে। "শের-ই-কাশ্মীর একদিন এখানে আসবেন তো? এরা হটে যাবে তো?"

মকবুল শেরওয়ানী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—"নিশ্চয়ই। আমরা এই পশুদের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা কববো। একজন সত্যিকারের কাশ্মীরী বেঁচে থাকতে লড়াই চলবে।"

আহ্মদজানের কৌতূহল মিটে যায়। আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কী ভাবছে ও, অমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে কেন?

আবার রাস্তাটার দিকে চান তিনি। হানাদারগুলো তেমনি যে যার কাজে ব্যস্ত। একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আরম্ভ হলো, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত যেন কেটে দিয়ে যায়। গুটিশুটি হয়ে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর একটা ইউনিফর্ম-পরা ক্যাপ্টেন এসে হাজির হয়। আগে ওকে দেখেছেন তিনি, দেখে বোঝা যায় কী-রকম কুটিল লোকটা। সে দুটো সেপাইকে কী যেন বলে, তারা এগিয়ে আসে। বরফের মধ্যে ওদের বুট বসে যাবার একটা অদ্ভুত আওয়াজ হতে থাকে। ওরা এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। মকবুল প্রস্তুত করেন নিজেকে। আহ্মদজান মুখ তুলে একটু উদভ্রান্ত, একটু অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওদের দেখে। ওরা আহ্মদজানকে তুলে ধরে। ও ওদের দিকে অন্যমনস্কভাবে চায়।

লোক দুটো খাঁটি আফ্রিদি। ছ-ফুটের ওপর লম্বা বিশাল চেহারা। একটার আবার বসন্ত হয়েছিল বোধহয়, সারামুখ দাগে ভর্তি, বাঁ চোখটা নষ্ট। আর একটার মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দুজনেরই মুখে নির্বোধ গর্বের ছাপ সুস্পষ্ট। যেন দুটো অসীম শক্তিশালী রোবোট, মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই।

আহ্মদজানকে ওরা হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। মকবুল শেরওয়ানী ঘাবড়ে গেলেন। নিশ্চয়ই ওরা ওকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ও-লোকটা যেমন ভিতু আর আগে থেকেই যেমন কুঁকড়ে আছে—প্রশ্ন করা মাত্র যা জানে বলে দেবে।

উনি উঠে দাঁড়ান ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। একটা সৈন্য সরে এসে রাইফেলটা তোলে। ক্যাপ্টেন ওঁকে লক্ষ করতে থাকে; তারপরে কী ভেবে চলে আসে ওঁর কাছে। আহ্মদজানকে ওরা এগিয়ে নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে আহ্মদজানকে বলে, "তাহলে এই হচ্ছে সর্দার।"

আহমদ কী যেন ভাবে, মাথা ঝাঁকায় অন্যমনস্ক। কী যেন একটা কথা সেই কাল থেকে ভাবছে ও।

ক্যাপ্টেন ওর মুখের বিদ্রূপপূর্ণ চোখ বুলিয়ে যায়। তারপর আহমদকে বলে, "বেশ, তোমার নাম কী?"

—"আহমদজান।"

—"বেশ, বেশ। তা, শোনো আহমদজান। তোমাকে আমবা ছেড়ে দেবো। তুমি কিন্তু তোমাদের দলে কে-কে ছিল এবং কোথায় আড্ডা আমায় বলে দেবে। দেখতে পাচ্ছো তো, কীভাবে অর্থ আমরা পাচ্ছি। কাজ ঠিক কবলে তাও মোটাই মিলবে। তোমার মতো সত্যিকারের স্বদেশভক্ত কাশ্মীবীই চাই আমরা। হিন্দুরাজা আব হিন্দুস্থানি সরকারের ধোঁকায় কাশ্মীরীরা ভুলবে না।"

সশঙ্কিত চোখে মকবুল শেরওয়ানী ওকে দ্যাখেন। আহমদজানেব মুখ গভীব চিন্তামগ্ন, এ-সব কথা যেন শোনেইনি সে। ক্যাপ্টেনের ধৈর্যচ্যুতি হয।

—"শুনছ, বহু টাকার ব্যাপার, প্রাণও বেঁচে যাবে।" ক্যাপ্টেন মুখ এগিয়ে বলে —"লোকটা হাবা নাকি? শুনছো, আবদুল্লার দলের পরাজয় হবেই। বেলা থাকতে সুযোগের—"

শেখ আবদুল্লাব নাম কানে যেতেই ও যেন কথা খুঁজে পায়।

"কুত্তা, শেব-ই-কাশ্মীর এখানে আসবেনই।" কলেব পুতুলের মতো কথাগুলো বলে। তাবপর পরম নির্লিপ্তভাবে ক্যাপ্টেনের এগোনো মুখে খানিকটা থুথু ফেলে।

চমকে ক্যাপ্টেনটা মুখ সরিয়ে নেয়। সৈন্য দুটো রাইফেলটা উঁচোয়। নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আহমদজান। শীতে শুধু থেকে-থেকে শিহরন লাগে ওর। ক্যাপ্টেন রুমাল বের কবে মুখ মুছতে থাকে। ওর মুখ রাগে লাল।

আহমদজান দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে যেন নতুন কথা খুঁজে বেব করে—"কুত্তা!"

ক্যাপ্টেন থরথরে হাতে পিস্তল বের করে, তারপর আবার কী ভবে ওটা খাপে রাখে। তারপর কালো সেপাইটাকে আহমদের কম্বল খুলে নিতে বলে। ওর কম্বল খুলে নেওয়া হলো। তার তলে একটা সাধারণ ভেস্ট আর সার্ট। এক-এক করে তাও খুলে নিল তারা। কেবল শালোয়াব পবে ঐ শীতে আহমদজান দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, আহমদের রোগা দেহটা কেমন নীল লাগে শেরওয়ানীর কাছে।

আহমদজান ওদের বাধা দেয়নি, বরং সাহায্যই করেছে। তার দাঁতে দাঁত ঠোকাব শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। কোনোবকমে বলে, "কুত্তা মুর্দাবাদ!"

ক্যাপ্টেন আর সহ্য করতে পারে না। ভারি বুটের এক আচমকা লাথিতে ওকে সেই কাদামাখা বরফের মধ্যে ফেলে দেয়। শেরওয়ানী শিউরে ওঠেন।

নির্বিকার মুখের ভাব ওর। কানা সেপাই কোথায় চলে যায়। আহমদজান মকবুল শেরওয়ানীর দিকে তাকিয়ে বলে, "কেমন, ঠিক করিনি আমি?"

মকবুল বলে ওঠেন, "তুমি—"

একজন সেঁপাই তাঁর হাত চেপে ধরে। ধীরে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নেন। কানা সেপাইটা খোঁজাখুঁজি করে একটা ভাঙা দরজার এক পাল্লা নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ইশারায় সেটা আহমদজানের বুকের ওপর রাখতে বলে।

মকবুল শেরওয়ানী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পশু, নীচ, জঘন্য পশু এরা। তিনি

ক্যাপ্টেনকে না-বলে পারেন না—"নিশ্চয়ই তুমি—"

ক্যাপ্টেন হিলেব ওপর ঘুরে বিদ্রূপপূর্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে—"শাট আপ!"

মকবুল চোখ বোজেন। চাবজন সেপাই পাল্লাটাব ওপর দাঁড়িয়ে নাড়াতে থাকে। আহ্‌মদজানের মুখ দিযে কোনো আর্তনাদ বেরোয না। কষ্ট করে ঢোক গিলে ফেব বলে—

"কুত্তা।"

মুখ দিয়ে ওর, নাক দিযে ওর চাপ চাপ বক্ত বের হতে থাকে। গাঢ লাল তার রং।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আহ্‌মদজান মাবা যায়।

সেপাইগুলো এতে উল্লসিত হয়েছে বোধ হলো। একজন পা দিয়ে তক্তাটা সরিয়ে দিল।...

ক্যাপ্টেন ও-সম্বন্ধে আর চিন্তা কবছে না। সে ঘুবে এদিকে তাকায়। তাবপর আস্তে-আস্তে বলে—"তবে তুমিই সর্দাব। বেশ-বেশ।"

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন কাশ্মীরী তাব কাছে আসে। লোকটা তাঁর চেনা, এখানকারই লোক। কানে-কানে ক্যাপ্টেনকে কী যেন বলে সে। ক্যাপ্টেন ভুরু তুলে বলে —"তাই নাকি?" লোকটা কী বিশ্রী করে হাসতে থাকে। ক্যাপ্টেন বলে আবার—"তোমার কথা মনে বইল।—ও, মকবুল শেবওয়ানী সাহাব? আদাবরস। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বড়ো লীডার, আদাববস।" ও একটা সিগাবেট ধরিযে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সেলাম করে।

—"কায়েদ-ই-আজম যখন বড়মূলায় আসেন বিশ্রাম করতে, তখন তুমিই তাঁর সভায় গোল পাকিয়েছিলে!"

মকবুল শেরওয়ানী খুব মিষ্টি করে হাসেন—"না, মিস্টার জিন্না যখন এসেছিলেন, তাঁর সভামঞ্চে উঠে তখন দুটো কথা বলেছিলাম মাত্র। শ্রীনগরে শেখসাহেবের সামনে তিনি বলেছিলেন, আমাদের রাজনীতিতে তিনি মাথা ঘামাবেন না। তারপরই কিন্তু মুসলিম কনফারেন্সের হয়ে নানা কথা বলেন অন্য সভায়। এখানেও সেই ব্যাপারই করতে যাচ্ছিলেন, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছিলেন, তাই আর-কি তাঁর সভায় উঠে দুটো কথা বলেছিলাম। ফলে ভয় পেয়ে তিনি এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যান। ডোগরা সৈন্যদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। তা, এখানকার দুষ্টু লোকেরা বলে থাকে—বড়মূলাই ভারতে একমাত্র স্থান, যেখান থেকে জিন্নাকে প্রাণ হাতে করে পালাতে হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন আস্তে-আস্তে লাল হয়ে ওঠে। তারপর ছোট্ট একটা "হুঁ" বলে দ্রুতপদে চলে যায়।

মকবুল শেরওয়ানীর মনে হচ্ছিল ঐ আহ্‌মদজানের কথা। লোকটা এত মিনমিনে স্বভাবের ছিল। কথা বলতে পর্যন্ত পারত না ভালো করে। এখানে এসে অবধি ডাল হ্রদের ধারে ফিরে যাবার ইচ্ছে তার কী রকম প্রবল ছিল, তাঁর জানা আছে।

হঠাৎ লোকটা এত জোর পেল কোথা থেকে?

ক্যাপ্টেন তখন রাস্তার ধারের পড়ে-থাকা কাঠগুলোকে পা দিয়ে ঠুকতে-ঠুকতে কী যেন বলছিল, আর মাঝে-মাঝে গোলায়-ভাঙা-বাড়িটা নির্দেশ করছিল। লোকটা তারপর চলে গেল কোথায়।

মকবুল শেরওয়ানী বসে পড়েন আবার।

খানিকক্ষণ কেটে যায়। তাঁব চোখেব সামনে সৈন্যরা ভিতটা পরিষ্কার করে ফেলল। কযেকজন মিলে দুটো ছোটো-বড়ো কাঠ আড়াআড়ি বেঁধে একটা ক্রশ তৈরি করে। ভিতে সেটা পোঁতা হলো।

ক্যাপ্টেনটা খেয়ে এল বোধহয়। মুখ মুছতে-মুছতে এল। —মকবুল শেরওয়ানীকে ঐ ভাঙা বাড়িটার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। যেতে-যেতে তিনি আহমদের দেহটার পাশে থমকে দাঁড়ালেন। সেপাই দুটো কিছু বলে না। তিনি তাকালেন শীর্ণ, খিন্ন মুখটির দিকে। মুখের পাশ দিয়ে বক্তের চাপ নেমে গেছে, নাকেব দুই ফুটো দিয়ে রক্তের ধারা।—"সেলাম, আহমদজান। শেব-ই-কাশ্মীবের পার্শ্বচর মকবুল শেরওয়ানী তোমায় সেলাম জানাচ্ছে, শেখ আবদুল্লা তোমায় সেলাম জানাচ্ছেন, সারা কাশ্মীর তোমায় সেলাম জানাচ্ছে। একদিন তামাম হিন্দুস্থান তোমায় সেলাম জানাবে। এখনও তুমি পড়ে আছ এই অক্টোবরের সকালে, এই বড়মূলার সদর রাস্তায়, এই হানাদারদের সামনে,—একটা নির্বিকার নীরব ধীর প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি।—খোদা হাফিজ।"

উপত্যকার উপান্তে পাহাড়ে বরফের চুড়োটা দাঁড়িয়ে, কুয়াশায় তার কোল ঢাকা, সবের প্রান্তরেখা অস্পষ্ট, কী-একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসটা এখন রীতিমতো ছোটোখাটো ঝড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তার আনাচ-কানাচ্ থেকে বরফের গুঁড়ো উড়ে আসে। একটু দূরের জিনিশও ঝাপসা। সূর্যদেব একবার দেখা দেবার পর কুয়াশার পাতলা মেঘের আড়ালে চলে গেছেন, কেমন একটা চাপা জ্যোতি চারিপাশে...

মকবুল শেরওয়ানী এগিয়ে চলেন।

তারপর আরম্ভ হলো দু-হাজার বছর আগের ইতিহাসের পুনরভিনয়। ভাবে নয়, কাজে। সত্যি-সত্যিই সেই ধসা ভিতের ওপর ক্রশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধা হলো। তারপর কানা সৈন্যটা বড়ো বড়ো লোহার গজাল আর একটা বড়ো হাতুড়ি নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেনটা হাসিমুখে তাঁকে দেখছে। কাশ্মীরীগুলো একপাল কুকুরের মতো একটু-একটু করে সরে এল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতার পরীক্ষা হলো শুরু।

ক্যাপ্টেনটা এগিয়ে এসে বলল, "দ্যাখো, শেরওয়ানী। তুমি নিশ্চয় ও লোকটার মতো বোকা নও। নিজের কিসে ভালোমন্দ, তা তুমি নিশ্চয়ই বোঝো। তোমাকে আমার মারবার ইচ্ছে নেই, সত্যি, মারতে আমার কষ্ট হবে রীতিমতো। বীরের কদর বীরে বোঝে। শোনো, এইসব কারণেই, যদি তুমি অন্তত শত্রুতা না-করো, তোমায় আমি মারবো না, সঙ্গে করে রেখে দেবো। তোমার কোনো কষ্ট হবে না। আরও কত ন্যাশনাল কর্মী আমাদের

দলে যোগ দিয়েছে। তোমাকে চাই কি ভালো সিভিলিয়ান কাজও দেওয়া যেতে পাবে।
—আর কথা না-শুনলে, দেখতেই পাচ্ছে, কী-ধরনেব পরিণতি অপেক্ষা করছে। অবশ্য আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথা বুঝবে।"

শেরওয়ানী চুপ করে থাকেন। ওদের দলে যোগদানকারীদের উনি জানেন। ভীত, লালায়িত কতকগুলো লোক। এ-প্রস্তাব কবার কাবণও বুঝতে পারেন তিনি। কাগজে-কাগজে জগতের কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। ওঁর সম্মতিলাভ একটা স্বত্ব অধিকার করার চাইতেও মূল্যবান।

ক্যাপ্টেন বলে—"তাহলে বলো, আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ!" একসঙ্গে সৈন্যগুলো চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটার মুখে থুথু দেবেন নাকি? নাঃ, সেটা বড়ো নোংরা হয়ে যাবে। আবার ও বলে—"কী চুপ করে আছো কেন?"

"এই বলি। আজাদ কাশ্মীর মুর্দাবাদ।" ধীরে-ধীরে, প্রত্যেক কথায় জোর দিয়ে, পরিষ্কার গলায় বলে শেরওয়ানী।

ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো ছোটো হয়ে আসে। হঠাৎ ও হেসে ওঠে—"বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা কবছ? বেশ, বেশ—এই লাগাও!"

বাঁ-হাতখানা আড়াআড়ি তক্তার সঙ্গে ধরা হয়। কানাটা গজালটা লাগিয়ে ঠুকতে যায়। শেরওয়ানী ঠোঁট চেপে চোখ বোজেন। আবার ক্যাপ্টেনের হাসি —"হা-হা, বীরত্ব ছুটে যাচ্ছে ক্রমে।"

নাঃ, দুর্বলতা সেখানে চলবে না।—"জানোয়ারের হাজার অত্যাচারেও কাশ্মীর টলবে না। ভেবেছো, ঢুকলাম আর সারা দেশটা বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল? শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ, কাশ্মীর সরকার জিন্দাবাদ।"

ক্যাপ্টেনের ধৈর্যচ্যুতি হয়। মাটিতে পা ঠুকে বলে—"দেরি কোরো না। আরম্ভ করো।"

আধুনিক ইতিহাসের এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু। গজালের তীক্ষ্ণ মুখটা হাতুড়ির এক আঘাতে নরম মাংস ভেদ করে ঢুকে যায় কাঠে। রক্ত গড়াতে থাকে। শেরওয়ানীর মনে হচ্ছে যেন আগুন ছুটছে এক-এক আঘাতে। ঝলকে-ঝলকে তীব্র ব্যথা হাত থেকে কাঁধে, কাঁধ থেকে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে।

দাঁত দিয়ে উনি ঠোঁট চেপে থাকেন। ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করে—"কী, বলবে আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ?"

উত্তর না-পেয়ে ওর রোখ ক্রমেই চড়তে থাকে, "ঐ হাতে লাগাও।" ডান হাতটা এবার, উঃ কী যন্ত্রণা। আর পারা যায় না। কিন্তু—

"কাশ্মীর সরকার জিন্দাবাদ।" চীৎকার করে ওঠেন শেরওয়ানী। ক্যাপ্টেন এবার খেপে যায়। এলোপাথাড়ি ঘুসি মেরে যায় ওঁর চোখে-মুখে। গালটা অনেকখানি কেটে যায়। রক্ত পড়ছে মুখের ওপর, কেমন নোন্‌তা তার স্বাদ।

কাশ্মীরী জনতা আস্তে-আস্তে পিছিয়ে যায়। তাবাও এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না।

মাথাটা ঘুরছে, কপালের বাঁ-দিকটা ফুলে গেছে শেরওয়ানীর। লাল টকটকে চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

"শের-ই-কাশ্মীব জিন্দাবাদ।"

কথাগুলো যেন হাতুড়িব আঘাতের মতোই লাগে গিয়ে ক্যাপ্টেনের গাযে। সে পাগলের মতো চ্যাচাতে থাকে—"লাগাও, অপেক্ষা কোরো না।"

কানা সেপাইটা ইতস্তত কবে। বোবোটেবও হৃদয় আছে কী? "ও যে মরে যাচ্ছে।"

"আমিও তো তাই চাই। এ-রকম যন্ত্রণাই দিতে চাই।"

আবার একচোট ঘুসি বর্ষিত হয।...মাথাটা আর যন্ত্রণা অনুভব করছে না। স্নায়ুগুলো অসাড় হয়ে গেছে। শুধু অসীম ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি ওর দিকে তাকিয়ে বলেন—

"আজাদ কাশ্মীর দল মুর্দাবাদ।"

একটার পর একটা গজাল তার দেহে ঢুকতে থাকে।... পর্বত-চূড়াটা কী জ্যোতির্ময়ই না লাগছে। উপত্যকাটা কী সুন্দর। আকাশটা ধোঁয়াটে হয়ে মিলিয়ে গেছে। অপরূপ। ভূস্বর্গ কাশ্মীর!

ঐ চেনার গাছটা বরফে ঢাকা। বিমলিন শ্বেত বরফগুলো কত অদ্ভুত নক্সাই না তৈরি করেছে ওখানে, বাড়ির কার্নিশে, টিনের চালে। ও গাছটা একদিন সবুজ হয়ে উঠবে; সবুজ পাতায় ভরে যাবে; উপত্যকার আঙুরের বাগান ভর্তি রসভরা আঙুর হবে; কাশ্মীর গালচের মতো নরম ঘাসের আস্তরণে উপত্যকাটা ভরে যাবে। বসন্ত আসবে।

বসন্তের সঙ্গে আসবে সৈন্যবাহিনী। দলে-দলে, কাতার দিয়ে লোক, পাহাড় পেরিয়ে, গিরিসংকট অতিক্রম করে, নদীতে সাঁকো বেঁধে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ করে আসবে। তাদের পুরোভাগে ছয়ফুটের ওপর লম্বা বিরাট পুরুষ সুদৃঢ় লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে আসবেন। কাশ্মীরের বাঘ। তাঁর সামনে কুকুরগুলো ভেসে যাবে। নতুন পত্তনি হবে, নতুন করে কাশ্মীর গড়ে উঠবে, তাঁর স্বপ্নের কাশ্মীর। ডোগ্‌রা রাজার পায়ের তলায় পড়ে থাকা কাশ্মীর নয়, জনগণের ভূস্বর্গ কাশ্মীর। ভূ-স্বর্গ।...মাথাটা তাঁর কেমন একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গি করে নেতিয়ে পড়ে।...

ক্যাপ্টেনটা বলে—"মরে গেছে। নামিয়ে ফেল!"

বহুদূবাগত শব্দটা কানে আসতে জড়তা কাটিয়ে উঠে আবার বলেন—"শেখ আবদুল্লা জিন্দাবাদ, কাশ্মীর জিন্দাবাদ।"

ক্যাপ্টেনটা হাঁপিয়ে গেছে। হতাশভাবে ভাঙা সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে যায়। প্রতীক্ষারত সৈনিকদের হুকুম দিয়ে সে সরে দূরে গিয়ে সিগারেট ধরায়। কয়েকটি সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। একটা হাবিলদার তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে।

এ-সবই আবছা আবছা দেখতে পান মকবুল শেরওয়ানী। পৃথিবী ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে তাঁর মরণোন্মুখ দৃষ্টিশক্তিতে। আজ এই পরমক্ষণে একমুহূর্তে তাঁর সমস্ত জীবনটা ছায়াছবিব মতো তাঁব মনে প্রতিফলিত হয। কয়েক সেকেণ্ডেব মধ্যে তিনি তাঁব সমগ্র অতীতটা দেখতে পান। দ্যাখেন, তাতে দুঃখ কববার মতো কিছু নেই। সামনের ঐ উত্তুঙ্গ দুর্নিরীক্ষ্য পর্বত চূড়াটাব মতোই জীবন শুভ্র. উদগ্র,—অনুশোচনাব কিছু নেই তাতে।

একটা প্রকাণ্ড কারণের জন্য সাবাজীবন কাজ করেছেন তিনি; আর আজ তাবই জন্য বিশাল মৃত্যুর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

সবচেযে ভালো যা, তা-ই করে এসেছেন, এবং সবচেযে ভালো যা, তা-ই কবতে যাচ্ছেন। সাবা কাশ্মীব তাঁব অনুসবণ করবে।...

তেরো বাউণ্ড গুলি করে তাঁকে মারা হয়!

# স্ফটিকপাত্র

## ঋত্বিক ঘটক

দিল্লি পথের বহু-বিশ্রুত এবং কাব্যে-আদৃত ধূলি, যা নাকি মোগল এবং শিখেরা মিলে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল একদিন, এখন আর ওড়ে না।

উড়বে না! কোথা থেকে উড়বে? দেখাই যায় না তাদের। তাদের বাহিত অদৃশ্য কীটের দ্বারা ভালো মানুষের ছেলেদের স্বাস্থ্য আক্রান্ত হবারও ভয় নেই। আর-এক ধরনের দৃশ্য কীটে ছেয়ে ফেলেছে দিল্লিব প্রশস্ত রাজমপথসমূহ।

উৎখাত বাস্তুছাড়া শরণাগতের দল।

অন্তত এইরকম একটা ধারণাই আমার হয়েছিল সেদিন মেল থেকে নেমে। প্ল্যাটফর্মে, শেডে, কোথাও আব পা ফেলবার জাযগা নেই যেন। গিজগিজ করছে লোক। ছেলের জন্মদান থেকে বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত বিশাল বিপুল নাটকের যবনিকা উত্তোলন আর নমস্কার...শালীনতার পাৎলা কাচ ভেঙ্গে চুরমার করে আদমীয় নির্লজ্জতার সঙ্গে সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে।

দেখে দারুণ মজা লাগল, এই লোকগুলো সেদিন পর্যন্ত লাহোরে কি লায়ালপুরে মুজঃফরাবাদ কী মুলতানে নিশ্চিন্তে নির্বিকাবভাবে কাটাচ্ছিল, ঘচাং করে পরিবেশ পরিবর্তন, সঙ্গে-সঙ্গে বহুযুগের খোলশ খুলে আদিম জীবনযাত্রায় ফিরে-যাওয়া! চমৎকার!

আমি সরকারি চাকুরে। আর-একজন সরকারি চাকুরে আমার আত্মীয় এবং কেন্দ্রে আমার ওপবওয়ালা ও দূত। কথাটা গোপন রেখে লাভ নেই, তাঁর কৃপাতেই সেণ্ট্রাল গর্ভনমেণ্টে অমন চাকরিটা ফট করে পেয়ে গেলাম।...এসেছি তাঁকে তৈলাক্ত করতে, উপলক্ষ তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশন। জীবনে এই প্রথম ভারতের মুকুটমণিতে অধমেব পদার্পণ।—আর একেবারে গোড়াতেই যা অভ্যর্থনার ঘটা এই পুরোনো বহুভর্তৃকা নাগরীর, তাতে একটু নাড়াই খেলাম। আশা ছিল মনের গোপন অভ্যন্তরে, নিদেন পক্ষে, সে মধ্যযুগীয় আড়ম্বরের ছিটেটা-ফোঁটাটা আভাসে-ইঙ্গিতে পাবো।...হায় রে পোড়ার ইতর কলিযুগেব আমি, কোথায় কী?

থাক্ গে টাঙ্গা নামক অর্ধ-খ এবং ভূ-যানে চেপে নবদিল্লির নসরৎবাগ পাড়ায় এসে পড়লাম। ইংরেজের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দিল্লির সরকারি চাকুরে নামধেয় শূকরকুলের মতে এটা অভিজাত পাড়া। আমার উচ্চপদস্থ আত্মীয়টি এ-অঞ্চলের মানী লোক। সে-বাড়ির প্রচণ্ড উৎসবের দোর্দণ্ড কাণ্ডকারখানার কথা তুলে নাই-বা স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করলাম।

কিন্তু পথে-দেখা বাস্তুত্যাগীদের দেখে কৌতূহল আমার উদ্রিক্ত হয়েছিল। অতি

কৌতূহলী হয়েই নাকি বহু আবিষ্কারক এবং শিকারী প্রাণটা খুইয়েছেন। আমিও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মারাত্মকরকম ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কেমন করে, সেইটেই ,বলি।

...এই নূতন জাতের ভিক্ষুকদের দেখতে সেদিন দিল্লির কিছু দূরে এক রিফিউজি-ক্যাম্পে চলে গেলাম।

জীবনে ভুলতে পারবো না সে-পরিবেশ। একটা মাঠের মধ্যে নতুন খাড়া-করা ছাউনি, বাস্তুহারাদের বস্তি। ঘর থেকে ঘরে সরে গিয়ে একই দৃশ্য দেখতে থাকলাম, জীবনধারণের প্রত্যেকটা জিনিশই মনে পড়ে তাদের অভাবের দরুণ। বীভৎস উলঙ্গ অভাব। নোংরা ছিন্ন কাপড়চোপড় আর কালিমাময় মুখচোখ। এই জানুয়ারি মাসে শীতে ঐ ছাউনিতে হিম আটকায় কতখানি, সেটা গবেষণার বিষয়।

সে-সময়টাতে আবার কলেবাব একটা মড়ক ওদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, একদল শুশ্রূষাকারী এসেছিল ওদের সেবা করতে। একটা ঘরে দেখলাম কলেরার ইনোকুলেশান দেওয়া হচ্ছে একটি মেয়েকে, রাশিকৃত চুল তার ছড়িয়ে আছে বমি-লাগা মুখটাকে ঘিরে, মাছি ঘিনঘিন করছে তার চারপাশে।...বেরিয়ে বাবান্দায় নাকে রুমাল দিয়ে ভাবছি এটাই কুম্ভীপাক অথবা রৌরব কিনা, এমন সময় একটা প্রাণফাটা চীৎকাব শুনে চমকে উঠলাম। ওপাশের ঘর থেকে চীৎকারটা এসেছিল, এখন কেমন চাপা গুঞ্জনে পরিণত হযেছে সেটা। এগিয়ে গেলাম, আর-কী বৈচিত্র্য আছে, সেটা দেখতে।

...মাতাপুত্র। চিরকেলে ম্যাডোনার বিষযবস্তু। মেয়েটির চেহারা সুন্দর ছিল বিস্মৃতপ্রায় কোন্ অতীতে, এখন ব্যথাদীর্ণ, বজ্রাহত অশুচি মুখচ্ছবি। মুখ দিয়ে একটা বক্তব্য গোঙরানি করে চলেছিল, কথাগুলো জড়ানো, তবু বোঝা যায় বলছে—"মুন্না মেরী, লাল মেরে—"

চুলগুলো আছড়াচ্ছে দু-পাশে পা ছড়িয়ে বসে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। সামনে পড়ে আছে ফুটফুটে ছেলেটি, বমিতে-পুরীষে মাখামাখি চেহারা। শেষ অবস্থা, খাবি টানছে।...মায়ের চীৎকার শুনে আমার সঙ্গে আরও-কয়জন দৌড়ে এসেছিল। তাদের একজন ডাক্তারদের খবর দিল। একজন এল, পেছনে বেঁধে উৎসুক জনতা। গিয়ে বসল ছেলেটার পাশে, নাড়ি দেখল, মাথা নাড়ল। ইতিমধ্যে প্রায়-পূর্ণ ঘরের শেষ দিক থেকে মাথা উঁচিয়ে আমি দেখছিলাম, ওরা আসতেই মা-টি কেমন আঁৎকে উঠে ছেলেটার পায়ের লাথিতে কুণ্ডলীকৃত কম্বলটা তুলে নিয়ে ঘরের কোণে চলে গিয়েছিল বড়ো বড়ো চোখ করে। ভীড় জমতেই ধীরে-ধীরে এর-ওর-তার পাশ কাটিয়ে দরজার কছে এসে পড়ল।—ওদিকে ডাক্তারটি নিস্তব্ধ ঘরে সাড়া জাগিয়ে বললেন, ফিনিশ্‌ড, অর্ডারলি।

আমি চেয়ে ছিলাম মায়ের দিকে। আচম্বিতে একটা হাওয়া মুখে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত দুটো একবার অসীম আবেগে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল।

মা ক্ষণেক তাকিয়ে থেকে আমার পিছন দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার ভদ্রলোকটি ততক্ষণ বলছেন—"এর কোনো আত্মীয় নেই?"

একজন জবাব দিল—“ছিল তো এখানেই।—কই দেখছি না এখন।”

দুষ্প্রাপ্য কীটের নমুনা দেখার একটা কৌতূহল চাগাড় দিয়ে উঠল মনে. মেয়েটিব অনুসরণ করে বাইবে চলে এলাম। বাবান্দাব এককোণে ভালো কবে কম্বল মুড়ি দিচ্ছে মা। আমি কাছে যাই, দেখলাম মুখখানা, কেমন জমাট বেঁধে-যাওয়া অভিব্যক্তি। ঠোঁট দুটো কিন্তু কেঁপে মৃদুস্ববে গেয়েই চলেছে পৃথিবীব আদিমতম গান—

“মুন্না মেরী, মেরে লাল...লাল মেবী...”

বললাম, “মায়ী, চলে এলে কেন? তোমায খুঁজছে ওবা...”

মেয়েটি একটু নড়ে অদ্ভুৎ বোকাব মতো হাসে। অস্ফুট দু-একটা শব্দ কবে। তাবপর চুপ কবে থাকে।...আমি আবার প্রশ্ন কবি—“ওরা ছেলেকে নিয়ে যাবে যে, খবব দাও? নইলে অজান অচিনভাবে—”

“অজান অচিনভাবে—” মেয়েটা আমার কথাব পুনবাবৃত্তি কবে। ওব হিন্দুস্থানির টানটা কেমন ব্যাঁকা ধরনের, মহাপ্রাণবর্ণেব ওপর ঝোঁকটা বেশি, লক্ষ করি আমি।...ও খানিক চোখ বুলোয় আমাব চোখের ওপর, তারপব বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে, অধরটা অল্প-অল্প কাঁপছে, সেই গুঞ্জনটা চলেইছে। একবার ধূলিম্লান দোপাট্টার প্রান্তভাগ বেব করে নাকের জল মোছে, আবার চুপ কবে থাকে...ওখানে কী দেখছে ও? ওখানে তো কালিই সোনার রোদ আব সবুজ ঘাস. জীবন-বশ্মি আর জীবনধৃতি। ও-সব দেখার অধিকার ওর আছে এ-কথা ওকে কে বলল?

ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে দুটো লোক একটা নেয়াবের স্ট্রেচাবে করে বাইরে রাখাব জন্য। ওদের পায়ের শব্দে মেয়েটা তাকায় এ-পাশে চমকে, মাথানাড়ার বেগে রুক্ষ্ম সোনালি চূর্ণকুন্তল উড়তে থাকে, আমি চেয়ে দেখি। একটা হাহাকার ওর বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে বের হতে চায়, মুখটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে যায়। চাঁপার কলির মতো অথচ অতীব নোংরা আঙুল দিয়ে দুহাতে মুখ সজোরে চেপে ধরে সে।

মড়াটাকে নিয়ে ওবা চলে গেল।...আমি করুণা-পরবশ হয়ে তার কম্বলের অংশ স্পর্শ করে বলতে যাই—কী বলতে যাই ঠিক জানি না। আমার বক্তব্য চিরকাল অকথিত বাণীই থাকবে। বলার আগেই মেয়েটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট-বৎ ছিট্‌কে সরে গিয়ে বলে—“মত লো। গোড় লাগতি হুঁ।”...তারপর আবার সেই গোঙরানোর চাপা আওয়াজ।

আমি বললাম—“ভয় পেয়ো না। ওদেব আমি কেউ নই। কিন্তু অমন কেন করছো মায়ী?”

মেয়েটা কাটাকাটিভাবে জবাব দিল এবার—“জানলে...ওরা...কম্বল নিয়ে নেবে। কম্বল!...জাড়া, এই জাড়াতে...মেরী বাচ্চা...” আরম্ভ হয়ে গেল আবার সেই কম্পান্বিত সুরে সমান সময়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে আওড়ানো—“মুন্না মেরী, লাল মেরে...”

এতক্ষণে বুঝলাম সমগ্র ব্যাপারটা। মেয়েটি শ্লীলতা এবং পুত্র নিয়ে পঞ্চনদের তীর ছেড়ে এখানে বেণী পাকাতে অথবা না-পাকাতে এসেছিল যখন, ও-দুটো আর যা সঙ্গে ছিল, শীতবস্ত্রের তালিকা তারমধ্যে ঐ কম্বলেই আরম্ভ এবং শেষ। পুত্র এবং সে বোধহয়

কাল রাত পর্যন্ত ঐ এক জিনিশেই শীত নিবারণ করেছে। কাজেই নিজের পরিচয় দিলে ও-কম্বল এবং কাপড় কলেরার বীজসংক্রান্ত বলে কেড়ে নিত ওরা। এর আগে মেয়েটা নিশ্চয়ই আর-কারো এমনটা হতে দেখেছে, অভিজ্ঞতাব নতুন স্তরে মাতৃত্বের বিকাশ তাই এমনভাবে। যারা কেড়ে নেয়, তারা শুধু কেড়েই নেয়, দেয় না।

...মেয়েটার মুখের দিকে আর-একবার তাকালাম নবোদ্ভিন্ন জ্ঞানের আলো চোখে নিয়ে। সে তেমনি ঘাড়টি কাৎ করে বাইরেটা দেখছে। ...মনে হ'ল, যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রথমযুগের পৃথিবীকে দেখছি, যখন পৃথিবীর ইতিহাসে শুধুই বর্ষাকাল, নিরবচ্ছিন্ন একটানা ব্রহ্মাবর্ষময় বর্ষাকাল। ...হাওয়ায়-হাওয়ায় কেবলই হাহাকার আর বিলাপময় সংগীত, মেঘের তিমিব অবগুণ্ঠনে দিক্‌দিগন্ত ঢাকা, বৃষ্টিতে অবিরল ক্রন্দনের সুর সৃষ্টিময়,...মঙ্গলগ্রহ থেকে তাব কতটুকু আভাস পাওয়া যেত?

কিন্তু এ আমার নিতান্তই কাল্পনিক ভাবোচ্ছ্বাস। আমি বাবা ও-সব ভেবে কিছু করতে পাববো না, ও তোমার সুখশয্যা পরিত্যাগ করে দেওয়ানা হয়ে বেড়াতেও পারবো না। সাফ কথা। দেশময় লোক তো কাগজে এইসব দেখছে আর সিনেমার টিকিট কাটছে, আমিও।

এরপর এ-সব দেখার অভিরুচি আমার না থাকারই কথা। এ-রকম ঘৃণ্য জায়গায় এসে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হযে মরে যাবো। নিতান্তই মেয়েলি বাষ্পসংকুল ঝোঁকের মাথায় ঐ পরিত্যাজ্য মেয়েটিব অঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়েছিলাম—অরে বাবা, কলেরার বীজ আমায় ধরলে বাঁচবো না।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ওদের জগতের দিকে তাকাতে তাকাতে নবোদিত উল্কার মতো বাইরের দিকে সরে পড়ি। অনেকটা বোধহয় সেইরকম ভঙ্গি হয়ে গিয়েছিল রাজচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী স্টেটসম্যানের শেষের পাতা ছবিতে ভরানোর জন্যে যে-ভঙ্গিতে শহর কলকাতার বস্তি পরিদর্শন করতেন।

কিন্তু ভাগ্য তখনও আমার ওপর বিরূপ। চরিত্রের দোষও অবশ্য আমার ছিল, চিরকালই আমি একটু বেশি কৌতূহলী। বিশেষ করে জন্তুজানোয়ার দেখাতে। কোথায় 'ইতি গজ' করেছিলাম জানি না, কিন্তু দর্শন তখনও আমার শেষ হয়নি যুদ্ধিষ্ঠিরের মতোই।

বাইরে বেরোতেই দেখি একদল নতুন বাস্তুত্যাগী এসে জুটেছে বিরাট পথ অতিক্রম করে সামনের মাঠে। দ্রষ্টব্য চেহারা তাদের। বোকার মতো থেমে ওদের দেখতে থাকি। তখন যদি জানতাম কী ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে, তবে কী দাঁড়াই আর!

ঝামেলাটা এল এক বুড়োর বেশে। বুড়োটার মাথায় মাটি মাখা পাগড়ি থেকে পায়ের ভাটা নাগরা পর্যন্ত একটানা একটি কাব্য।—আর-যাই হোক, কলেরার বীজ লোকটা ছড়াবে না। ভারতবর্ষের প্রতীক বলে যে-সব ছবি দেখতাম সচিত্র ইংরেজি পত্রিকায়, তাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে মুখের ভাঁজে-ভাঁজে পরতে-পরতে। হাতের শিরাগুলো পরিদৃশ্যমান। মুখে একটা দিশেহারার ভাব ফুটে আছে সুন্দর।...কিন্তু তার জীবনটা বোধহয় ঠিক কাব্য নয়, সুন্দর কী?—সে লোকটা আমার পরিষ্কার পোশাক দেখেই বোধকরি সোজা আমার

কাছে চলে এল। মরবার আর জায়গা পেল না। কী বলবো, আমার ঘুম হরে নিয়েছে ব্যাটা।

হাতে আবার মুঠিয়ে রেখেছিল কী-একটা কাগজ। প্রশ্ন করল—"হিন্দু?"

মাথা নাড়ি। সে একটু ভেবে আবার বলে—"এ হিন্দু ভাই, একটা খোঁজ দেবেন আমায়?" কেমন চক্রান্তকারীর মতো হাবভাব ওর।

পোড়া কৌতূহলটা তখন তীব্রবেগে চাড়িয়ে উঠেছে। বলি—"কী খোঁজো?"

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখে, তারপর—আর-এক পা এগিয়ে তার বোঁটকা গন্ধ সমেত মুখখানা আমার কাছে আনে। আ মোলো যা, অমন করে কেন? —ও বলে—"এই-সরকারের ঠিকানাটা জানেন?"

ঘাবড়ে গেলাম।—"সরকার! কীসের-সরকার?"

—"আহাঃ," বিরক্ত হয় যেন লোকটা—"রাজসরকার। হিন্দুস্থানের রাজসরকার, তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।"

—"তার সঙ্গে!" আমি আর-একদফা ভ্যাবাচ্যাকা খাই।—"আরে বুড়া, সরকার তো একটা লোক নয়, অনেক লোক, আমি-তুমি সবাই মিলে—"

ভাবলাম রাষ্ট্রগঠন পরিষদ আর Constitution Bill-এর সমস্ত কথা ওকে বলব কি না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বোধহয়। কাজেই মহান আদর্শটা—"আমি-তুমি-সবাই-মিলে—" দিয়েই শেষ করলাম।

...ওর পালা এবার ভ্যাবাচ্যাকা খাবার। এবং সেটা সে ভালো মতোই খেল দেখলাম। বলল ঢোঁক গিলে—"একটা লোক নয়? আমি-তুমি-সবাই মিলে? তবে—তবে আমি কী করি এখন। কার সঙ্গে দেখা করি?"

বিরাট র.স্য ওর কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে এই বিশেষ বৈঠকটি বন্দোবস্ত না-করার জন্যে। কষ্ট হল, ভাব দেখে। —"বেশ তো। দেখাই যদি করতে চাও, করো না দেখা পণ্ডিত জবাহরলালজির সঙ্গে। তিনিই তো সরকারের মাথা—"

—"পণ্ডিতজি পণ্ডিতজি..." লোকটা দু-চারবার নামটা বলে যায় পাখি-পড়ার মতো। হঠাৎ ঐ নোংরা একটা থাবা দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে—"লিখে দাও না, নামটা আমার মনে থাকবে না।"

খুব গল্প করার লোক পেয়েছিল যা-হোক। সন্তর্পণে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে রুমাল ঘষি। তারপর বিরক্তি-ভরা গলায় বলি—"পণ্ডিতজির নাম শোনোনি তুমি? দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে! কোথায় বাড়ি তোমার?"

মুহূর্তমধ্যে লোকটা কুঁকড়ে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিল। এ-ভাবটা আমার চেনা, ছোটো ছেলেকে আদর দিতে দিতে ধমক দিলে যেমন করে, ঠিক সেইরকম। আমার বাংলার চাষীরা যাকে ব্যথার বাথী ভেবে দুঃখের কথা বলে, সে যদি হঠাৎ আদেশের সুরে কথা বলে, তখন যেমন চাষীরা সুর করে কথা বলে, ঠিক সেইরকম। এই লোকটাও যখন কথা বলল, তখন মনে হল যেন চাকর প্রভুকে বলছে।—"বাড়ি লায়ালপুরের কাছে,

চাষের খেতে মজুরি করতাম আমি।"

আমার আবার মায়া হয়। বলি— "কিন্তু বুড়া, পণ্ডিতজির সঙ্গে তোমার দরকারটা কী?" আদরের রেশ টানার চেষ্টা করি গলায়।

ও আবার নিজেকে খানিকটা খুলে দেয়। কথাগুলো না-বললে যেন ওর চলছে না। বলে—"বাবুজি, আমার একটা সওয়াল আছে।"

—'কী সেটা?'

—লোকটা হাতের মুঠো খুলে কাগজটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে তার সেই প্রচণ্ড ভীষণ গোপন কথাটা। —"আমার সম্পত্তির তালিকা।"

—একটা খাটিয়া, দুটো ভঁইস, লাঙ্গল একখানা, কাপড়, তেজসপত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি রীতিমতো অবাক। ওর হাতে ওটা গুঁজে দিয়ে বলি —"কিন্তু এ-সব কেন?"

—"সরকারকে দেখাবো। আমার সব দেবে আবার।" নিশ্চিন্ত গলায় লোকটা জানায়।

মাথাটা ঘুরছে, পেটের মধ্যে হাসি গুলিযে উঠছে। "এইসব ফেলে এসেছ, তাই পণ্ডিতজির কাছে চাইলেই—"

ও পরিষ্কার বলে,—"ওরা যে তাই বলল। বলল, ওখানে তোমার সব দেবে! হিন্দু ভাইদের দেশ—"

করুণা হ'ল। লোকটা পাগলই? চুপ করে থাকি।

ও আবার বলে—"পণ্ডিতজি দেবে না এ-সব? চাইলে আমি পাবো না?"

আমি হাসলাম। ছোট্ট করে বললাম—"হুঁ!"

ও আবার তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভাবে। ওপাশটায় ওর সঙ্গীগুলোব মধ্যে জীর্ণ কাঁথা বিছিয়েছে কেউ, কেউ চুপ করে আছে, কেউ-কেউ নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি করছে। বলাবলি করার কী আর ওদের আছে?

বুড়ো বলল—"বাবুজি, সেই পণ্ডিতজি কোথায় আছেন?"

—"দিল্লিতে।"

—"দিল্লি?" ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—"দিল্লি তো নজদিক। কাছেই তো।"

...ওকে আর বললাম না, বড্ড দূর দিল্লি! বহুৎ! অনেক পথ।

লোকটা আবার নিস্তব্ধতার অতলে ডুবে যায়। নাঃ, এর মতো একটা বুড়ো গাধাকে মিছিমিছি খাটিয়ে আর অলীক আশা দিয়ে কাজ নেই। বলেই ফেলি।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলি—"দ্যাখো, তোমার মাথায় এ-সব কে ঢুকিয়েছে জানি না। তবে যে-ই বলুক, মিথ্যে স্তোক দিয়েছে। ও-জিনিশ এখানে আর তুমি পাবে না। ও-আশা ছেড়ে দাও। —আর পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা করাই বৃথা, হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।"

থেমে-থেমে, অন্যদিকে তাকিয়ে, হাত-টাত নেড়ে, এতটা অবধি আমি এগিয়েছিলাম, তারপব ওর মুখের দিকে চাই।

চুপ করে শুনল সে কথাগুলো, একটা পেশীও তার নড়ল না মুখের। হাতেব

কাগজটা তেমনি ভাবেই ধরা, মাটি-চষা লাঙ্গল-ধরা ফসল-ফলানো-পেশী—শিরাবহুল হাতখানা থরথর করে কাঁপছে শুধু। চাষীর হাত, ভারতবর্ষের হাত।

—পরমুহূর্তেই একেবারে ভেঙে বসে পড়ল ও। দু-হাত দিয়ে কাগজটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে আর কাঁদতে থাকে।—তাও আমি চেয়ে দেখি।

...খানিকবাদে তাকাল আমাব দিকে চোখ তুলে। আমাব অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। বহ্নিশিখা জ্বলছে তার চোখে। কান্না-টান্না কোথায় উড়ে গেছে। দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুকে আর বলিষ্ঠ চাউনিতে সর্বহীনের শেষ প্রতিজ্ঞার ভয়াবহ স্বাক্ষর।

আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে আবেগ-কম্পান্বিত গলায বলেছিল লোকটা—"দুশমনটা কে?...কে দুশমন? একবাব চিনতে পারলে তার টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে কাবার করে দিই!...জানতে একদিন পারবোই, সেদিন?"—হুংকার দিয়ে বলে শেষ কথাটা—"সেদিন? বেঁচে থাকবো, আমি বেঁচে থাকবো...সেদিনের—"

ওরে সর্বনাশ! এ যে সিডিশান!!...কলেরার বীজেব চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। ...উদ্দাম বেগে ধেয়ে যাই পথের দিকে, বাব্বাঃ—

সন্ধেবেলা।...সারাদিনটা ভেবেছি ওদের কথা। এখন অন্নপ্রাশনের মতো এমন একটা বিশাল প্রয়োজনীয় উৎসবের অভ্যাগত-অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আবার—মুন্না মেরী, লাল মেরে, মেরে লাল—নজদিক দিল্লি...টুঁটি...টিপে...টুঁটি...

নিজের অজ্ঞাতেই একবার গলায় হাতটা উঠে যায়। সচকিত হয়ে দেখি বাড়ির মালিক সশরীরে আমায় ডাকছেন। তাঁর সঙ্গে যাই। সবার মধ্যে বসি। আমাব বন্ধুদের মধ্যে। টেবিল থেকে পানপাত্র তুলে নেই।

...মুন্না মেরে, লাল মেরে...একটানা। এক ঘেয়ে।...লায়ালপুর...কোথায় লায়ালপুর? ...সেখান কী চাষ হয়, গম? দুশমন...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক চুমুকে সোমরস গলাধঃকবণ করি, হাতে পান-পাত্র।

কাচের গায়ে ফেনারা লেগে আছে, হাজারো তীব্র বাতির ঝলসানি তার এখানে-ওখানে। মাঝখানে আমি।...নিরুপদ্রবে নিজের প্রতিফলন দেখি স্ফটিকপাত্রে...

আর কী করবো?

# ড্রেসিং টেবিল

## সলিল চৌধুরী

বিয়ের পর নন্দা আমাকে যত চিঠি লিখত তার প্রায় প্রত্যেকটাতেই শেষ 'পুঃ' দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা থাকত : 'ঘব যখন নেবে আমার জন্য একটা ড্রেসিং-টেবিল কিনতে ভুলো না—আর, আব আয়নাটা যেন খুব বড়ো আর ভালো হয়।'

বিযের আগে নন্দার বাড়ি যখন যেতুম প্রথমেই নজরে পড়ত দরজাব সামনের দেওযালে একখানি চটা-ওঠা আয়না। তাতে মুখ দেখলে ওঃ যা দেখাত! নাক থেকে কপাল পর্যন্ত পুরো এক হাত লম্বা, আব ঠোঁট থেকে চিবুক মাত্তর এক ইঞ্চি। আবার একটু নড়লে-চড়লেই আয়নায় নানারকম ভঙ্গি করে মুখ ভ্যাংচাত।

রীতিমতো মন খারাপ হয়ে যেত আমার, আর নন্দা হাসত, বলত, 'তোমার কাছে যখন যাবো তখন ভালো আযনা কিনে দিও!'

পরবর্তী জীবনে নানা সমালোচকেব সম্মুখীন হতে হয়েছে—তাঁদের সমালোচনায় নিজের প্রতিবিম্বও দেখছি—দেখে বেশির ভাগ সময়েই মনে পড়েছে নন্দার বাড়ির সেই আয়নার কথা। সে কথা থাক—

বিয়ের ঠিক পরে। তখন আমার দু-তিনটে খবরের কাগজে ভালো চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছে, মানে এই হল বলে আর কী! সেটা না-হওয়া পর্যন্ত কটা দিন নন্দা তার বাবাব কাছে থাকবে—ঠিক হল। আর চাকরি হলেই ঘরভাড়া নিয়ে নন্দাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কেমন করে ঘর সাজানো হবে, কোন্ জায়গায় কী থাকবে—সে-সব প্ল্যান দুজনে মিলে আলোচনা করে পুরোপুরি মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলুম। নন্দা রইল গ্রামে তার বাবার কাছে। এর পরে ছ-মাসের কাহিনী যদি আপনারা শোনেন —থাকগে, সে-সব বলে লাভ নেই, কারণ যে-কাহিনী বলতে বসেছি সেটা আমার নিজের কথা নয়। তবু বলে রাখা ভালো যে চাকরি আমি পেয়েছি, নয়তো অনেকে মনে কবতে পারেন যে বেকার সমস্যার ওপর আমি কটাক্ষ করছি। অবশ্য যে-চাকরিগুলো পাবার কথা ছিল তার একটাও পাইনি, কিন্তু এমন-একটা পেয়েছি যা ঘুণাক্ষরে মনের ত্রিসীমানাতেও কোনোদিন ঠাঁই পায়নি। এক কথায়, জুতোর দোকানের সেলসম্যান। আর কসবার একেবারে ভেতরের দিকে যে এঁদো পুকুরগুলো আছে তারই একটার পাড়ে দুখানা টিন-দেওয়া ঘর এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বখরা করে ভাড়া নিয়েছি। নন্দাও চলে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে—মানে, বেশ আছি। নন্দার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে, বোধহয় সব মেয়েদেরই ওটা থেকে; সেটা হচ্ছে, অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। একদিনের জন্যেও মুখ শুকনো দেখিনি নন্দার—যেন কসবার টিনের ঘর ভাড়া নেওয়াটাই তার আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু একটা ব্যাপার, এ-ঘরে আসার

পর থেকে একবারের জন্যও নন্দা বলেনি ড্রেসিং-টেবিলের কথা। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময় এক শনিবারের দুপুরবেলা একটা ঘটনা ঘটল। নগদ করকরে ষাট টাকা মাইনে গুনে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরছি পথের দু-দিকে চাইতে-চাইতে। ইচ্ছে করলেই কত-কী কিনতে পারি, অথচ কিছুই কিনছি না, এটা যেন আমার সম্রাটিক খেয়াল। বেশ লাগে পকেটে টাকা থাকলে। হঠাৎ ঠিক কসবার মোড়ে দেখি এক চমৎকার ড্রেসিং-টেবিল রাস্তায় নিলেমে বিক্রি হচ্ছে। আরো কত-কী ফার্নিচার আশ্চর্য শস্তায় যাচ্ছে। ড্রেসিং-টেবিলটার গ্লাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা, তাছাড়া প্রায় নিখুঁত—দাম উঠল মাত্র তিরিশ টাকা—ভাবুন! হুপের মাথায় 'যা থাকে বরাতে' বলে কিনে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে সটান বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। বাড়িভাড়া যাবে ১৫ টাকা, বাকি ১৫টি টাকায় সারা মাস সংসার চালাতে হবে। নন্দার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল—কত আশা কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেচারি ভালোবাসতে শুরু করেছিল, তার তো কিছুই মিটল না! তিরিশ টাকা যায় যাক, কুছ পরোয়া নেই।

বাড়ি ঢুকতেই নন্দা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল—তারপরে কী যেন ভেবে কী ভীষণ খুশি যে হয়ে উঠল কী বলব। অন্য মেয়ে হলে হয়তো টাকার হিশেব করে এতক্ষণে প্যানপ্যান করতে বসত—কিন্তু দরিয়ার মতো দিল আছে নন্দার—কবি না-হোক, কবি-স্ত্রী হবার সে নিশ্চয় উপযুক্ত। প্রায় সারাক্ষণ নন্দা আয়নার সামনেই বসে কাটাল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চুল বাঁধল—কাপড় ছেড়ে কপালে টিপ পরল—মাথার ঘোমটা টেনে অকারণে দু-একবার হাসল। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খুশিতে যেন আবেশ আসছে—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। বিয়ের আগের দিনগুলো স্বপ্নে ভাসছে—কেমন যেন সার্থক মনে হচ্ছে জীবন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—নন্দা ডাকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম—নন্দার দু-চোখ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে—চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে—সারা শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে!

'কী হয়েছে নন্দা? কাঁদছো কেন অত?'

'ও, আয়না তুমি ফেরত দিয়ে এসো—ও আমার চাই না,' বালিশে মুখ ঢেকে নন্দা কাঁদতে লাগল। হয়তো পুরোনো জিনিশ বুঝতে পেরে ওর অপমান হয়েছে। কিন্তু নতুনের দাম কত! সে কি আর আমাদের কেনার সাধ্যি। এত অবুঝ হলে কেমন করে চলবে? আর জিনিশটা তো প্রায় নতুনই বলা যেতে পারে।

'ছি! নন্দা শোনো।'

'না, না, না, আমার চাই না। তুমি ফেরত দিয়ে এসো।' স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কেবল সংকীর্ণ একটা প্রেসটিজ বড়ো হল নন্দার। আর আমার কোনো দামই নেই ওর কাছে?

'বেশ। তাই হবে। ফেরত দিয়ে আসব।'

নন্দা আস্তে-আস্তে উঠে চলে গেল—খানিক পরে ফিরে এল আবার। আমার কোলের ওপর একতাড়া চিঠি ফেলে দিয়ে বলল—'এইগুলো পড়ে দেখো।' নীল খামে মোড়া পরিষ্কার বাংলায় লেখা চারখানা চিঠি।

'কার চিঠি এ? কোথায় ছিল?'

'আয়নার দেরাজের মধ্যে ছিল।'

চিঠিগুলো নিয়ে বসলুম। খুলে পড়তে শুরু করলুম এক-একখানা করে—হাত কাঁপছে—কী ব্যাপার কে জানে? তারিখ হিশেবে পর-পর সাজালে চিঠিগুলো এই:

## এক

বাগেরহাট

প্রিয়তমাসু—

আজ রাত বারোটায় এখানে এসে পৌঁছেছি। মনে হচ্ছে কতদিন যেন ছেড়ে এসেছি তোমাকে। ভাবতে অবাক লাগছে কাল এতক্ষণে তুমি কত কাছটিতে ছিলে।

জায়গাটা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অমলের কথা মনে আছে তো? সে এখানকার কলেজে প্রোফেসারি করছে। কাল থেকে তার ওখানেই উঠব। শরীর বড়ো ক্লান্ত লাগছে —অবশ্য ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ট্রেনে একটা বড়ো মজার ব্যাপার হয়েছে, শোনো: আমার সামনের বেঞ্চেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছোটো ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার সহযাত্রী। সুন্দর ঝকঝকে একটি পরিবার—ছেলেমেয়ের নিটোল-স্বাস্থ্য প্রৌঢ়ের অমায়িক হাসি-মুখ আর খাঁটি বাংলার মা—ভীষণ ভালো লাগছিল। স্কেচবইটা বের করে মনে রাখার মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। একটি মেয়ের নজরে পড়ল যে আমি ছবি আঁকছি—সে তার বোনকে বলল, বোন মাকে বলল—মা বাবাকে বললেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভীষণ উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন, 'তাই নাকি? দেখি কেমন আঁকলেন আমাদের? আরে! এমন অদ্ভুত মশাই! একেবারে জাদুকর লোক দেখছি আপনি?'

তারপর মহা হৈ-চৈ। যাই কেনেন তাই খেতে দেন আমাকে, কিছুতেই ছাড়বেন না।

'আরে মশাই, বাঙালির এত দুর্দশা কেন জানেন? তারা শিল্পীর কদর জানে না। আমারও ও-সব শখ ছিল—এককালে নামও ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে মহলে। নিন ধরুন —লজ্জা কীসের?'

খেতে হল। ভদ্রলোক যখন বলেন উত্তরের প্রত্যাশা করেন না—মনের ভাবটা যেন এই যে তাঁর ওপরে আর-কোনো কথাই চলতে পারে না।

'বিয়ে-থা করেননি তো? বেশ!! এটি যেন করবেন না—এই দেখুন না আমার- -হেঁ হেঁ—সব চুলোয় যাবে তাহলে'—আমি বলতে যাচ্ছিলুম আমি বিয়ে করেছি—ভদ্রলোক মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন:

'আমার মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান না আপনি? যা লাগে দেবো, কলকাতাতেই তো থাকেন—আমার বাড়ি হচ্ছে—বিডন স্ট্রিট। আসবেন নিশ্চই। যাক, তাহলে, ঐ কথাই রইল। হাসি, খুশি! তোরা খুশি তো? দ্যাখ, কেমন মাস্টার পেয়ে গেলি—হেঁ হেঁ—হেঁ।'

কোনো কথার উত্তর দেবারই অবকাশ নেই আমার। বোন দুটি জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি

আসবেন তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসবো।' উপায় নেই।

ইতিমধ্যে ছোটো ভাইটি আমার ব্যাগ হাৎড়ে অ্যালবামটা টেনে বের করেছে— আঙুলে থুথু লাগিয়ে ছবি উলটে দেখছে।

মা বললেন, 'ছি খোকা, অসভ্যতা কোরো না, রেখে দাও।'

'না, মা! মাস্টারমশাই আমাকে দেখতে বলেছেন, বলুন না আপনি, বলেননি?'

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ওকে দেখতে বলেছি।' এরা সব একজাতের।

ভদ্রলোক রানাঘাটে নেবে যাবেন। তোমার তৈরি লুচি বের করলুম— 'খেতেই হবে।' খোকাকে দিলুম, বোনদের দিলুম। নানা কথা হল—দেশের স্বাস্থ্য, টেনান্সি অ্যাক্ট, কমনওয়েলথ। তারপর তাঁরা নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে, হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন: 'আরে ভালো কথা, আপনার নাম-ঠিকানাটা তো জানা হল না। বলুন বলুন—তিনি কাগজ কলম বেব করলেন। একবার বললুম—শুনতে পেলেন না—আবার বললুম—'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ্যাঁ?'

'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ।'

লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'তা বেশ বেশ! কিন্তু ধরাব উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালি—তাই নয় গো?'

দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালি—তাই নয় গো? আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম: 'এখন কী বুঝলেন, তবে পাঞ্জাবি?' কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

আবহাওয়াটা সহজ করার জন্যে বোন দুটি তেমনি হেসে বলল—'ভুলে যাবেন না, আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রিট।' হাসবার চেষ্টা করলুম।

গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে পেলাম খোকার হাত থেকে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবারটা। তোমার হাতের তৈরি সেই খাবারের টুকরোটা প্ল্যাটফর্মে পড়ে রইল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কবল—মনে হল কামরাশুদ্ধ লোককে ডেকে বলি : 'দ্যাখো তোমরা —, বড়ো অবিচার হল, দ্যাখো।' কেউ কিছু জানল না। আমি চুপচাপ বসে বইলাম —সমস্ত দিনটাই আমার মাটি!

সব কথা এখন আর মনে নেই—মনে রাখতেও চাইনে, মাঝে-মাঝে বোন দুটির কথা কানে ভাসছে: 'ভুলে যাবেন না—আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রিট।' মনে-মনে বলি:

'না, তোমাদের ভুলব না বোন—তোমরাই নতুন বাংলা—তোমাদের মুখ চেয়েই যে আমরা বেঁচে আছি—তোমাদের ভুলব না।' চিঠির উত্তর দিও।...

তোমার রহিম

খামের উপরে ঠিকানা লেখা :—

আমিনা চৌধুরী
উজানিপাড়া, হাওড়া

## দুই

বাগেরহাট

বৌ—

আজ সকালে অমলের বাসায় এসে উঠেছি। পথে আসতে দেখছি বহু লোক ঘববাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। থমথম করছে সমস্ত শহবটা—লোকে জোরে কথা পর্যন্ত বলছে না। বুঝতেই পারছ, হঠাৎ একেবারে এর মাঝখানে এসে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। ব্যাপারটা ভালো কবে বোধগম্য হওযার আগেই শুনি অমল চাকরিতে ইস্তফা দিযেছে—মালপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই ওরা পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় বওনা হবে। আমাকে ওরা আশা কবেনি—অমলের বৌ একটু ফিকে হাসল।

'ব্যাপার কী. অমল? কী খবব, বৌদি? তোমরাও শেষকালে চললে?'

বৌদি হাসবার চেষ্টা করল, 'তোমাদের দেশে তো আর আমাদের জায়গা হবে না ঠাকুবপো!'

'আমাদের দেশ? আমাদের দেশ মানে? খুলনা তো অমলের দেশ—আমার দেশ ২৪ পরগণা—যাচ্ছ তো আমার দেশেই শুনছি।'

'আজকাল আর তা নয়—এখন মোছলমানের দেশ পাকিস্তান আর হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান।' অমল বলল বৌদিকে : 'তুমি যা করছিলে তাই করো গিয়ে।' জিনিশপত্র গোছাতে বৌদি চলে গেল। চুপচাপ অমলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অমলের বাচ্চাটা নতুন হামা দিতে শিখেছে—ফুটফুট করছে সুন্দর—সামনে দুটো দাঁত উঠছে। সে তার বাপেব পা ধরে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে কেঁদে উঠল। অমলের ভ্রূক্ষেপ নেই।

'শোন বহিম, কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'বল, শুনছি।' বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলুম।

অমলের কাছে যা-কথা শুনেছি তার মোট কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি: শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে নমশূদ্রের গ্রামে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। নমশূদ্ররা বেশির ভাগই চাষী—নয়তো জেলে। স্বভাবতই তারা গরিব। কিছু দিন ধরে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা একজোট হচ্ছিল। তাদের দুজন নেতাকে ধরবার জন্য পুলিস ওযারেন্ট বের করে। নেতাদের মধ্যে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। তাদের ধরার জন্য গ্রামে যখন একদল পুলিস ঢোকে চাষীরা তাদের বলে ফিরে যেতে। তাতে কাজ না-হওয়ায় কিছুটা উত্তম-মধ্যম দিয়ে তারা তাদের বের করে দেয় গ্রাম থেকে। এর পরেই ঘটনার শুরু। বহু আর্মড পুলিস আর বে-সরকারি গুণ্ডাবাহিনী গিয়ে হাজির গ্রামে। স্ত্রীপুরুষনির্বিচারে শুরু হয় প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়—আর যা পায় লুঠ করে নিয়ে আসে। সমস্ত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালাতে শুরু করে—আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এদিকে জোর প্রচার চলতে থাকে যে হিন্দুরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু—ওদের তাড়াও। এই সুযোগে শহরে গুণ্ডারা হিন্দুদের কয়েকটা দোকান লুঠপাট করে—আগুন দেয়। সদর রাস্তায় ওরা শাসাতে থাকে হিন্দুদের। আনোয়ারকে তোমার

মনে আছে? সেই যে-স্কাউনড্রেলটা কলেজে একদিন তোমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল? শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে শেয়ারের বিজনেস করার নাম করে তার যথাসর্বস্ব মেরে দিয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছে। এখন শুনি সেই নাকি এখানকার গুণ্ডা বাহিনীর মস্ত বড়ো কর্তা। তিনিই নাকি লীড করছেন।

শুনে পর্যন্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে। রাসকেলটার যদি একবার দেখা পাই তো ওর টুঁটি আমি ছিঁড়ে দেবো—এ তুমি দেখে নিও! অমলরা চলে যাচ্ছে—কাল না-গেলে পরশু যাবে—নয়তো তার পরদিন। কী বলব ওদের বলো তো? লজ্জায় দুঃখে আমার বুকটা খান-খান হয়ে যাচ্ছে। কী যেন আমার একটা কবা উচিত, বুঝতে পারছি না। অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয়, আমার দেশকেই বা আমি আঁকড়ে থাকব কোন যুক্তিতে? ভাবতে খারাপ লাগছে বড়ো। এখানে বিশেষ কাউকে চিনি না। একটি পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তারা পীস কমিটি করছে বলল। সব কাজকর্ম এখানে প্রায় বন্ধ। ভাবছি কাল-পরশু নাগাদ ঢাকা চলে যাব। সেখানে শুনছি কিছু-কিছু কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছু ভেবো না। আজকের দিনে মানুষকে আর সহজে বেশিদিন বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না। মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই—এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে। ওখানকার পরিচিতদের কাছে এখানকার সঠিক খবরটা দিও।...

তোমার রহিম

## তিন

ঢাকা

বৌ—

তোমার চিঠি পেয়ে আরো ভাবনা বাড়ল। কলকাতার কাগজগুলো খুলনার ব্যাপারকে যদি এইভাবে প্রচাব করতে শুরু করে থাকে তাহলে তার সাংঘাতিক ফল ফলবে। যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস করবে। তবে ওরা বোধহয় নিশ্চিন্ত যে সময় বুঝে দাঙ্গা বাধানো বা থামানো—এটা ওদেরই হাতে! এখানকার কাগজগুলোও ঠিক তাই শুরু করছে। পরস্পরের ওপর সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে, কখন কী ঘটে সেই আশঙ্কায় সবার চোখেমুখে বিষণ্ণতা দেখছি, এমন যদি কোনো শক্তি থাকত যা এই সমস্ত নোংরামিকে পায়ে মাড়িয়ে মনুষ্যত্বের ধ্বজাকে উঁচুতে তুলে ধরবে, শুধু আমি নয় প্রায় সবাই মনেপ্রাণে এই কথাটি অনুভব করছে—কিন্তু সে কই? এখানে সরকারি মহলে কিছু কাজের আশায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। আমি যে বাঙালি, এই কথাটাই প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। তুমি তো জানো, আমি পয়সা খরচ করে উর্দু ভাষা শিখেছিলাম। উর্দু সাহিত্যকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু যখন সেটা শাসনের দণ্ড হয়ে সোজা ঘাড়ের ওপর পড়তে চায়, আমার সংস্কৃতির টুঁটি টিপে ধরে, তখন তাকে বর্জন করাই মানুষের কাজ। সকলের কথায় সোজা বাংলায় উত্তর দিই—বুঝলে ভালো, না-বোঝে পরোয়া নেই। কাজেই কাজ যে জুটবে না বেশি,

তা বোধহয় বুঝতে পারো।

তোমার রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে জেনে ভারি কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দেখে যারা কথা না-বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাদের রবীন্দ্রসংগীত শেখবার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু এ-বিশ্বাসও হারিও না যে এরা সবাই ভালো—এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? দুর্ভাগ্য দেশের অভিশাপ এখনো কাটেনি, সে-দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমি বাদ যাবো কেমন করে বলো, বৌ! মনুষ্যত্বের অপমান যখন দেখি, মনে হয় আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খাক করে দিই হতভাগা দেশের পচা আবর্জনাগুলোকে।

সেদিন শুনলুম কয়েকটা চ্যাংড়া মিলে সদর রাস্তার ওপরে এখানকার কলেজের পণ্ডিতকে যাচ্ছেতাই অপমান করছে—টিকি কেটে দিয়েছে, মুখে গোমাংস দিয়েছে জোর করে। ভাবতে পারো? আমি শুনে এখানকার মাতৃব্বরদের বললুম: 'আপনারা থাকতে চোখের সামনে এইসব অনাচার ঘটছে—আপনারা কি ঠিক জানেন যে আপনারা এখনো বেঁচে আছেন?'

তাঁরা বললেন : কী করব—ওদের হাতে বন্দুক আছে, পেছনে পুলিশ আছে। ওরা হুমকি দিয়েছে যে-কেউ ওদের বাধা দেবে তারাই পাকিস্তানের শত্রু। তাদের ঘরদোর ওরা জ্বালিয়ে দেবে, তাদের খুন করবে—ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় গোটা জাতটারই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, নইলে কটা আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় না? আগাছাই বোধহয় জন্মাচ্ছে বেশি—বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও স্বীকার করতে হবে।

এখানে আর মোটে ভালো লাগছে না, বৌ। এধারে এসেই বোধহয় ভুল করেছি—তোমাকে ছেড়ে আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি না।...কাজকর্ম চুলোয় যাক, দু-একদিনের মধ্যেই পাড়ি দেবো। অমলের চিঠি পেয়েছি—ওবা আগামী কাল রওনা হবে। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে লিখেছে। ওখানেই ওদের ব্যবস্থা করে দিও। কোনোরকম চলে যাবেই।

তোমার রহিম

[এর পরের চিঠিটা প্রায় কুড়িদিন পরে লেখা। মনে হয় এর আগে আরো চিঠি লিখেছিলেন—যে-কোনো কারণেই হোক সেটা নেই]

## চার

আমিনা—

আমি বোধহয় শিগগিরই পাগল হয়ে যাবো। গত সাতদিন ধরে এক সেকেণ্ডের জন্যও ঘুমোতে পারিনি—পাগলের মতো সারা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে—বীভৎস তাণ্ডব চলছে পশুত্বের। চারিদিকে চিৎকার, কান্না আর পৈশাচিক উল্লাস। তার ওপর আজ আট দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র নেই। হাজার-হাজার

রিফিউজি এসে জড়ো হচ্ছে। তারা বলছে কলকাতায় আব একজন মুসলমানও বেঁচে নেই। বিশ্বাস কবা উচিত কি না সে-বিচারের বুদ্ধিও আমার লোপ পেয়ে গেছে। তুমি কোথায় আছো? তুমি এখনও আছো তো? এ-কথা আজ আর কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করি না—জিজ্ঞেস করি সূর্যকে, জিজ্ঞেস করি গাছপালাকে—আর জিজ্ঞেস করি, আমার আমিনা কেমন আছে? কোথায আছে?

অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডাব থেকে ওদের মারধোর করে সমস্ত লুঠপাট করে নিয়েছে। বৌদিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে—অমল কোনোরকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁছেছে। অমল লিখেছে—'আমার অবস্থার কথা না-লেখাই ভালো, তবে এটুকু জ্ঞান এখনও আছে যে এ-খবর কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়া উচিত নয়। যা ভালো হয় কবিস। আমি দেহমনে সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে গেছি।' আমি এখনই বেবিয়ে পড়ছি। এখানে আব কয়েক ঘণ্টা থাকলে বোধহয় আত্মহত্যা করে বসবো। বৌদিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার খবর পেলে মনে অনেকটা জোব পেতুম। জানি না আবার কবে তোমায় দেখব—জানি না দেখব কিনা।

আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা কোরো। বড়ো অহংকার ছিল আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি—সে-অহংকাব চূর্ণ হযেছে। মনুষ্যত্বকে বড়ো করতে গিয়ে পশুত্বকে ছোটো করে দেখেছি—তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেখানেই থাকো, যেমন থাকো,—সাবধানে থেকো। তোমাকে আমি হারাতে পারবো না বৌ, অমলের মহত্ত্ব আমার আছে কিনা, সে-পরীক্ষা দিতে আমি পারবো না। আমি সাধারণ মানুষ।...

তোমার রহিম

চিঠি এই কটাই। পড়ার পব হাওড়া উজানিপাড়ায় গিয়ে খোঁজ করেছি শিল্পী রহিমুদ্দিনের বাড়ি কোনটা। কেউ বলেছে—'জানি না।' কেউ বলেছে—'এ-পাড়ায় কোনো নেড়ে -ফেড়ে আর নেই মশাই।' একজন পানওয়ালা শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিল একটা একতলা বাড়ি—তার দুখানা ঘর নিয়ে ওরা থাকত। বাড়িটার শোচনীয় অবস্থা, দরজা-জানালার একটারও কপাট নেই—মাঝখানে কেবল একটা চট ঝুলছে। ডাকাডাকি করলে কেউ সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত চট সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি অন্তত বিশজন মেয়েছেলে--বাচ্ছাকাচ্ছা শুদ্ধ কেউ বসে কেউ শুয়ে রযেছে। আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। বাড়িটার চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। জিজ্ঞসা করলাম: 'রহিমুদ্দিন চৌধুরী এখানে থাকেন?'

তারা কেউ নাম শোনেনি রহিমুদ্দিনের—সেদিন সকালে খালি ঘর পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে—পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু সব। শুনলাম এরই মধ্যে চারবার হুমকি দেওয়া হয়েছে —রাতের মধ্যে উঠে যেতে হবে। একটি মধ্যবয়সী মহিলা ঘরের এককোণে বসে বমি করতে শুরু করলেন, সবাই নির্বিকার। একধামা খই মুড়ি নিয়ে দুটো ছেলে ঢুকল—দেখে মনে হল স্কুলের ছাত্র। তারাই ওদের এ-বাড়িতে জোর করে জায়গা দিয়েছে

—দেখাশোনা করছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলুম। একজন চিনত রহিমুদ্দিনকে—আমিনাকেও চিনত। তার দিদি রহিমুদ্দিনের কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত—সেও আসত দিদির সঙ্গে। তার কাছে সব খবর পেলুম। বলল: 'মাস্টারমশাই শুনেছি পাকিস্তানে আছে—কিন্তু আমিনা দিদি বোধহয় বেঁচে নেই। একদিন বাতদুপুরে এই ঘরটায় শিকল বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আগুন নিভিয়ে ওদের উদ্ধার করতে—কিন্তু পারিনি—তখন ভীষণ গুলি চলছিল।' ছেলেটির চোখ ছলছল করতে থাকে। বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম—সমস্ত দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে—পাশেই একটা নিমগাছ ঝলশে কুঁকড়ে গেছে। আগুন লেগেছিল সত্যিই। নন্দাকে ব্যাপারটা বলিনি—কেননা একটা সন্দেহ আমার হয়েছে, আমিনা যদি পুড়েই মরে থাকে—ড্রেসিং টেবিলটা অক্ষত রইল কী করে?

ছাত্রটি বলেছিল: টেবিলটা ছিল পাশের ছোটো ঘরটায়। হয়তো আমিনাও সে-ঘরে ছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়?

নন্দাব বিশ্বাস, কাগজে খবরটা বেরুলে আমিনা এসে নিয়ে যাবে তার ড্রেসিং টেবিলটা, তাই এই কাহিনী লেখা। আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে।

**পরিশিষ্ট**

কাহিনীর এখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই পাঠক-পাঠিকার কাছে। হযতো তাব সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই—কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। গত পয়লা এপ্রিল একটি বাংলা কাগজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে:

'হাওড়া স্টেশনের নিকটে গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাহার কাছে একটা ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি তুলি ও কিছু স্কেচ ছবি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ হয় সে হাওড়া স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে পাগলেব ভান করে ও বলে : 'একজন মানুষ।'

খবরের হেডলাইনে লেখা—'পাকিস্তানের গুপ্তচর গ্রেপ্তার।'

# অঙ্গপালি

## রমাপদ চৌধুরী

মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে হলো। এক যুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশী দিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেল কত পরিবর্তন।

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিলো দিকে দিকে। আর চিৎকাব। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিলো আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমেছিলো ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর দেখতে পেয়েছিলো ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ। ধোয়া চাদরের মতো ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিলো ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। তারপর। পশুর মতো চোখে আর প্রেতের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিলো ক্রুদ্ধ জনতার মদো রক্তের চিৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল, কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপর কি যেন ঘটেছিলো। ভালো করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলো ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিলো। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কত দিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণদুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত না নিঘুম রাত। তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিলো সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিলো ওদের। কি হবে মিথ্যে দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি। অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পাবে। স্নেহ আর ভালোবাসা নয়, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেলো সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্তমাংসে-গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করলে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

এমন সময় ডাক এসে পৌঁছলো। পুলিসের সাহায্যে কারা যেন উদ্ধার করলো ওকে।

তারপর।

আট মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সবিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মূর্তির মতো।

ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের মতো সশব্দে চলে গেল পুলিসের গাড়িখানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে তাকালো ও মা-র মুখের দিকে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়লো ওর, চোখ নিবদ্ধ হলো পায়ের দিকে। মুখ তুলতেও কেমন এক অস্বস্তি।

—আয়।

ছোট্ট একটি অভ্যর্থনার ডাক। হয়তো আন্তরিক, হয়তো বা উপায়হীন। সবিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আরেকবার চকিতে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, মা-র চোখে চাপা কান্নার অশ্রু।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো মা-র শরীরের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে। নেই? বাবা নেই? দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা।

কপালে ঠেস দিয়ে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ছোট বোন কবিতা। এগারো বছর বয়সের মেয়ে, কিছুই চেনে না, কিছুই বোঝে না, তবু কেমন এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওব চোখে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলে সবিতা।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। কি বলবে, কি-ই বা প্রশ্ন করবে? তার চেয়ে একেবারে চুপচাপ থাকা ভালো। কথা বললেই তো পাশ থেকে একটা কথাই খোঁচা দেবে। মনে পড়বে, মনে পড়িয়ে দেবে ওর অতীতের গ্লানির দিনগুলোকে।

মা বললে, বোস এখানে। আর নয়তো যা কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আয়। জিরিয়ে নে একটু। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করি গে।

নিজের মনেই হাসলে সবিতা। উত্তর দিলো না। লজ্জা আর অস্বস্তি ওর একার নয়। মা ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়, সরে থাকতে চায়।

মা চলে যেতেই কবিতাকে কাছে ডাকলে ও।

মৃদু হেসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো।—কেমন আছিস?

কবিতা ঘাড় নাড়লে, অর্থাৎ ভালোই।

—দাদা?

ছোট্ট একটি কথা। কি অর্থ ওর? যে-কোনো অর্থ ধরতে পারে কবিতা। দাদা কোথায়, দাদা কেমন আছেন। কিংবা, দাদা আছেন কি?

চমকে চোখ তুললে কবিতা। সবিতা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রশ্ন করলে, বকু? বকুও নেই?

—ছোড়দা কলেজে গেছে।

যাক। আছে তা হলে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সবিতা। জোর করে হাসলে, খুশিতে নেচে ওঠবার চেষ্টা করলে। মিলেমিশে যেতে হবে। ঠিক আগের দিনের মতোই। হয়তো অস্বাভাবিক মনে

হবে ওর ব্যবহার, চোখে লাগবে। তবু, মাঝখানের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে। দূরে দূরে থাকলে দূরের মানুষ হয়ে যাবে ও। সে আরো কষ্টকর, অসহ্য।

হাসিখুশি মুখে কোলের শিশুর গাল টিপে আদর করলে সবিতা, চুমু খেলো।

হাসতে হাসতে বললে, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কি দুষ্টু? চিনিস, একে চিনিস তুই?

কবিতাও হেসে হাত বাড়ালে। ওর কোলে ছেড়ে দিলো ছেলেটাকে। তারপর ছেলেকে আদর করতে কবতে কবিতাকে জড়িয়ে ধরলো। যেন ওর ছেলেকেই আদর করছে সবিতা। বাঁ হাতটা কবিতার কাঁধেব ওপর দিয়ে গিযে শিশুব চুলে বিলি দিতে শুরু করলে। কবিতার পিঠের ওপর বুকের চাপ পড়লো ওর। কবিতা বুঝলো না। ছোট ছেলেপিলে দেখলেই মেতে ওঠে ও। এ তো দিদিব ছেলে। সবিতার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিলো, খুব ইচ্ছে করছিলো কবিতাকে জডিয়ে ধরতে। বুকের কাছে টেনে আনতে চায় ও কবিতাকে। এতদিন পরে আবার আপন করে, অন্তরঙ্গভাবে ফিরে পেয়েছে ও ছোট্ট বোনটিকে! খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতে ইচ্ছে কবে তাই।

হঠাৎ মা-র পায়ের শব্দে মুখের হাসিটা ওর থমকে গেল। চট করে ছেলেকে কোলে তুলে নিলো ও। এত রঙ, এত রসিকতা, এত আনন্দ হয়তো মা-র চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

মা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

শিশুর দিকে হাত বাডিযে কবিতা বললে, কি সুন্দর চোখ দুটো, দেখো মা। কেমন দুষ্টুমির হাসি দেখছো?

খুশির ছোঁয়াচ লাগলো হয়তো, মাও হাসলো।

কবিতা জিগ্যেস করলে, কত বয়স হলো দিদি এর?

সবিতা উত্তর দিলো না প্রথমবারে। মা-র সামনে ওর কেমন এক অস্বস্তি।

কবিতা আবার প্রশ্ন করলে।

উত্তর এলো, শুকনো উত্তর।—আট মাস।

—ও মা। মাত্র আট মাস! কি ভাবি বাবা, কোলে রাখা যায় না। কেমন নাদুসনুদুসটি হয়েছে, না মা? আমি ভেবেছিলাম এক বছর দেড় বছর হবে।

মা বা দিদির কাছ থেকে কোনো কথা যে শুনতে পেলো না ও, কবিতার সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ও কথার পর কথা বলে চলেছে।

—কি নাম রেখেছো দিদি?

—নাম নেই। শুকনো গলায় উত্তর দিলো সবিতা।

অর্থাৎ নাম যেটা আছে, সেটা বলা চলে না।

কবিতা এদিকে বিস্ময়ে চোখ গোল করলে, নাম দাওনি এখনো? কেমন হাসিখুশি দেখছো মা। আচ্ছা, কি নাম দেবে বলো তো? হয়েছে, ও বাড়ির বউদি নাম দিয়েছে হাসি, এর নাম দেবো খুশি। খিলখিল করে হেসে উঠলো কবিতা।

তারপর শিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, হাসির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো বুঝলে

খুশি? বাঙা টুকটুকে দেখতে। কাল আনবো, দেখো।

সবিতা গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিলো। তবু পারলে না। ক্রমে ক্রমে একটা হাসি ফুটে উঠছিলো ওব চোখে।

মা বললে, যা সবি, হাত-মুখ ধুয়ে আয।

কবিতা হঠাৎ ফিবে তাকিযে বললে, কেমন দিদিমা বাপু তুমি, নাতিকে কোলে নিলে না সেই থেকে।

মা হেসে হাত বাড়ালো।

কলঘবের দিকে পা বাডিয়েছিলো সবিতা। দোরেব আডাল থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, মা কোলে নিলো ওকে।

সবিতাব বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। ঘুঙুরের বোল ফুটলো বুকের মধ্যে।

স্নান সেবে এসে সবিতা দেখলে খুশি তখনো মা-ব কোলে। কবিতা কাড়াকাড়ি করছে, কিন্তু না, মা কিছুতেই দেবে না।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে সবিতা। চোখ ভরে, প্রাণ ভবে দেখলে।

মাকে ওর ভয ছিলো। মা-র শুচিবাই ওর অজানা নয়! তাই আশঙ্কা ছিলো। পুলিস যখন ওকে উদ্ধাব কবতে যায়, হাত-পা ধরে অনুনয় করেছিলো ও। বলেছিলো, আমি তো বেশ সুখেই আছি, ফিরে যেতে চাই না। আর, আর ফিরে গেলেইবা মা-বাবা আমাকে ফিরে নেবেন কেন? আমার জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি। ওরা শোনেনি। আইন—আইনের দোহাই পেড়েছিলো। মা-বাবা গ্রহণ না করলেও, অনাথ আশ্রম আছে, সে ভরসা দেখিয়েছিলো।

সে কথা ভেবে সবিতার হঠাৎ মনে হলো মাকে সে চিনতো না। আজই প্রথম চিনলো যেন।

মানুষ কত বদলে যায়। সবিতা ভাবলে। মনে পড়লো ছোটবেলার কথা। ইস্কুল থেকে ফিবে কাপড় না ছাড়লে মাকে ছুঁতে পেতো না ও, ঘরের জিনিসপত্তরে হাত দিতে পেতো না!

সবিতা এবার মুখ খুললো।—একটু চা করে দিবি কবি?

মা ফিরে তাকালো।—বোস, খাবাব নিয়ে আসছি।

মা চলে গেল খাবার আনতে।

বিকেলের রোদ কমে এসেছে তখন। রাতের ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। বই বগলে বকু ফিরে এলো।—দিদি, তুই?

—হ্যাঁ, আমি। সবিতা হাসলে। বললে, ভূত ভেবেছিলি বুঝি?

বকুও হাসলো। বললে, আমরা ভেবেছিলাম, তুই মরে গেছিস।

—তা হলেই ভালো হতো, না?

—দূব। মরে কোনো আরাম নেই।

সবিতা হেসে বললে, পড়াশুনা করছিস আজকাল, না আগের মতোই?

বকু উত্তর দিলে, এ তো আর ইস্কুল নয়। কলেজে ভরতি হয়েছি। না পড়লে চলে?

—তাই বুঝি? সবিতা হাসলে।

কবিতা ফোড়ন কাটলে, পড়ে না ছাই। শান্তদার সঙ্গে আড্ডা দেয় দিনরাত।

—দিই তো দিই। কবিতাকে ভেংচি কেটে বই রাখতে গেল বকু।

আর জলযোগ সেরে বারান্দার ডেকচেয়ারটাতেই শুয়ে পড়লো সবিতা। সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর টনটন করছে। তা ছাড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে সবিতা। চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢলে পড়লো।

সন্ধ্যা নামলো। বাতাস থামলো। তারাজ্বলা অন্ধকারের আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁকে কোথায় একটা কাক বসে পাখা ঝটপট করছে। চিঁচিঁ শব্দ তুলে কয়েকটা চামচিকা উড়ে গেল।

সবিতা শুনতে পেলো না। দেখতে পেলো না। ঘুমের ঘোরে ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

বার কয়েক এসে ফিরে গেল কবিতা আর বকু। বসে বসে গল্প করবার সাধ ওদের। অনেক অনেক কথা শোনবার আছে। বলবার আছে। দেড়টা বছর যেন একটা যুগ। কত কি ঘটে গেল, কত কি বদলে গেল। সেসব কি শুনবে না ওরা, বলবে না? কিন্তু। না, শ্রান্ত দেহমন সবিতার। ঘুমুক ও। ঘুম ভাঙাবে না ওরা। ঘুম তো ভাঙবেই, নিজের থেকেই জেগে উঠবে একসময়।

কি একটা শব্দে চোখ খুললে সবিতা। উঠে বসলো।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। নির্জন নিশ্চুপ রাত। সামনে রাস্তাটার দিকে তাকালে সবিতা। দূরের আর অদূরের বাড়িগুলোর দিকে। আকাশের দিকে।

চাঁদের গায়ে কুয়াশার মতো স্বচ্ছ মেঘের ওড়না। নীচের রাস্তাটা চকচকে ইস্পাতের মতো পড়ে আছে নির্জন। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দু-একটা জানালায় এখনো আলো জ্বলছে।

উঠে দাঁড়ালো সবিতা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ও নিজেই কি গিয়ে জল গড়িয়ে নেবে? না, কবিতাকে ডাকবে?

হালকা পায়ে একটু পায়চারি করলে সবিতা। বারান্দাতেই খুশি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা সিরসির করছে যেন। দুধ খাওয়ানো হয়নি খুশিকে। নাকি, বোতলের দুধ খাইয়েছে ওরা।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর পা বাড়ালে ও।

ঘরগুলো অন্ধকার। ভেতরের উঠোনে এক ফালি আলো।

খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কপাটের আড়ালে।

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু।

বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?

মা লজ্জিত হয়ে বলল, কি করবো বল্। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।

# করুণকন্যা

## রমাপদ চৌধুরী

শুধু প্রথম কেন, প্রথম দিকেব যে-কোনো একটা পরিচ্ছেদের পাতায় চোখ ফিবিয়ে আনতে বললে অরুন্ধতীব অসম্মতি নেই। কিন্তু, তারপর, একটার পর একটা পাতা ওলটাতে ওলটাতে জল-থইথই পদ্মাব পাড়ে এসেই ভযে আঁতকে ওঠে ও। অন্ধকাব সমুদ্রে এসে চোখ বোজে।

বিশাল বিস্তীর্ণ পদ্মার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে, আর রাতগভীবেব দৃষ্টি-হাবানো অন্ধকাব। অনেক দূরের বাঁকে আর নদীজলেব মাঝডাঙিতে দুটো আলোব নিশানা দপ-দপ করে জ্বলছে, নিবছে; যেন ইশারায় কথা বলছে দূরের স্টীমারেব সঙ্গে। চতুর্দিকে শুধুই অন্ধকার, অন্ধকারের পারে সোনালী জরির তারার মতো এক সারি টিমটিমে আলো। মাঝি-ঘুমন্তির ঘাটে সারি সারি নৌকোর লণ্ঠন হয়তো। দূরের চলন্ত স্টীমাব থেকে ভেসে আসছে একটা মৃদু একটানা আওয়াজ, আব স্টীমারের ফণায় সার্চলাইটের মণিটা অবিরত ঘুবে চলেছে এদিক-ওদিক, অন্ধকাব ভেদ করে।

অরুন্ধতীর বেশ মনে আছে। মনে না থাকলেই যেন ভালো হতো।

হিজল ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দ পায়ে পালিয়ে চলেছে ওরা। বাবা, মা, ভাই, বোন–সকলেই। দূরে দূরে দু-একটা আলেয়া জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। আর নিস্তব্ধতাব মাঝে টুপটুপ্ করে হিজলের ফল পড়ছে জলে—মনে হচ্ছে, কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে! কথা নয়, জলেব বুকে হিজলের ফল পড়ার শব্দ জেনেও ভয়ে আশঙ্কায় নিশ্বাস চেপে থেমে পড়েছে ওরা।

হ্যাঁ, থেমে পড়তেই হলো শেষ অবধি। হইহই করে একটা উন্মত্ত বিভীষিকার দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অরুন্ধতীর জীবনে শুরু হলো নতুন একটি পবিচ্ছেদ।

একটি নয়, কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

সে-সব দিনের কথা ভাবতে চায় না অরুন্ধতী। ভুলতে চাইলেও পৃথিবী ভুলে থাকবে কেন!

জীবনের স্রোত থামিয়ে দিয়ে নোংরা জলে মুখ গুঁজে থাকতে চেয়েছিলো অরুন্ধতী। ভেবেছিলো, নোঙর তোলার সম্ভাবনাই যখন নেই, চোখে কল্পনার রঙ বুলিয়ে কি হবে? তার চেয়ে ভালো-না-লাগার ঘরকেই মায়া-মমতার নরম-গরম পালক দিয়ে চেপে ধরতে দোষ কি। এতশত ভেবেই না শেষ অবধি ঘৃণার-স্বামীকে বিনা বাধায গ্রহণ করেছিলো ও। স্বামী? শব্দটা মনে পড়লেও বিদ্রূপে বেঁকে যায় ওর ঠোঁটের হাসি। তবু সেই অসুর-প্রেমের অযাচিত সন্তানকে মাতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, স্নেহে প্রীতিতে।

বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে খবরই রাখতো না অরুন্ধতী। কোনো খবরই

এসে পৌঁছতো না ওর কাছে। পাতালপুরীর বন্দিনী দুঃখকন্যার মতো সব আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে মনকে শক্ত করবার চেষ্টা কবছিলো শুধু। নিজেব বলে মনে হয় না এমন এক ছোট্ট ঘবের অন্ধকাব কোণে মুখ লুকিয়ে, মন লুকিযে।

তারপব হঠাৎ একদিন দারোগা-পুলিস এলো, এক বাজ্যেব অন্তবীণ যেন অন্য রাজ্যের খাঁচার কপাট খোলা পেলো। ফিবে এলো অরুন্ধতী, কিন্তু সেই পুবোনো দিনেব সুখ-সংসারে নয়। তবু মুহূর্ত কয়েকের জন্যে বিক্ত বালিযাড়ির গাযে কয়েক টুকরো খুশির অভ্র চিকচিক করে উঠলো। না-বোঝা প্রশ্ন চাপা পড়ে রইলো ভাই-বোনের মনে, ফিবে পাওয়াব আনন্দেই ওকে জড়িযে ধরলে তাবা। মা-ব মুখ উজ্জ্বল হলো না সত্যি, কিন্তু বোঝা গেল, অনেক ঝড়-সওয়া ওই পাথুরে মুখ আসলে মিথ্যাব মুখোশে ঢাকা। এত বছর বাদে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাইছেন তিনি, কিন্তু অরুন্ধতীব কোলের ছোট্ট এক টুকবো ওই শিশু মা-মেয়ের মাঝখানে মস্ত বড় একটা দেয়াল তুলে দাঁড়িযে আছে।

শুধু কি মা?

পাড়াপড়শীদেব কানেও খবব বটতে দেরি হলো না। তবু মজা দেখবাব জন্যেই হযতো, এমন ভাব দেখালে তারা যেন কিছুই জানে না। এমন কপট হৃদ্যতাব ভাষায় কথা বললে, যেন অরুণির মা নতুন আসেননি এ-পাড়ায়, নতুন পরিচয় নয় তাদের সঙ্গে।—শ্বশুরবাড়ি থেকে মেযে এসেছে বুঝি? সবলতম চোখে প্রশ্ন কবলো হয়তো কেউ।

এ প্রশ্নের আর কি-ই জবাব দেওয়া যায়। চুপ করে রইলেন অরুন্ধতীর মা। মাথা হেঁট করলেন ম্লান মুখের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে। শেষে অনেক চেষ্টায়, চোখের জল চেপে শুধু বললেন, দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

—ও মা, তাই নাকি? সমবেদনায় সহানুভূতিতে চট করে সবাই চোখ সজল করে তুললো।—কি বক্তখেকো দাঙ্গাই যে লেগেছিলো দিদি! চোখে কাপড়ের পাড় ঘষলো তারা।

কে-একজন বললে, যাক, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব।

বিদ্রুপটা বুঝতে পারলেন অরুন্ধতীর মা, কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

অরুন্ধতীও শুনছিলো কপাটের আড়াল থেকে। আর লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলো ও। গ্লানি নিজের জন্যে নয়, ও কি করবে, অন্য কোনো পথ ছিলো নাকি ওর সামনে। কিন্তু ওর জন্যে মা মুখ তুলতে পারবে না, এ কথা তো কই কোনো দিন মনে হয়নি।

মনে হয়নি? ভাবেনি কোনো দিন? তা হলে সেদিন দারোগা-পুলিসের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিলো কেন? কেন বলেছিলো, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না আমাকে, আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

এতগুলো অনুনয়ের পিছনে তো একটাই কথা ছিল, একটাই ভয়। ফিরে গেলেও

কি আবার সব ফিরে পাবো? বাবা, মা, ভাই, বোন—সকলেই কি ফিরে নেবে আমাকে?

মনে মনে ঘৃণা আর আক্রোশ পুষে যাকে স্বামিত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলো অরুন্ধতী, তিন বছরের অভ্যস্ত আসঙ্গে সে নিশ্চয়ই এমন কোনো মায়ার শিকড় গাড়েনি তার জীবনে। হ্যাঁ, শুধু একজনকেই সে নিখাদ প্রীতিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো, তার নিজেরই রক্তশিশুকে।

এমন যে হবে তা জানতো অরুন্ধতী। বুকের মমতা যেদিন এই অবাঞ্ছিত সন্তানের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে রাজী হয়নি, সব হারানোর জীবনে এই সামান্য পাওয়ার উজ্জ্বল রামধনুটুকু যেদিন মুছে ফেলতে চায়নি ও, সেদিন থেকেই তা জানে অরুন্ধতী। কিন্তু, মা-র কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন সমস্ত শরীব ওর ক্রোধে আক্রোশে জ্বলে উঠলো।

—যাক, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব। পড়শী প্রৌঢ়ার এই কথাটাই যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো ওর চোখে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। দৃঢ় ক্রোধের গলায় বললে, ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি।

ওমা, তেজ কেন মেয়ের এত, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাতজন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হলো যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট করবে, তা নয়—স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব! তবু সান্ত্বনা দেবার ভান করে কেউ কেউ বললে, তোমার তো দোষ নয় মা, তুমি কি করবে।

আড়ালে অবশ্য ঠোঁট টিপে ইশারায় হাসাহাসি করলে ওরা। অর্থাৎ, এখন তো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।

অরুন্ধতীর আর কি করবার আছে, বিছানায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে ওর।

দু চোখ ভিজিয়ে অরুণি শুধু কাঁদলো আর কাঁদলো। কোন ফাঁকে যে মা এসে তাব পাশে বসেছেন, ব্যথায় কাঁপা হাত রেখেছেন ওর মাথায়, ধীরে ধীরে ওর চুলে পিঠে সান্ত্বনার সমবেদনার হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছেন, তা ও টেরও পাযনি।

—ওঠ মা, ওঠ, কাঁদিস না আর। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেছে তাঁর, গলা ভারি হয়ে এসেছে। বলেছেন, লোকে কি ভাবলো না-ভাবলো তাতে কি আসে যায় অরু?

ধড়মড় করে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। অশ্রুভেজা দু চোখের স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলেছে মা-র মুখের ওপর।

বলেছে, তবে তুমি কেন লজ্জা পাও, তুমি কেন সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

—সাধে কি ভয় পাই মা? দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া জল মুছতে মুছতে মা বললেন, দাঙ্গায় তোকে, তোর বাবাকে, দুজনকেই তো হারিয়েছিলাম মা। তোকে যে ফিরে পাবো ভাবিনি কোনো দিন, ফিরে পাবার জন্যে যে কত মানত করেছিলাম।

অরুন্ধতীর গলার স্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। বললে, ভুল করেছিলে। সেইজন্যেই

হয়তো বিষ খেয়ে মরতে সাহস পাইনি। মরলে সব জ্বালা চুকে যেতো।

—তোর বাবা যদি বেঁচে থাকতেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা: বললেন, উনি থাকলে এত ভয় পেতাম না অরু। কিন্তু একা, এই পাড়াপড়শীদের মাঝে সাহস পাই না একেবারে।

—তা হলে কি করতে হবে আমাকে বলে দাও। কান্নায় ভেঙে পড়লো অরুন্ধতী।

স্পষ্ট করেই বলতে পারলেন অরুন্ধতীর মা।

বললেন, এক কাজ করলে হয় অরু। ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে রেখেও তো আমরা দেখাশোনা করতে পাবি।

চমকে চোখ তুললে অরুণি।—কি বলছো মা? তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পাবে।

কোনো কথা বললেন না মা। আশ্চর্য। অরু তো এমন ছিলো না, এত অবাধ্য হলো ও কি করে? মতে মিলুক না-মিলুক, এটুকুও কি বোঝে না যে, ওর ভালোর জন্যেই তাঁর এত দুশ্চিন্তা? এত চোখ-ঝাঁজানো কথা তাঁকে বলে কি করে অরু? ভুলে যায় কেন যে, যত কিছুই ঘটে থাকুক অরুন্ধতী ওঁরই মেয়ে।

কিন্তু সে-কথা অরুণি বুঝবে কি করে।

কত কান্নাকাটি, কত অনুনয়-বিনয় করে ওর বাপের কাছ থেকে ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে এনেছে অরুন্ধতী, তা কি অরুর মা বুঝতে পারছেন? শুনলে হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, ভাববেন মেয়েটার বুঝি বা মাথার ঠিক ছিলো না।

না, সে-কথা বলে লাভ নেই। অরুন্ধতী শুধু বললে, না মা, তা হয় না।

তবে? এমনিভাবে পাড়াপড়শীদের ফিসফিসানি, আড়ালে আড়ালে হাসি-বিদ্রূপ ছড়ানো দেখেও সব সহ্য করে যেতে হবে? তিনি না-হয় চোখ বুজে থাকবেন, কিন্তু অরু কি সে-সব দেখতে পায় না, দেখেও কি মাথা উঁচু করে চলতে পারবে? ভেতরে ভেতরে শুধু শুকিয়ে যাবে দিন-কে-দিন। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিজু আর কলি বড় হচ্ছে, ওদের মনও কি এ গ্লানিব স্পর্শ পাবে না?

বললেন, তবে অন্য পাড়ায় উঠে যাই মা চল।

—সব পাড়াই তো সমান। অরুন্ধতী হাসলে।—গায়ে ঘা দেখলে কোন পাড়ায় না মাছি বসে মা।

—সাধ-আহ্লাদ তো তোর শেষ হয়ে গেছে। থেমে থেমে—বেশ বোঝা গেল, ভয়ে ভয়ে—কথা শেষ করলেন মা।—না-হয় একটা থান কাপড়ই পরবি অরু।

অরুণি হেসে উঠলো খিলখিল করে। কত দুঃখে যে মানুষ এমন পাগলের মতো হাসতে পারে, মা বুঝলেন। আশ্চর্য। সধবাই হলো না যে কোনো দিন, তাকে বিধবা হতে বললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—জানি না মা, যা ভালো বুঝিস কর।

ভালো বোঝবার আর কি আছে। ভালোর পথ কি আব প্রশস্ত আছে কোথাও? শীর্ণ সড়ক ধরে আঁকাবাঁকা গলিতে আনাগোনা ছাড়া উপায় কই!

তাই মাকেই একদিন বলতে হলো, যে ক'টা টাকা ছিলো, আর আমার খানকয়েক গয়না, যা দিদির কাছে গচ্ছিত ছিলো, তা তো সব শেষ হয়ে এলো অরু। গায়ের গয়নাগুলো ছিলো বলে তবু বিজু আর কলিকে বাঁচাতে পেবেছিলাম। কি করা যায় বল তো?

—কি আর করবে। চাকরির চেষ্টা করি একটা—উত্তর দিলে অরুন্ধতী।

সুতরাং চাকরিব চেষ্টাতেই ঘোরাফেরা শুরু হলো অরুন্ধতীর। খবরের কাগজ দেখে চিঠির পর চিঠি লেখা, আর নয়তো বেশ স্পষ্ট পোশাকে মুখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বিনয়ের অবতার সব কাঁচা বয়সের ছোটসাহেবদের সঙ্গে দেখা করা।

এমনি কোনো-এক আপিসের সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে ব্যথায় বিরক্তিতে সমস্ত মন যখন ভরে আছে, পাশের লোকটার সঙ্গে একটা ধাক্কা লাগলেও যখন চোখ ফিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না, এমনি একটা মুহূর্তে অভাবনীয়ভাবে সুবিমলের সঙ্গে ওর আবাব দেখা হয়ে যাবে, কে জানতো!

এতদিন বাদে আবার দেখা হলো।

অরুন্ধতীর সারা মনের কোণে পাপড়ি-ফোটানো গুঞ্জন শোনা গেল।

—সুবিমলদা!

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে সুবিমলের ওপর চোখ পড়তেই অরুন্ধতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে পরে উঠছিলো সুবিমল। ও আরো খানিকটা কাছে আসতেই নিঃসন্দেহ হলো অরুন্ধতী, সমস্ত মুখচোখ খুশির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বলে উঠলো, সুবিমলদা, তুমি!

চমকে চোখ তুলে অরুন্ধতীব দিকে তাকালে সুবিমল, কয়েকটা দ্রুত মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখালো সুবিমলকে। তারপব ওর ম্লান বিষণ্ন মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—অরুণি? অরুন্ধতী?

আশেপাশে কে কোথায় আছে না-আছে, কে কি ভাবতে পারে, কিছুই মনে পডলো না ওর। সুবিমলের একটা হাত চেপে ধরে বললে, ওঃ, কতদিন বাদে দেখা বলো তো সুবিমলদা। তোমার সঙ্গে আবার যে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি। কোথায় আছো? এখানেই তো? মাধু, মাধুরী, কোথায়? মাসীমারা ভালো আছেন? বিয়ে করেছো? করোনি তো? মা তোমাকে দেখলে কি খুশী যে হবে!

অনর্গল অগুনতি কথার তোড়ে সুবিমলের উত্তরটুকুও বোধ হয় ভেসে গেল। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নীচে নেমে গেল অরুন্ধতী।

—তারপর? কি খবর বলো সুবিমলদা। চুপ করে আছো কেন? কে কোথায় আছেন কেমন আছেন? কি করছো? চাকরি?

কথার যেন আর শেষ নেই। কত প্রশ্ন, কত কথা। সব জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন একসঙ্গে ভিড় করে আসে। কোনটা আগে বলবে, কোনটা পরে, কোন

প্রশ্নের পরে কোন প্রশ্ন—সব-কিছু যেন নিয়ম ভুল করছে। এতদিন বাদে মা-ভাই-বোনদের ফিরে পেয়ে যত না আনন্দ হয়েছিলো, আজ হঠাৎ সুবিমলেব দেখা পেয়ে যেন সত্যিই অরুন্ধতীর মনের পাতায় রোদ লাগলো, সবুজ রঙ ধরলো। আর এই উচ্ছ্লতাব ঢেউয়ে নিজেকে সে এত বেশী ভাসিয়ে ফেললে যে, বহুক্ষণ পরে তবে ওর হুঁশ হলো সুবিমল জবাব দিচ্ছে না ওর কথার।

—আরে, বেশ তো। কথা বলছো না যে! চোখের ভুরু কাঁপালে অরুণি।

টুকরো বিষণ্ণ হাসিতে ম্লান হলো সুবিমল।—কিন্তু আব বলবাব কি আছে!

সুবিমলেব মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের ছায়া অনুভব করলে অরুন্ধতী।—কেন, কি হয়েছে সুবিমলদা? বলো না।

হাসলে সুবিমল।—কি আর হবে, কি হতেই বা বাকি আছে অরুণি।

অরুন্ধতী বুঝলো, কি যেন ব্যথার ছাপ সুবিমলের মুখে, কি যেন লুকোতে চাইছে সুবিমল। ওর মুখের অনর্গল প্রশ্নে আপনা থেকেই যতি পডলো।

দুপুরেব রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে গির্জাব ছায়ায় এসে দাঁড়ালো ওরা দুজনে। রাস্তার সশঙ্কিত হর্নের হাত থেকে রেহাই পেতে। শুধু কি তাই? না। দীর্ঘ এক যুগ পরে দুজনের আবার দেখা হলো। অভিশপ্ত আকস্মিকতার দেয়াল যে ঘনিষ্ঠতা, যে অন্তরঙ্গ পবিচয়ের যুগ্ম স্রোতে বাঁধ টেনেছিলো, সে বাধা এতদিন পরে অপসৃত হলো। ঠিকানাহারা দুটো সমান্তরাল ঢেউ নতুন করে পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। কথার মতোই পথও খুঁজে পেলো না।

ওরা শুধু অনুভব করলে পরস্পরকে ওরা হারিয়েছিলো, পরস্পবকে আবার খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ, অনেক কথা জমে আছে মনের কোণে, অনেক, অনেক কথার বরফ গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে যেন শান্তি নেই। কত কি শোনবার শোনাবাব আগ্রহ দুজনের। কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, ধীরে ধীরে একটি একটি করে চীনেবাদাম ছাড়ানোর মতো করে কথা বলবে। জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন সোডার বোতল খোলার মতো একসঙ্গে উপচে আসতে চাইছে। তবু কেউ যেন কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, বলবে কথা, কথা।

নিতান্ত আজেবাজে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক দু-এক টুকবো শব্দের সুর, দু-এক ঝলক হীবে-জ্বলা হাসি।

কিন্তু এমন তপ্ত রোদ্দুরে গির্জার পাশে এমন ব্যস্তত্রস্ত জনচাঞ্চল্যের মাঝে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

অনেক কিছু আশা করেছিলো অরুন্ধতী। ভেবেছিলো, সেই আগের দিনের মতো সুবিমলই পথ বাতলে দেবে। কথার সুতো তুলে দেবে অরুণির হাতে। কিন্তু না, সুবিমলও যেন দিশেহারা।

শেষে অরুন্ধতীকেই বলতে হলো, চলো সুবিমলদা, আমাদের ওখানে। মা যে কি খুশী হবেন তোমাকে দেখে। সত্যি, কে কোথায় যে ছিটকে গেল...এত কষ্ট হয়। একটা

চেনা লোকও দেখতে পাইনে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে সুবিমল। বললে, চেনা লোক হয়তো আছে অরুণি, কিন্তু সবাই লুকিয়ে থাকতে চায়।

মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী, কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে।

বললে, মুখ লুকোবার আর কি আছে বলো। কিন্তু বলে ফেলেই বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। ওকে উদ্দেশ্য কবেই কি বলেছে নাকি সুবিমল? ওর কলঙ্কেব কাহিনী কি সুবিমলেরও জানা?

সুবিমলের ভালোবাসাই ছিলো ওর অলঙ্কার। কলঙ্কের কালিতে সে প্রেম কি মলিন হয়ে গেছে? সব মন কি একই মানুষের?

ভয়ে কাঁপলো অরুন্ধতী। ওব জীবনের যে করুণ পরিচ্ছেদটা ও সদম্ভে আর পাঁচজনকে জানিয়ে মনের আক্রোশ মিটিয়েছিলো, আজ সুবিমলের কাছে তা প্রকাশ হযে যাবার আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস কেন অরুন্ধতী।

তবু সুবিমলকে নিয়ে এলো ও। বললে, কলি যে কত বড় হয়ে গেছে দেখবে চলো। বিজু আর মা যে কি খুশী হবে।

সুবিমল এলো ওর সঙ্গে দুপুরের বোদে ঘামতে ঘামতে, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতো, যখন একরাশ বই বুকে চেপে কলেজ থেকে ফিরতো অরুণি, রোদ্দুরের তাপে ডালিমের ছোঁয়া লাগতো ওর গালে, কপালে ফুটতো স্বেদ-সিক্ত পোখরাজের মালা। অপেক্ষা করতো একটা নির্জন গলিব মোড়ে, সুবিমল আসতো, হাসতো, কথা বলতো, প্রথমে ইশারায়, তারপর স্পষ্ট ভাষায়, হাঁটতো পাশপাশি দুপুরের নির্জন রোদ্দুরের পথে। ওরা দুজনে পাশপাশি হেঁটে এলো, ট্রাম ধরলো, ট্রাম থেকে নামলো, পিচ-গলা বড় রাস্তা ছেড়ে, ছোট্ট গলির বাঁকে, রোদে ঝলসানো গ্যাসপোস্টের নীচের ডাস্টবিনের চারপাশে ছড়ানো জঞ্জাল লাফিয়ে লাফিয়ে, এপাশের চারতলা বাড়ি আর ওপাশের পাঁচতলা, তারই ফাঁকে সরু গলির চেয়ে আবো সরু মেটে কাদার পথটুকু পার হয়ে, সবচেয়ে কোণের, উপেক্ষিত, নি-বাতাস নিবালা ঘরের কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালো দুজনে, কড়া নাড়লো অরুন্ধতী, মা এসে দরজা খুলে দিলেন। হঠাৎ বুঝি খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ ম্লান হলো।

স্যাঁতসেঁতে নীচের তলায় ছোট্ট অন্ধকার না-বাতাস না-আলো এক-জানালার ঘরে এসে বসলো সুবিমল। ভাবলে, এ-বাড়ির ছাদে যখন বিকেলে ম্লান হলুদের আলো নামে, এ-ঘরে তখন সন্ধ্যা। শহরে যখন সাইক্লোন, এ-ঘরে শুধুই শব্দ।

তবু। এ-ঘর অরুন্ধতীর ঘর।

মা-ব দীর্ঘশ্বাস বললে, কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। বললেন, তোমরা তো দেখেছো বাবা সেই বাড়ি বাগান, স্টেশনে নেমে ওঁর নাম বললে লোকে পৌঁছে দিয়ে যেতো। কোথায় এসে উঠতে হয়েছে দেখে যাও।

সুবিমলের আকাশে তখন নতুন তারা ফুটছে। অরুণির চোখের তারায় ঘন গভীর

আলো। কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। সুবিমল ভাবলে, অনেক সমুদ্র পার হয়ে নতুন বন্দরে।

অন্ধকার ঘরের ছোট জানলাটার ধারে বসে, কাঁধের ওপর অরুণির ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁযায, সুবিমল জানলার বাইরে দৃষ্টি ফেললো। সে-চোখ পাশের বাড়ির দেয়ালে চাপা পড়েও অনেক অনেক দূর দিগন্তে পৌঁছে গেল!

অরুণির মন প্রশ্ন করলে, আমাদেব সব স্বপ্ন কি মিথ্যে হয়ে গেছে সুবিমলদা?

সুবিমলের মনেও দ্বিধা।—যা হারিয়েছি তা ফিববে না?

তাবপর ওবা যখন পরস্পরকে একান্তে পেলো, সুবিমল অরুন্ধতীর মুখের দিকে মুগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালে, কাছে টানলে অরুন্ধতীকে, ওর হাতের সুপুষ্ট আঙুলগুলোর সঙ্গে অরুণির নরম আঙুলগুলি লতার মতো জড়িয়ে গেল।

ওরা দুজনেই যেন অনেকগুলো আড়াল দেওয়া ব্যর্থ বছরের পিছনে ফিরে এলো।

সুবিমল চোখ মেলে তাকালো অরুন্ধতীর দিকে, সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলে অরুণি। দুজনেই যেন বলতে চাইলো. আমাদের মন যখন বদলায়নি, পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু মনকে কতটুকুই বা বিশ্বাস! ভয়ে কাঁপলে অরুন্ধতী। সব-কিছু জানার পবও কি সুবিমলের মুখে এমনি ভালোবাসার জ্যোৎস্না থাকবে?

মা এসে দাঁড়ালেন। কচি ছেলের দুধে খাজনা বসিয়ে সুবিমলেব জন্যে চা নিয়ে এলেন মা কাঁসার গ্লাসে করে। কথা সুরু করলেন সুবিমলের সঙ্গে।

কপাটের আড়ালে গিয়ে ইশারায় মাকে ডাকলে অরুন্ধতী। মা-র হাত দুটো চেপে ধরে ফিসফিস করে বললে, মা! বোলো না। আর কিছু বলতে পারলো না অরুণি।

—দূর বোকা মেয়ে! হেসে ফিরে এলেন তিনি সুবিমলের কাছে।

দেখলেন না, ঝরঝর কবে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অরুন্ধতীর।

না, এ যেন নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া। অরুন্ধতী ভাবলে, এভাবে সুবিমলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা, সে আরো লজ্জা। তার চেয়ে মাকে বলবে, নিজে তো আর গুছিয়ে বলতে পারবে না, এবার যেদিন সুবিমলদা আসবে সব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও মা।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সমস্ত দুপুরের শ্রমক্লান্তি মুছে ফেলবার জন্যে জেটি, জাহাজ আর সারি সারি নৌকোর দিকে তাকিয়ে, গঙ্গার ঘোলা জলের ধারে ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুবিমলের পাশাপাশি বসে. বিকেলের বিষণ্ণ রোদ্দুর-মাখা অনেকগুলো মুগ্ধ মুহূর্ত কাটিয়ে অসহন একাকিত্বের ব্যর্থ পথ মাড়িয়ে বাড়ি ফিরলো অরুন্ধতী।

ফিরে এলো।

কিন্তু মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা ভুলে গেল ও। একটা কপাটে ঠেস দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে একটা খাম তুলে ধরলেন অরুন্ধতীর মা।

—কে খুললো চিঠি? আজকের ডাকে এসেছে? কার চিঠি বুঝতে না পেরে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলো, কিন্তু উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করলো না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোর ওপব। তারপর ধীরে ধীরে বেদনা-থমথম মুখে বিছানাব ওপর এসে বসলো অরুন্ধতী, চিঠিটা মুঠোব মধ্যে চেপে বালিশের ভিতরে মুখ গুঁজে দিলো।

সে চিঠি লিখেছে অরুন্ধতীকে। চিঠি নয়; যেন অভিশাপ। আতঙ্কের রাহু যেন।

আশ্চর্য। অরুন্ধতীকে ফিবে চেয়েছে সে। লিখেছে, স্বেচ্ছায় অরুন্ধতী আবার ফিরে আসুক তার কাছে। ফিবে এলে কেউ বাধা দেবে না, এবার আর ছিনিযে নিয়ে যাবে না কোনো দারোগা-পুলিস।

অদ্ভুত! যেন অরুণি ওই ঘৃণিত দস্যুব বুকে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। যেন, অরুণির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কেড়ে আনা হয়েছে।

আশ্চর্য। অরুন্ধতীকে চিঠি লিখেছে সে।

লিখেছে, অরুন্ধতী যদি ফিবতে না চায়, যদি তাদের প্রেম-প্রীতি বর্ষা-বাতের ফানুসের মতো চুপসে গিয়ে থাকে, তা হলে—তা হলে অন্তত তার সন্তানকে যেন অরুন্ধতী ফিরিয়ে দেয। আপন শিশুব মুখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীকে ভুলে থাকবে সে।

আর অরুন্ধতী যদি ফিরে না আসতে চায, তার সন্তানকে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে অন্তত একটি দিনের জন্যে, তার নিজেরই শিশুসন্তানকে যেন দেখতে দেয অরুন্ধতী। কান্নার অনুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠলো অরুণি, হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিলো। একটা কুটিল আর হিংস্র হাসির রেশ ফুটে উঠলো ওর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সুবিমল আবার এলো আমন্ত্রণ জানাতে। অরুন্ধতী শুনলো, খুশিতে হাসলো, সায় দিলো, বেশবাস প্রসাধন কিছুটা, ছিমছাম শরীরে সুখীয়াল শিহবন, হীরে-জ্বালা হাসি, লজ্জা আর আনন্দে মেশা মুখ, ঠিক সেই পুবোনো দিনের মতোই, হালকা পায়ে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী সুবিমলের সঙ্গে। তারপর, অনেক স্মৃতির মতো একটানা অনেকটা ট্রামের পথ পার হয়ে, শহর-উত্তরের জরাজীর্ণ নির্জনতার ক্লান্ত বিষণ্ন দারিদ্র্যের ঘরে এসে পৌঁছলো ওরা।

বুকে বাতাস পেলো অরুন্ধতী। চোখে রঙীন রামধনু।

টিনের ছাদ। বাঁশের চিক দিয়ে বানানো বেড়া। একটু দূরেই মোটর আর যন্ত্রপাতি মেরামতের একটা ক্ষুদে কারখানা। কুলি মিস্ত্রী ধরনের দু-চারজন এখানে-সেখানে। অনেক দূরে চটকলের বাঁশি। লাল ধুলোর রাস্তা। ধুলো ওড়ায় দু-একখানা লরী, শব্দ ছড়ায়। তবু, এই মাটি বাতাস অরুন্ধতীর যেন কত আপন মনে হলো।

—অরুন্ধতী, শোনো। বাঁশের ফটক ঠেলতে ঠেলতে অরুণির মুখের দিকে তাকালো সুবিমল। সুবিমলের চোখ যেন বললো ফিসফিস করে, শোনো অরুণি, শোনো।

অরুন্ধতী তাকালো চোখ তুলে।—বলবে কিছু?

—একটা কথা তোমায় বলতে পারিনি অরুণি।

অরুণির সপ্রশ্ন ভুরুর রেখায় বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সুবিমল ঠাণ্ডা ধীর স্বরে বললে, মাধু, মাধুরী নেই অরুণি।

—নেই?

—আছে। কিন্তু, কিন্তু না থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো।

মাধু, মাধুরী নেই? জীবনের সেই এক ফোঁটা বয়স থেকে যাকে গভীরতম বন্ধু বলে চিনেছে, সেই অনেক আগ্রহের বন্ধু মাধুরী নেই? রাস্তার বুকে ঘর কেটে দু বন্ধুতে খেলা, খেলা—ঝগড়া—মিটমাট, আড়ি আর ভাবের বয়স থেকে প্রেমের ঘরে আড়ি পাতার বয়স উত্তীর্ণ হওয়া। তারপর কত জ্যোৎস্না-স্নাত রাতের ছাদে দুজনের উচ্চকিত হাসি, কথা, আনন্দ। ছাদের আলসে ধরে কত সময়ের স্রোত পার হয়েছে দুজনে। মনের কপাট খুলে দিয়েছে দুজন দুজনের কাছে। সেই মাধুরী নেই, না থাকলেই ভালো ছিলো। কিন্তু কেন? কি হয়েছে মাধুরীর, কি ঘটেছে তার জীবনে, প্রশ্ন করতে পারলো না অরুন্ধতী।

শুধু দেখলো, বুঝলো। কেউ একবারও মাধুরীর নাম মুখে আনলো না। মনে হলো সুবিমলের সংসারের পাতা থেকে মাধুরীর নাম মুছে গেছে। স্মৃতির পাতা থেকেও হয়তো বা। আর তাই অদম্য এক উৎকণ্ঠায়, দুর্বোধ আগ্রহে প্রশ্নের ফেনা জমে উঠলো অরুন্ধতীর মনে। তবু ওর অনুসন্ধিৎসু মন চাপা পড়ে রইলো আর সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা বলা, কুশল জানাজানির ভাঙা ভাঙা কথার নীচে।

তারপর সুবিমলের মা, ছোট ছোট ভাইবোন, দাদা-বউদি, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এনামেলের ভাঙা পুরোনো পেয়ালায় চা খাওয়ার স্মৃতিতে নিজেদের দারিদ্র্যের কুণ্ঠা ভুলে, উত্তরের শহরতলির ঘাস বাঁশ বুনো ঝোপের মাঝ দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কথা হারালো দুজনেই—অরুন্ধতী আর সুবিমল।

মাধুরী নেই, মাধুরী না থাকলেই ভালো ছিলো।

কথাটা কানের কাছে আবার বেজে উঠলো।

মাধুরী আছে। কিন্তু কোথায়, কেমনভাবে, কেন! ঠিক তেমনি আগের দিনের মতোই কি এখনো হাসলে গালে টোল পড়ে মাধুরীর? বিয়ে হয়েছে? ছেলেমেয়ে? মনে পড়লো, ছোট্ট ছেলে কাছে পেলে কেমন ফূর্তিতে নেচে উঠতো মাধুরী। আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতো তাকে। কাজ ভুলে যেতো, নাচতো, হাসতো, শিশুর হাসি আর শিশুয়ালি দেখে। নিজের ছেলের জন্যেও কি মাধুরী তেমনি আদর আর যত্ন বুকে বাঁচিয়ে রেখেছে? কিন্তু সুবিমলের কণ্ঠস্বর, মা দাদা বউদি—সকলের কথায় আশ্চর্য অনুপস্থিতি ওই একটি নামের। সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া, ভুলতে চাওয়া, কেন?

বাড়ি ফেরার পথে শেষ অবধি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না অরুন্ধতী। বললে, মাধু কোথায় বললে না তো সুবিমলদা? তার সঙ্গে এত দেখা করতে ইচ্ছে হয়। সত্যি, কতদিন দেখিনি বলো তো!

সুবিমল মাথা নীচু করলো, মাথা তুললো, তাকালে এপাশে-ওপাশে, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। তারপর ধীরে ঠাণ্ডা গলায় আস্তে আস্তে বললে, মাধুর কথা জিগ্যেস কোরো না অরুণি। ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ো না।

অরুন্ধতী স্তম্ভিত হলো, বিস্মিত হলো। ওর চোখ প্রশ্ন করলো, কেন সুবিমলদা কি হয়েছে মাধুর?

লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল সুবিমল। ফিসফিস করে বললে, মাধু—মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

চমকে চোখ তুললো অরুন্ধতী। চোখ নামালো। বিস্ময়ে হতাশায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো ওর চোখ ঠেলে জল এলো। মাধু-মাধুরী নেই। মাধুরী না থাকলেই ভালো ছিলো। মাধুরী, ওর সেই মনের অন্তরঙ্গ কোণ, মলিন হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

ছোট্ট কয়েকটা কথা, কিন্তু এমন ধারালো বর্শার আঘাত অরুন্ধতীকে আর কখনো সহ্য করতে হয়নি।

সুবিমল আবার আস্তে আস্তে বললে, আমরা তখন ট্রেনে। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো, সেই রাতে ট্রেন থেমে গেল, মাধুকে হারাতে হলো আমাদের।

শিউরে উঠলো অরুন্ধতী। নিজেরই জীবনের একটা পরিচ্ছেদ মনে পড়ার জন্যে নয়, সুবিমলের মনের হদিস পাওয়ায়। ভুল বুঝেছে ও। ঢেউয়ের গায়ে মিনার তুলতে চেয়েছে। এই কি মাধুরীর খারাপ হয়ে যাওয়া? হিংস্র বিদ্বেষে সশব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর। নিজের গোপন গ্লানির ইতিহাস প্রকাশ না করে ভালোই করেছে অরুন্ধতী।

বিদ্রূপে হাসলো অরুন্ধতী, ফেটে পড়লো না ক্রোধে আক্রোশে। শুধু নিশ্চুপ ব্যথায় সহানুভূতিতে না-ভাবার গভীরে ডুবে গেল অরুন্ধতী।

সুবিমল তেমনি ফিসফিস করেই বললে, তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না অরুণি। মাধুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর খারাপ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলা না ওর।

আশায় আশায় মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী।

বিষণ্ন দেখালো সুবিমলকে।—আমরাই খোঁজখবর করলাম ওর জন্যে। দিনের পর দিন, কত মাসের পর মাস কেটে গেল, খুঁজে পেলাম না ওকে। বেঁচে আছে এ কথাও যখন ভুলতে বসেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন খবর এলো, আর তারপরই পুলিসের হেফাজতে ফিরে এলো মাধুরী।

অরুন্ধতী উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে, তারপর?

ম্লান হাসলে সুবিমল, অরুন্ধতীর একখানা হাত চেপে ধরলো হঠাৎ। বললে, ভুল বুঝো না অরুণি, দোষ আমার নয়।

থেমে থেমে বললে, মাধুর পরেও তো তিনটি বোন রয়েছে, মা বললো, মাধুর জন্যে শেষে কি ওদেরও বিয়ে দিতে পারবো না, এতগুলো জীবন মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যাবে, দুর্নাম রটবে সমস্ত পরিবারের?

—তাই মাধুকে তাড়িয়ে দিলে, এই তো? বিদ্রূপ বেজে উঠলো অরুন্ধতীর গলায়।

—না। লজ্জায় মাথা নীচু করে সুবিমল বললে, সব-কিছু গোপন রেখে বিয়ে ঠিক করে ফেলা হলো মাধুরীর। কিন্তু মাধু বেঁকে বসলো। বললে, সারা জীবন ধরে নিজের কলঙ্ক ও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

—আর তাই বিয়েটা হলো না? আরো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর অরুন্ধতীর প্রশ্নে।

সুবিমল বুঝলো না। সহজভাবেই বললে, মা আর দাদা মত দিলে, বিয়েটা হয়ে গেলে মাধু জেদ ছেড়ে দেবে, আর জানতে পেরেও ওর স্বামী হয়তো সব-কিছু ক্ষমা করবে। কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিলো। বিয়ের পরই সব প্রকাশ করে ফেললে মাধু, আর কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ওর স্বামী।

অরুন্ধতীর চোখের কোণ দুটো জ্বালা করে উঠলো, কঠোর তীব্র ভাষায় কিছু একটা বলে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর। তবু চুপ করে রইলো। কোনো কথা বললে না, শুধু শুনলো সুবিমলের কথাগুলো। নিঃশব্দ পায়ে ঘাষ বাঁশ বুনো ঝোপের ধার দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে মাধুরীর জন্যে সমস্ত মন ওর ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলো। সেই অপরূপ লাবণ্য-উদ্ভাসিত মুখের সারল্য মনে পড়ে গেল। ভাবলে, সে মুখের দুর্ভাগ্য এত অসহন কি করে হলো।

সুবিমল আবার ফিসফিস করে বললে, সকলের কাছ থেকেই বকুনি খেলো মাধু। মা বললে, মাধুব যা খুশি সে করুক, কিন্তু অন্য মেয়েগুলোর তো বিয়ে দিতে হবে। সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে হবে তো সবাইকে। শুধু মাধুর জন্যে সমস্ত পরিবারটা তো আর ধ্বংস হতে পারে না। দাদা বললে, তার চেয়ে মাধু বেঁচে না থাকলেই ভালো ছিলো, ফিরে না এলেই পারতো।

—স্বেচ্ছায় তো ফিরেও আসেনি সুবিমলদা। অদৃষ্ট মেনে নিয়েই ও হয়তো ভালো থাকতো, তোমরাই তো হইচই করে উঠেছিলে দেশসুদ্ধ। ঘরের ছাদ সারানোর আগেই বৃষ্টির জন্যে হা-হুতাশ করেছিলে।

সুবিমল চুপ করে রইলো, অনেকখানি হেঁটে এসে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে থামলো। তারপর শান্ত গলায় বললে, সেই অভিমানেই হয়তো মাধুও চলে গেল একদিন।

—আর কোনো খোঁজ পাওনি? উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো অরুন্ধতীব স্বরে।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না সুবিমল। ফিসফিস করে বললে, পেয়েছি। আবার খারাপ হয়ে গেছে মাধুরী।

মনের অন্দরে বিদ্রূপের হাসি হাসলে অরুন্ধতী।—তুমিই না বলেছিলে সুবিমলদা, মানুষের মনটাই সবচেয়ে বড়। তবু তোমরা—সকলেই ভয় পেলে কেন?

—মন তো শরীরের বশ অরুণি। শরীর অশুচি হলে...কথা শেষ করতে পারলো না সুবিমল।

আর অরুন্ধতীর মনে হলো, নীতিবাগীশ কোনো গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের কথা শুনছে সে। বয়সে, পোশাক-পরিচ্ছদে, শিক্ষায়—যত পৃথকই হোক, সব মানুষের বুঝি বা একই মন।

না। তার চেয়ে এমনি অসহ্য আত্মদাহই জীবনের সম্বল হয়ে থাক। সুবিমলের কাছে আর ফিরে যাবে না অরুন্ধতী, ফিরে যেতে পারবে না।

কত কত দিন আব বাত নিঝুম চিন্তার জালে, অশান্ত জ্বালায় কাটিয়ে দিলো অরুন্ধতী। আব তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে বুকে এসে বিঁধেছে এক নতুন কাঁটা। বিষাক্ত জ্বালায় জ্বলেছে পুড়েছে অরুন্ধতী, অনুপায় আক্রোশে।

তার চিঠি!

অনুনয় উপবোধের চিঠি। ও শুধু ঘৃণা আর ব্যর্থ ক্রোধ পুষে রেখেছে যার বিরুদ্ধে, যে ওর জীবনের চোখে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কাজল, তার চিঠি। তার প্রার্থনা। কাঁটার মতো এসে বিঁধেছে অরুন্ধতীব বুকে।

অরুন্ধতী ফিবে এসো। ফিরে দাও আমাব শিশুকে। অন্তত একটিবারেব জন্যে তাকে দেখতে দাও অরুন্ধতী।

অনুনয়! শুধু আক্রোশ আব বিদ্রূপ জমা আছে অরুন্ধতীর মনে।

এর চেয়ে কত আন্তরিক উপবোধ ঢেলে দিয়েছিলো অরুন্ধতী সেই নৃশংসতার পায়ে। কত কান্নার সজল চোখ মেলে মন ভেজাতে চেয়েছিলো ও, পাশবিকতার পা জড়িয়ে ধরে ভেবেছিলো সে পায়ের শিরা-উপশিরায় বুঝি বা মানবতার বক্ত আছে।

অরুন্ধতীর ব্যর্থ অশ্রুব স্পর্শে সহানুভূতির পাষাণ একটুও নরম হয়নি সেদিন।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কে হিম হয়ে যায় সারা শরীর। দিনের পর দিন অত্যাচার, আঘাত, অপমান। অরুন্ধতীর সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সম্মান-সম্ভ্রমেব দেয়ালে ফাটল ধরিয়েছে সে, মুখ তুলে কথা বলার সব স্বাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারপরও জানিয়েছে সে অনুনয়ের প্রার্থনা একটার পর একটা।

তারই চিঠি!

মনে মনে আবার হাসলো অরুন্ধতী, হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিটা, কি যেন ভাবলো, পড়লো। সেই একই চিঠি নয়, একই প্রার্থনা নয়।

চিঠি নয়। জানিয়েছে আসবে সে, রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে আসবে। একটি মাত্র অনুরোধের হাত বাড়িয়ে সে আসবে। নিজের জন্য এই গোপনতা নয়। অরুন্ধতীর সম্মান আহত হবে এই ভয়ে রাত্রির অন্ধকাবে আসবে সে।

অরুন্ধতীকে ফিরে চায় না সে। জানে, অরুন্ধতীকে ফিরে পাবে না।

তার আপন সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে। জানে, ফিরে পাবে না তাকে অরুন্ধতীর কাছ থেকে।

শুধু একটিবারের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য গলির মোড়েব গ্যাসপোস্টের তলায় এসে দাঁড়াবে সে, অপেক্ষা করবে। শুধু একবার দৃষ্টির দু-বাহু জড়িয়ে তার আপন শিশুসন্তানকে।

আর কিছু নয়, আর কোনো উপরোধ প্রার্থনা নয়।

তবু উপহাসে কৌতুকে বিষাক্ত হাসি ফুটলো অরুন্ধতীর মুখে।

না, তাকে ক্ষমা করতে পারবে না অরুন্ধতী। সুবিমলকেও নয়।

একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।

সব ইতিহাস জানা হলে অরুন্ধতীকে দূরে সরিয়ে দেবে সুবিমল। ভালোবাসার, শ্রদ্ধার, সম্মানের আসন ফিরে পাবে না ও।

তবু ও শুধুই পথ খুঁজলো। চিন্তার জালে চোখ হারালো। চঞ্চলতায় মন।

তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনের সূর্য আকাশে উঠলো, দিগন্তে ডুবলো আর অশ্রুতে ভাসলো অরুণির মন। কি আশ্চর্য! সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা অরুণি শুধু ভাবলো আর ভাবলো।

এতদিনের ব্যর্থ আক্রোশ মেটাবার দিন এসেছে। জীবনের চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে অরুণি।

প্রতিশোধ নেবার তীব্র অধীরতায় রক্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যেন। যে শুধু ঘৃণাই পেয়েছে আর যে শুধু ঘৃণাই দিয়েছে অরুন্ধতীকে, আজ এই চরম মুহূর্তে তাদের দুজনকেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও।

জাফরানী দিন বিকেলে নামলো, লাল বিকেল শিশুসন্ধ্যায়। না-বাতাস না-আলো এক-জানালার নিরালা ঘরের কোণে অন্ধকার গাঢ় হলো, পথ নির্জন। শহরের রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলোয় আরো আঁধার ঘন হলো, ধোঁয়া, ধোঁয়া নীল বাঁকা গলির বাঁকে। তারপর লোক এলো, মই কাঁধে। বাতিজ্বালা লোক।

আলো নয়। ছায়া দিলো গ্যাসবাতি। রহস্যের, আতঙ্কের।

রাত্রি বাড়লো। নির্জনতম পথ।

একটি একটি করে চারপাশের জানালার আলো নিবলো, শব্দ থামলো, ঘুম নামলো চাঁদ-ঢাকা পাঁচতলা বাড়ির কার্নিসে কার্নিসে।

দশটা বাজার ঘণ্টা ভেসে এলো দূরের ট্রাম ডিপো থেকে। অধৈর্য হয়ে উঠলো অরুন্ধতী। অপেক্ষার সীমান্তে এসে পৌঁছলো ও এতক্ষণে। সমস্ত বাড়ির ঘুম-নিঝুম মেঝের ওপর পা টিপে টিপে সন্ত্রস্ত চোখে চতুর্দিকে তাকালো অরুন্ধতী। তারপর ঘন গভীর কালো শাড়ির আড়ালে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেললো ও, আর কালো ঘোমটার আড়ালে গ্যাসের ফিকে জ্যোৎস্নায় অরুন্ধতীর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখালো। আরো বিষণ্ণ করুণ। তবু ওই তীরতীক্ষ্ণ চোখের কোণে কোথায় যেন বিষনিশ্বাস।

আপন শিশুকে কোলের কাপড়ের আড়ালে নিয়ে পা টিপে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। মেটে কাদায় অন্ধকার শীর্ণতম পথটুকু পার হয়ে গলির মোড়ে গ্যাসপোস্টের দিকে পা বাড়ালো অরুণি।

দূরের দৃষ্টিতে ও তাকে চিনতে পারলো অরুন্ধতী। দেখলো অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছে সে। আশায়, হতাশায়।

অরুন্ধতীর কালো ঘোমটার তন্বী শরীরে কি চিহ্ন ছিলো কে জানে, মুহূর্তে উদ্ভাসিত

হয়ে উঠলো তার মুখ, এগিয়ে এলো সে।

—চলো। স্পষ্ট গলায় বললে অরুন্ধতী, আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চোখ তুললো সে। কি বলছে অরুন্ধতী? সে শুধু একটি মুহূর্তের দর্শন চায়, তার আপন সন্তানের। আর কিছু নয়।

—চলো। আবার বললে অরুন্ধতী।

—ফিরে যাবে? ফিরে যাবে অরুন্ধতী? অবিশ্বাসের ম্লান মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে, জানতাম। জানতাম অরুন্ধতী, তুমি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে। বিদ্রূপের হাসি দুললো অরুন্ধতীর চোখে। সে তো ফিরে যেতে চায়নি, সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।

# অতিমানুষ

## শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক চুমুক রক্তের অভাবে রমজান দিনকে দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো-বা একদিন ম'রেই যাবে।

তবু একফোঁটা রক্ত পাবারও জো আছে নাকি।

রক্ত তার শরীরের জন্য প্রয়োজন নয়, রক্ত সে খেতে চায়।

...

একদিন রমজান রক্ত খেয়েছিল। হোক তা নিজের ছেলের রক্ত, তবু কি সে-স্বাদ ভোলা যায় সহজে! কেমন ঈষদুষ্ণ নোনতা-নোনতা অদ্ভুত এক স্বাদ।

সেই থেকেই জোরালো বাসনা তার মানুষের রক্তপানের। এ-বাসনা সবসময় তুষের আগুনের মতো মনের মধ্যে জ্বলে। স্বপ্নেও রসনার রস গড়ায়। জাগ্রতে মাঝে-মাঝে পাগলের মতো হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু, মানুষটা রমজান কি আসলে সত্যিই পাগল? না। সাধারণের মধ্যে অতিসাধারণ। ব্যতিক্রম শুধু এক জায়গায়—মানুষের রক্তপানের অমানুষিক তৃষ্ণায় সে সর্বদা উদ্ব্যস্ত।

এমনও হয়, কখনও-কখনও নিজের হাত কামড়ে ধরে। চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত গড়ায় বা রক্তের ঢল নামে। আর তাই তখন সে জিব দিয়ে চেটেচুটে নেয়, ঠোঁট বসিয়ে চুষতে থাকে।

কিন্তু উঁহু, এতে তৃপ্তি নেই। খানিক পরে ক্ষতটা চিন-চিন করে, মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে, চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে—জ্বালা-জ্বালা করে। প্রথম-প্রথম আরো-বেশি জ্বালা-জ্বালা করত চোখ, জলের রেখা নামত গাল বেয়ে। তখন তার স্বাদও রমজান নিয়ে দেখেছে, অনেকটা রক্তের মতো।

চোখের পানি আর মানুষের খুনের স্বাদ অবিশ্যি এক নয়, তবু আপশোস, আজকাল তার চোখ দিয়ে গাল বেয়ে পানির ঢলও আর নামে না।

ভুখায় ওকে মরো-মরো দেখে কাফিখানার শরাফতের মনটা বুঝি মাঝে-মাঝে মেহেরবানিতে মোচড় দিয়ে ওঠে। তুন্দ্‌রির দু-একটা টুকরো গোস্তর ঝোল মাখিয়ে ওর হাতের মুঠোয় গুঁজে দেয়। কিন্তু তা গলা দিয়ে নামে না, অভ্যেসমাফিক খানিক চিবুনোর পর বারকয়েক ঢোক গেলার চেষ্টা ক'রেই রমজান তা উগড়ে দেয়। থুতু ফ্যালে ঘন-ঘন।

আসলে মানুষের রক্ত চাই রমজানের।

কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া ভারি মুশকিল। রাস্তায়-চৌমাথায় গলির মোড়ে

গাড়িবারান্দার নিচে যে-সব মানুষ ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘোরে, ডাস্টবিনের খাবার খুঁটে খায়, দোরে-দোরে হত্যে দেয় হন্যে কুকুরের মতো, আর শেষ পর্যন্ত যেখানে-সেখানে হেগে -মুতে কি গাড়ি চাপা প'ড়ে ম'রে থাকে—তাদের রক্ত চায় না রমজান। সুস্থ সবল লোক বড়োলোক মানুষের রক্তেই ওর লোভ। কেমন স্বাদ তাদের রক্তের? টকটকে-লাল পাৎলা রক্ত একটু একটু ক'রে ঘন হ'য়ে আসছে, জিভের আরামে সেই রক্ত চুকচুক ক'রে তারিয়ে-তারিয়ে চুষে খেতে কী-যে তৃপ্তি! গলার ভিতর দিয়ে সেই রক্ত যখন বুকে গিয়ে নামবে, বুক তখন নির্ঘাত তার ফুলতে থাকবে জোয়ার-লাগা গাঙের মতো। স্রোতের মুখে নাওয়ের মতো হালকা হ'য়ে যাবে শরীরটা। এবং ঘন হ'তে-হ'তে সেই রক্ত যদি জ'মে একেবারে কালো হ'য়ে যায়—আহা-হা—কড়া-জ্বালের তালের পাটালির মতো তা চিবিয়ে-চিবিয়ে খাওয়ার যা মজা!

ভেবেই সারা শরীর থরথর ক'রে ওঠে, হাড়ে-হাড়ে ঠোক্কর লাগে। জিভ দিয়ে চুকচুক করতে-করতে মনটা রমজানের দুর্বোধ্য অকথ্য এক চাপা আক্রোশে গুমরে মরে।

'ইস! দেখলা নি, মোটরটা বাহারের হুশ কইরা গেল গিয়া!' রমজান ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়ায়, 'হালাব গর্দানটা যেন দুম্বার রে!' মাটির পেশী কড়কড ক'রে ওঠে, শিবাবহুল হাতের আঙুলগুলি টানটান হ'য়ে যায়—সাঁড়াশির মতো।

তারপর উত্তেজনা অবসাদে থিতিয়ে আসতে-না-আসতে পেটেব নাড়িগুলি পাকে-পাকে জড়িয়ে যেতে শুরু করে : খিদে।

...

খিদে।

অন্তত একদিন খেলে পরের দু-তিন দিন উপোস অনায়াসেই দেয়া চলে—ক-মাসের মধ্যেই বাপ-বেটার মোটা বেশ রপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই একদিন জোটাই যে ভার!

আর খিদেটা মাত্রা ছাড়ালে জিভটা আঠা-আঠা হ'য়ে নাড়ির টানে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চায়, কাঠফাটা রোদ্দুরেও আঁধার ঘনিয়ে ওঠে চোখের তারায়, হাঁটু দুমড়ে আসে—জোর-জবরদস্তি যেন নামাজে বসাতে চায়—যেন খোদার দববারে একবার শুধু আরজি পেশ করলেই বেহেস্ত থেকে হুরির দল নেমে আসবে খাবারের থালা নিয়ে।

এদিকে এক লহমা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কি, ছকু এমনি চি-চি ক'রে ডাক ছাড়ে, 'বাজান!' খোড়া পা-টা ঘসড়াতে-ঘসড়াতে রমজান ফের চলতে শুরু করে। ছেলের ওপব গোঁসা হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না—এক হ্যাঁচকায় হাত ধ'রে তার টান মারে। ছকু কঁকিয়ে ওঠে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে হাতের মুঠো আলগা ক'রে দেয়, ভয়ে-ভয়ে তাকায় ছকুর মুখের দিকে। না, ঠিক আছে, মায়ের চেয়ে তাগদ বেশি ব্যাটার শরীরে। আচমকা এক ধাক্কা মেরেছিল ব'লে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়ে ম'রে গিয়েছিল ছকুর মা। তারপর কত ডেকেছিল রমজান, কত সোহাগ জানিয়েছিল, আমিনা তবু সাড়া দেয়নি। সোয়ামির হাজার ডাকে শত সোহাগেও যে মরা বউয়ের সাড়া দেয়ার সাধ্য থাকে না সেটা রমজান বুঝেছিল ঘণ্টা তিনেক পরে। আর বুঝে যত-না দুঃখিত তার বেশি

হ'য়ে গিয়েছিল অবাক। মরা মানুষের সাড়া না-দেয়ায় অবাক হওয়া নয়, আমিনার এমন বেকুবের মতো ম'রে-যাওয়ায় অবাক। এতদিন একসঙ্গে ঘর ক'রেও বউটা বুঝল না যে সত্যি-সত্যি মেরে ফেলার জন্যে রমজান তাকে ধাক্কা দেয়নি, নিজের খিদের জ্বালাটাকেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল—আমিনা শুধু সময় মতো সামনে প'ড়ে গিয়েছিল, এই যা! আমিনা না-থাকলে নিজের কপালটাকেই হয়তো সে ধাক্কা দিত দাওয়ার খুঁটোয়। এ-সব কি জানত না আমিনা? জানত, সব জানত—নেহাৎ তাকে জব্দ করার মতলবেই অসময়ে এ-ভাবে ম'রে গেল মাগিটা—পেটের খিদের সাথে মনের দুঃখটাও যাতে রমজানের সমান তালে চলতে পারে, তাই!

আলতো মুঠোয় রমজান ছকুর হাতের গোটা তিনেক আঙুল ধ'রে থাকে—আমিনারই তো পেটের পোলা! এবং হাঁটে। খানিক এ-ভাবে হেঁটে গেলেই যেন তার আর ছকুর খিদেটা উবে যাবে, গোয়ালন্দে স্টিমার থেকে নেমে যেমন ভেবেছিল হিন্দুস্থানের গাড়িটা খুঁজে পেলেই কমতে শুরু করবে খিদের তাড়না, মন থেকে মুছতে থাকবে ছকুর মায়ের প'ড়ে গিয়ে, ম'রে থাকার ছবিটা।

আস্তে-আস্তে সন্তর্পণে ছকুর হাতটা মুঠো ক'রে ধরে। আজ আমিনা থাকলে হয়তো তার একটি হাতও এমনি ক'রে ধরত।

ঘুরতে-ঘুরতে একটি গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। হিন্দু পাড়া-ভেতরে ঢুকবে-কি ঢুকবে-না ভাবে কয়েক সেকেণ্ড।

সুন্দর একটি বাসনা হাওয়ায় ভেসে আসছে।

পিচমোড়া নাতিপ্রশস্ত গলি, আলোর চেকনাই, দু-পাশে বাড়ির বাহার। কোন সাহসে ঢোকে সে এই গলিতে, এই হিন্দুপাড়ার গলিতে? কিন্তু হাওয়ায় ভেসে-আসা বাস্‌নার স্বাদে জিভ যে চপচপে হ'য়ে ওঠে!

সদর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রমজান একটু ইতস্তত করে। এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর পা বাড়ায় ভয়ে-ভয়ে। কিন্তু বেপাড়ায় এত আলোয় এত ভালো রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কেবলই দুই পা তার জড়িয়ে আসে। হঠাৎ নজরে পড়ে—হাতটাক চওড়া একটা পথ চ'লে গেছে পাশ দিয়ে। মুখ নাড়তে-নাড়তে একটা কুকুর বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। রমজানও হুট ক'রে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অনেকখানি পথ এক নজরে ঠাহর হয় না, কিন্তু নিশাচর জানোয়ারের মতো জ্বলছে তার দুই চোখ। সেই চোখের আলোয় পথ চিনে-চিনে অবশেষে সে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছোয়।

আঃ! ছকুর হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল রমজান।

জালতি-আঁটা জানালা দিয়ে রান্নাঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। কড়াতে একটু আগেই কী-যেন সম্ভার দেয়া হয়েছে, এখনও তা থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ উঠছে। সম্ভারের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগার সঙ্গে-সঙ্গে কস বেয়ে খানিকটা লাল গড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে মুখ বুজে জিভ নিয়ে রমজান খেলা করতে শুরু ক'রে দেয়। ঘন-ঘন শ্বাস টানে। থেকে-থেকে হা ক'রে হাওয়া গেলে। শরীরে কেমন-এক নেশার আমেজ নামে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আলগোছে একবার জানলার জালটা ছোঁয়, নখ দিয়ে বারকয়েক আঁচড় কাটে তার ওপর।

'বাজান!' ফিশ-ফিশ ক'রে ছকু ডাকে।

'চুপ র ছ্যামরা!' রমজান চাপা ধমক দেয়।

এঁদো গলির একেবারে শেষ মাথায় বাড়িটা। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সামান্য-একটু পিছু হঠে রমজান, যাবে-কি-যাবে-না, থেকেই বা কী করবে—এইসব বুঝি ভাবে জালতি-আঁটা জানালার ওপর অপলক চোখ রেখে ক্ষুধার্ত ছেলের হাত ধ'রে নিজের বুকের ধুকধুকি শুনতে-শুনতে।

ভারি সাজানোগুছোনো রান্নাঘর। আলমারি, তাক। রুপোর মতো ঝকঝক বাসনকোসন। দুটি শিকেয় হাঁড়িপাতিল। তাকের ওপর থেকে রাঁধুনি একটা বোয়েম নামাল, ঘিয়ের বোয়েম। চামচে ক'রে তার থেকে ঘি নিয়ে কড়ায় দিল। তারপর বোয়েম রেখে দিয়ে একটা হাতা তুলে নিল।

কড়াইয়ের সঙ্গে হাতার ঘর্ষণের শব্দ আর ঘিয়ের গন্ধ! দু-পা এগিয়ে যায় রমজান।

'বাজান!'

'আঁই—চোপ!'

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে মাথা তুলেছিল ছকু, ধমক খেয়ে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরল।

মাঝবয়সী একজন মেয়েমানুষ ঘরে ঢুকে কী-যেন রাঁধুনিকে ব'লে গেলেন। তাঁর কথা শোনা না-গেলেও বোঝা যায় যে ইনিই বাড়ির গিন্নি-রান্নার তদারক ক'রে গেলেন সম্ভবত। গাঁয়ে থাকতে রমজান যখন জন খাটত লাঙল ঠেলতে, মাঝে-মাঝে তখন খেতে পেত বাবুর বাড়িতে—মস্ত উঠোনের একপাশে পাত পড়ত তাদের, ভাত-তরকারি বেড়ে দিত অন্য লোকে, কিন্তু গিন্নিঠাকুরণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন সামনে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তদারক করতেন। বড়ো জোতদার, খানদানি পরিবার—ধনী লোক, মানী লোক। ধনী-মানী লোক এরাও। এই গিন্নিঠাকুরণকেই তো দেখতে অনেকটা—

'কও কী, বাজান?'

নিজের মনেই রমজান বিড়বিড় করছিল, ছকুর কথায় চুপ ক'রে গেল। তবে এবার আর সে ধমক দেয় না ছেলেকে। সাহস পেয়ে ছকু বাপের কোমর ছেড়ে নিজেই ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়াল নর্দমার বাঁধানো কিনারে।

'এনারে বাবুর বাড়ির ঠাকরোনের নাখাল দ্যাখতে, না-রে ছকাই?'

ছকু জবাব দেয় না। তারই বয়েসী একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকেছে, খাবারের তাড়া দিচ্ছে। অবিকল মুনীরের মতো গোলমাল গাঁটাগোট্টা চেহারা, পেসিডেন মমতাজ মিঞার ছোটো ছেলে মুনীর—বাড়ি থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে ছকুর সঙ্গে যে ঘুরে বেড়াত বনে-বাদাড়ে, বাপের কাছে বার-বার পিট্টি খেয়েও তার দোস্তিতে যে ইস্তফা দেয়নি।

মুইন্যা ব'লেই হয়তো ছেলেটিকে ডেকে উঠত ছকু, কিন্তু রমজান ততক্ষণে তার

একটি হাত চেপে ধরেছে—নিজের ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে পরের ছেলের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। পোলাপান মানুষের চেহারা এমন ঘাড়ে-গর্দানে না-হ'লে মানায়? জুৎসই খেলেই চেহারার জৌলুশ খোলে, চেকনাই বাড়ে, ঘি-দুধ পেটে গেলে মানুষ মোটা হয়, রমজান তা জানে। কারণ সেইসব খাদ্য শরীরের ভেতরে গিয়ে রক্তমাংস তৈরি করে, দেহে তাগদ আনে। কতদিন আগে কোন ছেলেবেলায় মাস্টার সাহেবের কাছে কথাগুলি শুনেছিল, এখনও কিন্তু ঠিক-ঠিক মনে আছে। পেট পুরে খেতে পেলে তার ছকুও আজ অমনি তাগড়া-তোগড়া হ'য়ে উঠত। কিন্তু কেন হ'ল না? না, খেতে পেল না।

কেন খেতে পেল না? পাকিস্তান তো হ'ল, তবু কেন খেতে পায় না গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষেরা? খিদের জ্বালায় কেন তাদের দুশমন দেশ হিন্দুস্থানে চ'লে আসতে হয়—আবার হিন্দুস্থানে এসে মরতে হয় না-খেয়ে বা ছোরা খেয়ে? কেন?

অ্যাঁ, কেন?

আর শুধু কি পাকিস্তানে? হিন্দুরাও তো হিন্দুস্থান চেয়েছিল—তবু কেন এ-দেশের গরিবরা না-খেয়ে মরে? পাকিস্তানের হিন্দুরা জানের ভয়ে পালিয়ে এসে না-খেতে পেয়ে জান দেয় হিন্দুস্থানে। কেন?

অ্যাঁ, কেন?

এ এক আজব ধাঁধা।

আসলে ধাঁধা-টাধা কিছু না—সব খোদা, খোদাতালার মর্জি সব। নইলে নিজের দেশ ছেড়ে রমজান চ'লে আসে এখানে, তেষ্টায় পানি জোটে না যে-দেশে? এতকাল পাশাপাশি ঘর ক'রেও লক্ষ্মণ কিনা ভয় পায় রমজানকে—যে লক্ষ্মণকে দাঁতালের মুখ থেকে জান কবুল ক'রে দু-বছর আগে বাঁচিয়েছিল রমজান নিজে? রাগের মাথায় কীই-বা এমন সে বলেছিল যে রাতারাতি গাঁ ছেড়ে পালাল লক্ষণ গুষ্টিশুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে? শুধু কি লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণরা। তার হঠাৎ-জাগা রাগটাই শুধু ওরা দেখল, আর লক্ষ্মণের ফাঁকা ভিটের দিকে তাকিয়ে যে ঝরঝরে সে কেঁদে ফেলেছিল, লক্ষ্মণের জন্যে মোনাজাত করেছিল খোদার দরবারে, সে-সব কিছু না? আসলে সব খোদা, খোদাতালার মর্জি সব। নইলে অমন জলজ্যান্ত মেয়েমানুষটা এক ধাক্কায় প'ড়ে গিয়ে থাকে? মরার আগে একবার ভাবে না পর্যন্ত যে এভাবে সে চ'লে গেলে তার সোয়ামির কী হবে, ছেলের কী হবে।

সব হারামজাদা, হারামাজাদা!

না-না, হারামজাদা নয়, আসলে সব খোদা, খোদাতালার ইচ্ছেতেই যা হবার হয়।

আদর ক'রে ছেলের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে একে-একে ছেলের বুকের পাঁজর গোনে রমজান।

তরকারির কড়া নামিয়ে উনোনে দুধের কড়া বসাল রাঁধুনি। ছোট্ট পুকুরের মতো এক-কড়া শাদা দুধ টলমল করছে। একটু পরেই তাত লেগে উথলে উঠবে, টগবগিয়ে ফুটতে থাকবে, সঙ্গে-সঙ্গে হাতা দিয়ে না-নাড়লে কড়ার গা বেয়ে উনোনে পড়বে। দুধ

পোড়ার কটু উগ্র একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের বিস্মৃত স্মৃতিটাকে রমজান রোমন্থনের চেষ্টা করে। চোখ জোড়া তার কড়ার ওপর আটকে গেছে—দুধ ফাঁপছে, দুধ ফুলছে। এরপরই ফেটে ফেটে যাবে, ফুটতে থাকবে। কখন, কতক্ষণে ওই দুধ উথলে উঠে আগুন পড়বে আর দুধ পোড়ার সেই কটু উগ্র গন্ধটা নাকে এসে লাগবে রমজানের? লাগবে কি?

'বাজান! ধোৎ!'

তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে রমজান বলে, 'কথা কইস না, বাপ, কথা কইস না—দ্যাখ, চুপ কইরা দ্যাখ।' তারপর ছেলের দেখতে অসুবিধে হচ্ছে ভেবে নিজেই তাকে কোলে তুলে দেখায়।

একহাতে বাপের গলা পেঁচিয়ে ড্যাবডেবে চোখদুটি ছকু জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় —অন্য হাতের আঙুলগুলি মুখে পুরে চুষতে থাকে প্রাণপণ।

ছোটো-বড়ো কয়েকটি থালায় ভাত বাড়ছে রাঁধুনি। হাতা দিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বার করছে, গরম ভাতের হালকা-হালকা ধোঁয়া উঠছে। আর গন্ধ!

ভাতের গন্ধ!

'বাজান-রে, কত্তো—'

'হ্-হ্—আঁই!' ধমক নয়, কথাটা রমজান এড়িয়ে যায়। আসলে কথা বলবার ইচ্ছে নেই, অবসর নেই তার। চোখ দিয়েই যেন সে গরম-গরম ভাতগুলি গোগ্রাসে গিলছে। অমন গরম ভাতে হাত দিলে পুড়ে যায়, তবু সে হাত সরিয়ে নেয়া অসম্ভব। মুখে দিলে গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্ব'লে ওঠে, তবু উগরে ফেলা অসম্ভব। ভাত। দলা-দলা গরম ভাতের গ্রাস। ওই এক কড়া দুধের বদলে এক শানকি ভাত পেলেই রমজান আজ বেশি খুশি, খু-ব খুশি।

চুপচাপই ছকু ছিল, রমজান তবু বলে, 'কথা কইস না, বাপ, দ্যাখ, চুপ কইরা দেইখা যা।'

'অতগুলান উয়ারা খাইব? আমাগোরে দুগা দিব না, বাজান!'

'দিব-রে, দিব-দিব।' ছেলেকে না, নিজের মনকেই যেন সে প্রবোধ দেয়। ইস. ব্যঞ্জনই দ্যাখো কত রকমের, ডাল-ঝোলের বাটিই গোটাচারেক, আঁই! একসঙ্গে এত খাদ্য কি খেতে পারে মানুষ? ইচ্ছে করলেও কি পারে? আঁঃ?

'বাজান,' বাপের থুৎনি ধ'রে ছকু বলে, 'অ্যাহনি দুগা চাইয়া লও না ক্যান, বাজান, নাইলে হগ্‌গলটি উয়ারা খাইয়া ফেলাইবনে।'

'খ্যাপচস। মানষে নি পারে—'

থালার ওপর বাটি সাজিয়ে রাঁধুনি একে-একে সেগুলি বাইরে নিয়ে যায়। তার যাতায়াতের সঙ্গে-সঙ্গে রমজানের চোখদুটিও ঘর-বার করে। ভাত দেয়া শেষ ক'রে রাঁধুনি দুধের কড়া সামনে টেনে আনে, হাতা দিয়ে বাটিতে-বাটিতে দুধ ভাগ করে। রমজানের সেদিকে দৃষ্টি নেই—ভাতের হাঁড়িটা খোলা প'ড়ে আছে, ভাত দেখা যায় না, কিন্তু হাঁড়িতে

ভাতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। একেবারে যেন শরীরী অনুভব। হাতের আঙুলগুলো শিরশিরিয়ে ওঠে, যেন গরম ভাতের তাত লেগেছে। লালায় জিভ জড়িয়ে আসে।

এক ঢোঁক থুতু গিলে হঠাৎ এক বেখাপ্পা প্রশ্ন ক'রে বসে, 'হাঁ-রে ছকাই, তুই কত্তগুলান ভাত খাইবার পারস ক দেহি, আঁই?'

'আমারে নি কও?' বাপের সন্দেহজনক সওয়ালটাকে ছকু একবার ঝালিয়ে নিতে চায়।

'আরে হ-হ—তরে নাইলে কমু কারে? আর আমাব আছে কেডা।' অপার অপত্য স্নেহে ছেলের শরীরটাকে সে পিষতে থাকে।

'অ্যাই অ্যাই—অ্যা-ত্তো!' শূন্য যতদূর-সম্ভব নিজের হাত দুটি বিস্তৃত ক'বে দেখায় ছকু।

'আরেঃ শযতান! কী আদেখিলা দিশারে তর!' কথাগুলি ব'লে ফেলেই সচেতন হ'য়ে গিয়ে রমজান নিঃশব্দে হাসতে থাকে। হাসির দমকে সারা শরীর কাঁপে।

'আর তুমি, বাজান?'

'তর থেইকা বেশি তো খামুই।' মুরুব্বির মতো ঘন-ঘন মাথা নাড়ে রমজান, 'বয়সটা কত আমার জানসনি? তর বাপ না আমি?'

ওদিকে ঘর-বার করছে রাঁধুনি, এদিকে চোখের দৃষ্টি অপলক রেখে প্রতি মুহূর্তের হিশেব কষছে বমজান। ইস, খেতে এত দেরি হয় কেন ওদের! খেতে ব'সে নিশ্চয় যত রাজ্যের গল্প শুরু করে। হ্যাঁ, আলবৎ! দূর থেকে মাঝে-মাঝে বাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের খাওয়া সে দেখেছে কিনা, তাই এদের হাল-হকিকৎ সব তার পুরোদস্তুর জানাশোনা। খেতে ব'সে ছাড়া যেন আর গল্প করার ফুরসৎ জোটে না। কিংবা হয়তো ভাত নিয়ে পাইজামি শুরু করেছে বাচ্চারা, গিন্নিঠাকরুণ ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

রমজান কিন্তু তিন গেরাসে এক থালা ভাত সাবাড় ক'রে দিতে পারে—যা-না থালার নমুনা—বড়োজোর চার গেরাস। তাই ব'লে এত দেরি!

রমজান ছটফট কবে। ছকুকে কোল থেকে নামাবে কি নামাবে না ভাবতে গিয়ে দ্যাখে ছকুও ঠায় তাকিয়ে আছে ঘরের দিকে আর ওদিকে গুটি-গুটি পায়ে একটা কালো বেড়াল ঘরে ঢুকছে দরজা দিয়ে। ছকু হিস-হিস ক'রে উঠল, থমকে দাঁড়াল বেড়ালটা, মুখ তুলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল।

'চোট্টা!'

'হালা!' হিস-হিস ক'রে নয়, বোধহয় সরাসরি ধমক দিয়েই বেড়ালটাকে তাড়াবার জন্যে রমজান জানালার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, রাঁধুনি ফের ঘরে এসে ঢুকল।

দু-হাতে তার কয়েকটি থালা। থালার ভুক্তাবশেষের দিকে তাকিয়ে রমজানের দেহে নতুন ক'রে রক্ত চলাচল শুরু হয়। এই এতক্ষণে যেন প্রত্যাশিত ছবিটি তার চোখে পড়ল। পেটটা ঘন-ঘন পাক দিতে থাকে, থুতুতে সারা মুখ ভ'রে যায়, চোখের পাতা ওঠা-নামা করতে শুরু করে ঘন-ঘন।

কিন্তু ও-কী, ও-কী!

এক লহমায় ছকুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রমজান চাপা চীৎকার ক'রে ওঠে। ঠিক চীৎকার নয়, বুকফাটা আর্তনাদ।

একে-একে থালা থেকে ভাতগুলি নর্দমায় ফেলে দিচ্ছে রাঁধুনি।

'আরে-আরে করো-কী, রও, রও!' পাতের এঁটো কয়েকমুঠো ভাত-তরকারি নয়, রমজানের আর্তনাদ শুনে মনে হয়, কেউ যেন তার কলিজাটাকেই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নর্দমায় ছুঁড়ে দিচ্ছে।

থমকে গেল রাঁধুনি। চমকে উঠল। তারপর জালতি-দেয়া জানালার আড়ালে আধো-আলোয় আধো-অন্ধকারে ক্ষুধার্ত রমজানের গোঁফ দাড়ি ভর্তি বীভৎস বিস্ফারিত মুখমণ্ডল দেখে ভয়ার্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল, মোছলমান! মোছলমান! খুন! খুন! -ওরে বাবা রে—'

'আরে না-না—আমি খুনী না, খুনী না—'

'খুন! খুন! মোছলমান—খুন—মেরে ফেললে বাঁচা-ও—'

কী-যেন হ'য়ে গেল দেখতে-দেখতে। তুমুল হল্লা। হট্টগোল। হইচই। ছোটোদের চীৎকার। মেয়েদের কান্না। পুরুষদের হুংকার।

'ওরে লাঠি আন, লাঠি আন। সাবধান! হুঁশিয়ার! রাম সিং, বন্দুক—'

প্রথমটা রমজান রীতিমতো বেকুব ব'নে যায়। বাপ-ব্যাটায় ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে। ওদিকে হল্লা ক্রমেই বাড়ছে, আড়মোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠেছে এক রক্তলোলুপ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র জানোয়ার। ফটাফট জানালা-দরজা খুলছে বন্ধ হচ্ছে। কোন বাড়ি থেকে যেন বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজও হ'ল।

'কী হইব, বাজান!' ভয়ে শিঁটিয়ে গিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফ্যালে ছকু, 'আমাগোরেনি কাইটা ফেলাইবা! আ—বা-জান।' দু-হাতে সে বাপকে জড়িয়ে ধরে।

ভয় রমজানও পেয়েছে, কান্নাও পাচ্ছে তার—ভয়মেশানো দুঃখমেশানো কান্না। কিন্তু সে-সবের অবসর কই এখন? ঝটপট সে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে নেয়। গলি দিয়ে ফেরা অসম্ভব। গলির মুখে এতক্ষণে নির্ঘাৎ ভিড় জ'মে গেছে, আর মুখ পর্যন্ত যে পৌঁছুতে পারবে তারই বা ঠিক কী—তার আগেই হয়তো দু-পাশের বাড়ি থেকে ইট-পাটকেল লাঠিসোঁটা পড়তে শুরু করবে। সামনের দিকে তাকায় রমজান নালার ও-পাশে বড়ো এক নর্দমা, তারপর ইটের পাঁজা, তারপর—তারপর অন্ধকারে আর-কিছুই নজরে পড়ে না।

কিন্তু না, আর ভাববার সময় নেই। লোকজন ক্রমেই বেরিয়ে পড়ছে। হট্টগোল বাড়ছে। বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে ঘন-ঘন। হঠাৎ রমজান ছেলেকে কাঁধে তুলে নেয়, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে সামনের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁচা নর্দমায়, পড়বে-যে তা জানতই, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। হাঁটু-ডোবা পাঁক লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে। চোখে-

মুখে পাঁকের ছিটে লেগে।

ইটের পাঁজা। পোড়োজমি। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। খোয়া-ওঠা সড়ক। রমজান ছুটছে। বারকয়েক হোঁচট খায়। রমজান ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছেই।

ক্ষুধার্ত অন্নপ্রার্থী মানুষ মানুষের পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইছে।

হঠাৎ পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রমজান, কাঁধ থেকে তিনহাত দূরে ছিটকে গেল ছকু।

'বা-জা-ন!' একটা তীব্র আর্তনাদ: কে যেন নির্জন অন্ধকারের বুকে ছুরি মারল।

রমজান কিন্তু শুনতে পায়নি। শুনতে পাবে কী, দুই কান তার ঝাঁ-ঝাঁ করছে এখনও, নিশ্বাস নিতে গিয়ে চড়চড় ক'রে উঠছে পাঁজর, বুকটা আথালি-পাথালি করছে, হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে, আগুন জ্বলছে সারা শরীরে, আকণ্ঠ তেষ্টায় গলা কাঠ।

খানিক পরে অন্ধকারে ঠাওর ক'রে-ক'রে জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিতে-দিতে রমজান ছেলের দিকে এগিয়ে যায়। একটু দম নিয়ে বিকৃত গলায় ডাকে, 'ছকু! অ ছকু!'

ছকু কথা কয় না।

'ছকু! ছকাই!' ছেলের মাথাটা ধ'রে নাড়া দেয়, 'বাপ আমার! ছকাই ধন!'

ছকু নিশ্চল। ছকু নির্বাক।

এবার অদ্ভুত এক আতঙ্কে রমজান শিউরে ওঠে। উঠে ব'সে তাড়াতাড়ি ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নেয়। নাকের কাছে আঙুলগুলো উলটে ধরে।

এ কী!

'বা-জা-ন!' নিজের স্বরই যেন নিজের কানে ছেলের কান্না হ'য়ে শোনাল, 'ছ-কু!'

কিন্তু ছকু, রমজানের ছেলে, জবাব দিল না।

রমজানের ছেলে ছকু আর জবাব দেবেও না।

...

'ছকু, বাপ আমার!' ডাক ছেড়ে রমজান এবার কেঁদে ওঠে, 'মোরে ছাইরা কনে গেলিরে বা-প!'

শহরতলির অন্ধকার নির্জনে মরা ছেলেকে বুকে চেপে অদৃশ্য খোদাতালাকে সাক্ষী রেখে কান্নার মধ্যে দিয়ে এই একই প্রশ্ন বার-বার রমজান করতে লাগল।

এ-প্রশ্ন করবার ন্যায় সংগত অধিকার তার অবশ্যই আছে। যে-ছকুকে সে জন্ম দিয়েছে, প্রতিটি আপদে-বিপদে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে—হঠাৎ আচমকা বিনা নোটিসে সে যদি এমন ক'রে চ'লে যায় তবে কেন নিজের দাবি সোচ্চারে ঘোষণা করবে না রমজান? গরিব হ'লেও ছেলের বাপ তো ও? আর শুধু কি ছকু? ছকুর মা, তার গ্রামের লক্ষ্মণ, তার গ্রাম, তার পাকিস্তান, আর গান্ধির দেশ হিন্দুস্থান—সব একসঙ্গে এ কী-এক ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে? কিন্তু কেন? অ্যাঁ, কেন? সে গরিব—শুধু এই

কারণেই কি?

আজ যদি মুসলমান হওয়ার অপরাধে রমজানকে প্রাণ দিতে হ'ত, বেঁচে থাকলে এই একই ধরনের প্রশ্ন হয়তো ছকুও করত।

যেখানে বাপ-ব্যাটাকে একই মুখের গ্রাস ভাগ ক'রে খেতে হয়, বাপ-ব্যাটার শরীরে যেখানে একই রক্ত বয়—সেখানে এই-ই রেওয়াজ।

ছকুকে বুকে জড়িয়ে রমজান তার মুখে-চোখে শীর্ণ শরীরের সর্বাঙ্গে অনর্গল চুমু খেয়ে চলে। একটা দুর্বার চাপা কান্নার দুর্বোধ্য আবেগ বার-বার চুম্বনের মধ্যে দিয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়ে। নিজের কোনো অনুভূতি নেই, ঠোঁট ছাড়া কোনো ইন্দ্রিয় নেই—শহরতলির অন্ধকার নির্জনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে অবিরাম চুমু খাওয়া ছাড়া যেন এ-জীবনে আর করণীয়ও কিছু নেই।

খিদেয়-তেষ্টায় সে নিজেও ক্রমে নির্জীব হ'য়ে আসছিল। ছকুর দেহটা একটু-একটু ক'রে হিম হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ধীরে-ধীরে একটা গ্লানিকর ক্লান্তি সারা শরীরে তার ছড়িয়ে পড়ছিল। তিন দিনের অনাহারী পেটের নাড়িগুলি যখন কোমর ভাঙা সাপের মতো প্রচণ্ডভাবে পাক খেতে থাকে, মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে কত আর সোহাগ জানাতে পারে মানুষ, মানুষের মন? তেষ্টায় ছাতি যখন বৈশাখের খেত হ'য়ে ওঠে, চুমু খেয়ে-খেয়ে জিভের থুতু তখন নষ্ট ক'রে লাভ কী?

যাক—। শেষবারের মতো ছেলেকে চুমু খেতে গিয়ে হঠাৎ রমজানের খেয়াল হ'ল, এ-কী! তার ঠোঁটে জল এল কী ক'রে।

আর এই জলের স্বাদ কেন এত নোনতা-নোনতা?

ছেলের ফাটা কপালে ঠোঁট রাখল রমজান।

ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত রমজান অপার অপত্য স্নেহে নতুন ক'রে ছেলেকে চুমু খেতে শুরু করল—দীর্ঘ বিলম্বিত চুম্বন।

...

মাত্র কয়েক চুমুক রক্তের জন্যে রমজান দিনকে দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন ম'রেই যাবে।

রক্ত তার শরীরের জন্যে প্রয়োজন নয়, রক্ত সে খেতে চায়। সুস্থসবল বড়োলোক মানুষের রক্ত।।

# বুলবুলি

## কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক লোকের হল্লা আর চীৎকার শুনে বুলবুলির প্রথমে খুব ফূর্তি হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো বুঝি-একটা মস্ত মজা হচ্ছে। কিন্তু বাবা-মা আর দাদাদের শুকনো মুখ দেখে প্রথমে সে বেশ আশ্চর্যই হ'লো। তারপর তার মনেও কেমন একটা গা-ছমছম করা ভয় দেখা দিলো। অনেক রাতে ঘুম ভাঙবার পর পাশে মাকে খুঁজে না-পেলে যে-রকম ভয় হয়—অনেকটা সে-ধরনের ভয়।

বাড়ির সদর-দরজায় সকাল থেকেই তালা দেওয়া হয়েছে। চাকরটা প্রত্যেক দিন সকালে বাজার করতে যায়। যাবার সময় বুলবুলি রোজ তাকে বলে, 'আমার পাখিটার জন্যে ছাতু আর কাঁচালঙ্কা আনতে ভুলিস না, বুঝলি?' চাকরটা হেসে প্রত্যহ ঘাড় নেড়ে জানায় বুঝেছে, আর প্রত্যহই তাকে রাগাবার জন্যে বাজার থেকে ফিরে বলে পাখিটার খাবার আনতে ভুলে গেছে। তার এই মিথ্যেকথাতে বুলবুলি আজকাল রাগ করে না। সে জানে বাজারের থলির মধ্যে কোথাও-না-কোথাও ছাতুর ঠোঙা আর কাঁচালঙ্কা নিশ্চয়ই আছে।

আজ সকালে সে দেখলো চাকরটা মুখ শুকনো ক'রে ব'সে আছে। বাজারে বেবোয়নি।

'তুই বাজার যাবি না?' বুলবুলি আশ্চর্য হ'য়ে তাকে প্রশ্ন করলো।

'হুঁ, যাবো বৈকি!' কেমন-যেন ভয়-পাওয়া ধরা গলায় সে উত্তর দিলো। 'বাড়ি থেকে বেরুই আর আমার গলাটা ওরা কেটে ফেলুক!'

ইশ। গলা কাটা সোজা নাকি! সে শুধু দৈত্য-দানার গল্পতেই পাওয়া যায়।' এমনি-এমনি রাস্তার লোক বুঝি মানুষ ধ'রে-ধ'রে গলা কেটে ফ্যালে! যত-সব বাজে-কথা। তাকে রাগাবার জন্যেই চাকবটা নিশ্চযই বলছে। কিন্তু সে অমন বোকা-মেয়ে নাকি? বাজেকথায় মিছিমিছি রাগ করলেই হ'লো!

খুব গম্ভীর হ'য়ে বড়োদের মতো গলার স্বর করবার চেষ্টা ক'রে বুলবুলি বললো, 'বাজে বকিসনি। আমার পাখিটার খাবার নেই। শিগগির বাজারে যা।'

এবার যেন বাস্তবিক রেগে খেঁকিয়ে উঠলো লোকটা, 'জ্বালিয়ো না, খুকি! বলে মানুষ বাঁচবে কী ক'রে, মানুষ খাবে কী তার ঠিক নেই—এখন তোমার পাখির ভাবনা! বাজার—বাজারের কিছু বাকি আছে নাকি? সব আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। দ্যাখো-গে যাও না, তোমার পাখির খাবার যারা বেচে তারা ফুটপাথে ম'রে প'ড়ে রয়েছে।'

তার গলার স্বর শুনে আর চোখ-মুখের চেহারা দেখে বুলবুলি বাস্তবিক ভয় পেয়ে

গেলো। ফুটপাথে লোক ম'রে প'ড়ে আছে? কাটরি দিয়ে তাদের কুপিয়েছে? লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে? রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে?—একবার সে মুরগি-কাটা দেখেছিলো। তাজা রক্ত আর কাটা-মুরগির ধড়ফড়ানি দেখে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। সেই থেকে মুরগি আর খেতে পারে না। অনেক মশলা দিয়ে অনেক ভালো ক'রে রাঁধলেও না। প্লেটে মুরগির মাংস দেখলে সেই কাটা-মুরগিটার কথা মনে পড়ে, সেই রক্ত আর রক্ত-মাখা পালকের ছটফটানি তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। খাবে-কি, তার গলার কাছটা টনটন করে, ভালো ক'রে ঢোঁক গিলতে পর্যন্ত পারে না। তার ছোট্ট বুকের ভিতরে রুদ্ধ-কান্না যেন দম বন্ধ ক'রে দেয়।—চাকরটার কথা শুনে সে ভালো ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলো: মানুষ তো মুরগির চেয়ে অনেক-বড়ো। তাকে কাটলে না-জানি আরো-কত-বেশি রক্ত বেরুবে, না-জানি সে আরো-কত-বেশি ছটফট করবে। যতই ভাবতে লাগলো চাকরটার কথায় ততই-বেশি সন্দেহ হ'তে লাগলো তার—এও কি সম্ভব? বাজারে মানুষকে মেরে ফেলছে? নিশ্চয়ই এটা ঐ শয়তান চাকরটার বানানো কথা। তার পাখিটাকে খেতে না-দেবার শুধু মৎলব!

বুলবুলি চললো বাবার কাছে নালিশ করতে। কিন্তু দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভিতরে তার বাবা-মা আর দাদাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

'—তোমার সব গয়নাগুলো খুলে একটা পুঁটলি ক'রে ফ্যালো।' তার বাবার স্বর।

'পুঁটলি ক'রে রেখে কী করবো? আমার সব গয়না, সিন্দুকের সব গয়না, তোমার সব টাকাকড়ি গুণ্ডাদের দিয়ে বলো আমাদের কিছু অনিষ্ট যেন না-করে। বলো, আমাদের সবাইকে তারা যেন এ-পাড়া থেকে ভালোয়-ভালোয় বাইরে যেতে দেয়।' তার মার স্বর।

এমন সময় বাইরের গোলমাল ভীষণ বেড়ে উঠলো। লোকগুলো সব খেপে গেলো নাকি? কী বলছে তারা? কী চাইছে?

ততক্ষণে বুলবুলির দাদা জানলা থেকে দেখে ফিরে এসেছে। বলছে, 'মোড়ের পেট্রলের দোকানটা ভেঙে লুঠতরাজ করছে। তার পাশের বাড়িটাতেও আগুন দিয়েছে। এবার আমাদের বাড়ির পালা!'

তার কথা শেষ হ'তে-না হ'তেই ঠকাঠক ক'রে সেই ঘরের মধ্যে ইট পড়তে লাগলো।

'সবাই বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো,' বলতে-বলতে বুলবুলির মা-বাবা-দাদারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ভিতরের বারান্দায়, যেখানে দাঁড়িয়ে বুলবুলি তাদের কথাবার্তা শুনছিলো।

বুলবুলিকে তারা যেন দেখেও দেখলো না। বুলবুলির বড়দা বললো, 'বাবা, তোমার বন্দুকটা—'

'মাত্র তিনটে টোটা আছে। তাও অনেক দিন আগে কেনা। ভালো আছে কিনা কে জানে—'

'যা-ই থাকুক, আমি বন্দুক বার করতে চললুম। অন্তত তিনটে গুণ্ডাকে তো মারতে পারবো।' ব'লে তার বড়দা দ্রুত-পায়ে বন্দুকের ঘরে চ'লে গেলো।

তার ছোটদা বললো, 'বাবা, আর-একবার টেলিফোন করলে হয় না পুলিশ-আপিশে?'

তার বাবার মুখ-চোখ যেন কেমন হ'য়ে গেছে। খোঁচা-খোঁচা কাচা-পাকা দাড়ি গজিয়েছে। চোখের দৃষ্টি যেন পাগলের মতো। কোনো কথা ঠিকমতো তাঁর কানে ঢুকছে ব'লে মনে হয় না।

'টেলিফোন কি আর আছে? কোনো সাড়া নেই।—থানায় খবর দেওয়া! পুলিশের চোখের সামনেই গুণ্ডামি চলছে। সবাই মুখ বুজে দাঁড়িয়ে।'

এমন সময় দুমদাম ক'রে সদর দরজায় ঘা পড়তে লাগলো। যেন মস্ত-এক পাগল সমুদ্র বিপুল গর্জন ক'রে দরজায় মাথা কুটছে।

'ওগো, তোমার পায় পড়ি! আর ভেবো না। আমার সমস্ত গয়নাগুলো ওপর থেকে ছুঁড়ে দাও। আর বলো, আমার ছেলেমেয়েদের যেন না-মারে, তোমাকে যেন না-মারে—বলতে-বলতে বুলবুলির মা তাঁর সুন্দর ফরশা হাত থেকে চুড়ি, গলা থেকে হার, কান থেকে দুল খুলে দিলেন বুলবুলির বাবার হাতে। মার হাত দুটো কী-রকম থরথর ক'রে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো কী-রকম কাঁপছে!—বুলবুলি আশ্চর্য হ'য়ে ভাবলো মার এ-রকম চেহারা তো কোনোদিন সে দ্যাখেনি।

তার বাবা গয়নাগুলো নিয়ে কী-রকম যেন ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় বুলবুলির দাদা বন্দুক নিয়ে ফিরলো। বললো, 'আর-তো চুপ ক'রে থাকা যায় না। আমি দোতলা থেকে ফায়ার করি। যা থাকে বরাতে। নইলে এক্ষুনি তো দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

শুনে বুলবুলির বাবার যেন চমক ভাঙলো। তাকে থামিয়ে তিনি বললেন, 'এখন না—খোকা, এখন না—মাত্র তিনটে টোটা আছে—' বলতে-বলতে আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তারপর জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বুলবুলির মার গয়নাগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে দিলেন। হাতজোড় ক'রে কী-যে তড়বড় ক'রে বললেন, বুলবুলি ভালো বুঝলো না। শুধু শুনলো বাইরের লোকগুলোর আকাশ-ফাটা জয়োল্লাস। দরজার ধাক্কা থেমে গেলো। গয়নাগুলো কুড়িয়ে নিতে লোকগুলো যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দরজা ছেড়ে তারা গয়নার উপর ঝাঁপিয়েছে।

হাতজোড় ক'রে বুলবুলির বাবা তখন জানলায় দাঁড়িয়ে, অকস্মাৎ একটা ইটের টুকরো তীরবেগে এসে তাঁর কপালে লাগলো আর চক্ষের নিমেষে ঝরঝর ক'রে রক্ত ছুটলো। বুলবুলির মা ছুটে গিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে সেই ক্ষতস্থান চেপে ধরলেন। তারপর একরকম টেনেই নিয়ে এলেন ভিতরে।

কিছুক্ষণের জন্যে বুলবুলিদের বাড়িটা বাঁচলো বটে কিন্তু বাইরের গোলমাল কমলো না। মাঝে-মাঝে এক-এক ঝলক গরম বাতাস আসে, ভেসে আসে পোড়া গন্ধ, উড়ে

আসে নরম ছাইয়ের টুকরো। কাছাকাছি যে অগ্নিকাণ্ড চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

'—ওরা আবার আসবে—' বুলবুলির বাবার গলাটা যেন বুজে গেলো।

'সিন্দুক থেকে সব টাকা বার ক'রে ছড়িয়ে দাও—' তার মা বললেন।

'কিন্তু তারপর? টাকা যখন ফুরিয়ে যাবে?' বুলবুলির ছোটদা প্রশ্ন করলো।

'—ওরা আবার আসবে—' তার বাবা আবার বললেন।

'আমি গুলি চালাবো।' বুলবুলির দাদা বললো।

'কিন্তু টোটা-তিনটে যখন ছোঁড়া হ'য়ে যাবে?' বুলবুলিব ছোটদা আবার প্রশ্ন করলো।

'—ওরা আবার আসবে—' দম-দেওয়া কলের মতো বুলবুলিব বাবা আবাব বললেন।

'তারপর কী হবে, বাবা!' বুলবুলি এতক্ষণে প্রথম কথা বললো।

তার কোঁকড়াচুলে ভর্তি মাথা আর টুকটুকে মুখের দিকে চেয়ে তিনি যেন কেমন হ'য়ে গেলেন।

'তারা এসে কী করবে, বাবা—আমাদের মেরে ফেলবে? কেটে ফেলবে? তোমাকে, মাকে, দাদাদের, আমাকে, আমাকে টিয়াপাখিটাকে—সবাইকে মেরে ফেলবে? কেন মারবে বাবা?'

সবাই বুলবুলির মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে যেন সব কথা ভুলে গেলো। '—পাখিটাকে শুদ্ধ মেরে ফেলবে, বাবা?

কিন্তু সবাইকার মুখ-চোখের চেহারা দেখে সে থেমে গেলো। তার ছোট্ট বুকের মধ্যে টিপটিপ ক'রে শব্দ হচ্ছে—এ রকম ফ্যাকাশে মুখ আগে সে কখনও দ্যাখেনি। দেওয়ালেব মতো শাদা-সব মুখ, কোথাও এতটুকু রক্ত যেন নেই।

রাস্তার হল্লা আবার বেড়ে উঠলো। সেই শব্দটা ফুলতে-ফুলতে আবার এসে যেন ধাক্কা দিতে লাগলো বুলবুলিদের বাড়ির সদর দরজায়। তার বড়দাকে থামিয়ে এবারে ছুটলেন বুলবুলির মা। ঘড়াং ক'রে সিন্দুকের ভারি দরজাটা খোলার শব্দ শোনা গেলো। তাবপর নিজেই তিনি দু-হাতের মুঠোয় টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি যা ছিলো তা-ই নিয়ে জানলার কাছে ছুটলেন আর পাগলের মতো সেগুলো ছড়িযে দিতে লাগলেন রাস্তায়, আর চীৎকার করতে লাগলেন, '—আমার ছেলেমেয়েদের মেরো না, বাবা, মেরো না!'

কয়েক মিনিটের জন্যে দবজার ধাক্কা থামলো। তারপর আবার দুমদাম ক'রে হ'তে লাগলো শব্দ।

বুলবুলির দাদা বললো, 'এবার?'

মা বলছেন, 'যা ছিলো সব-তো দিয়ে দিয়েছি, এবার কী হবে?'

বাবা বললেন, 'ওরা আবার আসবে, বলেছিলুম ওরা আবার আসবে!'

ছোটদা আর বড়দা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে দরজার কাছে। মড়মড় করছে দরজার কপাট। তাদের দেখে কোণ থেকে একটা বড়ো লাঠি তুলে নিয়ে বুলবুলির বাবাও ছুটে গেলেন নিচে, চাকরটাও চললো পিছন-পিছন। যাবার সময় বললেন, 'আমাদের-

গলার স্বর যখন আর পাবে না, যখন শুনবে তিনবার আওয়াজ ক'রে বন্দুকটা থেমে গেছে, তখন আর অপেক্ষা কোরো না। ছাতে উঠে ঝাঁপ দিয়ো। চারতলা থেকে রাস্তায় পড়লে কেউ বাঁচে না।'

তার মার এ-রকম পাথরের মতো মূর্তি বুলবুলি আগে-কখনও দ্যাখেনি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে মা-কে। সেই ভীরু চোখ, সেই দুর্বল ভঙ্গি কোথায় গেছে? মনে হচ্ছে তাঁর সামনে দাঁড়ালে যে-কোনো মানুষ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। একবার তিনি সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে নিচে কী যেন দেখলেন, তারপর তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন চারতলার ছাতে।

বুলবুলির দিকে একবার ফিরেও দেখলেন না। বুলবুলিকে সবাই ভুলে গেছে যেন! কিন্তু তারও অনেক কাজ বাকি। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তারও আজ চলবে না।

একছুটে সে তার শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিলো, এখনও খিল লাগাতে সে শেখেনি। তারপর হুড়মুড় ক'রে তার চেয়ারটা টেনে আনলো পাখিটার খাঁচার দিকে। সেই চেয়ারের উপর উঠে খাঁচার দরজায় সে হাত দিলো।

বাইরের গোলমাল যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে।—ওই বোধহয় দরজাটা ভেঙে পড়ার শব্দ হ'লো। ওই-তো গ'র্জে উঠেছে তার দাদার বন্দুক—একবার, দু-বার, তিনবার!—কী বিশ্রী শব্দ! মস্ত জনতার চীৎকার শোনা যাচ্ছে। কোনটা যে কীসের শব্দ, কে বলবে! সিঁড়িতে অনেক লোকের হুড়োহুড়ি। অনেক মানুষের পায়ের শব্দ।

বুলবুলির হাতটা কাঁপছে। তবু সে নিঃশব্দে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো। তারপর খুব-ফিশফিশ ক'রে বলতে লাগলো 'আমার ছোট্ট টিয়া, সোনার টিয়া, লক্ষ্মী টিয়া—তুই উড়ে যা, পালিয়ে যা—এই শহর ছেড়ে অনেক দূরের বনে চ'লে যা, যেখানে এই খুনে-ডাকাতরা তোর নাগাল পাবে না।' পাখিটা যেন প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলো না। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উড়ে বসলো জানলার উপর, তারপর তার সবুজ ডানা কাঁপিয়ে নীল আকাশের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেলো।

দরজা খোলার শব্দে চেয়ারের উপর ফিরে দাঁড়ালো বুলবুলি। তার চোখে জল, কিন্তু মুখে ফিকে একটু হাসি। ডাকাতদের ফাঁকি দিতে সে পেরেছে। তার টিয়াকে এরা কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

# জো

## কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মুখময় ছেলেটার বসন্তের দাগ। গায়ে ছেঁড়া খাকি শার্ট, পরনে ময়লা খাকি হাফ-প্যান্ট, দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাথার চুলগুলো তেল আর জলের অভাবে বেশ কটা। মুখে ধূর্ত হাসি, চোখগুলো বুদ্ধিতে জ্বলজ্বল করছে—অবশ্যই সুবুদ্ধির চেয়ে দুর্বুদ্ধিই তাতে বেশি।

ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে যদি প্রশ্ন করো, 'তোব নাম কী-রে?'

একমুখ হেসে সে বলবে, 'মাই নেম জো, স্যার!' তারপর তোমার পরনের ধুতি আর পাঞ্জাবি আর মুখের বিস্মিত ভাব দেখে সে উত্তর দেবে, 'সাযেব নই গো—*বাঙালি, ইণ্ডিয়ান*। সায়েবরা আমার নাম দিয়েছে জো।—তাই ব'লেই কি জো হ'য়ে গেলুম? ইস!'

জো-র মতো বহু ছেলে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় আজ দেখতে পাবে। প্রায় একইরকম চেহারা, একইরকম চতুর আর চটপটে। তাদের বাড়ি নেই, আত্মীয় নেই, বাঁধাধরা জীবন নেই। বয়স সাত আট নয়—বড়জোর দশ। কিন্তু এই বয়েসেই তারা তুখোড় হ'য়ে গেছে। এককালে কোনো গ্রামে তারা থাকতো—তাদের মা ছিলো, বাবা ছিলো, ভাই ছিলো, বোন ছিলো। কিন্তু তারপর তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে কোথায় সব ভেসে গেছে। তারা গ্রাম ছেড়ে এসেছে শহরে, তারপর এক সকালে উঠে দেখেছে মা তাকে ফেলে পালিয়েছে। সন্ধেয় কোনো বড়োলোকের বাড়ির বারান্দার তলায় বাপের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে মাঝরাত পেরিয়ে ভোর হ'য়ে গেছে—কিন্তু বাবা আর ফেরেনি। তারা দেখেছে ছোটোবোনকে ক্রমশ কঙ্কালের মতো শুকিয়ে যেতে, দেখেছে মৃতদেহকে শকুনে ঠোকরাতে। দেখেছে এই মৃতদেহ ও কঙ্কালসার মানুষের মাঝখান দিয়ে বড়ো-বড়ো গাড়ি ক'রে দামি দামি জামাকাপড় প'রে বড়োলোকদের হুস-হুস ক'রে চ'লে যেতে। সাতদিনের অভুক্ত পেট নিয়ে তারা জলকাদায় ঘসটে-ঘসটে কোনোরকমে মোড়ের বিয়েবাড়ির সামনেকার ডাস্টবিনের এঁটোপাতা চেটেছে, পাড়ায় লেড়িকুত্তার সঙ্গে করতে হয়েছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাছের কাঁটার উপর থেকে নর্দমার জল না-মুছেই পেটের জ্বালায় তারা চিবিয়েছে আর মাঝে-মাঝেই সানাই-এর সুর আর দারোয়ানের ধমকানি শুনেছে। ভারত সরকারের পক্ষছায়ায় এবং বড়োলোকদের দয়ার ঘ্যাঁট গিলে-গিলে তাদের অধিকাংশই আজ আর নেই। তবু কিছু যেন কোনোরকমে ছিটকে কলকাতা ও শহরতলির নানা অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। রুদ্র মন্বন্তরের পর তাদের নিজেদের জীবন সম্বন্ধেই আজ আর কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। ভালো ক'রে তারা স্মরণেই আনতে পারে না একদিন তাদের বাড়ি ছিলো, মাঠ ছিলো, সবুজ ধানের চারা যেখানে জলে গলা ডুবিয়ে বাতাসে শিরশির ক'রে কাঁপতো। অনেকেই মনে করতে পারে না তাদের

গ্রামের নাম, বাবা-মা, ভাই-বোনের নাম—এমনকী নিজেদের আসল নাম! মনে করতে পারে না তাদের জাত! ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু নাম মুসলমান।

অনেকেই আজ মনে করতে পারে না ঐ করাল মন্বন্তরের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে কোন-আশ্চর্য উপায়ে তারা বেঁচে উঠলো।

জো এই দলের মধ্যে পড়ে। ন-দশ বছরের বেশি বয়স তার নয়। কিন্তু তার জীবনের আগেকার বছরগুলো বেমালুম মন থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

নানা ফুটপাথে, গাড়িবারান্দার তলায়, বাড়ির রোয়াকে সিঁড়িতে ঘুরে অবশেষে একদিন নিজেকে সে আবিষ্কার করলো কলকাতার এসপ্ল্যানেড আর ধর্মতলার মোড়ে। দেখলো, তার মতো আরো-গুটিকয়েক ছেলে ইতিপূর্বেই সেখানে রয়েছে। তাকে পেয়ে খুশিও হ'লো না, বিরক্তও হ'লো না।—বেশ সহজভাবেই দলে টেনে নিলো।

তাদের দলের একজন সর্দারও আছে। সে যেমন চতুর, তেমনি চটপটে। মুখে যেন খৈ ফুটছে। ইতিমধ্যেই বেশ-কয়েকটা ইংরিজি বুলি শিখে নিয়েছে। পয়সা জমিয়ে নিজের ছোটো ব্যবসাও ফেঁদে বসেছে সে: জুতো পালিশ করার ব্যবসা। ছোটো-একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কালো আর তামাটে—এই দুই রঙের কালি আব দুটো বুরুশ —এই হ'লো তার ব্যবসার সরঞ্জাম। সকাল থেকেই গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় মাথা-ঢাকা ফুটপাথে সে বসে। খাকি কোর্তা-পরা মিলিটারি দেখলেই বলে, 'হ্যালো, জো! শু-শাইন? ভেরি-গুড পালিশ!' কেউ দাঁড়ায়, কেউ-কেউ দাঁড়ায় না। তবু দিন গেলে টাকা তিন-চার তার বেশ সহজেই হয়।

তাকে দেখে সর্দার বললো, 'হ্যালো, জো। তুই আবার ডিগ-ডিগ করতে-করতে কোথা থেকে এলি?'

সে বললো, 'জো কী?'

সর্দার উত্তর দিলো, 'কী আবার! সবাই জো! তুই জো, আমি জো, লালমুখো মর্কটগুলো জো, সরকারটাও জো।'

'সরকার? সে আবার কে?'

'তুই একটা গবেট। সরকারকে দেখিসনি? সেলাম করতে হয়। এই হোটেলেই তারা খানা খায়, মদ খায়, মেমদের নিয়ে নাচে। তারাই তো হ'লো গিয়ে সবচেয়ে বড়ো-জো। তারা কিন্তু লড়াই করে না। যেগুলো বোকা সেগুলোকে ঠেটি পেণ্টুলুন আর দু-পয়সার খাকি কোর্তা পরিয়ে ছেড়ে দেয়। তারাও মদ খায় আর গেলাস ভাঙে আর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে— তবে আমেরিকান জোগুলোই আসল জো, বুঝলি! তাদের জুতোয় পালিশ থাকলেও তারা আবার পালিশ করায়, উবু হ'য়ে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প করে, ছবি তোলে, সিগারেট খাওয়ায়, চার-আনা চাইলে চার-টাকা দিতে আসে। আর ব্রিটিশগুলো তাদের চেয়ে গরিব। আমেরিকানদের দেখলে তারা মনে-মনে হিংসেয় জ্ব'লে যায়।'

সর্দারের কথা শুনে আর তার ব্যাবসা দেখে তার বেড়ে লাগলো। দু-চারদিন তার

কাছেই ঘোরাঘুরি করলো। কিন্তু তখনও লালমুখ দেখলেই *'হ্যালো জো'* বলতে তার কী-রকম যেন ভয়-ভয় করতো। ধীরে-ধীরে সেটা কেটে গেলো। তখন থেকেই সে ঠিক ক'রে বসলো সর্দারের মতো ব্যাবসা ফাঁদতে হবে।

কিন্তু মূলধন জোগাড় হবে কী ক'রে? তার বুদ্ধি খেলে গেলো। দেখলো, তারই মতো একপাল ছেলে সব ছবিঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আর ছবি শেষ হবার পর লোকজন বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলে তাদের জন্যে ট্যাক্সি এনে দেয়।—এখানেও সেই খাকি কোর্তা-পরা লোকদের খুঁজে বার করতে হয়, তারপর চটপট সেলাম ক'রে বলতে হয়, 'হ্যালো, জো, ট্যাক্সি?' তারপর একদৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে বড়োরাস্তার কোনো খালি চলন্ত ট্যাক্সিকে মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে জোরে শিশ দিয়ে ডাকতে হয়, তারপর সেই ট্যাক্সিতে চ'ড়েই চ'লে আসতে হয় ছবিঘরের সামনে আর তড়াক ক'রে নেমে ট্যাক্সির দরজা খুলে সেলাম ক'রে দাঁড়াতে হয়। এই পরিশ্রমের জন্যে চার থেকে আট-আনা, কপাল ভালো থাকলে এমনকী গোটা-একটা টাকাও, বখশিশ মেলে।

জো এই ব্যবস্থা চালিয়ে মূলধন জোগাড় ক'রে কিছুদিনের মধ্যেই সর্দারের পাশে জুতো-পালিশের কারবার ফেঁদে বসলো।

ক্রমাগত লোকজন চলেছে, ভালো-ভালো জামাকাপড়, পাউডার আর সেন্টের গন্ধ, সুন্দর ফিরিঙ্গি মেয়েদের হাসি, গোরাদের মারামারি— ভারি ভালো লাগলো জো-র। গোরা দেখলেই সে চমৎকার চটপট বলতে শিখেছে, *'হ্যালো জো! শু-শাইন, শু-পালিশ?'* আজকাল সে আর একটুও ভয় পায় না। গোরাদের কয়েকটা কথা বেশ বুঝতেও পারে। ঘসঘস ক'রে সে জুতো পালিশ করে— আর কাজ না-থাকলে ব্যস্ত মানুষের চলন্ত স্রোত দ্যাখে, হাসে, ঠাট্টা-ইয়ারকি করে। বেশ দু-পয়সা তার জমতে শুরু করেছে। পরনের ছেঁড়া জামাকাপড় ফেলে চাঁদনি থেকে হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট কিনেছে সে। একজোড়া নতুন ভালো জুতার শখ তার অনেককালের। কিন্তু বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ভালো কিডের চামড়ার জুতো কেনবার মতো টাকা জমাতে এখনও পারেনি।

ব্রিটিশ সৈন্যদের চেয়ে মার্কিন সৈন্যদের জুতোগুলোও অনেক-ভালো চামড়ার, অনেক-বেশি শৌখিন— দিনের পর দিন জুতো পালিশ করতে-করতে এই সত্যটুকু সে আবিষ্কার করেছে। মোড়ের দোকানে ঠিক ঐ-জাতের ঠিক ঐ-রকম একটা জুতো শো-কেসে ঝকঝক করতে সে দেখেছে। ভারি শখ তার ঐ-জুতোটা কেনার। কিন্তু টাকা কোথায়?—অল্পস্বল্প নয় তো, করকরে আঠাশটি টাকা তার দাম।

বছর-কয়েক এই ব্যবসা চালাবার পর ক্রমশ সে আবিষ্কার করলো ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। লড়াই নাকি থেমে গেছে। গোরা আর মার্কিনরা ফিরে চলেছে যে-যার দেশে। আগে যেন খাকি-কোর্তার হাট বসতো গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায়। এখন তাদের সংখ্যা কত কম। অথচ তার মতো আরো-কত ছেলে জুতোপালিশ করার ব্যাবসায় ইতিমধ্যে নেমে গেছে। সারি-সারি তারাই এখন চৌরঙ্গির ফুটপাতের উপর হাট বসিয়েছে।—এ-ব্যাপারটাও আর ভালো লাগছে না। রোজগার বেশ প'ড়ে গেছে। মজাটাও নেই। তাছাড়া

ক্রমাগত লোকের জুতোর ময়লা পরিষ্কার করতে-করতে তার মনের কোনখানটায় যেন একটা চাপা অস্বস্তি জ'মে উঠছিলো।

সেদিন সকালে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেলো। মাঝ-বয়েসি একটা ইংরেজ তার সামনে জুতোসমেত একটা পা তুলে বললো, 'হারি আপ্।'

জো-র মনমেজাজ ক-দিন থেকেই ভালো নেই। তাছাড়া এ-লোকটাকে বহুদিন সে দেখেছে। সামনের কয়েকটা দাঁত ভাঙা, চিমড়ে শরীর, সর্বদা হুস-হুস ক'রে সিগারেট টানে। মাঝে-মাঝে মাৎলামো করে। তার বন্ধুরা লোকটাকে বলে *দালাল*। লোকটার বিশ্রী চেহারা, কুৎসিত হাবভাব আর তার জুতোশুদ্ধ পা-টা নিজের মুখের কাছে দেখে সেদিন সকালে একটা বোবা রাগে সর্বাঙ্গ তার জ্ব'লে উঠলো। তাকে বিদায় করার জন্যে সে বললো, 'ওয়ান রুপি, শু-পালিশ।' অর্থাৎ একটাকা লাগবে।

ইংরেজ রেগে বলল, *'ডার্টি নিগার,'* ব'লে জুতোসমেত পা তুললো জো-কে লাথি মারার জন্যে আর সে-ও চক্ষের নিমেষে সেই পা ধ'রে এইসা টান দিলো যে লোকটা শানের উপর পড়লো চিৎপাত হ'য়ে। তার মাথার কাছটা সামান্য কেটে রক্তও বেরুলো আর অন্যান্য জুতো-পালিশ-করা ছেলের দল উঠলো হেসে।

প'ড়ে গিয়ে লোকটা চ্যাঁচাতে লাগলো, '*পুলিশ—পুলিশ—সার্জেন্ট*—'

আর সার্জেন্ট! জো ততক্ষণে তার জিনিশপত্র ফেলে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটে নানা অলিগলির ভিতরে একেবারে হাওয়া হ'য়ে গেছে। কে ধরবে তাকে?

সেই থেকে জো এ-ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দিয়ে ছবিঘরে ট্যাক্সি ডাকার ব্যাবসাতেই আবার মন দিয়েছে।

কিন্তু *নিগার* কথাটা শোনা পর্যন্ত জো-র মনে আর সুখ নেই। কথাটার মানে এতদিনে সে জেনেছে আর যতই ভেবেছে ততই গরম হ'য়ে উঠেছে তার রক্ত। এক-একদিন শাদা চামড়ার মানুষ আর খাকি কোর্তার উপর এমনই মেজাজ বিগড়ে যায় যে ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েও সে ডাকে না। তাদের অস্বস্তি দেখে মনে-মনে একটা মজার আত্মপ্রসাদ পায়।

কিছুদিন এইভাবে কাটাবার পর জো-র মন যখন ঝিমিয়ে এসেছে তখনই একদিন বেশ মনের মতো কাজ সে পেলো। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবি নিয়ে সমস্ত কলকাতা চক্ষের নিমেষে গরম হ'য়ে উঠলো একদিন। এত উত্তেজিত মানুষের ভিড় আগে কখনও সে দ্যাখেনি। বাস-ট্রাম বন্ধ। মিলিটারি গাড়ি দেখলেই লোকে ইট-পাথর ছোঁড়ে। দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে লরি আর ট্রাম। সমস্ত ধর্মতলার রাস্তা ছাত্রদের মিছিলে বোঝাই। পুলিশ গুলি ছুঁড়লেও কেউ পেছোয় না। মিলিটারির তোয়াক্কা মানুষ করে না। *'জয় হিন্দ'* ধ্বনি লক্ষ কণ্ঠে বার-বার ধ্বনিত হ'তে-হ'তে আকাশের বুকেও যেন কম্পন জাগায়। গুলি খেয়ে একজন লুটিয়ে পড়লে দশজন ছুটে আসে তার জায়গায়।

ভারি ভালো লেগেছিলো জো-র। ধর্মতলা থেকে কালিঘাট পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই সে

ঘুরে দেখে এসেছে। সমস্ত পথ ভাঙা ইট আর পোড়া গাড়ির কঙ্কালে ছেয়ে গেছে। সুবিধে পেলে ইট ছুঁড়তেও সে-ও কসুর করেনি। তার মনের মধ্যেই সর্বদাই অন্ধ-একটি রাগ জেগে, কিন্তু কার বিরুদ্ধে তার রাগ, সে-কথা সে স্পষ্ট বুঝতো না। আজ যেন খানিকটা সে বুঝেছে। এক-একটি ইটের টুকরো ছুঁড়ে সে যেন তার বাব-মা-ভাই-বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়'—কোন অন্ধকার কুয়াশার ওপাশে স্বপ্নের মতো তারা মিলিয়ে গেছে। ভালো ক'রে তাদের মুখগুলো আজ আর তার মনেও পড়ে না। নিজের গ্রামের কথা আজকাল এক-একবার মনে করতে সে চেষ্টা করে। কিন্তু বিশেষ-কিছুই মনে পড়ে না ভালো ক'রে। শুধু মনে হয় যেন জল আর জল। অনেক-অনেক জল পেরিয়ে এখানে একদিন তারা এসে পৌঁছেছিলো। তারপর চোখের জলে সব যেন একাকার হ'য়ে যায়।

ভারি ভালো লেগেছে তাব এ-কদিনের হল্লা। পথে একটিও শাদা চামড়ার মানুষকে দেখা যায়নি। যে-ইংবেজটা তাকে একদিন *নিগার* বলেছিলো সন্ধের দিকে একবার তাকে সে দ্যাখে হগ মার্কেটের ধারে। কী-যেন কিনতে সে বেরিয়েছিলো। কিন্তু অমন ভয়-পাওয়া মুখ সে এর আগে কোনোদিন দ্যাখেনি।

শেষ পর্যন্ত জো-রাই জিতলো। লক্ষ-লক্ষ মানুষ শহর কাঁপিয়ে ঘুরে এলো ডালহৌসি স্কোয়ার! জো-ব ফূর্তি দ্যাখে কে! একাই সে একশোটা মানুষের মতো চেঁচিয়েছে।

এ-ঘটনার কিছুদিন পরেই আবার এ-ধরনের আর-একটি ঘটনা ঘটলো। সেদিন ছিলো আজাদ হিন্দ ফৌজের রসিদ আলির মুক্তির দাবি জানানো। আগেব বারের মতোই প্রায়-সমান গোলমাল এবারে হ'লো। রাস্তাঘাটে গাড়ি-ঘোড়া একটিও নেই। চলেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ চীৎকার ক'রে। কারুর পরনে লুঙ্গি, কারুর পরনে ধুতি। সবরকম পতাকা আকাশে উড়ছে। উন্মত্ত জনতা বিলিতি দোকানগুলোর বড়ো-বড়ো কাচ ঝনঝন ক'রে ফাটাচ্ছে। পথে শুধু মানুষের ভিড়—নিজের মনেই হেসে বলেছিলো জো: *শুধু ডার্টি নিগারেরই ভিড়*—শাদা চামড়ার কাপুরুষের দল এই মিলিত শক্তির সামনে আজ কোথায়। তাদের তো কামান আর বন্দুকের অভাব নেই। তবু ভয় তারা কেন পায়?

১৬ই আগস্টের সকালবেলা। ধর্মতলার চাঁদনির অলিগলিতে জো তার আগে থেকেই অনেক উত্তেজিত আলোচনা শুনেছে আর গভীর প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে।

সে ভেবেছিলো আজকের দিনেও লরি পুড়বে, ট্র্যাম পুড়বে, সবাই আসবে একসঙ্গে বেরিয়ে আর তাদের মিলিত চীৎকারে আবার বুঝি কেঁপে উঠবে কলকাতা শহর। সকাল হ'তেই একটা দলের সঙ্গে মিশে চীৎকার করতে-করতে সে-ও চললো মহাফূর্তিতে এগিয়ে।

হঠাৎ তার পাশের একটা লোক প্রশ্ন করলো, 'তুই কে-রে? হিন্দু, না মুসলমান? হিন্দুস্থান, না পাকিস্তান?

বিরক্ত হ'য়ে জো বললো, 'বাজে বকিসনে। *আমি জো, আমি ইণ্ডিয়ান।*'

শুনে কয়েকটা লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। একজন তার মাথায় চাঁটি মেরে

হল্লা করতে-করতে এগিয়ে চললো।

কিন্তু সকাল থেকেই কেমন-যেন জমছে না। কতক দোকান বন্ধ, কতক খোলা। সব মানুষরা চ্যাচাচ্ছে কই? বহু লোক তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। তারা তো সঙ্গে আসছে না। ভালো লাগছে না জো-র। দলছাড়া হ'য়ে একটু তফাতে থেকে পিছু-পিছু সে চললো।

লম্বা মিছিল। তাই সামনের দিকে কী হয়েছে জো ঠিক দেখতে পায়নি। হঠাৎ সে দেখলো মিছিলের সবাই যেন খেপে গিয়ে মার-মার ক'রে এগুচ্ছে।—মারবে? কাকে মারবে? দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলো দূরে আর-একদল লোকও রুখে দাঁড়িয়েছে। চক্ষের নিমেষে যেন প্রলয়কাণ্ড শুরু হ'লো। ছোরা ঝলসে উঠলো, লাঠি পড়তে লাগলো দমাদ্দম ক'রে, ইট আর সোডার বোতলের যেন বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো। বহু লোক আহত হ'য়ে গোঁ-গোঁ ক'রে মাটিতে পড়লো চিৎপাৎ হ'য়ে। রক্ত বইতে লাগলো—মানুষের তাজা রক্ত, কলকাতার পিচের গরম রাস্তার উপর। আরো-কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর হঠাৎ মিছিলের সব লোক ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। জো-ও ছুটলো।

ছুটতে-ছুটতে গড়ের মাঠে জো একজায়গায় বেজায় হাঁপিয়ে শুয়ে পড়লো। কারুর সঙ্গেই যেতে আর তার ভালো লাগলো না। দূরের পথে সে দেখতে লাগলো মানুষের দৌড়োদৌড়ি, চীৎকার, হল্লা। একটা ইট লেগে তার পায়ের খানিকটা থেঁৎলে গেছে। পুকুরের জল দিয়ে পা-টা সে ভালো ক'রে ধুলো, একপেট জলও খেলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

সন্ধেয় ধর্মতলায় যখন পৌঁছেছে তখন লুঠপাট বেশ জোর চলছে। যে-দোকানটায় সেই ভালো জুতো-জোড়া সে দেখেছিলো, জো দেখলো সেই দোকানটারই দরজা ভেঙে ফেলেছে গুণ্ডার দল। মালিক নেই। দোকানের ভিতর থেকে বাইরে যেন জুতো বৃষ্টি হচ্ছে। বহু লোক মহা-উল্লাসে কুড়িয়ে নিচ্ছে সেই জুতো। জো-ও দু-পাটি জুতো সংগ্রহ ক'রে ফুটপাতের একপাশে ব'সে পরতে লাগলো। জুতো সে বেশ ভালো ক'রেই চেনে। এগুলোর দাম যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কম হবে না, সে-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই নেই।

জুতো-জোড়া তার পায়ে একটু বড়োই হয়েছে। কিন্তু ওই ক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ঢোকবার তার আর প্রবৃত্তি নেই। সেইখানে ব'সে-ব'সেই সে দেখতে লাগলো।

দেখলো, কোথাও একটিও পুলিশ নেই। একটা সার্জেণ্ট চকচকে জুতো আর পরিষ্কার কোট-পেনটালুন প'রে নির্ভাবনায় সেখানে এসে দাঁড়ালো। গলি থেকে একটা লোক ছুটে এসে তার হাতে দিলো একটিন সিগারেট। দিয়েই সেলাম করলো। খুশি হ'য়ে সার্জেণ্ট হাসতে-হাসতে চ'লে গেলো। লুঠে কোনো বাধা দিলো না।

আবার সেই বোবা রাগে জো-র সমস্ত বুকটা যেন জ্বালা ক'রে উঠলো। দাঁতে দাঁত ঘ'সে সে বিড়বিড় ক'রে বললো, *'ডার্টি নিগার।'* তার পরেই তার চোখ পড়লো মোড়ের উপর। দেখলো সেই দাঁত-ভাঙা ইংরেজটা একপাশে দাঁড়িয়ে ফ্যাক-ফ্যাক ক'রে হাসছে আর আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে ভাঙা দোকানটার দিকে। তার পাশে একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে।

*আজ আর তাদের কোনো ভয় নেই।*

জো-র মাথায় রক্ত উঠে এলো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পা থেকে নতুন জুতো-জোড়া খুলে চীৎকার ক'রে সে ছুঁড়লো সেই লোকটার দিকে। জুতোটা লোকটার মাথায় না-লেগে গায়ে লাগলো। দারুণ ভয় পেয়ে পড়ি-মরি ক'রে সে আর মেম ছুটতে শুরু করলো।

আবার দাঁতে-দাঁত-ঘ'সে বিড়বিড় ক'রে জো বললো, *'ডার্টি নিগার।'*

কিন্তু উন্মত্ত গুণ্ডার দল কেউ তার দিকে চেয়েও দেখলো না।

# আদাব

## সমরেশ বসু

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তাছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরারা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যুবিভীষিকায় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে-স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

...

দু-দিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ-জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লাহো আকবর' কি 'বন্দেমাতরম!'

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ-কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।...নিশ্চল নিস্তব্ধ।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে-আস্তে মাথা তুলল লোকটা...ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা। মানুষ। ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা-ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু, না মুসলমান? এ-প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও

পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফ্যালে—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও।—অপব লোকটি জবাব দেয়।

পবিচয়কে স্বীকাব কবতে উভযেই নাবাজ। সন্দেহের দোলায় তাদেব মন দুলছে...প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবাব অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি কোনখানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইড়ায়।—তোমার?

—চাষড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে...কী কাম কব?

—নাও আছে আমাব, নাযের মাঝি।—তুমি?

—নারাইনগঞ্জের সুতাকলে কাম কবি।

আবাব চুপচাপ। অলক্ষে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবাব চেষ্টা কবে। চেষ্টা করে উভয়েব পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।......হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু-পক্ষেবই উন্মত্ত ধ্বনি। সুতাকলেব মজুর আব নাও-য়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

ধারেকাছেই য্যান লাগছে। —সুতা-মজুবের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

হ, চলো এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। —মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল: আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝিব মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিযেছিল। চোখে চোখ পড়তেই বলল, বইযো। যেমুন বইয়া বইছ—সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছাৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথা। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান।

ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল, ক্যান কী, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে-মনে দৃঢ় হয়ে উঠল!—যামু না, কি এই আন্দাইরা গলির ভিতর পইড়া থাকুম নাকি।

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মৎলবটা তো ভালো মনে হইত্যাছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমার মারনের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো। মানুষের মন বোঝো না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোবগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবাব মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলে মেয়েদের কথা...তাদের কাছে কি আর তাবা প্রাণ নিয়ে ফিবে যেতে পারবে, না তাবাই থাকবে বেঁচে...কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়া-ক ওযি—আবার মুহূর্তপবেই কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী কবে? কী অভিশপ্ত জাত!...সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা?—সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খশ-খশ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠি ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতি গেছে সেঁতাইয়া।—আর-একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

আরে জ্বলব, জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খশ-খশ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

সোহান্ আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়তাডি। ......ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

তুমি?...

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু-জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো-বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল,—হ, আমি মোছলমান। —কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে-ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাদের ঈদের পরব, জানো?

আর কিছু নাই তো—সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দ্যাখো।—পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে

সুতা-মজুরের দিকে।

আরে না-না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো?

ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি, একটা সুইও নাই। পরানটা লইয়া আপন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুরকে তার জামা কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজন বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ-সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পাবোনি—এই মাইর-দইর কাটাকুটি কীসের লইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো লিগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কীয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই, মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব।

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর পোলা-মাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কী আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেমবায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু-হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাঁধল—অখন জুটাইব কোন সুমুদ্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কী? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েব মশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান হুজরতের হাত, বখশিস্, দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দু বাবু আইব আমার নায়ে।

...

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড়ো রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে, সে-

বিষয়ে সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কী করব? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটাকে বগলদাবা করে।

—চলো পালাই। কিন্তুক যামু কোনদিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি মাইর খামু না;—ওই ড্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ ঠিক কথাই কইছ। কোনদিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে।

গলিটার যে-মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়তের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকিঝুঁকি মারতে আবার তারা বেরুল।

—কিনারে-কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও।—মাঝি চাপ-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কী হইল?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পান-বিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখো।

মাঝির সংকেতমতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর-একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর-একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে-গলি গেছে, হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাটে।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

—তাই কইতেছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এই হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িৎ যাইব গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না-পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আবে না-না মিয়া, কর কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে। —কেমনে যাইবা তুমি, অ্যাঁ? আবেগে-উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝো না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা আইজ চান্দ দেখছে। কত আশা কইবা বইছে তারা নতুন জামা পিনব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতাছে। পারুম না ভাই—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরেব বুকেব মধ্যে টনটন করে ওঠে। কামিজ-ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফালায়?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখানে থাইকো, য্যান উইঠো না। যা...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।—আদাব।

আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে-টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকেব ধুকধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবান—মাঝি য্যান বিপদে না-পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধনিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলা-মাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আব কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হল্ট...

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুটপায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর

লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম গুড়ুম। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ-আর্তনাদ সে শুনতে পায়।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা, শাড়ি, রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালবা আব বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনবা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

# রাম রহিমের কথা

## মহাশ্বেতা দেবী

আজন্ম ঈশ্বরের বিশ্বাস এই ভরা ভাদরে বড়ো দ্রুত বেগে চলে যায় সাজুমণি বেওরার মন থেকে। অবশ্য ঈশ্বর ব্যাপারটি কোনও দিন বোঝেনি সাজুমণিরা। মুখের লবজ, "ভগবান তুমি কুথা!" কিন্তু অবাঙ্মনসগোচর অদেহী পরমাশক্তি সাজুরা বোঝে না। ওদের ঈশ্বর শীতলা, পাঁচুঠাকুর। বড়োজোর বহরমপুর যেযে বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি! "কালী" নামেও অবশ্য ওর বর্তমানে বড়োই ভয়। হেতেমপুর ও কাজোখালির মধ্যবর্তী সিদ্ধকালীর মন্দিরেই তো ওরা ছুটেছিল প্রাণের ভয়ে, শোনা কথা সবই! সিদ্ধকালীর মন্দির যদিও বছর বিশেকের। তবু সিদ্ধকালীর সেবায়ত বলে থাকেন, একদা নিশীথকালে বটগাছের নিচে জল ফিরতে বসে তিনি অদৃশ্য হাতে প্রচণ্ড চড় খান এবং শোনেন, মাটির নিচে আমি রয়েছি জানিস না? সাতশো বছর পড়ে আছি, আমাকে উদ্ধার কর।

বৈদ্যনাথ ঘোষাল যদিও তার রক্ষিতাকে "ওরে আমার মদনা কলা। ও আমার ছানার গজা" ইত্যাদি বলছিল এতক্ষণ, এবং বাংলা খাচ্ছিল—(এগুলি দিয়ে তার সন্ধ্যা শুরু ও রাতে "রুটি গরম নয় কেন" বলে বউয়ের পিঠে লাথি মারা তার প্রাত্যহিক কর্মসূচি) তবুও সে দৈবীভাবে উদ্দীপিত হয়। জায়গাটি খুঁড়ে কিছুই মেলে না, তবু এ নিয়ে গভীর রেলা হয়। ফলস্বরূপ চতুর্ভুজা কালীর মন্দির হয়। প্রবল জনমতে যবন জাতীয় কয়েকজন কৃষক শস্যক্ষেত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বৈদ্যনাথ এখন রহিস ব্যক্তি। সুযোগ্য পুত্রদ্বয় আদ্যনাথ ও শক্তিনাথ সাট্টার ঠেক, চুল্লুর ঠেক, এমন অনেক জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান করে ফেলেছে।

এই সিদ্ধকালীর থানেও সাজুমণি একদা রামলালের রোগমুক্তিতে ছেলের চুল ও নিজের বুকের রক্ত দিয়েছে। কিন্তু সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথ ও আদ্যনাথ "কালী! কালী!" বলে খাঁড়া ঘোরাচ্ছিল এবং শরণার্থীদের মাথা কাটছিল। রামলালও ঘরে ফেরেনি বলে সাজুমণি দামলে বেড়াচ্ছিল। দশহরা স্নানের মেলায় মুড়ি-বাতাসা বেচতে যেয়ে 'কমনে গেলি অ রাম!' কথাগুলি গলায় আটকে যায় পাঁচুবিবির ছেলে রহিমের মুণ্ড দেখে।

তারপর থেকে "কালী" নামে বড়ো ভয়। পাঁচুঠাকুর, শীতলা, "ঈশ্বর" বলতে এরাই। এ-রকমই সংকীর্ণ চিন্তা সাজুমণিদের। স্বদেশ বা ভারতবর্ষ বলতে হেতমপুর বোঝে। দেশের সর্বাধিনায়ক বলতে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বোঝে না। বোঝে অঞ্চল-প্রধান অমূল্য সর্বজ্ঞকে। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তত্ত্বে বিশ্বাস রেখে সাজুমণি এতকাল বিশ্বাসই করেছে।

পাঁচুঠাকুর আর শীতলা জাগ্রত ঠাকুর।

"দেশ" শব্দের অর্থ হেতমপুর।

সর্বশক্তিমান বলতে অমূল্য সর্বজ্ঞ।

কিন্তু ভরা ভাদরে, ফরাক্কায় যখন ভাগীরথী কূল ভাসাচ্ছে, পুকুর ভেসে যাচ্ছে. শস্যক্ষেত্র মার খাচ্ছে, সহসা সাজুমণি আবিষ্কার কবে বিশ্বাসের ভিত ধূলিসাৎ।

কাল অবধি বিশ্বাসটি তার ছিল গো! কালও সে গিয়েছিল অমূল্যর কাছে। অমূল্যর পদবী সর্বজ্ঞ, এবং লোকটি সত্যিই অনেক জানে শোনে। সাপেকাটা রুগী পরীক্ষা করে কেমন সাপে কামড়েছে, বিষাক্ত না নির্বিষ বলতে পারে। টাইটেল বা পার্টিশান মামলা বিষয়ে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা। কাজেও আমিন, জমি মাপতে সিদ্ধহস্ত। পশু-চিকিৎসাও ভালো বোঝে। থানা, কাছারি, পার্টি আপিশ-জেওলাবো আপিশ, সর্বত্র তাব অনায়াসগম্যতা। পঞ্চায়েতি কাজকর্ম তাব লাইন, কাজ কম করে ক্ষমতা দখলে রাখা, যাতে সে পারঙ্গম।

—দু-মাস হয়ে গেল, একটা-কিছু বলবে তো? কীভাবে দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারো?

—ধাই-কাজ পাচ্ছো না?

—যখন যেমন জুটছে। ধাই-কাজ দেবার কথা তো বলতে আসিনি বাবু। (বর্তমানে আসন্ন প্রসবা বলতে রহিমের বউ বাতাসীবিবি। ওবা সাজুকে ডাকবে না টাউনে নেবে ওরাই জানে।) বলতে এসেছি, দুটো মাস কেটে গেল ছেলে যে ফিরল না, সে ফিববে, না কি লাশ পেয়েছো, একটা তো জানতে হবে। এমন করে মানুষ বাঁচে?

সাধারণত সর্বজ্ঞবাবু সাজুমণিকে দাবড়েই কথা বলে। সাজুমণিরা সরকারের বড়ো শরিককে ভোট দেয় না। মেজো শরিককে দেয়। কিন্তু চব্বিশে জুন কাটরা মসজিদ কেন্দ্রিক হত্যাকাণ্ডটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার। অত্যন্ত সতর্কতায় কথা বলতে হয়।

সে স্বভাবোচিত কণ্ঠ নরম করে।

—জানার চেষ্টায় একদিনও থামা দিইনি। পরশু মেয়েটাকে দেখতে বহরমপুর গেলাম, তখনো...

মনে-মনে বলে, সরকারেরও বলিহারি যাই। এতদিন নিখোঁজ, বলে দাও না "ধরে নাও মৃত"। তা নয়, যত রাজ্যের ফালতু বাত।

মুখে বলে, রামলাল তো হাবা ছেলে নয়। মুড়ি-বাতাসা সে দশহরায় বরাবর বেচে। সেই ছেলে ঘরে এলো না, এ-রকম কেস আরো চারটে, সে অবিশ্যি অন্য দিকে।

—আমার ছেলের খবরটা দাও।

—যখন পাবো তখনই।

সাজুমণি বলল, নিখোঁজ মানে মরে গেছে?

—যেমন খবরই আসুক...যাচ্ছো কোথা?

—বিমলা, সুবল ঢালের বউ বলছে, সর্বত্তর গেলে মাসি, সিদ্ধকালী বড়ো জাগগত! তা সেথা তো যেতে মন চলে না। যাচ্ছি কাজোখালি ফকিরবাবার থানে।

"সিদ্ধকালী" নামটি অমূল্য সর্বজ্ঞকে গম্ভীর করে দেয়। বৈদ্যনাথ ও আদ্যনাথ সে সময়ে কালীর আদেশ পেয়েছিল বলে শোনা যাচ্ছে। উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এনামুল,

মকবুল, মনসুর মল্লিকদের জন্মভূমি মন্দিরকল্পে বাগাবার কাজটিকে অমূল্যরও মনে হয়েছিল ধর্মকাজ। এবং প্রধান হবার পর ওদেরকে বিশ ডেসিমেল করে জমিও দেয়া গিয়েছিল, যা ওরা রাখতে পারেনি। বর্তমানে "সিদ্ধকালী"র বাজার খারাপ। বৈদ্যনাথের মামাতো ভাই অচিরে আরেকটি মন্দির তুলল। পাঁঠার রক্ত এক জিনিশ, যবনের রক্ত আর। যবন-রক্তপায়ী কালিকার বর্তমান সময়ে আবার পূর্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন বড়োই কঠিন। আবার কাউকে দৈবাদেশ পেতে হয়। সাত্তা ও চুল্লুর ঠেকও এখন নীরব।

—যাও। থানে-থানে ঘুরে শরীর যাচ্ছে।

বিমলা ঢাল দশাসই মেয়েছেলে। গলাটি স্বভাবতই চড়া। সে গলা চড়িয়ে বলেছিল, তা রাম যদি নাই ফেরে, মাসিবা টাকা তো পাবে। টাকার লালচে ছেলে খুঁজছে না বাবু। বউটার কোলে তিনমেসে মেয়ে। বড়ো আর সেজো ছেলে তো বরাববে বাইরে। মেজোটা নেই। বেটাছেলে বলতে রামের সাতবছুরে ছেলে। তোমরা খবর দিতে পারছো না, থানে-থানে যাবে না মানুষ?

ফকির বাবার থানেও কাল হত্যে দিয়ে পড়েছিল সাজুমণি। পাঁচুবিবির দুঃখ আমি বুঝি বাবা। জলজুলে ছেলেটা বেঘোরে চলে গেল। আমার দুঃখ কী! মন জানছে নেই।

প্রধানবাবুরা জানিয়ে দিক নেই। বউটা নোয়া-সিঁদুর নিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকে, নাতি-নাৎনি দৌড়ে আসে, বাবাকে আনলি? সাত বছুরে ছেলে, পাঁচ বছুরে মেয়ে, কোলেরটা গেঁদা, ডবকা বউ, কাকে আমি কী বলি? কাল কেমন ঘুমের ঘোরে ভুল হলো, রাম তো আসবে, তা শোবে কোথায়?

আতিপাতি সরছি আর মাদুর সাপটাছি। এমন একদিনও হয়নি বাবা। বলে দাও সে আছে না নেই। কাঁদলে তার অমঙ্গল হয় বলে কাঁদতে পারছি না।

হত্যে দান বিফল হয়। বিমলা উবু হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখেছিল। সাজুমণি মাথা তুলতে বলে। ঘরে চলো মাসি। তেঁতুল গাছে কী-বা পাখি ডাকল। তিনবার দামা পাখি দেখলাম। ঘরে চলো।

দামা পাখিরা জানে না তাদের দর্শন, স্থানীয় মানুষের সংস্কার মতে কত অশুভ। তারা বড়ো বড়ো ঘোর বাদামি দেহ নিয়ে পোকপতং খুঁজছিল। বিমলা ওদের দিকে ঢিল ছোঁড়ে। বলে, চলো, চলো।

ঘরে ফেরার পথে-পথে রামলাল ছড়ানো। এ-পথে সে কিছুকাল ইস্কুলে যেতো। এ-পথ থেকেই একবার কুড়িয়ে পায় একটি দু-টাকার নোট। কিন্তু অদূরে সিদ্ধকালীর মন্দির। সাজুমণির মনে পড়তে থাকে রহিমের কাটা মাথার স্মৃতি। নিষ্প্রাণ বিস্ফারিত চোখে সে কী অপার বিস্ময়।

রক্ত, কত রক্ত!

বর্ষায় রক্ত ধুয়ে গেছে যেমন, মাটি শুষে রক্ত নিচেও তো সাজিয়েছে কত! হেতমপুর-কেজোখালির মানুষরা কোন পাপটা করেছিল?

পাঁচুবিবি খবর তো তখনই পায়। আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদতে পেরেছিল কতদিন। আল্লা

দেলে যদি তবে নেলে কেন?

অ আমার মাথাল রে! কে মাথায় দেবে গো বাপ!

কে এনে দেবে বাতের মলম! কেন বা গেলে বাপ!

কেন বা ফিরলে না!

কান্না, কান্না, কেবলই কান্না।

বুক ফাটতেও সাজুমণি দৌড়ে যেতে পারেনি।

ওরা কি সহজভাবে নেবে?

তারপর পুকুরের এ-পারে ও-পারে দুজনে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন ভরা দুপুরে।

—রামলালের মা।

সাজুমণি থমকে দাঁড়িয়েছিল।

—পাঁচু বিবি, দিদি!

ইতস্তত পায়ে পাঁচুবিবি এগিয়ে এসেছিল।

—কেন্দে লে বুন, কলজাটা হালকা হবে।

চোখের জলে বুক ভেসে যায়, বন্ধ গলা সাফ করে সাজুমণি মাথা নেড়েছিল।

—খবর তো মিল্‌হে নাই দিদি। কান্দল্যে যদি তার অমঙ্গল হয়।

—আমার খবর তো পাকপক্ষীর মুখে!

দুজনে দুজনের সামনে বসে নীরবে ফুলে-ফুলে কেঁদেছিল। পাঁচুবিবির ঘোর বিপদ। দরিয়ায় ভেলা ভাসে, মাঝি-নাইয়া নেই।

সুকুর আর দুখু গেল তো রহিমও গেল। তা বাদে বুন।

তুই তো দেখে এলি স্বচক্ষে! মুনিষ খাটতো, শাক লঙ্কা আজ্জাত, বিড়ি বানতে চলে যাবো বলে ইদানীং খুব কেজে করতো।

পঞ্চায়েত কাজ দেয় না। মুনিষ খাটবে তো ইউনাইন করো। বড়ো কেচাবেচা হয়ে যাচ্ছিল আমাশয় রোগা-ভোগা রহিম। দুটো মেয়ে, বউ ন-মাসে পড়ল, পাঁচুবিবিকে আল্লা নেয় না কেন?

—দুজনের কপালেই বুন...

দু-রকম।

মাথা নেড়ে-নেড়ে পাঁচুবিবি চলে গিয়েছিল।

ঘরে এসে সাজুমণি ডাকলো, বউ।

—কী হল গো, মা

সাজুমণির গলা ধরে আসে।

—সাঁজ লেগেছে, ঝিঙে ফুল মাচাঙে, খোলা চুলে...কাঁচা পয়াতি...শ্বাস কোথা?

—কেরাচিনি আনবো।

—থাক, যাস না।

সাজুমণি সনিবাসে মাচাঙের বাক্স-পেটরার পেছন থেকে বোতলটি বের করে দেয়।

সাঁচাবাঁচা করে কেরোসিনটুকু, চালটুকু বাঁচানো তার বহুদিনের অভ্যেস। কাঁথা শেলাইয়ের মজুরি, লোকের মশারি কাচার মজুরি, ধাই কাজের পাওনা, যেটুকু পারে, বাঁচায়। বোতলটি দিতে বুকে কী ব্যাথা বাজে। সর্বজ্ঞবাবুর নাতির মুখেভাতে ঘটা কী বা। কোটাসুর গ্রামে ইস্কুলবাড়িতে টুনিবালব। সর্বজ্ঞর ছেলে কন্ট্রাক্টর। কাঁচা পয়সার গরমে ম্যালোয়ারি জ্বর। বোতল-বোতল ফলের সিরাপ দিয়ে বরফ ঢেলে শরবত দিয়ে প্রাথমিক আপ্যায়ন। রামলাল খুব জল টেনেছিল, দশটা টাকা, এক গামছা খাবার। একটি খালি বোতল এনেছিল।

—তবে যাবো না?

—না, ঘরে থাক।

—মুখে-হাতে জল দাও। চা খাবে?

—ননী নীতা গেল কোথা?

—খেলছে।

—ঘরে ডাক।

হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সাজুমণি অভ্যাস বলে তুলসীতলায় আলো দেখায়।

জাতে বাইতি, বিস্মৃত অতীতে বীররায়, তারপর বেরা, অপভ্রংশে বেওরা, ওদেরও নাকি জমিভূমি ছিল এখানেই। যা চলে যায় সর্বজ্ঞ ও পালধিদের হাতে। কিন্তু সিকিটা পেলে একানা সরিয়ে রেখো, শাশুড়ির শিক্ষা। রামলালের বাবা বলতো, ঘরে ব্যাং (ব্যাঙ্ক) করেছে। জমি কিনবে।

জমি কে আব কিনল এ-গ্রামে, বেওরা-ঢাল-মুসলমানরা? জমি স্বপ্নের মতো, মিলালে আর আসে না। রামলালের বাবা বলতো, সাঁচাও বাঁচাও বাবুদেরে সাজে। তাবা জমালে বিস্তর জমে। পঁদে গামছা তায় মুনিষ তায় হাল-নাঙল নেই। আমি জমাবো কেন?

বলতো, পারিস পাঁচশত টাকা দিতে?

না, সাজুমণি তা পারেনি। তবে ভাগে ছাগল পেলেছে, রামলালকে দশহরায় মুড়ি বাতাসার বাৎসরিক ব্যবসায় ফিনান্স করেছে, নিজে হাঁস কিনেছে। ঘর বড়ো জীর্ণ হয়েছিল, নির্বাচনের আগে পঞ্চায়েত ওদের কজনকে ঘর করে দিয়েছে।

নাতি-নাৎনি ঘরে আসে।

ওরা চারজন খেতে বসে। কলাই ডাল বাটা সিদ্ধ। গাঁটি কচুর তরকারি। পান্তা। তিন মাসের মেয়েটা, নির্মলা, মায়ের দুধ খায়।

কুপির আলোর দিকে চেয়ে বউ অন্যমনস্ক।

—খা! ভাবিস না।

—দিনে-দিনে দু-মাস হল!

—খা।

দু-মাস তো সাজুমণি বসে থাকেনি। বসে থাকতে দেয়নি সুবলের ভাইপো বিপুল ঢাল। হেতমপুরের একমাত্র মাধ্যমিক পাশ বর্গক্ষত্রিয় যুবক, পাশ করার পর চাকরিহীন,

বর্তমানে কিছুকাল ব্যাঙ্ক লোনে দু'হাজার লিখে পনেরো শো পেয়ে রিক্সা-ভ্যানে যাত্রী -চাল-সবজি-ছাগল-মুরগি-মড়া-রোগী-বাহক বিপুল ঢাল।

বিপুল ঢাল মেজো দলের উৎসাহী কর্মী। দু-মাস আগেকার রক্তসন্ধ্যার সাতদিন বাদে থেকে ও নিখোঁজদের তালিকা নিয়ে সদরে ছুটছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা! নিহত বলো, নিখোঁজ বলো, পঁচিশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবে। রোরুদ্যমানা পাঁচুবিবি ও থমকে থাকা সাজুমণিকে ওই বার-বার নিয়ে গেছে সদরে। যথাস্থানে দরখাস্ত দান, প্রধান কর্তৃক সুপারিশকবণ, থানা কর্তৃক স্বীকারকরণ, এ-সব ওই করেছে। মধ্যবর্তী সময়ে শান্তি মিছিলও করেছে। হেতমপুরবাসী মনে করে, আগামী পঞ্চায়েতে বিপুলের ভালো চানস আছে।

সাজুমণি জানে, হেতমপুরে সবাই ভাবে সাজুমণির ছেলের প্রত্যাবর্তন আশা আসলে দুরাশা। সিনেমা নয় যে ছেলেকে ফেরানো যাবে। জীবন বড়ো মরিচপোড়া।

সাজুমণিও জানে, ছেলের প্রত্যাবর্তনের আশা দুরাশা মাত্র। সাজুকে মেরেছে সরকাবি লালফিতা। নিখোঁজ রামলাল বেওরা, নসিব মোল্যা, রূপেন্দ্র গোপ, এদেরকে সরকার "চিরতবে নিরুদ্দিষ্ট, অতএব মৃত" না-বললে সাজুমণির হাত-পা বাঁধা।

ছাগল, হাঁস, সব গুণে-গেঁথে নেয় সাজু। পঞ্চায়েত মাধ্যমে গম সাহায্য পেয়েছিল, মদ্দা ছাগলটা বেচেছে, রামলাল ফেরেনি, কিন্তু সে তো সংসারের খিদেটা সঙ্গে নিয়ে যায়নি। সাজুমণি এর মধ্যে পঞ্চাযেতের কাছে কাজ পেয়েছে কয়েকদিন। সংসারের চাকা অচল, অচল। বিপুল সাহায্য না-করলে খেতে হতো না।

একই ঘরে ছাগল-হাঁস-সাজুমণি-বউ-নাতি-নাৎনি দুটো। মশারি এ-সময়টা টানাতে হয়, ঘরে সাপ ঢোকে। জলে ছিস্টি ভেসে গেলে তারা বা থাকে কোথায়। নরে-নাগে বাস।

বিছানায় শুয়ে সাজুমণি মনের কোণকানাচে দৈবে বিশ্বাসটি খোঁজে। হদিশ পায় না! অনেক দিনের বিশ্বাস। জন্ম থেকেই বিশ্বাস। যা হবে তা দৈবের বিধান, ভাগ্য মেনে নিয়ে জীবন চালানো। বড়ো ছেলে দেবগ্রামে, পান বেচে দোকানে। সেজো ছেলে ধুলিয়ানে বিড়ি বাঁধে। চোখের বার হলেই মনের বার হয় না কেউ। মা কি ছেলেদের ভুলে থাকতে পারে? কিন্তু সকলেই তো পেট চালাতে হেচোকেচা। কে কতদিন কাজ ছেড়ে পড়ে থাকবে? শ্যামলাল আর বিষ্ণু দুজনেই এসেছিল। বড়ো ছেলে বিশ টাকা, সেজো ছেলে পাঁচ কিলো চাল দিয়েছিল। শ্যামলাল বলে গেল, ঠাকুরকে ডাকো।

ডাকছি তো, সাড়া তো দেয় না।

তবে বুঝি ঠাকুরদেবতা নেই।

সাজুমণি জানতো, আছে।

এমন ভাদ্রের রাতে বিছানায় শুয়ে সাজুমণির বুক হা-হা করে। যেন দোরজানলা ভাঙা ঘরে বাতাস বইছে। বিশ্বাস হারিয়ে গেল বলে কী এমন ফাঁকা হয়ে গেল বুকটা? বুকের কতখানি জুড়ে বসেছিল বিশ্বাস?

নিষ্ঠুর, নির্মম হুকুমহাকিম থানা।
বলে দাও না, সে নেই।
নইলে বলো সে আছে।
নেই নয়, আছে নয়, রামলাল কোথায়?

## দুই

সকালে মেঘ কেটে ভাদুরে কড়া রোদ ওঠে।

সাজুমণি উঠোনে, বেড়ার গায়ে কাঁথা-কানি রোদে দেয়। বউকে বলে, সোডার জল কর তো। কাপড়-চোপড় যেন চিটে গেলে গেছে। কী গুমসোনি গন্ধ! সব কেচে আনি।

পুকুরপাড়ে কেচে-ধুয়ে স্নান করে সাজুমণি উঠোনের সজনা গাছের ডালে সব রেখে কাচা জামা-প্যান্ট-কাপড় মেলতে থাকে। হাঁস বের করে ঘর মুক্ত করে বউ যায় উনোন ধরাতে।

ননীলাল আর নীতা মুড়ি নিয়ে বসে।

—কলমি শাক এনেছি, পোড়া-পোড়া ভাজ। আর কুমড়ো দিয়েছিল বিমলি, তাই ভাতে দে।

—তেল আনতে হবে।

—হ্যাঁ। সর্ষের তেল, কেরাচিনি...একটা দেশলাই। শুকনো পাতা পাড়তে সাবধান বউ। বর্ষায় ভরসা নেই। সাপ ঢুকে থাকলে...

এমন সময়েই এসে পড়েন অমূল্য সর্বজ্ঞ, সঙ্গে বিপুল, বিপুলের কাকা সুবল।

সঙ্গে সেপাই কেন?

সর্বজ্ঞবাবুর মুখ শুকনো কেন?

বিপুলের বাক্যি হ'রে গেছে কেন?

—রামের মা। একবার দ্যাখো দেখি!

সাজুমণি নিজে যাচ্ছে না, অন্য-কেউ তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়াচ্ছে।

—এই হারটা...

দস্তার হার, দস্তার লকেট, লকেটে "রামলাল" লেখা, লকেটের মধ্যে পাঁচু ঠাকুরের থানের মাটি ছিল।

—তার হার। সে কোথায়?

অমূল্য সর্বজ্ঞ নিশ্বাস ফেলে বলেন, আর কোথায়। টেনে নিয়ে সেই খাল পাড়ে পুঁতে দিয়েছিল। জল বাড়তে ছেলেরা মাছ ধরতে যেয়ে...ওঃ, ভাগ্যে সে-সময়ে ডাইরি করা হয়েছিল। নইলে তো "পরে মরেছে" বলে থানা থেকে গোল পাকিয়ে দিত।

সাজুমণি কি দুটো হয়ে গেছে? নিজের গলা শুনতে পাচ্ছে কেমন করে?

—আমি দেখবো।

—আর কী দেখবে। রামলাল; আবার নসিব, রূপেন এখন তাদের গাঁয়েও যেতে হয়।

সাজু নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

—রামলাল তবে নেই?

বিপুল ওকে ধরে।

—দিদমা, বোসো।

—কদ্দিন নেই?

—সেদিনেই...

—এতদিন লাগল বলতে?

বউ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। সাজুমণিও এখন বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে। খালপাড় ধরে কালও তো গেছি বাপ! জানি না তুমি ওখানে... কেন জল্লাদে মারলো রে! খালপাড়ে যাই আসি, কিছু জানিনি রে বাপ!

পড়শিরা ভেঙে পড়ে উঠোনে।

এমন খবর আসবে বলেই মন বলছিল। আজ খবরটি স্বীকৃতি পায় এবং সাজুমণি বুক-চেরা শোকে এতদিনের চেপে-রাখা কান্নার মুখ থেকে পাথর তুলে নেয়।

কাঁদতে-কাঁদতেই সাজু বলে, গতিগঙ্গা?

—আমি সব দেখছি, দিদ্‌মা।

রামলাল বেওরা লকেট দ্বারা, নসিব মোল্যা বাঁ পা, ডান পা-র তুলনায় খর্বাকৃতি দ্বারা শনাক্ত হয়। অন্য গলিত মাংস কঙ্কালটির খুলিতে লেগে-থাকা বাবরি চুল ও কঙ্কালের দৈর্ঘ্য, তাকে রূপেন্দ্র গোপ বলে দেয়। মাস দুই তারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা ও ইটে বাঁধা ছিল। আইন-কানুনের পালা মিটলে সৎকার ও সমাধি হবে।

বিপুল বলে, তিনটেরই ডাইরি আছে।

বিমলারা রামলালের বউকে ঘাটে নেয়।

সুবলের জ্যেঠি বলে, অপঘাতে অপমরণ, গতি চিন্তায় বুদ্ধিহরণ।

দাহ হলে ছরাদ একটা...

বিপুল বলে, সেসব কথা এখন কেন?

সাজুমণির কানে কিছুই যায় না।

সে যে পঁচিশ হাজার টাকা পেতে পারে সে-সম্ভাবনায় ঈর্ষায় প্রজ্বলিত সুবলের জ্যেঠি বলে, এখনই তো ভাবতে হবে। দু-মাস বউটা নোয়া-সিঁদুরে ছিল, দোষ লাগেনি? অপঘাত মরণ। প্রাচিত্তিরি হবে না?

—কিসের প্রাচিত্তির? রাম কি নিজের দোষে মরেছিল? ভগবান থাকলে কি এমন হয়? সে নেই?

সাজুমণির কথাগুলি শোকের বিলাপ। কিন্তু বড়োই সর্বনাশা। খুব, খুব সর্বনাশা।

বিপুল ওকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়।

আর পাঁচুবিবির শোকার্ত বিলাপ ভেসে আসে। সাজুমণির কান্নায় ওর ছেলের মৃত্যুসংবাদ যেন নতুন করে শোনে ও। হেতমপুরের আকাশ যেন চিরে যায়।

...

সব এখন পরের পর হয়ে যায়, পরের পর।

পলিথিনের থলিতে বাঁধা প্রায় মাংসহীন কঙ্কালটি যথোচিত দাহ হয়। সম্ভবপর ওষ্ঠ স্থলে আগুন ছুঁইয়ে রামের বউ মূর্চ্ছা যায়।

সাজুমণি পাথর হয়ে থাকে। কাঁদতে পারে না।

শ্যামলাল আসে, বিষ্ণু আসে। ওদের বউ-ছেলেমেয়ে রেখেই আসতে হয়।

—মা, কাজের কী হবে?

সাজুমণি নির্বাক।

—একটা...যা হয...অপঘাত হয়ে গেল...

সাজুমণি আস্তে বলে, আমার কোনো কৃত্য নেই।...বেটা মরলে...মার কিছু থাকে না!

অগত্যা শ্যামলালবা অমূল্য সর্বজ্ঞর কাছে যায়। প্রত্যাশিত ভাবেই তিনি এ-বিষয়েও বিশেষজ্ঞ।

—টাকার জোব তো নেই। থাকলে বলো।

—কোত্থেকে থাকবে বাবু?

—কাটিগঙ্গাও গঙ্গা। তার ধারে বসে যৎসামান্যে...পুরুত ধরে দিচ্ছি। সে এবারে এমন কাজ অনেক...

বিষ্ণু সভয়ে বলে, টাকা কে পাবে বাবু?

—বউ পাবে, মা পাবে।

—ভাইরা পায় না?

—একান্নে থাকতে?

—দু-ভাই চুপ।

—নিরন্নের অন্ন মারতে যেয়ো না। মা, বউ, তিনটে সন্তান...সাজুমণিই ডাইরি করেছিল...

—কাজ কে করবে?

—শাস্তরমতে বউ। মুখাগ্নি করেছিল। সে যদি ঘাটপিণ্ড দিয়ে শ্রাদ্ধাধিকার দেয়, শ্যাম করতে পারে।

শ্যাম ও বিষ্ণু ঘটনার প্রেক্ষিতে বিবেকবিদ্ধ হয়। সেই করুক। অধিকার তো তারই।

—মরলো কিসে বাবু?

—কোপে খেয়ে, ইটের ছেঁচায়।

অতি সংক্ষেপে রামলাল বেওরা/পিং ঁ ঈশ্বরলাল বেরার ঘাটশ্রাদ্ধ হয়ে যায়। বস্ত্রাভাবে হলুদ ডুরেটি পরেই রামের বউ কাঁদতে-কাঁদতে শ্রাদ্ধ করে।

বিপুল বলে, দিদ্‌মা, এবারে তো নড়তে হয়।

—পারছি না বিপুল। এখনই নড়তে হবে?

—দেখি অমূল্যদা কেমন ব্যবস্থা করে। সে লিখবে, থানা লিখবে, সদরে যেয়ে প্রসাদবাবুকে ধরতে হবে। সব হয়ে যাবে দিদমা। মন্ত্রী আছে আমাদেব...

সাজুমণি আবার নির্বাক হয়ে যায়।

বিপুল বউকে বলে, কাঁদে না।

—সেই দিনে যা...পাথর হয়ে আছে কেন?

—কাঁদতে পারছে না।

সাজুমণি সবই শুনে যায়। সকলেরই চোখে পড়ে ওর পরিবর্তন। গরিবের ঘরে এমন শোক কে কবে দেখেছে? গবিব তিনদিন কাঁদে। আবাব সংসারে ফিরে আসে, কাজকর্ম খাটাখাটনি করে। এমন অশ্রুহীন নির্বাক হয়ে কে থাকে?

বউ বলে, কান পেতে থাকো কেন?

—শুনবো বলে।

—তার ডাক শুনবে বলে?

—না বে না।

—তবে কার? তুমি অমন পাথর মেরে থাকলে আমি কীসে ভবসা পাবো? সাজুমণি শীর্ণ হাত বাড়ায়।

—আমাব ভরসা। আমি তো তোদের ফেলিনি বউ।

—তবে কি শুনবে বলে অমন করছ?

সাজুমণি শ্রান্ত গলায় বলে, রহিমের মা! সেদিন কেঁদেছিল? সে জানে আমার জ্বালা, আমি জানি তার জ্বালা। তাকে পেলে কাঁদতে পারতাম। বুকটা হালকা হতো।

—সে কখনো আসে মা? কোন মুখে আসবে?

—কেন, যেমন যেতে-আসতে দাঁড়াতো? রহিম গেল মিটিনে, রাম গেল মুড়ি-বাতাসা বেচতে। দুজনেই নিদোষে মরল, তাতে রহিমের মার মুখ কেন ছোটো হবে? সে বা কী দোষ করেছিল, আমি বা কী দোষ করেছিলাম!

—টাকা পাবে বলে সব শত্তুরতা হয়েছে।

—রামের বদলে টাকা তো চাইনি আমি! কারুকে খেলার ছলেও মারেনি, হাংগামা দেখলে দৌড়ে ঘরে আসতো, তাকে এমন কুপিয়ে থেঁৎলে...

—মুকুলের মা রোজ ঘাটে বসে কাঁদে।

—রহিমের বউ?

—হ্যাঁ। বলে, আল্লার বিচার নেই।

—সাজুমণি ঈষৎ হাসে।

—ঠাকুর-দেবতা সাধু-ফকির, কার-বা বিচার আছে? নে, ঘুমো। সে এলে কাঁদতাম খানিক। কার সঙ্গে কাঁদবো?

বউ চুপ করে থাকে।

—আসতেও পারতো।

—ভাবে লোকে কী বলবে।

—হবেও বা। আমিও তো যেতে পারছি না সেজন্যেই। কিন্তু আর কার কাছে গেলে আমি কাঁদতে পারবো বউ?

সাজুমণির গলায় বড়ো বিপন্ন হাহাকার।

—ঘুমোও, মা।

—তুই ঘুমো।

সাজুমণি কান পেতে থাকে।

কয়েকদিন বাদেই সন্ধে পেরিয়ে হনহনিয়ে লণ্ঠন হাতে পাঁচুবিবি আসে।

—বুন! ঘরে আছো বুন?

—কোন চুলোয যাবো?

—বউটা জল ভাঙছে গো। এ আমাব কী বিপদ বলো। নসিবে আর কী আছে!

—হাসপাতালে...

নেবে কে? বিপুল ভেন নিয়ে লালবাগ গেছে। সকাল থেকে শরীর খারাপ, বলবে তো? তুমি ওর আগেরগুলো খালাশ করছো, এবারে বলতাম না, বড়ো বিপদে পড়ে বুন...

সাজুমণি অবাক, অবাক।

কই, কান্না তো আসছে না?

—হালিমের মাকে ডেকে নাও। জল গরম করো। আমি যাচ্ছি, তুমি যাও। সাবান আছে তো?

—আছে গো আছে। বউটা আবার ব্যথা খায় না বেশি।

পাঁচুবিবি চলে যায়।

সাজুমণি কাপড় ছাড়ে। থলিটা দে বউ। হোমোপ্যাথি শিশিতে ডেটল, বাঁশের চেঁচারি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নার্স প্রদত্ত গজ, ব্যাণ্ডেজ, তুলো। মেটারনিটি ব্যাগ হয়ে গেল সাজুমণির। কথাব মধ্যে ঠাট্টা ছিল? তোমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নানারকম শুনি। সাজুমণির হাতে সবই সুপ্রসব। মা-ছাঁ সব বেঁচে আছে।—কোথায় শিখলে সাজু?

—পোসুতিসদনের মেট্রন দিদি ছিল তখন। রাতে কেস এলে আমায় সঙ্গে নিতো। রামের বাপ মরেছে, রাম তখন চার বছরেরটি। সাথে গেলে দু-টাকা। তিনিই বললো, পোসুতিসদন উঠে যাচ্ছে কোটাসুরে। এ-বাড়ি এখানে থাকলে সারাবে না। সেখানে নতুন বাড়ি হবে। কাজটা শিখে নাও সাজু। শিখলাম। তখন গাঁ-গেরামে ডাকতো। এখন তেমন ডাকে না। সদনে যায়। তবে ঠেকো পড়লে...

শেষ প্রসব করিয়েছে বিমলাকে। ও মাগির ব্যথা ওঠে মাঝরাতে। তখন সাজুমাসি। বিমলির ছেলে ছ-মেসে। আর হ্যাঁ, রামের বউকেও তো প্রসব করালো। চেঁচারি যদি ডেটিলে মুছে নাও...

বাতাসীবিবি কাতরাচ্ছিল।

—নে, আঁচল কামড়ে থাক। সাবান দাও, দিদি...

রহিমের সন্তানকে মাটি ধরাবার কাজে ঘণ্টা দুয়েক ব্যস্ত থাকে সাজুমণি। বাতাসীর দু-চোখে আকুল কান্না। ভয় কী? আর দুটো কার হাতে হয়েছিল? কোঁক পাড়ো, চাপ দাও, এই তো।

ওঙা...ওঙা...ওঙা।

—কী হলো বুন?

—বেটা গো! নাতি হলো।

নাড়ি কাটো, ফুল বের করো, পুঁততে হবে। ছেলে-নাইয়ে ধুইয়ে মাকে সাব্যস্ত করতে চাঁদ ছেলে।

—চল, এগিয়ে দিই।

—টচ থাকে দাও। চলে যাবো।

—চল এট্টু যাই। পাওনাটা বুন...

—থাক, দিতে হবে না।

নিশ্বাস টানে পাঁচুবিবি।

—টাকা পেলে...

—থাক।

হাঁটতে-হাঁটতে পাঁচুবিবি ঈষৎ রাগত গলায় বলে, বুকে পাথর চাপা বা দিয়ে মরছো কেন? কানতে পারোনি?

—তুমি বা এক ডাকফুকরে গলা বুজলে কেন?

—ওরা মুখ চেপে ধরলো।

—তুমি আমার মুখ বন্ধ করে দিলে।

সাজুমণির ঘর দেখা যায়।

—এবারে যাও। বাতাসী একলাটি।

—হাসিমের মা আছে।

—যাও, ছেলে কালো হাগবে, দেহগত মল বেরোবে, তার আগে যেন মাই না-খায়। মধু-জল দিয়ো। জল ফুটে নিয়ো।

—নেবো। তুমিও খানিক কাঁদো। বুকে পাষাণ নিয়ে মানুষ চলতে পারে? ছেলেরা গেছে, কোন জ্বালাটা বা নিয়ে গেছে?

—না, সব রেখে গেছে। শিশু জন্ম, সংসারের প্রাত্যহিকী। পাঁচুবিবি পেছন ফেরে এবার। সাজুমণি কড়া নাড়ে ঘরের।

—মা, এলে?

—এলাম।

—কী হলো গো?

—বেটা।

—বেশ বড়োশড়ো?

—ওর তো হয় ছোটো, পরে বাড়ে।

—গোরো না কালো?

—ওই শামবন্ন হবে।

—বালতিতে জল রেখেছি।

কাপড় ছাড়ে সাজুমণি, হাতে মুখে জল ছেটায়। তারপর জানলা একটু ফাঁক কবে।

আকাশে হরিণহেলা শশী।

চাঁদেব দিকে চেয়ে সাজুমণি এখন ফলে-ফুলে কাঁদে।

বুকের পাষাণ গলে।

অঝোর, দুর্বাব কান্না।

কোঁক পাড়ে সাজুমণি, চাপ দেয়। শোক সে বহন করে আছে। খানিক নেমে যাক, নেমে যাক, বউ-ছেলে-মেয়ে, ছাগল-মুরগি নুন-তেল, কেরাচিনি, সব রইলো, তো হতভাগাবা মরলি কেন? উত্তর কোথায়.

চাঁদ সহাস্যে নিরুত্তর থেকে হেলে যায় আবেকটু।

# ভারতবর্ষ

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই গ'ড়ে উঠেছে একটা ছোট্ট বাজার। পিছনে গ্রাম, ঘন বাঁশবনে ঢাকা। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, তাই মাঝে-মাঝে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে—যখন কিনা কাঁচা রাস্তা ধ'রে সবুজ ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে আসে কোনো যুবক বা যুবতী; পরনে যা পোশাক, তা আমেদাবাদেব কারাখানায় তৈরি। কিন্তু বাজারে বিদ্যুৎ আছে। তিনটে চায়েব দোকান, দুটো সন্দেশের, তিনটে পোশাকেব, একটা মনোহারির, দুটো মুদিখানার। আর একটা আড়ত আছে। একটা হাস্কিং মেসিন আছে। তাব পিছনে ইটভাটা আছে। চাবপাশেব গ্রাম থেকে লোকেরা আসে। বাত নটা অব্দি জোব জমাটিভাব থাকে। তারপর সব ফাঁকা। শুধু কিছু আলো জ্বলে। কিছু নেড়িকুত্তার ছায়া ঘোবে পিচেব ওপর। মাঝে-মাঝে চলে যায় ট্রাক দূরেব শহবের দিকে। আবার সব চুপচাপ। বাঁকের মুখে আদ্যিকালের বটগাছে পেঁচাব ডাকও স্তব্ধতার অন্তর্গত মনে হয।

সময়টা ছিল শীতের। বাজারেব উত্তবে বিশাল মাঠ থেকে কনকনে বাতাস ব'য়ে আসছিল সারাক্ষণ। তাবপর আকাশ ধূসর হ'লো মেঘে। হালকা বৃষ্টি শুরু হ'লো। রাঢ়বাংলার শীত এমনিতেই খুব জাঁকালো। বৃষ্টিতে তা হ'লো ধারালো। ভদ্রলোক বলে *'পউষে বাদলা'*।ছোটোলোকে বলে *'ডাওর'*। আব বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোবালো হ'লে তারা বলে *'ফাঁপি'*। সেবার এই আবহাওযা হ'য়ে পড়ল 'ফাঁপি'। তখনও দূরের মাঠে ধান কাটা হয়নি। এই অকালদুর্যোগে ধানের ক্ষতি হবে প্রচণ্ড। তাই লোকেব মেজাজ গেল বিগড়ে। চাষাভুষো মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে-দিতে প্রতীক্ষা করতে থাকল রোদে-ঝলমল একটা দিন এবং মুণ্ডুপাত করতে থাকল আল্লা-ভগবানের। শেষ অব্দি ক্ষিপ্ত কোনো-কোনো যুবক চাষী চেঁচিয়ে ব'লে দিল—মাথার ওপর আর কোনো শালা নেই রে—কেউ নাই।

কেউ নেই মাথাব ওপর, তখন যা খুশি করা যায়। ক্ষিপ্ত মেজাজে কথায়-কথায় তর্ক বাধে। মাবামারির উপক্রম হয়। এবং তর্কের কোনো প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ নেই—একটা কিছু পেলেই হ'লো। সেই দুরন্ত শীতের অকালদুর্যোগে গ্রামের ঘরে ব'সে কারো সময় কাটে না। সবাই চ'লে আসে সভ্যতার ছোট্ট উনোনের পাশে হাত-পা সেঁকে নিতে। এইটুকুই যা সুখ তখন। এবং অলস দিনকাটানোর একঘেয়েমি দূর করতেই নানান কথা আসে। বোমবাইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা গায়ক, অথবা ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী, এম. এল. এ.—নয়তো সরা বাউরির যে-মেয়েটা শহরে বাবু জুটিয়েছে, সে-সবই এসে পড়ে। জোর কথা-কাটাকাটি হয়, চাওলার বিক্রিবাটা বাড়ে। ধানের মরশুম—আজ না-হোক, কাল পয়সা পাবেই, তাই ধারের অঙ্ক বেড়ে চলে।

সেই সময় এল এক বুড়ি। থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। রাক্ষুসী চেহারা। একমাথা শাদা চুল। ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো তেমনি চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি। পিচের পথে ভিজতে-ভিজতে দিব্যি একই তালে হেঁটে এল। ক্ষয়াখর্বুটে মুখে তার সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট। তর্কের মধ্যে চায়ের দোকানে ঢুকে চা চাইল সে। তাকে দেখে সবাই তর্ক থামাল। এই দুর্যোগে কীভাবে বেঁচেবর্তে হেঁটে আসতে পারল, সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল।

চা খুব আরামে গিলে বুড়ি সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। তখন একজন তাকে জিগ্যেস করল—ও বুড়ি, তুমি এলে কোত্থেকে?

বুড়ি বড়ো মেজাজি। গজগজ ক'রে জবাব দিল—সে-কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা?

ওরা হেসে উঠল।—ওবে বাব ' ঃ'বি তেজি দেখছি! এই বাদলায় তেজি টাট্টুর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

বুড়ি খেপে গেল।—তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু! খর্বদার, আকথাকুকথা বোলো না। আমি যেখানে থেকেই আসি, লোকেব কী?

একজন ঠাণ্ডা মাথায় বলল—ও বুড়ি, তুমি থাকো কোথায়, তাই জিগ্যেস করছে এরা।

—তোমাদের মাথায়।

ব'লেই সে কম্বলের ভেতর থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পয়সা খুলতে থাকল। তারপর চায়ের দাম মিটিয়ে আবার রাস্তায় নামল।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল—মরবে রে, নির্ঘাৎ মরবে বুড়িটা!

বুড়ি ঘুরে বলল—তোরা মর্, তোদের শতগুষ্টি মরুক।

সবাই দেখল বুড়ি নড়বড় ক'রে বাঁকের মুখের বটতলায় গেল। বটতলাটা ফাঁকা। মাটি ভিজে প্রায় কাদা হ'য়ে রয়েছে। সে সবার অবাক চোখের সামনে সেখানে গিয়ে গুঁড়ির কাছে একটা মোটা শেকড়ে ব'সে পড়ল। শেকড়টার পিছনে গুঁড়ির গায়ে খোঁদল আছে। সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়াল সে। বোঝা গেল, বুড়ির এ-অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে। অর্থাৎ সে বৃক্ষবাসিনী।

কেউ-কেউ বলল—বরং বারোয়ারিতলায় গেলেই পারত। নির্ঘাৎ ম'রে যাবে। এ-কথার পর স্বভাবত এবার বুড়িকে নিয়ে অনেক কথা এসে পড়ল। আবার জমে গেল।...

**পউষে বাদলা সম্পর্কে গ্রামের *'ডাকপুরুষের'* পুরোনো *'বচন'* আছে। তা হ'লো: শনিতে সাত, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে তিন—বাকি সব দিন-দিন। অর্থাৎ শনিতে বাদলা লাগলে সাতদিন থাকবে, মঙ্গলে পাঁচদিন, বুধে তিনদিন। অন্যদিনে লাগলে একদিনের ব্যাপার। এ-বাদলা লেগেছিল মঙ্গলে। কেউ অবশ্য হিশেব করেনি—কিন্তু যেদিন ছাড়ল, সেদিন আকাশ**

পরিষ্কার হ'য়ে গেল একেবারে। সূর্যের উজ্জ্বল মুখ দেখা গেল। আর, সবাই আবিষ্কার করল বটতলায় সেই গুঁড়ির খোঁদলে পিঠ রেখে বুড়ি চিত হ'য়ে প'ড়ে আছে—নিঃসাড়।

অনেকটা বেলা হ'লেও সে নড়ছে না দেখে চাওলা জগা বলল—নির্ঘাৎ ম'রে গেছে বুড়িটা।

একজন বলল—সর্বনাশ! তাহ'লে শ্যালকুকুবে ছিঁড়ে খাবে যে! গন্ধে টেঁকা যাবে!

একজন দুজন ক'রে ভিড় বাড়তে থাকল। কেউ-কেউ বুড়ির কপাল ছুঁয়ে দেখল—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একজন নাড়িও দেখল—কোনো স্পন্দন নেই। অতএব মড়াই বটে।

চৌকিদারকে খবর দেওয়া হ'লো। সে এসে বলল—থানায় খবর দিয়ে কী হবে? ফাঁপিতে এক ভিখিরি পটল তুলেছে, তার আবাব থানাপুলিশ! পাঁচ কোশ দূরে থানায় খবর দাও, তারপর ওনার আসতে-আসতে রাতদুপুর। ততক্ষণে গন্ধ ছুটবে। কবে মরেছে হিশেব আছে নাকি? দেখছ না, ফুলে ঢোল হয়েছে কেমন।

—তাহ'লে কী করবো চৌকিদারদা?

—লদীতে ফেলে দিয়ে এসো! ঠিক গতি হ'য়ে যাবে—যা হবার!

বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হ'লো। মাঠ পেরিয়ে দু-মাইল দূরে নদী। এখন শুকনো। সেখানে চড়ায় ফেলে দিয়ে এল কজন মিলে। বাঁশের চ্যাংদোলায় ঝোলানো হয়েছিল। সেটাও ফেলে দিয়ে এল ওরা। বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হ'য়ে প'ড়ে রইল।

ফিবে এসে সবাই দিগন্তে চোখ রাখল ঝাঁকে-ঝাঁকে কখন শকুন নামবে।

হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মাঠ পেরিয়ে একটা চ্যাংদোলা আসছে। সেটা যখন বাজারে পৌঁছোলো তখন জানা গেল ব্যাপারটা। সেই বুড়ির মড়াটাই তুলে নিয়ে আসছে মুসলমানপাড়ার লোকেরা। আরবি মন্ত্র পড়ছে ওরা। মাথায় টুপিও পরেছে কেউ-কেউ।

যারা ফেলে দিয়ে এসেছিল, তারা হিন্দু। তারা অবাক হ'য়ে এবং রেগে গিয়ে জানতে চাইল—কী ব্যাপার?

না—বুড়ি যে মুসলমান।

প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক। অনেকে তাকে শুনেছে বিড়বিড় ক'রে আল্লা বা বিসমিল্লা বলতে। এমনকী গাঁয়ের মোল্লাসায়েব অকাট্য শপথ ক'রে বললেন—আজ ফজরে (ভোরের নমাজের সময়) যখন নমাজ সেরে এদিকে বাস ধরতে আসছি, তখনই বুড়ি মারা যাচ্ছিল। ওকে স্পষ্ট কলমা পড়তে শুনলাম। তা—কে জানে, বুড়ি মরছে? আমি যাচ্ছি শহরে—মামলার দিন। তাই দেখা হ'লো না ব্যাপারটা। ফিরে এসে শুনি ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তৌবা! তৌবা! তা কি হয় আমরা বেঁচে থাকতে? তাই কবরে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

গাঁয়ের ভটচাজমশাই সবে বাস থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে সব দেখে-শুনে বললেন—অসম্ভব। আমিও তো মোল্লার সঙ্গে একই বাসে আজ শহরে গিয়েছিলুম। আমি কি কালা? আমি স্পষ্ট শুনেছি, বুড়ি বলছিল শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।......

তাঁর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল। নকড়ি নাপিত দিব্যি ক'রে বলল—কাল আমি কামাতে বসবো ব'লে বটতলায় এসেছিলাম। দেখলাম বসা যাবে না। তখন বুড়িকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি আপন মনে বলছে—হরিবোল, হরিবোল!

—ভুল শুনেছো। ফজলু সেখ বলল।—আমি স্বকর্ণে শুনেছি, বুড়ি লাইলাহা ইল্লাল্ল বলছে!

নিবারণ বাগদি রাগী লোক। একসময় দাগি ডাকাত ছিল। চেঁচিয়ে উঠল—মিথ্যে!

করিম ফরাজি এখন খুব নমাজ পড়ে এবং 'বান্দা' মানুষ। একদা সে ছিল পেশাদার লাঠিয়াল। নিবাবণেব চ্যাচানি বরদাস্ত করবে কেন সে? আরো চেঁচিযে বলল—খর্বদার!

বচসা বেড়ে গেল। তর্কাতর্কি উত্তেজনা হল্লা চলতে থাকল। তারপর দেখা গেল একদল লোক সেই বাঁশের চ্যাংদোলাটা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে। দোকানগুলোব ঝাঁপ বন্ধ হ'তে থাকল। আর তাবপরই দেখা গেল গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। সবার হাতে মাবাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চ্যাংদোলাটা তখন পিচের ওপর। বুড়ির মড়ার দু-পাশে স্পষ্ট দুটো জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। পরস্পরকে লক্ষ ক'বে গালাগালি চলছে। মাঝে-মাঝে মোল্লাসায়েব চেঁচিয়ে উঠছেন—মোছলেম ভাইসকল! জেহাদ জেহাদ! নারাযে তকবির—আল্লাহু আকবর!

অন্যদিকে ভটচাজমশাই গ'র্জে বলছেন—জয় মা কালী! যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা! জয় মা কালী কি জয়!

ধুন্ধুমার গর্জন প্রতিগর্জন এবং দেখা গেল, বিপন্ন আইনরক্ষক বেচারা নীল উর্দিপরা চৌকিদার তার লাঠিটি উঁচিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। যখনই মুসলিমপক্ষ এক পা এগিয়ে আসে সে মরীয়া হ'য়ে লাঠিটা পিচে ঠুকে গর্জায়—*সাবধান!* আবার হিন্দুপক্ষ এগোলে সে একই ভাবে সেদিকে লাঠি ঠুকে চেঁচায়—*খর্বদার!*

কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে—সে এবার পর্যায়ক্রমে পাগলের মতন দুদিকে একবার ক'রে পিচে লাঠি ঠুকতে শুরু করল। খট খট খট খট শব্দে কাঁপতে থাকল।

তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ির মড়াটা নড়ছে। নড়তে-নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করছে। দু-দিকের সশস্ত্র জনতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চৌকিদার হাঁ ক'রে দেখছে।

তারপর বুড়ি উঠল। উঠে দু-দিকে তাকাল—ভিড় দুটোকে, দেখল। মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল। সেই বিকৃত মুখে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল সে।

চৌকিদার এতক্ষণে মুখ খুলে বলল—বুড়িমা! তুমি মরোনি!

—মর্, তুই মর। তোর শতগুষ্টি মরুক!

দু-দিকের ভিড়ও চেঁচিয়ে উঠল—বুড়ি! তুমি মরোনি!

—তোরা মর। তোরা মব মুখপোড়ারা।

—বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

বুড়ি খেপে গিয়ে বলল—চোখেব মাথা খেয়েছিস মিনষেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে? ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখোবা! আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে? চোখ গেলে দোবো—যা, যা, পালাঃ।

ব'লে সে নড়বড় ক'রে বাস্তা ধ'রে চলতে থাকল। ভিড় স'বে তাকে পথ দিল। শেষ রোদের আলোয় সে দূরেব দিকে ক্রমশ আবছা হ'য়ে গেল।

# রাজা যায় রাজা আসে

## প্রফুল্ল রায়

ভোরবেলা পুবের ঘরেব দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমিব ওপব হলুদ-হলুদ রেখকাটা লুঙ্গি আব জালি গেঞ্জি। এই সাত সকালেই চুলে কাঁকই পড়েছে, মাথায় পেখম কেটে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক-মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবেব ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটের বড়ো-বড়ো পঁচিশের বন্দেব দুখানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নকশা-করা চাল, শাল-কাঠেব খিলান-দেওয়া দেয়াল, বিলিতি মাটির পাকা মেঝে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধাবে সারি-সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নাবাল জমি, পিঠক্ষীরা আর সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনটিই রয়েছে, দুইয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড়ো-বড়ো টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ-সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায়-যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল এখনও তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা-থোকা ভবঘুরে মেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে-ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসবার আগেই বুঝি, সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা। এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে-দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারিদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে-ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-সামনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শরৎকাল যেন জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে-নাচাতে অন্যমনস্কের মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক-মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোনো প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে, ধানখেত চিরে-চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু

লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোনদিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দুটোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান মেঘ —কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! আজ এই যে জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু-ভাগ না হত, বৈকুণ্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না-যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই, কী আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সেজন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পর নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলি—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়ো ধনী গৃহস্থ।

দুশো কানি তেফসলা জমি তোরাব আলির, হাল-হালুটি অগুনতি, গোরু আর বলদ পঞ্চাশ-ষাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বারো মাসই খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মুশুর সব মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড।

মাস আষ্টেক আগেও তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা, সবচাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড়ো গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলি মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকালবেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুলে-দাড়িতে কলপ। রাজেক জানে, কাছে গেলে তার চোখে শুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলি কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলির মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধহয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে-কচলাতে খুব সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'আপনে!'

দু-হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে-করতে সামান্য হাসল তোরাব আলি। বলল, 'হ, আমিই তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ্—হ্, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলি এবার বলল, 'পুঁকৈর ঘাটেই খাড়া কবাইয়া রাখবি নিকি? ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটোকাল থেকে তোরাব আলিকে দেখছে রাজেক, এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনও শোনেনি।

যাই হোক, রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন—আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলিকে কোথায় বসাবে, কিভাবে আপ্যায়ন কববে, ঠিক'কবে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলি কিন্তু বসল না। তাব সমাদবের জন্য বাজেকের ছোটাছুটি ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলিকে একবাব দেখে নিল রাজেক। তার বাড়িঘর দেখার জন্যই কি সক্কালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলিব মনে কী আছে, কে জানে।

বাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলি। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিশ তরই থাকব।'

মুখ ফুটে তোরাব আলি একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন আর 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসল তোরাব আলি। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল কবে তামাক-টামাক নিজেরই দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও, কিন্তু সংশয়ে মনটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলি বলল, বৈকুণ্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে, না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ।'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলি বলল, 'ঐ পুঁকৈরও তো বৈকুণ্ঠ সা'র?'

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও সা-কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই অখন তর হ্যাফাজতে?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীববতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল-গল কবে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলি। তাবপর বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা-বা আট মাস আগে গেবাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবব রাখে। আগের সুবেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোঁজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইব ভিতবে তরে চিঠিপত্তব দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কী ভাবল তোরাব আলি। তারপর বলল, 'তর কী মনে হয?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপাবে?'

'বৈকুণ্ঠ সা-বা আর ফিরব?'

'কেমনে কমু?'

রাজেকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলি। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমাব মনে লয় অরা ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলি আবার বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা-রা না-ফিরলে তাব জমিন, বাড়িঘব পুকৈব, সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুণ্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আরো কিছুক্ষণ খবর—টবর নিল তোরাব আলি। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে আমাগো বাড়িত চাউরগা ডাইলভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়ো, সবচাইতে সম্মানিত, সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক-দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলি কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে। কিছু-

একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলি। বলল, 'তাইলে ঐ কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কিলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত কবল রাজেক।

তোরাব আলি বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমবা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আব দাঁড়াল না। সামনের ঢালা উঠোন, তাবপরের সোনাল আর পিঠক্ষীরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতর অদৃশ্য হল।

তোরাব আলি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়েনি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহ্বল আগে আর কখনও হয়নি সে। এমন ভয়ও কখনও পায়নি।

তোরাব আলি তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলিব মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না-হয় বৈকুণ্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাবার পর একটু সুখেব মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কীভাবে চলত!

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পিছন দিকে ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের! ছোটোকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু-গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের, কখনও-বা খাঁয়েদের। তবে সবচাইতে বেশি যেত হিন্দুপাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে-সময় আর-কোনো অনুভূতি ছিল না। সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে-পায়ে ফিরত।

একটু বড়ো হবার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না, আর তা সম্মানজনকও না। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি জোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খানদুই মূলি বাঁশ। বাঁশ চিরে 'পলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ-দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পলো নিয়ে খালবিল কি দু-মাইল দূরের বড়ো নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে-মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত ইনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধের

পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরিব মুসলমান পল্লিটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারু উনুনে চাট্টি ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে-জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে-ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলির কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে-শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত সেগুলো খুঁটে-খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বের করতো। কুড়োনো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালোই কেটে যেত।

জলে-স্থলে সাবা বছবই তাব নিদারুণ জীবন-সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বারো মাস জল ভিজে-ভিজে চামড়া ফেটে-ফেটে গিয়েছিল, গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, চোখ দুটো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল, হেজে-হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে বং তখন। তার নাম দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের!

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত—ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেযে তিরিশটা বছর কীভাবে কেটে গেছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে-বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড়ো মাঠটায় কাতারে-কাতারে মানুষ গিয়ে জমা হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতি বাজনা বাজাল। কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল। সিল্কের নতুন পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধুম পড়ে গেল, তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে-পায়ে এগিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রং-তামশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধিক্কারের গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে আহাম্মক, তুই আলি কইথন? দেখি, দেখি তর চোপাখান।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে নিয়ে লোকটা এবার বলেছিল, 'তাই কই, আমাগো রাজেইকা ছাড়া এমুন কথা আর-কার মুখ দিয়া বাইর হইব। জলে থাইকা-থাইকা বুদ্ধিশুদ্ধি তর গেছে। কোনো খবরই রাখস না—'

'প্যাচাল না পাইড়া কী হইছে হেই কথাটা কও—'

লোকটা এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে একটা দিনের মতো দিন। সেদিন দেশ স্বাধীন

হয়েছে। স্বাধীনই শুধু না, কোটি-কোটি মানুষ যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য মৃত্যুপণে সংগ্রাম করেছে, সেই পাকিস্তানেরও প্রতিষ্ঠা সেই দিনটিতে। এমন একটা দিন বছরের, এক-আধ বছরেব কেন, বহু-বহু বছরের লক্ষ ম্যাড়মেড়ে আটপৌরে দিন থেকে আলাদা। তাকে তো অন্যমনস্কের মতো উদাসীনভাবে হাত পেতে নেওয়া যায় না। বিপুল সমাদরে রাজকীয় সমাবোহে বরণ কবে নিতে হয। তাই এত লোকজন, এত বাজি পোড়াবার ধুম, এত উদ্দীপনা।

মনে আছে, অনেক বাত পর্যন্ত সেদিন স্কুলবাড়ির মাঠে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়েছিল রাজেক। এত আলো, এত হৈ-চৈ, এত উত্তেজনা, এত রোশনাই, এত রং—সবই ভালো লেগেছিল তাব, নতুন নতুন মনে হয়েছিল। কিন্তু ভালো লাগার আয়ু মোটে একটা রাত। পরের দিনই 'পলো' নিযে খালে গিয়ে নামতে হয়েছিল তাকে।

সেই চমকপ্রদ বিশেষ দিনটিব পব বছরখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন কার্তিক মাসের পচা জলে 'চাই' পাততে-পাততে রাজেক খবর পেল, ছিপতিপুর গ্রামে ভাঙন লেগেছে। গোঁসাই বাড়ির লোকেবা নাকি জমিজমা ঘবদুয়াব বেচে কলকাতায চলে গেছে। গোঁসাইদে'ব পর গেল ভুঁইমালিবা, তারপর একে একে বারুইরা, কুমোররা, জুগীরা, দেখতে-দেখতে ছিপতিপুব একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বারো মাস জলে থেকে-থেকে অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাজেকের। গ্রামে কারা থাকল, কারা গেল—তা নিয়ে আদৌ দুর্ভাবনা নেই। তাব দিনরাতের একমাত্র চিন্তা—জলের তলা থেকে কেমন কবে জীবন্ত রুপোলি ফসলগুলোকে তুলে আনবে।

দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব কিংবা গ্রামের ভাঙন—সমস্ত কিছুই রাজেককে আলতোভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সে-সব নিয়ে বসে থাকার মতো যথেষ্ট সময় তার নেই। কেননা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাকে এত খাটতে হত যে তার পর আর-কোনো ব্যাপারে মেতে ওঠাব মতো উৎসাহ থাকত না।

কিন্তু খুব বেশিদিন চারপাশের জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা গেল না। মাঘ মাসের এক শীতল দুপুরে মাঠে-মাঠে ফেলে-যাওয়া শস্যের দানা কুড়োচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ বুড়ো বৈকুণ্ঠ সাহা তাব সামনে এসে দঁড়াল।

রাজেক শুধিয়েছিল, 'আমারে কিছু কইবেন সা-মশয়?'

'হ—' বৈকুণ্ঠ সাহা মাথা নেড়েছিল।

'কন।'

'আমরা তো গেরাম ছাইড়া চললাম—'

'কই চললেন?'

'কইলকাতা।'

'ফিরবেন কবে?'

'ফিরনের ঠিক নাই।'

রাজেক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

বৈকুণ্ঠ সাহা আবার বলেছিল, 'তর লগে একখান কামের কথা আছে।'

'কী?'

'আমরা কইলকাতা গেলে আমাগো ঘরদুয়ার জমিন-পুকৈর সগল তুই দেখবি। এমনে এমনে দেখতে কই না, ধান-পাট যা হয় সব তুই পাবি। যদি কুনোদিন ফিরি তখন বাড়িঘর ফিরাইয়া দিস। না-ফিরলে বেবাক তরই হইয়া যাইব।'

বৈকুণ্ঠ সাহারা সত্যিই চলে গেল। তার বিপুল সম্পত্তি, বিশাল ঐশ্বর্য এসে পড়ল রাজেকের হাতে। আট মাস ধরে জীবনধারণের জন্য জলে-স্থলে আর উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হচ্ছে না তাকে। এ-ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিন্ত। আরামে আর সুখে থেকে পায়ের হাজা, নখের কুটি-টুনি সেরে গেছে রাজেকের। খই-ওড়া চামড়ায় চকচকে মসৃণতা এসেছে, মাথায় ঢেউখেলানো টেরি দেখা দিয়েছে। মেজাজটিও হয়ে উঠেছে শৌখিন। আজকাল সিল্কের লুঙ্গি, জালি গেঞ্জি, কলিদার পাঞ্জাবি ছাড়া চলে না। গন্ধতেলটি না-হলে মন খুঁত-খুঁত করে।

ইদানীং সব সময় রাজেকের মনে হয়, ভাগ্যে দেশখানা দু-ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল! না-হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত।

দিনগুলো ভালোই কাটছিল কিন্তু ছিপতিপুর গ্রামে এত মানুষ থাকতে আজ তোরাব আলি কেন যে বেছে-বেছে হঠাৎ তার কাছেই আসতে গেল! শুধু আসা না, দাওয়াতও করে গেল। লোকটার মনে কী আছে, কে জানে।

তোরাব আলি নেমন্তন্ন করে গেছে। না-গেলেও নয়, আবার যেতেও ভরসা হয় না। পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে-বসে ভাবল রাজেক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার-বার তোরাব আলির উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময় চানটান সেরে, রঙচঙে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটি পরে কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

ছিপতিপুর গ্রামের শেষ মাথায় একটা দ্বীপের মতো জায়গায় তোরাব আলির বাড়ি। যেমন-তেমন বাড়ি না, রীতিমতো পাকা দালান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা, অসংখ্য ঘর। মানুষজনও প্রচুর।

ধানবন ঠেলে রাজেক যখন সেখানে পৌঁছল, আশ্বিনের বেলা অনেকখানি হেলে গেছে। রোদে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে না-ভিড়তেই তোরাব আলি ছুটে এল। সমাদরের গলায় বলল, 'আইছ মেঞা! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি ভুইলাই গেছ—'

উত্তর দেবে কি, রাজেক স্তম্ভিত। এই সেদিনও অবজ্ঞার সুরে তাকে 'তুই' বলত তোরাব আলি, সম্ভাষণের ভাষাটা ছিল 'রাজেইকা'। বেশি দূর পিছিয়ে যেতে হবে কেন, কালও তাকে 'তুই-তোকারি' করে এসেছে তোরাব আলি। রাতারাতি হঠাৎ এমন কী

ঘটে গেল যাতে সে অত সম্মানিত হয়ে উঠেছে! 'তুই' থেকে 'তুমি', 'রাজেইকা' থেকে 'মেঞা'—এতখানি বিস্ময় রাজেক সহ্য করতে পারছে না।

তোরাব আলি বলল, 'আসো—আসো—'

নিঃশব্দে নৌকো থেকে পাড়ে নামল রাজেক। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে তোরাব আলি বলতে লাগল, 'এত দেরি হইল ক্যান?'

জড়ানো গলায় রাজেক কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার একবর্ণও বোঝা গেল না।

তোরাব আলি বলল, 'আরেট্টু দেখতাম। হের পরও যদি না আইতা, তোমার বাড়িৎ লোক পাঠাইতাম।'

অনেক কষ্টে স্বরটাকে গলার ভেতব থেকে এবার মুক্ত করে আনল রাজেক, 'আপনে কাইল কইয়া আইলেন। না আইসা কি পারি, ঘেটিতে আমার কয়টা মাথা?'

তোবাব আলি কিছু না-বলে হাসল।

বাড়ির ভেতরে এনে ধবধবে ফবাশের ওপব খুব যত্ন করে রাজেককে বসানো হলো। তক্ষুনি সববৎ এল, পান-তামাক এল। বাড়িব যত বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে বাজেককে ঘিবে বসল। বাচ্চাগুলো দবজাব সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

রাজেক ঘামতে শুরু করেছিল। আটমাস আগেও যে সে এ-বাড়িতে কামলা খেটেছে, মাঠ থেকে ধান কেটে এনেছে, পাট 'জাগ' দিয়েছে—এই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তোরাব আলিরা কিন্তু সে-সব ভুলে গেছে। অন্তত তাদের আদরযত্ন এবং খাতিরের ঘটা দেখে তাই মনে হয়। সে যেন এ-বাড়ির অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি।

তোরাব আলি বলল, 'খাও মেঞা, সরবৎ খাও। রান্ধনের দেরি আছে। দুই-একখান পদ অখনও বাকি।'

বাড়ির অন্য লোকেরাও সায় দিল, 'হ-হ, খাও—'

কাঁপা-কাঁপা হাতে সরবতের গেলাস তুলে নিল রাজেক।

সববতের পর তামাক সাজা হল। তোরাব আলি হুঁকোয় দুচারটে টান দিয়ে রাজেকের দিকে এগিয়ে দিল।

সংকোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল রাজেক। দু-হাত এবং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না, না-না—'

তোরাব আলি হুঁকোটা প্রায় তার হাতে গুঁজেই দিল, 'আরে মেঞা, ধরো-ধরো। মাইয়া মাইনষের লাখান অত শরম ক্যান?'

মুখ নিচু করে আবছা গলায় রাজেক বলল, 'আপনের সুমখে নিশা করুম! না-না—'

'আমার সুমখে বইলা কী? খাও-খাও—'

অনেক বলার পর তোরাব আলির দিকে পেছন ফিরে বার কয়েক দ্রুত হুঁকো টানল

রাজেক। তারপর কাছে যাকে পেল তাব হাতে হুঁকোটা দিয়ে আবার ঘুরে বসল।

সরবৎ আর তামাকের পর গল্প শুরু হল। দেশভাগের গল্প, গ্রামে ভাঙন লাগার গল্প। ধান-পাট. এবারের বর্ষা—কিছুই বাদ গেল না। তবে বেশির ভাগ কথাই হল বৈকুণ্ঠ সাহা আর তার বিষয়-আশয় নিয়ে।

কথায় কথায় বেলা আরো হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা যখন অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় ভেতরবাড়ি থেকে খবর এল রান্না-বান্না শেষ।

তোবাব আলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, বেইল যায়। তোমাব বড়ো কষ্ট হইল মেঞা।'

বাজেক বলল, 'না, কষ্ট কীসের!'

'লও-লও, খাইতে যাইবা।'

খাবাব ব্যবস্থা ভেতর-বাড়িতে। তোরাব আলি আয়োজনও করেছে প্রচুর। পাঁচ-ছ রকমের মাছ, মাংস, পায়েস, পাতক্ষীর, বড়ো-বড়ো মোহনবাঁশি কলা, পুরু সরওলা হলুদবর্ণ ঘন দুধ।

একা বাজেক না, তার সঙ্গে তোরাব আলি এবং এ-বাড়ির বর্ষীয়ান ক'টি মানুষও খেতে বসল। খেতে-খেতে আবার বৈকুণ্ঠ সাহাদের কথা উঠল, তাদেব ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হলো।

রাজেক অবশ্য বিশেষ কথা বলছিল না। সে এত বিস্মিত এত স্তম্ভিত হয়ে আছে যে তোরাব আলির প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে এক-আধটা 'হুঁ'-'হ্যাঁ'ব বেশি তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না।

মাথা নিচু করেই খাচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ তোরাব আলির এক বুড়ো চাচার কথায় মুখ তুলে পাশেব দিকে তাকাতে গিয়েই ওধারের এক জানলায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কামরন দাঁড়িয়ে আছে। তোরাব আলির মেয়ে কামরন। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, দীঘল টান দেওয়া নাক-চোখ-চিবুক। মুখখানা পানপাতার মতো। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক-থাক কোঁচকানো চুল, ফুরফুরে পাৎলা ঠোঁট। পরস্তাবে সেই-যে গুলেবাখালি রাজকন্যার কথা আছে, কামরন যেন তাই।

মেয়েটা খুব সম্ভব একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ মধুর হেসে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কামরনকে অবশ্যই এই প্রথম দেখল না রাজেক। কামলা খাটতে এসে কতবার দেখেছে। কী দেমাক ঐ মেয়ের। রূপের দেমাক, বড়োমানুষির দেমাক। দুনিয়াখানাকে যেন পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। মানুষকে মানুষ বলেই সে ভাবত না।

সেই কামরন যে এমন হাসতে পারে, তা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরের ফরাশে এসে বসতে-না-বসতেই সন্ধে নেমে গেল। রাজেক বলল, 'অখন আমি যাই।'

তোরাব আলি আর তাকে আটকাল না, 'আইচ্ছা যাও, আবার আইসো।' ঘাট পর্যন্ত

গিয়ে রাজেককে নৌকোয় তুলে দিয়ে এল সে।

যতদূর চোখ যায় এখন গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত চরাচর জুড়ে লক্ষ-লক্ষ জোনাকি জ্বলছে। আশ্বিনের এলোমেলো ঝিরঝিবে হাওয়া ছুটছে দিগ্বিদিকে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে যেতে-যেতে রাজেক সেই পুবোনো কথাটাই ভাবছিল। তোরাব আলির এত খাতির, এত সমাদর—এ-সবেব উদ্দেশ্য কী? এগুলো ফাঁদ নয় তো? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার জমিজমা বাড়িঘব সে গ্রাস কবতে চায় কী?

...

সেই যে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হলো, কার্তিকেব শেষাশেষি পর্যন্ত একটানা তাব জেব চলল। দু-চারিদন পব পবই একটা-না একটা উপলক্ষে তোবাব আলির বাড়ি যেতে হযেছে বাজেককে। প্রথম দিনেব মতোই প্রতিবাব সেখানে আদর যত্ন-খাতিব মিলেছে।

একটা ব্যাপাব লক্ষ কবেছে বাজেক, ইদানীং কামরন তার সামনে আসে না। খেতে বসে কিংবা গল্প করতে করতে জানলার ফাঁকে চকিতেব জন্য এক-আধবাব তাকে দেখা যায়। অথচ আট-দশ মাস আগেও বাড়িতে যখন সে কামলা খাটতে আসত, সর্বাঙ্গে রূপ আব গর্বের ঝিলিক দিয়ে গববিনী মেযেটা তাদেব সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই কামরনের এ-জাতীয় আচরণের কোনো কাবণ খুঁজে পায় না রাজেক। ভেবে-ভেবে কূলকিনারা চোখে পড়ে না তাব।

শেষ পর্যন্ত রহস্যটা পবিষ্কার হলো। অঘ্রান মাসের গোড়ায় একদিন সকালবেলা তোরাব আলি রাজেকের কাছে এল, 'তোমাব লগে কামেব কথা আছে মিঞা—'

এতদিন বাড়িতে নিযে গিযে শুধু নেমন্তন্নই খাইয়েছে তোরাব আলি আব প্রচুর খাতির-যত্ন করেছে। এলোমেলো গল্প ছাড়া বিশেষ কোনো কথা বলেনি। তবে সে যে বলবে, নিদারুণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুবে, তা আন্দাজ করতে পারছিল বাজেক। সেজন্য বাজেকের ঘুম নেই, একটা ধারালো কাঁটা বুকের ভেতর সবসময য যেন আড় হয়ে বিঁধে আছে।

তোবাব আলিব কাজের কথাটা কী, কে বলবে। নিশ্বাস বন্ধ করে রাজেক তাকিযে থাকল। তোরাব আলি বলল, 'আমাব মাইয়া কামরনরে দেখছ তো?'

লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে না-পেরে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল রাজেক, 'হ—'

'আমার ইচ্ছা, কামরনের লগে তোমার শাদি দিমু—'

ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজেক, 'এ আপনে কী কন বড়ো মিঞা—'

তোরাব আলি শুধোলো 'ক্যান, কী কই?'

'আপনে কত বড়ো মানুষ, কত বড়ো ঘর আপনেগো। আপনের কাছে হেই দিনও কামলা খাইটা গেছি। হেই মাইনষের মাইয়ারে শাদি! না-না—'

'কামলা খাটার কথা ভুইলা যাও, মেঞা। আর বড়ো মানুষ, বড়ো ঘরের কথা যখন

তুললা তখন কই তুমিও ছোটো না। বৈকুণ্ঠ সার অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল-হালুটি পাইছ। তুমি কম কীসে? জাতে উইঠা গেছ, মেঞা—।'

দ্বিধান্বিত সুরে রাজেক বলল, 'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'আমার লগে মাইয়ার শাদি দিলে মাইনষে আপনেরে কী কইব?'

'কোন হালায় কিছু কইব না। সুমখা-সুমখি কওনের সাহস কারো নাই। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'আমার দেখতে হইব মাইয়া কোনখানে বেশি সুখে থাকব। তুমি ছাড়া আর কোন হালার নব্বই কানি জমিজেরাত আছে, এমুন সোন্দর ঘরদুয়ার আছে? লোক না পোক। মাইনষের কথায় আমি কান দেই না।'

এ একেবারে আশাতীত, অকল্পনীয়। জামাই করবে বলেই তবে তোরাব আলির এত ছোটাছুটি, এত সমাদর, এত মেজবান খাওয়াবার ঘটা। সুখের নদীতে ভাসতে-ভাসতে রাজেক বলল, 'তাহলে আমি আর কী কমু, আপনে যা ভালো বোঝেন—'

একটু ভেবে তোরাব আলি বলল, 'ভাবছি, ধান-টান উইঠা গেলে তোমাগো শাদিটা সারুম—'

রাজেক উত্তর দিল না, মুখ নিচু করে বসে থাকল।

তোরাব আলি আবার বলল, 'তাইলে ঐ কথাই রইল। অখন আমি যাই—'

তোরাব আলি চলে যাবার পরও উঠল না রাজেক। বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখান দু-ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নইলে এত সুখ কি তার কপালে ছিল!

...

অঘ্রানের মাঝামাঝি ধান কাটার মরশুম শুরু হলো। মাঠ থেকে ধান তুলে এনে সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে, ডোলের ভেতর সেঁতে রাখতে-রাখতে মাঘ মাস পেরিয়ে গেল। তারপর আবার এল তোরাব আলি। বলল, 'ফসল-টসল তো উঠল, এবার মোল্লামুচ্ছুল্লিগো খবর দেই—'

নখ খুঁটতে-খুঁটতে রাজেক বলল, 'আপনের যা ইচ্ছা—'

খানিক-চিন্তা করে তোরাব আলি বলল, 'আইজ কী বার?'

'বুদ—'

'শনিবার দুফারে নাও পাঠাইয়া দিমু, তুমি আমাগো বাড়িত যাইও মোল্লামুচ্ছুল্লিগো খবর দিয়া রাখুম, তারাও আইব। হেইদিন শাদির কথা, দেনমোহরের কথা পাকা হইব।'

রাজেক বলল, 'নাও পাঠাইতে হইব না, আমি এমনেই যামু গা—'

তোরাব আলি শুনল না। জোরে-জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'এট্টা ভালো

কামে যাইবা, নাও না-পাঠাইলে হয়। তোমার সোম্মান নাই?

...

বুধবার তোরাব আলি চলে যাবার পর দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শিরায়-শিরায় সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে থাকল রাজেক।

তবু একে-একে বেস্পতি গেল, শুক্র গেল। শনিবার সকাল থেকে সময় যেন একেবারে থেমেই গেছে। সূর্যটা অন্যদিনের চাইতে অনেক দেরি করেই বুঝি আজ উঠেছে, আর চলছে দ্যাখো না। এক ঘণ্টার রাস্তা পাড়ি দিতে আজ দশ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে তার!

রাজেক ঘুরছে ফিরছে আর দূর মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে কতবার যে পুকুরের ওধারের মাঠটার দিকে তাকিয়েছে তার হিশাব নেই।

এই ফাল্গুনে মাঠে অবশ্য জল নেই। কিন্তু তার পাশ দিয়ে একটা বড়ো খাল আছে, খালটা সোজা এসে বৈকুণ্ঠ সাহার পুকুরে থেমেছে। তোরাব আলির নৌকো ঐ খাল দিয়েই আসবে।

যত ধীরেই যাক, একসময় দুপুর হলো। আর তখনই অনেক দূরে নৌকোর গোল ছই চোখে পড়ল রাজেকের। সঙ্গে-সঙ্গে দোতারায় এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর ঝড় বইতে লাগল তার। এটা যেন সাধারণ দু-মাল্লাই নৌকো না, পরস্তাবের মনোহারিণী রাজকন্যা তার জন্য একখানা ময়ূরপঙ্খিই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দেখতে-দেখতে নৌকোটা পুকুরঘাটে এসে ভিড়ল। পলকহীন তাকিয়েছিল রাজেক। ভাবছিল ঘাটে যাবে কিনা।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই নৌকো থেকে যে নামল, এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে কেন, দু-তিন মাসের ভেতর তার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি রাজেক। সে চমকে উঠল, সামনে বাজ পড়লেও মানুষ এত চমকায় না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো শিরশিরিয়ে কী যেন বয়ে গেল তার।

একা বৈকুণ্ঠ সাহাই না, তার সঙ্গে আর একজনও নেমেছে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা-টেহারা দেখে মুসলমান বলেই মনে হয়। বয়েস ষাটের কাছাকাছি।

পুকুরঘাট থেকে সঙ্গীকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেককে দেখে ভারি খুশি সে। বলল, 'ভালোই হইল রাজেক, বাড়িতে পা-ও দিয়াই তরে পাইয়া গেলাম। ভাবছিলাম, পামু না। তা আছস কেমুন? শরীলগতিক ভালো তো?'

বাজ-পড়া অসাড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। কোনোরকমে বলতে পারল, 'আপনে সা-মশয়!'

বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'হ, আমিই। তরে খবর দিয়া আইতে পারি নাই। হঠাৎ সুযুগ হইল. আইসা পড়লাম।'

অ্যাদ্দিন আছিলেন কই?'

'মেলা জায়গায়। কইলকাতা, বনগাঁ, দত্তপুকৈর—কতখানের নাম কমু? শ্যাষম্যাষ

মুর্শিদাবাদে থিতু হইছি।' বলতে-বলতে সঙ্গী সম্বন্ধে সচেতন হলো বৈকুণ্ঠ সাহা। তার উদ্দেশে বলল, 'বসেন-বসেন, আমিন সাহেব। দে রে রাজেক, একখান জলচৌকি বাইর কইরা দে। তামুক-টামুক থাকলে সাজ—'

জলচৌকি এলে আমিন সাহেব বসল। বৈকুণ্ঠ সাহাও বারান্দার একধারে বসল। তারপর গল্প-টল্প শুরু হল। দেশের হালচাল, গ্রামে কারা-কারা আছে, কারা-কারা গেছে —ইত্যাদি-ইত্যাদি নানা কথা। বৈকুণ্ঠ সাহাই একতরফা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। রাজেক মনে-মনে অবসন্ন বোধ করছিল, নির্জীব গলায় উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

এলোমেলো অনেক রকম কথার পর আসল কথা পাড়ল বৈকুণ্ঠ সাহা, 'তারপর ঘর-দুয়ার ভালো কইরা রাখছস তো?'

এতকাল পরে হঠাৎ কেন বৈকুণ্ঠ সাহা গ্রামে ফিরে এল, বোঝা যাচ্ছে না। আর এল এমন দিনে যেদিন শাদির কথা পাকা হবে। অন্যমনস্কের মতো রাজেক বলল, 'দ্যাখেন না, কেমুন কইরা রাখছি—'

বৈকুণ্ঠ সাহা তক্ষুনি উঠে পড়ল। আমিন সাহেবকে ডেকে বলল, 'আসেন, আসেন। নায়ে কইরা আসনের সময় আমার জমিন দেখাইছিলাম। অখন আমার বাড়িঘর দ্যাখেন—'

ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমিন সাহেবকে চারিদিক দেখাতে লাগল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেক কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না, আকণ্ঠ দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার।

বৈকুণ্ঠ সাহা এতদিন পর বউ-ছেলে-মেয়ে, সংসারের কাউকে নিয়েই আসেনি সত্যি কিন্তু আমিন সাহেবকে সঙ্গে এনেছে। আমিন সাহেব এদিককার লোক না। হলে রাজেক নিশ্চয়ই চিনতে পারত। এই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পর্ক কী? আসবার সময় তাকে ধান-জমি দেখিয়েছে বৈকুণ্ঠ, এখন বাড়ি-ঘর দেখাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই রাজেকের কাছে রহস্যময় লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমিন সাহেবরা ফিরে এল। দাওয়ায় বসতে বসতে বৈকুণ্ঠ শুধলো, 'বাড়িঘর কেমুন দেখলেন?'

আমিন সাহেব বলল, 'ভালো।'

'পছন্দ হইছে তো?'

'হ্যাঁ।'

আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠ সাহার। তাড়াতাড়ি রাজেকের দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, তর লগে তো আমিন সাহেবের আলাপ-সালাপই কইরা দেই নাই। উনি মুর্শিদাবাদের মানুষ, আমার বন্ধু।' আমিন সাহেবকে বলল, 'আর ও হইল রাজেক মেঞা, বড়ো বিশ্বাসী মানুষ। আমরা যখন দ্যাশ ছাইড়া যাই অর উপর বাড়িঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম। দ্যাখেন কেমুন সোন্দর পরি দিয়া রাখছে।'

আমিন সাহেব কিছু বলল না, মাথা নাড়ল শুধু।

আলাপ-পরিচয়ের পর বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'বুঝলি রাজেক, দ্যাশে আমরা আর ফিরুম না। হেইর লেইগা আমিন সাহেবরে লইয়া আইলাম। ক্যান আনছি বুঝছস?'

রাজেক মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বোঝেনি।

চারিদিক ভালো করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় এবার বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'আমার হগল সম্পত্তি আমিন সাহেবরে দানপত্তর কইরা দিমু। আসলে ব্যাপারটা কী জানস?'

'কী?'

'আমিন সাহেব ইণ্ডিয়ায় থাকব না। মুর্শিদাবাদে তেনার ঘরদুয়ার খ্যাত-খামার যা আছে, আমারে দানপত্তর কইরা দিব। পাকিস্তানে আমার যা আছে, তেনারে দিমু। ব্যাপারটা অইল 'এচ্চেঞ্জ', বাঙলায় কয় বিনিময়—'

রাজেক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেইসময় তোরাব আলির দুই মাঝি এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'লন মেঞাসাব, তরাতরি লন। আমাগো আইতে এট্টু দেরি হইয়া গেল—'

আমিন সাহেবকে সব সম্পত্তির দানপত্তর করে দেবে বৈকুণ্ঠ সাহা। এ-কথা শুনবার পরও তোরাব আলির বাড়ি যাবার আর প্রয়োজন আছে কিনা, রাজেক বুঝতে পারছে না। মোট কথা, গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না সে।

এদিকে মাঝি দুটো সমানে তাগাদা দিতে শুরু করেছে। হঠাৎ তোরাব আলির সহৃদয় ব্যবহারের কথা মনে পড়ল রাজেকের। খাতির-যত্নের কথা মনে পড়ল। রাজেক ভাবল, শাদির ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে এখন আর না-ও পিছোতে পারে তোরাব আলি।

একরকম ঘোরের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল রাজেক। বৈকুণ্ঠ সাহাদের বলল, 'আপনেরা এট্টু বসেন সা-মশয়। আমি এট্টু ঘুইরা আসি—' বলে মাঝি দুটোর সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল।

তোরাব আলির বাড়ি আসতেই দেখা গেল বার-বাড়ির আসর একেবারে জমজমাট। মোল্লামুছুল্লিরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে! সর্দারদের বাড়ি থেকে, খাঁয়েদের বাড়ি থেকে, মৃধাদের বাড়ি থেকে—ছিপতিপুর গ্রামের হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে মান্যগণ্য লোকেরা এসে হাজির হয়নি।

রাজেক ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। পিচকিরি দিয়ে প্রচুর গোলাপজল ছিটোনো হলো। পান এল, তামাক এল, ভুরভুরে আতর এল। ফাঁকে-ফাঁকে ঠাট্টা-ঠিশারা চলল। রঙের কথায় রসের কথায় হাসি উথলে-উথলে উঠতে লাগল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না রাজেক, দেখতে পাচ্ছিল না। নির্জীবের মতো বিহ্বলের মতো বসে ছিল সে।

তোরাব আলি রাজেককে লক্ষ করেছিল। মেজাজখানা আজ তার খুব ভালো। মনে গোলাপি আভা লেগেছে। ভাবী জামাইকে একটু ঠাট্টা করার লোভ কিছুতেই সে সামলাতে

পারল না। রাজেকের কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, 'আইজের দিনে এমুন মনমবা ক্যান, মেওা? ব্যাপারখান কী?'

ফশ করে নিজের অজান্তেই রাজেক বলে ফেলল, 'আইজ বৈকুণ্ঠ সা আইছে।'

তোরাব আলি চকিত হয়ে উঠল, 'বৈকুণ্ঠ সা আইছে!'

'হ। লগে আমিন সাহেব বইলা একজনেরে আনছে। তাকে নিকি জমিন-জিবাত বাড়িঘর লেইখা দিয়া যাইব।'

মুহূর্তে সমস্ত ঘরখানায় স্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর তোরাব আলি বলল, 'তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালোর লেইগাই করে। ভাগ্যে আইজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে—' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল এবং বড়ো-বড়ো পা ফেলে ভেতব বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পর একে-একে মোল্লামুছুল্লিরা, গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা চলে গেল। ফাঁকা ঘবে একা-একা অনেকক্ষণ বসে থেকে একসময় বাইরে চলে এল রাজেক।

তাবপর দিন যায়, দিন আসে।

আবার পলো নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, টোন সুতোর বঁড়শি নিয়ে খালে-বিলে-নদীতে নামল বাজেক, আবাব হেমন্তের মাঠে শস্য কুড়োতে শুরু কবল। দেখতে-দেখতে তার পা ফেটে গেল, আঙুলেব ফাঁকে থকথকে হাজা হলো, চামড়া থেকে খই উড়তে শুরু কবল।

মাছ আব শস্যকণাব সন্ধানে ঘুরতে-ঘুরতে আজকাল বাজেক নিজেকে শুনিযে শুনিয়ে আপন মনে বলে, 'দেশখানা দু-ভাগ হয়, সাহার-ভূঁইমালিরা-জুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশেব এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?'

# মাঝি

## প্রফুল্ল রায়

দু-পাশে ঘন সবুজ জলঘাস, তার মাঝখান দিয়ে মেঘমতী রাজকন্যার সিঁথির মতো ঋজু রেখায় রয়নাবিবির খালটা সামনের ধলেশ্বরীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই খালটা যেখানে নারকেল আর সুপারি গাছের মর্মরিত কুঞ্জে আশ্বিনের প্রসন্ন সকালে ঝলমলিয়ে ওঠে, ঠিক সেইখানেই আবছা ভোরেই একমাল্লাই কেরায়া নৌকাটা এনে ভিড়িয়েছিল ফজল। তার অস্থির দৃষ্টিটা একবার পাড়ের করমচা ঝোপের আড়াল দিয়ে সুপারি বনের মধ্য দিয়ে সামনের কাঁচা বাঁশের চৌচালা ঘরখানার চারপাশ দিয়ে এক নিমেষে চক্রাকারে ঘুরে এসেছিল। কিন্তু নাঃ, সলিমা হয়তো ভুলেই গেছে কাল সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতির কথা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল ফজল। তারপর কাঁঠাল কাঠের বৈঠাখানা হাতে তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সিরাজদীঘার হাটে যেতে না-পারলে অন্য মাঝিরা সব সওয়ারি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে।

নৌকাটা ছেড়েই দিত ফজল, সেই সময় রয়নাবিবির খালের একটা উচ্ছল ঢেউ কলশব্দে এসে ভেঙে পড়েছিল কানের ওপর। একটা দীঘল নারকেল গাছের পাশ থেকে জলতরঙ্গের বাজনার মতো খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল সলিমা।

ফজল তাকায়নি, পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল। সলিমার এত দেরি হওয়ার জন্য তার মুখে অভিমানের মেঘ ঘন হয়ে নেমে এসেছিল।

এদিকে একেবারে নৌকার গলুইয়ের কাছে এসে পড়েছে সলিমা। তার চোখের নীলাভ মণিদুটিতে সকালের প্রথম আলো টলমল করে উঠেছিল। নিটোল নরম সজীব ভুঁইচাপার মতো সুদেহিনী সলিমা। কিন্তু জিভের ডগায় কৌতুকের তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ তার, 'ইশ, গোসা হলি নিকি আবার। রঙ্গ দেইখা শরীল আমার জ্বইলা যায় মরিচের লাখান।'

ফজল নির্বাক।

সলিমা আবার বলেছিল, 'কী হইল, মুখ ফিরা—'

ফজল মুখ ফেরায়নি। আগের মতোই নিশ্চুপ বসে ছিল।

এবার গাঢ় স্বরে সলিমা বলেছিল, 'অমুন মুখ ঘুরাইয়া বইসা থাকলে আমার কিন্তুক ভালো লাগে না। হুধাহুধি গোসা হইলেই হয় নিকি। বাজানের চৌখে ধুলা দিয়া তর কাছে আইতে হয়। হে যে কত কষ্ট তুই তো জানস। দিনরাইত আমারে আগলাইয়া রাখে। ঘুম থিকা উইঠা এতক্ষণ উঠানে বইয়া তামুক খাইতে আছিল বাজানে। এট্টু আগে জমিনে গেছে, হেই ফাঁকে তর কাছে আইছি।'

এবার মুখ ফিরিয়েছিল ফজল। সলিমার দেরি হওয়ার যুক্তিসংগত একটা কৈফিয়ৎ পেয়ে তার কাঁচা আনাজের মতো মুখখানা থেকে অভিমানের মেঘ উড়ে গিয়েছিল। সে

বলেছিল, 'বাজানের লগে আর বেশিদিন লুকাচুরি খেলতে অইব না। দুই-চাইর দিনেব ভিতরেই হগল ব্যবস্থা কইরা ফেলাইতে আছি। ছয় কুড়ি দশ ট্যাকা অইছে। আর দশটা ট্যাকা অইলেই সাত কুড়ি পুরাইয়া যাইব। আইজের দিন কেবায়া বাইলেই দশটা ট্যাকা পাইয়া যামু। হিন্দুবা দ্যাশ ভিটামাটি ছাইড়া যাইতে আছে, কেবাযা পাইয়া যামুই। হেয়ার পর সাত কুড়ি ট্যাকা তব বাজানের হাতে দিয়া আমার ঘরে নিয়া আহুম তবে। আইচ্ছা, অহন আমি যাই।'

সলিমা বলেছিল, 'না-না, অহনই তর যাওন অইব না। এত কষ্ট কইরা আইলাম। দুই দণ্ড যদি এট্টু কথা না-কই—' ছায়া নেমে এসেছিল সলিমার মুখে।

ফজল বলেছিল, 'তব বাজানে যা চামার, সাত কুড়ি ট্যাকা নিব গইন্যা-গইন্যা, হেয়ার পব মাইয়া দিব। যাই অহন, সন্ধ্যার সময় আবার আহিস।'

'তবে যা। ঠিক সন্ধ্যার সময় আহুম। আবার দেরি কবিস না য্যান।'

'না-না, দেরি করুম না।'

একটুক্ষণ কী ভেবে সলিমা বলেছিল, 'একখানা কথা—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ফজল।

'কাইল রাইতে নবীপুরেব কাশিমালি ট্যাকা লইয়া বাজানেব কাছে আইছিল। আমারে শাদি করতে চায় শয়তানটা। আমি তারে কাইন্দা খেদাইছি। এর আগে আইছিল বাসাইলের আইবুদ্দি, তাব আগে গিরিগঞ্জের হবিব মিঞা। হগলেরে ভাগাইছি। কিন্তুক বেশিদিন আর পারুম না। বাজানেবে তো চিনস। ট্যাকা হাতে লইয়া কুনদিন আমারে কার লগে যে গাইথা দিব। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'একা-একা আমার আর ভালো লাগে না। পরান জানি কেমুন করে।'

সকৌতুকে ফজল বলেছিল, 'কেমুন করে? আসমানের পঙ্খি হইয়া উইড়া যাইতে চায়?'

সলিমা লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, 'জানি না, যা।'

সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বলেনি ফজল। অনেকক্ষণ কী যেন ভেবে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল, 'ডর নাই, কাশিমালি সিকিমালি—কারো সাইধ্য নাই তরে আমার কাছ থিকা ছিনাইয়া নিতে পারে। কাইলই তর বাজানের পাওনা আমি মিটাইয়া দিমু। অহন যাই।' বলে আর অপেক্ষা করেনি সে। বৈঠার ধাক্কায় নৌকাটাকে রয়নাবিবির খালের মাঝখানে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর নৌকা বাইতে-বাইতে একখানা ভাটিয়ালি গলায় তুলে নিয়েছিল:

যোলো বছরের তাজা মাইয়া
সতেরে দিছে পাড়া,
আঁখির মইধ্যে রাখছে বাইন্ধা
পরভাতিয়া তারা।

প্রভাতিয়া তাবার স্বপ্ন-ধরে রাখা চোখেব মেয়ে তার যৌবন-বন্দনা শুনতে শুনতে সেই সুন্দব সকালে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর খালের নীলচে রেখাটা ধরে অনেক দূরে ধূ-ধূ একটা বিন্দুব মতো মিলিয়ে গিয়েছিল ফজলেব নৌকাটা আর তার গলার আচ্ছন্ন সুর।

...

এখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। সিরাজদীঘার কেবায়া ঘাটে নৌকোগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে।

হাটের চালাব তলায ভিন-গেবামি দোকানিদেব কোবোসিনেব কুপিতে এই অন্ধকাবে লাল-লাল শিখা ফুটে উঠেছে অজস্র। দূবেব কোনো একটা মহাজনী নৌকো থেকে মাঝির গলায নামাজ পড়ার শান্ত গম্ভীব আওয়াজ ভেসে আসছে।

শেষ সওয়াবিব খেপ দিয়ে এইমাত্র ফজলের একমাল্লাই কেরায়া নৌকাটা এসে ভিড়ল নদীব ঘাটে। সারাদিন সওয়াবি পাবাপাব কবে আজ মোট সাতটা টাকা মিলেছে। লগিটা পাবের মাটিতে শক্ত করে পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধল ফজল। তাবপব কেবোসিনেব ডিবে জ্বালিযে কোমবের গোপন গেঁজেটা বার কবে কাঁচা টাকাগুলো একটা-একটা করে গুনে নিল। মোট ছ-কুড়ি সতেব টাকা। সাত-কুড়ি পূর্ণ হতে এখনও তিনটে টাকা বাকি। আশা ছিল, আজই সাত-কুড়ি পূর্ণ হবে। নাঃ, আরও একটা দিন লাগবে, দেখা যাচ্ছে।

হিন্দুরা সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বেবাজিযাদেব মতো চলে যাচ্ছে কলকাতাব দিকে। একটা কেরায়া মিললে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া আজকাল আশ্চর্য কিছু না। আর তা কালকের দিনের মধ্যে মিলবেও। এ-বিশ্বাস ফজলেব আছে। সকালবেলা সলিমাকে বলে এসেছিল, কালই তার বাপের সাত-কুড়ি টাকার খাঁই মিটিয়ে আসবে। নাঃ, কাল আর সম্ভব হবে না। একেবারে পরশুই যাবে সে। সলিমার বাজানের বুনো খাটাশেব মতো মুখটাব ওপর হাতের সমস্ত শক্তিতে একশো চল্লিশটা কাঁচা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে নিজের ঘরে আনার সব ব্যবস্থা পাকা করে আসবে।

দিন কযেক আগে সলিমার বাজান শকুনেব মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সলিমারে শাদি কবতে চাও। সাত-কুড়ি ট্যাকা ডাইন হাতে দিযা বাঁ হাতে মাইয়ারে নিয়া যাইও। আর এট্টা কথা মনে রাইখো। শাদির হগল খরচ তুমার।'

বিরস স্ববে ফজল বলেছিল, 'আমার কাছে চাইর কুড়ি ট্যাকা আছে। অহন তা-ই দেই। শাদির পর বাকি ট্যাকা দিয়া যামু। খোদার কসম।'

বাকি বকেয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন সলিমার বাজান। বাকি টাকা হলো আশমানের তারা। কখনই তা মুঠোয় এসে পৌঁছোয় না। অতএব নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিল, 'ধার-বাকি লইয়া আমার কারবার নাই, মিঞা। আমি নগদ লইয়া ব্যাপার করি।'

'বেশ, তাইলে আমারে এক মাসের সময় দ্যান। আমি ট্যাকার জোগাড় কইরা লই।'

'এইব ভিতরে আর কেও যদি ট্যাকা লইয়া আইয়া পড়ে তো আমি হেইখানেই মাইয়ার শাদিব ব্যবস্থা কইরা ফেলামু।'

সেইদিন আর জবাব দেয়নি ফজল। ধীরে-ধীরে সলিমার বাজানের কুৎসিত মুখখানাব সামনে থেকে উঠে খালেব কিনারে একমাল্লাই নৌকাটায চলে গিয়েছিল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করে হোক আর যত তাড়াতাড়ি হোক, টাকাটা সে জোগাড় করে ফেলবেই।

সেদিন থেকেই একটি-একটি করে টাকা জমিয়েছে সে। তার সমস্ত যৌবনের কামনাকে ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের মূল্যে কিনবার জন্য একাগ্র নিষ্ঠায় কেবায়া বেয়ে সওযারি পার করেছে। দেলভোগ, সাভার, বাসাইল, সোনাবঙ—জল-বাংলাব দিগদিগন্তে নৌকো ছুটিয়েছে অবিরাম। দিনরাত, পল-প্রহর, ক্লান্তি-অবসাদ—কোনো কিছুর হিশাব ছিল না এই ঝড়ের মতো দিনগুলিতে। সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য নিশ্ছেদ পবিশ্রম চালিয়ে গেছে ফজল। ঘরের ভেতরে সলিমার স্বপ্নকে নিবিড কবে পাবার জন্যই ঘরেব বাইরে এই ক্ষান্তি-বিহীন আযোজন।...যাই হোক, টাকাগুলো গুনে একটা-একটা করে আবাব গেঁজের মধ্যে ভবে নিল ফজল। তারপর কোমরে বেঁধে ফেলল। একটা টাকাও যাতে হারিযে না-যায, তাই শবীরে চামড়াব সঙ্গে তার স্পর্শ ধরে বেখেছে সে। এর মধ্য থেকে একটি টাকা নিয়ে বেহেস্তে কি দোজখে গেলেও কারু রেহাই নেই। নিশিরাত্তিরের অপযোনির মতো তার পিছু-পিছু ধাওয়া করে যাবে ফজল।

আব মাত্র তিনটি টাকা। তারপরেই সলিমাকে শাদি কবা যাবে। ভবিষ্যতের সেই মধুর স্বপ্নময দিনটিব কল্পনা করে মৃদু আচ্ছন্ন গলায় গান ধরল ফজল :

কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উম্মন
আর মদ খাইয়াছি আমার বন্ধুর
পেরথম যৈবন।
কেমুনে ভাঙুম আমি হেই
বধূয়ার মান—
চোখের পাতায় চুমা দিমু
ঠোঁটে সাচি পান।

গান-গাওয়া তন্ময়তার মধ্যে আচমকা সকালবেলার সেই প্রতিশ্রুতিব কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার সময় মর্মরিত নারকেল বনে সলিমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তার।

অতএব তাড়াতাড়ি উঠে 'পারা' তুলল ফজল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সওয়ারির গলা শোনা গেল, 'মাঝি, কেরায়া যাইবা নিকি? আরে কে? আমাগো ফজল মাঝি নিকি?'

পরিচিত স্বর। পেছনে ফিরে ফজল দেখল, জলের প্রায় কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে

মালখানগরের ইয়াছিন শিকদার। আর তার ঠিক পেছনেই বোরখা-ঢাকা এক নারীমূর্তি। খুব সম্ভব মিঞাসাহেবের বিবিজান।

কেরাযাঘাটের লাগোয়া লঞ্চঘাটা। একটা নিশ্চল জেটি সেখানে পড়ে রযেছে। এইমাত্র নারাযণগঞ্জ থেকে একটা লঞ্চ এসে জেটিটার গায়ে ভিড়ল, সার্চলাইটের তীব্র আলোয সমস্ত এলাকাটা ভরে গেছে। ফজল জিজ্ঞেস করল, 'কই যাইবেন, মিঞাছাব?'

'চর ইসমাইল।' ইয়াছিন বলল।

'অহন অতদূব যাইতে পারুম না। বাইত অইয়া গেল। কাইল হকালে আইযেন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ইয়াছিন। নৌকার গলুইটা চেপে ধরে বলল, 'বাইত কইবা কেউ যাইতে চায় না। আমার বড়ো ঠেকা। তুমি লও, খুশি কইবা দিমু।'

এবাবে মন দেবার চেষ্টা করল ফজল, 'কেবায়া কত দিবেন?'

'পাঁচ ট্যাকা।'

'পাঁচ ট্যাকা—ফুঃ। একখান কাথা দেই, বিবিজানেরে লইয়া হারা বাইত পইড়া ঘুমান ঐ হাটের চালায়। হকালে উইঠা হাতর দিয়া যাইয়েন গিয়া।'

হ্যাঁ, অনেকটা সময বাজে খবচ হয়ে গেছে। এতক্ষণে মর্মরিত নাবকেল বীথির আড়ালে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে-গুনতে রাত্রির সমস্তটুকু অন্ধকার নিশ্চয়ই ঘন হয়েছে সলিমার মুখে।

এদিকে গলুইটা আরো তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরল ইয়াছিন, 'সাত ট্যাকাই দিমু; আমারে আইজ যাইতেই অইব চর ইসমাইলে।'

ফজল বলল, 'সাত ট্যাকা আমারে দিবেন ক্যান? ঐ দিয়া আড়াই স্যার ত্যাল কিন্যা নাকে দিয়া পইড়া থাকেন। চর ইসমাইলে যাওনের কথা মনেও থাকব না। ছাড়েন ছাড়েন, নাও ছাড়েন—'

'তাইলে কত চাই তুমার?'

'দশ ট্যাকা দিতে অইব মিঞাছাব। একেবারে সাফা হিশাব।'

'দশ ট্যাকা!' আতঙ্কিত চিৎকারের সঙ্গে মহাপ্রাণীটাও যেন গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ইয়াছিনের, 'নাঃ, পাহিস্তান হওনের পর তুমরাই সাপের পাঁচ পাও দেখছ—'

খুব নির্লিপ্ত সুরে ফজল বলল, 'ঐ-ট্যাকাটা দিতে পারলে নায়ে ওঠেন, নাইলে গলুই ছাড়েন। আমার কাম আছে।'

চাপা গলায় গজগজ করে উঠল ইয়াছিন, 'মোচড় দিয়া ট্যাকা আদায় করো। ঠ্যাকায় পাইছ। কী আর করুম—দশ ট্যাকাই দিমু।'

প্রথম কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি ফজল। কিন্তু শেষের কথা কটা নির্ভুলভাবে তার কানে ঢুকেছে। ফজল বলল, 'এই তো মিঞাছাবের মরদের লাখান কথা বাইর

অইছে। বিবিজানেরে নিয়া নায়ের পাটাতনে ওঠেন।'

ফজলের কথা শেষ হতে না-হতেই ইয়াছিন শিকদার বোরখা-ঢাকা নারীমূর্তিব হাত ধরে একটা টান লাগাল। সঙ্গে-সঙ্গে চাপা অথচ তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে উঠল নারীমূর্তি, 'না-না আমি যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান। আপনের পায়ে পড়ি।'

চাপা গর্জন শোনা গেল ইয়াছিনের 'হারামজাদির সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাঞ্জা খাঁর নাতিনের লাখান। নাইলে গুয়াখোলার ঐ কেবামত ডাকুই তবে নিয়া যাইত। তার কীল খাওয়াব থিকা আমাব খোদ বেগম হওন কি ভালো না?'

এবাব মৃদু চিৎকারটি মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চমকে উঠল ইযাছিন। তারপর দুটো ভাবি কর্কশ হাত নারীমূর্তির মুখে ঠেশে ধরল, 'চুপ চুপ—একেবারে খুনই কইবা ফেলামু তরে।'

গলার আওয়াজে অমন একটা সাঙ্ঘাতিক কর্ম করা যে একেবাবে অসম্ভব নয়, সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ফেরি লঞ্চের সার্চলাইটটা অন্যদিকে ঘুরে গেছে। আলোর দিকটায় কালো কাচেব মতো ধলেশ্বরীব জল ঝকমক করছে। আব এদিকটায় নিশ্ছেদ অন্ধকার, আর তাবই মধ্যে সাপের মাথার মণিব মতো জ্বলছে ইয়াছিনের চোখদুটো।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দুটো চোখ আর দুটো কানের মধ্যে একত্র কবে দেখা এবং শোনা, দুই-ই করছিল ফজল। আচমকা সে বলে উঠল, 'কী মিঞাছাব, বিবিজান চর ইসমাইলে যাইতে চায় না নিকি?'

ফজলের স্বরটা কেমন যেন সংশয়জনক। লাফিয়ে নৌকার কাছে ছুটে এল ইয়াছিন। এলোমেলো গলায় বলল, 'পোলাপান কিনা। বাজানের কাছ থিকা হোয়ামির ঘরে যাইতে কান্দে। ও কিছু না মাঝি, ও কিছু না।'

'অঃ, আমি আবার ভাবলাম অন্য-কিছু বুঝি।'

ফজলের কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে নারীমূর্তিটিকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নৌকার পাটাতনে তুলে নিয়ে এল ইয়াছিন। সঙ্গে-সঙ্গে বোরখার আড়াল থেকে আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠল।

কাঁপা ভীত সুরে ফজল বলল, 'মিঞাছাব, আমার য্যান কেমুন লাগতে আছে। আপনে কাইল হকালেই যাইয়েন।'

'বাগে পাইছ। আইচ্ছা পনেরো ট্যাকাই দিমু। লও, আর দেরি কইরো না। নাও খুইলা দাও। আইজ রাইতের মইধ্যে চর ইসমাইলে আমার যাইতেই অইব।

পনেরো টাকা! বলে কী লোকটা! নৌকার বাদাম তুলে দিলে উত্তুরে বাতাসের টানে রাত ভোর হবার অনেক আগেই চর ইসমাইলের মাটিতে পৌঁছোনো যাবে। হালের বৈঠাটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে আকাশে নক্ষত্রমালার ফাঁকে-ফাঁকে সলিমার মুখ দেখবার চেষ্টা করা ছাড়া আর-কোনো কাজ থাকবে না। তার বদলে নগদ পনেরো টাকা। সলিমার পণের জন্য সাত-কুড়ি পূর্ণ হয়েও বারোটা কাঁচা টাকা গেঁজের ভেতর পাশাপাশি শুয়ে

আনন্দে বাজতে থাকবে। ভাবতে-ভাবতে মনটা খুশিতে ভরে গেল ফজলের।

এতক্ষণে নারকেল বনে তার আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চয়ই চলে গেছে সলিমা। তা যাক। কাল সকালে পুবের আকাশে লালচে ছোপ লাগার আগেই সে সলিমার চামার বাজানের নাকের ডগায় পণের টাকাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে তাজ্জব করে দেবে। তারপর এই মাসটা গেলেই সলিমাকে শাদি করে তার ঘরে নিয়ে আসবে। শাদাসিধা মানুষ ফজল মাঝি। সলিমাকে ঘিরে ছোটো আনন্দ, ছোটো খুশি আর ছোটো ছোটো সুখের কল্পনায় কয়েকটা মুহূর্ত সে ডগমগ হয়ে রইল।

একটু পরেই ফজল আরেক বার ইয়াছিনকে পরখ করল, 'কত ট্যাকা দিবেন?'

ছইয়ের ভেতর থেকে জবাব এল, 'পনেরো।'

মোচড় দিলে আরো রস ঝরবে, এ-ব্যাপারে ফজল নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে আর গুণাহ করল না। কিঞ্চিৎ ধর্মভয় অন্তত তার আছে।

যাই হোক, আর দেরি করল না ফজল। বৈঠা দিয়ে খোঁচা মেরে নৌকাটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল। এরপর ধলেশ্বরীর অন্তহীন খরধারা। কালো কুটিল রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে। ঘোলাটে চাঁদের আলো ধলেশ্বরীকে ভৌতিক করে তুলেছে। জামকাঠের নৌকার গায়ে ছপ-ছপ শব্দে ঢেউয়ের আঘাত বাজছে।

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবছা আকাশের দিকে তাকাল ফজল। মিটমিটে জোনাকির মতো আকাশের গায়ে অগণিত তারা ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সলিমার কথা ভাবতে লাগল সে। মনটা আশ্চর্য এক মাদকতায় ভরে গেল যেন। নাঃ, সলিমাকে না-পেলে জীবনটা ব্যর্থই হয়ে যাবে তার। আজকাল দোচালা ঘরের বিছানাটাকে মরা সাপের হিমাক্ত আলিঙ্গনের মতো ভয়াবহ মনে হয়। বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আর সেই নিরানন্দ নিরুৎসব একাকিত্বের মধ্যে সলিমার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সমস্ত রাত জেগেই কাটিয়ে দেয় ফজল।

আজ রাত্রেই চর ইসমাইলে সওয়ারি পৌঁছে দিয়ে সলিমাদের বাড়ির দিকে নৌকার বাদাম তুলে দেবে। আনন্দে উত্তেজনায় শিরায়-শিরায় যেন টান পড়ল, রক্তে মাতামাতি শুরু হলো, হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগল।

তরতর করে নৌকাটা জল কেটে এগিয়ে চলেছে। হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় ধরে গান ধরল ফজল :

যৈবন আইল কইন্যার অঙ্গে
জোয়ারের জল রে—
আমার চৌখের জলে পদ্ম নাচে
টলমল রে—
ও কইন্যা, তুমি হইও চান্দোবদন,
আমি হমু মুখের আঁচল।

তুমি হইও লয়নমণি, আমি হমু
কালো কাজল, ও কইন্যা—'

আচমকা গানের সুরটা ছিঁড়ে গেল যেন। তীব্র ঝাঁকানি লাগল ইন্দ্রিয়গুলোতে। গোটা সত্তাকে কানের মধ্যে এনে উৎকণ্ঠ হয়ে বসল ফজল।

ছইয়েব ভেতব তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ধস্তাধস্তিব আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুকের ভেতব একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর বোধ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ফজলের।

সাপের শিসের মতো শব্দ কবে ইয়াছিন শিকদাব গর্জাচ্ছে. 'চুপ-চুপ, এক্কেবারে গলা টিপা মারুম।'

'তাই, তাই করেন। হয় আমারে মাইবা ফালান, নইলে ছাইডা দ্যান। না-হইলে আমি জলে ঝাপ দিমু। নারীকণ্ঠটি অবরুদ্ধ আব চাপা।

গোরস্থানের শিয়ালের মতো খিক-খিক কবে হেসে উঠল ইয়াছিন, 'মবণ কি অতই হস্তা, এমনে তরে মাকম নিকি? এট্টু-এট্টু কইরা খুন করুম।'

ইয়াছিন আর সেই নাবীমূর্তিটিব কথোপকথন খ্যাপা তুফানেব মতো ধডাস কবে আছডে পডল ফজলের হৃৎপিণ্ডে।

ধলেশ্বরীর অন্তহীন খবস্রোতে নৌকাটা উল্কার মতো ছুটে চলেছে। পাড়েব নাবকেল আর হিজল বনে ঝোড়ো বাতাস এলোপাথাডি আছাড় খাচ্ছে।

এদিকে ছইয়েব তলার ধস্তাধস্তি একসময় থেমে গেল। যে-মনটাকে একাগ্র উৎকণ্ঠ করে ইয়াছিনদের দিকে নিবদ্ধ কবে বেখেছিল ফজল, ধীরে-ধীরে সেটাকে আরেক দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আকাশময় অগুনতি তারা ছড়ানো। দৃষ্টিটা সেদিকে ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে আবার ভাবতে চেষ্টা কবল সে।

মোরগ ডেকে উঠবার আগেই কাল ভোরে সলিমার বাজানকে জাগিয়ে সাত-কুড়ি টাকার মেয়ে-পণ নাকে ছুঁড়ে মাবার পর তার মুখখানা কেমন হাবাগোবা বলদেব মতো দেখাবে, সেটা ভাবতেই খুব আমোদ লাগল ফজলের।

বেশিক্ষণ অবশ্য তার মনটা সলিমার বাজানকে নিয়ে মগ্ন রইল না।

একটু-একটু কবে সলিমার স্বপ্ন সমস্ত চেতনার মধ্যে নিবিড় হয়ে এল। টানা-টানা দুটি ঘন কালো চোখ, শ্যামলী লতার মতো সতেজ সুঠাম দেহ, তার ডোরাকাটা রঙিন শাড়ি—সব মিলিয়ে সলিমা যেন এক আশ্চর্য রহস্য, বিস্ময়।

স্বপ্নটা আবাব ছিঁড়ে গেল।

ছইয়ের ভেতর থেকে কান্নাভরা অসহায় নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আমারে কইলকাতায় দিয়া আহেন। আপনে আমার ধর্মের বাপ, আপনের পায়ে ধবি।'

চাপা বীভৎস গলায় ইয়াছিন হেসে উঠল, 'তর বাজান না লো হুমুন্দির ঝি, আমি তর পোলার বাজান হইতে চাই। অহন চুপ মাইরা থাক। তরে আনতে গিয়া তর হোয়ামির তিনটা শড়কির খোচা খাইছি।'

ইয়াছিনের হাসি, তরঙ্গিত কালো ধলেশ্বরী, আবছা অন্ধকার, ঢেউ আর পালের

শব্দ, বাতাসের আওয়াজ, সব একাকার হয়ে একটা ভয়ানক অশুভ ইঙ্গিত চারিদিক থেকে ক্রমাগত ঘনিয়ে আসছে। নদীর অতল থেকে কোটি-কোটি ইবলিশ উঠে এসে দিগন্ত জুড়ে অট্টহাসি শুরু করে দিয়েছে যেন। কেমন ভয় করতে লাগল ফজলের।

আবার ইয়াছিনের সেই ভয়ংকর গলা আর হাসি শোনা গেল, 'বেশি ঘ্যান ঘ্যান করবি না মাগি, একেবারে শ্যাষই কইরা ফালামু।'

সেই নারীকণ্ঠটি এবার মরিয়ার মতো শোনাল, 'হেই করেন, তাইলে, আমি বাইচা যাই। আপনে আমার হোযামিরে মারছেন।'

'হোযামিরে মারছি। পুরান হোযামিতে কতদিন আর হোযাদ থাকে? নয়া হোয়ামি লইয়া অহন ঘর করবি। মন-ম্যাজাজ তাজা অইব।' বলার সঙ্গে-সঙ্গে একটানা অট্টহাসি চলল ইয়াছিনের।

এইবার অমানুষিক গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি। বোরখার আড়ালে এমন একটা আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ কোথায় লুকিয়ে ছিল, ভেবে দিশেহারা হয়ে গেল ফজল।

চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রস্ত চকিত নারীকণ্ঠটি শোনা গেল, 'আমারে ছুইবেন না, ছুইবেন না। এই আপনের ধর্মের বিচার! এইর লেইগা অগো হাত থিকা আমারে ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলেন না আমারে কইলকাতায় পৌঁছাইয়া দিবেন। আমারে ছুয়েন না—আঃ—'

'ইশ, সতী বেউলা একেবারে। ছুয়েন না।' টেনে-টেনে বলল ইয়াছিন।

তারপরেই ছইয়ের মধ্যে নতুন করে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। নৌকাটা ঢেউয়ের মাথায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। এত দুলছে, যে-কোন সময় ডুবে যেতে পারে।

কিছু বলত যাচ্ছিল ফজল। তার আগেই তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি, 'আমারে বাচাও মাঝি, বাঁচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল।'

সে চিৎকার ফজলের শিরা-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।

ওপরে অবারিত আকাশ, হু-হু বাতাস, নিচে উথল-পাথল নদী। দুটি সওয়ারি ছাড়া কেউ নেই কোথাযও। মনের মধ্য থেকে সলিমার স্বপ্নটা অনেক আগেই মুছে গেছে। শিরায়-শিরায় রক্তস্রোতে কী এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল ফজলের। চোখদুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠল। সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। ভয়ংকর গলায় ফজল চেঁচিয়ে উঠল, মিঞাছাব—

ডাকটা শেষ হবার আগেই হালের বৈঠাটা বাঁ হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতখানা আড়কাঠের নিচে ধারলো কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে। আজ সারাটা রাত আবছা আকাশ আর মিটমিটে অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে সলিমার স্বপ্ন দেখার সুন্দর একখানা সাধ ছিল তার। কিন্তু কে জানত, সেই সাধটার পাশে এমন একটা কদর্য দুর্যোগ ওৎ পেতে আছে।

ডাকটা কানে যাওয়ামাত্র ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসল ইয়াছিন শিকদার।

সঙ্গে-সঙ্গে একরকম ঝাঁপিয়েই বেরিয়ে এল মেয়েটা। নৌকা কাৎ হয়ে ডোবায জল উঠল। মেয়েটা সেইরকম অমানুষিক স্ববে চিৎকাব করে উঠল, 'আমারে বাচাও মাঝি, আমাবে বাচাও। আমি তাঁতি-বাড়ির বউ। দাঙ্গায আমার হোয়ামিরে মাবছে অরা। আর এই—'

মেয়েটাব গলায় অশবীবী একটা আত্মা যেন ভর করেছে। ফজলের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিযে স্ববটা শিবশিবিয়ে বসে গেল। হৃৎপিণ্ডব ওপর কী একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল অতর্কিতে। নিজের অজ্ঞাতসাবে ফজলের হাতেব থাবা থেকে কোঁচটা সাঁ করে ছুটে গেল। অব্যর্থ লক্ষ্য। ইযাছিন বাধা দেবাব আগেই সেটা তার পাঁজরে গেঁথে গেল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল ইযাছিন শিকদাব, 'ইযা-আ-আ—'

তারপরেই নৌকার ভার খানিকটা হাল্কা করে ইযাছিনের শবীর ধলেশ্বরীর খরস্রোতে পাক খেতে-খেতে কোনদিকে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে কোঁচেব ফলাগুলো পরিষ্কার কবে ধুয়ে আবাব ডোরার তলায চালান করে দিয়েছে ফজুল।

আতঙ্কে শ্বাসনলীটা বোধহয় চেপে চেপে আসছিল মেয়েটার। আঙুল ফেটে ঝিঝি কবে বুঝি-বা রক্ত ছুটবে। চোখেব মণিদুটো হয়তো ঠিকরেই বেরিয়ে আসবে।

শান্ত, যেন কিছু ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে ফজল শুধলো, 'আপনে কই যাইবেন?'

আবছা স্খলিত স্বরে মেয়েটি বলল, 'এইখানে আমার কেউ নাই। দাঙ্গায সব পলাইছে। হোয়ামি মরছে। কইলকাতায আমার এক ভাশুর আছে। হেইখানেই যাইতে চাই।'

ফজল আর-কোনো প্রশ্ন করল না। নৌকার গলুইটা শুধু তারপাশা স্টিমাবঘাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আবার একটানা খরস্রোত, সোঁ-সোঁ ঢেউ, সাঁই-সাঁই বাতাস।

ভোবে পুব আকাশে এক আস্তর ছাযা ছায়া আলোর যখন ছোপ ধরল ঠিক সেইসময় তারপাশা স্টীমারঘাটায় এসে লগি পুঁতল ফজল।

নৌকার পাটাতনে নিস্পন্দের মতো বসে রয়েছে মেয়েটি। মুখের ওপর ভোরেব ফুটি-ফুটি আলো এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ-দুটো চমকে উঠল ফজলের। চকিতের জন্য মেয়েটির মুখে যেন সলিমার আদল ফুটে বেরুল।

স্টিমারঘাটায় অসংখ্য মানুষের জটলা। যাযাবরের মতো দেশের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে।

একসময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকিটঘবের দিকে এগিয়ে এল ফজল। বলল, 'ট্যাকা দ্যান, আপনের টিকিট কিনা দিই।'

মাথা নিচু করে মেয়েটি জানাল, তার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই।

এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ফজল। তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল, কোমরের গোপন গেঁজেতে যৌবনের সুন্দর স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

একটু দ্বিধা করল ফজল। বুকের ভেতরটা একটু দুলে উঠল। তারপরই নিজের

প্রাণের দিকে সবলে পিঠ ফিরিয়ে বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপিযে পড়ে কলকাতার টিকিট কিনে আনল একখানা।

ইতিমধ্যে গম্ভীর শব্দ করে স্টিমার এসে গেছে। টিকিটটা আর টিকিট কিনে যে-টাকাগুলো অবশিষ্ট ছিল—সে-সবই মেয়েটাব হাতে দিতে দিতে ফজল বলল, ‘এই ট্যাকা কয়টা রাখেন। এত মানুষ যাইতে আছে, তাগো লগে কইলকাতায গিয়া উঠবেন। পারবেন তো?’

‘পারুম, কিন্তুক এই ট্যাকা—’ অপবিসীম সংকোচে মাথাটা নিচে নেমে গেল মেযেটিব। খানিকটা পব যখন সে চোখ তুলল, কাউকেই দেখতে পেল না। অবিশ্বাস্য ভোজবাজিতে মাঝিটা কোথায যেন অদৃশ্য হযে গেছে।

...

কেবায়া ঘাটে নিজের একমাল্লাই নৌকাটাব দিকে ফিবে আসতে-আসতে ফজলেব কী মনে পড়ল? সলিমাকে? না। তাতি-বাড়ির ঐ সর্বস্বহীনা বউটিকে? না। দু-চারদিনের ভেতব সাত-কুড়ি টাকা পণ দিতে না-পারলে সলিমার বাজান অন্য জাযগায মেযেব শাদির ব্যবস্থা পাকা কবে ফেলবে, সেই চিন্তাতেই কি বিকল হযে গেল ফজলেব মন? তাও না।

তাব মনে পডল কাল রাতের সেই রক্তাক্ত কোঁচের ফলাটার কথা। চেতনাব ওপর দিযে দুলে-দুলে তাবা অবিবাম নেচে চলেছে। ধলেশ্বরীপাবেব মাটিতে কোনো নিভৃত ছায়াতরুর তলায সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে বাতেব ক্রুব অন্ধকাবে কতবার ইয়াছিনদের আবির্ভাব হবে তাব নৌকায? কতবার?

ফজলেব মনে পডল, কোঁচটায অনেকদিন শান দেওযা হয়নি। আজই ধাব দিয়ে রূপার মতো ঝকঝকে কবে তুলতে হবে সেটা।

# অনুপ্রবেশ

## প্রফুল্ল রায়

এখনও ভাল কবে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেবি, এই সময দলটা নর্থ বিহাবের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকাব মতো চুপিসাড়ে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।

দুই পবিবাবেব নানা বযসেব মেযে পুরুষ মিলিযে মোট আটটি মানুষ। এক পরিবারে ফবিদ এবং তার দাদী হাবিবা। অন্যটায রাশেদাবা। বাশেদা, তাব আব্বা, আম্মা, দুই ছোট ভাই আর এক বযস্ক রুগণ ফুফু অর্থাৎ পিসি।

পুরুষদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা, শার্ট, তাব ওপব চাদব কিংবা মোটা রোঁয়াওলা পুলওভাব। মেয়েরা পবেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ আব চাদর। সবার মাথায় বা হাতে নানা লটবহব—টিনেব ঢাউস বাক্স, বেতেব টুকবি, বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি ইত্যাদি।

এরা ছাড়া সকলের আগে আগে রয়েছে মধ্যবয়সী শওকত। সে ফরিদের দূব সম্পর্কের চাচা এবং আট জনের মনুষ্যবাহিনীটির গাইড।

ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেল। তবু বিহারের এই অঞ্চলে শীতেব মেজাজ খানিকটা থেকেই গেছে। বিশেষ কবে সন্ধের পর থেকে রোদ ওঠাব আগে পর্যন্ত সময়টায।

কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে রুপোর বুটির মতো অগুনতি তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সাদা কুয়াশা মিশে চারিদিকে ঝাপসা হয়ে আছে। অদৃশ্য, টান টান স্রোতের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়।

কাঁচা সড়কেব দু'ধারে ঝোপঝাড, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া পিপর গাছ। তারপর দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ। দূবে বা কাছাকাছি গাঁ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব অসাড, নিঝুম। ঘুমের আবকে সমস্ত চরাচব ডুবে আছে।

চারপাশে অন্ধকারে আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড় দিযে দিয়ে হাজার জোনাকি উড়ছে। পিপব গাছের ফোকর থেকে মাঝে মাঝে কামার পাখিদের কর্কশ চিৎকার ভোররাতের অগাধ শান্তিকে চুরমার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া এই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা সাঁই সাঁই একটা শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে। সেটা হল রাশেদার ফুফু আনোয়ারার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা হাঁপানির টানের আওয়াজ। বোঝা যায়, তার চিরস্থায়ী শ্বাসকষ্টটা মারাত্মক বেড়ে গেছে।

চাপা, ক্ষীণ গলায় টেনে টেনে আনোয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'আউর কিতনি দূর শওকতভাই?' কথা শেষ করে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে সে। এখানে, এই আকাশের

নিচে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার অকেজো ফুসফুসকে চাঙ্গা করে তোলাব পক্ষে যেন পর্যাপ্ত নয়।

শওকত চলাব গতি কমায় না। চলতে চলতেই দ্রুত পেছন ফিরে একবার তাকায় শুধু। বলে, 'এই নজদিগ। জোরে পা চালিয়ে এসো।'

'আর যে পারছি না। বহোত কমজোর লাগছে। চোখের সামনে বিলকুল সব আন্ধেরা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জরুব মাটিতে পড়ে যাব।' আনোয়ারার গলাব ভেতব থেকে কথাগুলো গোঙানির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে।

'উপায় নেই বহেন। সূরয ওঠাব আগে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। এখনও লগভ্‌গ তিন মিল (মাইল) বাস্তা।' বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয শওকত, 'দুনিয়ার কারো নজরে পড়াব আগেই এই সড়ক পেরিয়ে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে বহোত মুসিবত।'

এবপব আনোয়ারার আব কিছু বলাব থাকে না। তাব মাথা টলছিল। তবু তাবই মধ্যে প্রাণপণে, দুর্বল জীর্ণ শবীবেব শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি পা চালাতে থাকে।

আনোযারাব ঠিক পেছনেই ছিল ফবিদ। তাব মাথায় প্রকাণ্ড টিনের ট্রাঙ্ক, ডান হাত দিয়ে সেটা ধবে রেখেছে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বড চটের ব্যাগ। সে আনোয়ারাকে লক্ষ করছিল। টলতে টলতে আনোয়ারা যখন প্রায় হুডমুড় করে পড়ে যাচ্ছে, সেই সময বাঁ হাত বাডিযে তাকে ধরে ফেলে ফবিদ। বলে, 'আমাকে ধরে ধরে চলুন ফুফু।'

আনোয়ারা বলে, 'তোমাব মাথায় এত ভারী সামান। আমি হাত ধরলে সামলাতে পারবে না।'

'পারব।'

ফরিদের বাঁ হাত এবং কাঁধের ওপর শরীরের ভার রেখে হাঁটতে থাকে আনোয়াবা। বলে, 'বেটা ফরিদ, আমাব কী মনে হচ্ছে জানো?'

ফরিদ বলে, 'কী?'

'শেষ পর্যন্ত আর পৌঁছুতে পারব না। তার আগেই এই সড়কের ধারে আমাকে তোমাদেব গোর দিতে হবে।'

'এ সব বলতে নেই। আমরা সবাই জিন্দা পৌঁছুব। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলুন।'

আনোযারা আর কিছু বলে না। তার ফুসফুসের ভেতর থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজটা বেরুতেই থাকে।

মালপত্র এবং একটি মানুষের ভার নিয়ে চলতে চলতে ফরিদের মনে হয়, পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনো তুখোড় বাজিকরের ম্যাজিকে তারা বহুদূরের অচেনা ঘুমন্ত এক গ্রহে এসে পড়েছে।

তিনদিন আগে টাউটেরা মাথাপিছু দুশো টাকা আদায় করে তাদের আট জনকে

পশ্চিম বাংলার বর্ডার পার করিয়ে দেয়। এপারেও সেই একই ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষের জন্য দুশো টাকাই গুনে দিতে হয়, এক পয়সা কমবেশি না।

বর্ডার থেকে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের একটা ট্রেনে সন্ধেবেলা ফরিদরা কামতাপুরে এসে নেমেছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল শওকত। সে-ই তাদের খানিকটা রাস্তা বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে অনবরত হাঁটা। শওকতেব কথা যদি ঠিক হয়, আবো মাইলতিনেক তাদের হাঁটতে হবে।

ফরিদের বয়স তেইশ। তার জন্ম সাবেক ইস্ট পাকিস্তানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর আগে।

সে শুনেছে, সাতচল্লিশে ইণ্ডিযা দু ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাসসব আলি বিবি এবং ছেলেমেয়ে নিযে বিহার থেকে ঢাকায চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহাবে যে মারাত্মক দাঙ্গা হযেছিল, সেই সময় তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদদের কেউ মাবা না গেলেও, চেনাজানা অনেকেই খুন হযেছিল। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা. আগুন, রক্তস্রোত, লাশেব পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আব উম্মত্ততা। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাসসবদেব শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্তও আর নিবাপদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুশো বছর ধরে যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে যায। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ঢাকায় গিয়ে বেশিদিনে বাঁচেনি মুদাসসর আলি। এক বছবের ভেতরেই তার এন্তেকাল হয়। তখন তার একমাত্র ছেলে রহমত পূর্ণ যুবক। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রথম দিকে এটা সেটা করে নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কেটেছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য জিনের মতো খেটে গেছে সে। হাতে কিছু টাকা জমলে এবং আরো কিছু 'করজ' নিয়ে একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যাবসা জমে ওঠে। এরপর একমাত্র বোন মালেকার বিয়ে দিয়ে নিজেও শাদি করে রহমত। সাদির সাত বছরের মাথায় ফরিদের জন্ম।

নানা দুর্যোগ এবং টালমাটালের পর জীবনটাকে রহমত যখন মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, সেই সময় পর পর দুটি মৃত্যু তাকে অনেকটা টলিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমে মারা যায় মালেকা, তারপর ফরিদের আম্মা আমিনা। এই শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। তবে মন এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ঘর-সংসার বা রোজগারের দিকে তেমন নজর ছিল না। নেহাত যেটুকু না করলে নয়, সেটুকুই করে গেছে। বাড়িতে ফরিদকে আগলে রাখত তার দাদী হাবিবা।

এইভাবেই কোনোরকমে চলে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। একই ধর্ম, তবু বাঙালী আর অবাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তখন

চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ, ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক আগে আগে সেই ভযাবহ দাঙ্গার দিনগুলোতে। তখন প্রতিপক্ষ ছিল অন্য ধর্মের মানুষ। পাকিস্তানের খুনী সাঁজোযা বাহিনী ব্যারাক থেকে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল নিযে ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়েগঞ্জে এবং শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। তখন সারাদিনই চারিদিকে গুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের কর্কশ আওযাজ, বারুদেব গন্ধ, লাশের পাহাড, রক্তের নদী, ধর্ষণ, হত্যা, আগুন আর বিপন্ন বিধ্বস্ত মানুষেব আর্ত চিৎকার।

রহমত আলি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। রাজনৈতিক কূটকচাল তাব মাথায় ঢুকত না। নিজের দোকান আব ভাঙাচোরা সংসাবের চৌহদ্দি ছাডিয়ে অন্য কোনোদিকে তার নজর যেত না। কিন্তু চাবপাশে যখন আগুন জ্বলছে, তার আঁচ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। একদিন তাব দোকান জ্বালিয়ে দেওযা হল, প্রচণ্ড মাবও দেওয়া হয় তাকে, নেহাত আযুর জোরে সে বেঁচে যায়।

একদিন নিরাপত্তার কাবণে হিন্দুস্থান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল সে। পূর্ব পাকিস্তানকেই গভীর আবেগে নতুন স্বদেশ ভেবে নিযেছিল। মনে হয়েছিল, সব আতঙ্ক ভয় অনিশ্চয়তা আব দুর্ভাবনা কেটে গেল। কিন্তু এবাব তারা কোথায যাবে?

একদিন মুক্তিযুদ্ধ থামে। জন্ম নেয নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ, মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমানদেব সম্পর্কে বিদ্বেষ সন্দেহ আর ঘৃণাটা থেকেই যায়।

তবু বেঁচে তো থাকতে হবে। রহমত জোড়াতাড়া দিযে আবার দোকান খোলে কিন্তু আগেব মতো বেচাকেনা নেই। কামাই ভীষণ কমে যায়।

এদিকে স্থির হয়েছিল, পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদেব ঢাকা থেকে নিযে যাবে। দু-চারজনকে নিয়েও যায় কিন্তু কযেক লাখ মানুষ বাংলাদেশে পড়ে থাকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বছরের পর বছর। পাকিস্তান থেকে রহমতদেব নেবার জন্য প্লেন বা জাহাজ কোনোটাই আসে না।

এদিকে ফরিদ বড় হচ্ছিল। ক্রমশ স্কুল পেরিয়ে সে কলেজে যায়। কিন্তু বি এ পরীক্ষায় বসার আগেই রহমত আলি দশ দিনের জ্বরে মারা গেল। এরপর পড়ার খবচ যোগাবে কে? ফরিদ কলেজ ছেড়ে দেয়। শুধু পয়সার অভাবের জন্য না, তীব্র হতাশায় তখন সে ভুগছে। কষ্ট করে বি এ'র ডিগ্রিটা জোগাড় করতে পারলেও তার চাকরি হবে না। বাংলাদেশে তার ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতের বছর কেটে যায়। ইণ্ডিয়ার পার্টিসনের সময় যে বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই এখনও স্বপ্ন দেখে, লাহোর করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনোদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, তাদের বিশ্বাসে রীতিমত

চিড় ধরে গেছে। আর তারা করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্তিরে মীরপুরের উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে, ইণ্ডিয়াতে, পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়? তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতচল্লিশে যে উর্দুভাষীরা করাচিতে চলে গিয়েছিল সেখানকার আদি বাসিন্দারা তাদের আদৌ পছন্দ করে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা মোহাজিরদের সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড বিরূপতা। দাঙ্গা এবং খুন সেখানে লেগেই আছে। রুটির ভাগ কে আর অন্যকে দিতে চায়?

বেশ কিছুদিন পরামর্শের পর তাবা মনস্থির করে ফেলে সুদূর লাহোর বা করাচি থেকে বিহারের এই গ্রামগুলি—যেখানে পুরুষ পরম্পরায় তাদেব বাপ-দাদারা বাস করেছে—অনেক বেশি পরিচিত এবং কাছের। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো সেখানে যাওয়া যায না। এক স্বাধীন দেশ থেকে আরেক স্বাধীন দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আইন-কানুন যা-ই থাক, দুনিয়ায় টাউটেরাও থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা মীরপুরে হানা দিতে শুরু করে। তারাই জানিয়ে দিয়েছিল প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। এমন একটা ফাঁকা জাযগাব খোঁজ টাউটেরা দিয়েছিল যার আশেপাশে বসতি নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকেব যাওয়া বিপজ্জনক। লোকের চোখে পড়ে গেলে হৈচৈ হবে। তাদের পরামর্শ হল, ছোট ছোট দলে আট-দশজন কবে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কিছুদিন পর যাওয়া বিলকুল বন্ধ। তারপর প্রতিক্রিযা দেখে ব্যবস্থা করা হবে।

ছক মাফিক প্রথম দলটা আসে পনের দিন আগে। তাদের সঙ্গে এসেছিল শওকত। সে চটপটে, চৌখস, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তারপর থেকে প্রায় রোজই দু-তিনটে করে ফ্যামিলি আসছে। আজ এসেছে ফরিদরা।

রাশেদাদের আজ আসার কথা ছিল না। তার ফুফু আনোয়ারার খুবই শ্বাসকষ্ট চলছিল। ঠিক হয়েছিল, সে কিছুটা সুস্থ হলে পরের কোনো একটা দলের সঙ্গে ওরা আসবে। তবু যে আসতে হল তার কারণ রাশেদা।

রাশেদার সঙ্গে ফরিদেব শাদির কথাবার্তা এবং দেনমোহর অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। শাদিটা যে হয়নি তার কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতে পারে না ফরিদ।

রাশেদা চায়নি তাদের ঢাকায় ফেলে আগেই ফরিদরা চলে যায়। কেঁদেকেটে এবং জেদ ধরে এমন এক কাণ্ড সে করে বসে যে শেষ পর্যন্ত তার আব্বা এবং আম্মাকেও বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, কামতাপুর স্টেশনে রোজ অপেক্ষা করবে শওকত। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আসবে তাদেব জায়গামতো নিয়ে যাবে। আজও সে ফরিদদের নিয়ে চলেছে।

মুখ বুজে চুপচাপ সবাই হাঁটছিল। হঠাৎ রাশেদার আব্বা রমজান ডেকে ওঠে, 'শওকতভাই—'

মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় শওকত, 'হাঁ—'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার হালচাল কেমন?'

'এখনও গোলমাল হয়নি। তবে—'

'কী?'

'আমরা যে এসেছি, সেটা মনে হয় ওদিকের লোকে জেনে গেছে।'

খানিকটা পেছনে, মাথায় আর কাঁধের ব্যাগ সামলে, আনোয়ারাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল ফরিদ। এখন শরীরের সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আনোয়ারা।

শওকতের কথাগুলো কানে আসতে চমকে ওঠে ফরিদ। রমজান জবাব দেবার আগেই সে বলে, 'শুনেছিলাম জায়গাটা ফাঁকা মাঠ, ওখানে লোকজন থাকে না।'

শওকত বলে, 'বিলকুল ঠিক।'

'তা হলে?'

ফরিদের প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শওকতের। সে বলে, 'আরে বেটা, মানুষের আঁখ আর কানের মতো খতারনাক চীজ দুনিয়ায় আর একটাও পাবে না। জঙ্গলেই যাও, কি দরিয়াতে গিয়েই লুকোও, কারো না কারো নজরে পড়ে যাবেই। একজন দেখে ফেললে দশ আদমীর কানে উঠতে কতক্ষণ!' লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য খানিকটা কমিয়ে দিয়ে আবার সে বলে, 'পরশু খালেদ চার 'মিল' দূরে বারহৌলির বাজারে আটা ডাল নিমক মরিচ কিনতে গিয়েছিল। সেখানে শুনে এসেছে, লোকেরা আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আচানক মাঠের দখল নিলাম কী করে—এই সব। বুঝতেই পারছ, জরুর কেউ না কেউ আমাদের দেখে গেছে।'

পুরো তিনটে দিন ভাল করে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। ট্রেনে, বাসে, সাইকেল রিকশায়, বয়েল গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে অনবরত তারা চলেছেই, চলেছেই। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা এবং কোমরের জোড় যেন আলগা হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে টক্কর খেতে খেতে কোনোরকমে শরীরটা খাড়া রেখে তারা হাঁটছিল। শওকতের কথাগুলো তাদের শিরদাঁড়ার ভেতর অনেকখানি আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রমজান বলে, 'এখানে থাকতে পারবে তো শওকত ভাই?'

শওকত গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কোসিস তো করনা পড়েগা। ডরো মাত রমজান ভাই। একটা কিছু ব্যওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

বিশ ফুট পেছনে আসতে আসতে রমজানের দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় ফরিদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছে। সে শুনেছে, সাতচল্লিশে বিহারের দেহাত থেকে আরো হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে-ও ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অতি সাধারণ গরিব বিহারীরা গোড়ার দিকে যে ঢাকায় গুছিয়ে বসতে পেরেছিল সে জন্য শওকতের ভূমিকা কম নয়। সবার জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে একে ধরা, ওর কাছে আর্জি জানানো, তাকে সেলাম ঠোকা—কী না করেছে সে। আবার চল্লিশ বছর

বাদে এই যে প্রায় রোজ ছোট ছোট দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশে চলেছে, তাতেও তার প্রবল উৎসাহ। কখনও ভেঙে পড়ে না শওকত, হতাশায় তার শিরদাঁড়া দুমড়ে যায় না, কোনো অবস্থাতেই হার মানতে শেখেনি। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে ফরিদ।

এদিক রমজান আর কিছু বলে না। গভীর উৎকণ্ঠা তার ভেতরকার শেষ জীবনীশক্তিটুকুকে যেন চুরমার করে দিতে থাকে।

তারা চলেছে তো চলেছেই।

হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেই সব সময়ে তাদের বংশের আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল, কী-ই তখন তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই ফরিদের। গত দুশো বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে। কয়েক জেনারেশান ধরে তখন তারা বৃটিশ ইণ্ডিযার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকাব কারণে হয়ত বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইণ্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে।।

সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে কাচ্চী অনেকটা তফাতে বেখে বিশাল এক পড়তি জমির মাঝখানে পৌঁছে যায় ফরিদরা।

এখানে বাঁশ টালি চট আর বাতিল পুরনো টিন দিয়ে তিরিশ চল্লিশটা ঘর তোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে আগে যারা চলে এসেছিল, এই ঘরগুলো তাদের।

নির্জন নিঝুম মাঠের মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এই ছন্নছাড়া উপনিবেশে এখনও কারো ঘুম ভাঙেনি।

শওকত বলে, 'পৌঁহচ গিয়া। তিন রোজ বহোত তখলিফ গেছে তোমাদের। এবার আরাম করো।

ঘাড় এবং মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে সবাই মাটিতেই শরীর এলিয়ে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ময়লা চাদর পেতে আনোয়ারাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এতটা আসার ধকলে তার বুকে একসঙ্গে দশটা হাপর ওঠানামা করছে।

ফরিদ একধারে বসে অসীম আগ্রহে চারিদিক লক্ষ করছিল। শওকত সঠিক খবরই দিয়েছে। এখান থেকে যেদিক যতদূর চোখ যায়, কোথাও মানুষজন বা দেহাতের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে একদিকের কাঁকুরে ডাঙা ততদূর ছড়ানো। আরেক দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মজা বিল। শ্যাওলা আর লম্বা

লম্বা ডাঁটিওলা জলজ ঘাসে সেটা বোঝাই। বিলের ধার ঘেঁষে প্রচুর ঝোপঝাড় আর বিরাট বিরাট সিমার এবং কড়াইয়া গাছ। গাছগুলোর মাথায় অগুনতি বক ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এদিকে গলা তুলে শওকত ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'আরে ওসমান-ভাইয়া, রুস্তম, নবাবজান, রহিমা চাচী—আর কত ঘুমোবে! ওঠ ওঠ, উঠে পড়। ওরা এসে গেছে।'

প্রথমে দু-একজন, তারপর একে একে শ'খানেক মানুষ ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। ফরিদদের দেখে বলে, 'আ গিয়া তুমলোগ?'

রমজান নির্জীব স্বরে বলে, 'হাঁ। লেকেন বিলকুল মর গিয়া।'

ওসমান বলে, 'হাঁ, পয়দল অনেকটা রাস্তা আসতে হয়। পা আর কোমরের হাড্ডি বেঁকে যায়। পথে কোনো গোলমাল হয়েছে?'

'নেহী।'

'ইণ্ডিয়ার লোকজন সন্দেহ করেনি?'

'নেহী।'

'না করারই কথা। ইতনা বড়ে দেশ। কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) আদমী। এখানে কে কার খবর রাখে!'

এরপর ঠিক হয়, আগে এসে যারা ঘর তুলেছে, তাদের কাছে ভাগাভাগি করে ফরিদরা দু-চারদিন থাকবে। তারপর বারহৌলির বাজার থেকে টালি বা পুরনো টিন কিনে এনে নিজেদের ঘর তুলে নেবে।

ফরিদ দূরমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। আসলে বর্ডার পেরিয়ে এপারে আসতে আসতে নিজের মধ্যে তিনদিন আগে এক ধরনের উত্তেজনা টের পেয়েছিল সে। এখন, এই বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে আচমকা সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সে শুনেছে, এখান থেকে মনপখল গাঁ খুব দূরে নয়। মনপখল থেকেই চল্লিশ বছর আগে তার দাদা বিবি-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষের সেই গ্রামটা দেখার জন্য প্রচণ্ড অস্থিরতা এই মুহূর্তে একগুঁয়ে জিনের মতো তার কাঁধে যেন চেপে বসেছে।

হঠাৎ ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'শওকতচাচা, মনপখল গাঁও কোথায়'

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ফরিদের দিকে তাকায় শওকত। বলে, 'এখান থেকে 'মিল' তফাতে বারহৌলি বাজার। সেখান থেকে আরো দু 'মিল' গেলে মনপখল, কেন জানতে চাইছ?'

'আমি আমাদের গাঁও দেখতে যাব।'

শওকত বলে, 'এখন না বেটা। আরো কিছুদিন দেখি, হালচাল ভাল করে বুঝি। গাঁও তো নজদিগ রইলই। সময় হলে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে। আমারও তো ঐ একই গাঁও, আমিও এখন পর্যন্ত যাইনি।'

এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মনপগুল এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো থেকে একদিন ঢাকায় চলে গিয়েছিল। তারাও শওকতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, এখন পর্যন্ত কেউ পুরনো পিতৃভূমি দেখতে যায়নি। শুধু নিজেদের পুরনো গাঁওতেই না, অন্য কোনোদিকেও তারা পা বাড়ায়নি। ভয়ে ভয়ে, চাপা আতঙ্ক নিয়ে এই কাঁকুরে জমিতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে দু-একজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বারহৌলি বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল।

এদের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফরিদ। কেউ কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। চল্লিশ বছর আগে এটা তাদের দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তারা এ দেশের কেউ না। পিতৃভূমি বা জন্মভূমি দেখতে গিয়ে যদি বিপন্ন হতে হয়, তাই সেদিকে কেউ পা বাড়ায়নি।

ফরিদ আর কিছু বলে না।

শওকত এবার তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। হাবিবা আর ফরিদ তাদের ঘর না তোলা পর্যন্ত থাকবে ওসমানদের সঙ্গে। রাশেদা আর আনোয়ারা থাকবে নবাবজানদের কাছে। রাশেদার দুই ভাই এবং আব্বা-আম্মার দায়িত্ব নেবে রুস্তম আর গহর শেখ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরগুলোর সামনে ফরিদরা শওকতকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আজ আর ঢাকা থেকে কেউ আসবে না, তাই শওকতের কামতাপুরে যাওয়ার তাড়া নেই।

মাথার ওপর ঝকঝকে নীলাকাশ। সূর্য তার ঢালু গা বেয়ে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। রোদে তাত থাকলেও গা পুড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রচুর উল্টোপাল্টা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে হাওয়া থাকায় মোটামুটি ভালই লাগছে সবার।

ইণ্ডিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

ফরিদ বলে, 'শওকতচাচা, কতদিন আমরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব? তুমি আসতে আসতে বলেছিলে, আমাদের খবর অনেকে জেনে গেছে। তারাই আমাদের টেনে বের করবে। কে জানে ভাগিয়ে দেবে কিনা। তা ছাড়া আরো একটা কথা ভাবার আছে।'

শওকত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ঢাকা থেকে আমরা কে আর ক'টা পয়সা আনতে পেরেছি। কামাই না করলে না খেয়ে মরতে হবে। সে জন্যেও এখান থেকে বেরুনোটা জরুরি।'

ফরিদের কথাগুলো অনেককে নাড়া দিয়ে যায়। তারা সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক ঠিক।'

শওকত গভীর আগ্রহে ফরিদের কথা শুনছিল এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। সে আস্তে আস্তে বলে, 'বেটা তুমি যা বললে, সব আমার মাথায় আছে। লেকেন সবুর। আমি এখানকার একটা লোকের খোঁজ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে আমাদের

অনেক মুশকিল আসান হবে। দো-চার রোজের ভেতর তার সঙ্গে দেখা করব।'

অন্য সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

শওকত জানায়, তার নাম এখন বলা যাবে না। সে পলিটিক্যাল পার্টির জবরদস্ত লীডার। তার নামে এ অঞ্চলে বাঘ আর বকরি একঘাটে জল খায়। সে-ই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ ব্যাপার না।

ফরিদ এবং আরো অনেকে শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এর খবর তোমাকে কে দিল?'

শওকত বলে, 'বর্ডারের এপারে ওপারে কত ধান্ধায় কত দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানো? ধরে নাও তাদের কারো কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।'

ফরিদের সংশয় কাটে না। সে বলে, 'যদি লীডারের সঙ্গে দেখা করতে না পারো?'

'করতেই হবে। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফরিদ বলে, 'আরেকটা কথা বলব শওকত চাচা?'

শওকত বলে, 'একটা কেন, দশটা বিশটা, যে ক'টা ইচ্ছা—বল।'

'এই মাঠে পড়ে না থেকে আমাদের গাঁওগুলোতে চলে যাওয়াই তো ভাল। যারা আমাদের জমিনের ওপর বসে আছে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে একটু থাকার জায়গা দেবে না?'

ফরিদের সারল্যে হেসে ফেলে শওকত। ছেলেটা প্রচুর লেখাপড়া করলেও অনেক ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ, যেন বহুকাল আগের 'বচপনেই' থেকে গেছে। তার হয়ত ধারণা, দুনিয়াটা পীর-দরবেশে থিক থিক করছে। এদের কাছে হাত পাতলেই যা ইচ্ছা পাওয়া যাবে। শওকতদের মতো মানুষ যারা না ইণ্ডিয়ান, না বাংলাদেশী, না পাকিস্তানী, যারা একটু আশ্রয়ের জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে পুরনো স্বদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন যদি ফেলে-যাওয়া জমির অংশ চাইতে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে, চোখের সামনে ছবির মতো তা দেখতে পায় শওকত। সে ফরিদের কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'ফরিদ বেটা, কেউ এক 'ধুর' জমিনও দেবে না। যা খোয়া গেছে তা কোনোদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না। সমঝা?'

ফরিদরা আসার পর তিন দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আরো কিছু মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে।

আজ চতুর্থ দিন। সকালে উঠে বাসি রুটি আর আখের গুড় দিয়ে নাস্তা করে লোক আনতে কামতাপুরে চলে গেছে শওকত।

আর বেলা আরেকটু চড়লে ফরিদ ঠিক করে ফেলে, মনপখলে আজ যাবেই। পূর্বপুরুষের জন্মভূমি তাকে যেন প্রবল আকর্ষণে সেদিকে টানতে থাকে।

এখন যে যার ঘরের সামনের তকতকে ফাঁকা জায়গাটায় ঢিলেঢালা বসে কথা বলছে। পুরুষদের রোজগার-ধান্ধার ব্যাপার নেই। মেয়েদের অবশ্য কাঠকুটো জ্বেলে ভাজি চাপাটি বানাতে হয়। তবু তাদেরও তেমন তাড়া থাকে না। ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরে এই মাঠের মাঝখানে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনরাত শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া আপাতত কারো বিশেষ কিছু করার নেই।

ফরিদ পায়ে পায়ে বিলের দিকে চলে যায়। ওসমানের কাছ থেকে আগেই সে জেনে নিয়েছিল কীভাবে বারহৌলি যেতে হবে। আর বারহৌলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ঠিক মনপখলে চলে যেতে পারবে।

বিলের কাছাকাছি ফরিদ যখন এসে পড়েছে, সেই সময় শুনতে পায়, 'এই শুনো—'

ঘুরে তাকাতেই ফরিদ দেখতে পায় রাশেদা। বেতের মতো পাতলা, ধারালো চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। গায়ের রং পাকা গমের মত। বড় বড় চোখ দুটিতে আশ্চর্য যাদু মাখানো। বয়স উনিশ কুড়ি। ঢাকায় থাকতে মেয়েটা সেই কবে থেকে তাকে নজরে নজরে রেখেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করার বা কোথাও একটা পা ফেলার উপায় নেই।

রাশেদা কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ফরিদ ভেবেছিল মনপখলে যাওয়ার ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। বলে, 'কই কোথাও না। এই এখানে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।'

'ঝুট।'

'মতলব?'

'তুমি মনপখল যাচ্ছ।'

ফরিদ হকচকিয়ে যায়। বলে, নেহী নেহী, কে বললে?'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাশেদা। সে বলে, 'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ধরা যখন পড়েই গেছে, তখন কী আর করা। ফরিদ বলে, 'সে অনেক দূর। যেতে ছ মাইল। ফিরতে আবার ছ মাইল। তোমার কষ্ট হবে।'

'হোক কষ্ট, আমি তো আর তোমার পায়ে হাঁটব না।'

'না না, ভাল করে ভেবে দেখ।'

'তোমার কোনো বাহানা শুনছি না। আমি যাবই। জানো তো রাশেদা কেমন জিদ্দি।'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় ফরিদকে।

বিলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় চিরে একটা সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আধ মাইলের মতো হাঁটলে পাকা সড়ক বা পাক্কী। এই পাক্কীটা সোজা গিয়া ঠেকেছে বারহৌলিতে।

কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে ওঠে দু'জনে। দু'পাশে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠ, আকাশে

অজস্র পাখি দেখতে দেখতে আর কথা বলতে বলতে যখন তারা বারহৌলি পৌঁছয়, দুপুর হতে তখনও বেশ দেরি।

জায়গাটা রীতিমতো গমগমে। ছোটখাটো টাউনই বলা যায় বারহৌলিকে। প্রচুর লোকজন। বিজলী বাতি এসে গেছে। সাইকেল রিকশা আর বয়েল গাড়িতে ছয়লাপ। ফাঁকে ফাঁকে অটো আর স্কুটারও চোখে পড়ে। রাস্তার বেশির ভাগই পাকা। দু'ধারে একতলা দোতলা অগুনতি বাড়ি। অবশ্য টিনের এবং টালির ঘরও অজস্র। এরই একধারে জমজমাট বাজার।

মনপখলে গিয়ে খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। ফরিদরা বাজারে এসে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বালুসাই, লাড্ডু আর পুরি কিনে, দোকানদারের কাছ থেকে মনপখলে যাওয়ার রাস্তাব হদিশ জেনে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসে সেই সময় দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ফরিদরা দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় রাস্তার মোড় ঘুরে স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল আসছে। এবার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়।

'আগলা চুনাওমে আজীবলাল সিংকো—'

'ভোট দেঁ, ভোট দেঁ।'

'সমাজসেবক আজীবলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

'দেশপ্রেমী আজীবলাল—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'আজীবলালকা চিহ্ন—'

'হাঁথী ছাপ জিন্দাবাদ।'

'হাঁথী পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

রাশেদার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ফরিদ বলে, 'এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসছে।'

নির্বাচন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ঢাকাতেও তারা দেখেছে। এসব তাদের কাছে অজানা কিছু নয়। রাশেদা আস্তে মাথা নাড়ে, নিচু গলায় বলে, 'হাঁ।'

একসময় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা ফরিদদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ওরা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে যায়।

বাজাব এবং বারহৌলি টাউনের শেষ সীমা পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরিদরা একটা চওড়া পিচের সড়কে এসে ওঠে। মিঠাইওয়ালা বলে দিয়েছিল, এই সড়কটা মনপখলের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

এখানেও রাস্তার দু ধারে ফাঁকা ফসলের খেত। দূরে দূরে ঘন গাছপালার ভেতর কিষাণদের গাঁ।

এ রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া। দূরপাল্লার বাস, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, সাইকেল রিক্শা, ট্রাক আর বোগা হাড্ডিসার ঘোড়ায়-টানা এক-আধটা টাঙ্গা। এক কিনার দিয়ে, গাড়িটাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দু'জনে সোজা হাঁটতে থাকে। মনপখলের দিকে যত এগোয়, আবেগে এবং উত্তেজনায় ফরিদের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। রাশেদা কী ভাবছে, বোঝা যায় না। ফরিদের পাশে পাশে সে যেন চঞ্চল পাখির মতো উড়ে চলে।

মাইল দুই হাঁটার পর ওরা মনপখলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, এবার পাকা সড়ক থেকে নেমে ফরিদদের ডান দিকে যেতে হবে। মাঠের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই মনপখল গাঁও।

মাঠে নেমে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে ফরিদ। তার পাশে একইভাবে উড়ে উড়ে চলেছে রাশেদা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পৌঁছে যায়।

হালুইকর বলে দিয়েছিল, মনপখল গোয়ার বা গোয়ালাদের গাঁ। চারিদিকে অজস্র গরু-মোষ চরতে দেখে তা-ই মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের ঝাঁজ বেড়ে গেছে অনেকটা। তবে আগের মতোই জোরালো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনপখলে পৌঁছে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে না ফরিদ। সীমানার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা রাশেদাকেও থমকে যেতে হয়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফরিদের আবেগ এবং উত্তেজনা রাশেদার মধ্যেও যেন চারিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর রাশেদা বলে, 'কী হল, গাঁওয়ে ঢুকবে না?'

চমকে উঠে ফরিদ বলে, 'হাঁ চল।' যেতে যেতে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয় সে, 'হোঁশিয়ার, আমরা যে ঢাকা থেকে এসেছি কাউকে বলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

গ্রামে ঢুকে খানিকটা গেলেই বিরাট পুকুর। ফরিদ বলে, এই তালাও-এর ধারে বসে আগে খেয়ে নিই। তারপর কোথায় আমাদের পুরনো ঘরবাড়ি জমিন ছিল, খোঁজ করব।'

পুরি মিঠাই এবং পুকুরের জল খেয়ে তারা পিতৃভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ফরিদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আগে আর কখনও সে এখানে আসেনি। ঢাকায় থাকতে আব্বা বা দাদীর কাছে মনপখলের কথা অনেক বার শুনেছে কিন্তু তখন কোনোরকম টান অনুভব করেনি। বহুদূরে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অজানা এক ভূখণ্ডের জন্য তার প্রাণ উথলে ওঠেনি। পিতৃভূমি তার কাছে তখন নিতান্তই কথার কথা, ঝাপসা একটা আইডিয়া মাত্র। কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিয়ে ফরিদ টের পায়, না জন্মালেও বা আগে না দেখলেও তার অস্তিত্বের শিকড়টি মনপখলেই থেকে গেছে।

একটা ব্যাপার ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, সাতচল্লিশে পার্টিসানের পর তার

দাদা এবং রাশেদার দাদা এই গ্রাম থেকে সর্বস্ব খুইয়ে ঢাকায় চলে যায়। ঠিক চল্লিশ বছর বাদে তাদের দুই নাতি-নাতনী আশ্রয়ের খোঁজে, হয়ত বা আইডেনটিটির সন্ধানে এখানে চলে এসেছে।

একগুঁয়ে অভিযানকারীর মতো ফরিদ এবং রাশেদা মনপখলের ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দা যাদের বয়স কম তারা কেউ বলতেই পারল না, ফরিদের দাদা মুদাসসর আলি এবং রাশেদার দাদা সামসুদ্দিন হোসেন নামে আদৌ কেউ এখানে ছিল কিনা। তবে তারা শুনেছে, অনেক কাল আগে এই গাঁওয়ে কিছু মুসলমান থাকত, আজাদীর পর তারা কোথায় চলে গেছে, কে জানে। তবে এখন আর কোনো মুসলিম ফ্যামিলি এখানে নেই।

কিছুটা হতাশ হলেও অদম্য উৎসাহে খোঁজ চালিয়েই যায় ফরিদরা। শেষ পর্যন্ত মনপখলের সবচেয়ে প্রাচীন লোকটি তাদের জানায় মুদাসসর আলি এবং সামসুদ্দিন হোসেন এই গাঁওতেই থাকত। সে তাদের চিনতোও।

ফরিদের রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলী চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। সে বলে, 'মেহেরবানি করে বলুন তাদের ঘর কোথায় ছিল—' উত্তেজনায় আবেগে আগ্রহে তার গলা কাঁপতে থাকে।

বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু নেই বেটা।' তারপর আঙুল বাড়িয়ে দূরে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সেটা ফাঁকা শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘরবাড়ির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

সেখানে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফরিদ আর রাশেদা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে যায়।

বিকেলের ঢের আগেই তারা বারহৌলি বাজারে চলে আসে। এবারও দেখা যায় আরেকটা লম্বা মিছিল স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

'দশভকত রামবনবাস চৌবে—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'এম্লে বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'মন্ত্রী বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'রামরাজ লায়েগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'চৌবেজিকা চিহ্ন পেঁড় পর—'

'আগলে চুনাওমে মোহর মারো, মোহর মারো।'

'তুমহারা হামার উম্মীদবার কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'যবতক চান্দ সূরয হোগা—'

'তবতক চৌবেজিকা নারা হোগা।'

'চৌবেজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

রামবনবাসের নির্বাচনী মিছিল আজীবলালের মিছিলের চেয়ে কিছুটা বড় এবং বেশি জমকালো। কিন্তু সেদিকে ফরিদের লক্ষ ছিল না। সে শুনেছে মনপখলে তাদের বেশ বড় বাড়ি ছিল। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, চাল অবশ্য টিনের। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কী দেখে এল তারা? গভীর হতাশা চারিদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে

সন্ধের আগে আগে, আকাশে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই ছন্নছাড়া আস্তানায় পৌঁছে যায় ফরিদবা।

দিন সাতেক কেটে গেল।

এর মধ্যে ওপাব থেকে আরো শ'খানেক মানুষ এসে পড়েছে। বাঁশ চট টালি ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়ে আট দশটা নতুন ঘরও খাড়া করা হয়েছে। আরো ক'টা বানাবার তোড়াজোড় চলছে।

সব মিলিয়ে এখন এখানে আড়াই শ'র মতো মানুষ। ঠিক হয়েছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সীমান্তের ওধার থেকে লোক আসা বন্ধ থাকবে।

আজ সকালে নাস্তা সেরে শওকত ফরিদকে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বেটা।'

কোনো প্রশ্ন না করে ফরিদ বলে, 'যাব।'

কিছুক্ষণ পর তারা বেরিয়ে পড়ে। বিল এবং কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে উঠে শওকত বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?'

এ দিকটা ফরিদের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই ক'দিন আগে বারহৌলি হয়ে সে আর রাশেদা মনপখল গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনও ফরিদ জানে না শওকত তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে—বারহৌলিতে না মনপখলে? জবাব না দিয়ে উৎসুক চোখে শওকতকে লক্ষ করতে থাকে সে।

শওকত নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমরা যাচ্ছি বারহৌলি টৌনে। সেই পলটিকাল লীডারের সঙ্গে দেখা করতে। বড়ে আদমী, আংরেজি উংরেজি বলতে পারে। সঙ্গে একজন 'লিখিপড়ি' লোক থাকা দরকার। তাই তোমাকে নিয়ে এলাম।' শওকত একনাগাড়ে বলে যায়, 'ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা ঠিক না। কখন কী হাঙ্গামা বেধে যাবে, হয়ত এখান থেকে আবার ভাগিয়ে দেবে। তার আগে লীডারকে ধরতে হবে। সিধা ওঁর পায়ে পড়ে যাব।'

শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে।

জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।

শওকতের কথাগুলো ফরিদকে বুঝিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ায় থাকতে হলে পোলিটিক্যাল প্রোটেকসানটা একান্ত জরুরী। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ সে তাকে নিয়ে চলেছে।

ফরিদ আচমকা বলে ওঠে, 'আমরা কার কাছে যাচ্ছি চাচা? আজীবলাল সিং না রামবনবাস চৌবে?' বলেই টের পায় গোলমাল করে ফেলেছে। সে যে বারহৌলির দিকে গিয়েছিল, আর বারহৌলিতে গেলে নিশ্চয়ই মনপখলে হানা দিয়েছে, এটা এবার ধরা পড়ে যাবে।

শওকত অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকায়। বলে, 'ওঁদের নাম তুমি জানলে কী করে? বারহৌলিতে এসেছিলে?'

ফরিদ মুখ নিচু করে মাথা হেলিয়ে দেয়।

চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শওকতের। সে বলে, 'মনপখলেও গিয়েছিলে, তাই না?'

ফরিদ আধফোটা গলায় বলে, 'হাঁ।'

শওকত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, পরে মনপখলের কথা শোনা যাবে। এখন বল, আজীবলাল সিং আর রামবনবাস চৌবের কথা কার কাছে শুনেছ?'

ফরিদ সেদিনের দুটো মিছিলের কথা জানায়।

শওকত বলে, 'ও আচ্ছা। আমরা এখন রামবনবাস চৌবের কাছেই যাচ্ছি।'

বারহৌলি টাউনের এক মাথায় বাজার, আরেক মাথায় 'চতুর্বেদী ধাম'। বিশাল কমপাউণ্ডের মাঝখানে পুরনো আমলের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটার মাথায় রামসীতা মন্দির। কমপাউণ্ড ঘিরে দশ ফুট উঁচু এবং তিনফুট চওড়া দেওয়াল। সামনের দিকে লোহার পাল্লা দেওয়া বিরাট গেট। সেখানে পাকানো গোঁফওলা বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান হাতে বন্দুক এবং গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

শওকতরা 'চতুর্বেদী ধাম'-এ পৌঁছে দারোয়ানকে জানায় রামবনবাস চৌবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বাজখাই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে—'

শওকতেরা চলে যায় না, সমানে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। দারোয়ানের মেজাজ ক্রমশ চড়তে থাকে, সেই সঙ্গে তার গলাও। চিৎকার করে সে বার বার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে গুলি করে শওকতদের মাথা বিলকুল ছাতু করে দেবে।

এই সময় ভেতর থেকে গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, উ লোগোকো অন্দর আনে দো।'

গেটের পরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা হুড-খোলা প্রাচীন আমলের মোটর, দুটো জীপ আর ঘোড়ায়-টানা ফীটন দাঁড়িয়ে আছে। দুটো নৌকর মোটর আর ফীটন ধোয়ামোছা করছে।

দূরে মূল বাড়িটার একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢালা বারান্দায় ইজি চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে ডাক এডিসানের কাগজ পড়ছিলেন রামবনবাস। পাশে একটা নিচু টেবলে আরো অনেকগুলো খবরের কাগজ পর পর সাজানো। আর আছে দু-চারটে জরুরী ফাইল, কলম, দামী কাগজের রাইটিং প্যাড। নিচে একটা মোরাদাবাদী ফরসি, কলকের মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে।

রামবনবাসের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মজবুত স্বাস্থ্য। এই বয়সেও চুলটুল বেশি পাকেনি, দাঁতগুলো অটুট। খাড়া নাক, ধারালো মুখ। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে।

বারান্দাটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে। শওকতেরা ভয়ে ভয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে রামবনবাসের কাছাকাছি নিচের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সেলাম হুজৌর—'

রামবনবাস সোনার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তীব্র চোখে তাদের দেখতে দেখতে বলেন, 'কী হয়েছে? শোর মচাচ্ছিলে কেন?'

'হুজৌর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারবান আসতে দিচ্ছিল না।'

'কারা তোমরা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

শওকত জানায়, তারা এখানে নতুন এসেছে। তবে চল্লিশ বছর আগে এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিল।

কপালে ভাঁজ পড়ে রামবনবাসের। তিনি বলেন, 'মতলব?'

কীভাবে দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকায় তাদের কী হাল হয়েছে এবং এখানে ফিরে না এসে তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে শওকত।

রামবনবাসের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। খাড়া উঠে বসেন তিনি। বলেন, 'তোমরা লুকিয়ে চুরিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছ! ঘুসপৈঠিয়া—ইনফিলট্রেটরস। জানো এটা কত বড় বেআইনি কাজ?'

শওকত এবং ফরিদ হাতজোড় করে একেবারে নুয়ে পড়ে। শওকত রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'হুজৌর মা-বাপ, আমাদের বাঁচান। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে যদি থাকতে না পারি, বালবাচ্চা নিয়ে শেষ হয়ে যাব। এখন আপনার মেহেরবানি।'

অনেকক্ষণ কী ভাবেন রামবনবাস। তারপর বলেন, 'তোমরা কত লোক এসেছ?'

'লগভগ আড়াই শ হুজৌর।'

'আরো আসবে?'

'হাঁ।'

'কত আসতে পারে?'

'বহোত আদমী। তবে এদিকে আর সাত আটশ'র বেশি আসবে না।'

একটু চুপ করে থাকার পর রামবনবাস আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার খবর তোমাদের কে দিলে?'

টাউটদের নাম করে না শওকত। সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'দুনিয়ায় আপনার নাম কে না জানে! এখানে পা দিয়েই আপনার কথা শুনেছি মালিক।'

চাটুবাক্যে মোটামুটি খুশিই হন রামবনবাস। তবে বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। বলেন, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

শওকত ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কী হবে মালিক?'

'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও।'

রামবনবাস চলে যেতে বলেছেন, তবু দাঁড়িয়ে থাকে শওকতেরা।

রামবনবাস বিরক্ত হয়েই এবার বলেন, 'কী হল, গেলে না?'

শওকত মাথা আরো নুইয়ে দিয়ে বলে, 'হুজৌর, আমরা যে এসেছি, অনেকে জেনে গেছে। তারা যদি ঝঞ্ঝাট বাধায়?'

'চার রোজ বাদ তোমবা আমাব সঙ্গে দেখা ক'রো।'

শওকতের আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। 'জি—' বলে এবং বারকয়েক সেলাম ঠুকে তারা বিদায় নেয়।

রামবনবাস চৌবে স্পষ্ট করে তাদের কোনো ভরসা দেননি। অবশ্য চারদিন পর আসতে বলেছেন। তখন তিনি কী বলবেন, কী করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। শওকতের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে থাকে ফরিদের। আংরেজি বলার জন্য শওকত তাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। এতক্ষণ রামবনবাসের হাভেলিতে সে ছিল নির্বাক দর্শক। এবার হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে, 'চৌবেজিকে বলে কি ভাল হল চাচা?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শওকতও হাঁটছিল। ফরিদের প্রশ্নের ধাঁচটা ধরতে না পেরে বলে, 'মতলব?'

'ওরা পোলিটিক্যাল লোক। যদি বিপদে ফেলে দেয়?'

অর্থাৎ রাজনীতি-করা লোকেরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ফরিদের। শওকত বলে, 'কাউকে না কাউকে সাহারার জন্যে তো বলতেই হবে। পলটিক্যাল লীডার ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন দেখা যাক।'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

চারদিন নয়, ঠিক দু'দিন পর সকালবেলায় দুটো ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, হট্টাকট্টা চেহারার লোক এসে লাঠি ঠুকে চেঁচায়, 'কৌন হো শওকত মিঞা আউর ফরিদ আলি?'

মাঠের মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া এই বসতিতে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শওকত এবং ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা। কেন?'

'চৌবেজি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারদিনের বদলে দু'দিনের ভেতর কেন এই তলব, বুঝে উঠতে পারে না শওকত। ভীরু গলায় সে জানতে চায়, 'মালিক কেন যেতে বলেছেন, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না শওকত। চারপাশের ত্রস্ত মানুষগুলোকে খানিকটা ভরসা দিয়ে ফরিদকে নিয়ে লোক দুটোর সঙ্গে বারহৌলি চলে যায়।

দু'দিন আগে 'চতুর্বেদী ধাম'-এর একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় একাই ছিলেন রামবনবাস। আজ তাঁকে ঘিরে গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে চার-পাঁচজন বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে আন্দাজ করা যায় তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট সব মানুষ। উঁচু গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলেন। শওকতদের দেখে তাঁরা থেমে যান।

রামবনবাস বলেন, 'এদের কথাই আপনাদের বলেছিলাম'

তাঁর সঙ্গীরা স্থির চোখে শওকতদের লক্ষ করতে থাকেন। একজন বলেন, 'এরাই তা হলে ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)। এদের কথা আমার কানে আগেই এসেছে। বিলের পাশে পড়তি জমি দখল করে ঘর তুলে বসেছে এরা।'

আরো ক'জন সায় দিয়ে বলেন, 'আমরাও খবরটা পেয়েছি।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় শওকত আর ফরিদ। গলগল করে ঘামতে থাকে।

রামবনবাস শওকতকে বলেন, 'আজ তোমাদের একটা জরুরী কাজে ডাকিয়ে এনেছি। সেদিন তোমরা বলেছিলে, লগভগ আড়াইশ আদমী ওপার থেকে এসেছ।'

কাঁপা গলায় উত্তর দেয় শওকত, 'জি।'

এবার রামবনবাস তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা মনে করছেন, আগলা চুনাওতে আজীবলাল ভাল ভোট পাবে।'

সবাই সমস্বরে জানান, 'হাঁ।'

'কতগুলো সিওর ভোট হাতে থাকলে আমি জিততে পারি?'

'কমসে কম ছসাত শ।'

'ঠিক বলছেন?'

'হাঁ, জরুর।'

রামবনবাস আবার শওকতদের দিকে মুখ ফেরান। বলেন, 'সেদিন বলছিলে ওপার থেকে আরো ছ'সাত শ আদমী এখানে আসবে। এসে গেছে?'

'নেহী মালিক। শুনেছি কিছুদিন পর থেকে আসতে থাকবে।' শওকত শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রামবনবাস বলেন, 'এখানে আট মাস পর যে চুনাও হচ্ছে, তা জানো?'

শওকত ফরিদকে দেখিয়ে বলে, 'জানি না। তবে বারহৌলি বাজারে ও দুটো চুনাওর মিছিল দেখেছে। একটা আপনার, আরেকটা আজীবলাল সিংয়ের।'

'হাঁ।' রামবনবাস নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'এত আগে কেউ চুনাও নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেকেন আজীবলাল ময়দানে নেমে গেছে। আমার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না। ভূচ্চরটা জেতার জন্য দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' বলেই গলার ভেতর থেকে মোটা গমগমে আওয়াজ বের করেন, 'হোঁশিয়ার, ওদের পাল্লায় পড়বে না।'

ভীত মুখে শওকত বলে, 'নেহী মালিক, নেহী।'

'আর শোনো, আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন পেঁড়। পরে যারা ওপার থেকে আসবে তাদেরও ভোট দিতে হবে।'

এই সময় নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে ফরিদ বলে, 'লেকেন মালিক আমরা ঘুসপৈঠিয়া, আমরা এদেশে ভোট দেবো কী করে?'

তার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন রামবনবাস। বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার নেই। তিনি বলেন, 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। লেকেন হোঁশিয়ার, আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা গোরে চলে যাবে।'

পাশ থেকে শশব্যস্তে শওকত বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ মালিক, আপনাকেই আমরা ভোট দেবো, এই জবানের এদিক ওদিক হবে না। লেকেন আমাদের কী হবে? ফরিদ ক'দিন আগে মনপখল গিয়েছিল। সেখানে আমাদের বাপ-দাদার ঘর 'বরাবর' করে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা কোথায় থাকব? কী করব?'

'ওখানে কিছু করা যাবে। ভোটটা আগ দাও, ইণ্ডিয়ান বনো। তারপর ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

শওকত আর ফরিদ চুপ করে থাকে।

রামবনবাস আবার বলেন, 'আজ যে সব কথা হল, কাউকে বলবে না। মুহ বিলকুল বন্ধ।'

'হাঁ মালেক।'

আরো কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে আরো কয়েক শ লোক এসে পড়ে।

এদিকে নির্বাচনের কারণে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম-ধরা দুপুরে দুটো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আরো কয়েক দিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশন কার্ড হয়ে যায়।

দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ

এসে এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশন কার্ড হয়ে যাবার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের শ'তিনেক লোক চিৎকার করতে করতে এসে হানা দেয়।

'ঘুসপৈঠিয়া হিন্দুস্থানসে—'

'দফা হো, দফা হো।'

'বিদেশী—'

'ভারত ছোড়ো, ভারত ছোড়ো।'

ঘণ্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।

তারপব ঊর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।

রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হ'ন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগোকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে, রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইণ্ডিয়ান। কোনো ভূচ্চরের ছৌয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত করনা। শুধু আমার ভোটের কথাটা মনে রেখো।'

'জি। জান গেলেও ভুলব না।'

ঘণ্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ভাঙার মাঝখানে তাদের সেই সৃষ্টিছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে আসতে থাকে। বৃটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পর বাংলাদেশী। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দূরমনস্কর মতো হাঁটতে-হাঁটতে মনে-মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।

# জটায়ু

## দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ হতে-হতে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আবার অন্ধকার। কিছু-কিছু নানা চেহারার গাছ আকাশ, মাটি ও শূন্যতার সঙ্গে কালি-ঝুলি মেখে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ছিটিয়ে আছে।

আজ জোনাকিও ছিল না। এই অমাবস্যায় নাকি জোনাকি জ্বলে না। অন্ধকারটা কাদার মতো থিকথিক করছিল। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা, কোথাও আলো-অন্ধকার কিছু নেই। পৌষ মাস। হিম পড়ছে, যেন ফোঁটা-ফোঁটা অন্ধকার।

আর চতুর্দিকের সেই অবিশ্বাস্য পরিবেশের ভেতর কয়েকটা হ্যাজাকেব আলোয় ছোটো আসরটা আরো অবাস্তব মনে হচ্ছিল। শুধু প্রতিমার ওপরে চটের ছাউনি ছিল। এবারও দাশরথি মূর্তি গড়েছে। গাঢ় নীল শরীর। ফুটছে। টকটকে লাল জিভ। টানা চোখ। গলায়, হাতে কয়েকটা মুণ্ডু। বুঝি এইমাত্র কেটে আনা হল।

সন্ধিপুজোর আয়োজন করা রয়েছে। বুড়ো ঠাকুর কুশের আসনে উবু হয়ে বসে বিহুলভাবে প্রতিমার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে গল্প বলার সুরে মন্ত্র পড়ছে। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্খলিত কণ্ঠে ডেকে উঠছে—মা, মা। বাদুড়ের ডানা সেই ডাকটা অন্ধকারের ঝাপটা তুলে হারিয়ে যাচ্ছে। ঢাকি এসেছে চারজন। ছোট ছেলেটা কাঁশি বাজায়। বসে-বসে গাঁজা টানছে। একটু পরে নিত্যচরণের নাচের সঙ্গে বাজাতে হবে। তারপর বলি, পুজো।

মায়ের চোখের সামনে ঠাঁই হয়েছে। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে আট-দশ হাত জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে, জল ঢেলে-ঢেলে পেছল করা হয়েছে। হাঁটতে চলতেই কষ্ট। এর ওপর নেত্যচরণ পাখির মতো উড়বে। মাথায়, দাঁতে পেতলের মালশা থাকবে। মালশায় আগুন। আর নেত্যচরণ শরীর মুচড়ে, পায়ের ভর ঠিক রেখে আশ্চর্য ছাঁদে নাচবে। আগুনের ভেতর নাচবে। আগুন বয়ে নাচবে। নেত্যচরণ আগুন হয়ে যাবে।

মাতব্বর ছোকরারা ছোটোখাটো আয়োজনে চারদিকে দৌড়ে ফিরছে। শেষ সময়ের ব্যস্ত, বিচ্ছিন্ন হাঁক-ডাক সেই অদ্ভুত পরিবেশ আর আয়োজনের সামনে অত্যন্ত নিরর্থক মনে হবে। কে-একজন অকারণে বলির ছাগলটার সামনে আরো কিছু কাঁঠালপাতা ডাঁই করে দিল। মানুষ-জনা আগুন জ্বলবার আগেই যেন শিখার উত্তাপটি গায়ে পেয়ে একটু পিছিয়ে বসল। মেয়েরা আলাদা। শ্মশানের গায়ে পুজো। তাই ছেলেপিলের কোলাহল নেই। শুধু গাঁয়ের কুত্তাকটা ঠিক চলে এসেছে। মাটি শুঁকে-শুঁকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুর্গা মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিল। মেয়েদের সারিতে একদম শেষে, কোণ

ঘেঁষে বলেছিল। অন্ধকার এদিকে আলাদা ছায়া ফেলেছে। আগে এই রাতটিতে তার ঠাঁই ছিল সামনে। সেখানে আগুনের মৃদু আঁচ লাগে কি না লাগে। নিত্যচরণের প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি চাউনি স্পষ্ট দেখা যায়। দুর্গা সেই পেছল কাদামাখা ঠাঁইটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করল, আগে, অনেক আগে, আমি যেন কী-একটা, আমি যেন—তারপর হঠাৎ বুঝল আসলে সে এখন কিছুই ভাবতে পাবছে না।

উদাসীনভাবে লক্ষ্য করল অন্য ঝি-বউরা তাকেও আজ বিশেষ চোখে দেখছে। নিত্যর বউ বলে সমীহ করছে। আর অবাক হয়ে বুঝল নিত্যচরণের পরিচয়ে সম্মান পাওয়ার দিন তার এখনও শেষ হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গে উরু দুটো জ্বালা করে উঠল। দম চেপে, চোখ বন্ধ করে দুর্গা অসহায়েব মতো বসে রইল। সেই ভয়টা, সেই ভয়টা, আবার, এখন। বুক ঢিবঢিব করছে। হাত আর পায়ের ডগাগুলো ঝিঁঝি পোকার ডাক তুলে কী যেন বলতে চায়।

ছুটির পর ফেরার পথে লোকটাকে স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে দেখেছিল। তার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা কুঁচকোলো, হাসল। দুর্গা মুখ ঘুরিযে তাড়াতাড়ি হাঁটতে-হাঁটতে একটা মেযেদের কামরায় উঠে পড়ল। তারপর সমস্ত পথ শুকনো বাঁশপাতা হয়ে কেঁপেছে। কে লোকটা? আমার দিকে এভাবে তাকাল কেন? হাসল কেন? চশমা ছিল কি চোখে? উঁহু, পাতলা গোঁফ। পরনে ধুতি, না প্যান্ট? মনে পড়ছে না, চিনতে পারছি না, চিনতে পারি না। হাসল কেন? চেনে নাকি? কোন স্টেশনে যাবে? নাকি এমনিই পিছু নিয়েছে?

প্রতিটি স্টেশনে চোখদুটো তীক্ষ্ণ অথচ অন্যমনস্ক করে সে লোকটাকে খুঁজছিল। তারপর নামবার সময় হঠাৎ দেখল একটা জোয়ান ছেলে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িযে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তার মুখেব দিকে চেয়ে বিড়ি ধরাতে ভুলে গেল। কোনোদিকে না-তাকিয়ে দুর্গা সোজা মাঠের পথ ধরল। এই লোকটাই কি? কিন্তু ওর তো গোঁফ নেই, পরনে পায়জামা। তবে আমার দিকে তাকাল কেন? সেই লোকটা, না, আর-একজন?

পর-পর মুখগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো চেহারাই স্পষ্ট হয় না। কাউকেই বিশেষভাবে মনে পড়ে না। অনির্দিষ্ট একটা অবয়ব অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। দুর্গা মিলিয়ে নেবার চেষ্টায় হাঁপাতে থাকে। একটা রোমশ হাত, শুধু হাত, তার বুকে বিশ্রী চিমটি কাটে। তারপর গলাটা টিপে ধরে।

মাঠের আলপথে সেদিন ভিড়। সবাই যাবে পুজো দেখতে, নাচ দেখতে। দুর্গা যেতে-যেতে নানা মুখে নিত্যর নাম শুনল, নানা সত্য-মিথ্যে গল্পের অসংলগ্ন অংশ। যারা চেনে, হেসে কথা বলল। যারা চেনে না তাকে অবাক হয়ে দেখল, ফিশফিশ করে নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ল। আর দুর্গা প্রতিটি মুহূর্ত চাপা উত্তেজনা ও সন্দেহ নিয়ে এক অনির্দেশ্য আতঙ্কের তাড়া খেয়ে জানোয়ারের মতো ঘাঁড় গুঁজড়ে হাঁটতে-হাঁটতে কান খাড়া রাখল।

ভিড় সহ্য হয় না। আমার ভালো লাগে না। আমার ভয় করে। কেউ কারু সঙ্গে হেসে কথা বললে বুক ছাঁৎ করে ওঠে। কেউ তাকালে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ অপরিচিত কাউকে দেখলে আমার সন্দেহ হয়। চেনা লোক অজানা কারু সঙ্গে কথা বলছে দেখলে হাত-পা কাঁপে। ভিড় সহ্য হয় না—আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সবসময় কী একটা ষড়যন্ত্র চলছে বুঝতে পারি। আমি জানি, আস্তে আস্তে এখানেও তার জাল ছড়াবে। আস্তে-আস্তে এখানেও জাল ছড়াবে। আস্তে-আস্তে ছড়াবে। আমি জড়িয়ে যাবো। তারপর একটা হাত আঙুল তুলে বলবে, এই-যে, এই-যে। সেই হাতটা পেটে সুড়সুড়ি দেবে না। গলায় নখ বসাবে না। তবু আমি মরে যাবো। আমি যাবো। কোথায় জানি না। ঘরটায় শান্তি ছিল। নিজের বাড়িতে চোরের মতো পালিয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছিলাম। দাপুটে মানুষটাও চোরের মতো লুকিয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছিল। আমাদের সবাই মমতা করত। আমরা প্রায় মুছে গিয়েও কোনোরকমে ছিলাম। আজ আবার ঘর থেকে বেরুল। আমাকে টেনে আনল। ভিড় ভালো লাগে না। এত চোখ সইতে পারি না। ভয় হয় কী যেন হবে। হয়তো আজই হবে। প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির হয়ে বসে দেখব। সে অস্থিরতা প্রকাশ পেলে চলবে না। তারপর আমি কী করব? তারপর, আমি, কী করব? তারপর, আমি, সেই লোকটা, সেই হাতটা, নাচবে। আমি নাচ দেখব।

তখন তাকে বীর মনে হচ্ছিল।

পরনে আঁটোশাটো জাঙ্গিয়া ছিল। উদোম শরীরটি পিছলে চকচকে করছে। জলের ওপর তেলের মতোই এক টুকরো ময়লা কাপড় নেত্যর কোমর কামড়ে ভাসছে।

নেত্য আজ সেজেছে। সাবান ঘসে-ঘসে মাথার চুল ফাঁপিয়েছে। কপালে সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটেছে। গলায়, বাহুতে টকটকে পাকা জামের তুল্য ডব্‌কা পুঁতির মালা। চিকন, চিরোল পাতার দেমাকে বুকখানি টালমাটাল। উরু আর পায়েও বেশ পুরুষালি লোম আছে। তাবৎ শরীর জুড়ে পেশী, শিরা ফুলে পাকিয়ে সে-এক কাণ্ড। নেত্যর চোখে ঘোর লেগেছে। গোঁয়ারের মতো মুখে সবসময় কেমন একটা উদাসীন, অন্যমনস্ক হাসি ফুটিয়ে রেখেছে।

তারপর দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউ-দাউ করে আগুন ছড়াল। আগুনের বেড়াজাল। বেড়ার ভেতব নেত্য। নেত্যর দুটো হাত নেই। এক-দুই-তিনবারে বেড়াটা গুটোতে-গুটোতে হয়ে আসবে। মাথায় আর দাঁতে আগুনের মালশা নিয়ে নিত্যচরণ নাচছে। আস্তে সোহাগে পিছল কাদার ওপর পা ফেলছে।

আর ঢাকে কাঠি পড়েছে। আগুনের তাতে চামড়া টান করে বেঁধে নেওয়া ছিল। মাছরাঙা পাখির পালকের সাজ ঢাকের গা বেয়ে নৃত্যরত অনার্য প্রস্তরমূর্তির মাথায় যেন বীরছত্র ধরেছে। আগুনের শিখায় টলটল করে জ্বলছে। চিকন-তীব্র সুরে কাঁশি বাজছে। বুড়ো ঠাকুর স্খলিত গলায় চেঁচাল, মা, মা। বলির ছাগলটা ভয় পেয়ে একবার ডেকে উঠেই কাঁঠালপাতা চিবুতে লাগল। আর একসঙ্গে চিৎকার করে কুকুরগুলো মাটি আঁচড়াতে শুরু করল।

দুর্গা আগুনের দিকে স্তব্ধ তাকিয়ে ছিল। মাটির বুকে আগুন। অন্ধকারের বুকে আগুন। আগুনে শত রঙয়ের আবর্ত। আর ধোঁয়া। অন্ধকার কাঁপছে, আগুন কাঁপছে,

ধোঁয়া কাঁপছে। ঢাকের আওয়াজগুলিও একটি দ্রুত শব্দ হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

এত আগুন কতদিন দেখিনি। নিত্যচরণদের বংশে নাচ ছিল। ও এবার নাচবে কেউ ভাবেনি। সারাটা বছর যে কী-এক ভয় আর বোকামিতে মাথা নিচু করে দিন কাটায়, বৌয়ের রোজগারে খায়, সে এখন আগের দিনের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই মুগ্ধ দেখছে। আর আমার কুচ্ছিত লাগছে। আমার ঘেন্না হচ্ছে। আগুনের আঁচে ওর কাটা কনুইদুটোর প্রত্যেকটি সেলাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আ, লজ্জা নেই। নিশ্চয়ই কোনো মতলব ভেবেছে। আমি বিশ্বাস করি না। আর কী চায়? আ, কী চাও? সকলের সামনে একটা ঠাট্টার মতো আমাকে বসিয়ে রেখে নাচতে নামল কেন! সন্দেহ করছে কি? সন্দেহ। করবে। কী! সেদিন আমি তাহলে—সেদিন, আমি, সেদিন, আগুন—আরও বেশি, সমস্ত বাড়ি পুড়ে গেল। বাবাকে তার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বাবা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে দৌড়ুচ্ছিল। বাবার চুলে, দাড়িতে আগুন লেগে গেল। বাবা টেনে-টেনে পরনের ধুতি খুলে ফেলেছিল। বাবা চিরজীবন গাঁয়ে গাঁয়ে কথকতা করেছে। কিন্তু পুরাণের কোনো বীর বাতাসের মতো ছুটে এসে বাবাকে বাঁচাল না। বাবাকে বেরুতে দিল না। আর বাবার সেই কথকতা করা মিষ্টি গলার বাক্সুসে চিৎকারে, বাঁশফাটার আওয়াজে, আজানের শব্দে আকাশটা যখন চিরে গেল; তখন ওরা আমাকে সেই জ্বলন্ত বাড়ির আলোয় খোলা মাঠে শুইয়ে ফেলল। আমার পাশে আমার মাকে। একটা হাত বুকে চিমটি কাটতে লাগল। বাড়ির পোড়া ছাই উড়ে এসে চোখে পড়ছিল। আমার খুব গরম লাগছিল, অথচ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলুম!

মা, মা। বুড়ো ঠাকুর আবার চিৎকার করল।

দুর্গা চমকে তার দিকে তাকাল। কতকাল কাউকে মা বলে ডাকিনি। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল সে এখানে বসে। এখানে, এই শ্মশানের ধারে, নদীর এপার। আমার মা গেল, বাবা গেল, দেশ গেল। মা মুখে আগুন পায়নি। কতকাল কাউকে মা বলে ডাকিনি। বুড়ো ঠাকুর কি বলে চেঁচাচ্ছে? কে সাড়া দেবে? কেউ কি দেয়? কোনোদিন দেয়? তবে আমার এমন হল কেন? তবে আমার এমন হল কেন? পালিয়ে এসে স্টেশনে থাকতে নিত্যচরণের সঙ্গে বিয়ে। তারপর ওরা জোর করে জঙ্গল কেটে গ্রাম দিল। ঘর উঠল। খেয়ালি দাপুটে মানুষটা বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায়, নদীর এপারে এসেও কিছুতে ভয় পায় না, কাউকে ভয় পায় না। কিন্তু ওর সঙ্গে ঘর করতে করতেও আমি আতঙ্কে মরি। সেই হাতটার ভয়ে মরি! আমি হাতটাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। ফাটা-ফাটা কর্কশ তালু, কালো কালো নখ, কেন্নোর মতো ফুলে ওঠা শির। আমার নতুন আশ্রয়টি দুমড়ে দিতে চায়। সরল বিশ্বাসী দুটো চোখের সামনে আমাকে আসামীর মতো দাঁড় করাতে চায়। আমাকে নিয়ে খেলা করে আর বুকে চিমটি কাটে। ঘুমের মধ্যে নিত্যচরণের হাতটাই আঁচড়ে ধরে কতদিন চিৎকার করে উঠেছি। ও আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করেছে। গোঁয়ারের মতো বলেছে, সব হবে, এপারেই আবার হবে। ও আমাকে মায়ের মতো সান্ত্বনা দিত। কতদিন কাউকে মা বলে ডাকিনি।

মা, মা। বুড়ো ঠাকুর আবার চিৎকার করল। আর হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ মৃদু হয়ে গেল। তারপর বাইরে থেকে কে যেন একগোছা পাটখড়ি ছুঁড়ে দিল। অমানুষিক কৌশলে নিত্য দ্বিতীয় বেড়াটায় দপ করে আগুন জ্বালল। দাউ-দাউ-করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দুটো আগুনেব বেড়া গোল হয়ে জ্বলছে। মধ্যিখানে নিত্য নাচছে। ঢাকের আওয়াজটা আস্তে-আস্তে চড়ছে। দ্রুত হচ্ছে। ঠনঠন করে কাঁশি বাজছে। আর বলিব ছাগলটা হঠাৎ ভয় পেয়ে ডাকতে শুরু করেছে। ছাগলের চোখ দুটোয় আগুনের ছায়া কাঁপছে। এবং সেই অন্ধকারে কালীব মূর্তি, ঢাকের বাদ্যি, কিছু আবছায়া মানুষ ও মায়াবিনী আগুনের মধ্যে নিত্যচরণেব ভৌতিক নাচের চারিপাশে ছাগলের একঘেয়ে ডাক একটা জান্তব ফাঁদ সৃষ্টি করেছে।

কানেব কাছে ফিশফিস করে কে কাঁদছে। আবেগের সময় মানুষটার বুকে চাপড় মেবে কথা বলার স্বভাব ছিল। ফিশফিশ করে কে কাঁদছে। বউ, ঠুঁটা হইয়া আমি বাস্তায় বাইর হইতে পারুম না। নিত্যচরণ সেদিন বুক চাপড়াতে পাবল না। বউ তুই খাবি কী? বুক চাপড়াতে পারল না। বউ, আমি ঘরে বইসা, তুই চাকরি করস? বুক চাপড়াতে পারল না। বউ, তরে কেউ মা বইলা ডাকব না। বুক চাপড়াতে পারল না। বউ, এত রাইত অব্দি তুই কী করস? বউ, তুই পান খাইয়া আসছস ক্যান? বউ, তুই নযা নয়া শাড়ি পাস ক্যামতে? বউ, আমি তরে ছাড়া কিছু জানি না। ফিসফিস করে কে কাঁদছে।

আওয়াজটা ক্রমে স্পষ্ট হল। গমগম করে দূরেব ব্রীজ পার হয়েছে। একটা মালগাড়ি। শুধু সামনে আলো আর ইঞ্জিনঘরে আগুন, কটা মানুষ। ঝুঁকে পড়ে এদিকে দেখল।

নাচতে-নাচতে নিত্যচরণ যেন দুর্বোধ্য বিস্ময়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। অজ্ঞাতে তার পা দ্রুত হয়ে উঠেছে। অজ্ঞাতে ঢাকের বাজনা দ্রুত হয়ে উঠেছে। অজ্ঞাতে বুড়ো ঠাকুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলে মা-মা বলে চিৎকার করে উঠেছে। দুর্গা স্তম্ভিত হয়ে দেখল নিত্যচবণের মাথা থেকে মালশাটা পড়ে গেল, যেন পরম বিরক্তিতে সে সমস্ত বাহুল্য ঝাঁকিয়ে ফেলে দেবে। ছাগলের কান্না ছাপিয়ে কুকুরগুলোর গর্জন বাতাসে টাল খাচ্ছে। ট্রেনের আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা যায়, বুঝি হাত বাড়ালেই দুর্গা ছুঁতে পারবে। কালো কালো পাথরকুচি, ক্ষয়া কাঠের তক্তা, চকচকে লাইন। ট্রেনের চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। নাট-বল্টুগুলো ঝনঝন করে বাজছে। লাইন দুটো থরথর করে কাঁপছে। ট্রেনটা দৌড়ুচ্ছে। পেটে, বুকে, পিঠে দু-তিনটে সুপুরির পুঁটলি বাঁধা ছিল। ঐ ব্রীজের কাছেই নাকি সিগনাল পেল মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সার্চ হবে। সমস্ত চালু গাড়ির কামরার তলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। থরথর করে লাইন দুটো কাঁপছিল। থরথর করে খোয়াইগুলো কাঁপছিল। গাড়ির চাকা, নাট, বল্টু ঝনঝন ঝনঝন বাজছিল। আর হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ নাকি নিত্যচরণ পিছলে গেল। লাইনের ফাঁকে পড়েছিল, তাই মরল না। ভয়ে কিংবা জেদে দু-হাতে গাড়িটা টেনে থামাতে চেয়েছিল। লোহার চাকা একটা কবজি আর একটি ডানা কামড়ে

ছিঁড়ে নিল। তারপর আবার ফিশফিশ করে কানের কাছে কে কাঁদছে। ক্যান্ এমন হইল, বউ ক্যান হইল। কে কাঁদছে। কোন পাপ ত করি নাই। কে কাঁদছে, বৌ, বৌ, বৌ-রে। তারপর ঢাকের শব্দের মধ্যে ট্রেনের আওয়াজ দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মিলিয়ে গেল। আর আবার সকলে কেন জানি হিংস্র অথচ ভীত গলায় আর্তনাদ করে উঠল, মা, মা।

তখন দু-প্রস্থ আগুনের মধ্যে নিত্যচরণ নাচছে। মাঝে-মাঝে আগুন আর ধোঁয়া তাকে আড়াল করছে। থিকথিকে পেছল কাদার ওপর পা ফেলছে। সমস্ত গায়ে ঘাম। একটু আগে যাকে বীর মনে হচ্ছিল, এখন তার দিকে তাকাতে বুক শুকিয়ে যায়। কারণ চোখ দুটো লাল হয়েছিল আর মুখে সেই উদ্ধত উদাসীন হাসি ছিল। উদোম, দাপুটে শরীরটায় ঠুঁটো দেখলে হঠাৎ মনে হয় পুরাণের একটা পুরুষ মাটিতে নেমে এসেছে। তার সামনে আগুনের বথ। কালীমূর্তি লজ্জায় জিভ কেটেছে।

আবার কে পাঠখড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে। নিত্যচরণ তৃতীয় বেড়াটায় আগুন দিল। এবার কাদাব মধ্যেই আগুন জ্বলে উঠল। নাচবার জন্যে সাকুল্য দু-তিন হাত জায়গা রয়েছে। যেন নিত্যচরণেরই গা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। ভয়ে কেউ-কেউ আর্তনাদ করে উঠল। উত্তেজনায় অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো ঠাকুর মা-মা বলে চিৎকার করল। এবার কেউ গলা মেলায়নি। ছাগলটা দাপিয়ে দড়ি ছিঁড়তে চায়। শুকনো জিভ বেরিয়ে গেছে। আর কুত্তাকটা বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। কুকুরেও ভয় পায়। কাঁদে।

কে শক্ত করে ঘাড়টা চেপে ধরেছে। আচ্ছন্নের মতো চোখ তুলে দেখল ন-বাড়ির ছোটো বৌ! ও জানে না দুর্গাকে চেপে ধরেছে। কানের কাছে কে বলল, রাক্ষুসি। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে আস্তে-আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দুর্গা দেখল, কেউ নেই। কে বলল, তর পাপে। কে বলল, মরুম। দুটো হাত বাড়িয়ে দুর্গা তার পা দুটো ধরতে গেল। হাত জোড়া শুকনো দুটি পাতার মতো আস্তে কোলেব ওপর এলিয়ে রইল।

উত্তেজনায় ঢাকিরাও নাচছে। পাথরের শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। বুড়ো ঠাকুর প্রতিমার সামনে নাচতে শুরু করেছে। যে ভিনগাঁয়ের মানুষটা পুরুষদের সারিতে বসে অনেকক্ষণ তাকে দেখছিল, মনে হল আস্তে ধীরে কোমর দুলিয়ে নেচে-নেচে সেও যেন এদিক পানে আসছে। দুর্গা দেখল হঠাৎ তাবৎ মেয়ে-পুরুষ নাচতে শুরু করেছে। আর তিনটে সারিতে গোল হয়ে আগুন নাচছে। লাল, হলুদ, বেগুনি। ধোঁয়া নাচছে। ছাই, পাটকিলে, কালো। আগুন ছাপিয়ে ধোঁয়া। ধোঁয়াটা ফুলে ফেঁপে উঠল। ধূসর হয়ে গেল। হোটেলের পর্দাটা ফেঁপে উঠল। ধূসর হয়ে গেল। একজোড়া চেয়ার দিয়ে ভেতর থেকে কেবিনের দুটো মুখ আটকে দিল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। তবু তার ভীষণ গরম লাগছিল। অথচ শীতে কাঁপছিল। চোখের সামনে সে বাড়িটা পুড়তে দেখছিল—বাবা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটছে, বেরুতে পারল না, আজানের শব্দ, পোড়া ছাই চোখে পড়ল। তারপর ট্রেনের আওয়াজ, লাইনের ওপর চাকা গড়াচ্ছে, নাট-বল্টু ঝনঝন ঝনঝন বাজছে, দুটো হাত দিয়ে সে গাড়িটা থামাতে চেয়েছিল, পোড়া ছাই চোখে পড়ল। হোটেলের কাউন্টারে রেডিও বাজছে, তারপর সেই লোমশ কর্কশ হাতটা গলায় সুড়সুড়ি

দিল, আঙুলে আংটি। দুর্গা প্রাণপণে দু-হাতে নিজের গলা ধরে চিৎকার করে উঠতে চাইল।

কেউ শুনল না। পেছনের লাইনে আলো অন্ধকারে ভৌতিক ছায়া ফেলে একটা ট্রেন তীব্র শব্দে মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল। ময়দানব তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে। আর তিনটে বেড়ায় আগুন নাচছে। নিত্যচরণ নাচছে, তাবৎ মেয়ে-পুরুষ নাচছে। ঢাকের বাজনা নাচছে।

বেড়ার ভেতর থেকে যেন চিৎকার করে বলল, বউ?

কী কও?

আয় আমরা মরি।

না গো। মরতে বড় ডর।

তবে কী করুম?

তুমি কও।

এইভাবে বাঁচুম?

হ গো, তবু ত তুমি বাচবা।

এইভাবে বাচবি?

জানি না।

এইভাবে বাচুম?

হ গো। তবু ত আমরা বাচুম।

বউ, এইভাবে বাচবি?

আর পারি না।

তবে কী কস?

আর পারি না।

আয় মরি।

আর পারি না।

দুর্গা অস্ফুটে বলতে লাগল, পারি না, পারি না, পারি না, পারি না। আবার কানের কাছে কে বলল, রাক্ষুসি। কে বলল, তর পাপে। মা, মা। বুড়ো ঠাকুর চেঁচাল। ভয়ে ভক্তিতে উত্তেজনায় অনেকে কাঁপাসুরে গলা মেলালো। আর নিত্যচরণের দুই চোখ তখন কালীর জিভ। সমস্ত গা ফেটে ঘাম বেরুচ্ছে। কাদায় পা এলোমেলো হয়ে উঠেছে। যে-কোনো মুহূর্তে টলে পড়ে যাবে। মুখ থেকে মালশাটা ফেলে দিল। গা ঘেঁষে শেষ বেড়ার আগুন। কাদার মধ্যে আগুন, মাটির বুকে আগুন। দাউ-দাউ জ্বলছে। নাচতে-নাচতে জ্বলছে। এলোমেলো পা ফেলে নাচতে-নাচতে জ্বলছে। যে-কোনো মুহূর্তে বুঝি টলে পড়ে যাবে। কাটা কনুই-দুটো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। একটা ক্লান্ত, অতিপ্রাকৃত আত্মা কোনোরকমে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। আর বলির ছাগলটার সঙ্গে রাস্তার কুত্তাকটা গলা মিলিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।

দুর্গা দেখল আগুনটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে। তিনটে বেড়া এক হয়ে গেল। তিনটে সৃষ্টি এক হয়ে গেল। আর কে যেন সেই আগুনের স্রোত মন্থন করে উঠে দাঁড়িয়ে গমগম করে বলল, আমি এসেছি। আমি জানি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারোনি। দুর্গা আচ্ছন্নের মতো হাঁটু গেড়ে বসল। নিত্যচরণকে আর দেখা যায় না। তাদের কলোনিটা পুড়ছে। তারপর আগুনের রথ কলকাতার দিকে ছুটল। যে-হোটেলে চাকরি করে তার কেবিনের পর্দা পুড়ে গেল। আগুন নিষ্ঠুর শাসকের মতো চারদিকে সব কিছু পোড়াতে লাগল। একটা শিশু-ছেলে পুতুল হাতে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে পালাল। আগুন ছড়াল। সমস্ত মানুষ হা-হা করে নদীর দিকে ছুটল। নদী শুকিয়ে মরুভূমি। পদ্মা শুকিয়ে মরুভূমি। দেশ শুকিয়ে মরুভূমি। পৃথিবীটা মরুভূমি। আগুন ছুটে আসছে। কোথায় পালাবো? চোখে ছাই উড়ে পড়ছে। দুর্গার ভীষণ গরম লাগছে। অথচ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। অস্ফুটে বলল, এত বড় বোঝা কে আমারে দিল! বলল, আমি চাই নাই তুমি মর, কোনোদিন চাই নাই। জীবনে বড় সাধ আছিল গো।

তারপর দুর্গা স্পষ্ট দেখল আগুনের বেড়ার ভেতর তার নিয়তি এসে দাঁড়িয়েছে। যে-শত্রুর চেহারা সে স্পষ্ট করে চিনত না অথচ প্রতিমুহূর্ত যার ভয়ে কাঁপত—সে নিত্যচরণের চেহারায তার ভাঙা ডানাটা উঁচিয়ে দুর্গাকে দেখিয়ে বলছে, এই-যে, এই-যে, এইখানে।

# অধিরথ সূতপুত্র

## অমলেন্দু চক্রবর্তী

মিঃ আবদুল আহাদ, বি. এ.
হাটখোলা রোড,
টিকাটুলি
ঢাকা—৫
পূর্ব পাকিস্তান।

কলকাতা শহবের এসপ্লানেড অঞ্চলেব কার্জন পার্কে ভরাট দ্বিপ্রহরে কোনো এক গাছের ছায়ায় বসে সে এই শব্দগুলি পরিষ্কার হরফে লিখল একটি খামের ওপর। একসঙ্গে অনেক কথা, স্মৃতিময় অতীত ভেসে উঠল গোধূলির ছায়ায়—বুড়িগঙ্গার জল, সদরঘাটের কামান, জগন্নাথ কলেজ, জামালের চাযের দোকান, নাজমা, নাজমার মা...কিন্তু কোনো ভাবাবেগ নয়, সে তার পকেট থেকে ভাঁজ-করা চিঠিটা বের করল। গভীর মমতায় সে এটা লিখেছে এতক্ষণ। আরও একবার পড়ে দেখা প্রয়োজন বোধ করল। উত্তেজনায় এমন কিছু লিখল কিনা যাতে ওরা ভুল বোঝে, অথবা আঘাত পায় অথবা অন্য কোনো ক্ষতি—সত্যি বলিতেছি, আমার সমস্ত বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি যেই স্থানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি তাহার ঠিক পিছনেই রাজভবন, তাহার পাশে ময়দান, যাহাকে গড়ের-মাঠ বলে। দূরে ফোর্ট উইলিয়ামের চূড়া দেখা যাইতেছে। তুই কল্পনাও করিতে পারিবি না, কলিকাতা কি বিরাট শহব এবং এই গড়ের-মাঠের দৃশ্য কি মনোরম। আমি অবাক হইয়া ভাবি, ময়দানে এত কচি সবুজ ঘাস এত ফুল এত গাছ এত বাতাস থাকিতে কলিকাতা শহব এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল কেন? অথচ এই কলিকাতার সহিতই আমার লড়াই। আমি ভারতবর্ষেব নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছি। এই দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি. এ' ডিগ্রি ছাড়া আরও একটি নূতন সার্টিফিকেট জুটিয়াছে—'রিফিউজি'। ডিগ্রিতে যোগ্যতা প্রমাণিত না হইলেও, নূতন সার্টিফিকেটে বেশ করুণা ভিক্ষা করা যায়। সুবিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এক অনাহূত অজ্ঞাত-কুলশীল। আজও কোনো চাকরি পাই নাই। আমার কোনো পরিচিত রথী-মহারথী নাই। কলোনির নোংরা আবহাওয়ায় সকলেই ধীরে ধীরে মরিয়া যাইতেছে। ছোটভাই মণ্টু সকালে রেলগাড়িতে দাঁতের মাজন ফেরি করে, একদিন ট্রেন চাপা পড়িবে। বোন দুইটির লেখাপড়া হইল না। বিবাহের কথা কল্পনা করাও কঠিন। উহারা নষ্ট হইয়া যাইবে। সব দেখিয়া মায়ের অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, মনে হয়, তিনিও আর বেশিদিন বাঁচিবেন না। ইচ্ছা করে, আবার তোদের মধ্যে ফিরিয়া যাই। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে এখন আবার পাসপোর্ট ভিসা প্রভৃতির প্রয়োজন, যাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দেশভাগের পর বাবা গৃহত্যাগ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার

মৃত্যুর পর কতিপয় দুর্বৃত্ত আমার দাদাকে সুত্রাপুরের পুলের তলায় হত্যা করিয়াছে বলিয়া সেদিন বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম এবং মায়ের তাড়নায় কুমারী বোন দুইটির কথা ভাবিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় নাজমাকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাহাকে বলিস, একজন হিন্দু যুবককে ভালোবাসিয়া সে ভুল করিয়াছে। তাহাকে দিবার মতো কোনো কিছু, এমনকি চিঠি লিখিবার ভাষা বা শক্তিও আমার নাই। জানি, আবার ফিবিয়া গেলে নাজমার প্রেম পাইব কিন্তু মাতৃভূমির ভালোবাসা পাইব না। মৃত্যুর পূর্বে দাদা তাঁহার আততায়ীব চোখে চোখ বাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানে আমি আমার প্রতিপক্ষকে দেখিতে পাইতেছি না। মনে হয়, কোনো এক অদৃশ্য দেবতা আমার শত্রুকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। ঢাল তলোয়ারবিহীন নিধিরাম নই বলিয়া মনুষ্যজন্মের যে অহঙ্কার ছিল, জানি না, তাহাব কি হইবে...

এসপ্লানেডেব বড় দেয়াল-ঘড়িটায চোখ পড়তেই সে হকচকিয়ে উঠে পড়ল। আড়াইটা বাজে, এখনই গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই বিরাট বাড়িটার সামনে। চিঠিটা সে তখনই পোস্ট কবল না। ভাঁজ করে পকেটে বাখল। ট্রাম-বাস-মোটরের ভিড় এবং জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে এগোতে এগোতে, এগোবাব সব সম্ভাবনাকেই কেমন কৌতুক বলে বোধ হলো তাব। ভাঙা পুরনো বেকর্ড বাজানোর মতো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এ চাকরিও হবে না। তবু বৃন্দাবনখুড়োর মর্যাদাবক্ষা। কলোনির 'সি' ব্লকের বৃন্দাবন ভট্টাচার্য বিভিন্ন পুজো-পার্বনে ছুটির দিনে বাড়ি-বাড়ি পুরোহিতের কাজ করেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিস-ফেরত খালি-পায়ে ধুতির কোঁচা গলায় জড়িয়ে পিতলের সাজিতে গঙ্গাজলের ঘট বসিয়ে দোকানে দোকানে কল্যাণ-মন্ত্র উচ্চারণ করে বেড়ান। সবাই জানে, কলকাতার কোনো এক অফিসেব কেরানি বৃন্দাবন খুড়ো। কিন্তু সেদিন তাঁকে বিচিত্র বেশে আবিষ্কার করা গেল।

খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে চাকবির সন্ধানে সে এসেছিল এখানে। তিনতলার লিফটে ঢুকবার মুখেই বৃন্দাবনখুড়োর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা।

'কি ব্যাপার, আপনি?'

বৃন্দাবন খুড়ো কাঁপছেন লজ্জায়, বিহ্বলতায়। পরনে খাকি ফুলপ্যান্ট, গায়ে মোটা শাদা চাপকান, বুকে লাল-সুতোয় নকশা কেটে কোম্পানিব আদ্যক্ষর—'পি.এল.সি.'।

অস্বস্তি কাটাতে নিজেই হেসে সহজ হয়েছিল সনাতন—'তাতে কি খুড়ো, তবু তো চাকরি করছেন একটা, নিজের রোজগার।'

তারপরই জেনেছিল, এই ক্রীতদাসের বেশ থাকে নিচে দারোয়ানের কাছে। ধুতি-শার্টে কলোনি থেকে আসেন, পোশাক বদলে অফিসে ফরমাশ খাটেন, বিকেলে আবার বাবু সেজে ঘরে ফেরা। সবাই জানে, এমনকি নিজের ছেলেমেয়ের কাছেও তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিচয়—ভদ্র কেরানি।

সংসারে গুনে দেশলাই-এর কাঠি খরচ করো খুড়ো, আমি জানি। তবু তোমার এত লজ্জা, পোশাকের জন্য সংকোচ? পথ হাঁটতে হাঁটতে হাসি পেল তার। কিন্তু এই

বৃন্দাবন ভট্টাচার্যই একটা মহৎ উপকারে লেগে গেলেন একদিন। কলোনিতে সকালে-রাতে যখন-তখন এসে দেখা করেছেন ঘরে এসে। আশ্বাসও দিয়েছেন—চাকরি একটা জুটিয়ে দেবেনই। চেষ্টা করেছেন। মরিয়া চেষ্টা। অফিসের কোন এক সদাশয় কেরানিবাবুকে ধরেছেন, কেরানিবাবু অনুরোধ করেছেন হেড-ক্লার্ককে, হেড-ক্লার্ক মানেই বড়বাবু, বড়বাবু খুশি হলেই বড়সাহেব মঞ্জুর করবেন।

বৃন্দাবনখুড়োর নির্দেশেই হেড-ক্লার্ক ভদ্রলোককে প্রণাম করতে হলো। তিনি খুশি হয়ে কিঞ্চিৎ কুশল প্রশ্ন, দেশের খবর, কিছুটা জ্ঞান এবং উপদেশ দানের পর শর্ত রাখলেন—বৌবাজারেই তাঁর বাড়ি। আপিশ থেকে ফেরার সময় ওপথেই তো যেতে হবে শ্যালদা ইস্টিশন। সুতরাং বিকেলের দিকে তাঁর ছেলেমেয়েগুলোকে ঘণ্টাদুয়েক দেখিয়ে শুনিয়ে গেলে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। অবিশ্যি চাকরি তো এখন হবেই। ভবিষ্যতে প্রমোশন বা অন্যান্য সুখসুবিধার কথাটাও তিনি ভাববেন।

বড়সাহেব তখন ডিকটেশন দিচ্ছিলেন স্টেনোকে। সুতরাং আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো। ডাক পড়ল সাড়ে তিনটে নাগাদ।

'কি নাম'?

প্রায় ফুটবল-মাঠের মতো লম্বা একটা কাঁচ-ঢাকা টেবিলের ওপারে নিখুঁত সাহেবি পোশাকে বসে ছিলেন বড়সাহেব। দামি সিগারেট থেকে একগাল পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ওড়ালেন সামনের দিকে। দূর থেকে বড়সাহেবের মুখটা অনেকটা যেন মেঘের আড়ালে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো।

'সনাতন ঘোষ।'

'দেশ কোথায়?

'ঢাকা।'

'ঢাকা। কোথায়?'

'গেণ্ডারিয়া। গ্রামেও আছে, শাক্তা। বুড়িগঙ্গার ওপারে।'

'হুঁ, তুমি তো আমার দেশের লোক হে। আমাদেরও বাড়ি ঢাকা। উয়ারি চেনো?'

'হ্যাঁ, সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।'

'উমাপতিবাবু কে হন তোমার?'

উমাপতিবাবু' সনাতন কিঞ্চিৎ বিচলিত।

'আজ্ঞে না, না...' পার্শ্ববর্তী হেড-ক্লার্ক ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের দিকে টেনে নিলেন প্রসঙ্গটা—'না, ও আমার কেউ হয় না স্যার। আমাদের বেন্দাবনের সঙ্গে এক কলোনিতে থাকে। গরিব মানুষ, এত করে ধরেছে। তাই...'

'কে বৃন্দাবন?'

'বেন্দাবন ভটচায। আমাদের আর্দালি...'

'হোআট...' হঠাৎ একটা বুনো শুয়োরের বীভৎসায় গর্জে উঠলেন বড়সাহেব। ঝুঁকে

পড়লেন টেবিলের ওপর—'একটা পেটি আর্দালির রিকমেণ্ডেশনে একজন রেসপনসিব্‌ল ক্লার্কের চাকরি হয় নাকি এখানে। কি ভেবেছেন আপনারা?'

তখন বৃন্দাবনখুড়োর চেয়ে আরও করুণভাবে কাঁপছেন হেড-ক্লার্ক—'আজ্ঞে না, ও ঠিক তা নয় স্যার। লেখাপড়া জানে, গ্র্যাজুয়েট...'

'ড্যাম ইয়োর গ্র্যাজুয়েট। কত এম, এ., এম, এসসি ফিরে যাচ্ছে এখান থেকে। খবর জানেন?'

খুব কাছেই ছিল দরজাটা। সনাতন পেছন ফিরল।

'ইউ, ইউ কাম হিয়ার...'

সনাতন তখন বাইরে। আতুড়ঘরের দরজায় ভীত উৎকণ্ঠ নির্বোধ স্বামীর মতো জবুথবুঁ দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃন্দাবন ভটচায। বড়সাহেবের গর্জনটা বোধহয় শিশুর প্রথম কান্না বলেই ভুল হয়েছিল তাঁর, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন—'কি রে, হলো?'

সনাতন হেসে ফেলল।

ওর মুখে হাসি দেখে বৃন্দাবনও চোয়ালভাঙ্গা মুখে পায়োরিয়ার দাঁত খুলে হাসলেন —'খবর ভালো তো সব?'

'ভালো মানে। সে এক মজার ব্যাপার, ভীষণ মজা। পরে কলোনিতে গিয়ে বলব...বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলব।'

এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে বিরাট হলঘরের আলো, মানুষ, কর্ম-কোলাহলের জটলা ভেদ করে তীব্রবেগে বেরিয়ে এলো সনাতন। বৃন্দাবন ভটচায মুখ্য নন, তিনি অনুমান করলেন। আরও দ্রুত-গতি পিছু-ছুট তাঁর। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ভেঙেই নামছিল সনাতন, ওপর থেকে ডাকলেন—'সনাতন, শোন্ শোন্ সনা...'

প্রায় একতলায় নেমে এসেছে সনাতন। মাথা উঁচিয়ে তাকাল ঊর্ধ্বে—'তোমার ভয় নেই খুড়ো, ঘাবড়ো না। তুমি এত্ত বড় বিলাতি ফার্মের কেরানিবাবু। কেরানি...বা..বু...'

বাইরে তখন ঝাঁঝালো রোদ। গড়ানো পাথরের পিছলানিতে চারতলা থেকে নেমে সনাতন ক্লাইভ স্ট্রিটের তাতানো ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। সামনেই রাস্তার ফেরিওয়ালা থেকে ডাব কিনে আকাশে সূর্য দেখার ভঙ্গিতে আকণ্ঠ তৃষ্ণার জল পান করছিলেন একজন বিদেশী মহিলা। সতৃষ্ণ তাকিয়ে থেকে সনাতন তার স্নিগ্ধতা, পরিতৃপ্তি নিজের মধ্যে অনুভব করে হাঁপাতে লাগল। তাকাল পশ্চাদ্‌বর্তী বিশাল কপাটটার দিকে, কপাটের শীর্ষে সাততলা পাথুরে দৈত্য। তাকাল সরলরেখায়। চোখ ঝলসানো রোদে ঝলমল করছে কলকাতার প্রাসাদ অট্টালিকা। পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতিকে সচল রাখার অক্লান্ত বাসনায় বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে এর ভেতরে ভেতরে। মানুষগুলি ছুটছে—বাসে মোটরে পদব্রজে। যেন এইমাত্র খবর এসেছে—মানবসভ্যতা ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ স্তরে এসে পৌঁছে গেছে। সবাই ব্যস্ত, হন্যি হয়ে ছুটছে সকলেই, দেখা যাক...এই শেষ চেষ্টা...যদি তাকে বাঁচানো যায় শেষ পর্যন্ত...

প্রচণ্ড গতির মধ্যবিন্দুতে সনাতন স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন নিজেকে

ভীষণ একা, বড় নিঃসঙ্গ, নেহাত-ই অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হলো তার। নাজমাকে মনে পড়ল। নাজমার স্মিতমুখ, নরম চোখ, লাল শাড়িতে নাজমা আগুনের মতো জ্বলত।

সনাতন হাঁটতে শুরু করল। সরকারি লালকুঠির কাছে এসে লালদীঘির জল দেখতে পেল—সবুজ গাছ, ওপারে টেলিফোন-ভবন, এদিকে জি.পি.ও'র ঘড়ির কাঁটায় সময়, চলতি বাসের জানলায় মেয়েদের মুখ। ক্ষিধে পেয়েছে তার। আজকাল ক্ষিধে পেলেই পেটে কেমন-একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়, ক্লান্তি আসে। তবু এগোতে হবে। প্রতিটি মন্থর পায়ে ভেঙে-পড়া অবসাদ। এখানে ফুটপাতে বসবার ঠাঁই নেই। লালদীঘিতে গাছ আছে, ঘাসের অভাব। যেতে হবে সেই ময়দান। সেখানে খোলা আকাশ, খোলা বাতাস। প্রাণ ভরে ঘুমোতে চেষ্টা কববে। নইলে সন্ধ্যায় আবার তো সেই কলোনির আলোবাতাসহীন গুমোট অন্ধকার। কতগুলি মরা-মানুষের মুখ—অর্ধাহার, অনিদ্রা, আত্মগ্লানি আর বিবেকের চুলকুনি।

অনেক কষ্টে সনাতন নিজেকে টেনে নিয়ে এল লালদিঘির অপর প্রান্তে। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট মিশন রো-র সঙ্গমে। কলকাতাকে এখানেই সবচেয়ে রূপসী উর্বশী মনে হয় তাব। থরে-থরে কুবেরেব সাজানো সিন্দুক দুপাশে। নয়নাভিরাম। যেখানে দাঁড়িয়ে আরো একবার সে তার যুদ্ধক্ষেত্রকে দেখল তীক্ষ্ণ নজরে—শত্রুপক্ষের সৈন্যসমাবেশ, তাদের পরাক্রম। প্রতিটি ইমারত অট্টালিকাই যেন লৌহবর্ম শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত সতর্ক সেনানী।

অথচ তাদের সমবেত রক্তচক্ষুর সামনে তাব একক প্রতিরোধ নিজের তুচ্ছতাকেই তাৎক্ষণিক বিব্রত করে। শরীরটা টলছে, স্নায়ুতে অসহ্য দাহ। মস্ত এক প্রাসাদের পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে সে কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করল। ঠিক এই মুহূর্তে বাঁচার জন্য একটু খোলামেলা নিশ্বাস চাই তার, কিছুটা খাদ্য, তেষ্টার জন্য বিনিপয়সার জল।

নাজমা তুমি ভুল করিয়াছ। সূর্য যেখানে অফুরন্ত আলো দান করিয়া মানুষকে জীবনীশক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই আলোকিত জগতে তুমি যাহাকে ভালোবাসিয়াছ, সেখানে তোমার নায়ক কুলপরিচয়শূন্য জারজ সন্তানের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছে...সনাতন মনে মনে একটি সম্ভাব্য প্রেমপত্রেব খসড়া তৈবি করে আরাম পেল—স্বদেশ-বিদেশের সীমান্ত আমাব নিকট এক্ষণে এক বায়বীয় বিভ্রম। আজন্মকাল যাহাকে পরম বিশ্বাসে মাতা বলিয়া জানিয়াছি, আজ চিনিলাম—তিনিই আমার বিমাতা। অথচ নবলব্ধ স্বদেশ-গৃহে আমার জন্য কোনো আশ্রয় নির্ধারিত হয় নাই। প্রেম নাই, ভালোবাসা নাই, মনুষ্যত্ব নাই। সুবিপুল অন্ধকারে অন্ধত্ব তোমাকে...একমাত্র তোমাকেই সত্য বলিয়া মানে। তুমি কি আসিবে? সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই পারে? একজন মুসলমান রমণী পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে—ইহাতে পৃথিবীর মানুষের কাছে কিছু প্রমাণিত হইবে কিনা জানি না, তবে হলপ করে বলিতে পারি, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামব্যাপী তোমার তসবির ছাপা হইবে। তৎসহ দীর্ঘ প্রশস্তি। তুমি বিখ্যাত

হইবে। এবং আমিও বাঁচিব। জানিব, জীবনটা মিথ্যা হইয়া যায় নাই...

কিন্তু পরমুহূর্তেই সনাতন তার স্বাভাবিকতায় ফিরে এল। আমি কি উন্মাদ? নাজমা আসবে? কোন দুঃখে! এবং কেন? সে হাঁটতে শুরু করল। এখনও তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হবে এই শহরের পথে পথে। সন্ধেবেলা সে যাবে। ম্যাঙ্গো লেনের সেই ঝকঝকে বাড়িটার পাঁচতলায়।

কিন্তু মেঘ জমছে দক্ষিণের আকাশে। ময়দান কালো হয়ে উঠছে। একটা চাপা উত্তেজনার আভাসও সে প্রত্যক্ষ করল দুপাশের পথচারী জনতার ব্যস্ততায়। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-মোটরগুলি দলা পাকিয়ে যাচ্ছে রাজভবনের মোড়ে। কেউ কেউ ভিড় এড়াতে গাড়ি ঘোরাতে ব্যস্ত। রাস্তা কি বন্ধ? কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে সে-ও এগোতে চাইল। একঝাঁক পুলিশ কুচকাওয়াজ করে তালে-তালে ভারি বুটের পা ফেলে এগিয়ে গেল। আরও পেছনে আরও এক ঝাঁক। শস্তা উপন্যাসের বিচক্ষণ পাঠকের মতো সে যেন এক পলকেই বুঝে ফেলল—পরবর্তী ঘটনাগুলি কি এবং কি হতে পারে? বিক্ষুব্ধ জনতা এসেছে রাজভবনের সিংহদ্বারে, রাজকর্মী পথ দেবে না। স্লোগান, ধিক্কার, প্রতিবাদ, উত্তোলিত ঝাণ্ডা আর সহস্র মুষ্ঠি—কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি-চার্জ, গ্রেপ্তার, প্রয়োজনবোধে গুলিচালনা।

কালো সিন্দুক গোছের প্রকাণ্ড তিনটি গাড়ি। ওরা খাঁচায় পুরে নিয়ে যাবে। খুব কাছাকাছি এসে সনাতন থমকে দাঁড়াল। এরপর পা বাড়ানোর বিপদ সে জানে । নির্বিচার ধর-পাকড়। দূর থেকে সে শুধু বিক্ষোভকারী জনতার একটা অংশকে দেখতে পেল এবং তৎসহ প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ, একটানা চিৎকার। শহর উত্তাল। স্লোগানগুলি বোঝা যাচ্ছে না ঠিক-ঠিক, পোস্টারগুলির ভাষা থেকে জানা যায়—উদ্বাস্তু জনতা। খাদ্য পুনর্বাসনের দাবি।

ঢাকার সে-রক্তাক্ত দিনগুলির কথা মনে পড়ল তার। সমস্ত দেশ জুড়ে অশান্ত ঝঞ্ঝা, প্রবল উত্তেজনা। শ্বাসরোধী সন্ত্রাসের রাজত্বে রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসে দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার-সাঁটা, দিনের আলোয় বুলেটের মুখে মিছিল, শোভাযাত্রা। ভাষা-আন্দোলনের নির্ভীক কর্মী এবার চোখ ফেরাল জনতা থেকে সরকারি ব্যস্ততার দিকে। সামরিক কায়দায় সারি বেঁধে বেরিকেড তৈরি করেছে পুলিশ। অনেকটা যেন ডালহৌসি-চৌরঙ্গির গর্বিত অহঙ্কারী উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর প্রতিহারী ভূমিকায়। তেমনি ভয়ঙ্কর, তেমনি স্পর্ধিত।

একটা অতর্কিত চাঞ্চল্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল সমস্ত অঞ্চল। উত্তেজনা হৈ-চৈ চিৎকার। কিছু মানুষ ছুটে পালাচ্ছে ইতস্তত, তিনটে প্রিজনার-ভ্যান দ্রুত ছুটে গেল সামনের দিকে। আরও দুটো ওয়ারলেস ভ্যান এসে সজোরে ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, খুব কাছাকাছি।

'পালান, পালান, ওরা অ্যারেস্ট শুরু করেছে...'

'লাঠি-চার্জ করবে মনে হচ্ছে...'

'টিয়ার-গ্যাসের সেল্ দেখেছেন হাতে...'

'শালারা...'

'আমাদের দাবি মানতে হবে। খাদ্য চাই বস্ত্র চাই আশ্রয় চাই, চাই চাই চাই...'

একদা-ভাষা-আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী এবার একটু পিছিয়ে এল। উত্তেজনা শেষযাত্রায় উঠেছে। তিনটে পুলিশ কি নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষটাকে! অমানুষিক। ওরা কি লাঠি চালাতে শুরু করেছে? এত আকাশ কাঁপানো উন্মত্ততা কেন? এত চিৎকার! বিস্ফোরণ? কাঁদুনে গ্যাস্? সনাতন এবার দৌড়োতে শুরু করল।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে মানুষগুলি ভিড় করে আছে ম্যাঙ্গো লেনের মুখে। রাজভবনের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠ উন্মুখ সবাই। যেন বাজিতে আগুন ছুঁয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখার মজা—কি হয়, কি হয়? সনাতন হাঁপাতে-হাঁপাতে সেই ভিড়ে এসে মিশল।

'দেখেছেন মশাই, অ্যাদ্দুরেও চোখ জ্বলছে। টিয়ার গ্যাস।'

'আর মশাই টিয়ার গ্যাস। লাঠি মেরে পেঁদিয়ে লাট করে দিচ্ছে শালারা...'

'ধন্যি বটে মানুষগুলোর জান।'

'আমরা তো দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি।'

'যা বলেছেন দাদা, আন্দোলন-ফান্দোলন করা ভালো, যদি পরের ছেলে করে।'

'কি বললেন?'

'না, কিচ্ছু না...'

ভিড়ের মধ্যেই টুকরো-টুকরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ। সেখান থেকেও সরে এসে একেবারে পেছনে ম্যাঙ্গো লেনের ভেতর ঢুকল সনাতন। মানুষের জটলা যেখানে হালকা। বুক টেনে নিশ্বাস নেওয়া যায়। পেটের ব্যথাটা হঠাৎ-ই কোথায় উধাও হয়ে গেছে, ক্ষিধের অনুভূতিও ভোঁতা। সে শুধু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। তার সম্মুখবর্তী কলকাতা সত্যি এক যুদ্ধক্ষেত্র এখন। উন্মত্ত ক্রোধ আর বিক্ষুব্ধ আক্রোশের আঘাত, প্রতি-আঘাত। এবং এই যুদ্ধে সে এক স্বার্থপর পলাতক। লজ্জিত হবার কিছু নেই, অপমানবোধেও পীড়িত নয়। শুধু ভাবতে পারল, আরও বড় লড়াই তার। মরামানুষের লড়াইটা মৃত্যুর সঙ্গে নয়, বাঁচার সঙ্গে।

'কটা বাজে বলতে পারেন?' সনাতন পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোকের হাতঘড়ি দিকে নির্দেশ করল।

ভদ্রলোক বোধহয় ভালো করে তাকালেনও না ঘড়ির দিকে—'পোনে ছটা...' পৌনে ছয়! সে কি! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে? সনাতন সন্দেহ ঘোচাতে আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। কিন্তু হৈ-হট্টগোলে তিনি তখন নেই। আরও একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল—পাঁচটা। পেছন ফিরে তাকাল একবার। শেষবারের মতো। নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা কিছু ঘটছে ওদিকে।

রইল পড়ে মানুষ আর মানুষের জনতা, জনতার সংগ্রাম। বিনা দ্বিধায় এবং নিঃসঙ্কোচে তাকাল সামনের দিকে। যে পথে সে পালাচ্ছে সে পথেও এই নির্মম কলকাতা।

সনাতন পাঁচতলা হলুদ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় আর্দালি-চাপরাশি-দারোয়ানদের একটা জটলা। সবাই সোৎসুক দূরবর্তী সোরগোলের দিকে। লিফট বন্ধ। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শরীর ভেঙে পড়ে। তবু উঠতে হয়। ফুটপাত থেকে ধাপে ধাপে তিনতলার ঊর্ধ্বে। ময়মনসিংহের শশধর মিত্তির সব-হারানোর-দেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়েই এসেছিলেন এপারের সব পেয়েছির দেশে। 'এল-পি-লোন', 'এচ-বি-লোন' নিয়ে কলোনিতেই একটা দোচালা তুলেছিলেন, ক্যাশ-ডোলেই এককালে সংসার চলত তাঁর। চালাক মানুষ, বিষয় বুদ্ধিতে নিপুণ। কলকাতা এলেন। কলকাতা বোকা থাকতে দেয় না কাউকেই। দুনিয়ার হালচাল দুদিনেই সমঝে নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন জীবন নির্মাণে। জায়গাজমি থেকে শুরু করে, লোহালক্কর, পাট হয়ে বিয়ের ঘটকালি পর্যন্ত অসংখ্য দালালি। জমি কিনে বাড়ি করেছেন দমদমে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সানাই বাজিয়ে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সিও চড়েন, সনাতন দেখেছে। সেই শশধর মিত্তিরই কলোনিতে গিয়ে খবব দিয়েছেন—চাকরি তিনি দেবেন। তবে যে-কোনো শর্তে রাজি হলেই এ চাকবি। নইলে যেয়ো না।

সনাতন এল। প্রকাণ্ড দরজা আগলে বসেছিল নেপালি দরোয়ান। বাধা দিলো—কাঁহা যাইয়েগা আপ। আপিস বন্ধ হো গিয়া।'

'কিন্তু আমার যে আসার কথা ছিল।'

'কিসকো মাঙ্গতে?'

'শশধরবাবু, শশধর মিত্র।'

দারোয়ান চলে গেল। একটু পরে ছুটে এলেন শশধর মিত্র স্বয়ং—'এসেছ? বাঁচা গেল। ভাবছিলাম...'

সনাতন হাসল—'একটা চাকরি আমার দরকার কাকাবাবু।'

'আরে, সে তো বটেই, বয়স তো হয়েছে। তা কি করবি বাবা, পাকিস্তান যদি না হতো তবে কি আমবা...'

মস্ত বড় অফিস, বিশাল পরিসর। মাথার ওপর পাখাগুলি সারাদিনের ক্লান্তিশেষে জিবোচ্ছে, হলঘবটাকে অন্ধকার থেকে বাঁচানোর জন্যই ইতস্তত কতিপয় টিউব বাতি জ্বলছে তখনও। সনাতন অনাসক্তের মতো এগোতে লাগল। সামনের রেলিংটা পেরিয়ে, একটা টেবিল ডানদিকে রেখে অন্যটা বাঁয়ে সরিয়ে এঁকেবেঁকে এগোতে এগোতে শশধর মিত্র সুইংডোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দরজাটা একটু ঠেলে বললেন—'আয় বাবা, আয়...'

এ-জাতীয় পরিবেশ এবং বড়বাবু বড়সাহেব তার মুখস্থ এখন।

পরিচয় হলো। সাদর আমন্ত্রণ পেল সনাতন। রীতিমত বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত। ঘরে আরও পাঁচজন ছিলেন—প্রৌঢ়, প্রায়-প্রৌঢ় এবং যুবক। এঁদেরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই চাকুরিপ্রার্থী এবং একই উদ্দেশে এই নিভৃত ইন্টারভিউ। বাবুর্চি এল ট্রে-হাতে। চা-প্যাটিসের প্লেট সাজানো হলো সকলের বুক ছুঁয়ে। আশ্চর্য বকমের শাদা ঝক্‌ঝকে কাপ

আর প্লেটগুলি। দেহের যাবতীয় ক্লান্তি আর ক্ষুধার অনুভূতি যখন সবই প্রায় ভোঁতা হয়ে এসেছে, সনাতন মাথা তুলে তাকাল। য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে নানাধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টসের আমদানি করে এমন একটি ভারতবিখ্যাত ফার্মের স্বত্বাধিকারী গুজরাটি বণিক তার মুখোমুখি। ভয়ঙ্কর আর জান্তব মেদল শরীরে প্রসন্ন হাসি। মাথার ওপর গান্ধীজি, জওহরলাল। দ্রুত সে তার চারদিকের আসবাবপত্র, মানুষ, দরজাজানালা, সেফের মাথায় সিদ্ধিদাতা গণেশমূর্তি থেকে নিজের বক্ষলগ্ন চায়ের ধূসর বর্ণ পর্যন্ত সর্বত্রই চোখ বুলিয়ে নিলো। কুরুক্ষেত্র কলকাতার নিভৃতে এক আলাদা জগৎ এবং স্পষ্টই বোঝা যায়—দুর্যোধনের গোপন শিবির।

টেলিফোনে কথা বলছিলেন বড়সাহেব। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ প্রসন্ন সম্ভাষণ—'জেন্টলমেন, উই আর রিয়েলি হ্যাপি টু গেট ইউ হিয়ার অ্যাণ্ড...'

তারপর ইংরেজি শব্দ-কণ্টকিত আধা-হিন্দি, আধা-বাংলায় আসল বক্তব্য উপস্থাপনায়—দেশের স্বাধীনতারক্ষার মহান দায়িত্ব আমাদের। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা শহীদ এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করতে যাঁরা আত্মোৎসর্গে এগিয়ে আসবেন তাঁদের মর্যাদা শহীদদেরও উর্ধ্বে। কোম্পানি আজ একটু বিপন্ন। এ-ব্যাপাবে আপনারা যদি একটু সাহায্য করেন তবে কোম্পানি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। ইনি মিঃ বোস, কোম্পানির স্টোর ডিপার্টমেন্টের একজন বিশ্বস্ত কর্মী এবং ইনি মিঃ বক্সি, সেলস অ্যাকাউন্ট সেকশনে আজ সাত বছর কাজ করছেন। কিন্তু আপনি একজন বাইরের লোক। এঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। সরকারের সঙ্গে যে-ব্যাপারে আমাদের মামলা চলছে তাতে আপনারা স্বীকার করবেন—আপনারা তিনজন মিলে গত তিন বছরে কোম্পানির লক্ষাধিক টাকা নষ্ট করেছেন। ভয় নেই, চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলেও আপনাদের রক্ষার যাবতীয় খরচ কোম্পানির। শাস্তি যাতে না হয় তার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করা হবে। শাস্তি হলে কারাদণ্ডের বছরগুলোতে আপনাদের সংসার প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্বও কোম্পানির। ফিরে এলে কোম্পানি আজীবনকাল আপনাদের সেবা পেয়ে ধন্য হবে। এখান থেকেই প্রচুর সঞ্চয় নিয়ে রিটেয়ার করবেন। এবং আপাতত...

সনাতন টলে উঠল। স্নায়ুতন্ত্রীতে তোলপাড় চলছে—ঘাম। এক কাপ চায়ের পরও গলাটা শুকনো—তেষ্টা।

বড়সাহেবের ভ্রূকুটিতে তীক্ষ্ণতা—'কি বলছেন? এগ্রিড?'

সবগুলি দৃষ্টি সনাতনের ওপরই নিবদ্ধ তখন। ছিপ ফেলে জলের দিকে অপলক চোখগুলি। ফাৎনা নড়লেই ওদের চোখের পাতা কাঁপবে। সনাতন অনুভব করল, তার ক্ষীণ কণ্ঠনালীতে কার শক্ত হাতের থাবা।

বড়সাহেবের কণ্ঠস্বর পুরোহিতের মন্ত্রের মতো—'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইউ টু ডাই লাইক দোস্ হাউলিং হাংগ্রি বেগারস্। খবর পেলাম, পুলিশ লাঠি চালিয়েছে—প্রচুর জখম হয়েছে, অ্যারেস্ট করেছে আরও অনেক, গুলিতে মরেছে দু'তিনজন...'

সনাতন ঘামছে। সব কটা উদগ্রীব চাউনির কেন্দ্রে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বে বুদ্ধিভ্রষ্ট

সে। মনে পড়ছে তার—এমনি এক রুদ্ধশ্বাস পুলিসী-জেরার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল একদিন। সে ছিল আরও ভয়ঙ্কর—খোলা রিভলবার আর লক্‌লকে চাবুকের হুঁশিয়ারী। তেজী আলো, জ্বলন্ত সিগারেট চামড়ায়। ক্রোধে আর অপমানে ফেটে পড়েছিল আজিজ আর বসির। এবং আজ, সনাতন যাদুকরের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করল। কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠ, আধো আধো গোঙানির স্বর—'আওয়ার নর্মাল হার্টবিট্ সোজ এ হায়ার রেট দ্যান দ্যাট অব ইয়োর্স মিঃ বাজাজ। আই নিড্ সাম্ রেস্ট।'

'পোভার্টি'জ এ সিন। ফাইট ইট আউট্ জেন্টলম্যান...' বড়সাহেবের ভ্রূকুটি আর কপালের বলিরেখায় আত্মতৃপ্তি বড় বেশি ভরপুর—'ইনি মিঃ চোপরা, কোম্পানির ম্যানেজার, ইনি মিঃ বোস, অডিটর, ইনি মিঃ চৌধুরী, ল-অ্যাডভাইসর। এঁরা আপনাকে কেসটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আপনি শুধু...'

দেহমনের একীভূত সমস্ত শক্তি গলা ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল। পারল না সনাতন। ঠাণ্ডা ঘরে বড় বেশি জুড়িয়ে আসছে সে। তেষ্টা। হয়তো-বা রক্তের চঞ্চলতায় শরীরে শিরায় চোখেমুখে কিছুটা আভাস ছিল যন্ত্রণার। চমকে উঠল। যেন গোটা চারেক কোষমুক্ত তরবারি ঝলসে উঠল সম্মুখ-সমরের প্রতিক্রিয়ায়। এনাসথিসিয়া সম্পূর্ণ না করেই বিছানায় শুইয়ে ছুরি-কাঁচি চালাতে চায় হিংস্র কুটিল ডাক্তার।

আস্তে আস্তে উঠে এলেন শশধর মিত্র। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শান্ত, স্থির, লঘুস্বরে—'ডোন্ট বি সিলি...'

সনাতন চমকে তাকাল।

শশধর মিত্রের কটাক্ষে কুটিল ভ্রূকুটি। কানে কানে অলক্ষ্যের ভাষা—'গোটা কলকাতা শহর এখন অন্ধকার। পুলিশের কড়া টহল চারদিকে। ট্রাম পুড়ছে, বাস পুড়ছে, পুলিশের গুলি চলছে। মানুষ মরছে। এতটা পথ তোমায় হেঁটে যেতে হবে এই রাতে। তা ছাড়া...' শশধর মিত্র কণ্ঠস্বরকে আরও বিনীত করে আনলেন—'এরা গোটা ভারতবর্ষ চালায় সনাতন। অফিসের সিক্রেট ফাইল, তোমার কাছে ফাঁস করে দিয়ে এখন কিছুতেই দে উইল নট স্পেয়ার ইউ অ্যাট দ্য কস্ট অব দেয়ার সিকিউরিটি...'

'কিন্তু আপনি...' সনাতন থরথর কাঁপছে।

'ভেবে দেখো। নাউ ইট্ ইজ ইয়োর টাস্ক্ টু থিঙ্ক...'

সমস্ত উত্তেজনা শিথিল হয়ে আসে। হাঁটু কাপছে। অনিবার্য সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার শত্রুকে দেখছে—তার সুখী তৃপ্ত নিরুত্তেজ যুদ্ধজয়ের হাসি।

'এগুলোতে সই করো সনাতন।'

শশধর মিত্র একটা ফাইল নিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। নিজেরই পকেট থেকে কলমের ক্যাপ খুলে ধরলেন।

একটা কালো পর্দা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের সামনে। সনাতন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো।

'ডোন্ট গেট এক্‌সাইটেড জেন্টলম্যান। উই স্যাল্ গিভ্ ইউ লাইফ টু লিভ্, ওয়েল্থ

টু এনজয়...' মিঃ বাজাজ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

মাথার ওপর ঘূর্ণ্যমান পাখাটা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসছে, মনে হলো। কয়েকটা মানুষ জনতা হয়ে উঠছে চারপাশে। ঝাপসা, অস্পষ্ট, দুলছে দেয়ালগুলি। কাঁপছে। সমস্ত শরীর টলছে তার। ধীরে ধীরে এনেসথেসিয়া সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। শরীর অবশ। শশধব মিত্র কলমটা ওর হাতেব মুঠোয় তুলে দিলেন—'সই কবো।'

সনাতন সই কবল। একটি নয়, অনেকগুলি। মিঃ চোপরা এগিয়ে এসে দেখিযে দিলেন। পিঠ চাপডালেন আদরে।

গলা শুকিয়ে এসেছে। কাতরস্বরে উচ্চাবণ—'জল...'

বেল টিপলেন মিঃ বাজাজ—'বেয়ারা, একঠো অরেঞ্জ স্কোয়াস।'

এই সুন্দব পৃথিবীতে এত আনন্দময তৃষ্ণার জল। সনাতন আকণ্ঠ পান কবল।

...

মা-ব আঁচল ভবে টাকা তুলে দিযে সনাতন অসম্ভব তিক্ততায কাবণে-অকারণে ভাইবোনদেব ভর্ৎসনা করল, কাঁদাল। এবং সবশেষে আত্মগ্লানি আব ধিক্কারে আশ্রয নিলো নিজেব নিভৃতে। রাত বেশি নয। তবু পুবো কলোনিটাই ফুটপাতেব বেসামাল মেযেমানুষেব মতো ঘুমোচ্ছে তখন। স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেয় দর্মা-ছাওযা ভাঙাচোরা একটা জীর্ণঘরেব পরিসবে ছেঁড়ানোংরা তেলচিটচিটে কাঁথা-বালিশেব বিছানায পাঁচটা মানুষকে একসঙ্গে নিশ্বাস নিতে হয বলে আজই প্রথম ঘৃণাবোধ হলো তার। লণ্ঠন জ্বেলে বাইবের দাওযায় ছেঁড়া মাদুর পেতে শুলো। বাইরে বাতাস আছে, প্রযোজনীয অক্সিজেন নেই। হঠাৎ-ই আবিষ্কার তার—পূর্ণিমা বিলম্বিত নয়। ত্রয়োদশী কি চতুর্দশীব চাঁদ উপছে পড়ছে পোড়ো-চালের মাথায, দূরেব শিউলি ফুলেব গাছ থেকে গন্ধ আসছে। দেশ জুড়ে পূজোর ঢাক বাজবে শিগগিব।

চেষ্টা করা ...বাড়ল। ক্লান্ত শরীরে ঘুম নেই। বুকেব পাঁজবে, স্নাযুতন্ত্রীতে একটা তীব্র

সমস্ত দায়িত্বও কো... তুলেছে। মনে পডছে নাজমাকে, মনে পডছে বুড়িগঙ্গাব জল।

ধন্য হবে। এখান থেকেই ...রেব উবর্শী কলকাতা। মনে হলো, কাবা যেন তাব হাতটাকে

সনাতন টলে উঠল। ... একেবারে ধোওযা-কাপড-নিংড়োনোর মতোই বাকিযে,

গলাটা শুকনো—তেষ্টা। ...য়া নয়, সত্যি সত্যি শবীরে গাঁটে-গাঁটে সে একটা ব্যথা

বড়সাহেবের ভ্রূকুটিতে ...। এখনও জ্যোৎস্নার লোভ? বাতাসে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতা

সবগুলি দৃষ্টি সনাতনের ... এখনও আকাশে নক্ষত্র খুঁজে দেখা? ভবাট নির্জনেব

চোখগুলি। ফাৎনা নড়লেই ...র একরাশ নক্ষত্রেব বিরাট শূন্যতায় সনাতন লাফিয়ে উঠল।

ক্ষীণ কণ্ঠনালীতে কার ...। এখনও অনেক কিছু বলাব আছে তাকে. অনেক কথা।

বড়সাহেবের কণ্ঠ...নও শাদা। ভরপুর জ্যোৎস্নার রঙে অপাপবিদ্ধ। হৃদয়ের ভাষায়

লাইক দোস্ হাউলিং ...।

হয়েছে, অ্যারেস্ট করিয়া গিয়াছি। একদিন আজিজ বসির আর ইয়াসিনের পাশে

সনাতন ঘাম...য়াছিলাম। স্থগিত-মৃত্যুর ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত অদ্যাই কেন

লগ্ন উপস্থিত হইল, কোনো বিশুদ্ধ পঞ্জিকায় তাহাব নির্দেশ নাই। শহিদেব মালা পাইব না জানি। কিন্তু কযেক বিন্দু নিঃস্বার্থ অশ্রুব জন্য লোভ ছিল বলিযাই জীবনে স্বদেশ খুঁজিযাছি। বুঝিযাছি, আমাব স্বদেশ নাই। নাবীব ভালোবাসা চাহিযাছি। আমাব জবাক্রান্ত যৌবনে একমাত্র নাবীব নাম—নাজ-মুননাহাব। গঙ্গা নয, বুড়িগঙ্গাই আমাব নদী। কিন্তু পৃথিবীব কোনো মাটিব কাছে ভিক্ষা চাহিযাও বাঁচিবাব অধিকাব পাই নাই। স্বদেশহীন মানুষেব স্থান এই মর্ত্যভূমি কি কবিযা হইতে পাবে?

সনাতন তাকাল। অপেক্ষা কবল। সব কিছুই ঝাপসা দেখছে সে। তাবপব অনেক সময কাটিযে আব কিছুই দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে কলম বন্ধ কবল, লণ্ঠন নেভাল। এবং তখনই, অতর্কিতে একবাশ জ্যোৎস্না আছড়ে পড়ল শবীবে। কি দেখল সে চাঁদেব মহিমায? কি মনে হলো তাব? উঠে দাঁড়ল। মধ্যবাতে নিথব দীঘিব জলে শাপলা পাতাব পাশে পূর্ণিমাব চাঁদেব ছাযা সে কাঁপতে দেখেনি অনেক অনেক কাল।

ঘবেব দবজা ভেজানই বইল, বইল পড়ে আজন্মেব আশ্রয। উদাস জ্যোৎস্নাকেই ভালো লেগে গেল তাব। দুপাশে কলোনিব দোচালা ঘবগুলি নুযে নুযে পড়েছে থুবথুবে বুড়িব বাঁকানো পিঠেব ছাঁচে। মাটিব পথে ঝলমল চাঁদেব আলো। অদূবে তালগাছেব মাথায অদ্ভুত উজ্জ্বল এক নক্ষত্রেব দিকে তাকিযে নাজমাকে মনে পড়ে বাববাব। দূব-নক্ষত্রেব মতোই সুদূব এক নাবী, নাজমা...কী দুর্বিষহ যন্ত্রণাব নাম। তাপু, মনা, বুলু—ছোট ছোট ভাইবোনগুলিব মুখ। বোগা লিকলিকে নিবীহ কতগুলি প্রাণী। বঞ্চনা আব অনাদব আব ক্ষুধাব। মা। একটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শব্দ বাংলা ভাষাব। কাঁচা মাটিব পথে চলতে গিযে একটা নাড়া খেলো আচমকা। মুহূর্তমাত্র। তাবপবই আবাব স্বচ্ছন্দে এগোতে পাবল। দূবেব গাছে কোথায যেন প্যাঁচা ডাকল একটা, সামনেব চকচকে কলাগাছেব পাতায জ্যোৎস্নাব আলোয কি মনে হলো তাব? নিশিব-ডাকে বেহুঁশেব মতো পা ফেলে ফেলে, এগোতে-এগোতে পেবিযে গেল কলোনিব শেষ প্রান্ত। চাঁদনি বাতেব ভবাট আলোকেই বুঝি ভোব বলে ভুল কবল কোনো কাক। বাতদুপুবে ঘুমভাঙানিব ডাকে ঘুম-পাড়ানিব সুব। দেহভাবমন্থব সনাতন ভুলে গেল, ঘবেব দবজা ভেজানো বযেছে পেছনে, ভুলে গেল, মা এখনই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পাবেন। ডাকবেন খোকাকে...

...

ওযাবেন্ট হাতে পুলিশ এল পবদিন কালে। তদন্তে প্রকাশ—ফেবাবি গতকাল বাতদুপুবে কলোনিব ওপাবে ট্রেনেব তলায মাথা বেখে আত্মহত্যা কবেছে।

# উদ্বাস্তু

## দেবেশ রায়

বিছানায় শুয়ে এক কাপ চা খাওয়া সারা দিনের পরিশ্রমের প্রথম বিলাসী ভূমিকা। স্ত্রী যদি উঠতে তাগাদা না-ও দেয়, নিজের তাগাদাতেই বিছানা ছাড়তে হয় বেলা আটটার মধ্যে। হাত-মুখ ধোয়া, পায়খানা ও বাজার সারতে-সারতে সাড়ে-আটটা। বাকি আধঘণ্টা সময় হাতে রাখতে হয় কয়লা ওষুধ কিংবা লনড্রির জামা-কাপড় ইত্যাদি কিছু-না-কিছুর জন্য। তারপর আট ঘণ্টা—বেশ্যা যেমন তার মেয়েত্বকে এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টার জন্য বেচে—নিজের ইংরেজিতে চিঠি লিখবার বা ঠিকে যোগ দেবার ক্ষমতাকে বেচে, নিজ মেরুরেখার চারপাশে আবর্তিত হতে পৃথিবীর আরো যে-বারো ঘণ্টা সময় লাগে তা ঝিমিয়েই কাটিয়ে দেয়া যায়। জীবনের জন্য জীবিকা—এই ধরনের প্রচারিত একটি সিদ্ধান্ত যখন নিজ অভিজ্ঞতার জোরে জীবিকার জন্যই জীবনধারণ এই প্রকার বিপরীত সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁকে, তখন-যে সকাল আটটায় ঘুম থেকে না-ওঠার কোনো উপায়ই নেই, সেই কালে স্ত্রীর বা কন্যার ডাকা-ডাকি, সাধাসাধি, চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে এনে কাকুতি-মিনতি নিজেকে বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করায়। সেই ধাক্কাতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত চলে যায় বেশ। প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে-টাকা রেখে মারা যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তাতে ঋণ বাদ দিয়ে দাহ্-খরচ ও শ্রাদ্ধ ভালোভাবেই চুকে যায়। পঞ্চভূতে মিশে যাবার আগে শবহীন স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গোটা দুনিয়া, আর 'লোকটা বেশ গোছানো ছিল, টুকটুক করে চালিয়ে মরাটা পর্যন্ত রাইট টাইমে মরল' —এইপ্রকার শোকবার্তা স্মৃতি বহন করে। সন্তানসন্ততিরা জানান দেয় লোকটার বেশ শক্ত মূল ছিল, বহুদূর প্রসারিত, আর কখনোই লোকটি নিজের জমি ছাড়িয়ে অন্য জমিতে শেকড় চালায়নি।

কেরোসিন কাঠের তক্তপোশে সাড়ে চার টাকা দামের এক তাঁতের মশারির নিচে সত্যব্রত সেদিন এইরকম একটি আত্মনির্ভর স্বত্বাধিকারীর মতোই ঘুমোচ্ছিল। নিঃসংশয়ে তারই যে স্ত্রী, সেই মহিলা সত্যব্রতকে এসে ডাকাডাকি করছিল—'শুনছ, এই শুনছ, শুনছ, এই।' আপ্যায়িত সত্যব্রত অনাবশ্যক পাশ ফিরে শুলো। যেন ওপর দিকের কানের গর্ত দিয়ে অণিমার ডাকগুলো খুব ভালোভাবে ভেতরে গলে যাবে। কিন্তু অণিমা বলল —'বাইরে তোমাকে কারা ডাকছেন।'

সুতরাং সত্যব্রত চোখ খুলে—'কে?'

'কী জানি? জানি না। বসতে বললাম, বসল না, দাঁড়িয়ে আছে', বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে অণিমা যোগ করল—'চা হয়ে গেছে, খেয়ে যাও, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ততক্ষণে চৌকির কানায় পা ঝুলিয়ে বসে সত্যব্রত নিজেকে স্বত্বাধিকারী ভাবার বদলে যেন চারিদিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল, তার বাড়িতে যে-সব জিনিশ থাকবে ধরে নিয়ে লোক দুটি এসেছে, তা আছে কি না। যেন, আদালত থেকে তার বাড়ি নিলামে চড়াতে এসেছে—এমনভাবে কয়েক সেকেণ্ড ঘরের চারপাশে তাকাল। তারপর অপর চৌকিতে অঞ্জুকে শোয়া দেখে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাল। দু-টাকা চার আনা দামের লুঙি, রঙ উঠে গেছে, সত্যব্রত আণ্ডার-ওয়্যার পরে না, অর্থাৎ লুঙিটা যেন দেবীদের শাড়িব মতো, আছে অথচ নেই। বালিশের পাশে গেঞ্জিটা পড়েছিল, সেটা গায়ে দিল। তারপব নিজের চেহারাটা কল্পনাটা করল—পাৎলা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি, সদ্যনিদ্রোত্থিত—অচল। যেন বাইরের লোক দুটো সত্যব্রতকেই নিলামে তুলতে এসেছে। অণিমার পায়ের শব্দে চমকে দাঁড়িয়ে, কয়েক মিনিট আগে যে-লোকটা একটা মালিক-মালিক ভাব নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, দু-হাতের তালুতে মুখ ঘষতে-ঘষতে সে এমনভাবে বাইরে গেল যেন সে তার নিজের নামটাই অস্বীকার করবে। অণিমা 'এই' পর্যন্ত বলে চায়ের কাপ টেবিলের ওপর ডিশ চাপা দিয়ে রেখে অঞ্জনাকে ধাক্কা দিতে শুরু করল—'এই অঞ্জু ওঠ, অঞ্জু অঞ্জু, এই দ্যাখো, কীরে চড় খাবি নাকি?'

লোক দুজন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যব্রত গিয়েই বলল—'ভেতরে বসুন।'

'না-না, দরকার নেই, একটা খবর দিতে এসেছি, এক্ষুনি চলে যাবো।'

লোকটার হাসি থেকে সত্যব্রত অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল কাছাকাছি কোনোদিন নিমন্ত্রণ পাবার কথা আছে কি না।

'ভেতরে এসেই বসুন না।—'

'না। শুনুন, আপনাকে আজ বা কাল যে-কোনো সময় থানায় গিয়ে একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। যখন আপনার সুবিধে—'

'থানায়। আমাকে?'

একজন বলল—'আজ্ঞে।' আর-একজন পকেট থেকে নোটবই বের করে কয়েকটা পাতা উলটে পড়ল—'আপনার নাম তো শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী, পিতার নাম মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ী, হোল্ডিং নাম্বার দুইশো তিরিশ বাই এ বাই সিক্স, তারপর নোটবইটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল—'আজ্ঞে আপনিই।'

অপরে সাইকেল ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল—'যখন আপনার সুবিধে হয় যাবেন, এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, একদিন গেলেই হলো—'

লোক দুটো সাইকেলের প্যাডেলে পা দিচ্ছিল। সত্যব্রত তাদের ডেকে থামাল—'আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন একটু, কেন?'

লোক দুটো ওখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াল, আর-একজন বলল—'আরে কিছু না, কিছু না। বলেন কেন আর। গবর্মেন্ট থেকে অর্ডার এসেছে, তোমাদের দেশে—মানে শহর, আবার সীমান্ত শহর কিনা—আমরা খবর পেয়েছি তোমাদের ওখানে অনেক লোক আছে,

যারা আসলে সে-লোক নয়।' তারপর যেন সত্যব্রতকে অভয় দেবার জন্যই লোক দুটো দেখে বা শুনে মহড়া-দেওয়া মনে হয় এমনি এক হাসি হেসে বলল—'আর বলবেন না মশাই সেণ্ট্রালের কাণ্ড, যারা আছে, তারা তারা নয়। ভাবুন দেখি, আমরাই বা কী করি, চাকরি তো রাখতেই হবে। আচ্ছা চলি, যাবেন একদিন, একটু আলাপ করে আসবেন।' লোক দুটি সাইকেল চেপে চোখের বাইরে চলে যাবার আগেই সত্যব্রত পেছন ফিরে ঘবে ঢুকে পড়ল, যেন যে লোক দুটোকে দেখাতে চায় যে সে তাদের যাবার আগেই ঘবে ঢুকছে। তাছাড়া নিঃসন্দেহে অনিমা ভেতব থেকে কথাবার্তা শুনেছে। বারান্দায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে অনিমাকে ভাবতে দিতে চায় না যে থানায় যাবার নামে সে ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু অনিমা কোনো কথাই শোনেনি। সত্যব্রত টেবিল থেকে চা-টা তুলে নিয়ে চুমক দিলে, এমন সময় রুটি কামড়াতে-কামড়াতে অঞ্জুব প্রবেশ, তার পেছনে অনিমা। অর্থাৎ অনিমা এতক্ষণ অঞ্জুকে নিয়ে রান্নাঘরে ছিল, এটুকু ভেবেই সে মনে-মনে হেসে উঠল—সে কী, আমি কি চুরি না ডাকাতির দায়ে ধবা পড়েছি যে অনিমাকে জানতে দিতে চাইছি না!

'জানো, আমরা আমরা কি না—তার খোঁজ-খবর নেবার জন্য গভর্নমেণ্ট নাকি থানায় অর্ডার দিয়েছে, তাই থানায় যেতে হবে।'

'থানায় যেতে হবে, তোমাকে, কেন?'

'আমি যে আমি, এটা প্রমাণ দিতে।'

'কেন?'

'গভর্মেণ্টের হুকুম,' বলে চায়ের কাপটা টেবিলেব ওপর রেখে সত্যব্রত খুব দ্রুত কুয়োর পাড়ের দিকে গেল। হাত-মুখ ধোয়া সেরে বাজাবে যেতে হবে।

বাজার থেকে ফেরার পর যে-আধঘণ্টা সময় টুকিটাকি কাজের জন্য আলাদা করে রাখা, তাবই ফাঁকে সত্যব্রত থানা থেকে ঘুরে আসবে স্থির করল। সেজন্য বাজাবটাও ধীরে-সুস্থে করল না। খানিকটা দৌড়েই যা পেল তা কিনল। অথচ লোক দুটো বলে গিয়েছিল যে যখন সুবিধে তখন গেলেই হবে। থানায় কাজ থেকে ফেরার পথে গেলেই সবদিক থেকে সুবিধে। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এ-খবর শুনে ইস্তক থানায় যাবার জন্যই যে সে ছটফট করছে তা আব নিজের কাছেও লুকোনো থাকল না, যখন বাজার ফেলেই সে বেরিয়ে পড়ল। অনিমা একবার বলেছিল—'এত ছটফট করে যাবার দরকারটা কী, বিকেলে গেলেই তো হয়।' অঞ্জুও একটা অঙ্ক দেখিয়ে নেবার জন্য পিছু-পিছু ঘুরছিল। সত্যব্রত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে থানার দিকে হাঁটা শুরু করল।

আর ফিরল সূর্যাস্তের পর। অনিমা দুপুর থেকে ওঠা-বসা, ঘর-বারান্দা করছে। দশটার পর পাড়াতে বয়স্ক ছেলেপুলে পর্যন্ত নেই যে তাকে খবর নিতে পাঠাবে। বিকেল পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে শেষে একজনকে থানায় পাঠিয়েছিল। ছেলেটি এসে সংবাদ দিল সত্যব্রত ওখানে আছে। পাড়ায় ঘুরে অনিমা শুনে এসেছে একবার সবাইকেই নাকি

থানায় যেতে বলেছে এবং ঐ একই কারণে, যে-যা সে-তা কি না সেটা চূড়ান্তভাবে যাচাই করতে এবং আত্মপরিচয় দিতে। যে-মাটিতে শেকড় চাড়িয়ে সে গাছ, সেই মাটি ছেড়ে; যে-পরিবাবের মধ্যে সে স্বীকৃত, সেই পরিবার ছেড়ে; আজ বা কাল থানায় গিয়ে প্রমাণ দিতে হবে—তার আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল, তার অস্তিত্বের প্রমাণ, আজ অথবা কাল।

সত্যব্রত হাঁটছিল সমস্ত গা ছেড়ে দিয়ে পা টেনে-টেনে। ঘাড়-ভাঙা মুরগির মতো গলাটা ঝুলছে, ভেজা কুকুরের মতো চুলগুলো বিশৃঙ্খল, কণ্ঠাব আশ্রযে মৃত্যুর মতো শীতলতা, আঙুলগুলো চামড়ার গ্লাভসের মতো যেন পাঞ্জার অনুকরণ। বাইরের দরজা থেকে কথাটি না-বলে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করেছে অণিমা। একবার পিঠের ওপর হাত রেখেছিল, সহসা অনধিকারবোধে আক্রান্ত হয়ে সে হাত তুলে নিয়েছে। ভেতরের সিঁড়ির ওপর শ্মশান-প্রত্যাগতের মতো বসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ বুজে হেলান দিয়েছে। পেছনে থাম না-থাকলে হয়তো শুয়ে পডত। অণিমা নাযনি, খায়নি। সত্যব্রতব সমস্ত শরীবে উত্তর খুঁজে অণিমা বসে পড়ল, বোধহয় তার বসার শব্দেই চোখ মেলে শুধু মণিটাকে চারপাশে ঘুরিয়ে সত্যব্রত কিছু একটা সন্ধান করল। এতক্ষণে অণিমা বলল—'অঞ্জু ওব এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে।' শুনে সত্যব্রত চোখটা যখন অণিমার মুখের ওপর স্থির করল, তখন অণিমার মনে হলো সেই দৃষ্টির বহু অভ্যন্তবে বুঝি-বা কিছু দেখা গেল যাতে সত্যব্রতকে সত্যব্রত মনে হলো। সত্যব্রত পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে অণিমার হাতে দিয়ে আবার চোখ বুজল। চারপাশ থেকে ঝুপ-ঝুপ করে অন্ধকার ঝরছে। ক্ষণেক আলো পাবার আশায় অণিমা আকাশের আলোয় গিয়ে দাঁড়াল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত

১৯৩৯ থেকে '৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসে যে-গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, তার একটি সুসম্পাদিত ও সুসংগৃহীত তালিকা না-থাকায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের দেশ, জাতি, ভাষা, বংশ ইত্যাদি চিহ্নিত করার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। সব দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এক গুরুতর পরিবর্তনেব সম্মুখীন হয়েছে যে, কে যে কে, সে-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা এক তথ্যসংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে পৃথিবীগ্রহে বর্তমানে বহু ফেবারি ও বেনামা ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েৎনাম-দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব জার্মানি-পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলিতে। সে-কারণে 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা সমস্ত দেশেই যে-যা বলে পরিচিত, সে-তা কি না, তা পরীক্ষা করছি। এবং বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন স্ব-স্ব আত্মপরিচয় নিয়ে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দেন।

বল্লভপুর থানার বিবরণ

এক।। শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী, পিতা মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ী, আদি নিবাস পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে ২৩০।এ।৬ হোল্ডিংস্থ মোকানে বাস করেন। এই হোল্ডিংয়ের জন্য দেয় মিউনিসিপ্যাল কর গত বারো বৎসর যাবৎ তিনি দিয়ে আসছেন। ও ইংরেজি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে ঐ হোল্ডিংয়ের তৎপূর্ব মালিক শ্রীবনবিহারী মল্লিকের স্বাক্ষর-যুক্ত বিক্রয় দলিল পরীক্ষার পর উক্ত হোল্ডিং শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ীর নামে বল্লভপুর রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় শেখ মনসুর আলি, পিতা মৃত কদম শেখ, হালসাকিন রায়চর, জিলা পাবনা, ঐ হোল্ডিংয়ের বর্তমান ন্যায়সংগত মালিক। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর মৃত কদম শেখ তাঁর পুত্র মনসুর, কন্যা আমিনা ও স্ত্রী নুরাকে নিয়ে পূর্বপাকিস্তানে চলে যাবার পূর্বে তাঁর বাড়ি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব ঐ পাড়ার তিন পুরুষের অধিবাসী শ্রীবনবিহারী মল্লিকের ওপর দিয়ে যান। এবং ঐ বৎসরই শ্রীবনবিহারী মল্লিক ঐ হোল্ডিংয়ের মালিক হিশাবে শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর নিকট বিক্রয় করেন। পাবনা অন্তর্গত রায়চরে শেখ মনসুর আলির নিকট ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের মূল দলিলের নকল আছে।

সুতরাং শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নামক কোনো ব্যক্তি বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০।এ।৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিক নন। বা বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০। এ।৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিকের নাম শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নয়।

দুই।। মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র বলে কথিত শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৪৭ সালের পর ভারত ইউনিয়নের বহু জায়গায় সরকারি ও বে-সরকারি ক্ষেত্রে ইস্কুলমাস্টারি, কেরানিগিরি ইত্যাদি কাজ করেন। সব জায়গাতেই তিনি শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী, পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিন কাজের পর যখনই তাঁর কাছে বি-এ ডিপ্লোমা প্রভৃতি চাওয়া হয় তিনি বলেন যে পরীক্ষা দেওয়ার পর দাঙ্গার ভয়ে দেশত্যাগ করায় তিনি বি-এ মূল ডিপ্লোমা সংগ্রহ করতে পারেননি ও দেশভাগের পর এখন আর তা সম্ভব নয়। দু-একটি ক্ষেত্রে এর পরেও কর্তৃপক্ষ চাপ দেওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দেন।

তদন্তে প্রকাশ : মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী নামধেয় ব্যক্তি ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসরই তিনি খুলনা যাবার পথে ট্রেনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহত হন।

এমন হতে পারে বর্তমানে যে বা যারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর আত্মপরিচয় গাপ করেছে, তারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট পরিচিত ও সেই কারণেই মৌলিক সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকেও নিজেদের কাজে লাগাতে পারছে। মৃত সত্যব্রত মরেও জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং বর্তমানে জীবিত সত্যব্রত লাহিড়ী বস্তুত মৃত।

মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর এক খুড়তুতো ভাই স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই কলকাতায় চাকরি করেন। তদন্ত-কমিশনের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয়ে চাকরির চেষ্টা হয়েছে এমন দশটি ক্ষেত্রের কথা তিনি জানেন। তাঁর জানা দশটি ক্ষেত্রের বিবরণ শোনার পর বোঝা গেল তাঁর অজ্ঞাতে বহু-বহু জায়গায় চাকরির চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু চাকরিই নয়, সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয় দিয়ে এমনকী বিবাহের চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে এবং একটি বিবাহ যে সংঘটিত হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেট আলোচনা করে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালে দুইজন সত্যব্রত লাহিড়ী ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। এই দ্বিতীয় সত্যব্রত লাহিড়ীই সমস্ত সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। নইলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ' এই পরিচয়দানকারী যে কোনো ব্যক্তিকেই নিশ্চিন্তমনে গ্রেপ্তার করা যেতো।

বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, সব শুদ্ধ এ-পর্যন্ত মোট সাতাশি জন 'সত্যব্রত লাহিড়ী' ১৯৪৭ সালের পর বিবাহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কজন '১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ' তা জানা যায়নি।

দ্বিতীয় ঐ আর-একজন সত্যব্রত লাহিড়ী ঐ একই বৎসর বি-এ পাশ করেছেন বলে কে জীবিত আর কে মৃত সত্যব্রত তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। এমন হতে পারে 'মৃত' সত্যব্রত (বা জাল সত্যব্রত) নিজের সুবিধা অনুযায়ী কখনো মৌলিক মৃত সত্যব্রতের, কখনো মৌলিক জীবিত সত্যব্রতের বাবার নাম নিজের বাবার নাম হিশেবে বলে।

১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ—এই পরিচয়টিই জাল সত্যব্রতের নিজেকে অন্য পরিচয়ে পরিচিত করার একমাত্র কারণ বলে ঐ-তথ্যটি সে কোনো ক্ষেত্রেই বদলায় না। এবং সেখানে তাকে অবিশ্বাসও করা যায় না, কারণ, সত্যিই এক সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৪৫ সালে বি-এ পাশ করেছেন। পিতৃপরিচয়ে জাল সত্যব্রত লাহিড়ীর প্রয়োজন নেই বলেই তা পরিবর্তনশীল।

ফলে (ক) মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র (খ) ১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং (গ) শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী—এই তিনটি পরিচয় একত্রে পাওয়া যায় না।

পরন্তু সমস্যা আরো জটিল হয় মৌলিক সত্যব্রত লাহিড়ীর মৃত্যুর অনিশ্চিয়তায়। সংবাদে প্রকাশ ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে খুলনা যাবার পথে একবার এক গুণ্ডার দল ট্রেন আক্রমণ করে, ফলে বহুলোক হতাহত হয়। এই নিহতের তালিকায় 'সত্যব্রত লাহিড়ী' এই নাম পাওয়া যায়। এই নাম ভুল ছাপা হতে পারে। এই সত্যব্রত লাহিড়ী অন্য-কেউ হতে পারে। কিন্তু ঐ খুলনা রওনা হবার পর ১৯৪৫ সালের বি-এ ও পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী আর ফিরে আসেননি বলে তাকে মৃত ধরে নেওয়া হয়।

সুতরাং সমস্যা নিম্নপ্রকার। (১) মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ, খুলনা ট্রেন-আক্রমণে নিহত বলে ধরে নেওয়া কি অযৌক্তিক?

অর্থাৎ মৌলিক সত্যব্রত জীবিত হওয়া সত্ত্বেও কি তাকে মৃত বলে ধরা হচ্ছে? (২) যদি মৌলিক সত্যব্রতের সত্য-সত্যই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তার পরিচয়কে-কে আত্মসাৎ করেছে?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর মাত্র একজন দিতে পারেন। 'সত্যব্রত লাহিড়ী' এই নাম নিযে যে-কজন একজন হয়েছেন। সেই কারণেই এই প্রশ্ন ঘরে ঘরে, ১৯৪৭-এর পব যাঁবা বিবাহ করেছেন, যাঁদেব সন্তান হযেছে, যাঁরা চাকরি-বাকবি নিয়ে ঘর-সংসাব করেছেন—তাঁদেব প্রত্যেককে পৌছে দেওয়া হচ্ছে।

যতদিন এই দুই প্রশ্নের উত্তর না-পাওয়া যায়—ততদিন কোনো সত্যব্রত লাহিড়ী নিজেকে নিঃসংশয়তিরূপে সত্যব্রত লাহিড়ী বলে ভাবতে পারবেন না, কোনো স্ত্রীই তাঁর স্বামীকে মৃত পুণ্যব্রত লাহিডীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী বলে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন না, কোনো সন্তানই তাব পিতাকে অকৃত্রিম ও আদি সতব্রত লাহিড়ী বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।

নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয় সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করুন আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।

তিন।। শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০এ জুলাই চব্বিশ পরগণা জিলার মুখেবা গ্রামের শ্রী হেমচন্দ্র সান্যালেব দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীঅণিমা সান্যালকে হিন্দুশাস্ত্রমতে শালগ্রাম শিলা ও অগ্নি সাক্ষী রেখে বিবাহ করেন। মৃত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উভয়েই এই বিবাহে পৌবোহিত্য করেন ও তাঁদের উভয়ের সাক্ষ্য থেকেই এ-বিবাহ যে শাস্ত্রমতে নিষ্পন্ন হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী ও শ্রীঅণিমা লাহিড়ী উভয়ে গত দশ বৎসর যাবৎ বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০।এ।৬ নং হোল্ডিংস্থিত মোকানে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দেব ১৭ই মার্চ বল্লভপুর সদর হাসপাতালে শ্রীঅণিমা সান্যাল একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবাহেব সাত মাস পরে হলেও শিশু পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল এবং প্রসবও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। এ-বিষয়ে বল্লভপুর সদর হাসপাতালের খাতায় দেখা যায় যে ভর্তি হবার পর মাত্র পাঁচদিন পরই অণিমা লাহিড়ী খালাশ হয়ে যান। এই সন্তানই শ্রীঅণিমা লাহিড়ী ও শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর একমাত্র সন্তান শ্রীঅঞ্জনা লাহিড়ী।

'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক বিশ্বব্যাপী কর্মসূচির আহ্বানে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক জনাব এনামুল হকচৌধুরীর স্বতোপ্রণোদিত এক বিবরণে জানা যায় পাকিস্তানে অণিমার পিতা শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের বাড়ি তাঁদের পাড়ায় ছিল। ইং ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল সপরিবারে জনাব এনামুল হকচৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন এনামুল হকচৌধুরীর পিতা জনাব মইনুল হকচৌধুরী জীবিত। তিনি ও এনামুল অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত হেমচন্দ্র সান্যালের পরিবারকে রক্ষা করেন। দিন পনেরো-বিশ পর হেমচন্দ্র ভারত ইউনিয়নে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর কন্যা অণিমা

পাকিস্তানে এনামুল হকচৌধুবীব বাড়িতেই থেকে যায। হেমচন্দ্র সান্যালেব দ্বিতীযা কন্যা শ্রীঅণিমা সান্যাল পাকিস্তানে থেকে তো গিযেইছে, পবন্তু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দেব ৫ই ফেব্রুযাবি তাবিখে সে 'কুমকুম' এই নামে মইনুল হকচৌধুবীব পুত্র এনামুল হকচৌধুবীকে বেজিস্ট্রেশন বিবাহ কবে। জনাব এনামুল হকচৌধুবী তাঁব এই বিববণেব সঙ্গে সেই বিবাহেব সার্টিফিকেটেব একটি নকল পাঠিযেছেন। সে-দলিলে পাত্রীব নাম আছে কুমকুম, পিতাব নাম এইচ. সি. সান্যাল।

এই বিববণেব সপক্ষে নিম্নপ্রকাব পবিস্থিতিগত সাক্ষ্য পাওযা যায· শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল যখন ভাবত ইউনিযনে আসেন, তখন তাঁব সঙ্গে কেউই তাঁব দ্বিতীযা কন্যা অণিমাকে দ্যাখেনি। এমনকী মুখেবা গ্রামে আসাব পব হেমচন্দ্র প্রতিবেশীদেব বলেন যে তাঁব দ্বিতীযা কন্যা অণিমা তাঁব প্রথমা কন্যা অঞ্জলিব কাছে আসামেব এক চা-বাগানে আছে। আসামেব এক চা-বাগানে হেমচন্দ্র সান্যালেব বড়ো জামাতা কাজ কবতেন। কিন্তু তাঁদেব সাক্ষ্যে জানা যায, অণিমা সেখানে কোনোদিনই যাযনি। অর্থাৎ এই সাক্ষ্যগুলি পবোক্ষভাবে এই সিদ্ধান্তেব সমর্থন কবে যে, ১৯৫০ সালে যখন শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল পাকিস্তান ত্যাগ কবেন, তখন অণিমা তাঁব সঙ্গে ছিল না।

তবে কি অণিমা কমকুম নাম গ্রহণ কবে এনামুলকে সত্যই বিবাহ কবে? কিন্তু এইচ. সি. সান্যাল-নামেব আদ্যক্ষব-ঘটিত এই সামান্য মিল ছাড়া আব কোনো প্রমাণই নেই যে কুমকুম ও অণিমা একই ব্যক্তি।

কিন্তু তাই যদি না-হবে, তাহলে অণিমা পাকিস্তানে থেকে গেল কেন?

এই বিষযে দুই প্রকাব মত আছে।

প্রথম মত . জনাব এনামুল হকচৌধুবী ও অণিমা সান্যালেব মধ্যে বাল্যকাল থেকেই প্রণয ছিল। উভযেব বাড়ি একই পাড়ায। আট-ন বছব বযস পর্যন্ত তাবা একই পাঠশালায পড়ত। অণিমাব মাকে এনামুল মা বলে ডাকত। এনামুলেব পিতা মইনুল হকচৌধুবী ছিলেন ঐ অঞ্চলেব অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। সাতচল্লিশ সালেব পব থেকে এনামুল ও অণিমাব হৃদয-সম্পর্ক এবং এই দুই পবিবাবেব যোগাযোগ শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালেব পাকিস্তান ত্যাগ না-কবাব প্রধান কাবণ হযে দাঁড়ায। এনামুল একদিন সান্যাল বাড়িতে না-গেলে অণিমাব মা তাকে ডেকে পাঠাতেন। এনামুলেব খাবাব জন্য আলাদা কাপ-ডিশ থালা-গেলাস ছিল

এই প্রকাব অবস্থায '৫০ সালেব সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা শুরু হয। নিজেব বাড়ি ঘব ছেড়ে এনামুল তখন সান্যাল বাড়িতে চলে আসে। এনামুলেব পিতা জনাব মইনুল হকচৌধুবী এই সমস্ত ব্যাপাবে জড়িত হতে একেবাবেই চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁব একমাত্র পুত্র যখন এই বিপদেব সম্মুখীন হলো তখন তিনি আব স্থিব থাকতে না-পেবে সপবিবাবে হেমচন্দ্রকে নিজেব বাড়িতে নিযে আসেন এবং শহবেব ঐ এলাকাব শান্তি বক্ষাব জন্য পুলিশ ও সবকাবেব সাহায্য আদায কবেন।

একটি মাত্র ঘবে সমস্ত দবজা-জানালা বন্ধ কবে সান্যাল পবিবাব ছিল। দবজাব

বাইরে প্রতিটি শব্দকেই তাঁরা আশঙ্কার কানে শুনতেন। যখন তাঁরা ভেতর থেকে টের পেতেন যে এনামুল বেরিয়ে গেল, তারপর এনামুলের ফেরা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না-হয়ে কেউ স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারতেন না। সেই মরণপুরীতে একমাত্র ভরসা ছিল এনামুল। তারই স্রোতে ভেসে এসেছে এই হকচৌধুরী পরিবার। এনামুল সহই কেবল এঁদেব বিশ্বাস করা যায়। দিনে চারবার করে দরজা ঠেলে খাবার দিয়ে যেত। এবং সান্যাল পরিবারের জন্য এখানে আলাদা বাসন-কোসনের ব্যবস্থা ছিল না। সর্বক্ষণ চারদিকে হত্যাকারী ও আহতের উল্লাস ও আর্তনাদ, আগুনের নিঃশব্দ লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষের চীৎকার—এক-এক ধাক্কায় সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে দিচ্ছিল; ভূমিকম্প যেমন এক-এক ধাক্কায় পৃথিবীতে কী চিরস্থায়ী তা যাচাই করে নেয়। আর সেই মৃত্যুপরিবৃত অবস্থাতে সবাই বুঝছিল যে অণিমা আর এনামুলের প্রেম সেই তরণী যাতে এই তুফানের দরিয়া পার হবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অণিমা-এনামুলের প্রেম না-থাকলে এ-বাড়িতে সান্যাল পবিবার আসতে পারত না ও সরকারকে এনামুলের বাবা এ-অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজে বাধ্য করতেন না ও এনামুল শান্তিবাহিনী তৈরি করে কযেকজন বন্ধু -বান্ধব নিয়ে আগুন নেবানো ও আহতের উদ্ধার সাধন করতে যেত না। এগুলো অঙ্কের মতো এত প্রমাণিত ছিল যে সেই অবস্থায় সান্যাল পরিবার আর হকচৌধুরী পরিবার সমবেতভাবে এই ভালোবাসাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিল, ধোঁয়া বা ধুলো থেকে চোখেব মণি দুটোকে বক্ষা করার জন্য যেমন আমাদের স্নায়ু অচেতনেই কাজ করে। মুহূর্তে-মুহূর্তে প্রাণগুলি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচছিল, তাদের কাছে এ-ছিল আলোর মতো স্বচ্ছ।

আর এ-কথা সেদিন সবচাইতে বেশি করে বুঝেছিল অণিমা। আগে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি-বা অণিমার সঙ্গে এনামুলের আলাদা দেখা-সাক্ষাৎ হতো, দাঙ্গার অবস্থায় তার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দিন-রাতে এনামুল তিন-চারবার মাত্র এদের ঘরে ঢুকত।

স্নেহ প্রেম ইত্যাদি প্রমাণ করা অসুবিধাজনক ঘটনাগুলিকে আইনগত অনুসন্ধানের কাজে সাক্ষ্য হিশাবে উপস্থিত করা সমীচীন না-হলেও, এনামুলের সঙ্গে অণিমার অবিচ্ছিন্ন দেখা-সাক্ষাৎ না-হওয়া অথচ বাইরের ঘোরঘুরিব পর পরিশ্রান্ত এনামুল যখন ও-ঘরে ঢুকত তখন ঘাম মুছবার জন্য গামছাটা বা হাওয়া খাবার জন্য পাখাটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অণিমার এগিয়ে দেওয়া প্রমাণ কবে যে, যদি এনামুলের প্রতি অণিমার প্রেম পরিণতিমুখী হযেই থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এই সময়, আর-কোনো সময়েই নয়। কারণ সংস্কারগুলো তখন খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল আর সেই মৃত্যুপরিকীর্ণ অবস্থায় সান্যাল পরিবারের অতগুলি লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডধ্বনি অণিমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তার প্রতি এনামুলের ভালোবাসার শক্তি দর্শাচ্ছিল। নইলে পনেরো-বিশদিনের অনবরত চেষ্টায় যখন মইনুল হকচৌধুরী সান্যাল পরিবারের ভারত ইউনিয়নে যাওয়ার ব্যবস্থা কবলেন, তখন অণিমা ভারতে যেতে অস্বীকৃত হলো কেন।

অণিমাকে পাকিস্তানে রেখে আসতে হেমচন্দ্র সান্যাল নিশ্চয়ই একবারে সম্মত

হননি। কিন্তু এনামুলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীতই মেয়ের আত্মঘোষণায় তাঁরা হয়তো ভয় পেয়েছিলেন, আবার তাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য এনামুলের পরিশ্রম দেখে হয়তো তাঁরা অসম্মত হতে লজ্জা পেয়েছিলেন। সে যা-ই হোক, অণিমা পাকিস্তানে থেকে যায়।

এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পর অণিমা স্ব-ইচ্ছায় ও স্ব-চেষ্টায় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি 'কুমকুম' নামে জনাব এনামুল হকচৌধুরীকে বিবাহ করে। কুমকুমের সঙ্গে এনামুলের বিবাহের রেজিস্ট্রিদলিল আছে। কিন্তু নাম-পরিবর্তন কেন?

এনামুল ও অণিমা দুজন নাকি মনে করে যে এ-কথা জানাজানি হলে ভারত ইউনিয়নে সসম্মানে বসবাস করা সান্যাল পরিবারের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে, এবং সে-কারণেই পিতার পুরো নাম ব্যবহার করা 'হয় নাই।'

দ্বিতীয় মত : পাকিস্তান হবার পূর্ব থেকেই এনামুল অণিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর এনামুল প্রথমে অণিমাকে বেশ কিছু পত্র দেয়। তার কোনো জবাব না-পাওয়ায় পথে-ঘাটে অণিমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মাঝে-মাঝেই সে অণিমাদের বাড়িতে এসে অণিমার মাকে মা বলে ডেকে জোর-জবরদস্তি করে চা ইত্যাদি খাওয়ার চেষ্টা করত। অবশেষে যেদিন সে এক চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অণিমাকে বলে যে তার বিবি হতে রাজি না-হলে সান্যাল পরিবারের সবাইকে কুচি-কুচি করে কাটা হবে, সেদিন থেকে অণিমার বাইরে বেরুনো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। তার শুরুতেই এনামুল দলবল সহ সান্যাল বাড়িতে চড়াও হয় ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে অণিমাকে তার সঙ্গে বিয়ে না-দিলে সান্যাল বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করা হবে। সান্যাল মশাই এনামুলের বাবা মইনুল হকচৌধুরীকে এ-কথা জানালে তিনি পুলিশকে জানিয়ে দেন যে এনামুল তার দলবল নিয়ে ঐ পাড়ার শান্তিরক্ষা করছে। ফলে পুলিশ ঐ এলাকায় আসে না ও এনামুল ঐ এলাকার একমাত্র কর্তা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন রাত্রি গোটা দশেকের সময় প্রথমে বাড়িতে ভীষণ ঢিল পড়তে থাকে। সান্যাল বাড়ির সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে। ঘন্টাখানেক পরে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিতে-দিতে একদল লোক সান্যাল বাড়ি ঘিরে ফ্যালে। এবং বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে দরজা না-খুললে সেই মুহূর্তে আগুন দেয়া হবে। সেই সময়ই এনামুল এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে—"দরজাটা একবার খুলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বাধ্য হয়ে দরজা খুলতে হয়। এনামুল বলে, যদি তারা সপরিবারে হকচৌধুরী পরিবারে আশ্রয় নেয় তবেই একমাত্র বাঁচার সম্ভাবনা। অনন্যোপায় সান্যাল পরিবারকে বাধ্য হয়ে এনামুলদের বাড়িতে এসে উঠতে হয়। সেখানে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁদের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচতে হয়েছে।

মাঝে মাঝেই এনামুল ঘরে ঢুকত ও সবার সামনেই অণিমাকে বাতাস করতে কী ঘাম মুছিয়ে দিতে বলত। তখন সান্যাল পরিবারের পরিবারত্ব নেই, আত্মরক্ষাই একমাত্র

সমস্যা, দেব-মন্দিরের পূজার্থীর যেমন প্রয়োজন শুধু নিজের প্রার্থনা পূরণের। সেজন্য বলিদানের রক্তও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। এবং অণিমার প্রতি এনামুলের এই অশিষ্ট ও অশ্লীল ব্যবহারে এরা প্রত্যেকে আত্মরক্ষার স্বস্তি পেত। যেন অণিমা নামক প্রতিরোধক না-থাকলে ঐ অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা হত্যার নেশা হয়ে উঠত, যেন অণিমার শবীরের ওপরকার চামড়া এনামুলকে তার শরীরের ভেতবকাব রক্তের প্রতি দৃষ্টি হানবার সময় দেয়নি। যদি ঐ চামড়াটাকে রক্ষা করবার কোনো চেষ্টা করা যেত, তাহলে ভেতরের রক্ত দিয়ে সে চেষ্টার দাম শোধ করতে হতো।

আইনগত অনুসন্ধানের কাজে কাম, লোভ, অত্যাচার, বলাৎকার ইত্যাদি যে-সমস্ত বিষয়ের উৎস ও উদ্দেশ্য থাকা স্বাভাবিক—তাকে যথেষ্ট মূল্য না-দিলে ঘটনার সত্যতা যাচাই হয় না। অণিমার শরীরের প্রতি এনামুলের লোভ স্বীকার না-করলে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না কেন দশ-পনেরোদিন হকচৌধুরী বাড়িতে থাকার পর এনামুল যখন প্রস্তাব দিল অণিমাকে রেখে গেলে সে তাদের ভারত ইউনিয়নে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে, তখন সান্যাল পরিবাব সম্মত হলো। দাঙ্গার কযেক দিন হত্যা করার জন্য ও নিহত হবার ভয়ে মানুষের উল্লাস ও আর্তনাদ, আগুনেব নীরব লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষেব সমবেত কণ্ঠস্বর, সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে ফেলেছিল।

অণিমাকে পাকিস্তানে রেখে আসতে হেমচন্দ্র সান্যাল নিশ্চয়ই একবারে সম্মত হন নাই। কিন্তু এতগুলি লোককে প্রাণ নষ্ট আর অণিমার কূল নষ্ট—এর মধ্যে যোগ-বিয়োগ করে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন কোনটা লাভজনক। এবং তিনি অণিমাকে পাকিস্তানে রেখেই ভারত ইউনিয়নে চলে আসেন।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি অণিমাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত ও কুমকুম নামান্তবিত করে এনামুল হকচৌধুরী বেজেস্ট্রি বিবাহ করে।

তখন এই প্রকার আশঙ্কা ছিল যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পর এইসব ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হতে পারে। সেই কাবণেই অণিমার নামান্তর ও পিতৃ-পরিচয় গোপন রাখবাব জন্য আদ্যাক্ষব ব্যবহার।

পাকিস্তানে অণিমার থেকে যাওয়া সম্পর্কে এই দুটি মত ছাড়া সম্ভাব্য তৃতীয় একটি মত কিন্তু পাওয়া যায় না যে অণিমা ও কুমকুম আসলে এক ব্যক্তিই নয়। হেমচন্দ্র সান্যালেব মুখেবাক্সিত প্রতিবেশী ও আসামস্থিত বড়ো জামাতা ও তদীয় পত্নী অঞ্জলির সাক্ষ্যে অণিমাব ভারত ইউনিযনে না-আসা এমনভাবে প্রমাণিত যে, সেই কারণেই কুমকুম ও অণিমার দুই ব্যক্তিত্বের যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি অণিমা ও কুমকুম এক ব্যক্তি নয় এই মত প্রচলিত থাকত তবে সমস্যাও এইখানেই থাকত। তারা দুইজনই না একজন এব মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু সে-প্রশ্ন না-ওঠায় এরা যে একই ব্যক্তি তা পারোক্ষে সর্বসম্মত।

১৯৫২ সালের ৩০এ জুলাই এই অণিমা সান্যালেব সঙ্গেই যদি সত্যব্রত লাহিড়ীর বিবাহ হয়ে থাকে, তবে অণিমা সান্যাল ওরফে কুমকুম হকচৌধুরী পাকিস্তান ছেড়ে ভারত

ইউনিয়নে এল কবে ও কেন?

এ-বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে :

প্রথম মত : ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রথম বোঝা যায় যে অণিমা গর্ভবতী। বমি, মাথাঘোরা, অরুচি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বেই এনামুলের বাবা মইনুল হকচৌধুরী মারা যান। বাড়িতে শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ মহিলারও একান্ত অভাব। তাছাড়া শারীরিক কারণেই অণিমা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ে ও বারবার বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদির কথা বলতে থাকে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অণিমা তার বাবা-মার সঙ্গে ভারত ইউনিয়নে যেতে অস্বীকার করায় এনামুল এতদূর পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল যে তাদের বিয়ের পর পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজে খাপ খাইয়ে নিতে ও অণিমাকে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ দিতে সে দীর্ঘদিন বাইরে বাইরে ছিল। কেননা এনামুল জানত—অণিমা যে হিন্দু ও সে মুসলমান, এ-চিন্তা-সংস্কার দুজনের মনেই এত সুদূরে মূল প্রসারিত করে আছে যে ভেতর থেকে খয়ে না-গেলেও শুধু বাইরের টানে তা উৎপাটন করা যাবে না। তাছাড়াও, তার জন্যই স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে থেকে যাওয়ায় অণিমাকে এনামুল বোধহয় একপ্রকারের সশ্রদ্ধ দূরত্বে রাখতে চাইছিল। বোধহয় সে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল যাতে কোনো প্রকারেই সে অণিমার ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি না-করে। মইনুল হকচৌধুরীর মৃত্যুর ফলে বাধ্য হয়ে এনামুলকে অণিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হয় এবং তখন সে আবিষ্কার করে তারই মতো অণিমাও এতদিন এনামুলের কথা ভেবেই দূরত্ব রক্ষা করেছে। অতঃপর তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন। এবং এই কারণেই বিবাহের এক বৎসর পর অণিমার গর্ভসঞ্চার।

অণিমার শারীরিক অবস্থায় বাপ-মায়ের কাছে থাকলে ভালো হবে ও শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে বিবেচনায় এনামুল অণিমাকে মুখেরা পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অথচ সে গেলে শ্বশুরবাড়ির সামাজিক অসুবিধা হতে পারে ভেবে নিজে যাবে না স্থির করে।

এবং এনামুলের সক্রিয় ইচ্ছায় উৎসাহে শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি ও শান্তির জন্য অণিমা ভারত ইউনিয়নে আসে। সে যে নিরাপদে ভারত ইউনিয়নে এসেছে ও তার বাবার কাছে আছে এ-সংবাদ জানিয়ে অণিমা এনামুলকে একখানি পত্র দেয়। নাম লেখা ছিল অণিমা।

পাকিস্তান ছাড়ার পর এটিই তার একমাত্র চিঠি। তারপর এনামুল ঘন-ঘন তিন-চারটি পত্র দেয়, অভিমান করে পত্র দেয়া বন্ধ করে, আবার পত্র দেয় ও অবশেষে টেলিগ্রাম করে।

এদিকে অণিমা মুখেরা পৌঁছুবার সঙ্গে-সঙ্গেই হেমচন্দ্র সকলকে বলেন যে অণিমার বিবাহ স্থির হওয়ায় সে বড়দির কাছ থেকে চলে এসেছে। এরপর গর্ভবতী অণিমাকে প্রায় রুদ্ধ কক্ষে আটক রেখে, এনামুলকে চিঠিপত্র দেবার সমস্ত পথ বন্ধ করে ও

এনামুলের সমস্ত চিঠি গাপ করে হেমচন্দ্র যে-কোনো মূল্যে একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য ব্যতীত অন্য গোত্রে একটি পাত্র খুঁজতে লাগলেন। মইনুল হকচৌধুরী ও এনামুলের চেষ্টায় যে-টাকা-পয়সা-গহনাপত্র আসবার সময় সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, তাতে মুখেরা গ্রামে জমি সহ বসতবাটি, ব্রাহ্মণত্ব ও ধর্মবোধ একই সঙ্গে তিনি ভারত ইউনিয়নে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। মাঝখানের কয়েকটা দিন তিনি মুছে দিতে চাইছিলেন।

এবং অবশেষে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০-এ জুলাই, অর্থাৎ অনিমা পাকিস্তান থেকে আসার মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই, মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর সঙ্গে হেমচন্দ্র দুই মাসের গর্ভবতী অনিমার বিবাহ দেন। ও সেই বিবাহের সাত মাস পরে সে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ বল্লভপুর হাসপাতালে একটি পূর্ণাঙ্গ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সন্তান প্রসব করে। এ-সন্তানের গর্ভসঞ্চার হয়েছে এনামুল হকচৌধুরীর স্ত্রীরূপে, প্রসব হয়েছে সত্যব্রত লাহিড়ীর স্ত্রীরূপে।

দ্বিতীয় মত : ভারত ইউনিয়নে চলে আসার পর দীর্ঘদিন হেমচন্দ্র অনিমার কোনো খবব পান না। অথচ তাঁর আশা বা আশঙ্কা ছিল কোনোদিন হয়তো অনিমা ফিরে আসতেও পাবে। তাই তিনি সবাইকে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন ও বলেছেন যে সে তার বড়দির কাছে আসামের চা-বাগানে আছে। অবশেষে হঠাৎ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অনিমা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মুখেরায় এসে উপস্থিত হয়। সে নাকি বলে যে হেমচন্দ্র সান্যাল পাকিস্তান ছাড়বার পরদিনই সে এনামুলের হাত থেকে পালায় ও তারপর বহু কষ্ট ও যাতনার পর পাকিস্তান থেকে বেরুতে পারে ও তারপর নানা সূত্রে চেষ্টা করে হেমচন্দ্র সান্যালের ঠিকানা বার করে।

হারানো সন্তান ফিরে পেয়ে হেমচন্দ্র প্রথমে তাঁর ভগ্নশরীর সারিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন ও সেই কারণে সবসময় সে ঘরের মধ্যে থাকত ও বাইরের কারু সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়নি। মাসখানেকের মধ্যেই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়। এবং যে-ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, তাঁর চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার আগেই মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী বি-এর সহিত অনিমার সম্বন্ধ আসে। কন্যার প্রতি কর্তব্যের তাড়ায় ও নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর রাখতে না-পেরে হেমচন্দ্র এ-বিবাহে সম্মত হন। এবং ১৯৫২ সালের ৩০-এ জুলাই সত্যব্রতের সঙ্গে অনিমার বিবাহ হয়।

বিবাহের মাসখানেক-মাসদেড়েক পরে অনিমা যখন বাপের বাড়িতে আসে, তখন তার গর্ভের লক্ষণ দেখা যায়। এ-বিষয়ে মুখেরার প্রতিবেশীরা সাক্ষ্য দিতে পারেন। চার মাসের মাথায় অনিমাকে বল্লভপুর পাঠানো হয়। এবং সাত মাসের শেষে ১৯৫৩ সালের ১৭ই মার্চ অনিমার একমাত্র সন্তানের জন্ম হয়। এ-গর্ভসঞ্চার সত্যব্রতের সঙ্গে বিবাহের পরে ও এ-সন্তানের একমাত্র পিতা সত্যব্রত।

যদি এনামুল অনিমাকে ব্যবহার করার সুযোগ পেত, তবে কি আর অনিমা ছাড়া পেত, আর সেই লম্পট গুণ্ডার সঙ্গেই যদি সে থাকত, তবে এক বৎসর পর তার গর্ভসঞ্চারের কারণ কী?

সমস্ত মতামত ৷বেবেচনা করলে দেখা যায়—(ক) অণিমা এনামুলকে ভালোবাসত, না কি এনামুল জোর করে অণিমাকে আটকে রেখেছিল (খ) অণিমা এনামুলকে নামান্তরিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল, না কি বাধ্য হয়ে (গ) অণিমা সত্যব্রতকে গোত্রান্তরিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল, নাকি বাধ্য হয়ে (ঘ) অঞ্জনা কার কন্যা, এনামুলের না সত্যব্রতের —এই চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর অণিমার প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করছে, এবং অঞ্জনার। এবং প্রশ্নগুলি মানুষ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের কাছাকাছি নিয়ে যায়, অতি দ্রুত ও অতি সোজাসুজি।

যতদিন এই সোজাসুজি প্রশ্ন চারটির সত্য জবাব পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন-যাঁকে আপনি স্ত্রী ব৻ে জানেন, তিনি আপনাব স্ত্রী নন; যাকে আপনাদের সন্তান বলে জানেন, সে আপনাদেব সন্তান নয়।

সুতরাং নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয় সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিবা দিয়ে প্রমান করুণ আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।

...

খিড়কিতে সদর দাওয়ায় সিঁড়িতে তুলসীকোণায় ঘরের আনাচে-কানাচে অন্ধকার। দ্রুতবিস্তাবী বন্যার মতো, প্রাণান্তিক মহামারীর মতো, অন্ধকার। আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু অণিমা আর সত্যব্রত সে-অন্ধকারকে তপ্ত তরল লোহার ফুটন্ত সমুদ্র ভেবে বিলীন হতে চাইল।

পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেগুলি সংসার ছিল, এখন সেগুলি আলোহীন চোখের গর্ত—যেন মিথ্যা পল্লব তুলে উঠোনে অণিমা আর সিঁড়িতে সত্যব্রতের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই ঘর, সেই বাড়ি, সেই পরিবার, সেই সুখ, পা-গজানো রাক্ষসের মতো সত্যব্রত-অণিমার চারিদিকে আচ্ছন্ন করে তোলে এবং সেই ক্রমঘনিষ্ঠ অন্ধকারের আকাশে নিঃশব্দ ঘোষণা —'তুমি, তুমি নও সত্যব্রত; তুমি, তুমি নও অণিমা।'

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুটি আত্মা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে—বাইরে কচি করুণ একা-কণ্ঠে তীরের মতো তীব্রস্বরে অন্ধকারকে ভেদ করে অঞ্জু তাদের আত্মার তর্পণের মন্ত্র হাঁকবে : 'বাবা' 'মা'—তারই অপেক্ষায়।

# পুনর্বাসন

## অভ্র রায়

জীবনে কখনো পাখিও মারিনি একটা আমি। ছেলেবেলায় বেশ ভীতুই ছিলাম। ঝগড়া মারপিটে, জানেন, আমি দুঘা খেয়েছি ছাড়া কখনো ফিরিয়ে দিতে পারিনি।অথচ কী করে সব যেন ঘটে গেল। ভাবলে আমারই অবাক লাগে। আমার হাতেই যে এতগুলো শয়তান খতম হবে তা কি...

বলতে বলতে একবার থেমে গিয়ে আনোয়ার তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমাদের সবার সামনে মেলে ধরল। যেন ইঙ্গিতে বলতে চাইল, দেখুন এ দুটো। কত সাধারণ, স্বাভাবিক। আপনাদের পাঁচজনের চেয়ে একটুও আলাদা নয়। অথচ এই দুটো দিয়েই আমি দিনের পর দিন কত তাজা খুনের নদী বইয়ে দিয়েছি, বিশ্বাস হয়?

—সব মিলিয়ে, আন্দাজ কতজন আপনার একার হাতে সাবাড় হয়েছে?

খুব উত্তেজিত হয়ে আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্নটা করল।

কথাটা শুনে আনোয়ার একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আবার আগের মত সেই সুন্দর সরল হাসিতে ওর মুখটা ভরে উঠল। হাসলে ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখায়। গভীর চোখ দুটো কেমন খুশিতে ছলকে ওঠে।

বুকের কাছে হাত দুটো জাপ্টে ও বলল, একদম ঠিকঠাক সংখ্যাটা বলা কিন্তু মুশকিল। জয়েন্ট অপারেশনে কে কার হাতে ঘায়েল হল, জঙ্গলের মধ্যে তা সব সময় বোঝা যায় না। তাছাড়া বেশির ভাগ মোকাবিলাই তো রাত্তিরের অন্ধকারে। নিতান্ত সামনাসামনি না পড়লে তখন কে আর লাশ গুণে সময় নষ্ট করতে চায়। এর পরও আছে জখমীর তালিকা—যার মধ্যে বেশ কিছু শেষ পর্যন্ত ঘায়েলের দলেই পড়ে।

—তবু আন্দাজ—? প্রশ্নকর্তা নিতান্ত নাছোড়বান্দা।

এই রকম একজন জলজ্যান্ত তরুণ যোদ্ধার সান্নিধ্যে যেন কারও উত্তেজনা বাগ মানতে চায় না। সংখ্যাটার একটা হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই কৌতূহল মিটছিল না।

আনোয়ার বলল, তা ধরুন, প্রায় সেঞ্চুরি ছাড়িয়েছি...। শূন্যের দিকে তাকিয়ে স্বগোতোক্তি করল ও।

ওর মুখটা যেন একটু থমথমে। চোখের দৃষ্টিটা এই দমচাপা কুঠরি পেরিয়ে কোন এক দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের কথা ভাবছে এখন। রোদে পোড়া তামাটে রঙের মুখের দুপাশে দুটো শক্ত চোয়াল। এই আলোর মধ্যে কেমন চিক চিক করে ওঠে। অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে থাকা আমাদের সামনে ও পা দুটো ফাঁক করে দেহটাকে যেন মজবুত করে গেঁথে নিয়েছে মাটির সঙ্গে। হয়ত এখান থেকে এই পজিশানেই ও সব কিছুর মোকাবিলা করে নিতে চায়।

—একশ! তার বেশি! বলেন কি?

দু'তিনজনের গলায় অদ্ভুত বিস্ময়।

আনোয়ারের চেহারাটা ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। আমরা সবাই আবার ওকে চেপে ধরলাম। বলতেই হবে আপনার কিছু অভিজ্ঞতার কথা। আজকে সময় না থাকলেও, অন্তত কিছু বলে যান। পরে আবার কবে এমন সুযোগ আসবে, তা কে জানে।

আনোয়ারের মুখে সব কথার উত্তরে সেই অদ্ভুত সরল হাসি। একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে সে। ঠিক প্রথম পরিচয়ের পর যে ভাবটা দেখেছিলাম। অথচ সাজ পোশাক চলা ফেরার ভঙ্গি, গলার স্বর, সব কিছুই ওর পরিচয়কে আরও প্রকাশ করে দিচ্ছে। হীরো সাজার এই ত বয়েস। ম্লান আলোর মধ্যে ওর চকচকে তামাটে রঙ, গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার, ফারের লাইনিং বসানো ফোম টিউনিকে মোড়া বলিষ্ঠ দেহ অনায়াসে আমাদের কল্পনা স্পর্শ করে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই তরুণ বয়সেই কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওর দখলে। উন্মত্ত, হিংস্র, বিধ্বস্ত কত জীবনের ঘূর্ণি। কত চমকপ্রদ অ্যাডভেঞ্চারের ছবি!

কিন্তু তবু আনোয়ার তার নিজের সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। একটুখানি বলেই থেমে যায়। কী যেন একটু ভাবে মনে মনে। তারপর সেই সুন্দর নম্র হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তোলে।

আনোয়ারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাত্র ঘন্টা দুয়েক আগে। বাংলা দেশের মুক্তি উপলক্ষে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। সামান্য গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া এবং এই আনন্দদায়ক উপলক্ষকে ঘিরে বেশ জমিয়ে সন্ধে বেলায় বসে আড্ডা দেওয়া আর কি। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ একজন আওয়ামী লীগের নেতাকে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা তাকে খুলে বলতেই তিনিও আনন্দে রাজী হয়ে গেলেন আমাদের মধ্যে আসতে। খবর পাঠালেন সঙ্গে করে তিনি আরও দুজন বিশিষ্ট তরুণ নেতাকেও নিয়ে আসছেন। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটা বেশ একটু জমকালোই হয়ে উঠল।

একেবারে ঘড়ি ধরে সময়মত এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। খুবই অমায়িক ব্যবহার। পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখে নিজেই এগিয়ে এসে সবার সঙ্গে আলাপ করলেন। হাত তুলে নমস্কার বা করমর্দন কোনটাই তাঁর মনের মতন নয়। বাড়ানো হাত ঠেলে দিয়ে সবাইকে এক এক করে বুকে চেপে ধরলেন। তাঁর সেই দরাজ আলিঙ্গন আর আবেগে আমরা যেন অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম মুক্তির এই চেহারাটা বা স্বাধীনতার জন্যে আনন্দ আমাদের আর ওঁর এক রকম নয়। এই উচ্ছ্বসিত আবেগ সম্পূর্ণ আলাদা। সামান্য কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান দিয়ে একে বাঁধা যায় না। অবশেষে আবেগের প্রথম ধাক্কাটা কাটলে তিনি তাঁর সঙ্গী দুজনের সঙ্গেও পরিচয় করালেন। একজন স্বাধীনতার পর জেল থেকে সদ্যমুক্ত এক ছাত্রনেতা। নিতান্ত বরাতজোরে যিনি জল্লাদ বাহিনীর হাতে পড়েও এ যাত্রা রেহাই পেয়ে গেছেন।

অপরজন, আজকের সবচেয়ে বিশিষ্ট অতিথি, আনোয়ার। মুক্তিবাহিনীর একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেকটার কমাণ্ডার। শ্রীহট্টের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে মাসের পর মাস মুক্ত করে রেখেছে। এই তরুণ বয়সেই সে, যে সাহস, বুদ্ধি আর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। আনোয়ারের কাঁধে এক চাপড় মেরে তিনি বললেন, এরাই আমাদের মান বাঁচিয়েছে। এরাই আমাদের গর্ব, আমাদের ভবিষ্যত...

শেষ দিকে আবেগে তাঁর গলা বুজে আসছিল। আনোয়ারকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, বল তোমার নিজের কথা কিছু এদের কাছে। কিন্তু আনোয়ার লজ্জায় মুখ তুলতে চায় না। হাসি মুখে একের পর এক সবাইকে শুধু বুকে জড়িয়ে তার ভালবাসা জানাতে চায়।

অনুষ্ঠানটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। 'আমার সোনার বাংলা' গান দিয়ে শুরু হল সভা। সবার সঙ্গে আনোয়ারও গলা মেলাল। তারপর সামান্য বক্তৃতাও হল ছোট ছোট। শুভেচ্ছা বিনিময়, পারস্পরিক বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি, টুকরো টুকরো স্মৃতিরোমন্থন, আব চেনা জানাদের খোঁজখবরেই অধিকাংশ সময়টা কেটে গেল।

আমি সারাটা সময় শুধু আনোয়ারকে লক্ষ করছিলাম। কতই বা বয়েস? সাতাশ আটাশ। নাকি তারও কম? চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। চওড়া কপাল, টানা চোখ। কেমন একটা উদাসীন অন্যমনস্ক দৃষ্টি। জাঁদরেল কোন সেনাপতির সঙ্গে কিছুতেই মেলে না আদলটা। বরং একজন রোমান্টিক হীরোর ভূমিকায় তাকে বেশি মানায়। অথচ এই ছেলেটাই দিনের পর দিন এমন এক দুঃসাহসিক যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছে। ভাবা যায় না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে সে মনোযোগ দিয়ে শুধু সবার কথা শুনছিল। এবার আমরা সবাই মিলে পেড়াপিড়ি করাতে নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে কিছু বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করে সে একটু হাসল, আমি যে একদম বক্তৃতা করতে পারি নে। মুক্তি বাহিনীতে কিছু করেছি আমি—সেটুকুও আপনাদের ভালবাসা আর সাহায্যের জোরে করেছি। আমাদের বড় আনন্দের দিন আজ, খুবই আনন্দের দিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের কথাও ভুলতে পারছি না, যাঁরা আজ আর বেঁচে নেই। যে জন্যে তাঁরা জান-ইজ্জৎ বিসর্জন দিলেন আমরা তা কায়েম করেছি কিন্তু তাঁরা তা দেখে যেতে পারলেন না, এই আফসোস। আমাদের সামনে এখন অনেক কঠিন সমস্যা। তবে আপনাদের ভালবাসা আর সাহায্যের জোরে আশা করি, এবার সব ঠিক করে নিতে পারবো আমরা। জয় বাংলা।

মুখ নীচু করে কোন মতে কথাগুলো শেষ করে আনোয়ার বসে পড়ল। চোখে মুখে লজ্জার আভা। যেন এক মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে সে। চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে আমরা কয়েকজন ওকে এক পাশে টেনে নিলাম। বললাম, আপনি কোন ডায়েরি টায়েরি রাখেন নি যুদ্ধের।

আনোয়ার হাসল, রেখেছিলাম, কিন্তু অনেক কিছুর মত সেটাকেও খুইয়েছি। শেষের

দিকে একটা হেভী আর্টিলারি অ্যাটাকের মুখে বাংকারের মধ্যে ফেলে এসেছি। সেই ডায়েরিটা, কিছু জামাকাপড়, একটা ট্রানজিসটর, সব—। তবে আমার মনে আছে ঘটনাগুলো। একটু সময় পেলে সাজিয়ে টাজিয়ে নিয়ে দেখাবো আপনাদের একদিন।

চা শেষ করে ইঙ্গিতে বোঝাল আনোয়ার, একটু বাইরে চলুন। আওয়ামী লীগের নেতা বা আমাদের প্রবীন সভাপতির সামনে ও সিগারেট খেতে সঙ্কোচ বোধ করছে। বাইরে প্যাসেজের এক কোণে এসে আমরা ওকে সিগারেট অফার করতে গেলাম। ও ফিরিয়ে দিল। পকেট থেকে এক প্যাকেট খুব দামী ব্র্যাণ্ড বার করে বলল, আজকের দিনে আমাকেও কিছু অফাব করার সুযোগ দিন। সবই তো কেবল আপনারা করছেন। নিন ধরুন। লাইটার জ্বেলে ও সবাইকে এগিয়ে দিল।

সিগারেট টানতে টানতে একজন বলল, আনোয়ার ভাই, আমরা কিন্তু খুবই আশা করেছিলাম আপনাব কাছ থেকে কিছু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা শুনবো। আনোয়ার এক মুখ ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, কী শুনবেন বলুন—আমরা তো হলাম সেই নিধিরাম সর্দার, যার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, রসদ নেই তবু জান কবুল করে লড়ছে দিনের পর দিন।

—কিন্তু ওদেব এত সব আধুনিক অস্ত্রে সাজানো বাহিনীর সঙ্গে আপনারা লড়লেন কী করে?

আনোয়ার পায়ের তলায় সিগারেটের বাটটা পিষতে পিষতে বলল, সেটা কিন্তু আমরাও ঠিক ভেবে পাইনে যে কী করে এতদিন ওদের সঙ্গে লড়াইটা চালিয়ে গেলাম। শুরু করেছিলাম তো তীর ধনুক আর চা বাগানের কিছু শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে। ভেবেছিলাম এই নিয়েই চলবে। কিন্তু রাইফেলের সামনে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে অনেকগুলো প্রাণ নষ্ট করে কোন রকমে পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচলাম। তারপর যেদিন বেশ কিছু ট্রেনিং পেয়ে আমাদের দল ক্রমশ বড় হল, আমরাও রাইফেল স্টেনগান হাতে নিতে শিখলাম, তখন মনে হল এবার বুঝি স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। বিপুল উৎসাহে একেবারে ওদের ঘাঁটিতে মুখোমুখি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। কিন্তু তখন বুঝলাম, কামান, মর্টার মেশিনগান কী বস্তু। তবু প্রথমবারেই দশ বারটার দফা নিকেশ করে পাঁচটাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে পালিয়েছি।

বলতে বলতে আবার থামল আনোয়ার। উত্তেজিত ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্যেই বোধহয় আর একটা সিগারেট ধরাল সে।

—আচ্ছা ভাই, এত অসুবিধে, অনিশ্চয়তার মধ্যেও আপনারা মনোবল টিকিয়ে রাখলেন কী করে? সেটাই আমাদের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে।

—সত্যি কথা বলতে, দিনের পর দিন পাক সেনাদের নৃশংস অত্যাচার আমাদের খুন কখনো ঠাণ্ডা হতে দেয়নি। ঐ কথাটা কিন্তু খুব সত্যি যে, আয়ুব আমাদের নেতাকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে, আর ইয়াহিয়া দেখিয়েছে আমাদের স্বাধীনতার পথ। এক একটা গ্রামের ওপর যে বীভৎস অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি তা কোন ভাষায় বর্ণনা করা যায়

না। পুড়ে যাওয়া ঘরের পাশে ধর্ষিতা মৃত মায়ের বুকে হুমড়ি খেয়ে একটা তিন চার বছরের ছেলে কাঁদছে। মাথা ঠিক রাখতে পারবেন এই দৃশ্য দেখে? মনে হয়েছে এর পরও আমাদের বেঁচে থাকবার কি প্রয়োজন? জানের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তাই বারবার অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি ওদেব ঘাঁটি লক্ষ্য করে। দেখুন, সামান্য কিছু যা যুদ্ধের ট্রেনিং পেয়েছি তাতে একটা জিনিস জেনেছি যে, মনোবলই হচ্ছে যে কোন বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি। এবং আমরা এটাও বুঝে গিয়েছিলাম যে, আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়ছি তাদের ও বস্তুটা একেবারে শূন্য। তাবা জানে, তাদের পেছনে অনেক লোক, অনেক অস্ত্র। আমি না লড়লেও আর একজন লডবে। তাই যে যার মত মাথা বাঁচিয়ে ধর্ষণ আর সন্ত্রাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে। আব আমরা? আমরা জানতাম প্রত্যেকটি বুলেটই আমাদের টার্গেটে হিট করতে হবে। নষ্ট করার মত একটা গুলিও আমাদের নেই, অপচয কবার মত একটা মুহূর্তও।

একটানা আবেগে অনেকক্ষণ কথা বলে আনোয়াব একটু থামল। ঘরের বাইরে এসে ও যেন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। কথা বলার মধ্যে বেশ একটা দৃঢ়তার সুর। চোখে মুখে গভীর আত্মবিশ্বাস। আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আজ ত বেশি সময় নেই হাতে, আর একদিন ববং আপনাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে। সাড়ে নটায একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

—অ্যাপয়েন্টমেণ্টটা কি খুবই জরুরি, আনোয়ার ভাই? একটু দেবি হলে চলে না? আপনাকে পেয়ে কিন্তু আমাদের খুব ভাল লাগছে। আমতা আমতা করে একজন বলল।

আবার সেই স্নিগ্ধ হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল করে তুলল আনোয়ার, ব্যাপারটা কিন্তু একটু জরুরিই—আমাদের এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি সমস্যা, সেই পুনর্বাসনেরই একটা ব্যাপার এটা। এবং এটা খানিকটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যাও বটে।

—সে কি? আপনার আত্মীয় স্বজনও কি শরাণার্থী শিবিরে?

—সবই তো আমার আত্মীয়। আনোয়ার হাসল। তবে এটা একজন নির্যাতিতা তরুণীর সমস্যা, যে আমার আত্মীয়ের চেয়েও বেশি। খান সেনাদের একটা ঘাঁটি থেকে একে প্রায় আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করেছিলাম। মেয়েটির স্বামী সেইদিনই লড়াইয়ে মারা যায়। উদ্ধারের পর ওকে আমাদের আস্তানায় স্বেচ্ছাসেবিকাদের হাতে তুলে দি। সেখানে কিছুদিন থেকে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন নাসীম ঠিক আর দশটা মেয়ের মত স্বাভাবিক জীবনে মাথা উঁচু কবে বাঁচতে চায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কোন শিবিরেই নাসীমের এমন কোন আত্মীয়স্বজনের খবর পাচ্ছি না যার হাতে এখন ওকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায়।

—এটা তো একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা। আপনাদের সরকার নিশ্চয়ই এই সব মেয়েদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। এঁরা যাতে সুস্থ সামাজিক জীবনে আবার ফিরতে পারেন তার দিকেও নিশ্চয় দৃষ্টি রাখবেন আপনারা।

—সে তো নিশ্চয়, একশবার। কিন্তু এই মেয়েটির স্বামী আমারই নির্দেশে লড়াই

করতে নেমে আমার পাশে দাঁড়িয়ে শহীদ হয়েছে। তারপর থেকেই নাসীম আমাদের আশ্রয়ে। সে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে আমাদের অনেক আহত ভাইদের সেবা করেছে রাতের পর রাত। রাইফেল ট্রেনিংয়েও পেছিয়ে থাকে নি। বেশ ভাল হাত তার শুটিংয়ে এখন। অনেক কষ্টে তো তাকে আটকাতে হয়েছে, নাহলে তার ভীষণ জেদ ছিল আমাদের সঙ্গে লড়াইতে যাবে। ভাবতে পারেন কী মনের জোর মেয়েটার? একে কি আমরা কোন অসম্মান বা অবহেলা করতে পারি? তাই আমি চেয়েছিলাম নাসীমের কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে আমি নিজের হাতে ওকে তুলে দেব। নাসীমকে উদ্ধার আমার জীবনের একটা খুব বড় অভিজ্ঞতা, একটা দারুণ দুঃসাহসিক অপারেশান।

—একটু বলুন না সেই ঘটনাটা, কী ভাবে ওকে উদ্ধার করলেন?

আনোয়ার একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে স্বগতোক্তি করে, সব কথা তো বলবার সময় হবে না, তাহলেও একটু শুনুন। পর পর তিন চারটে গ্রামে আগুন দিয়ে সব ছারখার করে খান সেনারা একটা পাহাড়ী টিলার মাথায় ঘাঁটি গেড়েছে। খবর পেয়েছিলাম এক কোম্পানীর মত ফোর্স নিয়ে ওরা ওখানে ছাউনি ফেলেছে। এমনিতে কিন্তু খানেরা গ্রামে জল-কাদা-জঙ্গল আর সাপের ভয়ে বড় একটা থাকতে চায় না। এলোপাথাড়ি মেরেধরে লুঠ করে পালাতে চায়। টিলার ওপর সুবিধামত ঘাঁটিটা পেয়েই ওরা পাশাপাশি গ্রামগুলো রেঞ্জের মধ্যে রেখেছে। এখন ঐ টিলাটা কব্জা করতে পারলে ওদের বেশ কয়েক মাইল দূরে তাড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু মুশকিল হল পাহাড়টায় ওঠার একটাই সুবিধেমত রাস্তা। আর ঠিক রাস্তার মুখে এমন কায়দামত জায়গায় একটা মেশিনগান বসিয়েছে যে সেটাকে উড়িয়ে দিতে না পারলে ওদের কাবু করা অসম্ভব। নিচের দিক থেকে যতই লোক নিয়ে উঠিনা কেন ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি আমাদের অনায়াসে খতম করে দেবে। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে একটা প্ল্যান ঠিক করলাম।

কাছাকাছি গ্রামগুলোয় ঘুরে জন চারেক স্থানীয় লোক জোগাড় করলাম। তাদের মধ্যেই ছিল জামাল। জামালের কাহিনী শুনলাম, সপরিবারে তারা একটা দলের সঙ্গে সীমান্তের দিকে পালাবার মুখে রাজাকার আর খানেরা দল বেঁধে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জামাল কোন মতে তার বিবি নাসীমকে নিয়ে পালিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেখানেও তারা নিষ্কৃতি পেলনা। একটু পরেই খানেরা গুলি চালাতে চালাতে এসে হাজির। তারপর তারা নাসীমকে ধরে নিয়ে ওই টিলার ওপরে চলে যায়। জলের মধ্যে কচুরিপানার জঙ্গলে ঘাপটি মেরে জামাল কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু তারপর সে আর গ্রাম ছেড়ে পালাতে পারে নি। পাগলের মত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আমরা টিলাটা দখল করতে চাই শুনে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের দলে যোগ দিতে রাজী।

জামাল ও তার তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে পরামর্শ করলাম কী করে গোপনে একেবারে

ঐ মেশিনগানটার নিচেয় গিয়ে হাজির হওয়া যায়। ওরা ভরসা দিল, উত্তর দিকের বেত ঝোপ আর বাঁশবাগানেব মধ্যে দিয়ে বাত্তির বেলায় এগুলে একেবারে ওর বিশ তিরিশ গজেব মধ্যে পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু তার পরেই একেবারে সাফ জায়গা। শালারা চারদিক পরিষ্কার করে কামান পেতে বসে আছে। কিছু নড়তে চড়তে দেখলেই তোপ দাগবে। দিনেব বেলায় হবে না। সারাদিন আনসান খটাস খটাস করে খালি গুলি ছোঁড়ে। না হলে সায়েব, আমি এখনো বসে আছি? ধরে ধরে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিতাম না?

হাত মুঠো করে ক্ষ্যাপা পাগলের মত কিড়মিড় করে উঠল জামাল।

ওকে থামালাম, ঠিক আছে ভাইসায়েব, এব একটা ব্যবস্থা হবে। মাথা গরম করে ধৈর্য হারালে চলবে না এখন সব দিক ঠিকমত ভেবেচিন্তে নিয়ে আচমকা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যা বলছি ভাই, এখন মন দিয়ে শোনো....

ঠিক হল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি, জামাল আর আমার সহকর্মী খলিল ঐ জল-কাদার জঙ্গল ভেঙ্গেই এগুবো। সকাল সাড়ে চারটেব সময় ঐ মেসিনগানটার ওপর আমরা এ্যাটাক করবো। তখন আমার সেকেণ্ড কমাণ্ডাব তার ফোর্স নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে টিলাটা ঘিরে ফায়ারিং শুরু করবে। আর বাহিনীর একটা কলাম তখন ঐ ভাঙা মেশিনগানেব পাশ দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠবার চেষ্টা করবে। বাকি দল দুদিক থেকে ফায়াবিং চালিযে অ্যাডভান্সিং কলামকে কাভার করবে। জামালকে একটু ট্রেনিং দিযে গ্রেনেড চার্জ করার কায়দাটাও বুঝিয়ে দিলাম। হাতে করে ও বেশ করে নেড়ে চেড়ে দেখে নিল জিনিসটা।

ভোর তিনটে নাগাদ সেকেণ্ড কমাণ্ডারকে রেডি হতে বলে তার সঙ্গে আমার ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম। তারপর সবচেয়ে আগে আমরা তিনজন চুপি চুপি অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেলাম। এক পশলা বিষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলে পা হড়কে যাচ্ছে। তবুও প্রায় ছুটছি আমরা। সাপের ভয়ে খুব করে রসুন বাটা হাতে মেখে এসেছি। বুনো গন্ধের সঙ্গে মিশে এখন তার তীব্র গন্ধ কেমন বিদঘুটে লাগছে। গাছের ডাল পালায়, কাঁটা ঝোপে, মাঝে মাঝে রাস্তা আটকে যাচ্ছে। তবুও যতটা সম্ভব দ্রুত আমরা এগুতে লাগলাম। শেষের দিকটায় তো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে।

একেবারে মেশিনগানটার তিরিশ চল্লিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছি। তখনো মিনিট পনেরো সময় হাতে। চারদিক থম থম করছে। মাথার ওপরে হাত তুলে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলাম জামালকে, আমার বাঁ দিকে পজিশান নিতে। খলিলকে ডান দিকে।

ভোরের আলো ফুটছে এবার একটু একটু করে। দূরে পাখি ডাকার শব্দ। পাহাড়ের মাথাটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। মেশিমগানের নলটায় যেন তাজা রক্ত মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ। আর মোটে আট দশ গজ এগুলেই আমরা খোলা মাঠের মধ্যে ঐ ভয়ঙ্কর নলটার মুখোমুখি গিয়ে পড়বো। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে এবার এগুচ্ছি আমরা। আর একটুখানি গেলেই একেবারে নির্ভুল নিশানায় চার্জ করতে পারবো। প্ল্যানমত আমিই

প্রথমে চার্জ করবো। তারপর খলিল, সবশেষে জামাল।

এখনও থমথম করছে চারদিক। ওপরের দিকেও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ আমার পা কিসের মধ্যে ডুবে গেল যেন। আধখোঁড়া ক্যামোফ্লেজ করা একটা মেটে বাংকার ছিল বোধ হয়। পাঠকাঠি আর গুলঞ্চলতার ছাউনি ভেঙ্গে হুড় মুড় করে সশব্দে থকথকে জল কাদার মধ্যে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যা ট্যা করে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ভোরের শান্ত পরিবেশ এক মুহূর্তে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মত গুলির ঝাঁক শিস্ দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, আজ আমার খেল খতম। জামাল আর খলিলকেও হয়ত বোকার মত আমি মারলাম। আরও কয়েক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে থেমে গেল মেশিনগানটা। আর কোন শব্দ নেই। আবার সব চুপচাপ। দূরে দূরে কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। ভাবলাম, তাহলে ওরা আমাদের দেখেনি। শব্দ পেয়েই আন্দাজে ফায়ার করেছে।

বুকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম গর্ত থেকে। গোটা শরীরটা যেন পাথরের মত ভারি। দরদর করছে ঘাম সারা পিঠ বেয়ে। কনুই আর থুতনির কাছে একটা প্রচণ্ড ব্যথা। কেটে ছিঁড়ে গেছে হয়ত। কিন্তু সেদিকে দেখবার সময় নেই। বুক ঘষে ঘষে জামালের কাছে গিয়ে দেখি সব শেষ। রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তার লাশটা। আস্তে আস্তে ওর হাতের মুঠো থেকে গ্রেনেডটা ছাড়িয়ে নিলাম।

ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজতে আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি। দম বন্ধ করে পজিশান নিলাম। নাহ কোন শব্দ নেই আর। দাঁত দিয়ে এবার সেফটি-লিভারটা ছড়িয়ে নিয়ে একটু উঁচু হয়েই চার্জ করলাম সোজা। প্রচণ্ড আওযাজে কেঁপে উঠল চারদিক। সঙ্গে সঙ্গেই সটান দাঁড়িয়ে আর একটা। এবারে দেখলাম, একেবারে রাইট অন দি টার্গেট। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ফাটলো ডা‍ন দিকের অ্যাংগেল থেকে। বুঝলাম খলিল বেঁচে আছে। মুহূর্তের মধ্যে আমরা ওদের স্ট্র্যাটেজিক গান পয়েন্ট একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ে করে দিলাম।

তারপর তো ব্যাপারটা খুব সহজেই শেষ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পুরোপুরি ঘাঁটিটা দখলে নিলাম। ওরা রেডি হবার সময়ই পেল না। যে কজন সেণ্ট্রি গার্ড ছিল শুধু তাদেরই হাতে রেডি আর্মস ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমরা ঘিরে ফেলেছিলাম যে সে বেচারারা কিছু করার সুযোগ পেল না।

আনোয়ার এবার একটু থামল। ওর ভাবুক চোখ দুটোয় কেমন এক বিমর্ষ দৃষ্টি। আস্তে আস্তে ওর হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিলাম।

সিগারেটটা ধরিয়ে ও আবার বলতে লাগল, ওখানেই একটা ঘরে খুঁজে পেয়েছিলাম নাসীমকে। একেবারে ঝড়ে নেতিয়ে পড়া লতার মত পড়ে আছে। কোন মতে লজ্জা ঢাকবার মত সামান্য একটু আবরণ মাত্র দেহে। সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। সঙ্গে আরও একটা মেয়েকে পেলাম। শুকিয়ে কাঠ চেহারা। বয়সের কোন আন্দাজই পাওয়া যায় না। সেই মেয়েটাকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আব্বার কাছে পৌঁছে দিতে

পেরেছিলাম। কিন্তু নাসীমকে কোথাও দেওয়া গেল না। প্রথমটা ওর মাথারই ঠিক ছিল না। কথার জবাব দেয় না। ফ্যাল ফ্যাল করে পাগলের মত তাকিয়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে বাচ্চা মেয়ের মত ডুকরে কেঁদে ওঠে। মনে হয়েছিল, ও বোধ হয় পুরোপুরি পাগলই হয়ে যাবে। হা—!

বলতে বলতে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল আনোয়ার।

তাবপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল,

কিন্তু সেই নাসীমই এখন একেবারে আলাদা মেয়ে। দেখলে বুঝতে পারবেন না, ওব জীবনে এত বড় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। ঢাকামুক্তির খবর আমি ওকে দিলাম যখন তখন ওর চেহারা যদি দেখতেন। উল্লাসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে ওর মুখ, সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জলও গড়িয়ে পড়ছে। মুখে আনন্দেব হাসি ফুটেও ফুটছে না। শেষ পর্যন্ত আমার হাত জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল। সান্ত্বনা দিলাম, বোঝালাম অনেক তবু ওর কান্না থামে না।

এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি ওর নিজের লোকজন কেউ বেঁচে থাকে এবং সম্মানের সঙ্গে ওকে ফিরিয়ে নেয়। তাহলে আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করি। ওর স্বামী জামালের ডেথটা অবশ্য একটা অ্যাকসিডেন্ট। ওখানে আমি বা খলিলও খতম হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তবুও অনভিজ্ঞ জামাল আমার পরামর্শেই মৃত্যুর মুখেই পা দিয়েছিল। আমারই নির্দেশে সে শহীদ হয়েছে। নাসীমের এত বড় দুর্ভাগ্যের মূলে, তাই আমারও যেন কিছু দায়িত্ব থেকে গেছে। এবং এত বড় ঘটনার পরেও নাসীম আমাকে একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করে আছে।

—আচ্ছা, নাসীম সেই অপারেশনের সব ঘটনাগুলো জানে?

সব জানে। তাকে অনেক কথাই বলেছি আমি। প্রথম প্রথম খুব কাঁদত। কিন্তু তারপব শক্ত হয়ে ওঠে। এখন তো একেবারে অন্য মেয়ে। সঙ্গে করে নিয়ে এলে দেখতেন কী মনের জোর তার। আজ সে গেছে সীমান্তের দিকে। একটা পরিবারের সঙ্গে তাকেও পাঠিয়েছি কয়েকটা ক্যাম্প ঘুরে আসতে। যদিও জানি খুব একটা আশা নেই। নিজের বলতে ওর যে কজন ছিল সব রাজাকার আর খানেদের হাতে শেষ। তবু দৈবাৎ যদি কেউ আপনার জন মিলে যায় তাহলে ওর জমানো দুঃখটা কেঁদেও কিছু হালকা করে নিতে পারত। ও নিজে অবশ্য আর খামোকা ঘোরাঘুরি করতে রাজী নয়। বলে, আর কাউকে দরকার নেই আমার। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এই বয়সের একটা মেয়ে একা একা সারাজীবন তার ভাগ্যের সঙ্গে লড়বে সেটাও খুব সহজ ব্যাপার নয়।

একজন এসে খবর দিল আনোয়ারের সঙ্গী দুজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন। আনোয়ার তাড়াতাড়ি ঘড়িতে সময় দেখে বলল, আজকের মত তাহলে...। বলে আবার সেই নম্র মিষ্টি হাসিতে মাথা নোয়াল।

আমরা বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

আনোয়ার ওর টিউনিকের জীপটা টেনে গলা পর্যন্ত তুলে আনল। বেশ শীত পড়েছে

আজ। গম গম করে কাঠের সিঁড়িটা আমাদের পায়ের শব্দে কাঁপছে।

নামতে নামতেই একজন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আনোয়ার ভাই যদি তেমন কাউকে খুঁজে না পান, তাহলে নাসীমের কী ব্যবস্থা করবেন ভেবেছেন?

শেষ ধাপ থেকে নেমে দরজার মুখে একবার ঘুরে দাঁড়াল আনোযার। তারপর একটু যেন ইতস্তত করে বলল, এখনো একেবারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। তবে নাসীমের দিক থেকে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি ওকে আমার ঘরেই তুলব। যতদূর জানি, ও হ্যত এতে বাধা দেবে না। তাই অপেক্ষা করছি, ওর দিক থেকে একটু সাড়া পেলেই আমি সসম্মানেই ওকে শাদীর প্রস্তাবটা দেব।

—বলেন কি! সব জেনে শুনেও একটি ধর্ষিতা মেয়েকে আপনি...? আপনার মনের দিক থেকে কোন বকম প্রতিক্রিয়া ঘটবে না এজন্যে...? আপনাদের সমাজ বা আপনার বাড়ির লোকজন কি এটা স্বীকার করবে?— আমাদের পর পর প্রশ্নে আর বিস্ময় আনোয়ারকে ঘিরে।

আনোয়ার যেন লজ্জা পেল আমাদের অবাক হতে দেখে। একটু গলা নামিয়ে বলল, আপনাবা কি কাগজে দেখছেন না, গোটা দেশ আজ হানাদারদের হাতে ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা। এখনো তো সব রক্তের দাগ, সব আগুনের জ্বলুনি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় নি। সেই দেশটাকে যদি আমরা মা বলে ডাকতে পাবি, পোড়া মাটির ওপর যদি আবার ঘর বাঁধতে পারি, তাহলে নাসীমকে কেন ভালবাসতে পারব না? নাসীমের প্রাণ আছে বলে? বলুন?

আমরা এবারে রাস্তায়। গাড়ির দরজা খুলে ওঁরা অপেক্ষা করছেন। আনোয়ার চলতে চলতে এবার গলা নামিয়ে বলল, নাসীমকে আপনারা দেখেননি, তাই এই কথা ভাবছেন। দেখলে হয়ত বলতেন, ওকে পাওয়া যে কোন পুরুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা।

আমাদের কারো মুখে কথা ছিল না। আনোয়ারের শেষ কথাগুলো যেন চাবুক মেরে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আনোয়ারের বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ আর সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখটার দিকে শুধু অপলক দেখছিলাম। গাড়িতে উঠবার আগে সে শেষবারের মত হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কোন কথা না বলে হাতটা ধরে টেনে এবার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। একে একে সবাই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আবার কবে দেখা হবে আনোয়ার ভাই?

আনোয়ার বলল, খুব শীগগিরি হবে। তবে এরপর ওপারে—সোনার বাংলায়। এবার আমার ঘরে বসবে আসরটা। হয়তো নাসীমও থাকবে। আজ যা শুধু মুখে বললাম তারও কিছু নমুনা দেখাবো সেদিন—কথা দিলাম।

ওর কথা শেষ হতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যে অজস্র গাড়ির ভিড়ে যতক্ষণ ঐ লাল আলোটা না মিশে যায় ততক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

# অথবা

## মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপত্যকাটির ওপরে এ-পাশ থেকে মনুশঙ্কর আর ও-পাশ থেকে ওমর শরিফ একে-অন্যকে তাগ ক'রে দুমদাম গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাগমাফিক গুলি ছোঁড়া তাদের সাধ্য কী, তাহ'লে তো তাবা ওলিম্পিকে গিয়ে সোনার মেডেল পেতো; তাদের এই ফটফট-ফটাস আতশবাজিতে শুধু তারাই ফাযদা লুঠছিলো যারা এই AK-47গুলো বানিয়েছে আব চোবাপথে অনবরত গুলিগোলা জোগান দিয়ে যাচ্ছে। আব যখন গুলির আওয়াজে কান পাতাই দায়, ঠিক তখন, আচমকা, উড়ন চাকতিটা ঠিক উপত্যকাব মাঝবরাবর এসে মাটিতে নামলো। এই বেঢপ কিম্ভূত উদ্ভট মহাযানটাকে লক্ষ্য ক'রে মনু আর ওমর দুজনেই কয়েক দফা গুলি ছুঁড়লো—তাদের মাঝখানে অকস্মাৎ এই উটকো আপদটা এসে জুটে যাওয়াতে তারা দুজনেই ভারি চ'টে গিয়েছে। ঠিক তাদের রণক্ষেত্রের মধ্যে এ-কোন হতভাগা উড়ে এসে জুড়ে ব'সে তার শূর্পনাসা গলাতে চাচ্ছে? গুলিগুলো অবশ্যি ঐ অদ্ভুত মহাকাশযানের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। কাটতে যে পারবে, এমন কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। তাদের লক্ষ্যভেদ করার ওস্তাদির যা বহর! প্রায় শত হস্ত তফাৎ দিয়েই গেলো সে-সব গুলি। গ্রহযানচালক (গ্রহযানই তো, না কি?) কিন্তু ততক্ষণে তার বাহন থেকে নেমে পড়েছে, তারপর এমন ভাব করেছে যেন এ-জায়গাটা তার কতকালের চেনা, কেননা কোনোদিকে কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রেই সে হেঁটে পেরিয়েছে উপত্যকা, উঠেছে ঢাল বেয়ে, সোজা এগিয়ে এসেছে মনুশঙ্করের দিকে, আর মনু ততক্ষণে ব্যাপারটায় একটু হকচকিয়ে ছুটে গিয়ে আড়াল খুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়েছে, দণ্ডবৎ; ধ্বংসস্তূপটার এখনও-দাঁড়িয়ে-থাকা এতদিনের গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা হ'য়ে-যাওয়া দেয়ালের ছায়াটাই সে ভেবেছে তার আড়াল। ছায়াটা অবশ্যি দানা বাঁধেনি, অনিশ্চয়ে কাঁপছে কেননা জাফরির মতো আলো এসে পড়েছে নানান আকারে; বিড়বিড় ক'রে গালাগাল দিতে শুরু ক'রে দিলে মনু, পরম্পরাগত সব গালাগাল, কতগুলো গালাগাল অবশ্য সে সদ্য শিখেছে উপগ্রহ মারফৎ পাঠানো দূরদর্শনের মনোরঞ্জক প্রোগ্রাম দেখে-দেখে, আর শুয়ে-শুয়েই হুড়মুড় ক'রে চেষ্টা করে যাচ্ছে তার রাইফেলের বেল্টটাকে বাগে আনবার। তার তাগ কোনোকালেই ভালো ছিলো না। ঠাণ্ডা মাথায় যা-ও-বা পারতো, আগন্তুক যতই কাছে এগিয়ে আসছে, তাতে সবই এখন আরো এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। শেষটায়, একেবারে শেষমুহূর্তে, মনুশঙ্কর তার রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাশে-প'ড়ে-থাকা কাটারিটা এক হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালে।

'তবে গোল্লায় যাও', ব'লেই সে কাটারিটার একটা প্রচণ্ড কোপ মারলে।

সকালবেলাতেই তেতে উঠেছে রোদ্দুর। খরপ্রখর ঝকঝকে রোদ্দুরের মধ্যে কাটারির ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠলো: ওস্তাদ হাত মনুশঙ্করের, এমন কত কোপ তাকে মারতে হয়, কিন্তু কাটারির ফলাটাই যে শুধু আগন্তুকের ঘাড়গর্দান থেকে লাফিয়ে ফিরে এলো তা নয়—উলটে যেন কাটারির ভোঁতা দিকটা তার গায়েই লেগে যেতো, রবারের বল যেমন লাফ খায় তেমনিভাবেই ফিরে এসেছে কোপটা, তারপর গোটা কাটারিটাই তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো শূন্যে—আব মনুশঙ্করের মনে হ'লো তার হাতটা যেন অকস্মাৎ তড়িতাহত হয়েছে, একেবারে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে খেলে গিয়েছে বিদ্যুতের ঢেউ। সোঁতাটার ওপার থেকে একটা বুলেট এলো ঝটিতি, বোলতার হুল বেঁধার আগটায ঠিক যেমন একটা সোঁ-সোঁ আওয়াজ কানে আসে হাওযায় সে-রকমই একটা শব্দ তুলে—একই সঙ্গে যেটা বিলম্বিত অথচ ক্ষণস্থায়ী। মনুশঙ্কর আছাড় খেয়ে প'ড়েই তার আশ্রযের দিকটায় ক-বার পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়লো। আরো-একটা বুলেট একটু ক্ষীণ সুরে কিন্তু রিনরিন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, আর আগন্তুকের বাম কাঁধে ঝিলিক দিয়ে উঠলো তীক্ষ্ণ-নীল একটা ঝলক।

আগন্তুক কিন্তু সেইজন্যে দুশমন-মার্কা কোনো ভঙ্গিই করেনি। তাছাড়া তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো বিলকুল নিরস্ত্র। মনুশঙ্করের তীব্রধারালো চোখ একবার আপাদমস্তক ঘুরে গেলো আগন্তুকের ওপর। ধুস! তার বেশভূষার কী ছিরি! ছোটো-ছোটো নীল পালকে তৈরি একটা টুপিও আবার পড়েছে মাথায়। সেই টুপির তলায় মুখখানা কঠোর, শীর্ণ, অসহিষ্ণু। শুকনো বরবটির মতো ঢ্যাঙা শুঁটকো শরীরটা লম্বায় কম ক'রেও সাত ফিট। কিন্তু না, তার কাছে যে কোনো অস্ত্র আছে এ-রকমটা তো মনে হচ্ছে না! মনুশঙ্করের বুকে সাহসের একটা দমকা হাওয়া খেলে গেলো। কাটারিটা যে কোথায় পড়লো! দেখা যাচ্ছে না তো আশপাশে, তবে তার রাইফেলটা প'ড়ে আছে কয়েক হাত দূরেই।

অচেনা মস্তানটি এসে মাটিতে গড়াগড়ি-খেতে-থাকা মনুশঙ্করের কাছে দাঁড়ালে।

'উঠে দাঁড়াও,' সে বললে, 'কথা আছে।'

*তাজ্জব ব্যাপার!* চমৎকার বাংলা বলে তো, দ্বিতীয় অক্ষরে কোনো ঝোঁক দেয়নি, যে-ঝোঁকটা *আকাশবাণী* আর *দূরদর্শনে* শুনে শুনে সে সত্যি-সত্যি বাংলা শুনছে কি না তাই নিয়েই ধাঁধায় প'ড়ে যায় আজকাল। তবে একটা খটকা লাগছে। এর গলাটা যেন তারই মাথার মধ্য থেকে উঠে আসছে। বাইরে থেকে কানে আসছে, না কি সরাসরি মাথাতেই ঝমঝম ক'রে উঠেছে?

'উহুঁ, আমি বাপু দাঁড়াচ্ছি না,' মনুশঙ্করের সাফ জবাব। 'দাঁড়াই, আর অমনি ওমর শরীফের চাঁদমারি হয়ে যাই! ইল্লি! ওমর শরীফের গুলি খাবার সাধ আমার নেই। জানি যে ওমর শরীফের গুলি কখনও লক্ষ্যভেদ করে না, তবে আমি এতটা বুড়বাক নই যে কারু তাগ ফসকাবার অভ্যাসটার ওপর নির্ভর করবো। তাছাড়া এটা কিন্তু অন্যায্য ব্যাপার। ওমর শরীফ আপনাকে কত আশরফি দিয়েছে?'

আগন্তুক কটমট ক'রে মনুশঙ্করের দিকে তাকালে। জিগেস করলে : 'জানো আমি কোত্থেকে আসছি?'

'চাঁদু, তুমি যে-চুলো থেকে এসেই উদয় হও না কেন তাতে আমার এক কানাকড়িও এসে যায় না,' কপাল থেকে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে মনুশঙ্কর বললে। কাছের উঁচু পাথরটার দিকে একবার নজর ক'রে দেখলে সে, তার আড়ালে সে গোটা কয় মালের বোতল ভারি হুঁশিয়ারিতে লুকিয়ে রেখেছিলো। 'এসেছো তো নিশ্চয়ই মার্কিন মুলুক থেকে, তুমি আর তোমাব ওই উড়ন যান। ভেবো না, হিন্দুস্থানের সরকার যথাসময়ে এর কথা জেনে যাবে। রাষ্ট্রসংঘও জানবে।'

'হিন্দুস্থানের সরকার বুঝি খুনখারাপিতে মদত দেয়?'

'এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপাব,' মনুশঙ্কর বললে। 'আমাদের মুক্ত গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফয়সালা করবাব অধিকার সব নাগবিকেরই আছে। তাছাড়া এ তো জমি আর জলের হক নিয়ে কথা। জল জানো তো—যাব অন্য নাম জীবন—জল ভাবি সাংঘাতিক ব্যাপার। তাছাড়া এটা আত্মরক্ষারও প্রশ্ন। উপত্যকাব ওপাশ থেকে ওই বদমায়েশটা আমাকে খতম ক'রে দেবার মৎলব এঁটেছে। আর এও জানি চাঁদু তোমাকে ঐ স্ত্রীর ভাইটি এইজন্যেই ভাড়া ক'রে এনেছে—অ্যাকশন করতে। কিন্তু চাঁদু, এ কেবল ভাত-রুটির ব্যাপার নয়, জমিজরিতে পানিই নয়—শুধু ভাতরুটি দিয়ে কিছুই চলে না—এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক পরম্পরার মামলা, ঐ বেজন্মা আমার মন্দিরটাও হাপিশ ক'রে দেবার পাঁয়তারা কষছে। কিন্তু চাঁদু, এজন্যে খোদ বজরঙ্গবলী হনুমানজি তোমাদের অ্যায়সা সাজা দেবেন যে সাতজন্ম ধ'রেও তুমি তার কথা সোচে গা।' হঠাৎ মনুশঙ্করের মাথায় বিজলির ঝিলিকের মতো নতুন-একটা ভাবনা খেলে গেলো—নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে সে নিজেই মোহিত হ'য়ে গেলো। 'ঐ ওমর শরীফটার খেল খতম ক'রে দেবার জন্যে কত আশরফি চাই তোমার?' সে জিগেস করলে। 'আমি তোমাকে তিনহাজার রুপেয়া দেবো, আউর জোড়া বকরি। জোড়া পাঁঠা, সমঝমে আতা হ্যায়?'

'এখানে আর-কোনো দাঙ্গাফ্যাসাদ বা হাঙ্গামা হবে না, কোনো লড়াই নয়,' খুবই ঠাণ্ডাগলায় বললে আগন্তুক, 'কী, আমার কথা কানে গেছে?'

'তাহ'লে যাও, গিয়ে ওমর শরীফকে ও-কথা বোঝাও,' মনুশঙ্কর বললেন। 'তাকে জানিয়ে দাও যে এখানকার পানির হক আমার, ঐ ভাঙা বাড়িটা আমারই মন্দির। ও আমার দাবি মেনে নিলেই আমি ওকে ছেড়ে দেবো—ওঁম শান্তি। বিলকুল সাফ জবাব।' এই ঢ্যাঙা বিদ্‌ঘুটে উদ্ভট লোকটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যাচ্ছিলো। একপাশে একটু স'রে এলো সে, আর অমনি স্তব্ধতা ফুঁড়ে শিস দিয়ে এলো একটা বুলেট, আর কাছের ফণিমনসা গাছের ঝোপটায় মাখনের মধ্যে গরম ছুরির মতো বিঁধে গেলো।

আগন্তুক তার মাথার নীল পালকগুলোয় হাত বুলিয়ে নিলে একবার।

'প্রথমে আমি তোমার সঙ্গে সব কথা সেরে ফেলতে চাই। মন দিয়ে আমার কথা

শোনো, মনুশঙ্কর।'

'তুমি আমার নাম জানলে কী ক'রে? তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো জানপহেচান নেই।' গড়িয়ে পাথরটার আড়ালে গিয়ে সাবধানে উঠে ব'সে মনুশঙ্কর বললে। 'যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আমায় খতম ক'রে দেবার জন্যেই ওমর শরীফ নির্ঘাৎ তোমায় ভাড়া করেছে।'

'তোমার নামটা আমি এইজন্যেই জানি যে আমি তোমার মনটাকে একটু-একটু পড়তে পারি। সবটা পারি না—কারণ একে তোমার মনটা ভারি প্যাঁচালো তায় আবার কী-রকম ঘোলাটে হ'য়ে আছে। স্পষ্ট ক'রে কিছু ভাববার ক্ষমতাই তোমার নেই।'

'তাহলে চাঁদু, বলতেই হয় যে তোমার মা ছিলো এক কুক্কুরী,' মনুশঙ্কর বললে।

আগন্তুকের নাকের পাটা একটু শিরশির ক'রে উঠলো, ফুলে গেলো, কিন্তু অতিকষ্টে সে আত্মসংবরণ করলে—ববং বলা যায়, কথাটাকে সে কোনো আমলই দিলে না। 'আমি অন্য-এক জগৎ থেকে এসেছি,' সে বললে, 'আমার নাম—' মনুশঙ্করের মাথায় নামটার একশো আটরকম সংস্করণ খেলে গেলো, যার মধ্যে একটা হ'লো চতুরানন।

*'চতুরানন!'* মনুশঙ্কর ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেংচি কেটে বললে। 'তা মানতেই হয় যে চতুর যদি তুমি না-ও হও, চতুরের বাচ্চা তো বটেই। ধূর্তামির জন্যে তোমায় শিরোমণি পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।' তারপর মুচকি হেসে ফোড়ন কাটলে, 'তোমার নাম যে চতুরানন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর আমার নাম আদি শঙ্করাচার্য—সবকিছুকেই মায়া বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে যে ওস্তাদ—তবে সবকিছুর মধ্যে নরকের দ্বার নারী এবং অব্রাহ্মণরাই শুধু বেশি ক'রে পড়ে।'

চতুরাননের যে-আননটা দেখা যাচ্ছিলো সেটা রোগা, চিমশে, কঠোর—কিন্তু পুরোপুরি ভাবলেশহীন নয়, কেননা গনগনে আঁচে লোহা তেতে গেলে যে-রকম লাল হয়, সেটা সে-রকম লালচে হ'য়ে উঠলো, তবে তার কণ্ঠস্বর রইলো ইচ্ছাকৃতভাবে ঠাণ্ডা, বিষম ঠাণ্ডা, কথাগুলো যেন দাঁতে দাঁত চেপে বলা। 'শোনো মনুশঙ্কর! আমার ওষ্ঠাধর তাকিয়ে দ্যাখো তুমি, ভালো ক'রে খেয়াল করো, দ্যাখো তারা নড়ছে না। আমি তোমার মাথার মধ্যে কথা বলছি, মনে-মনে কথা-চালাচালি, যাকে তোমরা বলো *টেলিপ্যাথি।* আর আমার ভাবনাগুলো তুমি এমন কথায় তর্জমা ক'রে নিচ্ছো, যে-সব কথার এক-আধটু অর্থ হয় তোমার কাছে। আমার নাম তোমার পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন হ'তো। তোমার নিজের মন তাকেই সহজ ক'রে নিয়ে চতুরাননে তর্জমা ক'রে নিয়েছে। এটা মোটেই আমার আসল নাম নয়।'

*'সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের হাতি!'* মনুশঙ্করের ঠোঁট আবার আগের মতোই বেঁকানো। 'এটা তোমার নাম না আর-কিছু। চতুরানন তোমার নামও নয়, তুমি অন্য-কোনো দুনিয়া থেকেও এসে হাজির হওনি। কোনো ইয়াঙ্কির কথা বিশ্বাস করার পাত্তর আমি নই—সে যদি তাদের যাবতীয় মরহুম প্রেসিডেন্টের নামে কসম খেয়ে বলেও। কোনো ইয়াঙ্কির কথা যে বিশ্বাস করে তার বাপ নিশ্চয়ই একটা নয়—গোটা একডজন। তাও

রুটিওয়ালাদের ডজন হবে।'

চতুরাননের দীর্ঘ কঠোর মুখটা আবার গনগনে লালচে হ'য়ে উঠলো। 'আমি এখানে এসেছি হুকুম দিতে,' আবার ঠোঁট না-নেড়েই সে বললে। 'তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নয়। শোনো মনুশঙ্কর, তোমার কাটারিটা দিয়ে গায়ের জোরে কোপ মেরেও আমার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পরোনি, সে কিসের জন্যে ব'লে তোমার মনে হয়? তোমাদের ঐ গুলি-গোলা আমাকে ছোঁয় না কেন?'

'তোমার ঐ উড়নতুবড়ি ওড়ে কেন?' কথার পিঠে চ্যাটাং ক'রে কথা বলতে মনুশঙ্কর বংশানুক্রমিকভাবেই অভ্যস্ত। সে একতাল তামাকপাতা বার ক'রে বাঁ হাতেব চেটোয় নিয়ে একটু চুন মিশিয়ে খুব ক'রে ডলতে লাগলো। চোখ দুটো কুঁচকে পাথরের আড়াল থেকে ওমর শরীফের ওপর নজর বাখাটা সে অবশ্য যুগপৎ চালিয়েই গেলো। 'ওমর হতভাগা নিশ্চয়ই বুকে হেঁটে আমার তল্লাশেই বেরিয়ে পড়েছে। আমি বরং আমার রাইফেলটা বাগিয়ে রাখি।'

'রাইফেলটা ছাড়ো, মনুশঙ্কর।' চতুরানন বললে, 'ওমর শরীফ তোমার টিকির ডগাটিও ছোঁবে না।'

এবারে একেবারে চলচ্চিত্রের খলনায়কের কায়দাতেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো মনুশঙ্কর।

'আর তুমিও, মনুশঙ্কর,' চতুরাননের ওষ্ঠাধর-অকম্পিত কথা তখনও ফুরোয়নি, 'তুমি তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ—কিছুরই গায়ে আঁচড়টিও কাটবে না।'

'আমি তাহ'লে,' হাতের তামাকপাতা গায়ের জোরে ডলতে-ডলতে মনুশঙ্কর বললে, 'এই গালে চড় খাওয়ার পর ঐ গালটাও থাপ্পড় খাওয়ার জন্যে বাড়িয়ে দেবো —তবে থাপ্পড় না-মেরে সে তখন বন্দুকের নলটা মাথায় ঠেকিয়ে গুলি ক'রে ঘিলুটিলুও বার ক'রে দিতে পারে। ওমর শরীফ যে শান্তি চায় সেটা আমি তখনই বিশ্বাস করবো, চতুর্মুখ ব্রহ্মামশাই, যখন ওকে দেখবো মাথার ওপর হাত দুটি তুলে বিনা অস্ত্রে গুটি-গুটি, পায়ে-পায়ে, মাঠের মধ্য দিয়ে এদিকটায় এগিয়ে আসছে। অবশ্য তখনও আমি ওকে খুব একটা কাছে ঘেঁসতে দেবো না, কেননা চাকু মারায় ও এমনই ওস্তাদ যে বিজলি চমকাবে আর চক্ষে ধান্ধা লেগে যাবে। আর একটা চাকু ও রাখে পিঠে—'

চতুরানন তার মাথার নীল পালকগুলোয় আরেকবার হাত বোলালে। কী-রকম মুদ্রাদোষ এটা? কোনো বিদঘুটে দোটানায় পড়লেই কি সে মাথার ওই পালকের মতো জিনিশগুলোয় হাত বোলায়? তার চিমশে কঠোর মুখে ভ্রূকুটি। 'লড়াই তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে মনুশঙ্কর। তোমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার জাতিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব রীতিনীতি ঠিক ক'রে দেয়—আর আমাদের দায়ই হ'লো বিশ্বের যেখানেই আমাদের অন্তরিক্ষযান গিয়ে থামবে সেখানেই শান্তির ললিত বাণী ছড়িয়ে দেয়া—'

'যা ভেবেছি তা-ই,' মুখে খইনির ডেলা পুরে, একগাল থেকে আরেক গালে ডেলাটা চালান ক'রে দিয়ে থুঃ ক'রে একদলা থুতু ফেলে, খুব একটা আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে মনুশঙ্কর

বললে, 'যা ভেবেছি তা-ই। তুমি চাঁদু মার্কিন মুলুক থেকে এসেছো—সি-আই-এ-টি-আই-এ হবে হয়তো। শান্তির নাম ক'রে দেশবিদেশে হানা দিয়ে জম্পেশ খেল দেখাচ্ছো, বাপু। তা তোমবা তোমাদের নিজের দেশে শান্তি-টান্তি আনো না কেন? ক্যালিফর্নিয়ায় তো তোমাদের পুলিশ কালাআদমিদের ধ'রে ঠ্যাঙায়, সেদিন দেখলুম মার্টিন লুথার কিং, নামের একজন কালাআদমিকে খুন ক'রে দিব্যি ফিলিম বানিয়ে দু-পয়সা মুনাফা লুঠছো। পারোও বটে তোমরা। তুমি কি ভাবো তোমাদের হলিউডি সেক্সভায়োলেন্স আমি স্যাটেলাইট টি-ভির দৌলতে দেখতে পাই না? লস এঞ্জেলস নিউ-ইয়র্ক বা শিকাগোতে কী হয় জানি না বুঝি? তোমাদের *গডফাদার* আমরা দেখিনি? আর ওই মাফিয়া-টাফিয়াকে নিয়েই বা তোমরা কী করছো? বড়ো যে ফোপরদালালি ক'রে বেড়াচ্ছো, অন্যদেশের ব্যাপারে এসে নাক গলাচ্ছো, কিন্তু স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো থেকে যখন এ ওকে তাগ ক'রে গুলি ছোঁড়ে তখন বাপু কোথায় থাকো? হুঁ, আমি খুব ভালোই জানি, প্রথমে তোমরা আমাদের দেশে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠা কববে, তারপর আমাদের সব কাঁচামাল হাপিশ ক'রে দেবে, আর পাঁচ লক্ষ বাতিল জিনিশ *ডাঙ্কেলং শরণং গচ্ছামি* ব'লে এ-দেশে চালিয়ে দেবে। বুদ্ধিশুদ্ধির ওপরও তো দিব্যি জগৎজোড়া ট্যাকসো বসিয়ে দিচ্ছো। সত্যি, পারোও বটে তোমরা!'

তার ঝকঝকে ইস্পাতি পায়ের ডগা দিয়ে একটা নুড়িকে দাপিয়ে লাথি কষালে চতুরানন। 'আমার সোজাসাপটা সিধে কথাটা যদি তোমার মাথায় না-ঢোকে তো গজাল মেরে ঢোকাবো।'

এবার জেব থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ঠোঁটে গোঁজবার আগে মনুশঙ্কর বাঁকা হেসে বললে, 'এই তো, পথে, এসো, বাছাধন। ঠিক এই পদ্ধতিটাই আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছিলাম। ওমর শরীফের মাথায় যদি কিছু না-ঢোকে তো আমি সেটা গজাল মেরেই ওর মগজে ঢোকাতে চাই। এই জমি আমার, ঐ সোঁতাটা আমার, হু-ই ভাঙা পাথরটাথরগুলোও আমার। ওটা মন্দির ছিলো—ওখানে যা প্রণামী পড়বে তাও আমার। আমি ওর জল বন্ধ ক'রে দেবো, ও-যে ওখানে মসজিদ বানিয়ে মজহবের নাম ক'রে, দীন-ই-ইলাহির নাম ক'রে দু-পয়সা কামাবে, সে আমি হ'তে দিচ্ছিনে।' ব'লে সে সিগারেটটা ঠোঁটে গুঁজলো।

চতুরাননের রূঢ় কঠোর আননকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় দেখায়, যদি ধাতুর পাতের মলিনতাও কখনও বিমূঢ় হ'য়ে খাবি খেতে পারে। ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আবার সে মাথার নীল পালকগুলোয় হাত বোলালে। ওগুলো কি অ্যানটেনা, *শোষকশুণ্ড?* তারপর হঠাৎ সে তার বাঁ হাতটা তুললো, আর তার অনামিকার আংটি থেকে তপ্ত শাদা রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে মনুশঙ্করের মুখের সিগারেটের ডগাটা জ্বালিয়ে দিলো। হতভম্ব, তাজ্জব আর আতঙ্কিত মনুশঙ্কর একলাফে পেছিয়ে এলো। তারপর একটা সুখটান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়লো। তপ্ত শাদা রশ্মি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। চতুরানন তার বাঁ হাত ফের নামিয়ে নিলে।

'শুক্রিয়া,' মনুশঙ্কর বললে, 'বহুত ধন্যবাদ।'

চতুবাননের বর্ণহীন ওষ্ঠাধর চেপে বসানো যেন। 'মনুশঙ্কর,' সে বললে, 'কোনো ইয়াঙ্কি এটা করতে পারতো?'

'ডাও কেমিক্যালস বা ইউনিয়ন কারবাইড কখন যে কী আবিষ্কার ক'রে ব'সে থাকে তা স্বয়ং ডাঙ্কেলও জানে না, তা মানুষ তো কুত্তা।'

'তোমাদের এই গ্রহে যত প্রাণী আছে, তাদের কারুই এই ক্ষমতা নেই, মনুশঙ্কর। আর সেটা তুমিও ভালো ক'রেই জানো।'

মনুশঙ্কর তার কাঁধ ঝাঁকালে, তবে তার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটা ততটা জোবালো হ'লো না। 'শোনো বাপু, যে-হও-সে-হও। সবই ক্রিস্তোফোরো কোলোম্বোর দান। এই-যে খইনি পুরেছি গালে, এই-যে বিড়ি ফুঁকছি, পাঁচশো বছব আগে ক্রিস্তোবাল কোলোন আমেরিকা গিয়ে না-পড়লে তা কোথায় পেতাম? যা-ই দ্যাখো না কেন নতুন, নেশার জিনিস, টি-ভি থেকে তামাকপাতা—সব তোমাদের মার্কিন মুলুকের অবদান। কোকেন মেস্কালিনও!'

চতুরানন তার কথায় কোনো পাত্তা না-দিয়ে বললে, 'ঐ ফণিমনসার ঝোপটা দেখছো? ওই-যে ওখানে? দুই গুণতে না-গুণতেই তা আমি ধোঁয়া ক'রে দিতে পাবি।'

'আমার তাতে কোনোই সন্দেহ নেই প্রভু। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে তা আমি এক্ষুনি মালুম করেছি।'

'তা যদি বলো তো, এই আস্ত গ্রহটাকেই আমি উড়িয়ে দিতে পারি—ইচ্ছে করলে!'

'হ্যাঁ, আমরাও আজকাল পরমাণু বোমা বানাচ্ছি—শুধু তোমরাই তার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ক'রে রাখতে পারোনি, হাজার ফতোয়া দিয়েও, হাজারবার চোখ রাঙিয়ে শাসিয়েও পারোনি।'

মনুশঙ্কর যতটা পারে গলার স্বর মোলায়েম ক'রে আনলে। 'তা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে পারো, সার্কাসের তুড়ুংবাজি দেখাতে পারো, তখন কীটস্য কীট আমার আর ওমরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাচ্ছো কেন? এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো কি মশা মেরে হাত ময়লা করার মতো ব্যাপার হবে না? আমরা আপসে নিজেদের মধ্যে একটু দাঙ্গা ফ্যাসাদ খেলছি, ঐটুকু তো জল—তা নিয়ে ইয়ারদোস্তদের মধ্যে একটু বচসা হচ্ছে মাত্র—তোমার তো এই সামান্য জল নিয়ে, ঐ ভাঙাচোরা মন্দির-মসজিদ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনোই কারণ নেই—'

হিসস শিস তুলে কান ঘেঁসে বুলেটটা চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আওয়াজটা এলো।

চতুরানন ক্রুদ্ধভাবে আঙুলের আংটিটা ঘসলো, অনেকটা *আলিফ লায়লার* চরিত্রদের কায়দায়। অলুক্ষুণে আওয়াজ ক'রেই যেন বললে, 'উঁহু, পৃথিবীকে যুদ্ধ-টুদ্ধ থামাতেই হবে। হিংসার নিবৃত্তি চাই। যদি পৃথিবী তা না-করে, যদি নিজেরা মারামারি ক'রে নিজেদের ধ্বংস ক'রে ফেলতে চায় পৃথিবীর লোক, তবে তাদের আর অত সময় নিয়ে অত কষ্ট ক'রে ব্যাপারটা করতে হবে না। আমরাই এক ফুঁয়ে পৃথিবীটা উড়িয়ে দেবো। এই অহরহ

যুদ্ধবিগ্রহ কোনো মনোরম টি-ভি ধারাবাহিক নয়। বরং অতীব একঘেয়ে, বিরক্তিকর, পুনরাবৃত্তিতে ভরা। শান্তিপূর্ণভাবে মিলে মিশে সদ্ভাবে কেন সবাই থাকতে পারবে না, তার তো আমি কোনো কারণ দেখছি না।

'তার কিন্তু একটাই কারণ আছে, প্রভু।'

'কী?'

'ওই ওমর শরীফ,' মনুশঙ্কর বললে।

'তোমরা লড়াই না-থামালে আমি তোমাদের দুজনকেই ধ্বংস ক'রে দেবো—তোমাদের চিহ্নমাত্র থাকবে না কোথাও।'

'প্রভুই সত্যি শান্তিপ্রতিষ্ঠার হকদার,' খুব বিগলিত ভঙ্গিতে বিনয় ক'রে বললে মনুশঙ্কর। চতুরাননের মাথাব নীল পালকগুলো শ্লেষটা ধরতে পারলো কি না কে জানে! 'প্রভু একেবারে মূর্তিমন্ত শান্তি। আমি লড়াই থামাতে একপায়ে খাড়া আছি, যদি প্রভু বাৎলে দেন কী ক'বে লড়াইটা থামালে গুলিবারুদে উড়ে-যাওয়া থেকে আমি রেহাই পাবো।'

'ওমর শরীফও লড়াই থামাবে।'

মনুশঙ্কর কোনো কথা না-ব'লে পকেট থেকে একটা রুমাল বার ক'রে আনলে। পাশে প'ড়ে থাকা একটা কাঠি তুলে সে সাবধানে রুমালটাকে তার মাথায় চাপিয়ে কাঠিটা পাথরের ওপরে তুলে ধরলে। অমনি বিদঘুটে একটা রাইফেলের আওয়াজ। মনুশঙ্কর এক-লাফে পাথরটা থেকে পেছিয়ে এসে নুয়ে বসলো। তার হাত থেকে রুমাল সমেত কাঠিটা দূরে ছিটকে পড়েছে।

'ঠিক আছে।' গুলিটা তাগমতো লেগেছে দেখে মনুশঙ্কর বললে। 'আপনি যখন এত ক'রে বলছেন, প্রভু, তখন এই যুদ্ধ আমি থামাবো। তবে এই পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি না—আমার কেটে দু-আধখানা ক'রে ফেললেও না। যুদ্ধ থামাতে আমি সানন্দে রাজি আছি, প্রভু। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি আমায় এমনকিছু করতে হুকুম করছেন, সে-কাজটা আমি যে কী ক'রে করবো, তা কিন্তু কিছুতেই ভেঙে বলছেন না। আপনি হয়তো এরপর বলবেন আমি যেন আপনার ওই উড়নতুবড়ির মতোই সোজা মহাকাশে গিয়ে পাড়ি দিই—'

চতুরানন কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি ক'রে কী যেন গভীরভাবে ভাবলে। তারপর বললে, 'আচ্ছা মনুশঙ্কর খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলো তো তোমাদের এই লড়াইটা শুরু হ'লো কী ক'রে?

'ওমর শরীফ আমাকে কোতল ক'রে আমার বাড়ির সব্বাইকে ওব গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়। বুড়ো-বাচ্চাদের মারবে, একটু যারা জোয়ান তাদের রাতদিন শস্তায় খাটাবে, আর মেয়েদের ইজ্জত লুঠ ক'রে নেবে।'

'কিন্তু তা ও খামকা-খামকা করতে যাবে কেন?'

'কারণ প্রভু ও হচ্ছে মূর্তিমান অমঙ্গল। ইবলিশের ছানা।' মনুশঙ্কর বললে।

'কী ক'রে জানলে যে ও অমঙ্গল?'

'কারণ,' মনুশঙ্কর ন্যায়শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলে, 'ও আমাকে মেরে বুড়োবাচ্চাদের খতম ক'রে জোয়ানদের গোলাম বানিয়ে মেয়েদের ইজ্জত লুঠ ক'রে নিতে চায়।

কথাবার্তায় সাময়িক বিরতি। মনুশঙ্কর তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তার চোয়াল অবশ্য খইনিকে নিয়ে ব্যস্তই রইলো। একটা ডোরাকাটা কাঠবেড়ালি ছুটে গেলো পাশ দিয়ে, আর যেতে-যেতে একটু থেমে মনুশঙ্করের রাইফেলেব চকচকে নলটাকে এক ঝলক শুঁকে দেখলো। মনুশঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে। 'প্রভু, বিশ-পঁচিশ হাত দূরে ভালো-একটা বিলিতি মালের বোতল আছে। না-না, ডাঙ্কেলের ফতোয়া আমরা অমান্য করিনি—নিজেরা বানাইনি। বিলেত থেকে আনা বাজেয়াপ্ত মাল। শুল্ক দফতরের নিলেম থেকে শস্তায় দাঁও বাগিয়েছি—'

সে হয়তো আরো-কিছু বলতো, বিলিতি মালের আরো গুণকীর্তন নিশ্চয়ই, কিন্তু চতুরানন তাকে বাধা দিলে। 'জলেব হক নিয়ে তুমি কী বলছিলে?'

'ওঃ, পানি!' মনুশঙ্কর বললে, 'আমরা, প্রভু প্রকৃতির দানে বিশ্বাস করি। প্রকৃতিঠাকুরুন আমাদের ঐ সোঁতাটা দিয়েছেন—পাহাড় থেকে এখানেই নেমে এসেছে। তা গতবছর থেকে ভারি শুখা আছে—ঠাকুরুন একটু খামখেয়ালি কিনা। না কি ইরাকের যুদ্ধে চ'টে গিয়েই একটু বেগড়বাই করছেন। তা এখন যতটুকু পানি আছে, বর্ষাব ওপর আর ভরসা না-ক'রে, এই পানিটা দিয়েই চাষবাস করতে হবে। তা আমাদের দু'জনের জমি মাত্র অতটুকু পানিতে চাষ করা যাবে না। ওই পানি আমার হুজুর। ওমর চায় আমায় মেরে, বুড়োহাবড়াগুলোকে সাবাড় ক'রে দিয়ে, মেয়েদের ইজ্জত—'

'তোমাদের দেশে কোনো আইন-আদালত নেই?'

'আইন-আদালত? আমাদের?' মনুশঙ্কর খুবই মোলায়েম ক'রে হাসলে।

তার দন্তবিকাশ দেখতে-দেখতে চতুরানন প্রশ্ন করলে, 'ওমবেরও বাড়িঘর পরিবার-পরিজন আছে তো?'

'থাকবে না মানে! খুব আছে! ওরা চার-চারটে বিবি পুষতে পারে, হুজুর। আর ম্যালথাসের মুখে চুনকালি দিয়ে বছর-বছর চারটে ক'রে বাচ্চা পয়দা করে। যমজ-টমজ হ'লে তো সোনায় সোহাগা। আর বিবিগুলো যদি কেনা বাঁদির মতো না-খাটে তো তাদের ধ'রে-ধ'রে পেটায়!'

'তুমি তোমার বউকে পেটাও?'

'যখন বড্ড বাড় বেড়ে যায়, আর মুখের ওপর দু-কথা শোনায়। তবে তেমন পেটাই না, হুজুর। আমার একটা ইলেকট্রিক ওভেন আছে হুজুর, কম্পিউটারে চলে, ভালো ছক ক'রে প্রোগ্রাম করা : শ্বশুরবাড়ি ঠিক সময়ে বলবামাত্র টাকা না-দিলে, কিংবা বউ ভারি তেড়িবেড়ি করলে ঐ ইলেকট্রনিক স্টোভ নিজে-নিজেই প্রভু ওদের পুড়িয়ে মারে। ভারি সেনসিটিভ কি না। তাছাড়া স্টোভগুলো সব মালটিপারপাস। স্টোভ আর শ্মশানের চুল্লি

—দুটোই একসঙ্গে। *টু ইন ওয়ান।* বিজ্ঞানের কী জব্বর অগ্রগতি হয়েছে দেখুন। ঠিক ছকমাফিক প্রোগ্রাম ক'রে স্টোভটা রেখেছি ব'লে আমাকে প্রভু নিজের হাতে কিছুই করতে হয় না—তবে আমার এই বউটা গায়ে-গতরে বড্ড ভারি, নড়তে-চড়তেই আঠারো মাস, আর ভারি অলস। আর আমার বড়ো ব্যাটা বড্ড ঠ্যাটা—মুখে-মুখে তক্ক জোড়ে। এবা আমার কথা না-শুনলে এদের সজুত ক'রে রাখা আমার কর্তব্য। তাদের নিজেদের ভালোর জন্যেই। বিশেষত ও-রকম একটা কম্পিউটার উনুন যখন আমার আছে। আর এই জলের হক সামলানোও আমার কর্তব্য। কিন্তু ওই ইবলিশের ছানা ওমর শরীফ কসম খেয়ে ব'সে আছে, আমায় মেরে—'

'আর ঐ ভাঙা পাথবটাথর নিয়ে কী যেন বলছিলে?'

'এ. হুজুর, একটা ভাঙা মন্দির। আর ভাঙা মন্দির, হুজুর, সাক্ষাৎ মা-লক্ষীর কৃপা। বিনি পয়সায় ইট মেলে লোকের কাছে, বাস্তুকার কোনো ইনাম নেয় না, আর মন্দিরটা ফিরে তৈরি ক'রে নিলেই প্রণামীর ঠ্যালায়, হুজুর, মার্কিন মুলুককেও ভির্মি খাইয়ে দিতে পারবো। পালা-পববে সোনাদানা হিরে-জহরতও মিলবে। কিন্তু ওমর বেজম্মা বলছে ওটা নাকি একটা মসজিদ—আর এখানে নাকি কোন পীর-ফকিরের মাজার ছিলো। এ হুজুর ওর দু-পয়সা কামাবার ধান্দা। লোকে এসে মানত করবে, ধন্না দেবে, সোনাদানা দেবে —এ হুজুর ওর রাতারাতি বাদশা ব'নে যাবার ফন্দি—'

'তা অ্যাদ্দিন এই ভাঙা জায়গা নিয়ে গোল বাধেনি কেন?'

মনুশঙ্কর হেসে ফেললে। 'এ হুজুর আপনি এতবড়ো বেম্মজ্ঞানী হ'য়ে কেমন একটা কথা বললেন! আগে কি আর বড়োলোক হবার এমনতর শর্টকাটটা জানা ছিলো? মুনাফা লোটবার এই মেডইজি? আগে তো লোকে হানাবাড়ি ব'লে এ-ধারটাই মাড়াতো না। তারপর যত বঙবেরঙের আনকোরা সব মাল আসতে লাগলো—মা সরস্বতী ও প্রকৌশলবিদ্যার খুব রমরমা হুজুর আজকাল—তখনই আমি একদিন স্বপ্নাদেশ পেলাম: ওরে মনুশঙ্কর, কামধেনু লটারির টিকিট তুই ফালতুই কাটছিস, ও-সব লটারি কেলেঙ্কারি ফাঁস হ'লে দেখবি কত লোক চারশোবিশ করার জন্য হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যাবে। তুই যদি টাকা কামাতে চাস তবে গিয়ে বল ঐ পোড়োবাড়িটায় একটা মন্দির ছিলো। ব্যাস, আর দেখতে হবে না—জেনে রাখ মুফতে টাকা কামাবার ওটাই মোক্ষম দাওয়াই। দেবোত্তর ব্যাপারে কোনো উনপাঁজুরে বখাটে সরকারই নাক গলাতে আসবে না। এলেই সামনের ভোটের হাঁড়িকাঠে ওদের গর্দান যাবে—' মনুশঙ্কর তামাকপাতায় চুন মাখিয়ে আরেক দফা ডলাইমালাই শুরু করেছিলো।

'হুজুর, ওই বিলিতি কারণবারি—'

চতুরানন অধীর স্বরে ব'লে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে বকর-বকর ক'রে অযথা কেবল সময়ই নষ্ট করছি আমি। আমাকে ভেবে দেখতে দাও—'

'হুজুর, দেবতা কোনখানে নেই বলুন? ঐ বিলিতি কারণবারিও দেবতার দয়ায় পবিত্র গঙ্গাজল হ'য়ে গেছে, হুজুর—'

চতুরানন এমন কটমট ক'রে তাকিয়ে তার বাঁ হাত তুলে আংটিটা ঘসতে যাচ্ছিলো যে তিনবার ঢোঁক গিলে মনুশঙ্কর চুপ মেরে গিয়ে খইনি ডলতে লাগলো।

চতুরানন চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। কাঠাবেড়ালিটা রাইফেলের নলের বদলে কোত্থেকে যেন একটা বাদাম জুটিয়েছে এখন। ল্যাজটার রোঁয়া ফুলিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ঝোপের ওদিকটায় চ'লে গেলো।

মাথার ওপর নির্মেঘ নীল আকাশে সূর্য শাদা চোখ মেলে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে যেন। শুকনো থমকে-যাওয়া হাওয়ায় এখনও বারুদের একটা ক্ষীণ গন্ধ—খানিক আগেকার মুহুর্মুহু গুলি-চালাচালিরই রেশ। নিচে, উপত্যকায়, উড়ন-চাকতির নিখুঁত গোল আকার আর ঝকঝকে অচেনা ধাতুর ঝিলিক কেমন উদ্ভট ঠেকছে। মনুশঙ্করেরই মন্ত্রঃপূত বিলিতি কারণবারির মায়াজাল নয় তো?

'ঠিক আছে। তুমি এখানে সবুর করো।' অবশেষে চতুরাননের অনড় ওষ্ঠাধরে বুলি ফুটলো। 'আমি গিয়ে ওমর শবীফের সঙ্গে কথা ব'লে আসছি। আমি ডাক দিলেই আমার মহাকাশযানের কাছে চ'লে আসবে। আমি আর ওমর তোমার সঙ্গে সেখানেই দেখা করবো। একটু পরেই।'

'জো হুকুম, হুজুর। আপনার যা অভিরুচি,' মুখে খইনির ঢেলা পুরে দিয়ে জড়ানো গলায় বললে মনুশঙ্কর। তার ছটফটে চোখ আশপাশে ওমরের হদিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'আর ঐ রাইফেলে—খবরদার, একবারও হাত দেবে না,' চতুরাননের নির্দেশ এলো, সুদৃঢ়।

'আরে না-না, কী-যে বলেন, হেঁ-হেঁ,' চট ক'রে ঘাড় হেলিয়ে বললে মনুশঙ্কর। ঐ উদ্ভট ঢ্যাঙা লোকটা যতক্ষণ-না দূরে চ'লে গেলো ততক্ষণ সে ঘাড় হেলিয়েই রইলো। তারপর সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে রাইফেলটা হস্তগত করলে। একটু নিশ্চিন্তি। তারপর আরো-একটু খোঁজাখুঁজি করে কাটারিটারও পুনর্দখল পাওয়া গেলো। শুধু তারপরেই সে গিয়ে তার পঁচাত্তর প্রুফ বিলিতি মালের বোতলটার ছিপি খুললো। ভাগ্যিশ, সে আগেই আঁচ করেছিলো যে লড়াইটা অনেকক্ষণ ধ'রে চলবে, তাই চার-চারটে বোতল এনে মজুত করেছিলো। কারণবারি, প্লাস বেপরোয়া সাহস—এই বিলিতি বোতলগুলোও মালটিপারপাস। তারপর পকেট থেকে তার চন্দন ক্রিমের কৌটা বার ক'রে কপালে চন্দন লেপলো, বীরাপ্পনকে কাঁচকলা দেখিয়ে তার এক ইয়ারও চন্দনের ফলাও ব্যাবসা করে, মন্ত্রীদের মিনিমাগনা চন্দন জোগায়। ভক্তি চারপাশে যে-হারে বাড়ছে তাতে চন্দনের ব্যাবসাতেও আজকাল কোন-না দু-পয়সা আসে। আর বীরাপ্পনের দশাসই গোঁফের বহর দেখে অনেকেরই চোখ টাটায়। এই চন্দনের কৌটো সে তার দোস্তের কাছ থেকে মুফতে পেয়েছিলো, সঙ্গে ফাউ পেয়েছিলো সুপরামর্শ: 'শুধু কারণবারিই নয়, সিন্দুর এবং চন্দনও চাই—তাহ'লেই দেখবি ধর্মযুদ্ধে তুই একেবারে অপরাজেয় হ'য়ে উঠেছিস।' আর এই চন্দন লেপার পরই এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা ভিনগ্রহের ফোঁপরদালালটাকে ভুলবার জন্যে ঢকঢক ক'রে বোতলটা উপুড় ক'রে দিলে সে। উঃফ,

গলাটা ভয়ে যেভাবে শুকিয়ে গিয়েছিলো, পারলে সে অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে পৃথিবীর যাবতীয় কারণবারিই শুষে নিতে পারে। শুখা মাটির মতোই শুখা গলা। কিন্তু আচমকা কী খেয়াল হ'তেই সে তার কণ্ঠার ওঠা-নামা-করা ঢকঢক থামিয়ে দিলে। নাঃ, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রাইফেলে আনকোরা একটা গুলির সার পরিয়ে দিয়ে একটা পাথরের গায়ে সে হেলান দিয়ে বসলো। আর মাথা ঠাণ্ডা রেখেই ছোটো-ছোটো ঢোঁকে বোতলটা ফাঁক ক'রে দিতে লাগলো। সময়টাও তো কাটাতে হবে।

এদিকে ঐ আগন্তুক তার ধাতবনীল দেহে লেগে ছিটকে-পড়া দু-পাঁচটা বুলেটকে কোনো পাত্তা না-দিয়ে ওমর শরীফের লুকোনো আস্তানাটার দিকে এগিয়ে চললো। আচমকা গুলির আওয়াজ থেমে যেতেই স্তব্ধতাটা কেমন যেন ভনভন ক'বে উঠলো। স্তব্ধতার আওয়াজও সময়-সময় ভয়ানক হ'য়ে ওঠে। তারপর অনেকটা সময় নিশ্চয়ই কেটে গেছে। মনুশঙ্করের অবশ্য মনে হয়েছে সময়ের চাকা আর ঘুরছে না, ঠায় থেমে আছে। আসলে বেশ-কিছুক্ষণ পরেই ঐ অদ্ভুত ঢ্যাঙামর্তি ওপাশের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মনুশঙ্করের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

'জো হুকুম, মালিক পরওয়ারদিগর,' মনুশঙ্কর কিছু-একটা করতে পেয়েই গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো। সে নাগালের মধ্যেই রাইফেলটাকে হেলান দিয়ে রেখে খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালে, প্রথম গুলি চলার উপক্রম দেখলেই যাতে দণ্ডবৎ শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু না, সে-রকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ওমর শরীফের অভ্যুদয় হয়েছে, এখন ভিনগ্রহের লোকটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে সে। তক্ষুনি মনুশঙ্কর এক হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা তুলে তাকে তাগ ক'রে দুম ক'রে একটা গুলি ছুঁড়লো।

কিছু-একটা সূক্ষ্ম হিসহিস-করা জিনিশ যেন গোটা উপত্যকাটাই পুড়িয়ে দিলে। মনুশঙ্করের হাতে রাইফেলটা যেন জ্বলন্ত একটা অগ্নিপিণ্ড হ'য়ে উঠলো। বিকট যন্ত্রণায় একটা চীৎকার ক'রে সে রাইফেলটা হাত ফসকে প'ড়ে যেতে দিলে, আর পরক্ষণেই তার মনটা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন ফাঁকা হ'য়ে উঠলো। কিছুই তার মাথায় নেই আর। 'ইজ্জত নিয়ে বীরের মতো মরলাম,' তারপর শহিদদের মতোই মনুশঙ্কর আর-কিছু ভাবতে পারলে না।

...যখন সে চোখ খুললে, সে আবিষ্কার করলে সে শুয়ে নেই, বরং সে এখন সটান দাঁড়িয়ে আছে উড়ন চাকতিটার বিপুল ছায়ায়। চতুরানন ভেলকি দেখাবার ভঙ্গিতে তার চোখের সামনে হাত ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। তার আংটিতে ঝিলিক দিয়ে উঠছে রোদ্দুর আর কতরকম চেনা-অচেনা রং ছিটিয়ে দিচ্ছে। মনুশঙ্কর মাথা থেকে সব বেঘোরবিভ্রম ঝেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকালে।

'বেঁচে আছি আমি? না কি এটা পরলোক?' ফ্যাসফ্যাসে গলায় সে জানতে চাইলে।

চতুরানন তার এই কূট প্রশ্নটাকে আদপেই কোনো পাত্তা দিলে না। সে তখন ওমর

শবীফের দিকে ফিরে—ওমর তার পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো—তার পাথরের মতো স্থাণু মুখটার সামনে হাতটা ওই ভেলকি দেখাবার ভঙ্গিতেই নাড়লে। ওমরের কাচের মতো বিস্ফারিত লোচনে তার আংটি থেকে ঝিলিক পড়লো, আর ওমর কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে জড়ানো গলায় বিড়-বিড় ক'রে কী যেন বললে। মনুশঙ্কর তার রাইফেল আর কাটারি কোথায় দেখবার জন্যে চারপাশে চোখ বোলালে। কিন্তু সে-সব যেন মন্ত্রবলে কর্পূরের মতো কোথায় উবে গিয়েছে। জামার ভেতরে হাত চালালে সে, কিন্তু বিজলি চমকাবে কী করে, তার এত সাধের চাকুটাই যে উধাও। এবার ওমর শবীফের চোখে তার চোখ পড়লো।

'আমরা দুজনেই গোল্লায় গেছি, শেখসাহেব,' সে বললে। 'প্রভু চতুরানন আমাদের দুজনকেই জবাই করবেন। আপনি দোজখে যাবেন ভেবে আমার প্রাণে দুঃখ উথলে উঠছে, তবে আমি যে স্বর্গে যাবো তাতে কোনোও সন্দেহ নেই। ফলে আমাদের দু'জনের আব-কখনও দেখা হবে না। অলবিদা।'

'তুমি ভুল করেছো, মনুশঙ্কর।' ওমর শরীফ বললে। খামকাই সে তার নিজের চাকুটাকে হাৎড়ে খুঁজলো জামার তলায়। 'তুমি কখনও বেহেস্তের হুরিপরি দেখতে পাবে না। এই ঢ্যাঙা ইয়াঙ্কিটাও নয়। কারণ সে তার মিথ্যের কারবার ফাঁদতে গিয়ে আমার কাছে নিজেব নাম বলেছে হজরত আলি।'

'শেখসাহেব, আপনি দেখছি খোদ ইবলিশের কাছেও চিরকাল মিছে কথা বলে যাবেন—'

'চুপ করো, দুজনেই!' চতুরানন (কিংবা হজরত আলি) ধমক দিয়ে বললে, 'তোমরা দুজনেই আমার ক্ষমতা একটু-আধটু চেখে দেখেছো এবাব মন দিয়ে আমার কথা শোনো। যাতে গোটা সৌরজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্যে আমার নিজের কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছি। আমরা তোমাদের চাইতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেকটাই এগিয়ে গেছি। আমাদের এমন-সব শক্তি আছে যা তোমাদের হুডিনি বা পি. সি. সরকারও কল্পনা করতে পাববে না। যে-সব সমস্যার উত্তর খুঁজে তোমরা মাথা কুটে মরছো, আমরা তাদের সব সমাধান ক'রে ফেলেছি। এবার আমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে যাতে সকলের ভালো হয়, যাতে সবখানে শান্তি থাকে, তাব ওপর নজর রাখা, তার তত্ত্বাবধান করা। তোমরা যদি বেঁচেবর্তে থাকতে চাও, আদৌ যদি বাঁচার ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে এক্ষুনি তোমাদের সব ঝগড়াঝাঁটি লড়াই-বড়াই থামিয়ে দিতে হবে—চিরকালের জন্যে। এবার থেকে ভাই-ভাই যেমন থাকে, তেমনি থাকতে হবে তোমাদের। কী? আমার কথা কানে গেছে তোমাদের?'

ওমর শরীফ যেন আঁৎকে উঠেছে, এমনভাবে বললে: 'আরে! আমি তো তা-ই চেয়ে এসেছি চিরকাল —শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব। সেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'আর কোনো খুনোখুনি চলবে না,' চতুরানন ওরফে হজরত আলি বললে। 'হয় ভাই-ভাইয়ের মতো গলাগলি ক'রে থাকবে, নয় তো মরবে। বেছে নাও— কী তোমাদের পছন্দ।'

মনুশঙ্কর আর ওমর শরীফ—দুজনে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে. তারপর দুজনেই একসঙ্গে ভিন গ্রহের আগন্তুকটির দিকে ফিরে তাকালে।

নিচুগলায় ফিশফিশ ক'বে যেন নিজেকেই মনুশঙ্কর বললে, 'ভিখিরির আবার পছন্দ। হুজুর যে-রকম দুর্ধর্ষ শান্তির দূত তাতে এ-কথা না-মেনে আর উপায় কী? আমি আগেও এ-কথা বলেছি। আপনি যেমনভাবে এ-কথা বলছেন তাতেই বোঝা যায় শান্তি একেবারে সুনিশ্চিত। এবার লোটা-বদনা উপুড় ক'বে শান্তিবারি সিঞ্চন করলেই হয়। তবে আমাদেব বেঁচে থাকাব পক্ষে এ-ব্যাপারটা অত সহজ নয়। শান্তিসম্প্রীতি নিয়ে থাকো, বলা ভাবি সহজ। তবে হুজুব, আপনিই বলে দিন এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন ক'বে?'

'মারামাবি থামিযে দিলেই,' অস্থিরভাবে ব'লে উঠলো আগন্তুক।

'আপনি তো ব'লেই খালাশ,' ওমর শরীফ বললে, 'কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার কারবাবটা অত সহজ ব্যাপাব নয। হয়তো আপনি যে-চুলো থেকে এসেছেন, সেই চুলোয়—'

'তা তো বটেই। মার্কিন মুলুকে সব্বাই বড়োলোক,' মনুশঙ্কর বললে, 'আর কালাআদমিবা তো আর মানুষই নয়।'

'আমাদের এই জাহান্নামে মরণবাঁচনই সমস্যা। আপনার মুলুকে হয়তো সকলেরই জন্যে দানাপানি আছে, তবে আমাদের এখানে বিবি-বাচ্চাদের দু-বেলা দু-মুঠো খানা জোগানোই মুশকিল। আমাদেব এখানে লড়াই ক'রে বাঁচতে হয়'—

মনুশঙ্কর ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলে। 'একদিন হয়তো আমরা সবাই ভাই-ভাই হ'য়ে উঠবো, হুজুর। তবে এ তো আর ভেলকিবাজি নয়, যে আপনি হ্রীং স্বাহা ফট বললেন আর আমরা সবাই ভাই-ভাই ব'নে গেলাম। দুর্ভাগ্যবশত সমস্যাগুলো এত জটিল যে আপাতত এই জল আর হানাবাড়িটা নিয়ে লড়াই করতে ব্যস্ত থাকলেই আসল সমস্যাগুলো আমরা ভুলে থাকতে পারবো। সকলের জন্যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান সুচিকিৎসা —এগুলো আমরা আপাতত পাবো ব'লে মনে হয় না—তাই এই ওমর-টোমরকে হঠিয়ে দিতে পারলে, সকলে না-হোক অন্তত কিছু লোক তো সেগুলো পাবে—'

'কিন্তু গায়ের জোরে তো কোনো সমস্যারই সমাধান হয় না,' চতুরানন ওরফে হজরত বললে, 'গায়ের জোরই অমঙ্গলের উৎস। এখন তোমাদের দৃঢ়ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে—'

'আর আমরা যদি সন্ধি না-করি—'

*'চিরস্থায়ী সন্ধি,'* ধমক দিয়ে বললে চতুরানন বা হজরত আলি। 'লোকঠকানো সাময়িক সন্ধি নয়।'

'আর আমরা যদি সন্ধি না-করি,' মনুশঙ্কর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওমর শরীফের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলে, 'আপনারা আমাদের ধ্বংস ক'রে ফেলবেন। বেশ, হুজুর, তা-ই হবে। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে আপনার কথার সারবত্তা অগ্রাহ্য করে। আমি আপনার

প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চাই না। ঠিক হ্যায়, আমি মেনে নিলাম। এবার বলুন, আমাদের কী কবতে হবে?'

চতুরানন বা হজরত আলি ওমর শরীফের দিকে ফিরে তাকালে।

'আমিও মেনে নিচ্ছি, প্রভু,' ওমর শরীফ চটপট বললে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে।

'আপনিই নিশ্চয় ঠিক—বিশেষত নতুন জাতের একটা ব্রহ্মাস্ত্র আপনার আছে। বেশ তাহ'লে শান্তিই আসুক। তথাস্তু।'

মনুশঙ্কর বললে, 'আমিন।'

চতুরানন বা হজরত আলিব চোখ তখন জ্বলছে' বললে, 'আমি দেখতে চাই তোমাবা কোলাকুলি করছো।'

মনুশঙ্কর আব ওমব শরীফ দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু থমকে এগিয়েই গেলো পরস্পরের দিকে, এবং কোলাকুলি করলো। মনুশঙ্কর বললে, 'মুবারক, শেখসাহেব।' আর ওমর শরীফ বললে, 'জীবস্তু, মনুশঙ্কব।'

'দেখলে?' চতুরানন বা হজরত আলিব মুখে শুকনো একটা হাসি খেলে গেলো। 'দেখলে. ব্যাপাবটা কত সহজ। এবার তো দুজনে বন্ধু হ'য়ে গেছো। এ-বন্ধুত্ব আর ভেঙো না।' ব'লে সে ধীর পায়ে তার উড়ন-চাকতির দিকে এগিয়ে গেলো। অমনি চাকতির ধাতব দেহে একটা দরজা খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে এক পা বাড়িয়ে সে আবার ফিরলো। 'মনে রেখো, আমি কিন্তু সারক্ষণ নজর রাখবো।'

'তাতে আর সন্দেহ কী?' মনুশঙ্কর আর ওমব শরীফ একসঙ্গে ব'লে উঠলো।

'মনে থাকবে তো শান্তি, অথবা—'

তারপরেই উড়ন-চাকতিব দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো, আর তারপরেই সোজা সেটা উড়ে গেলো শূন্যে, তারপর বিদ্যুৎ চমকেব মতো পশ্চিম আকাশে সেটা অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

মনুশঙ্কর বললে, 'যা ভেবেছিলাম, তা-ই। আমেরিকার মদতে পশ্চিমি ষড়যন্ত্র।'

ওমর শরীফ তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো। 'তা মনুশঙ্কর, এই পানি কিন্তু আমার। আর ওই হানাবাড়িটাও। ওটা তো আগে মসজিদ ছিলো। তোমার জন্যে আমার কষ্টই হয়। পানি ছাড়া তুমি চাষই বা করবে কী ক'রে—'

মনুশঙ্কর তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ওমর শরীফের দিকে বাড়িয়ে দিলে। 'ভুল করছো, শেখসাহেব,' সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বললে, 'ঐ ছোটো সোঁতাটা আমার—তাই জলও আমার। আর ওই ওটা হানাবাড়ি নয় —মন্দির। ওখানে রোজ পুজো হবে—ঢাকঢোল বাজবে—'

'না, নমাজ পড়বে সবাই পাঁচ ওক্ত—'

তারপর হাত নেড়ে দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে চ'লে গেলো।

নিজের পাথরটার আড়ালে এসে উবু হ'য়ে বসলো মনুশঙ্কর। কাঠবেড়ালিটা তার

রাইফেলের পাশ থেকে ছুটে চ'লে গেলো অন্যধারে। ল্যাজটা নিশানের মতো ওঠানো।

মনুশঙ্কর যখন বোতল থেকে একটা ঢোঁক খাচ্ছে, তখন একটা বহুরূপী গিরগিটি পাথরের আড়াল থেকে কাঠবেড়ালটির মতোই বেরিয়ে এলো, তারপর চুপটি ক'রে প'ড়ে রইলো—শরীরের সামনের আর্ধেকটা ওঠানো, অপলক চোখ-মুখ থেকে ঝিলিক দিয়ে বেরুচ্ছে আর ঢুকছে তার জিভ, আর গলার কাছটার রং অনবরত পালটে-পালটে যাচ্ছে।

বোতলটা নামিয়ে রেখে মনুশঙ্কর যখন তার রাইফেলটার দিকে হাত বাড়ালে, তখন একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটলো। গিবগিটিটা যেন পিছলেই চ'লে গেলো শুখা মাটির ওপর দিয়ে ফের ঐ পাথরটার আড়ালে। আর স্তব্ধতা ভেঙে ওপাশ থেকে মনুশঙ্করেব পাথরটা লক্ষ্য ক'রে একটা গুলি ছুটে এলো।

# আলমের নিজের বাড়ি

## দিব্যেন্দু পালিত

ঢাকার আকাশ ছেড়ে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িংটা কলকাতার দিকে স্থির হতেই ভাবনাগুলো ফিরে এলো আবাব।

'সবকিছুব মতো ফেরারও একটা সময় থাকে, সেই সময়টা পার হয়ে গেলে মনে হয় আব আসা হলো না—', শেষ চিঠিতে লিখেছিল রাকা, 'মনে হচ্ছে তোমার বেলাতেও তাই হবে। এব মানে এই নয় যে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বা মন ভালো নেই। এর মানে শুধু এই যে প্রত্যেক চিঠিতে আসছি ব'লে কামান দাগাব কোনো মানে হয় না।' এইসব এবং আরো কিছু কথা, এতোদিন পরে হুবহু সবকিছু মনে থাকার কথা নয়। আলমের মনে হয়েছিল বেশ কয়েক বছব কলকাতায় থাকতে থাকতে কলকাতার ভাষাটা দিব্যি রপ্ত ক'রে ফেলেছে রাকা। যেখানে যেমন দরকার, জানে শ্লেষ ও সম্পর্ক কী ক'রে আড়াল ক'রে রাখতে হয়। শুধু বুঝতে পারেনি 'যে-মাটি যে-শিকড়েব জন্যে তৈরি' কথাগুলোর মানে। দ্বিধা যাতে সংশয় বা সন্দেহে পরিণত না হয় সেইজন্যে বারবার পড়েছিল লাইনদুটো। ধারণায় পৌঁছুতে পারেনি।

রাকা মেয়ে। পরে ভেবেছিল, কোথাও না কোথাও একটু আড়াল রাখবেই। স্বাধীনতা যতো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, সংস্কারও কি মুছে ফেলা যায় ততো তাড়াতাড়ি? এর মধ্যে বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে। আলম নিজে বুঝতে না পারলে রাকারও বোঝানোর দায়িত্ব নেই।

জবাবে লিখেছিল, 'তাপ বাড়লে হেঁয়ালিটাও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এটাই যদি কারণ হয় তাহ'লে আলাদা। তা না হলে তোমার চিঠির অনেক কথাই বুঝতে পারিনি। যে-মাটি যে-শিকড়ের কথাগুলোর মানে কি? আমি যা ভাবছি তাই হ'লে ভুলে যেও না আমার জন্ম কলকাতায়—পার্ক সার্কাসের যে-বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছুবে এ চিঠি, সেই বাড়িতেই। তা'হলে কি আমার শিকড় কলকাতায় নয়? তুমি কি জানো, রাকা নামের যতো মেয়ে কলকাতায় আছে তার চেয়ে বেশি আছে ঢাকায় এবং তাদের কেউই এখানে বেমানান নয়?' তবে রাকা যতোদিন না ঢাকায় আসছে ততোদিন আলমকেই ছুটতে হবে কলকাতায়, তার নিজের বাড়িতে—

এইসব এবং এই ধরনের আরো কিছু কথা, যা শুধু চিঠিতেই সম্ভব। তবু ভাষাও তো পারে শব্দের অর্থ জুড়ে জুড়ে রক্ত-মাংসের একটা আদল তৈরি করতে—আদলটাকে সম্পূর্ণতা দিতে। আবেগ এমনই ব্যাপার যে পারলে নিজের চিঠি নিজেই বাহক হয়ে রাকার হাতে পৌঁছে দিত আলম।

জবাব আসেনি। মাসখানেক অপেক্ষা করে আবার একটা চিঠি দিয়েছিল আলম।

মাত্র কয়েক লাইন। তাতে জবাব না পাওয়ার কথা ছিল, আর ছিল কলকাতায় মৈত্রী সংসদের সেমিনারে আমন্ত্রণ পাবার কথা। পুরুষদেরও অভিমান ব'লে যদি কিছু থাকে, রাকা টের পাবে।

এবার জবাব এলো অন্য হাতের লেখায়। খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ খুলতেই দেখল যা সন্দেহ করেছিল তাই—রাকা নয়, স্নেহমাসীমা। প্রথম তথ্য, রাকা কলকাতায় নেই। থাকলেও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, রিসার্চের কাজকর্মও এগোয়নি বিশেষ। চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না সব সময়। তাহ'লেও আলম যেন মাঝে মাঝে তাদের খোঁজখবর দিয়ে চিঠি দেয়। শেষে, সেমিনারেব ব্যাপারে মেসোমশাই খুব খুশি হয়েছেন, ইত্যাদি।

রাকা যে কলকাতায় নেই কিংবা এই চিঠিটার কথা জানে না, স্নেহর চিঠি পড়েই তা অনুমান করতে পেরেছিল আলম। সন্দেহ চাপা দিয়েছিল যুক্তি দিয়ে। মে-জুন ছুটির সময়, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। লতায়-পাতায় জড়ানো ওদের আত্মীয়ের সংখ্যাও কম নয়। সেই ছেচল্লিশ সাল থেকে শাখা-প্রশাখা ছড়াতে ছড়াতে পৌঁছে গেছে নানা দিকে—দিল্লী, পুনা, পাটনা, আহমেদাবাদে। বেড়াতে ভালোবাসে। হঠাৎ খেয়ালে এর কোনো একটা জায়গায় চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। ধাঁধা ওই সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না কথাগুলো নিয়ে। অসুবিধে হলো, রাকা কিংবা স্নেহমাসীমা কারুর কাছেই কথাগুলোর ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠানো যায় না।

পোড়া সিগারেটের গন্ধ নাকের কাছে আনাগোনা করতেই নিশ্বাসের ভার টের পেল আলম। ছেড়ে, আবার টেনে নিয়ে, সহজ হবার চেষ্টা করল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দূরত্ব পেরোতে হাজার হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে হয় না। এখান থেকে নিচে তাকালে অস্পষ্ট হ'লেও গাছপালা-নদী-মাঠময় বাস্তবের পটভূমি চোখে পড়ে—কিছু কংক্রীটের কাঠামোও। এতোক্ষণ সরলরেখায় ওড়ার পর হঠাৎই দুলতে শুরু করেছে প্লেনটা। আকাশের নীল ক্রমশ আড়াল হয়ে যাচ্ছে মেঘে। ভিতরের তাপেও সামান্য পরিবর্তন অনুভব করল আলম। আগস্টের শেষ। এই সময় বৃষ্টি-বাদলা লেগেই থাকে। হয়তো ঝড়ও আছে বাইরে। এই সময়ই টুং ক'রে বেল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্ব'লে উঠল বেল্ট বাঁধার সঙ্কেত, তারপরেই হোস্টেসের সাবধান-করা গলা। পাশের সীটে ব'সে সিগারেট জ্বালিয়ে এতোক্ষণ সেমিনার পেপারে চোখ বোলাতে ব্যস্ত ছিল ফিরোজ। এখন অ্যাটাচি বন্ধ করতে করতে বলল, 'পৌঁছে গেলাম নাকি?'

'এখনো মিনিট পনেরো।' ঘড়ি দেখে বলল আলম, 'এতো লো ফ্লাইটে বাম্প করবেই।'

বলতে না বলতে প্লেনটা ঢুকে পড়ল ঘনবদ্ধ সাদা মেঘের ভিতর। তবে যতোটা বাম্প করবে মনে হয়েছিল তা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দেখা গেল আকাশ, ধোঁয়াটে ভাব কাটিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ।

'এই যে আকাশ, এটা ইণ্ডিয়ার।' আবার বেল বাজিয়ে সঙ্কেত নিবে যাবার পর

ফিরোজ বলল, 'এর ওপর আমাদের যাকে বলে নাগরিক অধিকার—নেই।'

পাশে তাকিয়ে ফিরোজকে দেখে নিল আলম। তখুনি দেবার মতো কোনো জবাব মুখে এলো না।

আপাতত ঠাট্টা করে বললেও ফিরোজ যে খুব সিরিয়াস, সেটা বোঝাই যায়। সেমিনারে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পৌঁছুবার পর থেকেই বিষয়ের ভিতর প্রতিপক্ষ খুঁজে চলেছে ক্রমাগত। যেন তা না করলে যুক্তিগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো যায় না। কাল অনেক রাত পর্যন্ত এই নিয়ে তর্ক করেছিল। দু'দেশেব মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্যে বিশ্বাস করে ফিরোজ;বলেছিল, মৈত্রী ভালো, তবে ওটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার বিপদ আছে। খালি গায়ে না-থাকার জন্যেই জামা পবা—তাব মানে কিন্তু এই নয় যে জামার কাট থেকে রঙ পর্যন্ত সবই হবে এক। তাহ'লে স্বাতন্ত্র্য কোথায়! অসুবিধে হলো, ফিরোজ যেভাবে ভাবে, আলম নিজে সেভাবে ভাবতে পারছে না। কাট আর রঙের স্বাতন্ত্র্যই কি স্বাতন্ত্র্য? এমনও হতে পারে, আরো গভীর কিছু বলার চেষ্টায় আছে ফিরোজ, যেটা ওর নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট নয়। এখনো সে আমার-তোমার দিকে এগোচ্ছে শুনে বলল, 'কথাটার কি কোনো মানে আছে? ধৈর্য ও সময় থাকলে দূরত্বটা আমরা হেঁটেই পার হতে পারতাম। তাহ'লে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত। দূরত্ব যেখানে নেই সেখানে মৈত্রী নিয়ে আলাদা ক'রে সেমিনার করার দরকার হতো না।'

আলম জানে না সে নিজে কতখানি স্পষ্ট। তবে কথাগুলো বলতে পেরে খুশিই হলো।

ভুরু কোঁচকালো ফিরোজ। মুঠোয় ধরা বাদামী লাইটারটা জ্বালল চাপ দিয়ে। সিগারেট ধরাবার জন্যে নয়।

'কী বলতে চাও?'

'সুযোগটা নিলাম কলকাতায় আসতে চাই ব'লে।' আলম বলল, 'না হ'লে এই সেমিনার-টেমিনারের ব্যাপারগুলো আগাগোড়াই আমার ধোঁকা ব'লে মনে হয়। এক ভাষা, এক পোশাক, একই রকম খাওয়া-দাওয়া আর আবহাওয়া। তফাতটা রাজনৈতিক । এর মধ্যে অন্য কথা আসছে কোত্থেকে!'

'দু' দিনের সেমিনার পাঁচ মিনিটে শেষ ক'রে দিও না। এক দিস্তে কাগজের পেপার তৈরি করেছি ছ'রাত্তির জেগে—।' ফিরোজ এইভাবেই জবাবটা তৈরি করল, মূল প্রসঙ্গে পৌঁছুবার আগে সময় নিল যেন। তারপর ঝোঁক দিয়ে বলল, 'তফাতটা রাজনীতিরও নয়। ধর্মের। এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারবে কি?'

প্লেনটা সম্ভবত নামতে শুরু করেছে। এই সময়ের স্তব্ধতা বেশি; কিছু বললে আশপাশের যাত্রীদেরও কানে যেতে পারে। ওটা চাপানো ব্যাপার—অন্য সময় হ'লে বলতে পারত, জিগির হিসেবে সবচেয়ে অন্ধ ব'লেই সবচেয়ে বিশ্বাস্য। আমরা ধনী-দরিদ্র, শাসক-শোষিতের সম্পর্কটা যতো না বুঝি তার চেয়ে বেশি বুঝি ধর্মের সম্পর্ক। এতে দায়িত্ব থাকে না, বাস্তব থেকে পালানোও সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু, ভাবল, এসব ব'লে

লাভ আছে কিছু? সব প্রশ্নের জবাব থাকে না, দিতেও ইচ্ছে করে না। এমনকি হতে পারে যে, ঠিক যে-কথাগুলো যে-ভাবনাগুলো এই মুহূর্তে তার মনে এলো, ঠিক একইভাবে একই কথা, একই ভাবনা রাকারও মনে এসেছিল—তাই নিজে না লিখে জবাব পাঠালো স্নেহর মাধ্যমে? নাকি ভাষা মানেই অক্ষর, আবেগ মানেই নারায়ণ শিলা ছোঁয়া নয়!

নিজের প্রশ্নে বিভ্রান্ত আলম নিজেই জড়িয়ে পড়ল দ্বিধায়। রাকার মনের অনেকটাই সে জানে; সবটা জানে না।

ফিরোজ অবশ্য এসব মানবে না। তার ধাঁচ আলাদা। আপাতত ল্যাণ্ডিংয়ের পজিশনে টান টান হয়ে ব'সে চ'লে গেল অন্য কথায়।

'আলম, সত্যিই কি তুমি আমাব সঙ্গে থাকছ না?'

'বলেছি তো খারাপ দেখায়।'

'একসঙ্গে থাকলেও গিয়ে দেখা ক'রে আসতে পারতে।' ইতস্তত ক'রে বলল ফিরোজ, 'যাঁদের কথা বলছ তাঁরা তো তোমাব আত্মীয়ও নন?'

তুমি আমি কি আত্মীয়? তবু কোনোদিন যদি ঢাকা ছাড়ি, আবার ঢাকায় ফিরলে তোমার বাড়িতেই উঠব—'

প্লেনের চাকা টারম্যাক ছোঁয়ার চাঞ্চল্যে দু'জনেই খেই হারিয়ে ফেলল কিছুক্ষণের জন্যে। দাঁড়িয়ে-ওঠা যাত্রীদের ভিড় থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথাটার জের টানল আলম।

'তুমি যে একেবারেই একা থাকছ তা নয়। আজকের রাতটা পেরোলে কাল সকালেই এসে পড়বেন রহমান সাহেব। এদিকে মিশনের খানচৌধুরী তো আছেনই—'

ফিরোজ চুপ ক'রে থাকল।

খানিক আগেই সম্ভবত বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো চারদিকে ভিজে ভাব ছড়ানো। ছলছলে হাওয়া। হালকা রোদ্দুরে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে আর্দ্রতা। সমস্তই গায়ে মেখে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। কাস্টমস্ এনক্লোজারের দিকে এগোতে এগোতে অস্পষ্ট স্মৃতি ছুঁয়ে গেল আলমকে। এখন যেদিকে হাঁটছে, তিন বছর আগে ঠিক তার উল্টোদিকে এয়ারক্রাফটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভিজিটরস্ গ্যালারিব দিকে তাকিয়ে রাকাকে খুঁজেছিল সে। রাকা তো ছিলই, এসেছিলেন স্নেহ আর অনন্তও। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েনি। পাশাপাশি একসঙ্গে জড়ো হয়ে আছে বহু লোক—যারা বিদায় জানাতে আসে তাদের প্রত্যেকেরই মুখে একই আদল। ওরই মধ্যে থেকে উঠে আসা একটি সাদা হাতের আন্দোলন চিনিয়ে দিয়েছিল রাকাকে। দৃশ্যটা সহ্য হয়নি। প্লেন ছেড়ে দেবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওই বিদায়ের দৃশ্য ছাড়া স্মৃতি জুড়ে আর কিছুই ছিল না। আজ মনে হচ্ছে কতোক্ষণেরই বা দূরত্ব—পঁয়তাল্লিশ মিনিট, বড়ো জোর এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টার দূরত্ব পেরোতেই টানা তিনটে বছর কেটে গেল তার।

পুরনো ছবির টানে এখনো চোখ চ'লে গেল গ্যালারির দিকে। অবশ্যই রাকার খোঁজে

নয়। বরং সন্দেহে। আসছেই এই খবরটার সঙ্গে দিন, ক্ষণ, ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে দিন সাতেক আগে একই সঙ্গে ডাকে দিয়েছিল দুটো চিঠি—প্রায় একই বয়ানে। একটা রাকাকে, অন্যটা স্নেহমাসীমাকে। কোনো কারণে একটা হারিয়ে গেলে অন্যটা ঠিকই পৌঁছুবে এই ভাবনায় যতোটা না তার চেয়ে বেশি নিজের যুক্তিতে পরিষ্কার থাকার জন্যে। শুধুই কলকাতা তো কারও ঠিকানা হতে পারে না। শুধু এইটুকু পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া, এয়ারপোর্ট থেকে সে পার্কসার্কাসের দিকেই যাবে। এর বেশি আর কী লেখা যায়! এই মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে রাকার কি মনে পড়বে না, আজ সকালে আলমের ঠিকানা ঢাকা নয়, কলকাতা!

এই ভাবনাতেই রঙীন হয়ে উঠল আলম। রাকা নেই জেনে দৃষ্টি চ'লে গেল ব্যস্ততা ও ভিড়ের ওপারে।

খানচৌধুরী নিজেই এসেছিলেন এয়ারপোর্টে, সঙ্গে মৈত্রী সংসদের দু'জন। এর মধ্যে সুদেব বসুকে চিনতে পারল আলম। এই রকমই একটি সম্মেলন উপলক্ষ্যে গতবার গিয়েছিলেন ঢাকায়। জিয়াউর নিহত হওয়ার কারণে সম্মেলন বাতিল হয়ে যায় সেবার। গাড়িতে শহরের দিকে যেতে যেতে সেই গল্পই করছিলেন ফাঁপিয়ে। ফিরোজ শ্রোতা নয়, আলমও নয়। পুবনো গল্প। খানচৌধুরীও জানেন। চতুর্থ ব্যক্তি শুনতে পারে। এরই মধ্যে প্রসঙ্গ পাল্টে পাকিস্তান হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ওদিক থেকে কতোজন এদিকে এসেছেন তার হিশেব দেওয়া শুরু হলো। হিশেব ভুল ধরতে শুরু করেছে ফিরোজ—এবপর হয়তো গোটা সেমিনারটাই উঠে আসবে এই গাড়ির মধ্যে!

বিরক্ত হয়ে আলম বলল, 'ফিরোজ, দেখি একটা সিগারেট—'

'হঠাৎ!'

'প্রায় তিন বছর পরে কলকাতায় এলাম। একটু চাগিয়ে দেখি।'

সুদেব থেমে গেলেন। আলমকে লক্ষ ক'রে বললেন, 'কলকাতা তো আপনার চেনা জায়গা?'

ফিরোজের বাড়ানো লাইটারের আগুন থেকে অপটু হাতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আলম বলল, 'আমার জন্মভূমি।'

এরপব তলিয়ে যাওয়া যায় নিজের মধ্যে! জন্মভূমিই মাতৃভূমি কিনা এই প্রশ্নে প্রায়ই উদ্বাস্তু লাগে নিজেকে। এখনো লাগল।

পরের প্রসঙ্গটা এলো একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে। শেখ মুজিবের নামে তখন কলকাতা, পাগল। মনুমেন্ট ময়দানের একটা মীটিংয়ের কথা তুললেন সুদেব বাবু। সুচিত্রা মিত্র গান গেয়েছিলেন সেখানে। আলমের মনে পড়ে গেল। বলল না তখন সে কলকাতায়, ওই মীটিংয়েরই পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছিল সদ্যঘোষিত একটি দেশের নাম—যে-দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণাই তখন তার ছিল না। সেই দেশেরই তকমা আজ তার বুকে।

আরো কিছুদূরে এগিয়ে পাল্টে গেল আকাশ। জোলো হাওয়ার সঙ্গে নেমে এলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। জানলার ধারে বসার সুবিধে এই, অনায়াসে মুখ ভাসিয়ে রাখা চলে

প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়ায়। নজরুল ইসলাম এভিনিউ থেকে সি-আই-টি রোড, বাঁ দিকে চ'লে গেল সল্টলেকের রাস্তা। এর পরেই এসে পড়বে মানিকতলা, নারকেলডাঙ্গা। ক্লাসে রোল কল করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াচ্ছে এক একজন—প্রতিটি মুখই চেনা। সিরসিরে অনুভূতি ছড়িয়ে যায় গোটা শরীরে। চেনা ব'লেই এদের একান্ত ক'রে পাবার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে আলাদা-ট্যাক্সি ধরতে চেয়েছিল আলম। হলো না খানচৌধুরীর পীড়াপীড়িতে। ফিরোজকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার তাকে এগিয়ে দেবে পার্কসার্কাসের ঠিকানায়। আজ শনিবার, এখন এগারোটা—পৌঁছুতে পৌঁছুতে বারোটা। চিঠি পৌঁছে থাকলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা ক'রে থাকবে রাকা। গেটের কাছে কাঠচাঁপার গাছটা এই বৃষ্টিতে কিছু-না-কিছু গন্ধ ছড়াবে। অবাক হবে চিঠি না পৌঁছুলে। তিন বছর পরের রাকা নিশ্চয়ই তিন বছর আগের মতো নেই। আলমও অবাক হতে পারে। গঙ্গার ইলিশ ভালো না পদ্মার, তর্ক চলতে পারে এই নিয়ে। পদ্মাপারে গিয়েও যে গঙ্গার ভক্ত থেকে গেছে আলম, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতে পারেন অনন্ত মেসোমশাই। স্বাদটাও সংস্কারের মতো, বলেছিলেন একদা, একবার পেলে বিছুটির জ্বালাও সয়ে নেয়। আজ কিংবা কাল—এখানে থাকতে থাকতে—রাকাকে জড়িয়ে আলম যদি এই ধরনের কোনো কথা তোলে, খুব কি অবাক হবেন অনন্ত? বা স্নেহ?

আলম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পাঁচজনের মধ্যে এমন চুপচাপ থাকাটা অভদ্রতা। তবু, স্মৃতিই টেনে রাখে।

১৯১০। হুট ক'রে একদিন ডাক্তারি পেশা থেকে রিটায়ার করলেন বাবা। চেম্বার বন্ধ হলো—নিতান্তই না-গেলে নয় এমন ছাড়া কলে বেরুনো বন্ধ করলেন। তখনো শক্তপোক্ত, প্র্যাকটিশও ছিল ভালো। অভিমানই কাজ করেছিল মনে হয়। ধাক্কাটা এসেছিল ক্রমশ, বছরের পর বছর ধ'রে। আলম এসব জেনেছে অনেকদিন পরে।

তার আগের বছর দাদা গেল গ্লাসগোয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। 'পারলে থেকে যেও ওখানেই—', বাবা বললেন, 'খাতায় কলমে কোনো অসুবিধা নেই, এখানেও চাকরি পাবে। তবে, মনের দিক থেকে বেকার হয়ে যেতে পারো।' এই ধরনের কথা—যতো না সোজা তার চেয়ে বেশি রহস্যময়। ফাঁকা চেম্বারে কম্পাউণ্ডার সাহেবকে সামনে বসিয়ে বোঝাতেন অনেক তত্ত্ব। পার্টিশন হয়েছে দু'ভাবে। এক রাজনৈতিক, আর এক মানসিক। দ্বিতীয়টায় মাউন্টব্যাটেন সই মারেনি। আগে একই স্টেথ্‌সকোপ লাগাতাম রাম আর জামালের বুকে। সেদিন আর নেই। আমার পেশেন্টদের মধ্যে এখন রাম নেই, রহিম আছে; যদু নেই, জামাল আছে; কানাই নেই, করিম আছে। রাম, যদু কানাইরা সব চ'লে গেল ডাক্তার গুপ্তর কাছে। একই কলেজের এম. বি. দুজনে, একই মানুষের অ্যানাটমি শিখেছি। কাটা-ছেঁড়া সেই মানুষের গায়ে নামের লেবেল ছিল না।

মনে পড়ে, বড়ো কাঁসার থালায় এক পাহাড় ভাত নিয়ে খেতে ব'সে মা'র সঙ্গে গল্প করছেন বাবা। সেইখানেই ভাঙলেন খবরটা। বালিগঞ্জের চেম্বার নিয়েছেন ডাক্তার গুপ্ত। এদিকে পেশেন্ট কম, ওঁর চিকিৎসায় আর জামাল, করিমের আরোগ্য হয় না।

ওবা আসে আমার কাছে। ওদেব সংখ্যাও কমছে অবশ্য! যে যেমন পারছে চ'লে যাচ্ছে পাকিস্তানে। কেউ পূবে, কেউ পশ্চিমে। আমরাও গেলে পারতাম। মনের মধ্যে একটা রোগ টের পাচ্ছি—

এতোদিন পবে ঠিকঠাক মনে পড়ে না কথাগুলো। শুধু মনে পড়ে নির্জনতায় ঘেরা বাবাব নিঃসঙ্গ মুখ; ক্রমশ চুপচাপ হ্যে যাওয়া মাকে। চনমনে, ব্রণ-ওঠাব বযসে বোন দুটোব বিষাদ। নৈঃশব্দেও ঘেবা নিষ্প্রভ বালবেব আলো। তাব পরেই যুদ্ধ। বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন ডাক্তার গুপ্ত। ঢাকা ছেড়ে সপবিবারে চ'লে এসেছেন অনন্তশেখর। আর ফিরে যাওয়াব ইচ্ছে নেই। ওদিকে ধানমণ্ডিতে পড়ে আছে বাড়ি, জমি-জমা। 'আপনিও তো যাবাব কথা ভাবছিলেন ডাক্তার সাহেব? ভাবলাম পবামর্শটা দিই। যদি একান্তই যাওযা সাব্যস্ত কবেন, পালটা-পালটি ক'রে নিলে কেমন হ্য?'

শুনে গম্ভীর হ্যে গিযেছিল বাবাব মুখ। পরে বলেছিলেন, 'কপালে যদি থাকে, তাই হবে। ভেবে দেখি। নিযে আসুন একদিন অনন্তবাবুকে—'

ফিবোজ নেমে গেল হোটেলে। সঙ্গে খানচৌধুরী ও সুদেববাবুরা। প্রোগাম নিযে আলোচনা হবে বলেছিল, হযতো আরো কেউ-কেউ আসবে। রাত্রে ডিনার। খানচৌধুরীর অনুরোধে মাথা নাড়লেও আলম জানে না শেষ পর্যন্ত পেবে উঠবে কি না। গাড়িটা হোটেল ছেড়ে এগোতে অস্বস্তিকব একাকিত্বে ছেযে গেল মাথা। তাহ'লে এতোক্ষণ সে একা হবাব চেষ্টা করেছিল কেন? একতরফা স্মৃতিতে সাঁতার কাটার জন্যে? নাকি সুখের অনুভব, যে-সুখের সবটাই গন্তব্যের স্মৃতিতে! গন্তব্য ধরা দিতেই তেড়ে আসছে সংশয়?

আলম জানে না। এই মুহূর্তেও তাব ও গন্তব্যের মাঝখানে দাঁড়ানো দ্বিধাটাকেই চিনতে পারছে শুধু।

তিন বছরে অনেকটা বদলে গেছে কলকাতা। রাকা কতোটা বদলেছে অনুমান করতে গিয়ে নিজের বদলটা পরিমাপ করতে পারেনি। যে-কোনো আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মুখই প্রতিফলিত হয়—ভালো বা মন্দগুলো এতোই চাক্ষুষ যে চিরে দেখার দরকার পড়ে না। গতকালের বদল আজ ধরা যাবে না। পরের দিন মিশে যাচ্ছে আগের দিনেব সঙ্গে; মনও বাড়ছে জড়াজড়ি ক'রে। চেহারা ও মন, একসঙ্গে দুটোরই বদল সে'ই ধরতে পারবে সময় যার অতীত ও বর্তমানকে আলাদা ক'রে রেখেছে। সময়ের ব্যবধান থেকেই আলম ধরতে পারল, এই অঞ্চলের রাস্তায় এতো খোদল কখনো ছিল না, কিংবা দেয়ালে এতো লেখাও। আবছা হয়ে এসেছে 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'। এক নজরে মনে হয় মসৃণতা থেকে খাবলানো অংশগুলো অক্ষর হয়ে ফুটে উঠেছে দেয়ালে। মানুষও রাস্তা-পারাপারের চাপে বদলে যায় ক্রমশ, চট ক'রে ধরা যায় না।

ভিতরে ভিতরে বাবা যে সত্যিই এতোটা বদলে গিয়েছিলেন সেটা বোঝা গেল ডাক্তার গুপ্ত যেদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন অনন্তশেখরকে। ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু

বিনিময় চলে তার বেশি এগোলেন না। বললেন, 'পালটা-পালটির কথা শুনেছি। ঢাকার বাড়ি, জমিজমার নক্সা, ফিরিস্তি কিছু এনেছেন কি?'

'আজ্ঞে না তো!' বললেন অনন্তশেখর, 'দলিলটা আছে। মোটামুটি হিশাব দিতে পারি।'

'মোটামুটি হিশাবে কাজ হয় না।' সোজাসুজি অনন্তশেখরের দিকে তাকালেন বাবা, 'শুনুন মশাই, আমি মনস্থিব ক'বে ফেলেছি। আজ আমারটা দেখুন। পছন্দ হ'লে বলবেন। তারপর চলুন ঢাকায়—আপনাবটাও দেখব। খাটিয়ে রক্তের দাম কম নয়। চারটি বছর লেগেছিল এই বাড়ি শেষ করতে। এই তল্লাটের প্রথম দোতলা। শেষ না ক'রে ঢুকিনি। ছাদ তো নয়, উঠোন। মহাত্মাজী মারা যাবার পর শোকসভা হয়েছিল ছাদে। সভা ভাঙার পর বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল কেমন। শীতের রাতে নতুন ঢালাই করা ছাদে দাঁড়িযে মনে হয়েছিল আকাশটা কতো বড়ো—'

ড্রাইভারকে বলেছিল আস্তে চালাতে যাতে ঠিক জায়গায় বলতে পাবে এবার বাঁয়ে, এবার ডাইনে। সহজ হতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি। যেখানে একতলা থাকাব কথা, সেখানে দাঁড়িযে আছে দোতলা; মোটর গ্যারাজের রূঢ়তায় চাপা পড়ে যাচ্ছে ফুলের বাগান, নতুন সাইনবোর্ড ব'লে দিচ্ছে পুরনো ফেলাই যায়। তবে নিজের বাড়িটা চিনতে বাধা হচ্ছে না কোনো। হবেও না। 'একই বাড়িতে দু'বার জন্মায় না কেউ—,' একবার বলেছিল রাকাকে, 'একমাত্র আমি ছাড়া।' সে অন্তত এইভাবেই ভেবেছিল।

পালটা-পালটি যা হবার হয়ে গেল মাস দুযেকের মধ্যে। আলম গেল না। এম. এ. পড়ছে তখন। বেঁকে বসার আগে যুক্তি দিয়ে বুঝিযেছিল নিজেকে, বাবার সমস্যা তার নয়। মা'র সমস্যা বাবা। বোন দু'টিকে গোনা হলো জিনিসপত্রের সঙ্গে। আলম যাবে কেন!

'পড়বে যে, থাকবে কোথায়?' বাবা বললেন, 'হস্টেল খুঁজে নিও।'

নিজেদের বাড়িতে ব'সে অনন্তশেখরের সামনে এই আলোচনায় নিজেই ঝাঁকুনি খেলো আলম।

'আলম এখানেই থাকবে।' অনন্তশেখর বললেন, 'আপনাদেব সঙ্গে গেলে কথা ছিল। কিন্তু কলকাতায় থেকে অন্যত্র থাকবে, এটা হয় না। তা ছাড়া—,' বাবাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ঝরঝরে হয়ে উঠল অনন্তশেখরেব গলা, 'দায় আমার ছিল, ডাক্তারসাহেব, আপনার নয়। মাথা গোঁজার এই আশ্রয় ক'রে দিলেন আমাকে, আপনার ছেলেকে একটু আশ্রয় দিতে পারব না! আমারও ছেলে রয়েছে। দু'জনে মিলেমিশে থাকতে পারবে—'

'আশ্বস্ত হলাম।' বাবা বললেন, 'কী জানেন, অনন্তবাবু, ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। মিলেমিশে কি আমরাও ছিলাম না! আপনি তো কোনো আঘাতের কথা বলেননি! অস্বস্তিটা এলো কেন? পালটা-পালটি হলো তাই রক্ষে। তবে আমার ছেলেকে রাখার সিদ্ধান্ত আপনিই নিলেন। আবেগটা বুঝি। পরে যেন আফসোস না হয়।'

সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া। কাকভোরে স্টেশনে যাবার আগে ছাদে উঠে নামাজ পড়লেন বাবা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় পিছনে তাকাননি। বাবাকে অনুসরণ করতে করতে ওই বয়সেই আলম ভেবেছিল, মানুষের ধারাবাহিকতা থাকে রক্তে, ঠিকানায় নয়।

ছাদেই চিলেকোঠা। বাড়িবদল হয়ে যাবার পরেও নিজের ঘরটি বদলায়নি আলমের। একদিন সন্ধ্যায় হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এলো রাকা। তার আগেই অবশ্য গোলমাল কানে পৌঁছেছে আলমের। রাকা বলল, 'বাইরে খুব গণ্ডগোল, ঘরবাড়ি পুড়ছে। দাদা ফোন ক'রে বলল তুমি যেন বাড়ি থেকে না বেরোও—'

মুখের কথাগুলোর চেয়ে রাকার মুখ তখন অনেক দামী। বিস্ময় আড়াল না ক'রে আলম বলেছিল, 'তুমি আজ শাড়ি পরেছ!'

রাকা নিজেকে দেখল। আগের কথা ভুলে বলল, 'খারাপ লাগছে?'

আকর্ষণে ভালো কিংবা খারাপ থাকে না—যা অপ্রত্যক্ষ তা-ই শুধু হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ। রাকাকে তা বোঝানো যাবে না। দৃষ্টিতে যা বুঝিয়েছিল তার বেশি আর এগোয়নি আলম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খোলা ছাদে রাকার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছিল কিছু দূরে আকাশে ক্রমশ দগদগে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের আভা। গোলমেলে চিৎকারে মিশে যাচ্ছে আক্রমণ ও আর্তনাদ, কোনটা কার তফাত করা যায় না। শব্দই ক্রমশ পরিণত হয়েছিল নৈঃশব্দে। অনেকক্ষণ পরে রাকা বলেছিল, 'এখানেও এই!'

আলম কিছু বলেনি। তবে হঠাৎই মনে হয়েছিল তার, জোড়-পুতুলের ধরনে এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা, এর দাম কতোটুকু। আর কিছু নয়। এরপর ব্যস্ত স্নেহমাসীমা যখন ডেকে নিয়ে গেলেন, তখনো তার অন্য কিছু মনে হয়নি।

'এই, এই, রোকো—'

আচমকা নির্দেশে গাড়ি থেমে যাবার পর চেপে রাখা নিশ্বাসটাকে ছড়িয়ে দিল আলম। দরজা খুলে, স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে এলো বাইরে। ড্রাইভারকে ছেড়ে দেবার আগে নিশ্চিত হতে চাইল এই সেই বাড়ি কি না। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল সন্দেহের কারণ আছে কি? ছোটো গেটের দেয়ালে লাগানো শ্বেতপাথরের ফলকে পরিষ্কার হরফে লেখা—অনন্তশেখর সান্যাল। বাবা চ'লে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছিল আগের নামটা। কোনো আবেগের ব্যাপার ছিল না। অনেকেই জানত না বরাবরের মতো দেশ ছেড়ে চ'লে গেছেন ডাক্তারসাহেব। উটকো রোগীরা এসে প্রায়ই কড়া নাড়ত দরজায়; বিশ্বাস করত না সহজে। নাম বদলের পরামর্শটা শেষমেষ আলমই দিয়েছিল, নিজেকেও ক'রে নিয়েছিল অনন্তশেখরের কেয়ার অফ। সেজন্যে নয়। খটকা লাগল কাঠচাঁপার গাছটাকে অদৃশ্য হতে দেখে। ঠিক সেই জায়গায় পাঁচিলের দৈর্ঘ্য ছোটো হয়ে গ'ড়ে উঠেছে নতুন ঘর, মিষ্টির দোকান। সাইনবোর্ডে 'মধুর'। আগে রাস্তার নামের সঙ্গে কাঠচাঁপা গাছঅলা বাড়ি বললেই চিনে নিত লোকে। এখন নিশ্চয় চেনে মিষ্টির দোকানের নামে। রাকা কোনোদিনই এসব কথা লেখেনি। এটাও আবেগের ব্যাপার নয়; হয়তো কারণ ছিল। বাড়িতে জায়গা এতো, কিন্তু ঘর কম—'- কোনো কথায় একবার

বলেছিলেন অনন্তশেখর, 'প্ল্যানিংটা ঠিক হয়নি।' শুনে মনে মনে হেসেছিল আলম। পালটা-পালটির আগে এ-কথা শুনলে নিশ্চিত রফায় রাজি হতেন না বাবা। গাছটা লাগিয়েছিলেন এমন জায়গায় যাতে দোতলার শোবার ঘর কিংবা নিচে বসার ঘরের জানলায় দাঁড়ালেই সোজাসুজি দৃশ্য হয়। অনন্তশেখরকে এসব কথা বলার মানে ছিল না। হয়তো দোকান তুলে ফাঁকা জায়গাটার সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রয়োজনই স্বভাব শেখায়।

গাড়িটা চ'লে যাবাব পরেও বন্ধ গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল আলম। বাড়িটাই দেখছে। দোতলার জানলায় গরাদ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা—চেক-চেক লুঙ্গির ওপর ফতুয়া চড়ানো; গাল ও চিবুক জুড়ে ঈষৎ লালচে দাড়িতে মেঘের আলো। বৃষ্টি পড়ছে কাঠচাঁপা গাছের মাথায়।

হারানো গন্ধ ফিরে পাবার ইচ্ছায় ভারি হয়ে এলো নিশ্বাস। বাবা নয়, হলদে পর্দা। মাথায়, কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমে আসায় আকাশে তাকাল আলম। মেঘ। তখন মনে পড়ল, এয়ারপোর্ট থেকে গোটা রাস্তাটাই সে এসেছে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ভাবল, এসব নিয়ে ভাবনায় আবেগ ছাড়া আর কিছু নেই। গেট পেরিয়ে সিঁড়ি, তারপরে ঢাকা বারান্দা, দরজা। কলিং বেল টিপলেই দরজা খুলবে। রাকা? না, সেরকম প্রস্তুতি এখন আর মনে নেই। হয়তো মেসোমশাই, হয়তো স্নেহমাসীমা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার বেল টিপল আলম। সাড়ে বারোটা খুব বেশি বেলা নয়। তাছাড়া সে যে আসছে এটাও তো জানা কথা।

দরজা খুললেন স্নেহ। এঁটো হাত একপাশে আড়াল করা। কিছু অবাক, কিছু বা বিব্রত দৃষ্টিতে তাকালেন আলমের দিকে।

'ও, আলম!'

বরাবরের ভঙ্গিতে প্রণাম করার জন্যে ঝুঁকে এলো আলম।

'চিঠি পেয়েছিলেন?'

'ভেতরে এসো।' জবাব এড়িয়ে বললেন স্নেহ, 'খেতে বসেছিলাম—। বোসো—'

স্যুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রাখল আলম। সাজানো বৈঠকখানায় বসবার জায়গার অভাব নেই। তবু, ভিতরে যাবার পর্দার দিকে তাকিয়ে আশা বদলে গেল অস্বস্তিতে।

'আপনি খেয়ে আসুন, মাসিমা। আমি বসছি।'

'সেই ভালো।' এতোক্ষণে হালকা হাসি ফুটল স্নেহর ঠোঁটে, 'ততোক্ষণে তোমার মেসোমশাইয়েরও খাওয়া হয়ে যাবে।'

কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে থামলেন স্নেহ। স্যুটকেসটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চা খাবে তো?'

'খাবো। আপনি আগে সেরে নিন।'

'তুমি বসছ না কেন? বোসো!'

যে-দরজা পেরিয়ে ভিতরে গেলেন স্নেহ, সেই দরজা দিয়ে, তিন বছর আগেও

সটান ভিতরে চ'লে যেত আলম। তবে কেউ না কেউ দরজা খুলে দিতই। ফেরার সময় রাকা—অবশ্য অন্য কোনো সময়ে কতোবারই আর সে ফিরেছে! এখন সেখানে ফিরে এলো হলদে পর্দা। এমনও হতে পারে, পর্দা সরিয়ে এর পর যে আসবে সে স্নেহমাসীমা বা মেসোমশাই নয়—রাকাই। যতোক্ষণ কেউ না আসছে ততোক্ষণই অপেক্ষা। স্নেহ'র হাত এঁটো না থাকলে এই সময়টাও কমিয়ে আনা যেত। আলম অন্য কিছু ভাবল না।

ডানদিকের দেয়ালে গান্ধীজীর বড়ো ছবিটা আছে এখনো। শোকসভার দিন রাতে ছাদ থেকে নেমে এসেছিল এই ঘরে। তিন-চার বছর বয়স থেকে একই ভঙ্গিতে ছবিটা দেখছে আলম। মুখোমুখি দেয়ালে হরিণের শিং। তবু সরু একটা সুতো চোখ এড়ালো না। ওই জায়গাটা শ্বাশত নয়। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছিল একজন। তার বংশধররা থাকত মুর্শিদাবাদে। ওইখানের দেয়ালে টাঙানো অয়েল পেন্টিংয়ে ধরা অচেনা মানুষটির দিকে আঙুল তুলে ঠাকুরদাদার বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বহরমপুরের বাড়ি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাঁর ছেলে করত হাকিমি। হাকিমের ছেলে হলো ডাক্তার। ঢাকার জমিতে বাবার কবরের ওপর মাটি ছড়াতে ছড়াতে অন্যমনস্কভাবে ইতিহাসে ঢুকে পড়েছিল আলম। হরিণের শিং অন্য কিছু ভাবতে দিল না।

'কী খবর, আলম।'

অনন্তশেখর। পর্দা সরিয়ে পুরোপুরি ভিতরে আসবার আগেই প্রশ্নটা এলো।

'ভালো, মেসোমশাই।' চটপট প্রণাম সেরে আলম বলল, 'আপনাকেই যেন একটু অন্যরকম দেখছি!'

'কী দেখছ? স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে?'

'পাতলা হয়ে গেছেন অনেক।'

'হবে হয়তো। শরীর ভালো যায় না প্রায়ই।'

ধুতির তুলনায় গেঞ্জিটা ময়লা; দেখে মনে হয়, হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই পরেই চ'লে এসেছেন অনন্তশেখর। রাস্তার দিকের বন্ধ জানলাটা খুলে দিয়ে সোফায় এসে বসলেন।

'মা, বোনেরা—সবাই ভালো আছেন?'

আলম মাথা নাড়ল।

স্নেহ ফিরে এলেন। মনে হয় শাড়িটাও বদলে এসেছেন। অন্যমনস্কতায় বদল নেই কোনো। ঠিক মনে পড়ল না আগের শাড়িটা কোন রঙের ছিল।

'শুনেছিলাম আসছ।' ভাবনা থেকে উঠে এসে বললেন অনন্তশেখর, 'এখানে উঠবে জানাওনি তো?'

'এ আবার কী রকম কথা!' আলম প্রশ্নটা ভালো ক'রে বুঝে ওঠার আগেই ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন স্নেহ, 'কলকাতায় এলে আর কোথায় উঠবে।'

স্নেহ এতোই স্পষ্ট যে নিজের বিব্রত ভাব এড়াতে পারলেন না অনন্তশেখর। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'সে-কথা বলিনি।'

'এসো আলম, হাতমুখ ধোবে তো?' এই মুহূর্তের সমস্ত অস্বস্তি থেকে তাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে এলেন স্নেহ, 'চা হয়ে যাবে এখুনি—'

আলম উঠে দাঁড়াল। স্নেহকে অনুসরণ ক'রে ভিতরে যেতে যেতে ভাবল, তিন বছরের ব্যবধান স্বাভাবিকতার অনেকটাই নষ্ট ক'রে দিতে পারে। তিন বছর না আরো বেশি? এমনও হতে পারে, চিঠিতে দেওয়া খবরগুলো পুরোপুরি পৌঁছয়নি অনন্তশেখরের কাছে—বুড়ো মানুষ অন্যভাবেই ভেবে নিয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ফেরানোর কিছুটা দায় তারও।

পরিষ্কার তোয়ালে বের ক'রে রেখেছেন স্নেহ। সোপকেসও। হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'স্নান করবে না কি?'

"না। ক'রে এসেছি সকালে।'

'ভাতও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে নিও বরং—।' রাস্তা দেখানোর ধরনে উঠোনে নেমে এলেন স্নেহ, 'ঐ বাথরুম। নতুন ফীটিংস লাগানো হয়েছে। তুমি চেনো তো?'

আলম হাসল। সময়ের হিশেব করলে আলম যতোদিন ধ'রে এই বাড়ির সমস্ত অলিগলি চিনেছে, স্নেহ তার অর্ধেকও চেনেননি। অধিকারের কথা আলাদা! অবশ্য, বেসিনের ওপর মুখ পেতে চোখে, কপালে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ভাবল আলম, উঠোনের লাগোয়া এই বাথরুমটা তার পক্ষে নতুনই। চিলেকোঠা থেকে আটটা সিঁড়ি নামলেই দোতলা, বাথরুম। প্রায় তার একার জন্যেই। মাঝে মাঝে অবশ্য শ্রীমন্তদাও ব্যবহার করত; ক্বচিৎ রাকাও। একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'ঘরজামাইও এতো আদর পায় না। আমরা মরি ভাগাভাগি ক'রে, তোমার সব ব্যবস্থাই একার।' তখনো জানা ছিল না ঢাকা থেকে হঠাৎ মৃত্যুর খবর আসবে বাবার; তারপর ক্রমশ কলকাতার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে চ'লে যেতে হবে ঢাকায়। ঠাট্টার জবাবটাও তাই চট ক'রে এসে গিয়েছিল মুখে। রাকাকে প্রস্তুত হবার সময় দিয়ে আলম বলেছিল, 'যা পাবার তা একা পাওয়াই ভালো। আরো ভালো হতো যদি আদরটা একটু কম পেতাম।' রাকা যে বোঝে না তা নয়। ঠাট্টার জের পৌঁছেছিল তার চোখের তারায় আর কানের লতিতে। সামলে নিয়ে বলেছিল, 'কথায় যারা জগৎ মারে, তারা শ্বশুরের গলাধাক্কাও খায়।'

স্মৃতিই হাসিয়ে রাখল। একই গলার স্বর সুদ্ধ ফিরিয়ে দিল রক্তমাংসের গোটা দৃশ্যটাতে—ইচ্ছে করলেই এখন রাকাকে ছুঁতে পারে আলম। স্মৃতিই বাড়িয়ে দিল উৎকণ্ঠা।

খেতে ব'সে ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারল না আলম।

যত্নে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখছেন না স্নেহ। তাঁরই আড়ালে হয়ে যাচ্ছে আড়াল। ভাতের থালায় গবম ভাপ দেখেই আলম বুঝতে পারল, তার চা খাবার ফাঁকে ভাত ফুটেছে নতুন ক'রে, বাড়তি ভাজাগুলোও থালা সাজানোর জন্যে। খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এটা ওটা পরিবেশন করছেন নিজে; সেই সঙ্গে কথাও।

'তোমার সেই চিলেকোঠা এখন ঠাকুরঘর হয়েছে। শ্রীমন্ত দিল্লীতে বদলি হবার পর বসার ঘবেব পাশের ঘরটাকে গেস্টরুম করা হলো। গেস্ট আর এ-বাড়িতে আসবে কে? মাসখানেক আগে জলপাইগুড়ি থেকে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিল আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে।' বলতে বলতে হঠাৎই খেয়াল হলো যেন, বললেন, 'খাওয়া কমে গেছে, না খাচ্ছো না?'

'না, ঠিকই খাচ্ছি।' চোখ তুলে স্নেহকে দেখল আলম, ধৈর্যের শেষ পর্যন্ত সময় নিল। তারপব বলল, রাকাকে দেখছি না, মাসিমা। কলেজে নাকি?'

'এই দ্যাখো, বলতেই ভুলে গেছি তোমাকে।' জাগ থেকে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে স্নেহ বললেন, 'রাকা তো দিল্লীতে শ্রীমন্তর কাছে। আজ কিংবা কাল ফেরার কথা। তুমি আসছ জানে। আজ ট্রেনের সময় চ'লে গেছে, মনে হয় কাল সকালেই আসবে। দিল্লী থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়ার যা ঝামেলা—!'

চোখ নামিয়ে প্রায়-শূন্য থালার দিকে তাকাল আলম। শেষ হয়ে যাওয়া খাওয়াটাই আবার শুরু ক'রে বলল, 'কোন ট্রেনে আসবে? কালকায়?'

'মনে তো হয় তাই—'

এর পরের প্রশ্নটা খুঁজে পেল না আলম। কিংবা বয়স্ক গলার কাশির শব্দই চুপ করিয়ে রাখল তাকে।

বসার ঘর থেকে উঠে এলেন অনন্তশেখর। মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'কী যেন সেমিনারের কথা শুনছিলাম। তোমাদের বিষয়টা কি?'

অস্পষ্টভাবে অনন্তশেখরের কথাগুলো কানে তুলল আলম। জবাব দেবার ব্যস্ততা নেই কোনো। আলগোছে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে ভাবল, কালকা মেল সকালেই এসে পৌঁছায় হাওড়ায়। এই সেদিনও—কলকাতায় থাকতে থাকতে—ইউ. জি. সি'র ইণ্টারভিউ দিয়ে বার দুয়েক নিজেও ফিরেছে সে। কাল সকালে ফিরলে রাকা এখন ট্রেনে। তার মানে এখনো আঠারো-উনিশ ঘণ্টা।

সময়ের ভার নিশ্বাসে মিশে যেতে হাত থেমে গেল। চাপা ঢেঁকুরের সঙ্গে মিশে ছড়াতে লাগল বুকের ভিতরের খালি জায়গাগুলোয়। সুবিধে এইটুকু, কাল রবিবার, অপেক্ষা করার সময় থাকবে। স্নেহকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কাল স্টেশনে যাবে কি না।

অনন্তশেখর অপেক্ষা করছেন তখনো। হাতের তেলোয় মুখ পাতা—ধরনটা বিচিত্র; গাল ও চিবুকে সাদা ছোটো ছোটো দাড়ির বিন্দু।

কালচারাল এক্সচেঞ্জ বলতে পারেন।' আলম বলল, 'আলোচনার মাধ্যমে একটা

বিনিময়, যাতে দু'দেশের লোক পরস্পরকে আরো ভালোভাবে চিনতে পারে—'

'তা না হয় হলো।' নিজের ধরনে বললেন অনন্তশেখর, 'কিন্তু, তেলে জলে মিশ খায় কখনো? খেলে তোমার বাবাও কলকাতা ছাড়তেন না, আমিও ঢাকা ছাড়তাম না!'

কোন কথার উত্তরে কী বলবেন জেনেই যেন আলোচনায় নেমেছেন অনন্তশেখর। অস্বস্তির মধ্যেও হাসি পেল আলমের। অনন্ত আর কিছু বলেন কিনা শোনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বলল, 'মেসোমশাই, আমরা তেলজলের কথা বলি বটে—কারণ দিনের পর দিন এইভাবেই বলানো হয়েছে। কিন্তু কেউই জানি না কোনটা তেল আর কোনটা জল! একদিন হয়তো বুঝতে পারব দুটোই জল কিংবা তেল—'

'বুঝি না বাবা, তোমাদের কোন ধরনের ব্যাখ্যা!'

'এখন আর বুঝে কাজ নেই।' এতোক্ষণ চুপচাপ থাকার পর স্নেহ বললেন, তুমি হঠাৎ উঠে এলে কেন! আলম উঠুক। বেচারা ক্লান্ত। এখন ওকে একটু শুয়ে ব'সে কাটাতে দাও—'

আঠারো-উনিশ ঘণ্টার দূরত্ব পাঁচ-সাত মিনিটে কমানো যায় না। বিষাদ চেপে বসে আরো। বোধহয় ঠিকই আঁচ করেছেন স্নেহ, ক্লান্তি আসছে—বিশ্রামের নামে টান-টান হ'লেই যদি কেটে যায় আঠারোটা ঘণ্টা, তার চেয়ে সুখের আর কিছু নেই।

আলম উঠে পড়ল। অনন্তশেখরের সঙ্গে কথা বলবার সময়েই গুছিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। এখন বলল, 'রাতে খাবো না, মাসীমা।'

'ও মা, কেন!'

'ওখানে কথা দিয়ে এসেছি, ডিনার আছে। ফিরতেও রাত হবে হয়তো—'

স্নেহ তাকিয়ে আছেন। স্থির। দৃষ্টিটা সহ্য না হওয়ায় হাত মুখ ধুতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল আলম।

বসার ঘরের পাশে গেস্টরুম। স্নেহই বর্ণনা দিয়েছিলেন। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম আসতে লাগল ঝড়ের গতিতে। শুধু অনুভব করা যায়। কালকা মেলের গতিতে? পাশ ফিরে জুত হতে গিয়ে হাসির মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আলম। এটা চিঠির ভাষা হতে পারে, সামনাসামনি উপমা হিশেবে অচল। তখনই বৃষ্টি নামল বড়ো বড়ো ফোঁটায়।

ডেকে দিলে স্নেহ।

'কোথায় যাবার আছে বলছিলে না?'

বাইরে তাকিয়ে আলম দেখল সন্ধে হয়ে গেছে, হয়তো তার চেয়ে কিছু বেশি এগিয়ে গেছে সময়। বৃষ্টিভেজা, সোঁদা একটা গন্ধ পেল নাকে। কাঠচাঁপার নয়। তবে বৃষ্টিও নেই। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে জ্বালা; অনেক বেলায় খাবার জন্যে হ'তে-পারে স্নেহ আলো জ্বালতে টেবিলের ওপর থেকে রিস্টওয়াচটা টেনে আনলে চোখের সামনে। প্রায় সাতটা। ঘুমের মধ্যেই আরো বারো-তেরো ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো।

পিঠ টান ক'রে জড়তাটুকু কাটিয়ে নিল আলম।

'অনেকক্ষণ ঘুমোলাম, মাসীমা। একটু দেরিই হয়ে গেছে—'

স্নেহর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুঝল তার অন্যমনস্কতার সুযোগে তাকেই লক্ষ করছিলেন স্নেহ। এখন সরে যেতে যেতে বললেন, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। চা আনছি।'

স্নেহ নয়, রাকার গলা! হয়তো এইভাবেই বলত, ব'লেও ছিল। ধারাবাহিকতা থেকেই যায়—সূত্রগুলো যদিও মনে পড়ে না ঠিকঠাক।

আরো কিছুক্ষণ পরে ট্রামবাস্তার দিকে এগোতে এগোতে একই কথা ভাবল আলম। মেঘলা আকাশের ধোঁয়া লেগে আছে চারদিকের আলোয়। শনিবারের সন্ধেয় ভিড় থাকে না ট্রামে-বাসে। তা ছাড়া, একটিই ঠিকানা নিয়ে এসেছিল এখানে—নিজের বাড়ির; আর-আর ঠিকানা মনে করতে গেলে ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা দৃশ্যের ধরনে দ্রুত ও এলোমেলো হয়ে যায় স্মৃতি। সম্পর্কে ঢুকে পড়ে অপরিচয়। এই ভালো, উদ্দেশ্যহীনভাবে চৌরঙ্গির ট্রামে উঠে আলম ভাবল, ফেরার সময় না-হওয়া পর্যন্ত থামতে থামতে গড়িয়ে যাওয়া। তারপরে ফেরা; তারও পরে আরো কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। তবে সেটা খুব কঠিন না-ও হতে পারে। ঘুম যতো তাড়াতাড়ি আসবে ততোই দূরত্ব কমে আসবে রাকার সঙ্গে। নিজের বাড়ি বলতে যে-আবেগ চঞ্চল ক'রে রাখত সারাক্ষণ, কখনো বুঝতে পারেনি রাকাই পরিণত হয়েছে সেই বাড়িতে। অ্যানাটমি খুঁজলে গা-হাত-পা-মাথার বদলে নমনীয় হয়ে উঠত জানলা-দরজা-সিঁড়ি-চিলেকোঠা!

স্নেহই খুলে দিলেন দরজা। আলম জানে কোথায় বাথরুম, কোথায় গেস্টরুম। ঘরে ঢুকে দেখল, জলের গ্লাস, টর্চ, মৌরির কৌটো সবই চমৎকার গুছিয়ে রেখেছেন মাসীমা। অনুযোগের সুযোগ নেই কোনো।

'আর কিছু লাগবে?'

'না।' আলম হাসবার চেষ্টা করল, 'এরপর ঘুমোলেই সকালে—'

'তোমার সেমিনার তো সোমবার থেকে?'

আলম ঘাড় নাড়ল। না বললেও একটা কথা তখনো বলার ছিল; বলল না। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙে তার। ইচ্ছের কথাটা সকালেই বলা যেতে পারে। ভাবল, তখনো সময় থাকবে।

স্নেহ তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আলম বলল, 'কিছু বলবেন, মাসীমা?'

'না।' গলার স্বরে আচমকা ভাব। নিজেকে ফিরে পেয়ে স্নেহ বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়ো, বাবা। আমি যাচ্ছি—

আলোটা নিবিয়ে দিল আলম। দুপুরের টানা ঘুমের পরেও শরীরে এই আরো ঘুমের আলস্য কেন বোঝা যায় না। তবে উপায় না থাকার চেয়ে এই ভালো। ভাবতে ভাবতে হাই তুলল আলম,, হাত চাপা দিল চোখে। আচ্ছন্নতার মধ্যেই টের পেল আশপাশের শব্দগুলো নিঃশব্দ হয়ে আসছে ক্রমশ ঘুম এইভাবেই আসে।

'আলম?'

আচ্ছন্নতার মধ্যেই শব্দটা বিঁধে গেল কানে—ছড়িয়ে পড়ল গোটা শরীরে। স্বরটা চেনা হ'লেও অনুভূতিটা অচেনা। নিজেকে স্বাভাবিক করার সময় নিতেই জবাব দিল না আলম।

'আলম কি ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না, মাসীমা?'

'আমি একটু আসব?'

এবার নিজেই উঠে আলো জ্বালালো আলম। পর্দাটা সরিযে স্নেহকে ভিতরে আসার জাযগা ছেড়ে দিল।

'কিছু বলবেন?'

'তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

অকারণেই ওর বিছানার বালিশটা ঠিকঠাক ক'রে দিলেন স্নেহ। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসেব ওপর ঢাকনিটা চাপা দিয়ে বললেন, 'এ-বাড়িতে আরশোলা কম নেই। কিছুদিন আগেই পেস্টিসাইডস-এর লোক এসেছিল, কী সব ওষুধ ছড়িয়ে গেল। দু-চার দিন। আবাব যে কে সেই!'

আলম অনুমান ক'রে নিল, এ-কথা বলবার জন্যেই আসেননি স্নেহ। ইতস্তত ক'রে চেয়ারটা এগিয়ে দিল সে।

'অনেকদিন পরে আজ আপনার হাতের রান্না খেয়ে মনটা ভ'রে গেল।'

'কী আর খেলে! সামান্য মাছ-ভাত। বাজার সকালেই হয়ে গিয়েছিল।'

আলম চুপ ক'রে থাকল। এর পরের কথা চালানোর দায়িত্ব স্নেহর।

'তোমার মেসোমশাইয়ের সামনে বলতে পারছিলাম না কথাটা—', থেমে-থাকা থেকে হঠাৎই অন্য গলায় ব'লে উঠলেন স্নেহ, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। রাকাকে নিয়ে তোমার মনে যদি কোনো ইচ্ছে থেকে থাকে, সেটা ভুলে যেও। দোষটা আমার মেয়েরই—সে অন্যায় করেছে—'

আলম পুরোপুরি স্তম্ভিত হবার আগেই আঁচলে আড়াল-করা হাত বের ক'রে একটা খাম এগিয়ে ধরলেন স্নেহ।

'তোমার চিঠি। রাকা দিয়ে গেছে—'

স্নেহর মুখের দিকে তাকিয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ-করা কাগজটা বের করল আলম। রাকারই লেখা—'আমার ব্যাপারে তুমি যতোটা, তোমার ব্যাপারে—আমার ধারনা ছিল, আমিও ঠিক ততোটাই। তোমার শেষ চিঠিটা পেয়ে যখন মানে বুঝলাম, তখনই ওলট-পালট হয়ে গেল সব। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখলাম, তোমাকে আসতে লিখেছিলাম তুমি আসতে পারবে না জেনেই! তোমার উদ্দেশ্য তো তা নয় —তুমি আমাকে উপড়ে নিয়ে যেতে চাও। তোমার কাছে আমি কতো যে কৃতজ্ঞ! কিন্তু, আলম,

সে-মনের জোর আমারই নেই। কী একটা বাধা আছে—কী একটা লাগছে কোথায়! সেটা যে কী বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই বাধার দেয়ালটা ভাঙবার মতো জোর যখন পাচ্ছি না, তখন দেয়ালটা আরো উঁচু করবার দরকার কি! এই বাধাটার জন্যেই তোমার আমার ঠিকানা বদল হয়ে গেল, আমাদের আগে আরো অনেকের হয়েছে। বাধাটা না থাকলে হয়তো কোনোদিনই পবিচয়ের সুযোগ হতো না আমাদের—এই অক্ষরের পর অক্ষর সাজানো ভালোবাসারও দবকার হতো না। তোমার মতো একজন সৎ মানুষের সামনে দাঁড়িযে এসব কথা বলতে পারতাম না জেনেই পালিয়ে যাচ্ছি। এই চিঠির ভাষাটাও একটু রোমান্টিক লাগতে পারে—তারও কারণ হয়তো এই যে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। পালিয়ে যাচ্ছি, তার কাবণ তোমাব ভালোবাসাটা আরো খাঁটি। যে-কষ্ট তোমাব হবে, আমাব তা হবে না। যদি পারো ক্ষমা কোরো। যদি পারো খোঁজখবর নিও। যদি চিঠি দাও জবাব দেবো! তা ছাড়া মিথ্যে জেনেও তো আমরা অনেক বিষয়কে সত্য ক'রে জিইয়ে বাখতে ভালোবাসি। বাসি না?'

মাঝামাঝি এসেই নিশ্বাস সহজ করতে শুরু করেছিল আলম। এখন চিঠিটা ভাঁজ ক'রে ভ'রে নিল খামে! ছেঁড়া কাগজের একটা ছোট্ট ফালি পড়ে গিয়েছিল মেঝে, সেটাও তুলে নিল ঝুঁকে। অনায়াসে হাসল স্নেহর দিকে তাকিয়ে।

'বাকা কিন্তু ভাষাটা খুবই সুন্দর শিখেছে, মাসীমা। এতো সুন্দর লেখে।'

'জানি না বাবা কেন এ-কথা বলছ।' স্নেহ বললেন, 'তুমি আসছ শুনেই কেমন যাবাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।'

আলম জবাব দিল না।

'শুয়ে পড়ো। কর্তাকে বলেছি কাল ইলিশ আনতে! রাঁধবো তোমার জন্যে।'

আলম হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন গঙ্গার ইলিশ খাইনি!'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে থেমে দাঁড়ালেন স্নেহ।

'আলোটা নিবিয়ে দেবো?'

'আপনি ভাববেন না। আমিই নিবিয়ে দেবো।'

'তোমার তবু আসার সুযোগ আছে। আমাদের তো সে-রাস্তাই বন্ধ। জন্ম কম্ম সবই ওখানে—মাঝে মাঝেই টানে। বিশেষ ক'রে তোমার মেসোমশাইয়ের। দশ বছর হয়ে গেল, নিজেদের বাড়িঘর বলতে সবই এখন এখানে। তবু যে কেন নিজেদের উদ্বাস্তু লাগে।'

স্নেহর কথা যেখানে শেষ হলো সেইখানেই নৈঃশব্দ্যের শুরু। রাত কম হয়নি। টেবিলের ওপর খুলে রাখা রিস্টওয়াচটা তুলে দেখল, সাড়ে বারোটা। অনেকক্ষণ পরে এক-একটা গাড়ি যাচ্ছে, তার শব্দ। বাড়ির সামনে দিয়ে একটা রিক্সা গেল ঠুং ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে। ধ'রে রাখা নিশ্বাসটা ছেড়ে দিল আলম। আলো নিবিয়ে বিছানার ওপর বসল।

জানে, এখন সে কী করবে। মানুষের ধারাবাহিকতা তার রক্তে; ঠিকানায় নয়।

অনেকদিন আগে এই বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবার আগে ছাদে উঠে নামাজ পড়ছিলেন বাবা—সে অন্তত সেই দৃশ্যের সাক্ষী ছিল। সব হারানোর পরেও যে-বিশ্বাসে নতজানু হয়েছিলেন বাবা, তার তো সে-বিশ্বাসও নেই। চোখের কোণে জমে-ওঠা জলবিন্দুটুকুও এই রাতের অন্ধকারে সে নিজেই মুছে নিতে পারে।

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে আলম বলল, তুমিও কিছু কম সৎ নও, রাকা।

# হিন্দু

## দিব্যেন্দু পালিত

প্রতিদিনের মতো আজও ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন মথুরানাথ। খালি পা, পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক, হাতে তামার পাত্রে গঙ্গাজল। সুগৌর পায়ের পাতায় জল শুকিয়ে গেলেও মাটি লেগে আছে এখনো। মুখে অস্ফুট গীতার শ্লোক। প্রতিদিনের এই নৈষ্ঠিকতা শীতে বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচায় তাঁকে, গ্রীষ্মে হয়ে ওঠে ক্লান্তিহব। নিতান্তই অসুস্থ না হয়ে পড়লে গত তিরিশ বছবে এই অভ্যাসে ছেদ পড়েনি কখনো।

দশ বারো বছর আগে ভোরের স্নানযাত্রায় সঙ্গী পেতেন কাউকে কাউকে। তাঁদের কেউ মারা গেছেন, কেউ অথর্ব, কেউ বা রামপুর ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র। শেষ সঙ্গী বানোয়ারিলাল মারা যাবার পর এখন তিনি একা। নতুন কেউ আসেনি। মথুরানাথ জানেন দিনকাল পাল্টে গেছে, আরো পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ। শুদ্ধাচার বিনষ্ট হবার মুখে। মানুষ এখন ধর্ম নিয়ে ব্যাবসা করে, রাজনীতি করে; কিন্তু ধার্মিকতা মানে না। এই যে এখন একা একাই গঙ্গাস্নান করতে যান তিনি—একাই স্পর্শ করেন প্রত্যূষেব নদীজল. এসব সময় এক বিচিত্র উপলব্ধি স্পর্শ করে যায় তাঁকে। মনে হয় তিনি যেমন গঙ্গার, তেমনি প্রতি ভোরে গঙ্গাও অপেক্ষায় থাকেন তাঁর—তাঁকে সংস্পর্শ দেবার জন্যে থেমে থাকেন কিছুক্ষণ। তিনি যখন থাকবেন না তখন নদী অন্যমনস্ক হবে।

দশ বারো বছর আগে অবশ্য নদী এতটা দূরে সরে যায়নি। তখন মাইল দুয়েক দূরে খঞ্জরপুর ঘাটে গেলেই হতো। মূল স্রোত ক্রমশ বাঁক বদল করতে শুরু করায় চড়া পড়তে শুরু করে খঞ্জরপুরে। নদী আর নদী থাকেনি। পাঁক, আগাছা আর সর্ষে গাছের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ যে জলধারা এখন বহে যায় তাতে পায়ের পাতা ভেজে না। সুতবাং যেতে হয় অনেকটা দূরের পীরপুর ঘাটে—গঙ্গা যেখানে আজও নদী, বেশ চওড়া ও গভীর, সারাক্ষণ টলটল করে জলের গতিতে।

বাষট্টি বছরের মথুরানাথ পাণ্ডের এই খেয়াল পছন্দ করে না তাঁর বাড়ির লোকজন—স্ত্রী কৌশল্যা, মেয়ে বিন্দিয়া, ছেলে বিপিন এবং পুত্রবধূ নীতা। এমনকি কাজের লোক গয়ারাম, লছমিও। দিনকাল খারাপ। ইদানীং কোথাও তেমন কিছু না ঘটলেও গত দাঙ্গার পর থেকে একটা চাপা আশঙ্কা যে ছুঁয়ে থাকে রামপুর ও তার আশপাশের মানুষজনকে, কেউই একা হতে চায় না—সেটা কে না বোঝে!

মথুরানাথের ছেলে বিপিন আইন পাশ করেছে পাটনা থেকে। প্র্যাকটিশ করে পাটনা, রামপুর দু' জায়গাতেই। ভোর রাতে উঠে বুড়ো বাপের গঙ্গাস্নানে যাওয়া নিয়ে মা কৌশল্যার অনুযোগ শুনে কিছুদিন আগে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টায় বলেছিল, 'বাবুজি,

সুব্‌হ ঘর মে আস্নান করেনসে আপকা ধরম্ ঝুটা হো যায়গা কেয়া? বুঢ়াপে মে কুছ শোচ বিচার চিন্তা আনা চাহিয়ে। আখির হামলোগোঁ কী ওর ভি তো দেখিয়ে। মা কিতনা রোতী হ্যায়।'

শুনে হেসেছিলেন মথুরানাথ। যেমন হাসেন, স্বচ্ছন্দে।

'দেখো বেটা, মেরে লিয়ে চিন্তা নেহি করো। ধরমকা চিন্তা মনুষ্যকো অপনী অপনী হোতী হ্যায়। যেইসে তুমারা আঁখে দিখাতা হ্যায় ম্যায় তুমারা পিতা হুঁ—ঔর মে দেখতে হুঁ তুম মেরা পুত্র হ্যায়। ম্যায় হিন্দু হুঁ—অগর মেরা আত্মা শুদ্ধ রহে, বিশওয়াস ঠিক রহে, তো মেরা কাজকাম ভি ঠিকই রহেগা। লাগাতার তিশ বাত্তিস সাল আস্নান মে গিয়া, লোটা ভি তো আয়া অবতক! কুছ অনিষ্ট নেহি তো হুয়া!'

'আপকা বাত সহি হ্যায়।' বিপিন বলেছিল, 'লেকিন অচানক কুছ হো যায় তো! অনিষ্ট আশমান সে হি ঝুঁকতা হ্যায়—'

'পরন্তু ইয়ে অনিষ্টকে বাত ভি নেহি হ্যায়।' ছেলেকে এইভাবে আশ্বস্ত করে স্বভাববশত গীতা থেকে উচ্চারণ করেছিলেন মথুরানাথ, 'ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ। বেফিকিব রহো'

মথুরানাথের চাপে পড়ে একদা সংস্কৃতচর্চা করার সময় গীতা পড়েছিল বিপিন, সে জানে এই শ্লোকাংশের অর্থ কী। মথুরানাথ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না, গার্হস্থ্য জীবনযাপন করলেও সন্ন্যাসীর শুভচারিতা তাঁর রক্তে—মোক্ষলাভের প্রত্যাশা নেই। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিপিন দেখছে মানুষটা ধার্মিক, ন্যায় অন্যায় মানেন, শ্রদ্ধা করেন নিজের হিন্দুত্ব ও পৈতেকে। এ অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, অন্ত্যজ সব মানুষই চেনে তাঁকে, সম্মান করে। আগে যখন চারদিকে সব মানুষের মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতি ছিল তখন বহু লোক আসত তাঁর কাছে। ঘনিষ্ঠরা বসত, সরবত খেত, কথা শুনত তাঁর। এখন কানহাইয়ালালজি, দয়াচরণ মিশ্র, জানকীনাথ চৌধুরী এবং এমনই প্রবীণ দু'চারজন ছাড়া নিয়মিত আসেন না কেউ। নতুনদের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান, রুচির ব্যবধান, একটুআধটু ভাষারও ব্যবধান। তবে সম্মানটা পান।

বাপকে নিয়ে বিপিনের চিন্তার কারণও ও-ই, বয়স। আগের মতো সবল, সমর্থ নেই। ঠিকঠাক অ্যাটাক না হলেও বছর তিনেক আগে হার্টের অসুখে ভুগেছিলেন বেশ কিছুদিন। চিনচিনে ব্যথা হতো বুকে, বাঁ হাতে। চিকিৎসা করাতে গিয়েছিল পাটনায় নিয়ে গিয়ে। ডাক্তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বললেও বেশি পরিশ্রম করতে মানা করেছিল। কে শোনে! রোজ ভোরে এই গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া এবং ফিরে আসাটাকে মথুরানাথ নিজে স্বাভাবিক মনে করলেও অন্যরা করে না। একা একা যাতায়াত, সাঁতার জানেন না—কোনোদিন হঠাৎ কিছু ঘটলে টেরই পাবে না কেউ। অন্য ধরনের ভয় ছাড়াও রাস্তাঘাট খারাপ, যখন বেরোন তখন ঘুটঘুট করে অন্ধকার। হোঁচট খেতে পারেন, বা পাটনা, মোকামা, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ থেকে আসা যাওয়া করে যেসব লরি আর ট্রাক, অসাবধানে চাপাও পড়তে পারেন সেগুলোর কোনোটায়।

ওদের আশঙ্কায় ভুল নেই কোনো। কোতোয়ালিতে তাদের বাড়ি থেকে পীরপুর ঘাটের দূরত্ব কম নয়। এদিক ওদিক পাঁচ ক্রোশ তো বটেই। এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে কেউই পার হয় না আজকাল। দরকারও পড়ে না। রামপুরের যে অংশটুকু শহর হতে হতেও পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি এখনো, তার একদিকে কোতোয়ালি থানা, রেলস্টেশন, হনুমান মন্দির, বাজার; অন্যদিকে পোস্টাপিস, হাসপাতাল, রামমন্দির আর কাছারি—মোটামুটি দেড় দু' মাইলের মধ্যেই অঞ্চল সীমাবদ্ধ। তাও বসতি মাঝখানে যত ঘন আশপাশে তা নয়। রামপুরেব ওপব দিয়ে বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস যায় এক দেডঘণ্টা অন্তর, শহরের মধ্যে সাইকেল চলে, সাইকেল রিকশা আছে বেশ কয়েকটা, মোটর আছে দু' চারজনের। আর বাহন বলতে ঘোড়ায় টানা এক্কা আর গরুর গাড়ি। সেগুলি যাতায়াত করে বামপুরের আগের বসতি নাথচৌক থেকে পরের বসতি ছান্দেরি পর্যন্ত। বাকি পথের খবর রামপুরের মানুষ রাখে না। বছর দুয়েক আগে দাঙ্গার পর থেকে এটা হিন্দুদেরই জায়গা। আগে কংগ্রেসের দাপট ছিল, এখন বিধানসভা নির্বাচনে অধিকাংশ ভোট দেয় বি জে পি-কে। যে কয়েক ঘর মুসলমান অবশিষ্ট ছিল তাবা আস্তে আস্তে সরে গেছে ছান্দেরির দিকে। ওদিক থেকেও কিছু হিন্দু চলে এসেছে এদিকে। নিতান্তই দাযে না পড়লে এখন কেউই আর এদিক ওদিক কবে না।

প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসে মথুরানাথ যখন বাড়ির কাছাকাছি তখন আর ভোর নেই, সূর্য উঠে গেছে, নরম রোদ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে চারদিকে। পথ হাঁটার পরিশ্রমে ঘাম ফুটেছে তাঁর কপালে। ঘাম অনুভব করছেন নামাবলীর নীচে, পিঠে ও বুকে। গরম পড়তে শুরু করেছে, দুপুরের দিকে ছোটখাটো ধুলোর ঝড় বয় মাঝে মাঝে। এরপর বাড়িতে পৌঁছে দরজার শিকল নাড়লেই দরজা খুলবে। বেশির ভাগ দিনই ছুটে আসে মেয়ে বিন্দিয়া কিংবা পুত্রবধূ নীতা, যে সেদিন রজস্বলা নয়। গঙ্গাজলের পাত্রটি হাতে নিয়ে পৌঁছে দেয় পুজোর ঘরে। নিঃশ্বাস সহজ করে তারপর উঠোনের টিউবওয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মথুরানাথ। অনুগত দয়ারাম জল পাম্প করলে সেই জলে পা ধোবেন তিনি, আচমন করবেন। গা থেকে নামাবলী খুলে গামছায় গা হাত পা মুছে চলে যাবেন পুজোর ঘরে। মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবেন শ্বেত পাথরের রাম ও কৃষ্ণের মূর্তির সামনে। বেলপাতায় গঙ্গাজল ও চন্দন নিয়ে ছিটোবেন তাঁদের পায়ের কাছে, দু' এক ফোঁটা জল মুখে ঠেকিয়ে উঠে পড়বেন। এখন তাঁর বারান্দার খাটিয়ায় গিয়ে বসবার সময়। পিতলের গ্লাসে ঠাণ্ডা দুধ নিয়ে আসবে কৌশল্যা। খাবেন। তারপরই ক্রমশ মিশে যাবেন গার্হস্থ্য জীবনে।

কিন্তু, প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় বাধা পড়ল আজ।

মথুরানাথ লক্ষ করলেন প্রায় তাঁদের বাড়ির কাছে বড় বটগাছটার সামনে জটলা করছে সাত-আটজন লোক। একজন দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল নিয়ে। আর কিছু দেখবার আগেই দ্রুত এগিয়ে আসা সুলতানগঞ্জ-ছান্দেরি বাসের ধুলোয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলো তাঁর। বাসটা চলে যেতে জটলার সামনে এসে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ পড়ল কপালে।

অল্প চওড়া পিচের রাস্তার পাশে ধুলোয় পড়ে আছে একটা উলঙ্গ লোক। দেখে মনে হয় মাঝবয়সী। কোমরে ময়লা ফিতের গিঁট বাঁধা; কিন্তু সেটার সঙ্গে জড়ানো পাজামাটা ছিঁড়ে খসে যেতে যেতে এমন আকার ধাবণ করেছে যে শরীর আড়াল হয় না। গায়ে জামাব মতো একটা কিছু আছে বটে, কিন্তু সেটাও এমনই ছিন্ন যে, বাঁ হাতের ওপর দিকে একটা অংশ লটকে থেকে বাকিটা চলে গেছে লম্বালম্বি শুয়ে থাকা শরীরের নীচে। ছিন্ন কাপড় এবং নগ্ন শরীর, সমস্তই কাদা মাখা। যেন পাশের নর্দমায় শুয়ে ছিল বেহুঁস হয়ে, সেখান থেকে তুলে এনে কেউ শুইয়ে দিয়ে গেছে রাস্তায়। এমনও হতে পারে লোকটা নিজেই যাচ্ছিল কোথাও—এগোতে পারেনি।

সেজন্যে নয়। লোকটা চোখে পড়ছে অন্য কারণে। মুখের খানিকটা ও শরীরের কিছু অংশ বাদে তার গোটা শরীরে ঘা। মাথায়, গলায়, বুকে, হাতে, কোমরে, তলপেটের নীচে, হাঁটু ও পায়ের পাতা, ঘা সর্বত্র। কোনোটা আকারে ছোট, কোনোটা শুকোতে গিয়েও শুকোয়নি, কোনোটা চামড়া উঠে, পুঁজ জমে বেশ দগদগে। বিশেষত অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের যা চেহারা, চোখ খুলে দেখা যায় না।

অভিজ্ঞ মথুরানাথ চোখ ফেবালেন না তবু। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কবলেন লোকটার ডান চোখ পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও বাঁ চোখ সামান্য খোলা। এভাবে অচেতন শুয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকটা মরে যায়নি তা বোঝা যায় তার গর্তে ঢোকা পেট, পাঁজরা বেরুনো বুক ও কণ্ঠনালীর ওঠানামা দেখে; মুখ ও গায়ের ঘায়ে মাছি বসলে হঠাৎ কখনো কেঁপে ওঠা দেখে।

মথুরানাথকে দেখে সেখানে জড়ো হওয়া লোকগুলির আলোচনা থেমে গিয়েছিল। পথ-চলতি আরো দু' একজন এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। সামান্য ঝুঁকে দেখা অবস্থা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মথুরানাথ। এই রাস্তা দিয়েই ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন তিনি, তখন চোখে পড়েনি। তারপরেই তাঁর মনে হলো কৃষ্ণপক্ষ চলছে, যে-সময় তিনি গিয়েছিলেন তখন চারদিকে ঘন অন্ধকার, নিজেকেই হাঁটতে হয়েছিল সাবধানে। এমনও হতে পারে, দেহটা তখনো এইভাবেই পড়েছিল এখানে।

আশপাশের লোকগুলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মথুরানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কব সে গিরা হ্যায় ইঁহা পর?'

'কেয়া মালুম, পণ্ডিতজি।' একজন বলল, 'হম তো ব্যস আভি-আভি দেখা!'

আর একজন বলল, 'বিচারা! করিব মরনে বালা হ্যায়।'

'এইসে মত বোলো, বাবুয়া।' দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন মথুরানাথ, 'শ্বাস ঠিক হ্যায়। জীবিত হ্যায়। আভি আসপাতাল মে লে যানা চাহিয়ে—বাঁচ যায় গা—'

তখন প্রায় সকলেই মাথা নাড়ল গুঞ্জন তুলে।

যে-যুবকটি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার তার দিকে চাকলেন মথুরানাথ।

'কী নাম হে?'

'জি, গিরধারি।'

'তো এইসে করো গিরধারি বাবুয়া, পুলিশ চৌকি মে যা কর বোলো এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায় ইধর—জেরা আসপাতাল্ল লে যানে কি বন্দোবস্ত করে—'

'জি ম্যয় তো স্টিশন যায়েঙ্গে। ট্রেন পাকড়ানা হ্যায়—'

'একহি তো রাস্তা—ব্যস খবরহি না দেনা হ্যায়। দো মিনিট কা বাত। যাও বেটা, ফুর্তি সে যাও।'

সাইকেল নিয়ে গিরিধারী চলে যাবার পর খানিক অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। লোকটাকে দেখলেন আবার। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মাছির সংখ্যা। সাধারণ মাছির সঙ্গে একটা দুটো নীল ডুমো মাছিও চোখে পড়ল। ডান চোখের পাতায়, ঠোঁটের পাশে, বুক, হাত, পেট, অণ্ডকোষ—এখন তাদের বিচরণ সর্বত্র। মুহূর্তের জন্যে শরীরটা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল আবার, ঠোঁটদুটো ফাঁক হতে হতেও হলো না। লোকটা কি পিপাসার্ত? কণ্ঠনালীর স্থিরতা দেখে সেরকম কিছু অনুমান করা গেল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস পড়ল মথুরানাথের। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন যেন। হে রাম, হে কৃষ্ণ, মুমূর্ষুর এই নিয়তি সজীব মানুষকে দেখতে হয় কেন! চারদিকে এত মানুষের মধ্যে এই হতভাগ্যের কি কেউই নেই, যে ওর নিজের! এভাবে পড়ে থেকে কোন শান্তি পাবে! তারপর ভাবলেন তাঁর নাম বললে চৌক থেকে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে পুলিশ, গরুর গাড়ি বা মাল-টানা রিকশা যাতেই হোক তুলে, একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আশা করা যাক হয় সুস্থ হবে, না হয় মৃত্যুই গ্রহণ করবে ওকে। জীবন এর বাইরে চলে না।

এরপর বাড়িতে ফিরলেও মনটা বিমর্ষ হয়ে থাকল মথুরানাথের। অন্যদিন বাড়ি ফিরে যা যা করেন ও যেভাবে, আজও সেইসব সেইভাবে করলেও চিড় খেল একাগ্রতা। টিউবকলের সামনে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ গামছায় হাত পা মুছতে মুছতে দয়ারামকে বললেন, 'শুনো জি, রাস্তা মে বড়ে পেড় কে পাশ এক বেহুঁস আদমি গিরা হুয়া হ্যায়। পুলিশ চৌকিমে খবর ভেজা গিয়া আসপাতাল লে যানেকে লিয়ে। যাও, দেখো জেরা। অগর উসে পিয়াসা লাগা হ্যায় তো হালকাসে এক দো বুন্দ পানি দে না মুমে। আভি আভি যানা।'

দয়ারাম মথুরানাথের অনুগত, কখনো অবাধ্য হয় না। তবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন জাত হ্যায়, মালিক?'

মথুরানাথ চলেই যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন। সামান্য বিরক্তি ফুটল কোমল মুখে।

'মরিজকে ভি জাত হোতা হ্যায় কেয়া। এক বেচারা মনুষ্য—উসে পানি পিলানা ধর্‌ম হ্যায়।'

খড়ম ঠুকতে ঠুকতে পুজোর ঘরের দিকে চলে গেলেন মথুরানাথ। ধ্যানস্থ হতে।

জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহল আছে রামপুরের মানুষের, কিন্তু আগ্রহ নেই কোনো। সেই দাঙ্গার সময় চারদিনে দু'পক্ষ মিলিয়ে তেত্রিশটা লাশ পড়ার পর এবং আঠারো

জন জখম হবার পর একটু ভয় ভাবনা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তারপর আবার যে-কে-সেই। কলেরা কি ধরা-না-পড়া অন্য কোনো অসুখে, কি ফোতা ভগন্দর সেপটিক হয়ে, বা নিতান্তই বার্ধক্যজনিত রোগে নিয়মিত কিছু মানুষ না মরলে 'রাম নাম সত হ্যায়' ধ্বনি ভুলে যাবে লোকে, যেন সেইজন্যেই মানুষের মৃত্যু হয় এখানে। উদ্বেগহীন সহজে। জমি বা রাণ্ডি নিয়েও খুনোখুনি হয়,তবে ক্বচিৎ। রামজি ভরোসা।

পুলিশ কাজে দম পায় না—চোরের চুরির বখরা নেয়, গা ডলায় পা টেপায় তাকে দিয়ে, জল তোলায় কুয়ো থেকে, বেগড়বাই না করলে ছেড়ে দেয় দু'দিন পরে। দাঙ্গার প্রথম দু' দিনেই খুন হয়েছিলো উনত্রিশ জন, পাটনা থেকে রিজার্ভ পুলিশ এসে অবস্থা সামাল দিয়েছিল, সেই থেকে কাজ না করার ব্যাপারে তারা আরো নিশ্চিন্ত।

হাসপাতালও তেমনি। সুপারিনটেনডেণ্ট ডাক্তারের সাইকেলের টায়ার পাংচার হলে সেটা না সারানো পর্যন্ত গালাগালি দেয় সরকারকে, তখন তার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্টের ফুরসত হয় না রোগী দেখার। যে কুড়ি বাইশটা বেড আছে সেগুলো রোগীর চিকিৎসার জন্যে যত না, তার চেয়ে বেশি শুয়ে থাকার জন্যে। ডাগদারবাবুর আত্মীয়স্বজন এলে এবং কোয়ার্টার্সে জায়গা অকুলান হলে হাসপাতালের দু' একটা বেড খালি করে শুতে পাঠানো হয় তাদের। ছোটখাটো অসুখের চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু কেস একটু জটিল মনে হলেই চোখ বন্ধ করে চালান কেটে দেওয়া হয় ভাগলপুরে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে খাটিয়ায় বসে দুধ খেতে খেতে দয়ারামের খোঁজ করলেন মথুরানাথ। সে এসে খবর দিল লোকটার মুখে কয়েক ফোঁটা জল সে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার বেশিটাই গড়িয়ে পড়েছে দু' ঠোঁটের পাশ দিয়ে। মুখে নেযনি। বলল, গিরিধারী জানিয়ে গেছে পুলিশের আসতে দেরি হবে।

'কিঁউ?' চিন্তিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন মথুরানাথ।

'কেয়া মালুম, মালিক।' দয়ারাম বলল, 'এইসেহি বোলা। উয়ো হাবিলদার সাব কো বহুৎ টাট্টি হো রহা হ্যায় কাল রাতসে। চৌকিমে পুলিশ কম ছে।'

'হুঁ।' দু' পাশে দু' হাত ছড়ানো, কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর বললেন, 'কেয়া দেখা তুম? উয়ো জিন্দা হ্যায় না?'

'জি, মালিক। জিন্দা তো হ্যায়। এইসে লাগা কি মুণ্ডি ভি হিলায়া। ঔর—'

'ঔর কেয়া?'

'জি, উয়ো খৈনিবালা রঘুনাথ কহা, আপ ঘর আনেকে বাদ পিসাব ভি কিয়া। ঔর লোগ ভি কহা।'

দয়ারামের কথায় চিন্তা বাড়ল মথুরানাথের। মুখে জল নিল না, অথচ বলছে পেচ্ছাপ করেছে। সমস্তই লোকটার সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রতিপন্ন করে। যেটা আরো ভয়ের, যে-ধরনের ঘায়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে লোকটার, তার ওপর ক্রমাগত মাছি বসলে, রাস্তার ধুলো পড়লে রোগ আরো জাঁকাবে। এসব শরীরে ভিতরের আরো বিষাক্ত কোনো অসুখের

প্রভাব কি না কে বলবে! দয়ারামের কথা শুনে মনে হলো বেশ কিছু লোক ভিড় করে আছে ওখানে। কী দেখছে ওরা—এরকম ধুঁকতে ধুঁকতে কখন মরে যায় অপিরিচিত মানুষটা। এভাবে কি মরতে দেওয়া যায় মানুষকে!

বিপিন নেই এখানে। মামলা লড়তে গেছে পাটনায়, আজ কালের মধ্যেই ফেবার কথা। ও থাকলে পরামর্শ করে একটা উপায় বের করা যেত। তাহলে কি জানকীনাথ চৌধুরীকে খবর দেবেন? রামপুরের এম এল এ-র ঘনিষ্ঠ, জানকীনাথ ইচ্ছে করলেই একটা ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সে থাকে নাথচৌকের দিকে—বিকেলে যদিও নিজের গাড়ি চড়ে রোজই আসে এদিকে, টুঁ মেরে যায়, এখন অতটা দূরে কে খবর দেবে তাকে! গযাবামকে দিয়ে খবর পাঠালেও জানকীনাথ যে বাড়িতেই থাকবে তার নিশ্চয়তা কি?

একটা অধৈর্য ভাব দেখা দিল মথুরানাথের মধ্যে। ঘাম এলো শরীরে। খাটিয়াব ওপব পড়ে থাকা হাতপাখাটা তুলে নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না। হঠাৎ চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, 'বিন্দিয়া—ও বিন্দিয়া—'

বিন্দিয়া স্নানঘরে। পিছনের বাগানে ভিজে কাপড় মেলতে গেছে নীতা। জাঁতায় কলাই পিষছে লছমি। বস্তা থেকে কুলোয় কলাই বের করতে কবতে স্বামীর ব্যস্ত হাঁকডাক শুনে নিজেই বেরিয়ে এলো কৌশল্যা।

'কেয়া বাত হ্যায়? কুছ চাহিয়ে কেয়া?'

দবজাব পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে দেখতে দেখতে চিন্তাটা গুছিযে নিলেন মথুরানাথ।

'দুগো রুপেয়া জেরা লা দেও। দয়ারাম কো আসপাতাল ভেজনা হ্যায়—রিকশামে যায় গা—'

'আসপাতাল!'

'হাঁ। বাহার পেড়কে পাশ এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায়। আখির কোই তো খয়াল করে গা!'

ঘটনাটা লছমির মুখে আগেই শুনেছে ওরা। স্বামীকে চেনে, সুতরাং কথা না বাড়িয়ে টাকা আনতে ভিতরে গেল কৌশল্যা।

দয়ারামকে হাসপাতালে খবর দিতে পাঠিয়ে ফতুয়া চড়িয়ে, কাঁধে গামছা নিয়ে নিজেও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন মথুরানাথ।

অন্তত জন কুড়ি বিভিন্ন লোক তখনো জড়ো হয়ে আছে ওখানে। তাদের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকে, গনগনে রোদের মধ্যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভব করলেন মথুরানাথ। সেই একই ভঙ্গি; কিন্তু অসংখ্য মাছিতে ছেয়ে গেছে লোকটা। বিশেষত বুক ও অণ্ডকোষের দগদগে জায়গাগুলো যেন মৌমাছির চাক, মাছিতে প্রায় ঢেকে ফেলেছে ক্ষতগুলো। জমে আছে, উড়ছে, আবার এসে বসছে। মাছি চোখের পাতায়, পাঁজরের খাঁজে খাঁজে, ঠোঁটের ওপর। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল বুকের অল্প ওঠানামা। দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভিজে এলো মথুরানাথের। ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই গামছাটা টেনে নিয়ে ব্যস্ত হলেন মাছি তাড়াতে।

গামছার হাওয়ার ঝাপটায় মাছিগুলো ওড়াউড়ি শুরু করতে ছোয়া বাঁচানোর ভয়ে তাড়াহুড়ো করে পিছিয়ে গেল লোকগুলো। মনে হলো আরাম পেযে লোকটা কেঁপে উঠল একটু। মাথাটাও কাত করল সামান্য।

মথুরানাথ উঠে দাঁড়াতে ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি লোক মন্তব্য কবল, 'অব তো ফিন আপকো গঙ্গা মে জানে পড়ে গা, পণ্ডিতজি!'

'কিঁউ!'

মথুরানাথকে বিবক্ত দেখে যে মন্তব্য করেছিল সে ভয়ে ভযে বলল, 'দেখিয়ে না, অব পুরা মাছ্ছি তো আপহি কা বদন মে গিয়া। রাম জানে কোন জান।'

কথাটা ঠিকই। মথুরানাথ লক্ষ করলেন উড়ে যাওয়া মাছিব অনেকগুলোই এখন এসে বসেছে তাঁর ফতুয়া ও ধুতিতে। আবার ফিরে যাচ্ছে লোকটাব গাযে। কোনো জবাব না দিয়ে থমথমে মুখে বাড়ির দিকে এগোলেন তিনি।

হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ হয়নি। দয়ারাম ফিরে এসে বলল, 'ড়াগদাববাবু আভি নহি আয়া, মালিক। ডেপটিবাবু ভিতর থা, ভেট নেহি হুয়া। উয়ো চৌকিদার কহা কি, আনেসে খরবর দেগা—'

মথুরানাথ জবাব দিলেন না। মুখটা আরো একটু চিন্তিত হয়ে উঠল শুধু। নিঃশ্বাস পড়ল ঘন হয়ে।

এরপরেই একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মথুরানাথ। বাড়ির মেয়েদের ডাকলেন। দয়ারামের ঘরের পাশের ঘরটা খালি পড়ে আছে। ঘরটা ঝেঁটিয়ে দিক লছমি। খাটিয়া পাতুক। লোকটাকে রাস্তা থেকে ঘরে নিয়ে আসবেন তিনি।

মৃদু আপত্তি তুলল কৌশল্যা।

'শুনিয়ে জি, আপ ব্রাহ্মণ হ্যায—'

অন্যরকম দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মথুরানাথ।

'অগর মনুষ্যকে সেবা ব্রাহ্মণকে কাম নেহি হ্যায় তো আজ সে ম্যয় শূদ্র বনেঙ্গে।'

এ কথায় হকচকিয়ে গেল সকলে। মথুরানাথের এমন মূর্তি, এমন চোখমুখ কেউ দেখেনি আগে। যেটা আরো আশ্চর্যের, হঠাৎই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখের কোল বেয়ে। বিষণ্ণ হাতের উল্টোপিঠে সেটা মুছে নিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'হে রাম, হে কৃষ্ণ!'

নীতা কৌশল্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিন্দিয়া বলল, 'আপকা বিচার সহি হ্যায়, বাবুজি। আখির উয়ো তো এক মরিজই হ্যা। যাও দয়ারাম, বাবুজিকে সাথ যাও। ম্যয় ইধর বন্দোবস্ত্ করতি হুঁ।'

অনুগত দয়ারাম, দ্বিধা থাকলেও নিঃশব্দে অনুসরণ করল মথুরানাথকে।

রামপুরের মানুষ এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি আগে। ঘেয়ো, অচৈতন্য, জাতপাত না-জানা একটি রাস্তার মানুষকে বুকে কোলে করে বাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন

মানুষ। তাদের একজন কি না মথুরানাথ!

দৃশ্যটা দেখে কেউ ভয় পেল, কেউ নাক কোঁচকালো ঘৃণায়। সংখ্যায় অল্প হলেও, মাথাও নাড়ল কেউ কেউ। খবরটা চাউর হয়ে গেল চারদিকে।

লোকটাকে বাড়িতে এনে, খাটিয়ার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন মথুরানাথ। তিনি চিকিৎসক নন, কিন্তু শুশ্রূষা জানেন। ক্ষতস্থানগুলো সাবধানে মুছে বাঁটা চন্দনের প্রলেপ দিলেন সেখানে। জ্বরের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন; তারপর চামচে করে দুধ খাওয়ালেন যতটা পারেন। স্নেহের হাত বোলালেন মাথায়। লোকটার উলঙ্গ দেহের ওপর ঢাকা পড়ল পরিষ্কার চাদরেব। নাকের কাছে হাত এনে অনুভব করলেন নিঃশ্বাস সহজ হয়েছে অনেকটা। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে টিউবকলের জলে স্নান করতে গেলেন তিনি।

দুপুরে আব এক দফা ওষুধ আর দুধ খাইয়ে মনে হলো কিছুটা তেজ এসেছে লোকটার শরীরে। তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলেন তিনি।

বিকেলে কানহাইয়ালালজি, জানকীনাথরা এসে সব দেখেশুনে মাথা নাড়ল। যে যাই বলুক, কাজটা ঠিকই করেছেন মথুরানাথ। রামপুরের পুলিশ আর হাসপাতাল নিয়ে কিছু করা দরকার, বললেন জানকীনাথ। এমন অব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। যাক, লোকটার জ্ঞান ফিরুক, তারপর তিনি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

বিপিন ফিরল সন্ধের পরে। মামলায় জিতে খুশি; কিন্তু, মথুরানাথের কাণ্ড দেখে খুশি হয়েছে মনে হলো না। প্রায় ঠাট্টার গলায় বলল, 'ইয়ে তো করিব মহাত্মাজি কো কাম হো গিয়া। ইয়ে সন্দেশ রাষ্ট্রপতিকে পাস যানা চাহিয়ে—'

ছেলের মুখে এমন কথা আশা করেননি মথুরানাথ। ব্যথিত চিত্তে হাসলেন তিনি।

'তো তুম মেরা পুত্র নেহি হো!'

'আপ গলদ সমঝ রহে হে, বাবুজি। ম্যয় আপহি কা পুত্র হুঁ। লেকিন রামপুরকে আম জনতা আপকা পুত্র নেহি হ্যায়। অগর হোতা তো পিছলে বালা দাঙ্গা নেহি হোতা।'

মথুরানাথ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর আত্মবিশ্বাসে ঋজু গলায় বললেন, 'সায়দ—। লেকিন মেরা ধরম মুঝে হি পালন করনে হোগা।'

পরের দিন ভোরে যথারীতি গঙ্গস্নানে গেলেন মথুরানাথ। ফিরেও এলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গতকাল যেমন দেখেছিলেন তেমনি, দেখলেন বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে বাড়ির সামনে। সকালের রোদ তখন উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। সেই আলোয়, দেখলেন, একটা মোটরও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চেনা লাগল। কী ব্যাপার, বুঝলেন না। কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা চিন্তিত হয়ে ধীর পায়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা কিছুই বলল না।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হলেন মথুরানাথ। জানকীনাথ কথা বলছেন বিপিন আর বিন্দিয়ার সঙ্গে। তাঁকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল।

'কেয়া বাত হ্যায়! জানকীনাথজি আপ? ইতনা সুবহ্!'

গঙ্গজলের পাত্রটি মথুরানাথের হাত থেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল বিন্দিয়া।

'জি। আনেহি পড়া।' জানকীনাথ তাকালেন বিপিনের দিকে, 'তুম বোলো, বিপিন। আপ বৈঠিয়ে না, পণ্ডিতজি।'

মথুরানাথ বসলেন না। সন্দেহের চোখে তাকালেন বিপিনের দিকে।

'বাবুজি—', ইতস্তত করে বলল বিপিন, 'উয়ো আদমিকো আভি হটানা হোগা ঘরসে—'

'কিঁউ!'

'কারণ, উয়ো মুসলমান হ্যায়।'

স্তম্ভিত চোখে বিপিনের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া উয়ো হোঁস মে আয়া হ্যায়?'

'জি নেহি।' জানকীনাথ বলল, 'লেকিন সারে ওর লোক এইসে হি কহ্ রহা হ্যায়। উয়ো নাঙ্গা থা—বদনমে পহচান ভি থা—'

মথুরানাথের মুখে কথা ফুটল না।

'ইয়ে সচ হ্যায়, বাবুজি।' বিপিন বলল, 'কাল রাত দয়ারাম বোলা থা হমকো—বেহুঁস মে উয়ো মরিজ "হায় আল্লা" বোলা—'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সচেতন হলেন মথুরানাথ।

'ঠিক হ্যায়। লেকিন—, উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। আভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেবা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।'

'আপকা ধরম আপহি কো রহনে দিজিয়ে, পণ্ডিতজি।' কঠিন গলায় এবার বলল জানকীনাথ, সিচুয়েশন কুছ খারাপ লাগতা হ্যায়। কেয়া আপ রামপুরকে নেহি জানতে হেঁ। কেয়া আপ চাহতে হেঁ কি ইধর হামলা শুরু হো যায়—ফির এক রায়ট লাগে?'

তখন স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

জানকীনাথ বলল, 'উয়ো মরিজকো বন্দোবস্ত্ ম্যয় হি করুঙ্গা আপকো কোই হানি নেহি হোগা। আপ আরাম কিজিয়ে, পূজাপাঠ কিজিয়ে। ইয়ে ছোটিসি বাত হ্যায়।'

সম্ভবত তা-ই। সামান্য ঘটনা এটা। তবু বড় একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করলেন মথুরানাথ। অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে ঘোর লাগল তাঁর। কান গরম, জ্বালা করে উঠল চোখের কোণদুটো। নামাবলীর ভিতর দিয়ে পৈতে স্পর্শ করে শিথিল ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন তিনি, 'হে রাম! হে কৃষ্ণ!'

তার পরের ঘটনাগুলো ঘটল খুবই স্বাভাবিকভাবে। মথুরানাথ পা ধুলেন, গা মুছলেন, পুজোর ঘরে গেলেন, দুধও খেলেন। কোনো প্রশ্ন করলেন না কাউকে। যেন একটু আগেকার অভিজ্ঞতা ভুলে গেছেন তিনি, যেন প্রতিদিনের মতো আজও আরো একটা দিনমাত্র। রোদ আছে, হাওয়াও আছে; সবই প্রকৃতিস্থ। সামান্য গাম্ভীর্য আর অন্যমনস্কতা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটল না তাঁর

কৌশল্যাকে চিন্তিত দেখে বিপিন বলল, 'বাবুজি আপনা ধরম পালন কিয়া, বাকি যো সব ঔর লোগ কিয়া। ব্যস, এহি তো হুয়া! কেয়া বাবুজি ভি নেহি সমঝতে হেঁ ইয়ে সব।'

কৌশল্যা ভাবলেন, হয়তো। বিশেষ কো়ে পবিবর্তন তো তিনিও লক্ষ করছেন না মথুবানাথেব মধ্যে।

পরদিন ভোরেব অন্ধকারে প্রতিদিনের মতো গঙ্গাস্নানে বেরুলেন মথুরানাথ।

আব ফিবলেন না।

খবরটা রটনা হতে দেরি হলো না। বিপিন, দয়ারাম-সহ গোটা রামপুরের মথুরানাথের পবিচিত সব মানুষ ছুটল পীরপুর ঘাটের দিকে। দেখল একটু বা ঢেউয়ের আলোড়ন তুলে ধীর গতিতে বহে চলেছে গঙ্গা। গভীর টলটলে তার জলে তীরের মানুষের প্রতি কোনো মনস্কতা নেই।

কোথায় চলে গেলেন মথুরানাথ, কীভাবে গেলেন, কেউই জানতে পাবল না তা। ক'দিন অপেক্ষা করাব পবেও তাঁর দেহ ভেসে উঠল না কোথাও। তখন লোকে বলাবলি করল, প্রকৃত হিন্দু এই মানুষটির ধর্মাচরণে ভুল ছিল না এতটুকু। গঙ্গাই আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে।

কথাটা মনে ধবেছিল জানকীনাথ ও রামপুরের অন্যান্য নামী মানুষের। নিজেদের মধ্যে শলাপবামর্শ করে, এম এল এ-কে ধবে পীরপুর ঘাটের নাম পাল্টে দিল তারা। ঘাটেব ভাঙা সিঁড়িগুলো বাঁধানো হলো নতুন করে। বড় বোর্ড পড়ল—'মথুরানাথ ঘাট'। তার নীচে ছোট কিন্তু স্পষ্ট অক্ষরে 'কেবল হিন্দুয়ো কে লিযে'। সংক্ষিপ্ত করার জন্যে কেউ কেউ অবশ্য ওই ঘাটকে হিন্দুঘাট-ও বলত।

# উপমহাদেশ

## কিন্নর রায়

কাহিনী এভাবে শুরু হতে পারত।

...

মহাদেবকে হঠাৎ আসতে দেখে আঁকার তুলি মুখে ঢুকিয়ে লুকোল চিত্রকব। ছবি গড়ার অনুমতি নেয়া হয়নি মহদেবের কাছ থেকে। তাই অভিশাপ—যেমন পুরাণকথায় হযে থাকে। মুখের ভেতব ছবি আঁকার তুলি। সে তুলি অশুচি, তাই দেবতাব কোপ—তোরা জাতিচ্যুত হবি।

পুরাণেও জাত-পাতটি বড়ো ভারি লগুড়। একের পাপে সম্প্রদায ভাসে। চিত্রকররা সবাই হায় হায় কবে এসে পডল মহাদেবের পায়ে।—দেবতা, ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

মার্জনা-প্রার্থী এতজন। পাথর দেবতা বুঝি গলে। কিংবা পুরাণ অনুসারে তাকে গলতেই হয়। ক্রোধের আগুনে জল।—তোরা মুসলমানের সব নিয়ম মেনে চলবি। আব ছবি আঁকবি হিন্দু দেব-দেবীর, মূর্তি গড়বি। গান বাঁধবি।

পুরাণে বড়ো সহজে ঠিক হয়ে যায় জাতের ভাগাভাগি। ঢাল নেই, তলোযার নেই। রক্ত, আগুন, লুট, ধর্ষণ, লাঠি-বন্দুক-বোমা—বাবরি মসজিদ-রাম-জন্মভূমি, রাম-শিলা, কিছুই না। কিন্তু পুরাণের পাতাটি সামনে খোলা রেখে বেজে ওঠে সত্যি বন্দুক। চোখের সামনে ভাগলপুরের মুণ্ডহীন ধড়গুলির তা-তা-থৈ-থৈ।

গল্প শুরু হতে পারত চিত্রকরদের বাবা বিশ্বকর্মা আর মা স্বর্গবেশ্যাঅপ্সরা ঘৃতাচীকে নিয়ে। বিশ্বকর্মার বীজটি গর্ভে লালন করে ঘৃতাচী মা হয়ে যায় নবশায়কদের। মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, কংসকার, শঙ্খকার, সূত্রধব আর চিত্রকর—প্রচলিত লোককথায় এদের মা ঘৃতাচী, বাবা বিশ্বকর্মা। নয় ছেলের সর্ব কনিষ্ঠটির বংশধর চিত্রকবরা। এসব তো নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের গূঢ় আলোছায়া—গল্পে যা ইদানীং আসলেও আসতে পারে।

এত সহজে কিন্তু এ গল্প শুরু হয় না। রাধেশ্যাম চিত্রকর, থানা পিংলা, গ্রাম নয়া, জেলা মেদিনীপুর। তাকে নিয়ে কাহিনীতে ঢুকে পড়তে গিয়ে আরও জানতে পারি ভোটার লিস্টে একই সঙ্গে রাধেশ্যামের নাম রহিমতুল্লা। তার পেশা পট আঁকা।

হিন্দু নামের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানি নাম একটা রাখতে হয়। আমরা পটুয়া-শিল্পী। দশ পিঁড়ি—পুরুষ বা জেনারেশন—ধরে পট আঁকা রহিমতুল্লা এবং রাধেশ্যামের এ কাহিনী। চিত্রকরের প্রথম নামটি ইসলামি, যেমন জবেত-বিষ্ণুপদ, ওসমান-দুখুশ্যাম, জুম্মন-গুরুপদ, ইসমাইন-বনমালী, বাহার-রঞ্জিত, তাজ মহম্মদ-ননীগোপাল, আবেদ আলি-আনন্দ। এভাবেই রাধেশ্যাম বা রহিমতুল্লা কথা বলে।

আর নারীরা, তারাও—যেমন জৈগুন হয় কাজল, খাতুন হয় লক্ষ্মী। দূর গাঁয়ে আলতা-সিঁদুর-চুড়ি, দেশলাই-বিড়ি নিয়ে নিয়ে পৌঁছে যায় চিত্রকর-মেয়েটি। সারা দিনমান তার বাইরে কাটে। কোনো মেয়ে, সে তো দু-চার জনই—ঘরের পট আঁকে। সরা আঁকে। পুতুল গড়ে পুড়িয়ে বিক্রি করে। হাঁস, মুরগি, ছাগল, গোরু দেখে। তার পুরুষ গেছে অনেক, অনেক দূরে। কাঁধের ঝোলায় জড়ানো পট। পেটে খিদের আগুন।

পটুয়া পট দেখিয়ে গান শুনিয়ে...'খিতান' করলে চাল-ডাল পায়, খাবার, কিছু নগদ পয়সা। জড়ানো পট মেলে দিতে দিতে সে গায়—

নাগ লয়ে মনসা দেবী নাগ লয়ে যায়
অষ্ট কোটি নাগ নিয়ে মনসা চলে যায়
দুষ্ট বেনে আড়চোখে তার দিকে চায়
মনসা জগতের গুরু জয় বিষহরি
পদ্মফুলে জনম মায়ের মনসা কুমারী
তরজে গরজায় বেনা মোচড়ায় দাড়ি
কাঁধে করে নাচে বেনা হেঁতালের বাড়ি
সেই গালে বিষহরি আপনি শুনিল
কোরধ করিয়া চাঁদের ছয় পুত্র খেল

...

নয়া গ্রামের আকাশ এখন নীল হয়ে আছে। নিচু প্রায়ান্ধকার ঘরে যে সামান্য আলোর কটি ভাঙাচোরা লাইন, তার উজ্জ্বলতায় চোখের জ্যোতি কমে আসা রাধেশ্যাম পিঠ বাঁকিয়ে, ঘাড় গুঁজে, মেঝের ওপর ঝুঁকে আর্ট পেপারে তুলির টানে দেবীমুখ এবং শরীর গড়ে তোলার সাধনায়।

গল্প এখান থেকেও শুরু হতে পারে। রাধেশ্যামের হাতে এখন কিছু কাজ আছে। যাতে পয়সা আসবে। শহরের বাবুদের ঘর সাজানোর জন্যে লম্বা জড়ানো পট নয়, দেয়ালে টাঙানো যায়, এমন আয়তক্ষেত্রাকার আড়াপট চাই। নব্বই একশ দেড়শ—খদ্দেব বুঝে দাম। বাকিতেও চলে কেনাবেচা। আর ইদানীং সরকারি মেলায় শহরে, গাঁয়ে রাধেশ্যাম ডাক পায়। গান বাঁধে, পট আঁকে দেখায়। তার নিজের মুখ, হাতের কাজ ছাপা হয় খবরের কাগজে। বি. ডি. ও, জেলা সভাধিপতির সই করা সার্টিফিকেট, কিছু নগদ, কয়েক বেলার খাওয়া—এসব এখন হচ্ছে। বিদেশে তার পট যায়। বিদেশীরা জানতে আসে।

রাধেশ্যামের হাতঘড়িতে সকাল দশটা। ঘড়িটি তার পাওয়া। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চিত্রকরদের নিয়ে কাজ কবে বই লিখতে আসা কিম-এর উপহার।

ঘাড় গুঁজে ঢুকতে হয়, এমন ঘরের দেয়ালে খবরের কাগজ থেকে কাটা ভিলেন হিরো-হিরোইন। রঙিন ও শাদা-কালো শরীরী যৌনতা, ভায়োলেন্সর—আ গলে লাগ যা। এই সব ফোটোগ্রাফ সুলেমান-এর, শুকদেব চিত্রকর নাম নিয়ে দূর গাঁয়ে গাঁয়ে পটের

গান শুনিয়ে আসে।

বেলের আঠার মাড় দিয়ে তৈরি ছবির জমিতে ছাগলের ঘাড়ের লোম থেকে নিজের হাতে তৈরি তুলিতে রাধেশ্যাম প্রথমে হলুদ রঙটি বুলিয়েছে। আবহমানের সংস্কার এমনই। কাঁচা হলুদ দিয়ে তৈরি রঙের সঙ্গে বেলের আঠার মিশেল। পোকা লাগবে না। হাতের আঙুলে তুলির সরু ডাঁটি, বাঁশ ছুলে তৈরি। তার টানটোনে চিত্রকরের স্বপ্ন-কল্পনা রূপ পায়।

শহরে মনসা পট কিনতে চায় বেশি। বেহুলা-লখিন্দর, চাঁদ বেনে, লোহার বাসরঘর, সপ্তডিঙা, গদা বুড়ো। রাধেশ্যাম বিড়ি ধরায়! শস্তা লাইটারের আগুনে তার কম দেখা চশমাপরা দু চোখ, বসন্তের হালকা দাগ-আক্রান্ত মুখ, কানের একপাশ, টাক মাথা চকিতে আলোময় হয়ে উঠেই ঘরের আলোয় হাওয়ায় নিজস্ব মাত্রা নিয়ে ফুটে থাকে। চালভাজা হাঁড়ির কালিতে বেলের আঠা মিশিয়ে তৈরি রঙে রাধেশ্যাম দেবীর চুল আঁকে। শিমপাতা বাটা সবুজ, ঘুঁটের ছাইয়ের ধূসর কালো, পাকা পুঁইবীজের গোলাপি—এ-সবই ছবিতে সঠিক রংটি হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায়।

বাঁশের গজাল মেরে বেহুলা ভাসিল
ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা কত দূবে গেল
হেনকাল সীমন্তিনী ছয় ভাই এল
ভাই বলে ওগো দিদি প্রাণের ভগিনী
পচা মড়া লয়ে দিদি জলে ভাস তুমি
মা বাপের ঘরে দাদা আর নাইক সাজে
কুঁদুলা ছ ভাজের সঙ্গে সদাই দণ্ড বাজে
ঘরকে ফিরে চল দিদি আমরা সেবা নেব
ছটি বধূ তোমার নীচেতে খাটাইব।

...

বিড়ির আগুন ধোঁয়া এবং নিকোটিনের উত্তেজনা মিশিয়ে দিচ্ছিল রক্তে। বেহুলা কলার মান্দাসে ভাসছিল গাঙুরের জলে। উঠোনে ছাগল ভ্যাভাচ্ছে। এ ঘরের বাতাসে ভ্যাপসা গুমোট। চিত্রকর-নারী তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। আর এই শেষ বর্ষায়, প্রাক-শরতের রোদ ও নীলে আবহাওয়া যখন ভারি হয়ে আছে, তখন তার মনে পড়ে অর্ডারি পটের কথা। শহরে বারবার যাতায়াতের সূত্রে রাধেশ্যাম পয়সা রোজগারের কিছু ফাঁকফোকর চিনেছে। খবরের কাগজের অফিস, বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে তার পট লোক দেখে কিনতে চায়। সেখান থেকে কোনো একজনের চিঠি নিয়ে নতুন খরিদ্দারের সন্ধানে। তার সূত্রে আবার নতুনতর।

শুধু মনসা পট, কৃষ্ণলীলা, শ্রীমন্ত মশান (চণ্ডীমঙ্গল), সাবিত্রী-সত্যবান, দাতাকর্ণ, হরিশচন্দ্র, জগন্নাথ, সীতাহরণ, রাবণ বধ, দুর্গার শঙ্খবর্ণনা, মনোহর ফাঁসুড়িয়া আঁকে না রাধেশ্যাম অথবা নয়াগ্রামের আরও পঁচিশ ঘর পটুয়া।

মুসলমানি, সাঁওতাল পট ছাড়াও তার তুলিতে ফুটে ওঠে স্বাধীনতা দিবস, '৭৮-এর বন্যা—যার বর্ণনায় বন্যা দেখা, হেলিকপ্টারেব পেটের ভেতর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পাওয়া যায় রাধেশ্যামের পটে। তার সঙ্গে গান—কোথা ওগো জ্যোতি বসু / গরিবের ভগবান।

পণপ্রথা, বধূহত্যা বৃক্ষবোপণ, এমনকী ফরাসি বিপ্লবের ছবি এঁকে রাধেশ্যাম পৌঁছে যেতে পারে দুয়ারে দুয়ারে। মানুষ তো এখন এসবও দেখতে চায়।

অল্প বয়সে দাদা হলাম কৈড়া ষাঁড়ি
কত না ফেলাব দাদা নিরিমিষ্যির হাঁড়ি
ভাই সবকে পরিবোধ দিয়া ভাসিয়া চলিল
গদা বুড়ার ঘাটে মান্দাস উপনীত হল
গদা বুড়া বঁড়শি আডে গাঙুরের জলে
শুধু অন্ন খায়নে গদা রুই মাছ ধরে
দুই পায়ে গোদ গদা কাঁধে রামকুড়ি
আশেপাশে ফিকে গদা বঁড়শির দড়ি
যুবতী দেখিয়া গদা করে উপহাস
কহ কহ সীমন্তিনী কোন দেশে বাস
বেহুলাকে দেখে গদা জলে দিল ঝাঁপ
গোদেব ভারে উঠতে পারেনি বলে বাপরে বাপ
যেই মুখে বলেছিলি গদা রমণী বলে
সেই মুখে বলরে গদা গোদ জননী বলে
জননী বলিতে গদার ভাল হল
গদারে পরিবোধ দিয়া বেহুলা ভাসিতে লাগিল

...

ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখ ভারি হয়ে আসে, জ্বালা ধরে। এবং দৃষ্টি আরও ঝাপসা মনে হয়। কিছুতেই চশমাটি বদল করানো হচ্ছে না। পটের মনসা, চাঁদ বেনে, না‍া দল, বেহুলা, কলার মান্দাস সবই দেখতে গিয়ে কেমন যেন কুয়াশা ঘেরা। কোমরে লুঙির ফাঁস ঠিক করে নিয়ে বোমহীন বুকের পাটা, গালে গড়িয়ে নামা ঘাম বাঁ হাতের চেটোয় মুছে রাধেশ্যাম উঠে দাঁড়াতে চায়। তার পঁয়তাল্লিশের হাঁটু পায়ের গোছ পাতা কোমর এই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার স্থবিরতায় যেটুকু রস সঞ্চয় করে নিতে পেরেছে, তাতে ঝিনঝিনি বাড়ে। রক্ত চলাচলে সময় লাগবে। রাধেশ্যাম আবার বসে পড়ে। ধীরে ধীবে পায়ের দুটি পাতা নাড়াতে নাড়াতে শোণিত-তরঙ্গ ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে চায়।

দাওয়ায় ভাদ্রের চরমপন্থী রোদ্দুর। সূর্য এখন প্রায় মাঝ আকাশে। উঠোনে কাঁঠাল গাছের ছায়া ছড়িয়েছে। সেখানে চঞ্চল দুটি শালিক। সকালে যেটুকু পান্তা দিয়ে রক্ষামণি

—ভোটার লিস্টে যার নাম খালেদা, রাধেশ্যাম চিত্রকরের বিবাহিত স্ত্রী—দূর গ্রামে গেছে সিঁদুর-আলতা-চুড়ি নিয়ে—তার ফিরে আসার অনেক আগেই পান্তাটুকু শরীরে মিশেছে। ও-ঘরে সুলেমান অথবা শুকদেব চিত্রকরের স্ত্রী রাবেয়া তার সবে ষেটেরা পূজো পেরিয়ে আসা দিন-পনেরোর সন্তানটিকে নিয়ে একলা অন্ধকারে। হয়ত মাই দিচ্ছে, নয়ত শুয়ে। রাবেয়ার কোনো হিন্দু নাম নেই। তার বাবা-মা কেউই চিত্রকর নয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই কিশোরীর সঙ্গে সুলেমান অথবা শুকদেবের বিবাহে গ্রামীণ রাজনীতির জল কিছু ঘোলা হয়ে ওঠে। ফলে পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পার্টিবাবু, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা সভাধিপতি—সকলেই জড়িয়ে পড়ে। রাধেশ্যামের সেই পেটেন্ট বিশ্বাস এবং কথাটি —আমি শিল্পী—তাকে অনেকখানি আগলে রাখে। ঘোলা জলকে থিতিয়ে দেয় সময়।

ঐ অন্ধকার ঘরে রাবেয়া সুলেমান নাকি শুকদেবেব—সব কেমন ইদানীং গোলমাল হয়ে যায় রাধেশ্যামের—কন্যাটিকে বুকে আগলে থাকে। যেহেতু মেয়ে, তাই নাম হয়েছে বাবার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে, ছেলে হলে মায়ের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে হতো—এমনই নিযম। শুকদেবের মেয়ে সুমিতা। আসলে শহর, এবং শহুরে হিন্দুয়ানি রাধেশ্যামকে গ্রাস করে ফেলে অনেকখানি। কানে শোনা শহরের নামটি সে নয়া গ্রামে এনে বসায়, তার নাতনির গাযে।

দূরে বাসরাস্তা দিয়ে কারা যেন চোঙা ফুঁকতে ফুঁকতে ভিড্যো শো বলতে বলতে চলে যেতে থাকে। ভাদ্রের থমধবা হাওয়ায় সেই শব্দ কেটে কেটে বসে এবং একজন লোকশিল্পী—যে শহর এবং গ্রামের ধান্দাময় টানাপোড়েনে নিজেকে অনেকটাই অভ্যস্ত করে নিতে পেরেছে, তার পক্ষেও এই ভি.ডি.ও.-বাণী তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। আসলে পেটে টান পড়ে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়।

দূর গ্রামে পট দেখাতে গেলে বৌ-ঝি-রা আর তেমন করে পটুয়ার যত্ন করে না। বিস্ময়াবিষ্ট বালক-বালিকা, সদ্য বিবাহিত লাজুক কিশোরী একই পটের গান ও ছবি আবারও দেখতে-শুনতে চায়, এমন চিত্রমালা ইদানীং প্রায় অস্পষ্ট। এক টাকার টিকিটে দুটো কারেন্ট বই দেখা যায় ভি.ডি.ও. তাঁবুতে। আলাদা হল-ও রয়েছে। বাইরে সাইকেল রাখার বন্দোবস্ত থাকে।

ভিড্যো-প্রলাপ দূর বাতাসে মিলিয়ে গেল। রাধেশ্যাম কিঞ্চিৎ অস্থিরতায় মাথা নিচু করে দালানটি পেরিয়ে ঘরে এসে মনসার পটটি দেখে। ঝাপসা মতন চশমার কাচে তখনও পটের ঠাকুরেরা 'সদর' থেকে শুরু করে পর পর অন্যান্য ফ্রেমে। ঘরের বাতাসে এখনও কাঁচা বেলের আধা আর অন্যান্য রঙের ফিকে ঘ্রাণ। কাছাকাছি কোথায় যেন চড়াই ডাকছিল।

রাধেশ্যামের মনে হচ্ছিল এ-পট তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ওঠা দরকার।

গল্প এভাবে চলতে চলতে এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে যেতেই পারত—যেমন উৎসমুখ থেকে বহে আসা নদী নিয়মমাফিক সাগরে। কিন্তু গল্প যেমন রাধেশ্যামকে নিয়ে, তেমনই তার চারপাশের সময়কে ধরেও।

আসলে রাধেশ্যাম কখনই ভাবেনি সে আসলে কি! রহিমতুল্লা না রাধেশ্যাম! কিংবা সাঁওতাল পট দেখাতে গিয়ে পিলচু হড়াম-এর কাহিনী বর্ণনায় সেই হাঁস আর জলভরা পৃথিবীতে তার ডিমপাড়ার কিস্যা বলতে গিয়ে মনে হয়েছে, সে হয়তো কোনো বাস্কে, কিসকু, টুডু বা সোরেন। যার তীরের ফলা, আরণ্যক চিৎকারে জঙ্গল জ্বলে ওঠে। রক্তে খেলা করে কৌম বিশ্বাস।

ইদানীং কাহিনীর ঘোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সে মাঝে-মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করতে চায়—আসলে আমি কি রাধেশ্যাম, নাকি রহিমতুল্লা! আমাদেব নিজস্ব মসজিদ আছে, সেখানে নামাজ হয়। মুসলমানদের মসজিদে আমাদের যাওযার উপায় নেই। আমরা মৃত্যুর পর কবরে যাই। শুয়োব খাই না। গো-মাংস খাই। ভগবানের ছবি আঁকি, তাঁর নামে গান বাঁধি। আগে কড়াকড়ি ছিল, এখন হিন্দু মুসলমান সাঁওতাল—সকলের সঙ্গেই আমাদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয়। চৈত্র, ভাদ্র মাসে বিয়ে বাদ। আমাদের সুন্নত করা বাধ্যতামূলক। আর স্বপ্নে, নাকি লোককথায় ভেসে আসে মরুভূমির দৃশ্যাবলী!

আমরা কি তাহলে সেই সাধুর বড়ো ছেলের বংশধর? যিনি রোজ সকালে গোরু কেটে তাঁর দুই ছেলেকে দিতেন, আবার বিকেলেই বাঁচিয়ে তুলতেন গোরুকে! একদিন বড়ো ছেলে গোরুর পাঁজরের হাড় আর কোমরের কিছু মাংস গোবরেব ভেতর রাখল লুকিয়ে। সাধুর মন্ত্রে বিকেলে বেঁচে ওঠে গোরু। তার হাড় আর মাংস কম দেখে সাধুর রেগে ওঠা, বড়ো ছেলে দোষ স্বীকার করে। গোবর ঘেঁটে হাড়-মাংস আনতে গিয়ে দেখে সেখানে পেঁয়াজ আর রসুন গাছ। রেগে গিয়ে সাধু দিলেন শাপ। সেই বড়ো ছেলের ছেলেবাই হয়ে দাঁড়াল চিত্রকর। বহুবার শোনা এবং বলা গল্পের ভেতর নেশা থাকে। রাধেশ্যাম সেই রোমন্থনের নেশায় ছিল।

অস্তিত্বের এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে পেটের আগুনও গায় মিশে। ভাদ্রের রোদ দুপুরকে গ্রাস করেছে। হাঁড়িতে নিশ্চয়ই আরো কিছু পান্তা আছে। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা। তার আগে স্নান সারা দরকার। সকালেই মাঠ ফিরে এসেছে রহিমতুল্লা। কাঁঠাল গাছের ছায়াটি সরে গেছে। সেখানে এখন কোনো শালিক নেই।

...

কলকাতায় রাধেশ্যামের জন্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ছায়া আছে। নিজের আঁকা পোস্টকার্ড সাইজের ছোটো পট প্রেজেন্ট করে, আমার নাম রাধেশ্যাম চিত্রকর, গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা মেদিনীপুর বলে সে বহু জায়গায় কাঁধের পটভর্তি ঝোলাটি নমিয়ে রাখতে পারে। প্যান্টে সত্তর দশকের গোড়ার দিককার ডিজাইন—বেলবটম। নস্যি রংটি অনেকটাই ময়লা-রোদ-সাবানে মুছে এসেছে। জায়গায় জায়গায় বিড়ির আগুন এবং পোকার দাঁতের ফুটো। পায়ে শস্তা প্লাস্টিকের চপ্পল। গায়ে কটকি প্রিন্টের পাঞ্জাবি। তাতে ঘাম থেকে ফুটে ওঠা শরীরী নুনের ডিজাইন।

সুকুমারের বিজ্ঞাপন কোম্পানির অফিসে রাধেশ্যাম এভাবেই এসেছিল সমীরের চিঠি নিয়ে। পূর্ব ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটি ইংরেজি দৈনিকের বিজ্ঞাপন-

কর্মী সমীর। তার চিঠি, সুকুমার ফেরাতে পারেনি। আসলে সেদিন তার হাতে বহু কাজ সময়ে শেষ করার তাড়া।

সামনের সপ্তাহে বরং, আজ কিছু করতে পারব না। আপনি বরং দশটা টাকা রেখে দিন। অতদূর ফিরে যাবেন। সুকুমার আসলে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল।

রাধেশ্যাম টাকা নিতে প্রথমটায় একটু যেন কিন্তু করছিল। তারপর স্বাভাবিক ছন্দে দুটো পাঁচ টাকার নোট পকেটে রেখে, পোস্টাকার্ড সাইজের ন্যাতানো কাগজের ওপর আঁকা কতগুলো পট বের করে সুকুমাবকে বলল, দাদা, আপনার পেনটা একটু দিবেন?

সুকুমার তার ঝাপসা কাচে ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে ভাবছিল। তার টেবিলে অনেকগুলো লে-আউট করাব ম্যাটার, হেডিং ক্যাপশান, ব্রোমাইড পড়ে আছে। ছবি দিয়ে সাজিয়ে, ঠিকঠাক করে মাপমতো পাঠাতে হবে। বুক পকেট থেকে ডটপেন নিয়ে রাধেশ্যামের হাতে দিতেই, তা দিয়ে পটের গায়ে কাগা-বগা অক্ষরে নিজের নাম ঠিকানা লিখে পেনসুদ্ধু ওকে ফিরিয়ে দিল। 'রাধেশ্যাম চিত্রকর গ্রাম নয়া থানা পিংলা জেলা মেদিনীপুর। আমি এই পটটি দাদাকে উপহার দিলাম।'

হলুদ জমির ওপর সবুজ কালো আর গোলাপিতে ফুটিয়ে তোলা বিষহবি মনসা। ইন্টারেস্টিং।

আচ্ছা, আপনি দুর্গা আঁকতে পারেন? প্রশ্নের ভেতর দিয়ে সুকুমার যেন কিছু আবিষ্কার করতে চাইল।

পারি—ঘাড় নাড়ল রাধেশ্যাম। বেশ, আপনি সামনের সপ্তাহে আসছেন তো। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, সমীরকেও না। গোটা দুই বড়ো দুর্গা করে আনবেন। পছন্দ হলে ভালো দাম পাবেন। যদি শেষ না-ও হয়, তাহলে আমার বাড়িতে বসে বাকিটুকু—ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেই সুকুমার ভাবল শ্রীলেখাকে তো বলা হলো না —হট করে একটা উটকো লোক—শ্রীলেখা তো এরকমই বলে যাকে—যাক, আসুক তো তখন দেখা যাবে—ভাবতে ভাবতেই কথার শেষপর্বটুকু জুড়ে দিল সুকুমার—ঠিক আছে। এখন আপনি চলে যান।

সুকুমার আসলে তার অ্যাড এজেন্সির দুর্গাপুজোর গা-লাগোয়া নানান ক্যামপেইনে রাধেশ্যামের পটের দুর্গা। ক্যাপশান দিয়ে ভিসুয়ালি ফেলতে পারলে। ভাবতে ভাবতে অ্যাড এজেন্সির তিরিশ পেরোনো আর্টিস্ট সিগারেটে যেতে চাইল।

...

বাঁশদ্রোণী বাজারের পরের স্টপ ফায়ার ব্রিগেড, তারপরই উষা গেট। সরকারি বাস উষা গেটে দাঁড়ায় না। মিনি প্রাইভেট থামে। সুকুমার রাধেশ্যামকে নিয়ে যখন উষা গেটে নামল, তখন রাত নটা। নাকতলা মিনির পিঠের লাল আলো অন্ধকারেও চোখে পড়ল। এ-রাস্তা পেরিয়ে ওপারে। ডানদিকে সাইকেল রিকশ স্ট্যাণ্ড। একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। কাঠের ব্রিজের ওপর ওঠার আগে বাঁদিকে একটি স্টেশনারি, দর্জির দোকান। ডাইনে বাঁয়ে দুটি দোতলা বাড়ি। তারপর ঠিক ব্রিজের মুখে ডানদিকে ও বাঁদিকে

টালির চালের কাঁচাঘর কয়েকটা। আর নালার বুকে থোকা থোকা অন্ধকার, যার কোনো দিগন্ত নেই।

কাঠের সেতুর একদিকে কাঠ দিয়ে ঘেরা। হলুদ টিনের ওপর লালে সাবধানবাণী —ব্রিজ সারানো হচ্ছে, সাবধান। ইংরেজিতে লেখা এই সতর্ক করে দেয়া কথাসুদ্ধ টিন প্রায়ই মাটাডোর বা লরির গুঁতোয় মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্রিজের ওপরে উঠলেই চোখে পড়বে ব্যাঙ্কের বাড়ি। বাঁদিকে পিচ রাস্তা। খালের ধার ঘেঁষে কয়েকটি ঝাড়ালো গাছের ছায়ায় সাইকেল সারানোর দোকান, চুল কাটানোর সেলুন। এত রাতে তারা কেউ নেই। আরও এগলে পোলিওর ইনজেকশন দেয়ার বাড়ি, কেরোসিন তেলের ডিপো, চাযেব দোকান, মিস্টির দোকান, পাশাপাশি দুটি স্টেশনারি—উল্টোদিকে মেশিনে খড়কাটার দোকান—এসব পেরিয়ে, কয়েকটি কাঁচা ও পাকাবাড়ি পেবলে সুবোধ পার্ক। আরও একটু হাঁটলে ঘরবাড়ি, মাঠ, পুকুর, সেলুন, মিষ্টির দোকান। একই ছাদের নিচে পাশপাশি পার্টি অফিস আর ভি.ডি.ও. ক্যাসেট ভাড়া দেয়ার জায়গা। তাবপরই রায়নগর জলের ট্যাঙ্ক।

সুকুমার একটু আগে হাঁটছে। পেছনে কাঁধে ঝোলা নিয়ে রাধেশ্যাম। সুকুমার রিকশা নেয়নি। প্রায়দিনই তার হেঁটে ফেরা। রাধেশ্যাম, সুকুমাব—দুজনেই মাঝারি গতিতে হাঁটছে। ফলে রায়নগর পেরিয়ে মেটে মসজিদ আসতে তাদের ঠিক দশ মিনিট লাগে। দুটো ছবিই ফিনিশ করা বাকি। রং-তুলি সঙ্গে এনেছে রাধেশ্যাম। তার বাড়িতে বসে বাকিটা করে নেবে।

রিকশ স্ট্যাণ্ড, শনি-মন্দির, দু পাশের বাড়ি পেরিয়ে তারা সোজা এবং ডাইনে মুড়ে বটতলা পৌঁছে যেতে পারে। এখানে রাস্তায় হলুদ ভেপার ল্যাম্পের আলো পাওয়া যায়। এখন লোডশেডিং, তাই দুপাশের বাড়ি, কবরখানার ওপর আশফলের গাছ, বাজারে খাসি কেটে ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখার বাঁশের কাঠামোয় অন্ধকার লেগে থাকে। এলাকাটি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের। তাই তুলনামূলকভাবে আলো কিছু বেশি যায়। মানুষ এ-আঁধার আরও অন্যান্য অনেক কিছুর মতো মেনে নিয়েছে।

আজ বটতলায় লেদ কারখানার সামনে ক্যারামের আড্ডা, উত্তেজনা নেই। পূর্বাশার বাড়িগুলি আর উজ্জ্বল পার্কের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, তাব গায়ে বাতিহীন মফস্বলী রাত লেগে আছে। পিন কোডে কলকাতা ৭০০০৮৪, কিন্তু নাগরিক সুবিধের প্রায় ধারে-পাশে নেই, এমন একটি অঞ্চলে সুকুমার ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছে বছর খানেক। এল. আই. সি. থেকে পলিসি জমা রেখে চড়া সুদে হাউস বিল্ডিং লোন, পি. এফ. লোন, ব্যক্তিগত ঋণ—এসবই সুকুমারকে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজারের পাঁচশ স্কোয়ার ফিটের খাঁচা কেনার জন্যে করতে হয়েছে।

বটতলা থেকে বাদামতলা পৌঁছনোর রাস্তাটুকু আরও যেন আঁধার মাখানো মনে হয় সুকুমারের। পথে বার দুই বিড়ি ধরিয়েছে রাধেশ্যাম। বাজার, গৌরববাবুর ওষুধের দোকান, চিঠি ফেলার বাক্স, রাধা সুইটস, ওষুধের অন্য ডিসপেনসারি, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা, তাড়ির দোকান, রান্না করা গোরুর মাংস আর ভাতের হোটেল, টেলারিং

শপ পেবিয়ে তরকারির পাইকারি বাজারের সামনে কুকুরদের সমবেত চিৎকারে তাদের থমকে যাওয়া। ঠ্যালা বোঝাই করে তরকারি নিয়ে যাওয়া ব্যাপারীরা এইসব কুকুরদেব ধমকে চুপ কবতে বলছিল। সেখানে হ্যাজাকের আলো ছিল। আর পয়সার হিশেবনিকেশ। একটু পরেই পাকা মসজিদ। যার নতুন নাম ব্রহ্মপুর জামে মসজিদ। উল্টোদিকে সাইকেল, সাইকেল রিকশ সারাইয়ের দোকান, টাইপ শেখার স্কুল। দুটো স্টেশনারি কাম মুদি দোকান। ফলের দোকান। মসজিদের গায়ে পরোটা আলুর দম, চা-জিলিপি, ফল বিক্রির জায়গা। সবই বন্ধ। সুকুমার রাধেশ্যামকে নিয়ে পাতলা গ্রিলেব খোলা গেট পেরিয়ে হাউসিং কমপ্লেকসের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে টের পেল বাহাদুর টর্চ জ্বেলে তাদের আলো দেখাচ্ছে। মেটে মসজিদ থেকে এ রাস্তাটুকু আসতে আরও দশ মিনিট—কুড়ি মিনিট —কুড়ি মিনিটের হিশেব ঠিক আছে।

ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে—উপায় নেই, এখন বেল বাজানো যাবে না, সুকুমার তাদের বসার ঘরটিতে এনে রাধেশ্যামকে রাখে।

এখন নটা কুড়ি। অন্যদিনের তুলনায় সুকুমাব অনেক আগে এসেছে। অ্যান্টেনা জেগে। কাল শনিবার তার ইংলিশ মিডিয়ামের দীর্ঘ ব্যায়াম নেই। ভ্যান রিকশ, স্কুল বাস, হোমটাস্ক—স্কুলে পৌঁছনোর টেনশান।

হাউসকোট পরা শ্রীলেখা। রাতদিনের কাজের মানুষ পারুলদি ডাইনিং স্পেস, বান্নাঘর মাপে বড়ো শোয়ার ঘর—ওদিক ওদিক। ছোটো বেডরুমের অন্ধকারে রাধেশ্যাম আর তার কাঁধব্যাগ। সুকুমার একটা লণ্ঠন এনে রাখল। শোয়ার ছোটো ঘরটির লাগোয়া ফালি বারান্দায় অন্ধকারে জোনাকি। পলিথিনের দড়িতে প্লাস্টিকের রঙিন ক্লিপ। গামছা, জামা-কাপড়। তারও পরে অন্ধকার আকাশ, কমপ্লেকসের জমি, ও.এন.জি.সি. পার্ক করে দেবে—প্রস্তাবিত ফাঁকা জায়গাব ওপারে কাঁঠাল গাছ বাতাবিলেবুর পাতায় লোডশেডিং লেগে আছে। তাদের গায়ে উড়ন্ত জোনাকির ফুল।

আসলে সুকুমার কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। অ্যান্টেনা ঘরে উঁকি দিল একবার। তারপর মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।—রাধেশ্যামদা চা খাবেন? এমন একটি প্রশ্ন করে সে ছন্দে ফিরতে চাইল।

না।

রঙিন টেলিভিশন রয়েছে এ-ঘরে। কিছু বই-পত্র, ম্যাগাজিন। গ্রাফিক্স ডিজাইনের ওপর বেশ কিছু বড়ো ভলিউম। একটা সিঙ্গল বেডের হালকা খাট। দুটো ফঙ্গবেনে অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ার। রাধেশ্যাম তার ব্যাগ নিয়ে মোজাইক মেঝেতে বসেছিল। কলকাতায় পট বিক্রি করতে এলে তাকে বেশিরভাগ দিনই হাওড়া স্টেশনে শুতে হয়। নয়তো কাছাকাছি অন্য কোনো স্টেশনে। পুলিশ, রেলকর্মী চিনে গেছে। পটুয়াকে কেউ বিরক্ত করে না। তার বদলে এমন ছাতের নিচে, সঙ্গে রাতের খাবার—রাধেশ্যাম হিশেব কষছিল, নিশ্চিন্তে ঘুম দেয়া যাবে।

কাল সারাদিন বসিয়ে ওকে দিয়ে দুর্গার পট-ছবি ফিনিশ করাতে হবে। তারপর

কলার ট্রান্সপারেন্সি তুলে।—এসব ভাবতে ভাবতে সুকুমার জামা-প্যান্ট ছাড়ছিল।—হাত মুখ ধুয়ে নিন রাধেশ্যামদা। খেয়ে নেয়া যাক। কখন আলো আসবে কোনো ঠিক নেই।

একটা পটের গান শুনবেন? মেঝেয় বসে বিড়ি ধরাতে ধরাতে জিগ্যেস করল রাধেশ্যাম।

টেরাকোটা অ্যাশপট এগিয়ে দিতে দিতে সুকুমার বুঝতে পারছিল না এতে এই পাঁচশ স্কোয়ার ফিটের দমবন্ধ পরিবেশ হালকা হবে, না গুমোট আরও বাড়বে।

বৌদি, খোকাকে ডাকুন না। আমরা শিল্পী—আর এভাবেই তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাধেশ্যাম জনসংযোগের তীরটি নিক্ষেপ করে। এবং যেহেতু শহর, তাই এখানে বৃক্ষরোপণের পট-গানটি উপযোগী হবে—এই তাৎক্ষণিক ভাবনায় রাধেশ্যাম গাইতে শুরু করে।

ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ
গাছ লাগাইলে পরে মানুষের উপকার করে
বাতাসে নিঃশ্বাস ধরে গাছেরই ধরন
ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ

...

গানের সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো পটটি খুলে যায়। হারিকেনের ঘোলাটে হলুদ আলোয় ঘরে বিষাদ জমেছে। দেয়ালে কিছু ছায়ার ভাঙচুর। রাধেশ্যামের মুখ দেখা যায় কি যায় না। কিন্তু তার ঈষৎ অনুনাসিক উচ্চারণে গান ভেসে বেড়ায়। আর পটের হলুদ জমির ওপর সবুজ গাছ, বাবরি-চুলো মানুষ, মাছ—সবই যেন-বা আধুনিক ভাবনার হয়েও পুরাণ-প্রতিমা।

এবং তখনই রাধেশ্যাম চিত্রকরকে অন্যতম এগজিবিট হিশেবে দেখিয়ে নিজেরও কিছু মান বাড়বে এমন আশায় শ্রীলেখা একতলার মিসেস পিচুমণি দোতলার পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস সান্যাল আর তিনতলার মিসেস বকসিকে ডেকে আনে।

রাধেশ্যাম গান গাইতে গাইতে অঙ্ক কষে—এদের একজনও যদি তার পট কেনে, তাহলে আর সামনের বারের গাড়িভাড়াটা উঠে যাবে। নাতনির জন্যে নিয়ে যাওয়া যাবে কিছু। এ সবই মস্তিষ্কের ভেতরে যোগ-বিয়োগ হতে থাকে। আর তার গলা শোনা যায় অন্ধকারে।

গাছ থাকিলে পুকুর পাড়ে মাছ কিন্তু
তিন গুণ বাড়ে
মাটিকে সে আঁকড়ে ধরে বসে না কখন
ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ

তাল গাছ থেকে উপকার পাই তালগুড় আর
মিছরি ত খাই

উপকারের তুলনা নাই সবার প্রয়োজন
নারকেল গাছ থেকে উপকার পাই নারকেল
কত কাছে লাগাই
ডাব জল ঢালে শিবের মাথায় শাস্ত্রেতে লিখন

...

হারিকেনের আলোয় ছোটো বেডরুমটিতে গাইতে গাইতে পট মেলে ধরে রাধেশ্যাম, হলুদ জমির ওপব কালো, সবুজ, ধূসর, গোলাপি রঙের ফিগার-ড্রইং দেখাতেই থাকে। রঙিন টেলিভিশন পর্দায তাব ছায়া বুঝি কেঁপে ওঠে।

মিসেস পিচুমণি, মিসেস বকসি, মিসেস সান্যাল এই অদৃষ্টপূর্ব প্রদর্শ-বস্তুটির জন্যে সুকুমার-শ্রীলেখাকে বার বার ধন্যবাদ দেন। রাধেশ্যাম একসময় গান ও পট থামিয়ে দেয়।

রাতে খাওয়ার পর ছোটো বেডরুমটির মেঝেতে মশারি খাটিয়ে রাধেশ্যাম। সিঙ্গল খাট অন্ধকাবে ফাঁকা পড়ে থাকে। ডাইনিং স্পেসে পারুলদি—যেমন রোজ শোন। এবং শোওয়ার ঘরে খাটের ওপর অ্যান্টেনাকে বর্ডার লাইন রেখে শ্রীলেখা-সুকুমার।

ছেলের কাল স্কুল নেই, বাব্বা! বলতে বলতে শ্রীলেখা সুতির ম্যাকসি পা পর্যন্ত টেনে দেয়। কমপ্লেকসের উঠোনে যে টিউবগুলি একা একা সারারাত জ্বলে তাদের কোনো একটার চোরা আলো এসে পড়েছে শ্রীলেখার লম্বাটে পায়ের পাতায়। মিনিট পনেরো আলো এসেছে। ব্রাউন রঙের নতুন সিলিং ফ্যানের তেমন কোনো শব্দ নেই।

ও কি কালকেও থাকবে? উল্টোদিকে মুখ ফেরানো শ্রীলেখা জানতে চাইল।

কাজটা হলেই চলে যাবে। ওর আঁকা দুর্গা দিয়ে লে-আউটটা যদি পছন্দ হয় ভিসুয়ালাইজারের, তাহলে আমার গুরুত্ব বাড়বে কোম্পানিতে। পার্টি অ্যাড ক্যামপেইন অ্যাকসেপ্ট করলে হয়তো ক্যাশ ইনসেনটিভ।

কোথা থেকে কাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে—বাকি কথাটা বোধহয় নিজের ভেতর চিবিয়ে ফেলল শ্রীলেখা।

ইনসেনটিভ দিয়ে তোমায় নির্ঘাৎ একটা বালুচরি।

শ্রীলেখা চিৎ হয়ে শোয়। অ্যান্টেনা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ইন্টারেস্টিং কি জানো!—একটু খেজুর করে সুকুমার আসলে শ্রীলেখাকে একবগ্‌গা গোঁ ধরে থাকার বিন্দু থেকে ফেরাতে চাইছিল। ওরা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীর গান, আমাদের মতো নাম—আবার একটা করে ইসলামি নামও—এবং কি মনে করে, একটু থেমে সুকুমার বলল, আবার মুসলমানরাও ওদের নিজেদের মনে করে না।

মুসলমান! শ্রীলেখা প্রায় চমকে, যেন-বা আর্তস্বরেই বেজে উঠে বিছানায় বসে। তার গভীরে আজন্ম লালিত সংস্কার। ঘৃণার বিষ—যা কিনা তার বাবার থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া—দেশভাগ, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালি—ভ্রান্ত একপেশে ইতিহাস।

—তুমি শেষ পর্যন্ত, মুসলমানকে, ওর এঁটো থালায় কাল আমরা যে কেউ ভাত

খাব। পারুলদি ওর এঁটো পরিষ্কার করেছে। বাসন মাজবে। জানলে পরে কুরুক্ষেত্র। লোক চলে গেলে আর পাওয়া যাবে! কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে তোমার?

সুকুমার বুঝতে পারে ভুল জায়গাটিতে চাল দিয়ে ফেলেছে। এ চাল ফেরত হয় না। তার মনে রাখা উচিত ছিল মসজিদ-কবরখানার এত কাছাকাছি ফ্ল্যাট কেনাতেও শ্রীলেখার আপত্তি ছিল। কিন্তু তাদের বাড়তি টাকা নেই, কদিন বাদে এ-ও পাওয়া যাবে না—এমন চেতাবনিতে শ্রীলেখার নরম হওয়া।

এই সেদিন কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে...কলকাতার ভালো চায় বড়ো বড়ো হোর্ডিং পড়েছিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে। দুর্নীতি-মুক্ত প্রশাসন, হকারবিহীন ফুটপাথ, কর্পোরেশনের খরচে পুরনো বাড়ি সারানো, রাস্তায় রাস্তায় সুলভ শৌচালয়, পৌরট্যাক্স কমানো—আরও নানান স্বপ্ন প্রস্তাব। সঙ্গে দেয়াল লিখনে সব ধর্মেব নাগরিকদের সমান অধিকারের, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি ছিল। শ্রীলেখা কী এসব হোর্ডিং, দেয়াল লিখন, লিফলেট পড়েছে? জানে!

সুকুমাব কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না। তার, সামনে এখন সমস্যা হিশেবে দাঁড়িয়ে শুধুই লে-আউটটুকু করানোর ভাবনা। চাপা গলায় বলে উঠল, আস্তে বলো। রাধেশ্যাম শুনতে পাবে। পারুলদিও। তাতে কেলেঙ্কারী বাড়বে।

এই উপমহাদেশের মতোই একই সঙ্গে দুটো—হিন্দু এবং মুসলমানি নাম নিয়ে বেঁচে থাকা চিত্রকররা আসলে রহমতুল্লা না রাধেশ্যাম—এমন প্রশ্ন সুকুমারকে খুঁচিয়ে মারছিল না। তার কাছে অস্তিত্বের সংকটও কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়ায়নি।

এই মুহূর্তে রাধেশ্যামকে দিয়ে দুর্গা আঁকিয়ে অফিসে নিজের পায়ের তলার মাটিটি আরও মজবুত করার ভাবনায় বিভোর ছিল সুকুমার। তার জন্যে কিছু তো ছাড়তেই হবে। আপাতভাবে বাঁচার চেষ্টায় সে আবারও শ্রীলেখাকে তার অফিসের পজিশন, ক্যাশ ইনসেনটিভ, বালুচরি শাড়ি মনে করিয়ে দিতে চাইল। এই স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর্বগুলিতে শ্রীলেখা উত্তাল ছিল। পরে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যাওয়া।

ও-ঘরে নাইলন মশারির নীলিমার গভীরে, বিছানায়, ফ্যানের হাওয়ায় নিশ্চিন্ত ঘুমে ছিল রহিমতুল্লা এবং রাধেশ্যাম। তার স্বপ্নে নয়ার বাড়ির উঠোনে কাঁঠাল গাছটির ছায়া ভেসে ডুবে যাচ্ছিল। স্বপ্নের রঙে অনেক জ্যোৎস্না।

...

যেমনটি উপমহদেশে হয়ে থাকে।

# বোকাবুড়ো

## কিন্নর রায়

### ১। জয়শঙ্করের জগৎ

খুব ভোরে উঠলে জয়শঙ্কর সাকসেনার তেমন কিছু করার থাকে না। তবু অভ্যাস, সেই বেয়াল্লিশ সালে প্রায় দুবছর টানা নৈনি জেলে থাকার সময়। ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় পিঠ দিয়ে থাকা যায় না। এখনো ভোর হয় নি স্পষ্ট করে। দূরে পরেটের ওপর বিশাল অশ্বত্থ গাছটি হিম-কুয়াশার আড়ালে আবছা ছবি। তার ডাল, পাতা, মাটি ছোঁয়া, ছুঁতে দূরে চাওয়া ঝুরি, ইটে বাঁধানো চারপাশে—সবই কুয়াশার ওপারে।

পুরোনো ইটের তিরিশ ইঞ্চি দেয়াল একতলায়। সামনেটা খাপরার চাল। দোতলা একটু ফ্যান্সি, ঝকঝকে। এই কুয়াশার ভেতরই সামনের উঠোনে গোলাপায়রার ঝাঁক নামে। দুটি তিনটি কাক। পায়রাদের জন্যে গম বরাদ্দের আছে। কাকেরা বাসি রুটির টুকরো। এই সব পাখ-পাখালিকে নিজের হাতে খাওয়ানোর অভ্যেস জয়শঙ্করের, সেও অনেক পুরোনো। নৈনি জেলে থাকতেই।

একতলার বাইরের দেয়ালে অর্ডিনারি এলামাটির রং। কাঠের ভারী সদরদরজা। তার গায়ে আয়তাকার কাঠের প্লেটে দেবনাগরী হরফে জয়শঙ্কর সাকসেনা। বি এ, এল এল বি। পুরানা কাটরা, ইলাহাবাদ। নাম-ঠিকানা লেখা কাঠের পাতটি লালচে। তার ওপর শাদায় পতা অর নাম।

ভাঁড়ারঘরের দরজার শেকল খুলে পেতলের বড় বালতি থেকে মুঠো করে গম আনেন জয়শঙ্কর। এজন্যে নিচু হলে তার গায়ের পুরু সুতির চাদরটি মেঝেয় লুটোপুটি খেতে চায়। হাতের মুঠোয় গম নিয়ে, চাদর সামলে কোমর সোজা করেন। এ ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিতে দিতে 'আঃ আঃ' ডাক খুব ধীরে দিলেও ডানার শব্দ পাওয়া যায়। খাপরার চাল থেকে কুয়াশামাখা বাতাস ছিঁড়ে দিতে দিতে নেমে আসে কবুতরের ঝাঁক।

জয়শঙ্কর তাঁর উঠোনে গম ছড়িয়ে দেন। শীতের কুয়াশা একটু-একটু করে ছিঁড়তে থাকে ডানার শব্দে। এরপর রান্নাঘরের প্রায় একই ধরণের দরজা সেই একই কায়দায় খুলে কাঁসার বড়, ভারী জামবাটির পেতলের ঢাকা, তার ওপর চাপা দেয়া নোড়া সরিয়ে গোটা দুই রুটি তুলে নেন। রান্নাঘরের সিমেন্টের মেঝে থেকে হিম উঠে আসে। তাঁর পায়ের পাতা বেয়ে সেই শীতলতা বুঝি-বা শরীরকে ধরে ফেলে। জয়শঙ্কর লাইট জ্বালেন নি, তাই ঘরের ভেতর থিতু হয়ে আছে আবছা অন্ধকার। কাঁসার বড় জামবাটিতে ঢাকা দিয়ে তার ওপর নোড়া চাপা দেয় নীরজা, যাতে না ইঁদুর রুটি নিয়ে পালায়।

রুটি হাতে দাওয়ায় এলে পায়রার ঝাঁক তাঁর পায়ের শব্দে ঝটপট ডানা আছড়ে একটি বড় ফুলের মালা হয়ে আকাশে ওড়ে। তারপর খাপরার চালে বসে নিজস্ব ভাষায় বক্ বকম। বক্ বকম। রুটি ছিঁড়ে হাতে করে দাঁড়ালেই কোথা থেকে যেন ডানা ঝাপটে উড়ে আসে কাক। তাদের ঠোঁট ফাক করলে ধোঁয়া বেরোনো দেখতে পান জয়শঙ্কর। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় কেউ কেউ। 'ক্ব ক্ব ক' শব্দ রুটি ভাগাভাগিতে মন দেয়। জয়শঙ্কর দুহাতের চেটো ঝেড়ে নেন। একবার, দুবার, তিনবার। গমের ধুলো, রুটির গুঁড়ো তাঁর হাত থেকে খসে খসে পড়ে। এমন ছবি রোজই।

এরপর জল তোলা পর্ব। সিতারা কাহার আসবে বর্তন মলতে। বাসন মাজবে আব নিজের মনে কথা বলে যাবে। নীরজা তখন রান্নাঘরে। গ্যাস আভেনে নীলচে আগুন। শোঁ শোঁ শোঁ শব্দ। কি এত বলে সিতারা, সব সময় মনে রাখতে পাবেন না জয়শঙ্কর। তিনি জল রঙের পলিথিন পাইপ দিয়ে বড় ড্রামে জল ভরতি করতে থাকবেন, নিচু কলটি থেকে। নগরমহাপালিকা দিনের পর দিন ট্যাক্স বাড়াচ্ছে। আর জল, রাস্তা-ঘাট, কোনো দিকেই তেমন নজর নেই। মনে পড়ল বছর কুড়ি আগেও জলের এরকম হাহাকাব ছিল না শহরে; দিন রাত জল। কল খুললেই মোটা স্রোত। আর এখন জলও খরচ করতে হয় হিশেব করে।

পলিপ্যাকে 'পরাগ' কোম্পানির দুধ আসবে এখনই। পপ্পু দিয়ে যাবে। পুরানা কাটরায় এখনো বিশাল আহির পল্লি। সেখানে অনেক, অনেক গোরু-মোষ। খাটাল। সকাল থেকে দুধ দোয়ার ব্যস্ততা। গাহক্‌দের ভিড়। নীরজা কিন্তু বলবে 'পরাগ'-দুধে ভাল চা হয়! চায়ের স্বাদ, রং—দুই-ই ভাল জমে। জয়শঙ্কর এসব বুঝতে পারেন না। তিনি সকালে এক কাপ চা খান। তাও শুধু লিকার, চিনি ছাড়া। নিজের হাতে বানিয়ে নেন গ্যাস জ্বেলে তারপর হেকিম মির্জা আলি শা শাহেবের কথামতো এক চামচে আদার রস ঢিমে আঁচে কুনকুনে গরম করে তার সঙ্গে দিহাত থেকে আনানো খাঁটি মধু এক চামচ মিশিয়ে হেকিমশাহেবের দেয়া এক পুরিয়া শাদা গুঁড়ো। সবটা গেলাশে মিশিয়ে ঢক করে গিলে ফেলা। যেটুকু তলানি লেগে থাকে, তা গরম জল ঢেলে গেলাশ নাড়িয়ে আবারও গলায়।

হেকিমশাহেব গোটা শীত এইভাবে খেয়ে যেতে বলেছেন। তাতে নাকি আমার পুরোনো ব্রঙ্কিয়াল ট্রাবল, অ্যাজমা অনেকটা চাপা পড়বে, এমন ভাবনার ভেতরই জয়শঙ্কর দুবার কেশে ফেললেন।

সদরদরজায় সাইকেলের ঘন্টী। বোধহয় পপ্পু এল। বাপ-কাকার গোরু-মোষ, দুধের ব্যাবসা, সব ঠিক ঠিক আছে। আর পপ্পু যাদব নিয়েছে 'পরাগ'—পলিপ্যাক মোড়া দুধের এজেন্সি। সদর সামান্য ফাঁক করতেই জয়শঙ্কর দেখতে পেলেন সাইকেলের ওপর কুয়াশা-মাখা পপ্পু। তার মাথায় কান-মুখ ঢাকা উলের মাঙ্কি ক্যাপ। ফুলহাতা সোয়েটার হাতে গ্লাভস। সোয়েটারের ওপর চাদর।

পপ্পুর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো থলিতে 'পরাগ'-এর প্যাকেট। সাইকেল

দেয়ালে ঠেস দিয়েই পপ্পু মাটিতে নেমে এল। দুটি 'পরাগ'-এর প্যাকেট হাতে তুলে জয়শঙ্করের দিকে এগোতে এগোতে বলল, জয় রামজিকি ভাইয়া—

জয় রামজিকি—বলতে বলতে ডান হাতটি কপালের দিকে সামান্য তুললেন জয়শঙ্কর। আকাশি রঙের ফুলহাতা সোয়েটারের হাতার কিছুটা দেখা গেল খাদির চাদর সরে যেতে। ব্যস, ওইটুকুই। জয়শঙ্কর হাত নামালেন। ঠাণ্ডায় পপ্পুর দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কুয়াশায় তার মুখটি তেমন স্পষ্ট নয়। তার ওপর হনুমান টুপির ছায়া আছে। সব মিলিয়ে পপ্পু যাদবের মুখরেখা জয়শঙ্করের চোখে আবছা হয়ে যেতে থাকে। এমনকি কিশোর পপ্পু মোচ্ রাখার পর—শুধু রাখা নয়, তা তরিবত করে করে ঘন রেখায় স্পষ্ট করে ফুটিযে তোলার ধারাবাহিক চেষ্টা ও আংশিক সফলতার পর যেটুকু পুরুষত্ব, তা নিয়ে কতবার ঠাট্টাও করেছে নীরজা—অব পপ্পু লায়েক হো গয়েস, মোছা রখ রহা হ্যায় —তাও এখন কুয়াশার আড়ালে। শুধু 'জয় রামজিকি ভাইয়া' বলার সময় পপ্পুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া চারপাশে ঝুলে থাকা ভারি পরদার গায়ে মিশে যেতে দেখলেন জয়শঙ্কর।

'পরাগ'-এর পলিপ্যাক হাতে নিতে নিতে বরফের গভীরে রাখা ঠাণ্ডাটুকু টের পেলেন, হাতের চেটোয়, আঙুলে বুঝি-বা ছ্যাঁকা লাগল। আর তখনই তাঁকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল রাকেশ। কুয়াশার আড়ালে তার চেহারা বড় তাড়াতাড়ি মুছে গেল। জযশঙ্কর জানেন রাকেশ এখান থেকে বিবেক শুক্লার বাড়ি যাবে। তারপব সেখান থেকে সাইকেলে দুজনে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক।

আমাদের যৌবনে এর নাম ছিল অ্যালফ্রেড পার্ক। ১৯৩১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ। আজাদির পর সেখানে চন্দ্রশেখবের মূর্তি। পার্কের নাম বদলে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক। এখন ওখানে শাদা শার্ট, খাকী প্যান্ট পরা রাকেশরা গৈরিক ধ্বজের সামনে—ভাবতে ভাবতে বড় করে নিশ্বাস নিলেন জয়শঙ্কর।

রাকেশ সাকসেনা আমারই ছেলে—এমন ভাবনার ভেতর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হলেন। পায়ের পাতায় বহুদিন আগে বিঁধে যাওয়া কাঁটা হঠাৎ ব্যথা হয়ে জেগে উঠলে যেমন হয়, তেমনই কোনো কষ্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়ে পারলেন না। যন্ত্রণা জড়িয়ে গেল সারা শরীর মনে।

'পরাগ' দুধের পলিপ্যাকের একটি কোণ ডান হাতের দু-আঙুলে ধরে খুব ধীর পায়ে তিনি উঠোন পেরিয়ে উঠে আসছিলেন। সেখানে তখনো গমের দু-একটি দানা। এক টুকরো বাসি রুটি, এসবই চোখের বাইরে থেকে গেল। বারান্দায় উঠে এসে কাঠের বেঞ্চে নিজেকে বসিয়ে দিতে দিতে দেখতে পেলেন সামনে তেমনই কুয়াশার আড়াল। দুধের পলিপ্যাক নিজের পাশে নামিয়ে রাখলেন যত্নে, নীরজা উঠে ব্যবস্থা করবে। আর তখনই দরজায় আবারও কড়া নাড়ার খটখট শব্দ। তবে কি মহারাজিন, এত তাড়াতাড়ি বাসন মাজতে।

চওড়া কালো ফ্রেমের ভারি চশমা নাকের ওপর সামান্য নেমে এসেছে। মাথার প্রায় শাদা হয়ে যাওয়া সব চুল সকালে খানিকটা এলোমেলো। তাই চওড়া কপালের ওপব ঝুঁকে এসেছে। এখনো দাড়ি কামানো হয় নি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে তামাটে গাল জুড়ে অসংখ্য শাদা শাদা বিন্দু চোখে পডবে। এমনিতেই দাড়ি কামানোয় আলসেমি। রাজনীতি করতে গিয়ে তাব শিকড় আরো গভীবে ছড়াল। চুলে তেল না দেযা, বাহার করে সিঁথে কেটে না আঁচড়ানো, গালে দু-এক দিনের দাড়ি—সবই জড়িয়ে গেল বামমনোহর লোহিয়া, নরেন্দ্র দেব আর জয়প্রকাশ নারায়ণের নামের সঙ্গে।

দরজায আবারও কডা নাড়ার শব্দ। বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে, উঠন পেরিয়ে এসে কওন —এটুকু নিজের অভ্যাসে বলে দিতে পারেন জয়শঙ্কর।

ম্যায়। রাজেশ।

রাজেশ! নিজেব প্রথম সন্তানের নাম শুনে কেমন যেন বিহুল হন। ইণ্ডিয়ান নেভির অফিসাব। বম্বেতে পোস্টেড। আই এন এস আংগ্রে। দুর্ধর্ষ মারাঠা নৌ সেনাপতি কনোজি আংরে, নাকি আংগ্রে—তাঁব প্রতি শ্রদ্ধায়—এই জাহাজের নাম। রাজেশ সবার বড়। তারপব সবলা, বিয়ের পর এখন মোগলসবাইতে। জামাই রেলে চাকরি করে। সবলার পব শান্তি। বিয়েব পর কানপুর। জামাই ইউ পি গভমেন্টের এমপ্লয়ী। বিয়ের সময় লখনৌতে পোস্টেড ছিল। বদলির চাকবি।

দবজা খুলতে খুলতে বুকের ভেতব আহ্লাদেব একটা চোরাস্রোত বয়ে যেতে লাগল। আমার ছেলে, নেভি অফিসার রাজেশ সাকসেনা।

সব ঠিক হ্যায় না—দরজার একটি কপাট খুলে সন্তানের দিকে তাকিয়ে এটুকু বলে উদ্বেগমুক্ত হতে চান। তাঁর মাথা ছাড়ানো রাজেশের নেভি ব্লু ব্লেজার, আকাশ-নীল জিনসের ব্যাগিস। পায়ে শাদা নর্থস্টার। ডান হাতে একটা বড় স্যুটকেস। ছোট স্যুটকেসটি তখনো রিকশায়।

ইকা কিরায়া মালিক, আবাহিন মহেঙ্গা সব কুছ—
শালে ভোঁসড়ি কাঁহিকে ইসিলিয়ে পুলিশবালে তুম লোঁগকো—
কা বতায় সবকার, গরিব আদমি—একঠো রুপেয়া অওর দেইদো—
চল, হট বে—নয়া আদমি সমঝ রহে হো কা!

জয়শঙ্কব দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন। রাজেশের মুখ তখনো রিকশাঅলাব দিকে। কুয়াশা এই দুটি চেহারাকেই আবছা করে রেখেছে। এমনকি দরজায় দাঁড়ালে লল্লু-মাসাউয়াদের চাটের খালি গাড়ি, শেকল বাঁধা মোষ—সবই ঘোলা মতন। যেন-বা জলতলে হালকা হালকা পেনসিল রেখায় আঁকা কোনো ছবি, যার কোথাও কোথাও রং জেবড়ে গেছে।

রিকশাঅলার কাকুতিমনতি খুব সহজেই দূরে ঠেলে সরিয়ে আর-একটি চ্যাপ্টা স্যুটকেস নামিয়ে আনতে পারে রাজেশ। নামানোর আগে বাঁহাতের পাঁচ আঙুলে তার খুব ছোট করে ছাঁটা চুল একবার ব্রাশ করে নেয়, অভ্যাসে তারপর জয়শঙ্করকে দেখে

হায় ড্যাড, বলেই জিভ কেটে ফেলে মাথা নিচু করে সদর পেরোতে থাকে।

একঠো স্যুটকেস মুঝে—বলতে বলতে একটি স্যুটকেস বইবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন। আব তখনই নিজের সন্তানের গা থেকে উড়ে আসা পুরুষালী পারফিউম আর সিগারেটের গন্ধ একই সঙ্গে টেব পেয়ে যান।

নহি রহান দো। বলতে বলতে রাজেশ দুটি স্যুটকেস নিযে হেঁটে যেতে থাকে। পেছনে তার বাবা।

ঘর মে সব ঠিক হ্যায় না?

হ্যায তো।

তুমহাবা ওহি পুরানা খাঁসি, অ্যাজমা—

ও তো চলেগা আখরি দমতক, যবতক জিয়ে, উসসে ছুটকারা হ্যায় নহি—

চিকিন কিউব—মুরগিকা বচ্চা সে বনা দাওয়া অওর অ্যাপ্রিকট ব্রাণ্ডি—দোনো একসাথ হপ্তাভর খাইয়ে আপ। সব লায়ে হ্যায় ক্যান্টিন সে—বলতে বলতে রাজেশ তার প্রায়-সত্তর বাবার দিকে তাকায়—খাঁসি উসি সব বিলকুল সাফ—

হম শরাব নহি পিতে—বলতে বলতে জয়শঙ্করের চোযাল শক্ত হযে ওঠে। ভারি চশমা খানিকটা নেমে আসে নাকের ওপর। সেটা আঙুলে করে ঠেলে তুলে গলা আরো নিচুতে নামিয়ে মোলায়েম করে বলতে চান, হেকিমশাহাব কা দাওয়া লে রহে হাম।

রাজেশ কোনো কথা বলে না। নিজেব ক্যান্টিন থেকে বাজারেব তুলনায় অনেকটা শস্তায় কেনা ফাইবারের স্যুটকেস দুটো বাইরের বারান্দায একটু জোরেই ঠুকে নামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, আম্মা আভিতক শোয়ি হ্যায়! বিমার হ্যায় কা।

নীরজা আসলে একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তার ওপর শীতেব আলসেমি লাগা সকাল। লেপের ভেতর শীত ঢুকে থাকে, বাইরে ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই আরো বেশি, ভাবতে ভাবতে নীরজা নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়ে, রেখে দেয় লেপের নীচে। তার চারপাইয়ের নীচে এখনো কাঠকয়লার আগুন, কাঁচামাটির গড়সিতে। সেই আগুনের ঢিমে আঁচ ধিকিধিকি তাপ ছড়িয়ে যায় সারারাত। শরীর আরাম পায়।

ভোরের দিকে, রাত ফুরিয়ে আলো ফুটে এলে লালচে আগুন ছাইয়ের নীচে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে। শুধু তার অগ্নিময় রংটুকু ছাইয়ের ধূসরতা ভেদ করে জেগে থাকতে চায়। আর তার থেকে উঠে আসা আঁচ দু-হাতের তেলোয় শুষে নিয়ে গলায়, গালে মুখে লাগাতে চায় মানুষ। তাতে শীত যায়।

কাঠের বেঞ্চে তখনো 'পরাগ'-এর পলিপ্যাক। তার গা থেকে চোঁয়ানো সামান্য জল গড়িয়ে পড়েছে। হিমায়িত সব জিনিশই প্রকৃতির নিয়মে এমন ঘামে। নিজেকে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিয়ে গায়ের ব্লেজার খুলে ফেলতে ফেলতে ইণ্ডিয়ান নেভির বছর পঁয়ত্রিশের কমিশনড অফিসার রাজেশ সাকসেনা মা, মা, শুনতি হো—বলে বার দুই তিন অসহিষ্ণু গলায় ডেকে ওঠে।

এই শেষ পর্বের ঘুমে, যত না ঘুম, তার চেয়ে অনেক বেশি আলসেমি—নিজেকে

কোনো স্বপ্নের ভেতর জড়িয়ে ফেলে আবার সেই স্বপ্ন-জগৎ থেকে 'আমি'টিকে টেনে বের করে এনে নীরজা প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসে। রাজেশের 'মা'-ডাক তার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়। এই স্বপ্নভূমিতে হয়তো রাজেশ ছিল, হয়তো ছিল না—কিন্তু নীরজা না-ঘুম, না-জেগে থাকাব ভেতর 'মা' শব্দটি শুনে প্রায় ছুটে, আলুথালু বসনে খাটিয়ার ওপর বসে, কোমরের বাঁধনটুকু শুধু ঠিক করে নিয়ে, বুকে কাপড় জড়িয়ে কোনোরকমে একবার ঠাকুর প্রণাম করে—এমনি দিনে বিছানা ছাড়ার আগে অন্তত মিনিট দশ তার ঠাকুর-প্রণাম পর্ব ও বিড়বিড় মন্ত্রপাঠ—বাইরে এসে যেন-বা ঘোরের ভেতর তার বড়-ছেলেটিকে দেখে, আমি জেগে আছি, না কি স্বপ্নে—এমন ভাবনার ভেতর আহ্লাদে, সুখে কুটিকুটি হযে যেতে যেতে 'রাজ্জু কব আয়ো' বলতে বলতে রাজেশকে ছুঁয়ে ফেলে।

আমার মা ঠিক পাঁচ বছরের ছোট আমার বাবার থেকে। এখনো কপাল জোড়া একটা বড় লাল সিঁদুরের টিপে মাকে ললিতা শাস্ত্রীর মতো দেখতে লাগে। ললিতা শাস্ত্রী মানে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বউ। যাঁকে এলাহাবাদ শহর কেন, তামাম দেশই হয়তো ভুলে গেছে। তবু চাপা নাকের, গোল মুখ, সাজানো দাঁতের আমার ফরসা মা—নীরজা সাকসেনা, যার নাকে এখন শাদা পোখরাজের উজ্জ্বল বিন্দু, তাকে দেখলে মহল্লার প্রাচীন মানুষেরা ললিতা শাস্ত্রীর কথাই বলে।

তবিয়ত ঠিক হ্যায় না? ছেলের মাথায হাত বুলোতে বুলোতে নীরজা স্বপ্ন ভাঙতে চায়।

হাঁ মা। নীরবে মাথা নাড়ে রাজেশ। তারপর খুব ধীরে 'সাত দিনকে ছুট্টি স্রিফ' বলে উঠে দাঁড়িয়ে সে তার মাকে বুকে টেনে নেয়।

মায়ের গায়ে সেই পরিচিত কোলগেট তেল, জরদা-পানের মেলামেশা গন্ধ। শাড়ির আঁচলে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। এই দৃশ্যকাব্যের বাইরে একা বসে থাকা জয়শঙ্কর সাকসেনার সত্যি সত্যি কিছু করার থাকে না।

কাহে কো খত না দিয়েস। একঠো তার—না জানিয়ে ছেলের এই আসা নীরজার বুকে জমে থাকা নানা অভিমানকে বুঝি-বা একই সঙ্গে উসকে দেয়। তার মনে পড়ে রাজ্জু আমের মিষ্টি আচার খেতে ভালবাসে। কাটরার লাল পেঁড়া, গরম জেলিবি, মালাই, তেলঅলা খাসির মাংস, আরো কত কি!

জয়শঙ্কর বুঝতে পারেন এবার তাঁকে বাজার যেতে হবে। তার আগে কী কী আনতে হবে তার একটা লিস্ট বানিয়ে দিতে বলবেন নীরজাকে। নইলে বারে বারে বাজার যাওয়া।

আজ কছেরি যাও গে?

নীরজাব এই প্রশ্নে ঘাড় নাড়লেন জয়শঙ্কর। অর্থাৎ কোর্টে বেরোবেন।

থ্যয়লা দেও, বাজার জানা হ্যায়। কোন কোন সা চিজ লানা হ্যায়—উয়ো সব লিখ দে দো। বলতে বলতে জয়শঙ্কর আকাশের দিকে তাকলেন। নভেম্বরের আকাশে কোনো রৌদ্রাভাস নেই। কুয়াশা থাকলে তেমন ঠাণ্ডা থাকে না। বরং এ আবরণ সরে গিয়ে রোদ উঠলে খানিকটা কনকনানি টের পাওয়া যায়। কিন্তু এই মেঘলার ভেতর কেমন

যেন একটা স্যাঁতস্যাঁতানি জড়িয়ে ধরে চারপাশে। গোটা শরীরটাই বুঝি-বা অচল হয়ে যেতে চায়।

লো থ্যয়লা—খাসি কা গোস—বলতে বলতে নীরজা তাঁর হাতে থলি ধরিয়ে দিয়েছে।

তার মানে কর্নেলগঞ্জ বাজার। এমন ভাবনার ভেতর ফুলহাতা সোয়েটারের নীচে পাঞ্জাবির বুকপকেটে কালকে রাখা টাকা টের পেলেন জয়শঙ্কর।

মালাই লানা।

আরে সব লিখ দেও বাবা। বলতে বলতে জয়শঙ্কর দাঁড়িয়ে যান।

## ২। কোর্ট ও হেকিমখানা

কোর্টে এই দুপুরে আজ তেমন কাজের চাপ নেই। একটা মামলার হিয়ারিং ছিল, সিনিয়ার করাবেন। জয়শঙ্কর সঙ্গে ছিলেন। আর একটি মামলার জজ বসেন নি। সুতরাং...। মেঘলা মতো আলোয় কোর্টের সামনে এখন অনেক অটো ট্যাকসি-দু-একটি টাঙা, এক্কা। গোটা চার-পাঁচ রিকশা। অটো ট্যাকসির হেলপার ছেলেগুলো চিৎকার করে করে প্যাসেঞ্জার ডাকছে—বড়ি টিশন, সিভিন লাইনস...। টাঙা টানা কোনো কোনো ঘোড়ার মুখে ঘাসের থলি। তারা কেউ কেউ পা ঠুকে ঠুকে মশা তাড়াচ্ছিল।

লম্বা, টানা টিনের চালার নীচে স্ট্যাম্প ভেণ্ডার, টাইপিস্টরা। সেখান থেকে একটানা টাইপ রাইটারের শব্দ—খট খটা খট খট...। কেমন যেন ক্লান্তি এসে যায়। একটু পরেই পোস্ট অফিস। পুরানা কাটরার সবজি বাজার ছড়াতে ছড়াতে প্রায় কোর্টে এসে ঠেকেছে। ওদিকে লছমি টকিজ পর্যন্ত। পেয়ারার গাড়ি, কমলালেবুর গাড়ি লেগে গেছে। কমলালেবু ওজন ধরে—এমন নানা কথায় নিজেকে জড়িয়ে দিতে দিতে হাই উঠছিল জয়শঙ্করের।

একবার চা খেয়ে এলে হয়তো এই ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে যেত। কিন্তু অসময়ে চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাই বসে বসে টাইয়ের নট আরো আলগা করলেন জয়শঙ্কর। আর তখনই তাঁর চোখের সামনে হরিমাধব মিশ্রা ফুটে উঠল। বেঁটে, গোলগাল চেহারা। দাড়িগোঁফ কামানো মেয়েলি মুখ। কপালে হলুদ লাল টিপ। একটু বড় চুল শ্যাম্পু করা। মুখে পান।

—অব তো রামমন্দির হোগাই, আখবার বালোঁ নে যো লিখে সো লিখে, ইয়ে তো জনতা কা মাংগ হ্যায়।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর হরিমাধবকে একটু চোখ বড় করে দেখলেন জয়শঙ্কর। নতুন সরকার আসার পর এ পি পি। মুখটা অনেকটা যেন কমলাপতি ত্রিপাঠি বসানো।

জয়শঙ্কর কিছু বলতে চাইছিলেন না। বলা মানেই বহেস, তর্ক, চিৎকার। মুসলমানোঁ কা দালাল, পাকিস্তান কা চামচা, সিউডো সেকুলারিস্ট, অ্যান্টি ইণ্ডিয়ান—এমন শুনতে হবে। হরিমাধব খুব চিৎকার করে। গলা ফাটিয়ে চেঁচায়—হিন্দুস্থান স্রিফ হিন্দুয়োঁ কো

হ্যায়। মুসলমান লেগোঁনে পাকিস্তান লিয়ে হ্যায়। আজ হিন্দুস্থান মে স্রিফ হিন্দু হি রহেঙ্গে...

এসব শুনলে, তার খিলাফে পালটা বলতে গেলে বুকের ভেতর দশটা কেশর ফোলানো ঘোড়া টগবগ টগবগ শব্দে দৌড়ে যেতে থাকে। তাদের পায়ের খুরে থেঁতো হয়ে যেতে চায় হৃৎপিণ্ড। বুকের বাতাস কমে আসে। পঞ্চাশ পার করেই আমি ইসকিমিক হার্ট, অ্যাজমা আছে। শেষবার বড় করে পলিটিক্স করেছি ১৯৭৫-এ। ২৬ জুন ইমাবজেন্সি ডিক্লেযাব হল। তাব আগে লোকনায়ক জয়প্রকাশ টোটাল বেভলিউশানের ডাক দিয়েছেন তাঁব কদমকুঁয়াব বাড়ি থেকে। ইন্দিরাব তানাশাহিব বিরুদ্ধে, জরুরি অবস্থাব প্রতিবাদে, প্রেস সেন্সরশিপেব প্রতিরোধে—তাবপর এটাওয়া থেকে অ্যারেস্ট হয়ে প্রথমে পুছতাছেব জন্যে সাতদিন পি সি। তারপর নৈনি জেল।

পান-জরদাব কষধবা নোংবা দাঁত খানিকটা বেব করে, মুখে একগাল পিক থাকলে যতটা ফাঁক কবা যায়, ততটুকু হাঁ কবে পানের পিক মেশানো উচ্চারণে হরিমাধব নানা কথা বলে যেতে পাবে। আর এইসব উচ্চারণের ফাঁকে সে মনে করিয়ে দিতে চায় এখন মৌলানা মুলায়ম ইউ পি-ব চিফ মিনিস্টার নয়, সেন্ট্রালেও ভি পি সিং নেই—এইসব বলাব মাঝে হালকা, শস্তা অ্যাসট্রেব ভেতর নিজের মুখ থেকে পানের পিক নামিয়ে দিতে দিতে দুবার জরদার হেঁচকি উঠে আসে। জবদার তীব্র গন্ধ এই ঘরের হাওয়ায় ধক করে মিশে যায়। জয়শঙ্করেব গা গুলোয, কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না।

'মন্দির ওহি বনাযেঙ্গে'—পিক ফেলার পব হরিমাধবের এই উচ্চারণ আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। জয়শঙ্করের মনে পড়ে শেষবার তানাশাহির খিলাফে আমবা বড় করে জেলে গিয়েছিলাম ১৯৭৫। তারপর টুকটাক আরো দু-এক বার, কিন্তু তানাশাহি তা ত আমাদের চারপাশেই এখন। এমন ভাবনার ভেতর শীতের মেঘলা দুপুর নিজস্ব নিয়মে গড়াতে গড়াতে বিকেলে পৌঁছে যাচ্ছিল।

একটা সেশানস সেরে সৈয়দ মনজির আলি ঠিক তখনই ফিরল। তার হাতে মোটা ডায়েরি, ক্রস এগজামিনেশন-এর কাগজপত্র। চার্জশীট-এর কপি ও ফাপামৌবালা মার্ডার কেস আভি সেশানস মে হ্যায় না—জয়শঙ্কর নিজের চিন্তার মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইছিলেন। একটা কিং সাইজ ঠোঁটে ঝুলিয়ে টুংটাং শব্দ তোলা সোনালি লাইটারে জ্বালিয়ে নিতে নিতে মনজির ঘাড় নাড়ল।

জয়শঙ্করের মনে হল মনজির মানে তো নূপুর। শব্দটি সংস্কৃত না আরবি? এরকম ভাবতে ভাবতেই জয়শঙ্কর সাক্ষী—গবাইদের ক্রস এগজামিনেশন হল কিনা জানতে চান।

নাহি জি—দো গবাইযা আয়ে নেই। দো হস্টাইল ডিক্লেয়ার কর দিযা পি পি নে। বলতে বলতে তামাকের পোড়া গন্ধে চারপাশে ভারি করে তুলতে পারে মনজির। হরিমাধব ততক্ষণে পরদা সরিয়ে বাইরে।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে এঘরের বাতাস আরো দমচাপা হয়ে উঠছিল। টি-ভি-তে এত বিজ্ঞাপন; তবু মানুষ এখনো প্যাসিভ স্মোকিং-এর ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝল না। আশ্চর্য! জয়শঙ্কর হাত নেড়ে ধোঁয়া তাড়াতে চাইছিলেন।

স্যরি—বলে লম্বা জিভ কেটে মনজিব তখনই নিজেব প্রায় আস্ত সিগারেটটি বাটার ভারি সোলের নীচে থেঁতো করে দিল। হাওয়ায় এখনো নিকোটিন। জয়শঙ্করের কাশি আসছিল। হরিমাধব ততক্ষণে সরে গেছে, হয়তো-বা মনজিরকে দেখেই—

সাকসেনাজি, কেয়া আপ চায় পিয়েঙ্গে—

নহি—হালকা কাশির ভেতবই জয়শঙ্করের জবাব।

লাল ডটপেনে টার্জশীটের কার্বন কপিতে দাগ দিচ্ছিল মনজির। সরকারি কারবন কপিব ভোঁতা ভোঁতা অক্ষর লাল রিফিলের আণ্ডার লাইনে অন্য মাত্রা নিয়ে ফুটে উঠছিল। লড়কা হরিজন থা। লড়কি ঠাকুব। দোনো মে মুহব্বত। শাদি কা চাহত। লেকিন ইয়ে তো বোম্বাইওয়ালা ফিলমি কিস্যা নহি—নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে চার্জশিটের ওপব সরু মেটাল ফ্রেমের বাইফোকাল মোড়া দুচোখ নিয়ে ঝুঁকে পডতে চাইছিল মনজির।

জয়শঙ্কর মামলাটা জানেন। সিনেমায যেমন হয়ে থাকে প্রথমে প্রেম—তারপর বিরহ—খলনায়ক—নায়িকা—টিসুম-ঢাসাম, ফায়ারিং, গান, হেলিকপ্টার, দেশপ্রেমের ভাষণ, শেষ অবদি রক্তাক্ত নায়কের বুকে নায়িকা—এখানে তেমন হয় নি।

পালিয়ে বিয়ে করার অভিযোগে দুই সাবালক নারী ও পুরুষকে ধরে এনে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় গ্রামবাসীরা। থানা কিছু করতে পারেনি। ব্যাপারটি নাকি ‘মব’ হয়ে গেছে। পরে দিল্লি-বোম্বের কাগজে প্রচুব লেখালেখি হলে প্রায় একশো কুড়িজন পুরুষ এই মামলার আসামি। এরা সবাই ব্রাহ্মণ, ঠাকুর। মামলায় সাক্ষী দুশোরও বেশি।

মনজির ডিফেন্স কাউন্সেল। তার সিনিয়ারও আছেন। আর্গুমেন্ট, ম্যাকসিমাম ক্রস এগজামিনেশন তিনিই করবেন।—ই লোগ হি রামমন্দির বনায়েঙ্গে—খুব চাপাস্বরে এমনটি বলতে বলতে জয়শঙ্করের দিকে তাকিয়ে মনজির তার মেটাল বাইফোকাল নাকের অনেকটা ওপর নামিয়ে আনতে পারে। বাইরের যেটুকু মেঘলা আলো, তা প্রায় মুছে এসেছে। মনজিরের সিনিয়ার বিক্রম জয়সোয়াল এখনো আসেন নি। সম্ভবত তিনি এখন এই মামলা বা অন্য কোনো মামলার তদবিরে পি পি বা এ পি পি-র কাছে।

যো লোগ জাতপাতকে সওয়াল মে লড়কি, ভাতিজি কুছ নহি মানতে হ্যায় ও লোগ বাবরি মসজিদ তোড় হি দেঙ্গে, বলতে বলতে জয়শঙ্করের দিকে অদ্ভুত শূন্য চোখে তাকায় মনজির।—মসজিদ তো গ্যয়াই, যব সে উশ মে মূর্তি ঘুস গ্যয়া, ঠিক হ্যায়-লেকিন আব তো নারা উঠ রহে হ্যায়—‘এক ধাক্কা অওর দো বাবরি মসজিদ তোড় দো’—তোড়েঙ্গে উলোগ। কই বচানে নেই পায়েঙ্গে। ফির দঙ্গা-ফসাদ। লড়াই। খুন। ভাগো—ভাগতে চলো। আখির হমলোগ যায়েঙ্গে কঁহা।

ঘরের বাতাস কমে আসছিল বুঝি। এই শীতেও ঘামের দানা ফুটে উঠতে চাইছিল কপালে। জয়শঙ্কর পাশপকেট থেকে রুমাল এনে কাল্পনিক ঘাম মুছে ফেলতে চাইছিলেন। টাইয়ের নট আরো আলগা করে সহজে নিশ্বাস নেওয়ার পথ তৈরির একটা চেষ্টা ছিল এমন কার্যক্রমে।

চার্জশিটের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে মনজির সামনের পরদার দিকে তাকিয়ে। সেখানে চৌকো অন্ধকার ধীরে দুলে উঠছিল।

হেকিম মির্জা আলি শা-র দাবাখানায় সন্ধের দিকে একটা আড্ডা বসে। প্রায় দিনই জয়শঙ্কর সেখানে। আজও এই শীতের সন্ধেয়—কোনো এক প্রাক্তন বিচারপতির মৃত্যুতে কোর্ট অ্যাডজরনড হয়ে গেলে একটু আগেই পৌঁছেছেন।

হেকিম মির্জা আলি শা-র পর—নানার পর নানা নাকি এসেছিলেন ইরান থেকে। মায়ের দিক থেকে ইরানি রক্তের দাবিদার এই মানুষটি হাঁটু ছাড়ানো লম্বা ঝুলের ছাই-রঙের গরম কোট, টেরিকটের শাদা পাজামা মোড়া সামান্য মোটার দিকে যাওয়া শরীরটি নিয়ে চৌকির ওপর শাদা ফরাসে বসে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। ঘরে এরকম আরো তিনটি নীচু চৌকি। তার ওপর শাদা ফরাস, তাকিয়া, মেহমান, মরিজদের জন্যে।

মুনক্কা, শিলাজিত, কাবাবচিনি—এমন, সব নানান উচ্চারণে হেকিমখানা সন্ধে থেকেই একটু একটু করে জমে উঠতে থাকে। এছাড়া আছে মোদক ধরণের একরকম নেশার গুলি। গোটা দুই একসঙ্গে গালে রাখলেই মাথাটা ধীরে ঝিমিয়ে আসে। আর তার ভেতর নানা আনন্দের রং খেলা করতে থাকে। বয়েস পেরিয়ে আসা মানুষেরা কেউ কেউ দূর অথবা বেহস্ত-এব মৃদু খোয়াবে ধীরে এলিয়ে যায় তাকিয়ায়।

নিজের চোখে চাঁদির ফ্রেমের গোল চশমাটি ঠিকমত বসিয়ে দিতে দিতে হেকিম মির্জা আলি শা ছাঁটা পাকা দাড়িতে একবার অভ্যাসে হাত দিয়ে মোদক নিয়ে ঢুলে পড়া মাঝবয়েসী বা প্রায় প্রৌঢ়দের দেখে হয়তো-বা যৌনশক্তি বাড়াতে শিলাজিত কতটা উপকারী, আর এই আসল শিলাজিত তিব্বত না আফগানিস্তান থেকে আসে, তা নিয়ে বে-ফজুল তর্কে মাতিয়ে উসকে দিতে পারেন ফরাস-তাকিয়ার মানুষদের।

জয়শঙ্কর সাকসেনা, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির এনশিয়েন্ট হিসট্রির সুলেমান আলি এলে পৌঁছলে আড্ডার মেজাজ, ধারা একেবারেই বদলে যেতে থাকে। রোজই এরকমই হয়।

হেকিম মির্জা আলি শা তাঁর চটুল জিভে লাগাম টেনে সিরিয়াস হয়ে যেতে থাকেন।

জয়শঙ্করের হাতে আজ একটি ক্লাস এইটের ইতিহাস বই। রানা প্রতাপ, শিবাজি, বলিরাম হেড গেওয়ার, মহাত্মা গান্ধি—সব মিলেজুলে এক খিচুড়ি। ব্রিটিশ আমলে নয়, আমাদের প্রকৃত পরাধীনতার শুরু মুসলমান আক্রমণ থেকে...বৈদিক গণিত—সেও এক চরম উন্নত ভাবনা—সুলেমান আলির হাত থেকে ইতিহাসের স্কুলপাঠ্য বইটি টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে জয়শঙ্কর ধৈর্য হারাচ্ছিলেন। তাঁর নাকের পাটা ফুলে উঠছিল। উত্তেজনায়। নাকের ওপর ভারি চশমার ব্রিজটি গড়িয়ে নেমে আসতে চাইলে, তাকে ঠেলে তুলে দিতে জয়শঙ্কর আশপাশের কাউকেই প্রায় দেখতে পাচ্ছিলেন না। সবাই প্রায় জলে ভেজা কাচের ওপারে থাকা ছবি। মোদকের গুলি নেয়া রামেশ্বর শ্রীবাস্তব তানসেন গুলির সাহায্যে শারীরিক সম্ভোগ ক্ষমতা কতটা বাড়ানো যায়, এমন ঘোরের ভেতর বুঁদ হয়ে

তাকিয়ে ছিলেন। তার পাশে হরিশ সিং, একটু পরে তাকিয়া ঠেস দেয়া বুন্দিলাল গুপ্তা। সকলেরই গালে হেকিমি মোদক, নেশা একটু একটু করে রক্তে ছড়াচ্ছিল।

ঘড়ি-পকেট থেকে রুপোর চেন বাঁধা পকেট-ঘড়ি এনে সময় দেখলেন হেকিম মির্জা আলি শা। তারপর সবে সাতটা বেজেছে দেখে নিজের খুব পছন্দের একটা শায়েরি ধীরে বলতে লাগলেন—

আ কর মেরি কব্র পে
কিসনে দিয়া জ্বলা দিয়া
বিজলি তড়প কর গির পড়ি
সারা কফন জ্বলা দিয়া
চ্যায়ন সে শোয়ে থে কব্র পে হাম
য়ঁহা কি সতানে আ গয়ে
কিসনে পতা বতা দিয়া।

বাহ্, বাহ্ বহুত খুব। সবাই খুব তারিফি দিচ্ছিল। ঘোরের মধ্যে নিজের হাঁটুতেই জোরে জোরে চাপড় দিচ্ছিল বুন্দিলাল। তার ডান হাতের আঙুলে আঙুলে দামি পাথরের ঝিকিমিকি

চোখের কোলে আব একটু মজার হাসি ঝুলিয়ে হেকিম মির্জা আলি শা বললেন, অব মেরা হি মস্তুগি শুননা জরা, সমহালকে। সমহালকের ওপর জোর পড়ল।—শুনাউ?

সবাই ঘাড় নাড়লে হেকিম মির্জা আলি শা তাঁর লেখা শায়েরিটি পেশ করেন এভাবে —মসজিদ মসজিদ হি রহ গ্যায়া/মন্দির সো তো হ্যায় মন্দির/লেকিন দিদার ন মিলা জ্ঞান কা/হাথ মে থামে সমশিব—

মসজিদ মসজিদই থেকে গেল মন্দির তো মন্দিরই। জ্ঞানের দর্শন হল না। হাতে এখন তলোয়ার।

সবাই চুপ।

সিভিল লাইন্স কফি হাউসে সুলেমান আলি আর আমি বসেছিলাম দুকাপ কফি নিয়ে। সুলেমানের কাছে ক্লাস এইটের ইতিহাস। নাকি ইতিহাসের ভস্মশেষ। এরা আরম্ভ করেছে কি? মধ্যযুগ মানেই অন্ধকার যুগ। মুসলমান রাজা মানেই অত্যাচারী। হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী? আর হিন্দু রাজারা—তারা সব আশমান কে ফরিস্তে।

হেকিম মির্জা আলি শা-র শায়েরি শোনার পর কেউ কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। মির্জাশাহেব নিজেই গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন, জয়শঙ্করজি, আপকে খাঁসিকে দাওয়া তৈয়ার হ্যায়। পুরিয়া লেতে জানা। অদ্রক, শহদ অওর গরম পানি সে...—। সো তো ঠিকই হ্যায়, লেকিন আপ তো বাবরি মসজিদ বাচেগা নহি। খ্যর ঠিক হ্যায়। বাবরি মে কোই নমাজ নহি পড়তা, ও ভি সহি—লেকিন উসকা আর্কিটেকচারাল ভ্যালু—হমলোগ ইয়ে দেশমে হিন্দু অওর মুসলমান, মিলকে হ্যায় মিলকে চলেঙ্গে। ও ভি খতম হো যায়গা—হমারা সেকুলারিজম—

জয়শঙ্কর দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে ১৯৯০-এর ৩০ অক্টোবর বাবরি মসজিদের মূল গম্বুজে গৈরিক পতাকা, আক্রান্ত বাবরি মসজিদের মিনার, স্থাপত্য, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা—ছবি হয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। সে সবই তো কাগজে বেরিয়েছে। আমরা কিছু করতে পারি নি।

অব তো ইয়ে বতাইয়ে, হমলোগ যাঁয়ে কাঁহা। মুসলিম কানট্রি মে রহে নহি সকেঙ্গে। অগর উসি টাইম মে পাকিস্তান চলে যাতে তো—তাও হল না জয়শঙ্করজি। ভাইপো, ছোটভাই, মা—কেউ রাজি হলেন না। এখন ছেলেরা রাজি হবে না। রাজি হবে না তাদের মা। ইলাহাবাদ তাদের ওয়াতন—দেশ।

লেকিন দাঙ্গা হলে! নাইনটিতে আমার এ দুকান—দাবাখান—যা বলেন না কেন অ্যাটাক হয়েছিল। আমি থ্রেটনড হয়েছিলাম।

এ ঘরে এখন টিউবের আলো। দেয়াল জোড়া উঁচু উঁচু কাচের আলমারির ভেতর রকমারি চেহারার নানামাপের বোতল, জার। অশ্বগন্ধা, লসোড়া, শতমূলি, পিপুল, শিলাজিত, কাচের বড় জারে মধু।

মোদকের ঘোর থেকে বেরিয়ে এখনো কেউই হেকিম মির্জা আলি শা-র কথার জবাব দিতে পারছিলেন না।—অব হম মুসলমানলোগ কঁহা জায়েঙ্গে। হম মুসলমান হ্যায়, ইণ্ডিয়ান ভি হ্যায়। তো সাউদি মে যাকে হেকিমখানা বনানা তো—

জয়শঙ্কর বুঝতে পারছিলেন এক ভারতীয় মুসলমানের সংকট এই মুহূর্তে—কোথায় পালাব, কোথায় দাঙ্গার আগুন আমায় ছোঁবে না, আমার জান মান—দুই-ই বাঁচবে—আমায় পি এ সি গুলি করে খুন করবে না—সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্কুলপাঠ্য বইয়ের পাতায় পাতায়—মুসলমানরা, ইসলাম ধর্ম ভারতের স্বাধীনতা নিয়েছে, তাকে সর্বনাশ, অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দিয়েছে—সেই অনৈতিহাসিক, উৎকট বর্ণনা।

মেরা বড়া লড়কা শমিম, বতা রহা থা উ আলবেনিয়া চলে যায়েঙ্গে। ফির আলবেনিয়া ভি মুসলিম কানট্রি, ফাণ্ডামেন্টালিস্ট, মৌলবাদী—

জয়শঙ্কর আর শুনতে পারছিলেন না। ভারতীয় মুসলমানের এই দাঁড়ানোর জায়গা খোঁজার আর্তি তাঁকে খুঁচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। তবু তো এতগুলো মানুষ যেমন নীরব, তেমনি তিনি বা এনশিয়েন্ট হিসট্রির সুলেমান আলি—কেউ-ই তো বলতে পারলেন না, ঠিক হ্যায় হেকিমশাহাব, অগর দাঙ্গা লগ হি যায় তো মেরে ঘর খুলা হ্যায়, চলে' আনা। হিচকিচাইচ না কর না।

তা বলা হল কই।

## ৩। অন্তর্ঘাত

একটু রাতে বাড়ি ফিরে দরজা খটখট করে বাইরে প্রতীক্ষায় ছিলেন জয়শঙ্কর সাকসেনা। দরজা খোলার পর লেডিজ শাল জড়ানো নীরজার শরীরটুকু এই অন্ধকারে নীরবে সামনে

চলে গেলে চাপা হাসি, চলকে ওঠা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পান জয়শঙ্কর। দোতলার বেডরুমে রাজেশ তার ইয়ারদের সঙ্গে তাসে। কার্ড পিছু পয়সা। কিট্টি, নয়তো রামি। নেভি ক্যানটিন থেকে আনা শস্তার রাম। ঘরে ফূর্তি উড়ছে। ছেলে সাতদিন এখানে থাকবে? হিশেব মতো আর দুদিন বাকি। তারপরই ওয়ারেন্ট দেখিয়ে টিকিট নিয়ে আবার বোম্বাই, আই এন এস আংগ্রে।

শিবসেনা দেখিয়ে দিয়েছে বাবা, তুমি এখানে বসে পাকিস্তানের চামচাবাজি করলে তার নতিজা কি হবে। তুমি শালা খাবে ইণ্ডিয়ার আউর বোলেগা—দাউদ ইব্রাহিম কা নাম। ও নেই চলে গা। ইণ্ডিয়াকা খানা খাও তো হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ বোলো। তুমহারা এ কে ফর্টিসেভেন, তো মেরা ভি এ কে ফিফটিসিকস।

জয়শঙ্করের গলায় রসুন-শাদা জিরে ফোড়ন দেয়া অড়হর ডালমাখা রুটি আটকে যাচ্ছিল।—তুই কি জানিস, শিবসেনা যা করছে, তাতেও তুইও কয়েকদিন পর বোম্বাই ছাড়তে মজবুর হতে পারিস। আমি বা তুই তো সালগাঁওকার, সোলকার, তেণ্ডুলকার, তলোয়ারকার, গোখলে, চাপেকর, তিলক—বা অন্য কোনো মারাঠি পদবির মানুষ নোস। শিবসৈনিকরা কি তোকে ছাড়বে! শ্রেফ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে বাবা—

এসব কিছুই বলা হল না জয়শঙ্করের। তিনি শুনতে পেলেন রাজেশ বলে যাচ্ছে .—বাল ঠাকরে নে শিখলায়া, ক্যায়সে মুসলমান লোগোঁ সে বিহেভ—

তুই না সামরিক বাহিনীর অফিসার। কমিশনড র‍্যাঙ্ক। তোকে আমি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে মিলিটারি সায়ান্স-এ এম এ করিয়েছি। তোর গলায় কেন বাল ঠাক্‌রে কথা বলবে! জয়শঙ্কর কিছুতেই তাঁর গলায় ফেঁসে যাওয়া রুটির টুকরোদের কায়দা করতে পারছিলেন না। তাঁর চোখের সামনে ১৯৩০-এর ৩০ অক্টোবর ইউনিফর্ম পরা বন্দুকধারী পুলিশ 'জয় শিরিরাম', 'জয় শিরিরাম' বলতে বলতে হলুদ গাঁদার মালা হাতে বাবরি মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। পেছনে অনেক মানুষ। তাদের কপালে গেরুয়া পট্টি, দু-চোখে হিংস্রতা। হাতে গেরুয়া পতাকা। মুখে—জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম জয় জয় শিরিরাম।

ছবির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আবারও বিষম।

· একটু বিরক্ত হয়েই নীরজা বলল, খানে কা টাইম মে কাহে কো বহেস। লো, পানি পি লো—বলতে বলতে জলের ঘটিটি এগিয়ে দিয়ে তার আর তখনই কিছু করার থাকে না। রাকেশ এখনো বাড়িই ফেরে নি। বাইরে রাত নিজের নিয়মে বেড়ে যাচ্ছিল।

আজ নীরজা এভাবে চুপচাপ দরজা খুলে সামনে চলে গেলে দরজা বন্ধ করা হবে কিনা, অর্থাৎ তিনিই এবাড়িতে শেষ ঢুকলেন, নাকি এরপরও রাকেশ সাকসেনা—আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট—আসবে, নাকি এসে গেছে—কিছুই বুঝতে পারলেন না জয়শঙ্কর। তবু তিনি পিছিয়ে গিয়ে খিলটি তুলে চলে এলেন। শীতের বাতাস নিজের মতোই বয়ে যাচ্ছিল।

## ৪। উদ্যোগ পর্ব

সকালে মহারাজিন—সিতারা কাহার বাসন মাজার আগে আলুর পাপড় বেলছিল। বাজারে এখন নতুন আলু। শস্তা। দেশী আলু অনেকটা সেদ্ধ করেছে নীরজা। পাপড় বেলে রোদে শুকিয়ে নেবে। আজ চমৎকার রোদ চারপাশে। দোতলার ছাদে দাঁড়ালে এখন আব চারপাশটা তত পরিষ্কার নজরে পড়ে না। শুধু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে গম্বুজটি, পাশে মিনার আব কোম্পানি বাগের সবুজ এখনো—একটু নজর করলে চোখে পড়ে। ছাদে একটা আধ পুরোনো ধুতি মাথার ওপর টাঙিয়ে পাপড় বেলছিল মহারাজিন। কাকে যাতে ছোঁ না মারতে পারে, তারই জন্যে সতর্কতাটুকু। তবু দুবে দুবে নেচে বেড়ানো কাকেরা।

রোদ বেশ আরাম দিচ্ছিল। কিন্তু কোর্টে বেরোনোর তাড়া আছে। জযশঙ্কব নীচে নেমে এলেন।

এদিন রাতেই নীরজা আমায় জানায়—করসেবক হিশেবে রাকেশ অযোধ্যা যাচ্ছে। হাড়ের ভেতব শীত ঢুকে পড়ছিল জয়শঙ্কর সাকসেনার। মহাত্মা গান্ধি, রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, টোটাল রেভেলিউশান—সব সব ঘোড়ে কা আণ্ডা। বাকেশ করসেবক হয়ে অযোধ্যা যাবে। বাবরি মসজিদ ভাঙা হবে।

অসহায় জয়শঙ্কর বাতাস সাঁতরে তাঁর স্ত্রীকে ছুঁতে চাইছিলেন। আমরা তো অনেকটা বয়েস পেরিয়েই বিয়ে করলাম নীবজা। সামনে আজাদির লড়াই ছিল। জেল, ফাঁসির দড়ি। জয়প্রকাশ নাবায়ণের সেই ডাক। নরেন্দ্র দেব। লোহিয়াজি। স্বপ্নের সমাজবাদ।

নৈনি জেলে কত দিন, রাত কেটে গেছে। বাইরে বেয়াল্লিশের উত্তাল ভারতবর্ষ। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আজাদি তখন একটা স্বপ্ন। হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই সবাই পাশাপাশি। আংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো। কুইট ইণ্ডিয়া—

নীরজা কোনো কথা বলতে পারছিল না। অনেকক্ষণ পর—ওরা বলছিল সরযূর বালি নিয়ে প্রতীকী করসেবা। ভাঙচুর কিছু হবে না। ওদেরই ক্যাডাররা বাবরি মসজিদকা পাহারাদারি—

মিথ্যে কথা—ঝুট। সফেদ ঝুট। বিলকুল ঝুট, বলতে বলতে জয়শঙ্কর চুপ হয়ে গেলেন। পঁচিশ বছরের যুবককে আমি কি বোঝাব—তাব অন্ধতা, তার অজ্ঞানতা—তার হিন্দুত্ববাদ—চুপ করে থেকে গভীর যন্ত্রণায় ভাঙচুর হতে হতে জয়শঙ্কর নিজেকে কুঁকড়ে নিয়ে এলেন লেপের গভীরে। যেন কত শীত, কত হাজার বছরের হিম তাঁকে জড়িয়ে ধরছে।

জিনসের ঢিলে ব্যাগিস। পায়ে নর্থস্টার। গায়ে গেরুয়া গেঞ্জি তার বুকে জয় শ্রীরাম —হিন্দিতে। মাথার থাকথাক বড় চুলে গেরুয়া পট্টি, সেখানেও দেবনাগরী হরফে জয় শিরিরাম। গেঞ্জির ওপর হাফহাতা সোয়েটার। তার ওপর পুরোহাতা। পিঠে ছোট হ্যাভারস্যাক। কাঁধে জলের বোতল। রাকেশ সাকসেনা সরযূর বালি মাড়িয়ে হাঁটতে

হাঁটতে ভাবছিল কালই, কালই শেষ দিন।

এই শীতে নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছিল। সরযূর পাশেই বিশাল রামলীলা ময়দান। কাল সেখান থেকে ভাগে ভাগে করসেবকরা দল বেঁধে আসবে। সরযূর তীরে বিশাল উঁচু উঁচু বালির ঢিবি তৈরি হয়েছে। হাতে মুঠো করে সেই বালি দিয়ে কংক্রিটের তৈরি প্ল্যাটফর্মের পাশে বড় বড় গর্ত বুজিয়ে—লেকিন ইয়ে সব তো আখবারওয়ালোঁ কা গসিপ, আসলি কাম তো—

রাকেশ এটা নিয়ে আর ভাবতে চাইছিল না। দূরে দিন মুছে আসছিল।

কাল ৬ ডিসেম্বর। আমরা গুঁড়িয়ে দেব পরাধীনতার গ্লানি। রাকেশ ভাবতে ভাবতে ভেতরে ভেতরে ধারালো হয়ে উঠছিল। একটা রাতের প্রতীক্ষা শুধু—আমরা চাকরি পাই না—কারণ ওরা এখানে আছে। ওরা সবাই পাকিস্তানের সাপোর্টার—ওদের মেরে পাকিস্তানেই পাঠিয়ে দাও। হিন্দুস্থানে থাকতে হলে তোমাকে হিন্দু হয়েই থাকতে হবে। বলতে হবে, বন্দোমাতরম, ভারত মাতা কি জয়... রাকেশ তাদের সংগঠনে, বৌদ্ধিকে বার বার শোনা কথাগুলো মাথার ভেতর নেড়েচেড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিল।

আজ চার দিন হল অযোধ্যায় এসেছি। দূরে নেমে আসা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আকাশ আর নদী যখন একই রং পেয়ে যাচ্ছে, তখনই এমনটি মনে হল রাকেশের। আমরা এসেছি পরাধীনতা, দাসত্বের চিহ্ন মুছে দিতে। এরপর কাশী, তারপরই মথুরা—

সকালে কয়েক লরি বিস্কুট, লাড্ডু-পেঁড়ার প্যাকেট, পলিপ্যাকে ভাজা চিঁড়ে—দফায় দফায় খাওয়ার কথা প্রায় একই সঙ্গে রাকেশ মনে করতে পারছিল।

তোড়তাড়কে লিয়ে তাগদ হোনা চাহিয়ে। বারে বারে খাবার। সকাল দশটা থেকে রাত বারোটা। দুপুরে ভাত-ডাল-তরকারি-দহি—শুধু শাকাহারি ভোজনের জন্যে কোনো পয়সা লাগছিল না। সব আসছে রামের বনামে। মন্দির যঁহি বনেঙ্গে।

ট্রেনে ওঠার আগেই পরিচয়পত্র মিলেছিল, আমরা যে সংগঠনের লোক—তার চিহ্নটুকু। আর ট্রেনের কামরাতে কামরাতেও খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। টিকিট চেকার, পুলিশ সবাই খাতিরদারি করছিল আমাদের। টিকিটের বালাই ছিল না, যেন-বা দেশোদ্ধার করতে যাচ্ছি। রাকেশ এসব মনে করতে করতে সরযূর বুক থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ার কামড় বাঁচাতে নিজের দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

খুব ধীরে নেমে আসা অন্ধকার একই সঙ্গে মিশিয়ে দিল বাবরি মসজিদ, হনুমান গড়ি, রাম চবুতরা, শিলান্যাসের জায়গাকে। কাঁটাতারে বেড়া, বালির বস্তা, পি এ সি-র ইউনির্ফম পরা সিপাহি, অফিসার—এদের ওপর আলো। রাম-কথা কুঞ্জ, শ্রীরাম হাসপাতাল—সব জায়গাতেই আলো জ্বলে উঠেছিল। অনেক বছরের শ্যাওলা লাগা গম্বুজ আর মিনার নিয়ে বাবরি মসজিদ চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সরযূর পাড় থেকে সরে এসে রাকেশ ধীরে তাঁবুর দিকে যেতে চাইছিল। এখন এক-একটা তাঁবুতে কুড়ি জন। কখনো কখনো সার্কাসের তাঁবু চেহারার বিশাল বিশাল

ছাউনিতে অনেক মানুষ। আমাদের সংগঠন সারা হিন্দুস্থানে। শিউডো সেকুলারিস্টরা কিছুই করতে পারবে না আমাদের, যেমন আমার বাপ—জয়শঙ্কর সাকসেনা, বি এ, এল এল বি—শালা চুতিয়া—থুঃ করে অনেকখানি থুতু ফেলল রাকেশ।

## ৫। ফাইনাল টাচ

সকালে সরযূর বালির ধার দিয়ে কেউ যায়নি। ইউ পি পুলিশ, পি এ সি, হাতে হাতে সার বেঁধে দাঁড়ানো খাকি প্যান্ট শাদা শার্ট বাহিনী তার ওপর গেরুয়া স্রোত আছড়ে পড়ছিল। পুলিশ চাইছিলই আলগা দিতে। পি এ সি-ও। শেষ অবদি শাদা শার্ট খাঁকি প্যান্ট, পি এ সি, উ. প্র পুলিশ— সবাই একই সঙ্গে জোড় খুলে দিল।

হর হর মহাদেও, জয় বজরঙ্গবলিকি, জয় জয় শিরিরাম—আদিম রণহুংকারে কেঁপে উঠছিল অযোধ্যার আকাশ। তলোয়ার, ত্রিশূল, শাবল, লোহার রড, ঝলসে উঠছিল রোদমাখা আকাশের গায়ে। গেরুয়া, গেরুয়া স্রোত শুধু। পতাকায়, পাগড়িতে, সোয়েটার, পাঞ্জাবি, আল্লাখাল্লায় গৈরিক, শুধু গৈরিক।

জিনসের ব্যাগিস, পায়ে নর্থস্টার—আছড়ে পড়ছিল পাঁচশ বছরের পুরোনো দেয়ালে। ঝুরঝুর করে খসে যাচ্ছিল ইট। তোদের জন্যে আমাদের চাকরি হয় না। তোরা ভয় পেয়ে পাকিস্তান চলে যা— আমরা চাকরি পাব। রাকেশ প্রাচীন দেয়ালে লাথি মারছিল। আর তার এই রাগ, জয় শ্রীরাম লেখা গেরুয়া ফেটি বাঁধা চুল, দামি সোয়েটার, পাশে ত্রিশূল হাতে মাথা ন্যাড়া কোনো গেরুয়াধারী—দুজনের মুখেই জয় শ্রীরাম, হু-আ, হু-আ বণধ্বনি—এই ডাক বুঝিবা ছড়িয়ে যাচ্ছিল সমস্ত মসজিদ চত্বরে, মসজিদ পেরিয়ে সংখ্যালঘু বস্তিতে বস্তিতে, যাঁরা এই অঞ্চলে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনার ফুল নিয়মিত জুগিয়ে থাকেন।

হু-আ হু-আ হু—বুঝি-বা বাঁধ ভেঙে গেছে—এমনই গর্জন, সঙ্গে হর হর মহাদেও জয় শ্রীরাম—ভিডিও ক্যামেরায় গোটা ব্যাপারটি তুলে রাখতে গিয়ে চড় খেলেন করুণা মাহেশ্বরী। তাঁর গায়ের জ্যাকেট টেনে ছিঁড়ে দিতে চাইল আট-দশ জন। যদিও এখানকার চালু করা নিয়ম মতো ভিডিও তোলার আগে মাথায় জয় শ্রীরাম লেখা ফেট্টি বেঁধেছিলেন করুণা। তবুও করসেবকরা তাঁর বুক ছুঁতে চাইছিল। তাঁর নামটি লিখিয়েছিলেন লিস্ট তৈরি করা স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে। তবু মেয়েদের কেন এত সাহস হবে? ভাগ, ভাগ শালী— করুণা পিছু হটছিলেন।

রাকেশ লাথিতে লাথিতে পুরোনো ইটের গাঁথনিতে ধুলো উড়িয়ে দিতে দিতে ভাবছিল—হমলোগ আজাদিকে লিয়ে লড় রহে হ্যায়। দূরে সরযূর বুকে দুপুরে সূর্য তার লালচে ছায়াটি নিয়ে ভেসেছিল।

এগারোটা পঞ্চাশ—রাকেশের টাইটান কোয়ার্জ ঠিক ঠিক সময় দিয়ে ছুটছিল। গম্বুজের মাথায় মানুষ। তাদের হাতে লাঠি, রড, শাবল, হাতুড়ি। এসবই তো আনতে

বলা হয়েছে আমাদের গোপন সার্কুলারে। রাকেশ নিজেকেই নিজে বলল। শুকনো শ্যাওলামাখা গম্বুজের ওপর দাঁড়ানো সবাই দমাদম শাবল, হাতুড়ি, রড চালাচ্ছে। বাতাস ধুলোয় ধুলো। প্রায় পাঁচশোবছরের পুরোনো সুরকি, ইটের গুঁড়ো হাওয়ায় মিশে যাচ্ছিল।

জিনসের মিডি স্কার্ট আর বড়ো পকেটঅলা ঢিলে গেঞ্জি পরা সোনালি চুলের ওই নারী, হাতে ক্যামেরা, মাথায় আমাদের নিয়ম মতো জয় শ্রীরাম ফেট্টি—ছুটে এসে ক্যামেরায় সেইসব মুহূর্ত ধরে রাখতে চাইছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা খিস্তি, ঠেলাঠেলি, ক্যামেরা কেড়ে নেযা। সেই বিদেশিনী মুখে বার বার 'প্রেস প্রেস প্রেস' বলেও কাউকে থামাতে পারে না। মাথা কামিয়ে শুধু চুলের ডিজাইনে তৈরি করা 'জয় শ্রীরাম' লেখা ষণ্ডা মার্কা দুজন লম্বা লাঠি দিয়ে তার ডান হাতে, পায়ের গোছে...। ওঁক—এই জাতীয় একটা চাপা শব্দ করে সেই নাবী বসে পড়ে। বাঁহাতে তখনো উঁচু করে ধরা প্রেস কার্ড। ক্যামেরা লুট হয়ে গেছে। গলায় ঝোলানো সান.গ্লাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে আর একজন। মাথায় গেরুয়ার ওপর কালো অক্ষরে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ফেট্টি বাঁধা দুজন নিচু হয়ে তার নিতম্ব, কোমর টিপে টিপে মানি ব্যাগ ও মাংস—দুই-ই খুঁজে নিতে চাইছিল।

রাকেশের কিছু করার ছিল না। বরং সে এসব কিছুতেই উল্লসিত হয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, রাম জন্মভূমি উদ্ধারের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে হাজির থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছিল।

হুড়মুড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো। রাম চবুতরার দেয়াল ভেঙে পড়েছে আগেই। মসজিদ ঘেরা কাঁটাতারের সঙ্গে থাকা লোহার পাইপ আর ফেন্সিং স্ট্যাণ্ড হাতে হাতে এখন ভাঙনের হাতিয়ার। তলোয়ার, লাঠি, শাবল, হাতুড়ির একটানা শব্দ।

বেলা গড়িয়ে বিকেলে এসে যাচ্ছিল। সূর্য একটু একটু করে গড়াচ্ছিল পশ্চিমে। সরয়ূর বুকে, বালির ওপর শেষবেলার আলো।

বিকেল চারটে পঞ্চান্ন, রাকেশ তার হাতঘড়িতে দেখতে পেল সমস্ত আকাশ ধুলোয় ধুলো করে দিয়ে একটি একটি করে গম্বুজ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে। অনেক আগেই চুপ হয়ে গেছিল মাইক, সেই অ্যাকশান শুরুর সময় থেকেই। গৈরিক নেতারা উল্লাসে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছিলেন। মুখে গুঁজে দিচ্ছিলেন লাড্ডু। বাবরি মসজিদ এখন ভাঙাচোরা রাবিশের স্তূপ।

আমাদের পুলিশ কিছু বলে নি, পি এ সি কিছু বলে নি, সি আর পি কিছু বলল না। বরং তারা অনেকে 'জয় জয় শিরিরাম' বলতে বলতে ভাঙচুরে এগিয়ে এসেছে।

হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল খাবারের প্যাকেট, জলের বালতি—গম্বুজের মাথায়। যারা ভাঙছে, তাদের যেন ভুখা পেটে কাজ না করতে হয়। রাকেশ এসবই দেখতে পাচ্ছিল।

এখন, এই শেষবেলায় কাঠামো ভেঙে পড়লে তার একটি ইট দরকার। একটা ইট নিয়ে যাব 'পরসাদ' হিশেবে। ইট, চুন-সুরকির রাবিশের ভেতর থেকে সবাই পাগল

হয়ে ইট খুঁজছিল। সেই ন্যাড়া মাথার ভেতর চুল দিয়ে ডিজাইন করা জয় শ্রীরামেরা, দাড়িঅয়ালা গেরুয়া পরা—সবাই ইট চাইছিল। প্রথমে 'এম' মাঝখানে চাঁদ শেষে 'কে' —এমন ডিজাইনের ইটের খোঁজ সবচেয়ে বেশি। রাজেশ দুটি ইট নিতে পেরেছিল। তার জানাও ছিল না ১৯৩৯-এর ৯ নভেম্বর রাতে ভেঙে ফেলা বার্লিন পাঁচিলের টুকরো ইওরোপে এখন বিক্রি হয় কিউরিও হিশেবে। তার বদলে ডলার পাওয়া যায়। ডলারে কেনা যায় সব সুখ।

হু-আ হু-আ-আ, জয় জয় শিরিবাম, হর হর মহাদেও, পি এ সি জিন্দাবাদ, সি আর পি জিন্দাবাদ বলতে বলতে ইটের টুকরো, রাবিশ যে যার নিজের মতো করে তুলে নিচ্ছিল। পাশে দাঁত বের করে পোজ নেয়া উ. প্র পুলিশ, পি এ সি। কপালে লম্বাটে সিঁদুর টিপ। আবাবও হইচই, চিৎকাব খিস্তি—শালে আখবারওয়ালো— প্রেসবলা, মার পাথব। চালাও ইটা। শালে ফোটো খিঁচ রহে হো—লাঠি, ত্রিশূল, তলোয়াব, রড তাড়া করছিল পিছু হটা চিত্রসাংবাদিককে। জয় জয় শিরিরাম—একজন আর-একজনকে টেনে নিচ্ছিল বুকের ভেতর। অতি উৎসাহী কেউ কেউ তখনো গালাগালি দিতে দিতে ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

### ৬। স্থানীয় সংবাদ

ঢাঁচাকা ভারি নুকসান পঁওছা—এমন খবর টেলিভিশন শুনিয়েছিল। ছবি দেখায় নি। বুকের ভেতর একটা পুবোনো কাঁটা বারবার বিঁধে যাচ্ছিল জয়শঙ্করের। আমি, নীরজা কেউই পারলাম না রাকেশকে করসেবা থেকে আটকাতে। তাহলে আমার সমাজবাদ, লোহিয়াজি, নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশজি— জয়শঙ্কর ভারি চশমা নামিয়ে আনছিলেন চোখ থেকে।

আখির রাকেশকো কুছ হোগা ত নহি—নীরজা এমন উচ্চারণ করতেই পারে, যেমন মায়েরা, কিন্তু আমি—কা জানে, য্যয়সি করনি—অ্যায়সেহি ভবনি বলে খানিকটা চুপ থেকে আবারও ট্রানজিস্টারে বিবিসি শোনার চেষ্টা করি। বাবরি মসজিদ মাঠ হয়ে গেছে। আমরা কেউ তাকে বাঁচাতে যাই নি। সারা দেশে ভাঙচুরওয়ালারা ছাড়াও এতগুলো পলিটিক্যাল পার্টি, তার এত নেতা—এত অসাম্প্রদায়িক মানুষ, সোসাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, এরা সবাই মানবশৃঙ্খল করে, হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলা—লো ঠিক হ্যায়, তুমলোগ মসজিদ তোড়ো তো সহি, লেকিন হমলোগোঁন কা ডেড বডিকা উপর সে জানা হোগা। আমাদের সবার মৃতদেহ মাড়িয়ে মাড়িয়ে, হাতে হাত ধরা মানব-শৃঙ্খলের বাঁধা টপকে তোমাদের যেতে হবে। এটুকু সাহস হল না কারো। এত সাম্প্রদায়িক সদ্‌ভাবনার জুলুস, এত মিটিং, সেমিনার, পদযাত্রা—সব গেল চুলহে, ভাঁড়মে। ওরা জিতে গেল।

বুকের বাতাস কমে আসছিল জয়শঙ্করের। রাত বাড়ছিল ধীরে। সারা দেশ জুড়ে দাঙ্গা লেগে গেছে। আগুন। লাশের পাহাড় জমবে এবার। ওরা তো তাই চাইছিল। সারা *দেশ জুড়ে মানুষের পচা লাশ। সেই লাশের পাহাড় চুড়ো থেকে এক লাফে দিল্লির মসনদ।*

বাইরের ঘরে টেলিভিশনের ছবি রেডিওর খবর একই সঙ্গে বেজে যাচ্ছিল। শহরে কার্ফু লেগে গেছে। জয়শঙ্কর বুকের ভেতর কাঁটার খোঁচা টের পাচ্ছিলেন। কোনো একজন নেতা বলতে পারল না, আমরা বাবরি মসজিদের সামনে অনশন করছি। পার তো আমার লাশের ওপব দিয়ে গিয়ে মসজিদ ভাঙো। মৃত্যু নয়তো সেকুলারিজম। আমিও তো পারি নি। আমবা কেউ-ই তা পারলাম না। করলাম না। বুকের ভেতর সেই পুরোনো কাঁটা খুঁচিয়ে উঠছিল। বাঁহাতে বুক মালিশ করছিলেন জয়শঙ্কর।

শোয়াব ঘরে নীরজা একা। চুপ। আজ আর কারোরই খিদে নেই। জয়শঙ্কর একটু দুধ খেয়ে নেবেন বামদানা দিয়ে। আমি একটা কলা, একটু দুধ—এমন ভাবনার ভেতর নিজের ছোটছেলের মুখ মনে পড়ে যেতে ফুঁপিয়ে উঠল নীরজা। তারপর হাতের উলটো পিঠে জল মুছে ফেলে নিজের মনে মনেই মঙ্গলবার লাড্ডু চড়াবার মানত করে ফেলল বজরঙ্গবলিব কাছে। হে ভগবান, রাকেশ কো সহি সহি লওটা দো—

অনেক দিন বাত জাগার অভ্যেস নেই। তবু জয়শঙ্করের মন্দ লাগছিল না। থানা থেকে কার্ফু পাশ পাওয়া গেছিল খানিকটা ছুটোছুটি করে। থানেদার তাঁকে নামে চেনেন।

সারা রাত একভাবে চৌকি দেয়া।—আমার হাতে লাঠি দিও না। হাতে অস্ত্র নিলে মনের সাহস নষ্ট হয়, এমনটি বলতে বলতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়া ছাত্রটির হাতে বাঁশের লাঠি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন জয়শঙ্কর সাকসেনা। এরা সব র‍্যাডিক্যাল স্টুডেন্ট। মারের বদলে মার বিশ্বাস করে। সাহসী। এখনো সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে। ক্রান্তি। আমার দার্শনিক ভাবনা থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। তবু তো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। নকাশকোনার এই মুসলমান পল্লির মানুষদের কাছাকাছি। এত তাড়াতাড়ি একটা দাঙ্গাবিরোধী কমিটি তৈরি করা, রাত-পাহারার ব্যবস্থা, ক্ষতি হয়ে যাওয়া মহল্লায় মহল্লায় রিলিফ পাঠানো—খাবার জল, ওষুধ, জামাকাপড়, মাথা ঢাকার ত্রিপল, পাউরুটি, রান্না করা খাবার—সবই তো এই ছেলেরা, মেয়েরা। আমায় বাত জাগতে বারণ করেছিল। আমি বললাম, প্রথম দিনটা—থাকি না তোমাদের সঙ্গে। ওরা আপত্তি করে নি। আর আমার মতন আরো দু-চার জন পুরানা পাগল, যারা অনেকটা বয়েস হলেও সমাজবাদ নামের স্বপনকে ভুলতে পারে না, তারাও এই কমিটিতে, রিলিফের আযোজনে।

ভোর ছটা অবদি কার্ফু। তবু সঙ্গে কার্ফু পাশ। মাথায় 'রিলিফ' ছাপ মারা একটা গাড়ি, ওরাই জোগাড় করেছে অনেক কষ্টে, আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল চৌরাহায়। শাম চার বাজে আনা, হম যায়েঙ্গে—

চাচাজি আপ এক কাম করে, আজ রেস্ট লে লিজিয়ে ফিন কাল—আপকা তবিয়ত তো ঠিক নহি হ্যায় না—

নহি, নহি, বাচ্চাদের মতো ঝেঁকে ওঠেন জয়শঙ্কর। হম যাউঙ্গা। ম্যায় ঠিক হুঁ।

আচ্ছা ঠিক হ্যায়—বলত বলতে সাগর শর্মা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে। তার লালচে, নবীন দাড়িমাখা ফরশা গাল কাচের ওপার থেকে একবার জয়শঙ্করের চোখের

সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

আজ রোদ নেই। কুয়াশার চাদর চারপাশে। বেলা কটা হল। জয়শঙ্করের হাতে ঘড়ি নেই। খাদির ধুতি একটু তুলে পরা, পায়ে ক্যাম্বিশের পা-ঢাকা জুতো। তার গায়ে শীতের ধুলো। গায়ে পুরো হাতের সোয়েটারের ওপর খাদির মোটা চাদর। ওই তো পরেট দেখা যাচ্ছে। বড় খোলা মাঠটি। তার ওপব সেই বিশাল বটগাছ। যার গোড়া ইটে বাঁধানো। কুয়াশার ওপারে এখনো আবছা মতো। তবে কি রাত ফুরোয় নি। ঠাণ্ডা হাওয়া জয়শঙ্করের হাড়ে ঢুকে যাচ্ছিল। বাড়ি আর কতদূর। কতদূরে তুমি নীরজা। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না জয়শঙ্কর। পাশের পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে ভোঁতা শব্দ তুলে ভারি চাকার মিলিটারি ট্রাক গড়িয়ে যাচ্ছিল।

জয়শঙ্কর কখনো বটগাছটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। কখনো আবছা। আর তারপরই হঠাৎ ডানদিকে পিচরাস্তার ওপারে কুয়াশামাখা গাছের সারি, তার পেছনে ইউনিভার্সিটির বুক সমান উঁচু পাঁচিল, তারপর অনেকটা ফাঁকা মাঠ—সেখান থেকে ছুটে আসা একটি গুলির শব্দ—সঙ্গে শালা, পাকিস্তানকে আওলাদ, মুসলমান মুহল্লা পাহারাদারি কর রহে হ্যায়, এই উচ্চারণও উঠে আসে।

জয়শঙ্কর উলটে পড়তে পড়তে বুঝতে পারলেন, তাঁর পেটের ভেতর একটা আগুনের ছুবি বড তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল। মাথার মধ্যে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর সামনে বটগাছটি আরো বড়, বিশাল হতে হতে স্থির হয়ে যাচ্ছিল। সিনেমায় যেমনটি ক্যামেরা জুম করে সাবজেকটের ওপব চার্জ করে। গোটা পরদা জুড়ে চোখের সামনে তেমনই স্থির একটি বটগাছ। জয়শঙ্কর ঠিক এরকমই দেখতে পাচ্ছিলেন।

জয়শঙ্কর ঘুরে পড়ে যান। আর সেই গুলির শব্দে ইউনিভার্সিটির প্রাচীন গম্বুজে বসে থাকা পায়রারা ভয় পেয়ে কার্ফুর নিয়ম ভেঙে ডানা ঝাপটে ওড়ে। উড়ে যায়। এমনকি জয়শঙ্করের বাড়ির খাপরার চালে বসা কবুতরের ঝাঁকও—রোজকার গম পাওয়ার অভ্যাসে বসে থেকে থেকে গুলির শব্দে নিরাপত্তার অভাব ঝাঁক বেঁধে আকাশে উঠে আসে। আকাশে কোনো কার্ফু, একশো চুয়াল্লিশ ধারা নেই।

জিনসের টাইট প্যান্ট, স্পোর্টস শ্যু মোড়া দুজোড়া খুনী-পা আবারও এসে দাঁড়ায়। জয়শঙ্কর তখন উপুড় হয়ে দুহাতের দশ আঙুলে বটগাছের গোড়ার মাটি আঁকড়ে ধরছিলেন। তাঁর চশমাটি একটু দূরে, ছিটকে গেছে। খুব কাছে এসে, মাথার পেছন থেকে হত্যা নিশ্চিত করার জন্যে আরো একবার রাইফেল ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ল। এবাবে আর অতখানি বোধ কাজ করছিল না জয়শঙ্করের। তাঁর নাকে পরেটের হিম ভেজা মাটি আর রক্তের ঘ্রাণ। আকাশের পাখিরা তখনো কোথাও নামতে পারে নি।

শালা বুরবাক, বলতে বলতে দুজোড়া স্পোর্টস শ্যু পরা পা কুয়াশার আড়ালে মুছে গেলে গোটা পৃথিবী তেমনই নিঃশব্দ হয়ে যায়। ভারি চাকায় ভোঁতা শব্দ তোলা মিলিটারি ট্রাক যায় আসে, যায়—।

# দীন-ইলাহি

## স্বপ্নময় চক্রবর্তী

*[জীবন পাত্র গতকাল মেমো খেয়েছেন। এখন সিগারেট খাচ্ছেন। টেনশনে খান। কমিউনাল হারমনির উপর একটা প্রোগ্রাম একমাসে তিনবার বেজেছে। প্রোগ্রামটা জীবনবাবুরই করার কথা। কারণ পাকেচক্রে প্রোগ্রাম অফিসার হয়ে গেছেন উনি। দিব্যি ছিলেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে, যুদ্ধ থামলে একসেস্, তখন রেডিওতে চালান দিল। তারপর রিটায়ার করার আগে প্রমোশন। এবার বানাও প্রোগ্রাম! পোষায়? আগে ছিল সংস্কৃত প্রোগ্রাম। নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনটাই 'নরম্' বলে মনে আছে আর শক্তগুলো সবই ভুলে মারা হয়ে গেছে। একজন সংস্কৃত প্রফেসারের হেল্পে চলে যাচ্ছিল কোনোরকমে, গতমাসে ঘাড়ে চেপেছে ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন আর কমিউনাল হারামনি!*

*ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন নিয়ে নো প্রোবলেম। কত পি ভি এস মানে পেট্রিয়টিক ভোকাল সং আছে, আর এই সাবজেক্টের টকার তো বাম-ডান মধ্যপন্থী নির্বিশেষে পাড়ায় পাড়ায়, খুব-একটা অসুবিধে হচ্ছিল না, কমিউনাল হারমনির আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান—রবীন্দ্রনাথের, সরি, সরি, নজরুলের ঐ কবিতাটা পার্থ ঘোষকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে ওটারই গায়ে-গায়ে ছোন্নত করলে হয় মুসলমান নারীলোকের কী হয় প্রমাণ বাজিয়ে দিলে তিনে চারে সাত মিনিট খেয়ে গেল, বাকি আট মিনিট হাজি গোলাম আহমেদ আর ব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের টক (Talk) দুজনেই এম. এল. এ—চার চার মিনিট করে বাজিয়ে দিলেই, ব্যস, হয়ে গেল। এটাই বাজিয়ে ছিলেন তিনবার। শালা রিপোর্ট হয়ে গেছে।*

*জীবনবাবু নতুন একটা প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করছিলেন। অনেক সিগারেট পুড়ছিল। স্কুলফাইনালে আকবরের চরিত্র সংক্ষেপে লিখে ঝাড়া মুখস্থ করেছিলেন। সম্রাট আকবর হিন্দুধর্ম, ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল ধর্মের সার লইয়া এক অপূর্ব নতুন ধর্মের চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন দীন-ই-ইলাহি। দীন-ইলাহি নিয়ে কিছু করা যায় কিনা, এ নিয়ে পাশের টেবিলের কিংশুক ভদ্রের সঙ্গে, কিংশুক নতুন এসেছে, ডাইরেক্ট ইউ পি এস সি—একটু আলোচনা করছিলেন, ছেলেটি তখন ওর ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বার করে দিল, তাহলে এটা নিন জীবনদা, একটা গল্প আছে, পড়ে নিন, অনেকগুলো কমিউনাল হারমনি বানাতে পারবেন।]*

*[ওটা অফিসে পড়েননি জীবনবাবু। আজ ছুটির দিন, বাড়িতে পড়ছেন। বউকে ডাকলেন উনি—মাধুরী—এক কাপ চা। ওদের স্বামী-স্ত্রীর নামের মধ্যে যে এত ভাব লুকিয়ে আছে রেডিও না হলে উনি জানতেই পারতেন না। দিনরাত গান হয় 'আমার*

*জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। গল্পটা শুরু করে জীবনপাত্র। গল্পের নাম 'দীন-ই-ইলাহি'।]*

নূরুল বলল যাদবপুর। দশ টাকার একটা নোট দিল। কণ্ডাক্টার কুড়ি পয়সা হাতে ধরিয়ে দিযে বলল টাকা পরে দিচ্ছি। নুরুল বলল টাকা পবে দিচ্ছি মানে? তাহলে ত টিকিটটাও পরে কবলেই হত। কণ্ডাক্টার বলল, কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? নূরুল বলল-—না, হচ্ছে না। কণ্ডাক্টার বলল, মিনিবাসে নতুন উঠছেন নাকি? নুরুল বলল, এক থাবড়া মেরে মুখ ভেঙে দেব।

*[সব শালার মাথা গরম। হবে না? কেমিকাল সার। এখন বর্ষার টমেটো-কড়াইশুঁটি, শীতে পটল-ঝিঙে, সারা বছর ধনেপাতা হচ্ছে কী করে? সব সারে। কেমিকাল সারে। ঐ সারের জিনিশ, মাদার ডেয়ারী মানে-তো কেমিক্যাল দুধ, পাচ্ছে সব, মাথাটা গরম হবে না?]*

আসলে নুরুলের মেজাজ খুব খাবাপ। একটা ঘর খুব জরুরি। দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স চাইল, ভাবা যায়? পকেট থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল বাব করল নুরুল। ঘড় ভাড়া। গড়িয়া হইতে সোনারপুরের মধ্যে উত্তম উত্তম ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় দুই কামরাব ফ্ল্যাট ৭০০, দক্ষিণ খোলা, একতলায় ৬০০, ইহা ছাড়া উপরে এসবেসটাস ছাদ, রান্নাঘব, টিউবকল, সেঃ পায়খানা যুক্ত ৫০০, সত্ত্বর যোগাযোগ করুন —চিত্তর পানেব দোকান, রামগড়েব মোড়।। দালালের পাল্লায় পডতে চায় না, বড় হুজ্জোত হয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিব গেটের সামনেই স্বাতী দাঁড়িয়ে ছিল। নুরুলকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, বৈষ্ণবঘাটা দেখে এলে? নুরুল বলল—ভোগস। দশ হাজার। চলো চা পেঁদিয়ে আসি।

*[হিন্দু মেয়েটাকে নিয়ে মুসলমান ছেলেটা থাকবে নাকি? ঘর চায় কেন? বিয়েও করেছে নাকি?—বাঙালি ঘরের মেয়েগুলো যা হচ্ছে না আজকাল!]*

নুরুল বলল, আজ শুধু চা খেয়েই ফুটব। গ্যাঁজানোর সময় নেই, ডিউটি আছে।

নুরুল টেলিফোনে কাজ করে।

*[ওঃ, সেন্ট্রাল গর্ভণমেণ্ট সারভেণ্ট? তবে কোয়ার্টারের চেষ্টা করছ না কেন? সাঁতরাগাছিতে একগাদা কোয়ার্টার হয়েছে, এস্টেট ম্যানেজারকে লিখতে পারো। বে-জাতে প্রেম করছ এ-সব খবর রাখো না?]*

নুরুল অফিসে ঢুকতেই একজন মাঝবয়সী দাদা বলল, এই যে 'কাটা' এসে গেছ? তখন একজন মহিলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসল। উনিই অবিনাশদা। নুরুলকে খুব ভালোবাসেন। নুরুলকে কাজ শিখিয়েছেন। ক্যান্টিনে রাতের খাবার বলতে গেল নুরুল। রাতে বিষ্টুবাবু থাকেন। কী তরকারি হচ্ছে? না আলুপটলের। এক তরকারি একমাস ধরে হচ্ছে, যেন মেশিনে তৈরি। সেম স্বাদ, সেম ভিসকোসিটি, সেম স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, সেম ফ্লুয়িডিটি। ছ মাস আগে, নুরুল যখন এক্কেবারে নতুন, রাতের খাবার অর্ডার দিতে গিয়েছিল, বিষ্টুবাবু নাম জিজ্ঞাসা করেছিল, ও বলেছিল লিখুন টেকনিকাল

অ্যাসিসট্যান্ট। বিষ্টুবাবু বলেছিলেন টি এ ত, এখানে অনেকেই আছে নাম বলুন। ও গলাটা একটু নামিয়ে বলেছিল নুরুল আলম। গলাটা নামাল কেন নুরুল? নাম বলতে কীসের লজ্জা? কীসের অপরাধ-বোধ? এটা সেকুলার স্টেট না। বিষ্টুবাবুর অ্যাঁ? শব্দের সঙ্গে কপাল রেখার কুঞ্চনে নুরুল যে-অর্থ পায়, তার প্রতিক্রিয়ায় ও দ্বিতীয় বারে তীব্র উচ্চারণে জানায় নুরুল, নুরুল আলম। বিষ্টুবাবু বলেন, ও। নতুন ভরতি হলেন বুঝি, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন রাত্রের ডিউটি হলেই নুরুল যে প্লেটটা পায় তার মাঝখানে গোলাপ ফুলের ছবি, তার মানে এই নয় যে ক্যান্টিনের সব প্লেটেই গোলাপের ছবি মারা।...ঠিক আছে।

ক্যাবিনেটের একটা ফিউজ উড়ে গেছে, দুটো ট্রানজিস্টার পালটাতে হবে। আব-একটা রেজিসট্যান্স পালটানো দরকার ছিল, বেজিসট্যান্স বোর্ডে একটা ছোটো কমপ্ল্যানের কৌটো মাবা আছে। অবিনাশদা, অবিনাশ মজুমদাব ব্রেন। 'বেল' থেকে রেজিসট্যান্স কবে আসবে ঠিক নেই। কৌটোটার 'ওমস' এখানে ট্যালি করে গেছে। ওটা লুজ হয়ে গিয়েছিল বলে সোলডারিং করছিল নুরুল, তখন বিজনদা বলল, কী, বাড়ি পেয়েছো?

—ধুব! কোথায় বাড়ি? পাচ্ছি না।

—বৌ কোথায়?

—বাপের বাড়িতে।

—মিট করছো? চোখ টিপল বিজনদা।

—খুব অসুবিধে। ওদেব বাড়িতে থাকা যায় না। স্বাতীদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, বাড়িতে নাবায়ণ আছে, স্বাতীর দাদু রোজ পুজো করেন।

—সিগারেট আছে?

—পাউচ আছে। বানিয়ে দিচ্ছি।

—বানাও একটা, ছেড়েই দিয়েছি, এই বৃষ্টির জন্য একটা ইচ্ছে করছে, থুথু লাগিও না, আমিই জুড়ে নিচ্ছি।

—তা তো নিশ্চয়ই, আপনিই জুড়বেন।

—বাড়ি আছে একটা, কেষ্টপুরে, আমার জামাইবাবুর দাদার। খুব মাই ডিয়ার লোক। ওরা গর্ভমেন্ট সার্ভিসেব লোক চাইছে, ট্রান্সফারেবল প্রেফারড।

—আমাদের দেবে তো?

—না, মানে আমি তো ইয়ে, মানে...

—ধুস্। ওদের ও-সব প্রেজুডিস নেই, একবার আমার সঙ্গে বিফ পর্যন্ত খেলো।

*[বিফ্ বাদ। ১৫ মিনিট প্রোগ্রামের পক্ষে এই পর্যন্তই এনাফ্। ওরা ঘর পেয়ে যাবে, বিজনের জামাইবাবু দাদা বলবে, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, অমনি সেতারে ধুন বাজিয়ে দেবো, সুপার ইমপোজে দিলীপ ঘোষের ভয়েস যাবে, এইভাবেই দূর করতে হবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ। আস্তে আস্তে ফেড ইন হবে—'এস হে আর্য এস অনার্য হিন্দু-মুসলমান। শক হুন দল...' হুন কি চীনের লোক? তবে থাক। 'খোল খোল দ্বার রাখিও না আর—' সে দ্যাখা যাবে।]*

বিজনের জামাইবাবুর দাদার বাড়িটা বাসরাস্তা থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে। একটা খালের ধারে। স্বাতীও সঙ্গে ছিল। ও বলল, কত গাছপালা। ও বলল, খালের জল কোথায় যায়? নুরুল বলল, যাতায়াত করতে পারবে তো স্বাতী, যাদবপুর? স্বাতী বলল, একবার তো পালটাতে হবে খালি। বাড়িটার নাম স্বপ্নপুরী। প্লাস্টার হয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন না, ইউনিয়নের মিটিং চলছে পুরীতে। ভদ্রমহিলা এলেন, চুলে লক। নুরুল বলল—বিজনদা পাঠিয়েছেন, ঘরভাড়া দেবেন শুনলাম।

—আমরা ত গভমেন্ট সার্ভেন্ট ছাড়া...

—আমার গভমেন্ট চাকরি, বিজনদার সঙ্গেই...

—অ, এসো, বসো, তুমি করেই বলছি ভাই, মেয়েটি বউ তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

—বিয়ে হয়ে গেছে না হবে?

—না, না, হয়ে গেছে।

—বেশ ভালো, বেশ লাকি বউ হয়েছে ভাই, তবে সামান্য হলেও একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে রেখো। কিছু মনে কোরো না যেন, এটা বাঙালির কালচার। কী নাম গো?

—স্বাতী। স্বাতী মজুমদার।

—কদ্দিন বিয়ে হলো?

—পাঁচ মাস।

—তুমিও চাকরিবাকরি করো নাকি?

—রিসার্চ করি, কিছু টাকা স্কলারশিপ পাই।

—ডক্টরেট হবে?

—হতেও পারি, যদি...

—সব সেপারেট, জল, কল, পায়খানা...

—দেখবো?

—দেখতে পারো, তবে আমি ভাই হৈ-চৈটা খুব পছন্দ করি, ঐ যে সেপারেট সিস্টেমে একেবারে মুখ গুঁজে সেপারেট হয়ে রইলে, আমাদের সেটা একেবারে ভালো লাগে না।

নুরুল দেখল লেবেল খসানো ওল্ডমংকের খালি বোতলে মানিপ্ল্যান্ট, বিয়ারের বোতলে জল, বোতলের গায়ে জলবিন্দু।

নুরুল বলল— সে তো ভাল কথা, আমরাও হৈ-চৈ করব।

ঘরটা দেখল ওরা। ভাড়া? মার্কেটের চেয়ে ৫০ টাকা কম ছাড়া বেশি নয়—তা উনি আসুন, ফাইনাল বলে দেবে। অ্যাডভান্স? মাত্র তিন মাসের, তবে দু বছর পর ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু। স্বাতীর মুখে হাসি ফুটল। সামনের সপ্তাহে এসে একদিন ফাইনাল করে যাওয়া যাবে

—নামটা তো জানা হল না ভাই, নুরুলকে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রমহিলা।

—নুরুল আলম।

—সে-কী? মো-মো-মো—

—হুঁ।

–অদ্ভুত, বিজনটা অদ্ভুত। হাওয়ায় ফোঁড়ানো চাপা স্বগতোক্তি। তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। এসময় স্বাতীই বলল—তাহলে বোধহয ঘরটা আর...ভদ্রমহিলা স্বাতীকে বলল—শোনো, একটু এদিকে এসো। ভিতরের দিকে নিয়ে গেলেন উনি, তারপর বললেন, দ্যাখো, একটা কথা বলি। কিছু মনে কোরো না, শিক্ষিত হতে পারো কিন্তু রুচিটা খুবই খাবাপ। মুসলমান বিয়ে করলে? জানো না ওরা আমাদের কীরকম মেরেছিল। কী না অত্যাচার কবেছে...তাড়িয়ে দিয়েছে...

স্বাতী কথা বাড়ায়নি, চলে এসেছিল।

স্বাতীরা দেশভাগ দ্যাখেনি, দাঙ্গা দ্যাখেনি, যুদ্ধও দ্যাখেনি। ঠিকমতো। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সাইরেনের শব্দ আর ঠুলি পরানো রাস্তার আলো খুব আবছাভাবে মনে পড়ে। আচ্ছা ঐ বাড়িওলি ভদ্রমহিলাও কি দেশভাগ দেখেছে? ওঁর বয়স দেশভাগ দেখার মতো নয়।

স্বাতী যখন এ-সব বলছিল নুরুলকে, নুরুল বলেছিল, মানুষ সহজে ভোলে না। সেই কবে পৃথিবীতে হিম যুগ এসেছিল, প্লাবন হয়েছিল, সেই স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ তাদের মিথলজিতে, তাদের উপকথায়। স্বাতী তখন বলেছিল, আমরা তো দাঙ্গা করিনি তবুও আমাদের ভুগতে হবে বুঝি?

*[একেই বলে মেয়েছেলে। আবার ডক্টরেট হচ্ছে। বাঘ আর ভেড়ার গল্পটাই জানে না। সেই যে ভেড়ার কোন পূর্বপুরুষ ঝরনার জল ঘোলা করে দিয়েছিল বলে...]*

ময়দানে বসেছিল ওরা, স্বাতী ওর গত রাতের মজার স্বপ্নটার কথা বলছিল। ঠাম্মাকে আনতে গেছি ব্যোমকালীতলায়—তখন খ্যাপা বাবা বলছে—ওরে মেয়ে, তোর মনের কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। ঘর চাস তো? ঐ নে। দেখি ব্যোমকালী মন্দিরের উলটো দিকে একটা হলুদ দোতলা বাড়ি। খ্যাপাবাবা আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছে—দোতলায়। দোতলায় কী হাওয়া, পরদা নড়ছে, একটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে বুকশেল্‌ফ। কী মজা যে লাগছিল...।

*[জীবনবাবুরও অনেকক্ষণ ধরেই চোখ লেগে আসছিল। উনিও ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট করে স্বপ্ন দেখে ফেললেন। ভক্তিতে নুরুল খ্যাপাবাবার দীক্ষা নিল, নুরুলের গলায় খ্যাপাবাবার ছবিঅলা লকেট। ও সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে বসে থাকে, আর খ্যাপাবাবা অন্যদের বলছে, দ্যাখ-দ্যাখ একজন যবন কীভাবে আমাতে বিশ্বাস রেখেছে।*

*চটকা ভাঙলে জীবনবাবু এই স্বপ্নটার সঙ্গে গতকাল বাড়ি আসার পথে শেয়ালদা স্টেশনের ইউরিনালে সাঁটা লিফলেটটার মধ্যে একটা লিঙ্ক পেয়ে যান।*

*"জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য বাবা কালাচাঁদ। বিশ্বাস হারাইয়াছেন? জীবনে শান্তি হারাইয়াছেন? বাবা কালাচাঁদের আশ্রমে আসুন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে*

*ভক্তসংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে।"]*

সেই দিনই তোল্লাই হলো। মিহি ধুতি আব হাফশার্ট পরা একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করেই বলল—চলো থানামে। বদমাসি হোচ্ছে।

—আমবা তো জাস্ট বসে ছিলাম। স্বাতী বলেছিল।

—চুপচাপ বোসে থাকলে কুছ বলি না, যখনি হাত লাগিয়েছে তখনি ধরেছি।

—আমরা হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফ।

—সে পুরুফ থানামে দিবেন।

পকেট হাৎড়ে ২২ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেল। এত কমে বাজি নয়। কমসে কম পঁচাশ দিন।

কিন্তু নেই যে...।

স্বাতী লাইব্রেরি কার্ড বের করেছিল, নুরুল আইডেনটিটি কার্ড। নুরুলের কার্ডটা দেখে ও সি বলল—নুরুম আলম? গভমেণ্ট সার্ভিস? ছিঃ, একটা হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করছেন? সাসপেণ্ড হযে যাবেন।

নুরুল বলল, আমরা ম্যারেড।

—বললেই হলো?

—আমাদের সার্টিফিকেট আছে, বেজিস্ট্রির।

—কোথায়, দেখি?

—সঙ্গে-সঙ্গে কেউ রাখে? ঘরে আছে।

—কাল দেখিয়ে যাবেন, এখন যা আছে রেখে যান।

—যাবার ভাড়ার জন্য দুটো টাকা বাখি, অ্যাঁ

*[তোমরা তো আচ্ছা বুদ্ধু, যাও না, কড়েয়া রাজাবাজারে, পার্কসার্কাস, খিদিরপুরের দিকে। ওদিকে তো তোমার জাতভায়েরা থাকে। মিডল ইস্টের টাকায় মসজিদ উঠছে সব—]*

সেদিন অফিসে চুপচাপ কাজ করছিল নুরুল। বনানীদি শাড়ি খশখশ করে খেজুর করছে। নতুন শাড়ি পরে এলেই পাবলিক রিলেশন বেড়ে যায় ওঁর। কেউ বলল খুব ভালো দেখাচ্ছে, কেউ বলল বয়সটা তোর দশ বছর কমে গেছে রে। মাধুরীদি একটু ঠোঁটকাটা। বলল, ইস কী ক্যাটকেটে, মুসলমান-মুসলমান রং, তখনি এই রে বলেই জিভ কাটল। একটু পরেই মাধুরীদি বলল, কী ভাই, বাড়িটাড়ি পেলে?

ওঁর কী দোষ? স্বাতীও তো বলে। নুরুল একবার বলেছিল এইসব জায়গায় আমরা ঘর ভাড়া পাবো না, চল আমরা পার্কসার্কাস, কড়েয়া, খিদিরপুরের দিকে চেষ্টা করি। স্বাতী বলেছিল ঐ-সব জায়গায় কীরকম মুসলমান-মুসলমান গন্ধ। নুরুল একবার স্বাতীকে নিয়ে গিয়েছিল ওর এক দাদার বাড়ি। ওর বাবার জেঠিমা হন তিনি। নিজেদের বাড়ি। বুড়ি তো স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করল। নুরুলকে বলল অ্যাদ্দিনে দাদিকে মনে পড়ল, শুনেছি বিয়ে করেছিস, ইজাব-কবুল করেছিলি তো বাবা? নুরুল বলল,

দেশে গিয়ে করে নেবো দাদি। বুড়ি বলল, সেটা তো জায়েজ হবে না বাবা, ইজাব, কবুল, ওলী, খোৎবা ছাড়া মুসলমানের বিয়ে হয় না ধন। তোর জ্যাঠা খুব দুঃখ করছিল, তুই রোজা রাখিস না, নামাজও পড়িস না, আখেরে খারাপ হবে ধন। এখন তোমরা মিশছ—মেশো, কথাবার্তা কও, কিন্তু খোৎবা না-পড়ে স্বামীস্তিরির ঐ কাজটা কোরোনি বাপ, ওটা হারাম......

তখন ঐ বাড়ির তিন ভাড়াটের রান্নার ফোড়ন। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ তো পৃথিবীময় একরকম, বৌদ্ধদেরও খেতে দেখেছে দার্জিলিং-এ। বীফও। তবে মুসলমানী গন্ধটা, যেটা স্বাতী বলেছিল, সেটা ঠিক কী তা স্বাতীও বলতে পারেনি, তবে নুরুলের নিজেরও এইসব এলাকা ভালো লাগে না। অনেক কারণ। যেমন হয়তো হঠাৎ দরকার পড়ল গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডটা, পাশের বাড়ি খোঁজ করে পাওয়া যাবে খিদিরপুরে? রাজাবাজারের মুসলিম পাড়ায়? তাছাড়া ঐ সব অঞ্চলেই কি আর ফাঁকা ঘর আছে? ঘরের ভিতর ঘর হচ্ছে, বারান্দায় পার্টিশন, সংসার বাড়ছে, যাবে কোথায়? তার উপরে আবার বাইরের লোক? দাদিমাকে বললে হয়তো টেম্পোরারি থাকতে দিত, দোতলায় তিনটে ঘর। তার আগে খোৎবা পড়তে হবে, ইজাব-কবুল, দোয়া দরুদ, এটা ফরজ, ওটা ছোন্নত,......ভাবা যায়?

মেসে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকে নুরুল। ইসমাইল বোর্ডিং। স্টুডেন্ট লাইফে হস্টেলে ছিল। এখন এখানে সত্যি ভালো লাগে না। মাথার কাছে দুলদুলের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। রুমমেট রহমতউল্লা বসিরহাটের ছেলে। ঠিকঠাক নামাজ-ফামাজ পড়ে। ব্যাটা এম. এ.-র স্টুডেন্ট, বাংলার। এখনই মৌলভী মৌলভী ভাব। নুরুলকে তো নাফেস্-ফাসেক বলে খিস্তিই দেয়। গতকাল ঘাড় নাড়িয়ে নুরুলকে উপদেশ দিচ্ছিল—প্যাট্রলের সঙ্গে আগুনের যে সম্পর্ক, একজন যুবতীর সঙ্গে পুরুষের সেই সম্পর্ক। টক খাদ্য দেখলে জিহ্বায় পানি আসবেই। সেইজন্যেই নবী পর্দার বিধান দিয়েছেন। কাঁঠাল দেখলিই মাছিরা ভোঁ ভোঁ করে ধেয়ে আসে। কাঁঠালের যদি ফোঁকড় থাকে, সেখান থিকে মাছিরা কাঁঠালের মধু খায়, আর যদি খোশাটা ঠিকমত থাকে, মাছিরা কিছু করতি পারে না। নুরুল তখন ওকে বলেছিল, যাও ভাই, বাথরুমে গিয়ে হাত মেরে এসো। ও খুব খচে আছে।

ওর টেবিলে একটা বই। মলাটে একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারের ছবি। ঈদের নমাজে, টুপি পরে সেজদা করছে। এই মন্ত্রীই দু-দিন পরে হনুমান মন্দির উদ্বোধন করবেন, কম্পিউটারের সিঁদুর মাখানো কলা লাগিয়ে মেশিন পবিত্র করবেন, বড়োদিনে মাল খাবেন, শিবরাত্রে বেল খাবেন। বইটা হল আনন্দমঠের নোটবুক। শাবাশ। ভালো মলাটে দিয়েছে। খুলে দেখল নুরুল। এখানে ওখানে দাগ মারা। ইম্‌প, ভি-ভি ইম্‌প।

ওখানে শান্তি নামে একটা ক্যারেকটার আছে না, ব্যাটাছেলে সেজে থাকত?

আচ্ছা, একটা মেয়েছেলে যদি নির্বিঘ্নে ব্যাটাছেলে সেজে থাকতে পারে—একেবারে সেই অর্জুনের আমল থেকে, তাহলে ওটাও পারবে। নুরুল অমিতাভর কাছে যায়।

অমিতাভ নুরুলের সঙ্গেই ফিজিক্স পড়ত। এখন স্বাতীদের সঙ্গেই রিসার্চে রয়েছে।

অমিতাভ বলেছিল একটা একোমডেশন আছে নাকতলার দিকে। ঐ টেকনিকাল অসুবিধেটা ম্যানেজ করতে পারলে ঘর হয়ে যেতে পারে। টেকনিকাল অসুবিধেটা হচ্ছে নামটা।

হোয়াট ইজ ইন এ নেইম, একটা ভেগ কথা। নামে আসে যায়। ওর তো আসলে কোনো ধর্মই নেই। ও নিজেকে মুসলমান মনে করে না। হিন্দু তো নয়ই। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান কিচ্ছু নয়। শুধু নাম। নুরুল। নুর মানে তো জ্যোতি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম আরবিতে নুরুলই বোধহয় হবে।

অমিতাভ বলল, ওদের বাড়িতে আগে পড়তাম। এখন আর টাইম দিতে পারি না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিতে স্বাতীর কথাই লিখছি। পত্রবাহিকা আমার সহপাঠিনী ও রিসার্চফেলো স্বাতী মজুমদার......। স্বাতীকেই ফেস করতে বলবি। ওরা রাজি হবে, কারণ ওদের ছেলেটা নাইনে উঠেছে।

কাবায় বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মারা গেছে, সাহাবুদ্দিন হাঁক দিল মুসলিমদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাতে হবে। আর. এস. এস. চ্যাঁচাচ্ছে। রাম জন্মভূমি আদায় করবই, আর নুরুল ঠিক করল ও নারায়ণ হবে। নারাযণ মজুমদার।

অমিতাভর চিঠি নিয়ে নাকতলায় গেল ওরা। দুজন 'সাইন্স' পেয়ে বাড়িওলা তো মহাখুশি। বলছে ছেলেটাকে দেখিয়ে দিতে হবে আপনাদের। মাধ্যমিকে সাইন্স গ্রুপে যেন স্টার থাকে।

নুরুল বলল ঠিক আছে, এইজন্য ভাবতে হবে না। আমার পক্ষে তো ভালোই হলো, চর্চাটা থাকবে।

*[বাব্বাঃ অ্যাদ্দিনে ঘর পাওয়া গেল তাহলে। ঘরই যখন পাওয়া গেল কদিন আগে পেতে দোষ কী ছিল? অনেক আগেই কমিউনাল হারমনি হয়ে যেতে পারত,—খালি ভ্যাজাং ভ্যাজাং।]*

সেদিন সরস্বতী পুজো। বাড়িওলি স্বাতীকে বলেছে সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ো। ঠাকুরমশাই প্রথমেই আমাদের পুজোটা সেরে দেবে। বাড়িওলার ছেলেটা, যে নুরুলদের ছাত্র, স্বাতীর গ্লাডস্টোনের বইটা নিয়ে গেল, কারণ ঐটাই সবচেয়ে মোটা। স্বাতী এলোচুলে। নুরুলের মনে পড়ে কলেজলাইফে, যখন হস্টেলের কালচারাল সেক্রেটারি ছিল। হস্টেলের সরস্বতী পুজো। সারারাত জেগে রঙিন কাগজের শিকল বানানো, খিচুড়ি আর বাঁধাকপি। ঠাকুরমশাই পুজো করার সময় জিজ্ঞাসা করলেন কার নামে সংকল্প বাক্য পড়া হবে? অমিতাভ বললে—কেন, আমাদের সেক্রেটারির নামে।

—সেক্রেটারির নাম কী?

—নুরুল আলম।

ঠাকুরমশাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে—কী বললে?

অমিতাভ বলে—বলছি তো নুরুল আলম।

—গোত্র?

নূরুল বলেছিল, মনুষ্য গোত্র...

—নারায়ণবাবু, আসুন, অঞ্জলি দিয়ে যান। বাড়িওলা ডাকছে।

সক্কালবেলায় অফিসে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয়েছিল, সেটাই বোধহয় ভালো হত।

বলো—ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত......

নুরুলেব দুই হাতেব তালুতে নিষ্পাপ ফুল পাপড়িগুলি দলিত, মথিত হতে থাকে......

*[আর পড়া যায় না।—লাস্টে কি আছে?]*

একটু দূরে আব একপাটি চটি খুঁজে পেল স্বাতী। নুরুল তখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নুরুল তখনও বুঝতে পারছিল কে মুছিয়ে দিল ঠোঁটেব কোণেব বক্ত, কার হাত পিঠেব উপর ঘুরছে।

'আর ভয় নেই। আমরা এবার যাই, দিদি। আর কিছু হলে আমাদেব জানাবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা রক্ষা কববোই'—পার্টির ছেলেরা বলে গেল।

কার হাত পিঠের উপর ঘুরছে নুরুল জানে।

তবু কেন দরজা-জানালা চৌকাঠের গলায় ফিশফাশ শুনতে পায় নুরুল—মিথ্যেবাদীটা নারায়ণ নামে এসেছিল, আসলে নুরুল।

নূরুল বিড়বিড় কবে—আমি তো একই, আমি তো সেই, সেই একই, শুধু নামটা......

*[নামের সঙ্গে কিংশুক ভদ্রের কোনো মিলই নেই। ও অভদ্র। আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছিল। প্রফেশনাল জেলাসি।]*

# রবীন্দ্রনাথ

## স্বপ্নময় চক্রবর্তী

।। এক ।।

আরে মনে কবো তুমি আছো কলকাতায় আর তোমার বিবি রয়েছ্যান দেশ গেরামে, —আর মনে করো তোমার বিবি তোমারে চিঠি নিকেছ্যেন। কি চিঠি নিক্যেচ্ছ্যে বাব্বরা ... শুন বলি ... নিক্যেচ্ছ্যে আমি ভালবাসি তুমি ভালবাসো আমি প্র্যাম করি তুমি প্র্যাম কব আমি ভাল আছি তুমি ভাল আছ, আরও কত মুধুমাখা কতা নেকা আছে বাবারা। আবার চিঠির নিচে একটা গোল দাগ মেরে নিক্যেচ্ছ্যে আমি এই স্থানে চুমা খাইয়াছি তুমি এই স্থানে চুমা খাইও। তুমি সেই চিঠি পড়লে আর ঐ বিবির চিঠি দেখে তোমার প্রাণেব পাখি নাফাতে নেগেছে। দু-বার পড়লে বাবা, তিনবার পড়লে, তিনবার পড়লে বাবা চাববাব পডলে। আপিসে গিয়ে পকিট থেকে বার করে পড়লে আবার বড়বাবু এসে গেল বলে পকেটে নুকুলে! বড়বাবু চলে গেলে আবার পড়তে নেগেছ। তারপর বাসে টেবামে পড়লে, রাস্তায় যেতে যেতে পড়লে, আবার রেতের বেলা মশারির ভিতরে ঘুমোবাব আগে লাস্টবার পড়তে গেলে আর হ্যরিকেনের আগুনে লাইলন মশারি পুড়ে গেলে...

হায়-রে মুসলমান!

দেখবাবা, সারা দিনমানি তুমি বিবির চিঠি পড়ে কাটালে। শয়নে ভাবলে বিবিব কথা, স্বপনে ভাবলে বিবির কথা। তোমার বিবির মোহাব্বতের কথা ভেবেই তুমি তোমার সারা দিনমানি কাটায়ি দিলে। আর ইদিকে যে খোদাতালা মেহেরবান আসমানে নুর জ্বালিয়ে আলো দেচ্ছেন, সেই আলো দিয়ে, বাতাস দিয়ে, নদীর পানি দিয়ে, পাখির গান দিযে. ফুলেব খোসবু দিয়ে সারাদিন তোমায় যে মোহাব্বতের বাণী পাঠাচ্ছেন সে কথা একবারও ভেবে ও দেখলে না।

হায়-বে মুসলমান!

আরে জুতো ছিঁড়ে গেলে তারে কী দিয়ে জোড়া নাগাতি হয় বাবা? তারে পিরেক দিয়ে জোড়া নাগাতি হয়। কাগজ ছিঁড়ে গেলে তারে আঠা দিয়ে জোড়া নাগাতি হয়। আব এই মুসলমানি ছিঁড়ে গেলে তারে কী দিয়ে জোড়া নাগাবে বাবা?

আরে ইবানের মোসলমান তুরানের মোসলমান পাকিস্থানের মোসলমান বাকিস্থানের মোসলমান আমেবিকার মোসলমান হারমোনিয়ার মোসলমান আরমেনিয়ার মোসলমান সব এক সুতো দিয়ে জোড়া লাগানো আছে তা হ'ল মোসলমানির সুতো।

বল ভাই— বিসমিল্লা এর রামে রহিম।

বাবারা সেলাম আলাইকা
মায়েরা সেলাম আলাইকা
দোস্তরা সেলাম আলাইকা।

বলুন কেমন হয়েছে — অমিত জিজ্ঞাসা করল। ক্বারি আব্বাসউদ্দিন বল্লেন আসল জায়গাগুলোতেই তো ভুল করলেন। ঐ শেষেব কথাগুলো। বিসমিল্লা-হের রাহমা-নের রহিম হবে। আব সালামের বয়ানটা হ'ল আসসালামু আলায়কুম অরাহ্ মাতুল্লাহি অ-বারাকাতুহু...

নাটকটাব নাম 'রাম ও রহিম'। লেখক ও পরিচালক ভজন সরকার। এই ব্যাংকের সিনিয়ার ক্যাশিয়ার। কমুনাল হারমনির উপর এবারের প্রোগ্রামেব আইডিয়াটা ওর মাথা থেকেই এসেছিল। এ নিয়ে নাটকটাও শেষ পর্যন্ত তাঁর উৎসাহেই হচ্ছে। বাংলা বাজারে কমুনাল হারমনির উপর তেমন নাটক কই! সমবেশ বসুর "আদাব" কে নাটক করে এ-বছর কম করে ছ-টি অফিসক্লাব নাটক করছে। ভজনবাবু তাই নিজেই নাটক লিখে ফেল্লেন।

নাটকটার ঘটনটা হচ্ছে—একটি গ্রামে দুটি পাড়া। একদিকে মুসলমানরা থাকে, অন্যদিকে হিন্দুরা। মুসলমান পাড়ায় এক পীরের মাজারে উরস হচ্ছে। এখানে কাওয়ালী, পীরের গান এইসব চলছে, অন্যদিকে কীর্তন চলছে হিন্দু পাড়ায়। এমন সময় কীর্তনের আখড়ায় আগুন লাগে। তখন মুসলমানরা সব ঐ দিকে ছুটে যায় ওদের আগুন থেকে উদ্ধার করতে। তখন এরকম ডায়লগ আছে।

কাদেব আলী: পুড়ুক, পুড়ে মরুক ওরা, দোজখের আগুনে মরুক। আমরা কেন যাব?

হাজী আবু বক্কর : থাম। এসব কথা মনে আনাও গুনা। আমরা সবাই আল্লার সন্তান। আল্লা একই রকম রক্ত দ্যাছেন আমাদের শরীলে। ওরা আমাদের ভাই। ভাই বিপদে পড়িছে। এসময় আমরা বসি থাকলে আল্লা আমাদের ক্ষমা করবেন না। চলো ভাইসব।

তারপর ভক্তদাস বাবাজীর পোড়া দেহ বার করে আনে হাজী আবু বক্কর। ভক্তদাস বাবাজী তখন আর্তনাদ করছেন জল ... জল ... তখন আবু বক্কর বলছেন এই নাও পানি। ভক্তদাস ঐ জল খায় আর কাঁপা গলায় বলে, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

নাটকের চরিত্রগুলো সব তখন মঞ্চে সমবেত হয়ে যাবে। লুঙি পরা, টুপি পরা, কণ্ঠি গলায়, পৈতে গলায় সব চরিত্ররা। আবু বক্কর যখন ভক্তদাসকে জল খাওয়াচ্ছে তখন সমবেত স্বরে বলা হবে :

যা জল তাই পানি।
এই দুটোই জীবনের নাম।
যা কৃষ্ণ তাই আল্লা
এরা সবই ভগবানের নাম।
যা রাম তাই রহিম

এরা সবই মানুষের নাম!

পর্দা পড়বে।

ভজনবাবুর এটি তৃতীয় রচনা। এর আগে একটি সামাজিক এবং একটি স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত হাসির নাটক লিখেছিলেন। এটার জন্য প্রচুর খাটতে হয়েছে তাঁর। ঘুঁটিয়ারী শরীফে গিয়ে ঐ পীবেব পাঁচালী রেকর্ড করে এনেছিলেন, যেটা এতক্ষণ অমিত পড়ল। অমিত, হাজী আবু বক্কব-এর ভূমিকায় অভিনয় করছে। ঘুঁটিয়ারী শরীফ থেকে রেকর্ড কবে আনা ক্যাসেটটা অমিতকে অনেকবাব শোনানো হয়েছে। আজ রিহার্স্যালের সময় খিদিবপুর ব্র্যাঞ্চ-এর একাউন্ট্যান্ট ক্বারী আব্বাসউদ্দিন সাহেবকে নিয়ে আসা হ'ল। রিহার্স্যালের সময় উনি আরবি উচ্চারণগুলি শুনে শুনে কারেক্ট করে দেবেন। ক্বারীসাহেব একবাব বলেছিলেন—এইসব পাঁচালী টাচালী ঠিক শরীয়ত সম্মত নয়, আবু বক্কব-এর আগে হাজীটা কেটে দিন। নাটকটার মধ্যে অনেক বে-ইসলামী নাপাক আছে, তবু সবাই বলছে যখন মদত করছি, প্রথমত আল্লা উচ্চাবণটাই হচ্ছে না। জিভটা টাকবাব দিকে অনেকটা বাঁকা করে নিতে হবে। খোদা উচ্চারণেব সময় 'খ' টা গলার অনেক ভিতর থেকে উচ্চারণ করতে হবে। দেখ, এইরকম ... এই হ'ল আরবি উচ্চারণ। অমিত অনেক চেষ্টা করল ক্বারীসাহেবের মত আরবী উচ্চারণ করতে, ক্বারীসাহেব কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। ভজনবাবু বল্ল. ছেড়ে দিন তো ক্বারীসাহেব, ও হচ্ছে ভট্টাচার্যি বামুন, মুসলমানের উচ্চারণ হবে কি করে, বাঙালির মতই করুক, এ্যা? ক্বারীসাহেব হঠাৎ যেন থম মেরে গেলেন। ভজন সরকারের দিকে একবার তাকালেন। এবার কষ্টকর হাসি হেসে বল্লেন, মুসলমানরা বুঝি বাঙালি হয় না? ভজন সরকার বুঝল। একটু নার্ভাস হ'ল। আঙুলের প্রবালের আংটিটা দুবার দাঁতে লাগিয়ে দুবার খট খট করে বল্ল, সরি সরি। কিছু মনে করবেন না ক্বারীসাহেব, নাইন্টিপার্সেন্ট বাঙালির মতই এই ভুলটা করে ফেলেছি। ক্বারীসাহেব আবার হাসলেন। বল্লেন, আবার একটু ভুল করলেন। বলুন নাইন্টিপার্সেন্ট হিন্দুর মত ...

।। দুই ।।

নিজেকে হিন্দু বলিতে গর্ববোধ করি— স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের একটা রঙীন ছবি! আলমারিটার গায়ে স্টিকার লাগানো। বুবুন ফিরেছে। বুবুন রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে। ক্লাস সিকস। অমিতের রিহার্স্যাল ছিল বলে অসীমাই নিয়ে এসেছে। বুবুন অমিতের গলা জড়িয়ে ধরে। অমিত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে ওটা কে লাগিয়েছে?— স্টিকারটা দেখায় অমিত।

অমিত বোঝে—রামকৃষ্ণ মিশন। অমিত নিজে পড়তো তালতলা হাইস্কুলে। ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনা হ'ত: হে তবোবাসনা দেবী হে তবো পশোবিতা ... অনেক পরে জেনেছিল আসলে ওটা শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্প সুশোভিতা। নুরুল, সৈফুদ্দিন, ওদের ও লাইনে দাঁড়িয়ে ঐ প্রার্থনা করতে হ'ত। একবার কি যেন একটা গণ্ডোগোল

হ'ল। দাড়িওলা, টুপিওলা কয়েকজন লোক এসে হেড স্যারের সঙ্গে কথা বলল। তারপরই দেখা গেল নূরুল সৈফুদ্দিনরা লাইনের বাইরে, ওরা কয়েকজন, চুপচাপ, একা একা দাঁড়িয়ে থাকতো। আর লালটু? অমিতের ভাগনে, পড়ে, কলকাতার স্কটিশচার্চ ইস্কুলে। লালটু— হাওয়া হাওয়া করতো, বল্লেই ক্লাস টুর লালটু হাওয়া হাওয়া এ হাওয়া মুঝে প্যার মিলা দে নেচে নেচে গায়। লালটু, এবার প্রেয়ারটা করত, লালটু গড়গড় করে বলে যায়: হে দয়াবান পোভু তোমাব নিমিত্ত আমরা এই ধরাধামে অবস্থান করিতেছি যাবতীয় পাপ তোমাব সমীপে সমর্পণ করিয়া আমরা তোমার নিমিত্ত এই বলিয়া অঙ্গীকাব কবিতেছি যে ... লালটুর গুরুজনবা তখন হাসে। বুবুন, ঐ স্টিকারটা কি তোমাব স্কুল থেকে দিয়েছে?

—না তো?

—কিনেছ?

—ওটা তো ভজন আংকল দিয়েছে।

বুবুনেব আঙুলটা উপরে দেখায়। ব্যাপারটা বুঝে নেয় অমিত। ওদেব ল্যাণ্ডলর্ড! বাড়িওলা। ওরা সব বিশ্ব হিন্দু পবিষদেব লোক। বাড়িওলার নাম হ'ল বামলাল চতুর্বেদী। বড়বাজারে মশলার দোকান।

চর্তুবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগ স— গীতায় শ্রীকৃষনজী বলে ছিলেন। বরণ বিভাজন আর কুছ নাই অমিতবাবু দেখুন না ব্রামহন হয়ে আমাকে এইসব গন্ধা বেওসা করতে হচ্ছে খালি পেটের জন্য— না কি বোলেন। ছোট ছেলেটা দাকানে বসতে চাইছে না—। কোমপিটিশনের পরীক্ষা দিবে বলে খালি মোটা মোটা বই কিনছে আর পড়ছে। বি কম লাগিযে ভি তিন বরস হ'য়ে গেল। দেখুন না আপনার ব্যাংক-উংক মে ...

বামলালের ছেলেব নাম ভজনলাল। আসলে কিন্তু ছেলে নয়, রামলালের শালীর ছেলে, অমিত জানে। আরও জানে ভজনলালের দোকানে বসতে না চাওয়াটা সত্যি নয়। ভজনলাল বসতেই চায কিন্তু রামলালের প্রকৃত ছেলে কেশবলাল ওকে কিছুতেই বসতে দেয় না। আর ঐ জন্যই চাকরির চেষ্টা করছে ভজনলাল।

আরে ধুস। নোকরি-উকরি আমার হবে না। ব্রামহন আছি না কী করে হবে? সব ভ্যাকেন্সি তো রিজার্ভ আছে না, সিড্যুলকাষ্ট পাবে, ট্রাইব পাবে, আহির-যাদব কুর্মী ভি পাবে মুসলমান পাবে,...ভজনলাল বলেছিল।

আরে, তুমি চাকরির কথা ভাবছো কেন? হোয়াই? তোমাদের এত ভালো ফ্যামিলি বিজনেস...

আরে বিজনেস-এর কথা তুলবেন না দাদা, ওটা ধরে নিন আমার দাদার দোকান। ভজনলালের দাদা কেশবলাল কপালে চন্দন লাগিয়ে দোকনে যায় সকালবেলা। অমিত তখন বাজার থেকে ফেরে। আজ গদিতে চল্লেন? অমিত এরকম জিজ্ঞাসা করলে রসিকলাল বলে, গদ্দি? ঐ ছোটোমোট দোকানটাকে গদ্দি বোলেন?

রামলাল একদিন জানতে চেয়েছিল ব্যাংক থেকে ম্যাকসিমাম কত লোন তোলা

যেতে পারে। কারণ ওর মশলার দোকানটার পাশেই একটা জর্দার দোকান আছে, ওটার মালিক একজন বুড়ো মুসলমান, চালাতে পারে না। দোকান বিক্রি করবে বলছে, সাত লাখ চায়। ওর দুই বিবির মোট সাত ছেলে! আমি বলেছিলাম, সাত লাখ চাইছে? এত? রামলাল বলেছিল, আরে রাজ তো উগোকা। আগর রায়ট ফায়ট কিছু হোলে তো বাপ বাপ বোলে দোকান বিকে পালাতো। কী আজীব বাত বোলেন তো, পাকিস্তান ভি নিল, আউর হিন্দুস্থান কা পুরা সুবিধা ভি নিল। এহি জন্য বলা যায় হিন্দুরাষ্ট্র আবশ্যক আছে।

বুবুন, শোনো ভজনের কাছে তুমি স্টিকারটা চেয়েছিলে নাকি ভজনলালই তোমাকে ডেকে দিয়েছে।— আমি ভজন আংকল-এর কাছে ওটা চেয়েছিলাম।— চেয়েছিলে তুমি? কেন?— তুমি ওরকম করছ কেন বাপি? যেন কিছু অন্যায় করেছি। ওটা তো স্বামীজীর বাণী।

—স্বামীজীর তো আরো অনেক অনেক ভাল ভাল কথা আছে বুবুন।

—এটা কি খারাপ কথা?

কোন সময় কি ভাবে স্বামীজী এই কথাটা বলেছিলেন আমি জানি না। তবে হিন্দু বলে আমাদের গর্ববোধ কবতে হবে তার কোন মানে নেই। এরকম জঘন্য জাতিভেদ হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নেই। শূদ্রদের লেখাপড়া করার অধিকার পর্যন্ত দেয়নি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম। দেবতাদের নিয়ে পুতুল খেলা অন্য কোন ধর্মে আছে। দেবতাদের ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করাব এই যে ধারণা...

এমন সময় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ আসে। মসজিদের মাথায় এখন চারটে লাউডস্পিকার। আগে দুটো ছিল। এখন কিসের নমাজ অমিত জানে না। আছরের না মগরবেব না এশার...অমিত শুধু চীৎকার শোনে। পেঁচিয়ে ওঠা তীব্র চীৎকার। বুবুন আস্তে আস্তে বাইরের জানালার কপাট বন্ধ করে দেয়।

## ।। তিন ।।

নাটকের সেট নিয়ে ভজন সরকার বেশ চিন্তা ভাবনা করেছে। কাঠের ফ্রেম করে তার মধ্যে পিসবোর্ড এবং কাগজ সেঁটে একটা মন্দির এবং একটা মসজিদ তৈরি করার কথা ভাবতে হল। মোটামুটি ছবি এঁকে দেয়া হ'ল। প্রফেশনাল স্টেজের কাজ করেন এমন একজনকে কনট্রাক্ট দেয়া হল। বেশ জমজমাট করে নাটকটা নামছে। কথা হল রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংশনের পর নাটকটা নিয়ে ইন্টারব্যাংক ড্রামাকমপিটিশনে যাওয়া হবে।

সুভেনিরের কাজ চলছে। বিজ্ঞাপন ভালই পাওয়া যাচ্ছে হনুমান মার্কা দন্ত মঞ্জন একটা ফুল পেজ বিজ্ঞাপন দিল, পুরো পাতায় হনুমানের ছবি। হনুমান বুক চিরে রাম সীতার ছবি দেখাচ্ছে। টিভির রামায়ণে ঐ দৃশ্যটা ছিল। বুবুনও দেখেছিল চোখ বড়বড় করে। সেবারই পাড়ার বিখ্যাত কালীপুজোয় টুনিলাইটে সাজানো ইলেকট্রিক হনুমান শো করা হয়েছিল গেটের সামনে। হনুমান বুক চিরছেন বুকের ভিতর সিংহাসনে বসে থাকা হাসি হাসি মুখ রামসীতার ছবি। ছবির তলায় লেখা অজন্তা আর্ট প্রেস।

তো, ফুল পেইজ হনুমানের বিজ্ঞাপন এই সময়ে এই পরিস্থিতিতে ছাপা উচিত কিনা এ নিয়ে একজিকিউটিভ মিটিং-এ আলোচনা করা হ'ল কালচারাল সেক্রেটারি বল্ল, হনুমানের তলায় লেখা 'জয় রাম' কথাটা বাদ দিলে আপত্তির কীইবা আছে। ফুল পেইজ মানে দেড় হাজার টাকা। কিন্তু ব্লকেই জয় রাম জী কি সেট করা হয়েছে। ওটা ছাড়া হনুমান হয় না। শুধু হনুমান ছাপা যাবে না। কিন্তু ফুল পেইজ মানে দেড় হাজার টাকা। সুতরাং ছাপা হচ্ছে।

ভজন সরকার বল্ল, যদি সুভেনির-এর প্রচ্ছদে মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসুলমান ছাপি তবে কেমন হবে?

দিলীপ বিশ্বাস তখন খনখনে গলায় বল্ল, আমরা খৃস্টানরা কি মারাবো?

নীতিশ বড়ুয়া বৌদ্ধ কিন্তু শুটকি মাছ বড় ভালবাসে। ও অবশ্য কিছু বল্ল না। সম্পাদকের বক্তব্য একটা দিতে হবে। খগেন রাউত সেক্রেটারি কিন্তু তাব অনেক কাজ। সম্পাদকীয় টম্পাদকীয় লেখার সময় কোথায়? অমিত একটু আধটু লিখতে পারে। খগেনবাবু অমিতকে বলল সম্পাদকীয়টা বেশ ভাল করে লিখে দিতে। লাইব্রেরী থেকে সঞ্চিতা সঞ্চয়িতা সব তুলে দিল।

অমিতেব এক বাল্যবন্ধুর কাগজ বারাসাত বার্তায় কালেভদ্রে প্রবন্ধ লেখে অমিত। পোষ্টে পত্রিকা আসে। তাতেই হয়েছে মুস্কিল। সবিতা চা হল?...ধুব, এসব ছাই ভাললাগে? অমিত লিখল সুধী, আজ সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতাব কালো ছায়া...সবিতা চা নিয়ে এল। ধোঁয়া ও সুগন্ধ। এমন সময় এল ভজনলাল। মাথায় গৈরিক ফেট্টি। বল্ল প্রণাম করতে এলাম। করসেবায় যাচ্ছি। অযোধ্যা। অমিত ওর দিকে হাঁ কবে তাকায় বলে বলো কী? ওখানে তো ভীষণ গণ্ডগোল হবার চানস আছে।

ঠিক আছে। খুন দিয়ে দিব। কিন্তু রামমন্দির শিয়োর আদায় করব।

কিন্তু রামমন্দির হলেই কি তোমার চাকরি হয়ে যাবে?

এটা আমাদের হিন্দুদের প্রেস্টিজের সওয়াল আছে।

তোমার বাবার মত আছে।

শিওর।

অসীমা ফ্রিজ থেকে দুটো সন্দেশ বের করে ভজনকে দেয়। বলে, সাবধানে থেকো।

চলি দাদা। জয় রাম জীকি।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি পত্রিকা। বড় অক্ষরে লেখা, 'গরব সে বোলো হামলোগ হিন্দু হ্যায়।'

।। চার ।।

ফাংশন সাকসেসফুল। সভাপতি হয়েছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। মালা দিয়ে সভাপতি বরণ করল লাল শাড়ি পরা সদ্য যুবতী, আচ্ছা, এটা কি হিন্দু প্রথা নয়? প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, চন্দন ফোঁটা দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, এগুলো সব কী? নারকোল

কেটে জাহাজ ভাসানো? মার্কস লেনিনের গলায় পর্যন্ত মালা পরিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে, এইসব কি হিন্দু অনুসারী নয়? কে জানে? সভাপতি বরণের পর ক্যালকাটা ইয়োথকয়ার গাইলে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান। তারপর নাটক। নাটকটাও জমেছিল বেশ। কেউ পার্ট ভোলেনি। সেটও হয়েছিল দারুণ। স্টেজের একপাশে একটা মসজিদ, অন্যপাশে মন্দির। একবার মসজিদে আলো ফেলা হচ্ছিল, আর একবার মন্দিরে আলো ফেলা হচ্ছিল। ঐ সেট দুটো রেখে দেয়া হয়েছিল। আর ঐ সেট দুটো রেখে দেয়া হয়েছিল বলেই আজ এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মিছিলে মসজিদ এবং মন্দিরের ব্যবহার করা যাচ্ছে। আজকের মিছিল ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের যুক্ত মিছিল। আরও অনেক ব্যাংকই মন্দির এবং মসজিদ-এর ট্যাবলো বানিয়েছে। মন্দির এবং মসজিদকে ব্যবহার করায় মিছিলটা বেশ খোলতাই হয়েছে। অমিত আর সুরঞ্জন প্রথমে ঘাড়ে করে মসজিদ বইল। বেশ ভারি। ভজন আর ইউসুফ বইল মন্দির। কিছুক্ষণ পর অমিত ভাবল, মন্দিরটা বরং একটু হাল্কা হতে পারে। ও তখন ভজনের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে নিল। ইউসুফের সঙ্গে চেঞ্জ করা যাবে না, কারণ ও ইউসুফ। ও মন্দিরই বইবে। এটা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মিছিল। কিছুক্ষণ পর মনে হ'ল মসজিদটাই বোধ হয় হাল্কা হ'ল। অমিত বল্ল, ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে আমাদের, অন্য কেউ এটা ক্যারি করুক এবার। ...বিভেদ নয়, ঐক্য চাই হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। মিছিল এগুচ্ছে ঠনঠনে কালীবাড়ীর দিকে। বুবুনের চিঠি এসেছে গতকাল। চিঠির উপরে লেখা শ্রীশ্রী কালীমাতা সহায়। ওর অঙ্ক বইয়ের ভিতরে একটা ছবি দেখেছিল এবার। মাকালীর দুপাশে বসে থাকা রামকৃষ্ণদেব ও সারদামণি। ঠনঠনে আসতেই শ্লোগান যেন কম কম। অনেকের হাতই উঠে গেল কপালে। অমিতের সামনেই ছিল কানাইবাবু। অমিত বল্ল, এটা কিন্তু আজকের দিনে ঠিক হল না।

—কেন? কী ভুল হ'ল?

—এই যে, যা করলেন...

—কালীপ্রণাম হুঃ। আমরা আমাদের ঠাকুরকে একটি শ্রদ্ধাও জানাতে পারব না? বাঃ। এদিকে হেড অফিসের ছাতের চিলেকোঠা ফুল মোজাইক করে দেয়া হয়েছে নামাজ পড়ার জন্য, শুককুর বার দুপুরে এবং দুঘন্টা কাজ কামাই করে নমাজ পড়ে সে বেলাতো ইউনিয়ন কিছু বলে না।

আর কথা বাড়ালো না অমিত। শুধু বল্ল—আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এই জিনিষটা একটু ক্যারি করুন তো, ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কানাইবাবু উঁচু করে তাকালেন। তারপর বল্লেন, মন্দির বলেই নিচ্ছি।

### ।। পাঁচ ।।

ভজনলাল মারা গেছে। পুলিশের গুলিতে নিহত। অযোধ্যা থেকে ওর মৃতদেহ এসেছে। গৈরিক কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহ। ওর বাবার লুটোপাটিতে দলামোচরা হচ্ছে ঐ গৈরিক

আচ্ছাদন। কে যেন বল্ল—মাত বো, বাম জী উসকো বৈকুণ্ঠ মে লে লিয়া...গলত কিয়া...গলত কিয়া... রামলাল চেঁচায়।

ফুল এল, কতফুল। ধূপ এল, কত ধোঁয়া, বাড়িব সামনে কত লোক...

অমিত শ্মশানে যাবে। শ্মশানে যাবে মবা ভজনলাল। ওর এমপ্লয়মেন্ট কার্ড আব বিনিউ করাব দবকাব নেই। ভজনলালেব কপালে চন্দন, গায়ে অগুরু, ধূপ জ্বলছে। শ্মশানে চলল ভজনলাল। শ্মশানে চলল অমিত, আবও কতলোক শ্মশানে চলল। বাম নাম সত হ্যায়।

এই ভজনলালকে অমিত ছোটবেলা থেকে চেনে! তেলেভাজা মুড়ি ভালবাসত। কার্ফু ভেঙ্গে যাবা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গতে গিয়েছিল তাদেব মধ্যে যে ভজনলাল ছিল সেই ভজনলালকে ভাল করে চেনে না অমিত। অমিত ভজনলালেব খাটেব দিকে যায়। ও কাঁধ দিতে চায়। রাম নাম সত হ্যায়।

ভজনলাল বাংলা গান ভালবাসত। অমিতের কাছ থেকে ক্যাসেট নিয়ে যেত। কাঁধে নেয় ভজনলালের মরা দেহ।

আর্তনাদ করে ওঠে অমিত। কাঁধে ভীষণ ব্যথা। কাঁধে ভীষণ ক্ষত। মন্দিরের ভার বইতে হয়েছে এ কাঁধে। মসজিদের ভার বইতে হয়েছে ঐ কাঁধে। ওব কাঁধে মন্দির মসজিদের ক্ষত। ওর ভীষণ কষ্ট হয়, কষ্ট হতে থাকে।

বুবুনকে কিছু বলার ছিল। অনেক কথা বলার ছিল। সেদিন বুবুন চলে গেল হোস্টেলে। সঙ্গে নিয়ে গেল ঐ স্টিকারটা। বুবুন, অযোধ্যার গুলিতে নিহত সাতশ...সাঁইত্রিশ...সাতচল্লিশ...। গুজরাটের দাঙ্গায় নিহত কুড়ি। জয়পুরে আঠের। বারানসীতে আঠাশ। কানপুরে, হায়দ্রাবাদে, আলিগড়ে, জামসেদপুবে, ঝালদায়, খুলনায়, ঢাকায়...রাম নাম সত হ্যায়।

বুবুন, কটা লাইন খুঁজে পেয়েছিলাম সম্পাদকের বক্তব্য লিখতে গিয়ে, ঐ লাইন কটা তোর জন্য, তোদের জন্য রেখে দিয়েছি বুবুন, রবীন্দ্রনাথেব :

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।.

# বর্ণপরিচয়

## বীরেন শাসমল

আজ বাচ্চাদেব হাতে খড়ি দেওয়ার দিন,
হয়তো সে কাবণেই, পরিচিত মানুষজন অন্তত তাই ভাববে—কাকভোরে উঠে পড়েছেন তাযেব মাস্টার,
কিন্তু না,
খাবাপ একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি, এই
আবছা আমানীরঙা ভোরে, সাদা কালোর কাজ কবা জটিল ব্রহ্মাণ্ড নক্সায়,
গত কয়েকদিনের কানাঘুষা আব ভয়ঙ্কব ঘটনাগুলি ঢুকে পড়ে গভীর দুর্বোধ্য আকার নেয়, বাতচর মনুষ্যমূর্তিরা হাঁসুয়া হাতে ইতঃস্তত ঘুবে বেড়ায়, ষড়যন্ত্রী হাওয়ার সাথে কীসব ফিসফিস করে, পাসনী শোর্ড, রাম-দা হিসহিস করে হাওয়া কাটে, আকাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাবা যেন একটি একটি নক্ষত্র ছিঁড়ে ফেলে,
তারপর,

লতাগুল্ম ঘাস মাটি দ'লে ঘরবাড়ি মানুষজনের বুক কাঁপিয়ে দিয়ে হিম হাসি হাসতে হাসতে চলে যায় কোথায়—যেখানে তার বোধি পৌঁছোয় না, অনুমানও, পরিবর্তে তাঁর কাছে পৌঁছে যায় একুশটি তাজা মৃতদেহের ছবি, একটি ইঁদুরকলের মিনিয়েচার এবং ছেঁড়া ফাটা একটি মানচিত্র—

এবং এসব নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে, বা বলা যায় বিগত কয়েকশো বছব ধবে চিন্তান্বিত আছেন তায়েব মাস্টার, এসময়ে প্রায়শই মানুষজন সতর্ক করে দিয়ে যায় —হাওয়া খাবাপ, সতর্ক থাকুন—কিন্তু কাঁহাতক গর্তের ভেতর চুপচাপ বসে থাকা যায় ভেবে তিনি হাওয়ার গতি বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁব বোধির দরজায় ঘা পড়ে,

এবং এমনই এক উৎকণ্ঠায়

তিনি দুচোখ এক করতে পারেন না, এই যেমন কাল রাতে জানালার ফাঁক দিয়ে তিনি যতোটুকু আকাশ দেখেছিলেন, তাতে তাঁর হাজার বছরের নিদ্রাহীনতা হয়েছিল, দেখেছিলেন আকাশের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত ইফরিতের দীর্ঘ ছায়া, তারাগুলি ভয়ে মিজ মিজ করে জ্বলছে, বেহেস্ত-এর উদ্যান থেকে তাঁর হৃদয় পর্যন্ত প্রসারিত নূর-এর আশ্চর্য আলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু ঠিক এসময়ে বৃষের কাঁধের মতো অন্ধকারের ঢিবিগুলি তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ায়, এবং বিপন্ন তায়েব মাস্টার।

এই আহত ভোরবেলায় তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে, দেখেন হাঁসুয়ার মতো একখণ্ড অন্ধকার ঘন হচ্ছে ঠিক তাঁর মাথার ওপরে, প্রথমে তা ছিল অজগর সাপের

কুণ্ডলীপাকানো দেহের মতো, পরে সেটি কুণ্ডলী খোলে, লম্বা হতে হতে সারা আকাশ ঘিরে ফেলে, ফুঁসতে থাকে, মাস্টারের গায়ে যেন তার নিঃশ্বাস এসে লাগে, মাস্টার অস্বস্তি বোধ করেন, ঘামতে থাকেন এমনভাবে যেন তাঁর অনেকদিন ধরে গভীর কোন অসুখ করেছে, এখন এই নির্বান্ধব আবাসে তিনি একা, তিনি ঘাম মুছতে থাকেন এমনভাবে যেন গোপন কোন রক্তের ধারা হাত দিয়ে মুছে ফেলছেন, বলতে চেষ্টা করেন— আল্লাহ নূরোস সামাওয়াতে—হে আল্লাহ্ তুমি দ্যুলোক ভূলোকের জ্যোতি-স্বরূপ, কিন্তু তাঁর গলা কাঠ হয়ে যায়, তাঁর সামনে অন্ধকারের গলাবন্ধ পরে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু কবন্ধ, জনমানবশূন্য মাইল প্রান্তরের সীমায় দোজখ—যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় একটি বন্ধ ট্রেনের কামরা থেকে, তায়েব মাস্টারের বুকে অসহ্য বেদনা, তাঁর দুনিয়া গুটিয়ে ছোট হয়ে আসে, তায়েব মাস্টার হঠাৎ মন-সংযোগ হারিয়ে ফেলেন, যেন তিনি জীবনের কেন্দ্রভূমি থেকে বিক্ষিপ্ত, মনুষ্য পরিচয় হারিয়ে কোথাও তলিয়ে যাচ্ছেন, অদ্ভুত এক ধরনের বিপন্নতায় তাঁর গলায় খেদোক্তি জমে, তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে অর্থহীন বিড় বিড় করেন, যেন চলে গেছেন স্মৃতিমগ্ন নিকট অতীতে, নিকট মানে এই দুদিন আগের, তিনি সেই হতভম্ব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পানাপুকুরের পাড়ে, সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি তিনি দেখেছিলেন পুকুর পাড় ধরে মাঠে বেবোতে গিয়ে, এই আধা গ্রাম আধা শহরে এখনো রয়ে গেছে মজা পুকুর, পানা জমাট বেঁধে আছে যেন চড়া পড়ে গেছে মানুষের হৃদয়ে, পানার ওপর গজিয়েছে আগাছার জঙ্গল, ঘাস, আর সেই পানার ফাঁকে কুণ্ঠিত অন্ধকারে জেগে আছে একটি মাথা, খেয়াল করে দেখতে গিয়ে মনে হল হাঁ মানুষেরই মাথা এবং একজন তাজা যুবকের, তায়েব মাস্টার হকচকিয়ে গিয়ে ভয়ে খানিক সরে এসেছিলেন,

আবার কিসের টানে যেন কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, খুব কাছে তখন দুটি ভয় পাওয়া চোখ, কেমন অসহ্য বিপন্ন আলো সে চোখে, যেন অনেকদিন, অনেকযুগ সে চোখে ঘুম আসেনি, নিদ্রাহীনতার বেদনাটি স্পষ্ট, তায়েব মাস্টার দেখলেন তা অস্তিত্বের বেদনাও বটে, পচাপানায় নিজেকে অর্ধেক পুঁতে রেখে সেই মনুষ্যমূর্তি একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে কী ভিক্ষা করছিল কে জানে, মাস্টার ভাবলেন তিনি কী দেবেন, কী দিতে পারেন, প্রাণ দিতে কি তিনি পারবেন প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, এসব সংশয় সেই মুহূর্তে তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল, তবু,

তিনি তাকে চুপিচুপি উঠে আসতে বলেছিলেন জল থেকে, চারদিকে সতর্ক চোখের কথা একবার ভেবেও ছিলেন, মানুষের চলাফেরা ক্ষিপ্র, ভয়ার্ত, এখানে ওখানে অশ্লীল উত্তেজনায় কেউ কেউ দাঁত বাজাচ্ছিল, তবু,

সেই আর্ত মানবকে তিনি উঠে আসতে সাহায্য করেছিলেন কেননা ঠিক তার পরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে, আলো ফুটলে বিকৃত উৎসব শুরু হবে, যুবকটির মাথা আস্ত থাকবে না, মাস্টারের মনে হল আপাতত সে বলির জন্য নির্দিষ্ট সেই ছাগল যে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু লুকোবে কোন খোঁদড়ে, এমন ছাগলের বেঁচে থাকা উচিত কিনা, ঘাড় উঁচু করে মনুষ্যসমাজে ফিরে যাওয়া উচিত কিনা ইত্যাদি ছোটখাটো ভাবনায়

হঠাৎই বহুদিন আগের পড়া একটি গল্পের কথা মনে করে বসলেন, মানুষ পশু হয়ে গেলে পশু নাকি মানুষ হিসেবে গণ্য হয় যেমনভাবে রমেশ সেনের 'সাদা ঘোড়াটি' হয়েছিল এবং মনুষ্যক্রোধের মর্যাদা দিতে দু'টুকরো হয়ে রাস্তায় পড়েছিল তায়েব মাস্টার সেই দু'টুকরো হওয়ার দৃশ্যটি ভাবতে ভাবতে সেই যুবককে রাতে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, সারারাত জেগে জেগে পাহারা দিলেন, আর তখনই তাঁর নিজেকেও মনে হল সেই বিপন্ন যুবকের মতো, তিনিও এই আগাছা আর পানাভর্তি মনুষ্য জঙ্গলে শিকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে পচা পানাপুকুরের ডুবে আত্মরক্ষা করছেন, অথচ নিজেকে পানাপুকুর থেকে না তুললে আশ্রয় পাওয়া কঠিন, পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কোথাও যাওয়া যাবে না, অথচ যেতে তাঁকে হবেই, বাচ্চাগুলিকে আনতে যেতে হবে, ভয়ে থেমে থাকলে চলবে না, বাচ্চাগুলি আসবে, না আসবে না, অথচ বাচ্চাগুলোর আজ তাঁর কাছে আসার কথা ছিল, এলো না কেন ভেবে তায়েব মাস্টার চোখ বন্ধ করেন দেখেন বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ ট্রেনটার ওপারে,

আবার বাচ্চাদের মুখ ভেসে ওঠে, তিনি তাঁর হৃদয়জুড়ে তাদের দেখতে পান, কী এক ঘোরে বলে ফেলেন, কী সুন্দর এইসব শিশুরা, কিন্তু এই সৌন্দর্য সুষমা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, বারবার ফিরে আসে বন্ধ ট্রেনের কামরা তখন তিনি দার্শনিক হয়ে পড়েন, না-না করলেও লোকে শোনে না,

তিনি রিটায়ার করেছেন তবু তাঁকে এরা রিটায়ার্ড থাকতে দেবে না, আর তাঁরও হয়েছে যতো জ্বালা, অদৃশ্য সুতোর টানে তাঁকে বারবার ফিরতে হয় তাদেরই কাছে, অক্ষরগুলি দিব্যতায় জ্বলে, অক্ষর মানেই তো সেই নূর-এর বাতি, বাতি জ্বললে খুলে যায় অন্ধকারের দুয়ার, যে অন্ধকার তাড়াতে মানুষ সেই গুহাযুগ থেকে ভাবনাচিন্তা করেছে, কবে রাত্রি প্রভাত হবে এই আশায় ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে আগুনের কাছে, শিশুদেরও তো সেই মানবের আদিরূপ হিসেবে দেখতে হবে, নজরুল হয়তো একথা ভেবে মাত্র দুটি কথায় হাজার কথার ছল রাখলেন: ভোর হল দোর খোল খোকাখুকু ওঠরে—ওপারে অক্ষরে—জগৎ জানার চাবিকাঠি, এপারে তমস, মহারাত্রি, অন্ধকারে মানুষ অন্ধ, ওপারে আহ্বান ওঠে; ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মুনিঋষিনবীদের সেই গভীর মন্ত্রোচ্চারণ—হে তিমিরবিনাশী জ্ঞান, তুমি মূর্ত হও—তায়েব মাস্টারও খড়ি ছোঁয়াতে যাবার আগে সেই জ্ঞানকে আহ্বান জানান, হে তিমির বিনাশী জ্ঞান তুমি রূপ নাও গোল, চৌকো, তেকোণা এই অক্ষর চিহ্নগুলিতে, তাৎপর্যময় এই মহাবিশ্বকে প্রকাশিত কর—

এমনই পরিচিত ধ্যানমগ্নতায়

তায়েব মাস্টার আবার মা-পাখি হন, অক্ষর খুঁটে তুলে ধরেন বাচ্চাগুলির ঠোঁটে, তারা কিচমিচ করে ডাকে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পাখিগুলি রব করে, কাননে কুসুমকলিরা একে একে সবাই ফুটে যায়, দিগন্তে, আকাশ পর্দার পেছনে, বোধির গভীরে সঞ্চিত আলোকঝর্ণায় দেবশিশুরা গান গায়, কিন্তু হঠাৎই তারা মিলিয়ে যায় কোথায়

তাদের সামনে তেড়ে আসা অজগরটি নিঃশ্বাস ছাড়ে, বর্ণমালাগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে ভাগ হয়ে যায়, দস্যুরা তাদের লুঠ করে নেয়, দু'দলে ভাগ কবে নেয, তখন তারা পবস্পরে খামচাখামচি করে,

বিদ্যাসাগরেব 'জল' আর 'পানি' দুটির আলাদা মানে হয়, আকাশ থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বারি ঝরে, জল পড়ে বটে কিন্তু তাতে গাছের পাতাগুলি নড়ে না, বরং গাছগুলিকেও দেখায় ক্লান্ত, কালিমাখা বিস্তীর্ণ প্রান্তবে তাবা গা জড়াজড়ি করে রুদ্ধশ্বাস দাঁড়িয়ে থাকে, দূরে কালিমাখা সেই ট্রেনের আদল চোখে পড়ে, উত্তেজিত মানুষজন পবস্পবের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সশস্ত্র. কে বা কারা ট্রেনের পেছন দিকেব ভ্যাকুয়াম পাইপ কেটে দেয়, অন্ধকারে কারুর গলা শোনা যায়: বল শালা, 'জল' না 'পানি' 'কৃষ্ণ' না 'আল্লা', এমন কুৎসিত আদেশে তায়েব মাস্টার উৎকণ্ঠিত হন, যেমন বহুবার হযেছেন, শব্দসত্য মিথ্যায পবিচিত করে নিজেকে, এবং এটিই মিথ্যের সত্য হয়, প্রাণের ভয়ে আল্লাহ হন কৃষ্ণ. জল হয়ে যায় পানি, তখন কারুব দেশ গাঁ জম্মস্থান থাকে না, ধূ ধূ মরুতে আঁধি ওঠে, জীবনভূমি যেখান থেকে দূবে, বহুদূরে, মরুতে দুরতিক্রমী রাত্রি নামে, ভয়ার্ত এক নারী অন্ধকারে তাকে যেন শুধায়—এরা কারা, উত্তরে কেউ কেউ বিকৃত হাসিতে নৈঃশব্দ ছিঁড়ে ফেলে, বলে, এরা আব কোনদিন আল্লাহের নাম উচ্চারণ করতে পারবে না, তায়েব মাস্টাব তাঁর প্রিয় অক্ষরগুলিব দিকে তাকান, তারা যেন আতঙ্কে পাণ্ডুর, তায়েব মাস্টার ধীরে উচ্চারণ কবেন, হে ভগবান দানবদের হাত থেকে তুমি অক্ষরগুলিকে রক্ষা কর, কিন্তু

দুঃস্বপ্নের ডানা আকাশ ছেয়ে ফেলে, তাঁর চারপাশে বিষাদ জমে, বায়ুস্তর ভারি হয়ে ওঠে, ধীরে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে সে বিষাদ, তাঁর চশমার কাচ ভাঙে, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি, গভীর হৃদয়দেশে বহুদিনের লুকনো এ্যালবামটির পাতা খুলে যায়, অপ্রতিহত একটি মুখ মনে পড়ে, মনে পড়ে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়, যেন এই এসে সে দাঁড়ালো সামনে, তীব্র অব্যর্থ যুক্তির তীরন্দাজ ছিল সে, তাঁর মুখ ফালাফালা হয় যন্ত্রণায়, কিন্তু পরাজিত সে মুখ তিনি আর দেখাবেন না তাই না দেখাবার কষ্টে কষ্ট করেও পথে বেরোন

বেরিয়েই হকচকিয়ে যান, ভোরের শুদ্ধ হাওয়ায়ও শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাঁর, নাকে গন্ধ পান কিছু পচছে, গন্ধের উৎস ধরতে পারেন না, ভাবেন একি তাঁর নিজের ভেতরে, এই ভেবে মাস্টার বিব্রত, দু'পাশে আবছা গাছপালার তলায় কি কোন সরীসৃপ হেঁটে যায়, এই আলোছায়ার খেলায়, তীব্র পচনগন্ধ নিয়ে বাতাস বয়ে যায়, মাস্টার চোখ বোজেন, আর তখনই

একটি মৃতদেহ, অতি পরিচিত মৃতদেহটি চোখে পড়ে, নাকি একটি ইমান

একটি স্থির বিশ্বাস যার মুখোমুখি হ'তে পারেন না তিনি, কোথাও আশ্রয় খোঁজেন, কোথায় আশ্রয় —এ প্রশ্নে বিশ্বচরাচর খুঁজতে লেগে যান, এবং

আপাত গ্রাহ্য পূর্বাপর ঘটনাসম্বন্ধ

তাঁর মনে একটি শৃঙ্খল তৈরি করে, খবরের কাগজ হাতে কিছুক্ষণ তিনি অর্থহীন

ফ্যাকাশে চোখে বসে থাকেন, সর্বশেষ সংবাদসূত্রে ক্রমপ্রকাশ্য মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় একুশ-এ, অনেক মানুষ স্বভাবতই নিখোঁজ থেকে যায়, যেমন চিরকাল থাকে, সরকারি ভাষ্যে অপ্রয়োজনীয় এই মৃত্যুর জন্য স্বভাবতই কোন বেদনা থাকে না, হতাহতের সংখ্যার সমর্থনে বড় জোর কৃত্রিম বিবৃতি যান্ত্রিক নিয়মে ছাপা হয়ে যায়, অক্ষরের আগুন থিতিয়ে এলে পড়ে থাকে অনুভবের ছাই,

এইসব ছড়ানো মৃতদেহের ভূগোল টপকে যান তিনি, কেননা এ ভাবেই যেতে হয় পথে, আবার সেই পচন গন্ধে তাঁর শরীর ভূখণ্ড বিষিয়ে ওঠে, এখানে শিশুরা বাঁচতে পারে না, শ্বাস নিতে পারে না, গন্ধের উৎস খোঁজেন তিনি, খোঁজেন কোথায় সেই গলিত মৃতদেহটি রয়েছে কিন্তু তাঁর চারপাশের লোকজনের কোন বিকার থাকে না, তারা বল্লে ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যাঙ পচেছে, অথচ তায়েব মাস্টার ঘুরে বেড়ান পাট খেতে, না হৃদয়ের খেতে, সেখানে নাকি অনেক দিনের দুর্গন্ধ জমে আছে, সে দুর্গন্ধ কেউ কি কোনদিন সাফ করবে না,

তায়েব মাস্টার হঠাৎ সেই প্রিয় মুখটিকে আবার দেখতে পান, যেন সে দাঁড়িয়ে আছে, কাছে ডাকছে, এসো—এবং এই আহ্বানের সাথে সাথে তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ স্রোত খুলে যায়, ধর্ম শিকারীরা শরীয়ত বিরোধী পৌত্তলিক বলে যে মুখ শিকার করেছিল আজ থেকে দশবছর আগের কোন এক রাতে, পবিত্র ইসলামকে সে নাকি বিপন্ন করে তুলেছিল, মোল্লা মৌলভীদের বলেছিল অচল আধুলি, বলেছিল এরা সব শূন্যমার্গে শূন্যের খিদমৎগার, জ্ঞান নিয়ে এরা মিথ্যে রহস্যলোকে লুকায়, অথচ জ্ঞান কখনোই রহস্যাবৃত থাকতে পারে না, আল্লাহের নূর-এর মতো জ্ঞান যতো রহস্য কুহেলী সাফ করে দেয়, এইসব মৌলভীরা যখন আল্লাহকে রহস্যে ঢেকে রেখে সাধারণ মানুষগুলিকে বোকা বানায় তখন এরা আল্লাহের দিক থেকে উল্টো পথে হাঁটে ইত্যাদি ইত্যাদি চোখা অস্ত্র নিয়ে সেই ছেলেটি হাঁটছিল মুক্ত সূর্যের দিকে অথচ মোল্লারা তাকে খেয়ে ফেললো, তার রক্ত এই পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়েছিল, এপথে তার রক্তের দাগ ছিল,

এমন চিন্তায় তাঁর ভেতরেই গোবিন্দমাণিক্য বলে ওঠে, এত রক্ত কেন জয়সিংহ —সে রক্ত সোপান শ্রেণীর ধাপগুলি বেয়ে তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন একে একে ভয়ঙ্কর সব উন্মোচনের দৃশ্য—হৃৎপিণ্ডের কাটা দাগগুলি দগদগে জ্বলুনিতে ছেয়ে দেয় শারীরবৃত্ত, একে একে দৃশ্যগুলি ভিড় করে—সাতচল্লিশের লাহোর কিম্বা অমৃতসরের বন্ধ ট্রেনের কামরা, রক্তের তীব্র গন্ধ, আরো আগের সেই উনিশশো ছাব্বিশের রক্তধারা এসে মর্মমূলে ঢুকে পড়ে, তায়েব মাস্টাব লণ্ডভণ্ড হয়ে ছে'চল্লিশের নোয়াখালিতে উপস্থিত হন, খোদা আর ঈশ্বরের কাজিয়া বা একতরফা খোদার প্রবল ধর্মযুদ্ধ দেখতে দেখতে তিনি খুঁজতে থাকেন মানুষের জন্য পাকা বাসভূমি,

কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর নিজের জন্য কোন শহর বা গাঁ নেই, থাকলেও যেন সে শহর সে গাঁয়ের মানুষ জনকে তিনি চেনেন না বা তাঁরা তাকে চেনে না, তায়েব মাস্টার এই তথাকথিত মনুষ্যাবাস থেকে অনেক দূরে, কোন মরুর বুকে বসে দূরের

কাফেলার দিকে চেয়ে থাকেন, কালো বিন্দুর মতো দূরে বহু দূরে তা দেখা যায় কিন্তু কোন সময়ে তা কাছে আসে না, বা এমনও হতে পারে কাফেলা তাঁর মতো আর্ত মানুষকে ফেলে এগিয়ে গেছে, সেখান থেকে হৃতসর্বস্ব মুসাফিরের মতন তিনি মানবকেই ডাকেন, কিন্তু কেউ শোনে না সে ডাক, তিনি বাচ্চাগুলিকে ডাকেন, বাচ্চারা আসে না, শুধু হাওয়া ধেয়ে আসে, পাশের কোথাও কোন জনপদে বহুদিন ধরে আগুন লেগেছে, আগুনের চক্রান্ত লেগেছে আরো বহুদিন আগে থেকে, কিছু মানুষ তায় বৃথাই জল ঢেলে যাচ্ছে, ভেতরে, একেবারে ভেতরে সেই আগুন জ্বলছে অবিনাশী, আগুন ধেয়ে আসে, লোমকূপে উত্তেজনায় চাপ পড়ে, তাবিখগুলি ওলোট পালোট হয়, ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়ে পড়ে, তারিখগুলি গাদাগাদি লাশ নিয়ে দগ্ধ হয়, এবং এই অবিনাশী আগুন নিয়ে তায়েব মাস্টার বসে থাকেন গুম হয়ে, আচ্ছা কতোকাল তিনি এভাবে বসে আছেন-এমন চিত্রে, কৃষন চন্দরের 'অমৃতসর' গল্পের নানীও পাথর হয়ে বসে থাকেন তাঁর তৃষ্ণার্ত কচি নাতিকে নিয়ে, কামরায় রাত্রি নামলে রক্তের গভীরতা বাড়ে, সহৃদয় তেমন কোন মানব পুত্র রক্তের বদলে রক্ত খাওয়াতে চাইলেও তিনি নড়েন না, বেলা বাড়ে, প্রখর রোদ আর মেঘলা আকাশের জটিল গুড় গুড় বেড়ে যায়, সেই কচি বাচ্চাটিব প্রোফাইল বড় হতে হতে তাঁর চারপাশ জুড়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে জল চায়, কিন্তু তিনি জল দিতে পারেন না, তখন তাঁর সেই প্রিয় মুখটি কাছে এগিয়ে আসে, কিন্তু আবার সেই চিন্তা তাঁকে আক্রমণ করে, বাচ্চাগুলো এখনো এলো না কেন—তবে কি ওরা আসবে না, তবে কি,

ওদেরও মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেছে অনতিক্রমী দিওয়ার, এমন সব সম্ভাব্য সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে করতে তিনি ব্যথা অনুভব করেন, ব্যথাটা পাক দিয়ে ওঠে, নিদানকালে নাড়ি খুঁজে-না-পাওয়া ডাক্তারের মতো মুখটি তাঁর, আজ চারপাশের এই ছোট্ট শহরটাকে অবিশ্বাসী মনে হয়, তিনি শহরকে কেমন নির্মম বিষণ্ন উত্তেজিত দেখেন, তখন আবার সেই দানবের লুণ্ঠন শুরু হয়ে যায় তাঁর আকাশে, তারা আবার বর্ণগুলিকে ভাগ করতে লেগে যায়, ভেদচিহ্নগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে, যেগুলিকে পছন্দ নয় সেগুলিকে নির্বিচারে তছ্ নছ্ করে যায়, নিচে পথে পথে কিছু নিরীহ মানুষ হতভম্বের মতো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খুন হয়ে যায়,

তায়েব মাস্টার হায় হায় করে ওঠেন, চিৎকার করে বলেন, আপনারা শুনুন পূজা ধ্যান-সমাধির সাথে কালিমা নামাজ্ রোজা হজ্ব যাকাত-এর কোন মৌলিক প্রভেদ নেই, কিন্তু কেউ শোনে না তাঁর কথা, তিনি সুরা ফাতেহা থেকে আবৃত্তি করেন, ইন্না, ল্লাহা রাব্বী ও আরব্বুকুম ফা-রোদু হো আজা সেরাতুম মুস্তাকিম, শুনুন আপনারা—পরমেশ্বর আমাদের সবারই প্রতিপালক, তাঁর ভজনা করুন, এটিই একমাত্র সরল সত্যপথ, সেরাতুম মুস্তাকিম—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধিয়ো যো নঃ প্রচোয় দয়াৎ ওঁ —আমি ধ্যান করি তাঁর আলো, সেই নূর, তিনিই আমাদের মহাবিশ্বের চালনকর্তা, তাঁকেই ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে সত্য এবং মঙ্গলের দিকে চালিত করুন,

কিন্তু কেউ কান দেয় না তাঁর কথায়, তাঁর চোখ জ্বালা করে ওঠে, আবার সেই পচনের গন্ধ পান তিনি, যেন দোজখ্-এর রন্ধ্রপথ দিয়ে ধেয়ে আসা-না-পাক দুর্গন্ধ বাতাস দূষিত করে রেখেছে,

তায়েব উৎকণ্ঠায় পথের দিকে চেয়ে বসে থাকেন, খবরের কাগজের হরফগুলি ছিটকে পড়ে পথে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এটি একতরফা খুন, যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সমূহ ভাষা পায় খণ্ডবিখণ্ড মনুষ্যজটলায়, প্রক্ষিপ্ত তপ্ত আলোচনায়, তিনি বোঝেন এখনো কসাইদের উৎসবের রেশ কাটেনি, এখনো পরস্পর বিরোধী মন্তব্য উত্তাল রাখে হাওয়া, গলির ভেতরে, চায়ের দোকানে মনুষ্যভাষা খুবই সতর্ক, হাওয়া ক্রমশই খারাপ হচ্ছে,

সারা শহরে শুধু ফিসফাস,

মাস্টার নেমে আসেন দরজার কাছে, তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে উত্তেজিত জনতার একটি ছোট্ট দল চলে যায়, তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন তাঁকে দেখে তাদের কথাবার্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তারা খানিক হতভম্ব, তবু কষ্ট করে কেউ একজন বাধ্য হাসিটি মেলে ধরে, কিন্তু সে হাসিতে কোন প্রাণ থাকে না, তায়েব মাস্টার বিস্মিত, ঠোঁটের ডগায় কুশল-জিজ্ঞাসার সামান্য ইচ্ছা জেগে মিলিয়ে যায় তাঁর,

আর এমনই সময়ে বুড়ো চক্রবর্তীকে আসতে দেখা যায় কতকগুলি শিশুকে নিয়ে, তারা কলকল করে আসে, তায়েব মাস্টারের ভেতরের অক্ষরগুলো হুটোপাটি শুরু করে দেয়, আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেন তিনি কিন্তু,

মাস্টারের কান্না থেমে যায়, তিনি দেখেন রাস্তার উত্তেজনা, জনা-দশ বারো লোক হাত পা নেড়ে চক্রবর্তীকে কী সব বোঝাচ্ছে, বারণ করছে নাকি, না ভয় দেখাচ্ছে এখান থেকে ঠিক বোঝা গেল না, চক্রবর্তী রীতিমত উত্তেজিত, মাস্টার ভাবলেন সব শেষ হয়ে গেল, কিন্তু না, চক্রবর্তীকে দেখা গেল শিশুদের নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকেই আসতে, আমুদে চক্রবর্তী দূর থেকেই ডাক দেন, মৌলভী সাহেব—থুড়ি মাস্টারসাহেব—নাও এগুলিকে আমি তোমার হাতেই দিলাম, আচ্ছা করে বিদ্যে দিয়ে দাও, এমন কষে বাঁধবে যাতে সরস্বতীর হাত থেকে কিছুতেই পালাতে না পারে, একথা বলে চক্রবর্তী সহাস্য তাকান, মাস্টাব কিন্তু ম্লান হাসেন, সাদা দাড়ির ভেতরে সে হাসি বিকশিত হয় না,

চক্রবর্তী বলেন, ধর্মযুদ্ধের রেশ কাটেনি, আজও আবার ছোটাছুটি, চারদিক থমথমে, গত ক'দিনের খোয়াড়ী কাটেনি, ধর্মের গলায় ছুরি চালিয়ে সব ধার্মিক হয়েছে, গুণ্ডা মস্তান লোচ্চা সব তেলক কেটে ভগবানের ষাঁড়, এতদিন একসাথে বাস করে এলাম আজ এরা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভগবানের সৃষ্টিকেই দেশ ছাড়া করে দেবে, কী মাস্টার হাসছো না যে, বলে চক্রবর্তী তাকান তাঁর দিকে, শিশুগুলি কিচমিচ করে, মাস্টারের নিজের হাতে লাগানো রজনীগন্ধার ডগা দোল খায়, বাইরে কোথাও একটি আহত কোকিল ডেকে ডেকে কাঁদে, কাকগুলি খা খা করে উড়ে যায়, মেঘেরা দলবেঁধে হামলাবাজদের মতো জড়ো হয় মাথার ওপরে, চক্রবর্তী মাথার ওপরে অকারণে যেন তাকান, আকাশের অবস্থা ভালো না, বুঝলে মাস্টার, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে আজ, বড্ড

ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি, এতদিনের পুরনো একটা ব্যাপার ভুলি কী করে, ও হাঁ, ভুলে গেলে চলবে না আজ তোমার নেমন্তন্ন আমার বাড়িতে, তবে একলা যেও না আজ, আমি লোক পাঠাবো, একলা কোনমতেই যাবে না, আরে তোমার ভয় নেই, চক্রবর্তী বেঁচে থাকতে, হাঁ তবে বলি শোন, এত বছর পরে আজ প্রথম আমাকে একটু ঝামেলায় পড়তে হল বুঝলে, বলা যায় ছেলেদের সাথে লড়তে হল, মাস্টার, আমরা বোধহয় পুরনো হয়ে পড়ছি, এরা নাকি আধুনিক, আচ্ছা আধুনিকতা আর অসহিষ্ণুতা কি এক, যাক্‌গে—

মাস্টাব, চক্রবর্তী একটু থামলেন, চুপি-চুপি তোমায় বলি, আজ কিন্তু তোমাব সামনে আসতে আমার লজ্জা করছিল, হয়তো আমি আমি বলেই, আমাদেব এ পাপের কি কোন ক্ষমা হতে পারে, আচ্ছা মাস্টার শব্দের কি কোন সম্প্রদায় হতে পাবে আমার জানতে ইচ্ছে করে কে এমন সব নাম চালু করেছিল কে এগুলিকে সমর্থন করেছিল, বহুবার, সেই আগে যখন কংগ্রেস করেছি তখন থেকেই আমি এর বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি —এই যে হিন্দুস্থান পাকিস্তান—

মাস্টার এবাব হাসেন, শিশুদের শেলেটে দাগ টানতে টানতে বলেন, শব্দকে আমরা শত্রু করেছি, বর্ণকে ব্যবহারের পাপে অপবিত্র করেছি, দেখ, 'হিন্দুস্থান' কথাটাব বিপীবতে শত্রুর মতো দাঁড় করানো হল পাক-ই-স্তান, কিন্তু 'পাক' কথাটার মানে কী—পবিত্র, পবিত্রতার কোন্ জাত, কোন সম্প্রদায়, পবিত্রতার উল্টোদিকে হিন্দুই বা কোন্ অপবিত্রতা, না-পাক—কী অদ্ভুত আমাদের জ্ঞানের মহিমা বল, যে শব্দটি পাক সেটিকেই ব্যবহারের গুণে আমরা না-পাক করে ফেলেছি, আবার দেখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দিয়েছি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, হিন্দু কলেজ, আমাদের কোন ক্ষমা হতে পারে না, এমন কথোপকথনের ফাঁকেই তায়েব মাস্টার কাজে লেগে যান, ক্রমেই তিনি গুরু হয়ে ওঠেন, তাঁর চিত্ত উন্মোচিত হয় এবার যেন বুকের ভেতর নিজের ছেলের কণ্ঠস্বর শুনতে-পান, সেই ছেলে তাঁকে বলেছিল, কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছো বেহেস্ত-এর নূর, তোমার হৃদয়ের মধ্যেই তাঁর নিদর্শনমালা, তুমি কি তাঁকে দেখতে পাও না, দেখ তোমার গ্রীবাস্থিত ধমনীর আরো কাছে দেখ, তোমার ইমান নিয়ে তুমি লোকযাত্রায় যাও, অলৌকিকের পেছনে সময় নষ্ট কোর না, পবিত্র জ্বলবে তুমি যেমন জান্ কুরবানি দিতে পারো, পবিত্র জ্ঞানের দীপ জ্বালাতে তেমনিই নিজেকে কুরবানি দাও —তবেই হবে তোমার ইরফান, প্রকৃত জ্ঞানলাভ, তুমি জীবনকে নতুন করে দেখার জন্য সাধনা কর, জীবনকে জেনেই তবে জীবনের সাথে মিলতে পারবে তুমি, এই তোমার ফনা ফিল্লাহ, বক্কা বিল্লাহ, এখানে তোমার বলতে আর কিছুই থাকবে না, এই দুনিয়াই আল্লাহ্ময়, তুমি এই পবিত্র গয়বে বিশ্বাস স্থাপন কর, দেখবে পৃথিবী জুড়ে নূরের বাতি জ্বলছে, তুমি পৃথিবীতে যাও, বাতিগুলিতে তেল ভরে দাও,

মাস্টার বাচ্চাদের যত্নকরে গোলাকৃতিতে বসান, চোখ বন্ধ করে পবিত্র মনে আল্লাহের নাম উচ্চারণ করেন, প্রত্যেকের শেলেটে প্রথমে লেখেন এলাহিভরসা, শেলেট নিজের মাথায় ছোঁয়ান, তারপর লেখাটি মুছে দিয়ে বলেন, বাবাজী, ঐটি ছিল আমার, এবার

লেখেন শ্রীশ্রীহরি, শ্রীদুর্গাশরণম, ওঁ সরস্বতৈঃ নমো নমহ,—এগুলি বাবা তোমাদের, বলেই শেলেট ছোঁয়ান তাদের মাথায়, খড়িশুদ্ধ হাত মাথায় ছোঁয়ান, খড়ি তুলে দেন হাতে, চক্রবর্তীর দিকে ফিরে বলেন, কী সুন্দর কল্পনা বল, শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পশোভিতা, অক্ষর ফুটিয়ে তোলেন শেলেটে, অদ্ভুত আলো নেমে আসে তাঁর মুখমণ্ডলে, মাস্টার বাচ্চাদের কচি কচি হাতে খড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, চক্রবর্তী, মনসামঙ্গল পড়া আছে তোমার, চক্রবর্তী কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কপালে ভাঁজ পড়েছে তাঁর, কোথাও সংশয়ের কীট ঢুকে পড়েছে নিজেরই ভেতরে, এ পরিস্থিতিতে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে এসে তিনি কী খুব ভুল করে ফেললেন, নাকি তাঁরই বা ভয় কী, লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই একেবারে লোপ-পেয়ে যায়নি, চক্রবর্তী মাথা নাড়েন, কেন জানি তাঁর চোখ পড়ে থাকে রাস্তায়, দিনের বেলায়ও মাস্টারের উঠোন লাগোয়া কাঠের দবজাটিব দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন, মাস্টার আবৃত্তি করে শোনান,

শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ,
বাজনীতি শেখাইল জানাইল বেদ।।
শুভদিনে লক্ষীন্দরের বিদ্যা আরম্ভিল
নানা বিদ্যায় লক্ষীন্দর রত্নতুল্য হইল।।

বিজয়গুপ্তের লেখা, বুঝলে, আর তোমাদের বিপ্রদাস পিপিলাইও কী লিখেছে শোন, শেখাইব হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে, তারপর বলেছে,

ক খ গ ঘ ঙ পড়ি হরষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে কালা লক্ষীন্দরে।।

কর্ণভেদ তো উঠেই গেছে কী বলো, উঠে যাওয়াই উচিত, কানফোড়ানো বড়ো নিষ্ঠুর আচার, চক্রবর্তী বলেন, ঠিক কথা, ওগুলি মধ্যযুগের ব্যাপার, আমরা অন্তত সেই তুলনায় আধুনিককালের মানুষ—কিন্তু তা বলে ইংলিশ মিডিয়ামে আমার রুচি নেই ভাই, একখান অক্ষরকে পাঁচখান ভেঙে শেখায় আমার এই বাবা শেলেটেই আস্থা বেশি, আমার পুরো অক্ষরটি চাই, আরে এরা সব বিদ্যের দোকানী বুঝলে, একটাকেও সামাজিক মানুষ তৈরি করে না,

মাস্টার গম্ভীর, হৃদয়দেশ থেকে স্বর তুলে এনে বাচ্চাদের বলেন, বল—অ—অ-—অক্ষরটি নানান কাকলিতে ভরিয়ে দেয় চারদিক, অদ্ভুত সঙ্গীত ধ্বনি ছড়িয়ে যায়, মাস্টার ধীরে ধীরে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন অক্ষরের সাথে, যেন অন্ধকার রাতে অভিজ্ঞ মানুষের মতো তিনি শিশুদের দেখিয়ে দিচ্ছেন পা ফেলবার নির্ভরতম জায়গা,

চক্রবর্তী দেখতে থাকেন মাস্টারকে, তাঁর চোখে শ্রদ্ধাবোধ চিকচিক করে,

মাস্টার গোঁড়ামিহীন মোসলমান, ভালো হাফেজ, খোত্‌বা পড়েন ভালো, লম্বা মূলাজাৎ করেন নির্ভুল উচ্চারণে, কিন্তু কখনো কোনসময়ে নিজেকে আমিল-উল-মিল্লৎ বা ধর্মরক্ষক মনে করেন না, বেনামাজীদের বেদ গীতা ধর্মশ্রাস্ত্র থেকে অনর্গল মুখস্থ

বলতে পারেন, সাচ্চা হিন্দুর ছেলেরা যারা হেগেল মার্ক্স আওড়ায় অথচ নিজেদের দর্শন বা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানটুকুও রাখে না, তাদেরকে অনায়াসে হিন্দুদর্শনের কথা বলে যান, ব্যাখ্যা করেন,—

মাস্টার বলেন, তোমার মনে আছে চক্রবর্তী, ছেলেবেলায় সেই বুড়ো মুসলমান ফকির মস্ত বড মাটির প্রদীপ হাতে মুশকিল আসান বলে হাজির হয়েছেন তোমাদের বাড়িতে—চক্রবর্তী ছিনিয়ে নেন কথা, আর আমার মা সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল হিন্দুরমণী হয়েও তাঁর প্রদীপে তেল ঢেলে দিচ্ছেন, পয়সা দিচ্ছেন, ফকির সেই প্রদীপের শিষ ভেঙে আমারই কপালে টিপ এঁকে দিচ্ছেন, দেখ এগুলি সবই হল সম্প্রীতির চিহ্ন, প্রতীক, বলেই তিনি শিশুদের কপালে অক্ষয় বিদ্যার্জনের আশীর্বাদী টিপ এঁকে দিলেন, তাঁর মন প্রসন্নতায় ভরে গেল, কিন্তু এসময়ে, অপ্রসন্ন ঝাঁঝালো হাওয়া বইলো, আবার ক্রিয়াশীল সেই পচনগন্ধ,

বাইরের উচ্ছৃঙ্খল শব্দসমূহ ঝাঁপ দিয়ে আসে, বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়, মাস্টার দেখেন তাঁর বুলবুলিরা কেমন ভয় পেয়ে গান থামিয়ে দিয়েছে, মাস্টার মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, হে ভগবান, এইসব শিশুদের আলোর পথে চালনা কর, সেরাতুম মুস্তাকিম-এ মতি হোক এদের, এরা এখন আঁতুড়ঘরে অক্ষরের ওম মাখছে, সঠিক রোদ্দুরে এদের তুমি লালন কর এই অক্ষরগুলি দিয়ে যে শব্দব্রহ্ম গড়ে উঠবে, সেই ব্রহ্ম একদিন এদের কলুষমুক্ত করুক, শব্দ থেকে শব্দান্তরে, শাখায় প্রশাখায়, সভ্যতার নানান দিকের অগ্রগমনে এরা পথ খুঁজে চলুক,

মাস্টার চক্রবর্তীব দিকে তাকান, আবার তাঁর চোখে তাঁর প্রিয় মৃতদেহটি ভাসে, কেন এভাবে এসময় তাঁকে বারবার বিক্ষত করে তা তিনি ঠিক এই সময়ে বুঝতে পারেন না, তবু শান্তভাবে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞসা করেন, রুম্‌লী মা কেমন আছে, রুমলী চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে, রুমলীর একটি গল্প আছে, সে গল্পের সাথে তাঁর প্রিয় মৃতদেহটির একটি যোগসূত্র আছে, অথচ সেই গল্পটি গল্প পেরিয়ে জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি, অসম্পূর্ণ সেই গল্পের দুটি চরিত্রের মাঝখানেও ছিল অনতিক্রমী দিওয়ার, তাই রুমলী আর রশীদের পেছনে দুদিকে দুই বুড়ো নীরবে বসে থাকলেন, যেমন থাকেন, রুম্‌লী রশীদের গল্পটি তাঁদের মুখের রেখায় লেখা হয় এভাবে,

রুমলীর মুখ, টলটলে দুটি চোখে মুক্তোবিন্দু, বিষাদ সিন্ধুর জয়নাব যেন বা, রুম্‌লী আজও মাস্টারকে চিঠি লেখে, অধুনা অনেকদিন যদিও তিনি চিঠি পাননি, রুম্‌লী আজও রশীদের একটি ছবি লুকিয়ে রাখে, বিয়ে হয়ে যাওয়া রুম্‌লী আজও একটি নির্দিষ্ট দিনে স্বামীর দিকে পেছন ফিরে কাঁদে, সে কেন কাঁদে মাস্টার বোঝেন, এই রুম্‌লী রশীদকে ঘিরে এ শহর তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল একদিন, ভয়ঙ্কর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দুই বুড়ো সবচেয়ে নির্মম কাজটি করেছিলেন, রুম্‌লী এখনো সেই গভীর দীঘির মতো, তার তল খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা, সেখানে রশীদের জন্য হয়তো কিছু বর্ণমালা লুকনো আছে, তারা লুকনোই থাকবে হয়তো, সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক কিছুই লুকনো থাকবে,

এখনো যেমন রুমলীর কাছে লুকনো আছে একটি ফাউণ্টেন পেন, একটি গানের খাতা আর একটি দর্শনের বই যা তার জন্মদিনে সর্বশেষ উপহার ছিল, এই চিন্তা ক্রিয়াশীল দুই মুখের ওপরে,

বাইরের এলোমেলো চিৎকার আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ গুজবে দোকানপাট যেমন দুদ্দাড় বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিই সামনের রাস্তার অনেকদূরে পর্যন্ত বাড়িঘরের দরজা জানালা বন্ধ হতে লাগলো, চক্রবর্তী এসময়ে গভীর চিন্তিত, পথে বেরিয়ে যেতে চাইলেন, মাস্টার আটকালেন, হেসে বললেন, বিপদকালে পৃথক হতে নেই, বলে হো হো করে হাসলেন, আমরা দুজনে কী বলে, ওই যে আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে চড়ুইভাতি করছি, তাই না, মাস্টার নিজেও চিন্তিত, অনেক কষ্টে বললেন এবার দেখ তোমাদের বেদ বলেছে, মনুষো নহুষো বি-জাতাঃ, সকল মানুষ এক নহুষের সন্তান, কোরআনও দেখ একই কথার প্রতিধ্বনি করেছে, সমস্ত মানুষ এক জাতি, কান্না ন্নাসো উম্মাতান ও আহেদাতান, ধর্মে বলপ্রয়োগের কোন স্থান নেই, লা একহারা ফীদদানে, আর আমাদের সবার বিদ্যাসাগর কী বললেন ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য—মাস্টার বাচ্চাগুলিকে বলেন, তোমরা সব ঐক্যে বড়ো হও,

বাচ্চাগুলি অক্ষরের ওপর ঝুঁকে আসে, মনোযোগ দিয়ে খড়ি ঘোরায়, কেউ ভাঙা ভাঙা ছড়া বলতে চেষ্টা করে, কেউ নতুন জামার ওপরের নক্সা ফুল বা ফুটবলের ছাপানো ছবিতে মন দেয়, কেউ লাথালাথি করে, একজন বলে অ—য় অজগর আসছে তেড়ে/ আমটি আমি খাব পেড়ে

এসময়ে দূরে কোথাও বোমা পড়ে কয়েকবার, বাচ্চারা দুই বুড়োর মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ভয়ে

সেই অজগরের জিভ বার করা ছড়াছবি অ আ ক খ'র বইয়ের পাতাটি খোলা পড়ে থাকে, আমও আর খাওয়া হয় না, হাওয়া এসে বারবার অজগরের মুখটিকেই দেখায়, অজগরটি তেড়ে আসবার ভঙ্গিতে হাওয়ায় ওলটপালট খায়, বাচ্চারা ভয়ে খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ এই কিছুক্ষণ আগেই বিদ্যাসাগরের তৃতীয় পাঠে তারা যেন কথা বলছিল, হাত নাড়ছিল, কিন্তু এখন তাদের মাথার ওপরের প্রলয়ের আকাশ,

চক্রবর্তী আবার একবার বেরিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসবেন বলেন, মাস্টার বলেন আমি তোমায় কী করে একলা ছেড়ে দিই বলো কিন্তু তাঁর চোখে বিষণ্নতার রেখা, তিনি ভেজা চোখে বাচ্চাদের দেখেন, বলেন, জানো চক্কোত্তি, রংপুর জেলার মায়েরা একটা ছোট্ট ছড়া বলে, চক্কোত্তির ছড়ায় মন নেই, মন পড়ে আছে রাস্তায়, বারবার তিনি দরজার কাছে গিয়ে কান পাতেন, মাস্টার বলেন, ভয় নেই, আমায় কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু চক্রবর্তী উসখুশ করেন, আগের সাহস ধরে রাখতে পারেন না, বাচ্চাদের কেউ পাঠাতে চায়নি, বলা যায় না কোথায় কী হবে, কিন্তু চক্কোত্তিই দায়িত্ব নিয়ে খানিকটা জেদের বশে চলে এলেন, ভাবখানা এই যে সব স্বাভাবিক আছে, মাস্টার ছড়া বলছেন, চক্কোত্তি তাকিয়ে থাকেন, মাস্টার বলে চলেন, হামার ছাওয়া মতিহার/আক্কাশের তারা/যদি তারা

হাসে/তারা কাছে আসে/যদি ছাওয়া কান্দে/তারা যাবি চান্দে

আমার খালি মনে হয়, এইসব তারাগুলি আকাশ আলো করুক, দুনিয়ার রহস্য উন্মোচিত হোক, জ্ঞান বড়ো সক্রিয় বুঝলে, বশীদ বলেছিল, সমাজের কোন প্রয়োজন নেই নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের, আজ জীবনের শেষ মাথায় এসে বুঝতে পারি নিজেই নিজের ভেতব কুয়ো হযে আছি, বুঝলে, জ্ঞানের দাতা সেজেছি, দেওয়ার অহঙ্কারে স্থাবর হয়ে আছি, নিতে পারিনি কিছুই, জীবনের কাছে, হাঁটু গেড়ে বসে কিছু শিখতে পারিনি, এবং একথা বলার পরে পরেই

বাইরের উচ্ছৃঙ্খল শব্দসমুদ্র কাছে চলে আসে, গোলমালেব শব্দ শোনা যায়, শব্দ ক্রমে কাছে আসে, ভয়ঙ্কর শব্দে আছড়ে পড়ে ঠিক তাঁরই দরজায়, দরজা সে ভার সইতে পারে না, পথ করে দেয নিজে ভেঙে গিযে, হুড়মুড়িয়ে একশো দু'শো লোক ঢুকে পড়ে বাড়িতে, তাদের অনেকেরই তখন রুদ্রমূর্তি তারা ঘরে ঢোকে, বইপত্তর আলমারি, জলের কলসী, বিছানা বালিশ, টেবিলেব ওপবকার লেখা ম্যানিউসক্রিপট তাদের ক্রোধের আগুনে লণ্ডভণ্ড, দেওয়ালের মৌলানা আজাদকে লাঠি পেটা কবে ভাঙতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী বঙ্কিমচন্দ্র সুভাষেরও মুখ ফেটে যায়, আতিপাঁতি করে তারা এঘর ওঘর বাথরুম রান্নাঘর পেছনের দরজায় খোঁজে, চিৎকার করে বলে, কোথায় লুকোবে শালা, তারা দরজা জানালায় দমাদম লাথি মারে, কেউ বলে—চিড়িয়া উড়েছে, কোথাও কিছু না পেয়ে তারা দাওয়ায় পাতানো মাদুরের ওপর রাখা শেলেটগুলিকে আছড়িয়ে ভাঙে, একজন অতি উৎসাহীর চোখ চলে যায়—একটি শেলেটে অস্পষ্টভাবে এখনো লেখা রয়েছে 'এলাহি ভরসা', জনতার মধ্যে পণ্ডিতেরা গর্জন করেন, হিঁদুর ছেলেকে শেখানো হচ্ছে 'এলাহি ভরসা', হিঁদুর রাজ্যে বাস করে মুসলমানের খোদার চামচেবাজি হচ্ছে, এ কথায়,

মাস্টারের ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে ছায়া পড়ে, শিশুগুলির মুখেও ছায়া, চক্রবর্তী বাধা দিতে এলে তাকে খোদার চামচে বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, মাস্টার এবার দৃঢ় গলায় বলেন, তোমরা অনেকেই তো আমার কাছে অ-আ-ক-খ শিখেছিলে, ও যবে শিখেছিলাম শিখেছিলাম, অ আ ক খ শিখিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি, এখন জমানা বদলে গেছে, আজ বাবরি মসজিদ চাই, কাল কাশ্মীর চাই, এসব ফ্যাঁকড়া তুলছেন, এসব মামদোবাজি চলবে না এখেনে,

ওই আল্লার বাচ্চাকে কোন্ পথ দিয়ে হাপিশ করে দিয়েছেন, এই প্রশ্নে মাস্টার স্থির হয়ে জনতার দিকে তাকালেন, জনতা চুপ, কেন এভাবে চুপ করে গেল উত্তেজিত এইসব মানুষ মাস্টার জানেন না, অথচ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এদের মধ্যে অনেকেই এখনো বিবেকের ভার নিয়ে বিব্রত, উত্তেজনায় সবাই হয়তো অশ্লীল হয়ে উঠতে পারেনি, মাস্টার বললেন, মানুষ মানুষের কাছেই আশ্রয় নিতে আসবে, পশুর কাছে নয়, কে যেন বলে উঠলো, এসব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে ওই নেংটিপরা বুড়োটা, পাকিস্তানকে নাতজামাই পাকিস্তানের তিনশো কোটী টাকা দিয়ে দাও বায়না ধরেছিল,

অথচ নোয়খালিতে ভড়ং করে থেকেও হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেনি, বলাবাহুল্য এসব কথা হচ্ছিল খুব উঁচু পর্দায়, মাস্টার নিচু পর্দায় নামলেন কেননা তা নাহলে এরা উম্মাদ হয়ে উঠবে এখুনিই, ঘন গলায় দুঃখ করে বললেন ছেচল্লিশের নোয়াখালি যেন আর কোনদিন ইতিহাসে না হয় তার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার আছে, জনতা চুপ হচ্ছে, ক্রমে থিতিয়ে যাচ্ছে, এসব দেখে চতুর পণ্ডিত ক'জন যাদের বাস মাস্টারের বাড়ির কাছাকাছি, তারা হঠাৎই যেন গোপন কথা ফাঁস করছেন এই ভাব দেখিয়ে বললেন, কাল রাতে আপনার বাড়িতে মুসলমানদের মিটিঙ হয়েছে, রেল স্টেশনের ঘটনার বদলা নেবে ওরা, আমাদের কাছে গোপন খবর আছে, আপনার বাড়িতে তারা শোর্ড ড্যাগার জমা করেছে, মাস্টার স্তম্ভিত, জনতা আবার উত্তাল, লোকদুটির চোখ মাস্টারের বাড়ির ওপর, বড় বড় ঘরের ওপর, রাস্তার ওপরের চমৎকার পজিশন মাস্টারের ভিটের, মাস্টার আবারো বললেন আমি আপনাদেরই একজন, এতদিন এখানে বাস করছি কেউ বলবেনা আমি কোন হীন ষড়যন্ত্র করেছি কোনদিন, এটা আমার নিজের দেশ, নিজের জম্মভূমি, আমার পাশাপাশি আপনারা আমার প্রতিবেশী, বলা যায় নিজের ভাই, আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তো নিজের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে হয়, কিন্তু সেই দু'জন ছাড়বে না, আস্তে আস্তে গুজবের অস্ত্রগুলি একে একে ব্যবহার করে এবং সেই দ্বিপ্রহরে বিনা মেঘে আকাশ ক্রমশ কালো হতে থাকে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত মাস্টার ধীরে বলেন, আমায় কী কবতে বলেন আপনারা, তখন ছোঁ মেরে নিয়ে কেউ কেউ উত্তর দিতে চেষ্টা করে এবং সেই উত্তরটিই শ্লোগানের মতো জনতাকে আবিষ্ট করে, জনতা বলে, পাঠশালা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে

কিন্তু তাতে আবার বেশ কিছু লোক বেঁকে বসে, এমন দাবি ঠিক তারা গিলে উঠতে পারে না, পারে না দেখে, চতুর পণ্ডিতেরা এবার ধর্মের ঘা-মুখ খুলে দেয়, ক্ষতস্থানে খোঁচায়, এলাহি ভরসা শব্দ দুটিই তাদের কাছে এখন বিষাক্ত ছোবলের মতো, এতে হিন্দুধর্মের গায়ে নাকি বিষ চারিয়ে যায় এবং অচিরেই এর নিরাময় চাইতে গিয়ে জনতার উম্মাদ দাবি ওঠে, এলাহি ভরসা হিন্দুদের শেখানোর জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে, আর নিজের হাতে তা মুছে দিতে হবে, চক্রবর্তী ভিড় ঠেলে এসে কিছু বলতে চান কিন্তু ছেলে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যায় দরজার বাইরে, চক্রবর্তী ছেলের সাথে যুদ্ধ করেন, পারেন না, এদিকে ভেতরে কয়েকজন শেলেট তুলে ধরে সবাইকে দেখায়, এলাহি ভরসা।

কথা দুটি বৃহৎ হতে হতে সবার হৃদয়ে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যায়, যেন এই মনুষ্যকুল এই দুটি শব্দের পেছনে লুকনো আরো একটি মনুষ্যকুলের হাতে অদৃশ্য অস্ত্রসমূহ দেখতে পায়, যেন তারা দুই বিবদমান মানবগোষ্ঠী গোচারণভূমি দখলের জন্য জঙ্গলে পাথরের টিলার আড়ালে সশস্ত্র, অপেক্ষমাণ, শুধু আক্রমণের মুহূর্তটি টিকটিক করে কাছে আসতে থাকে, যেন বিস্তৃত স্তেপভূমিতে হা রে রে করে দুই মানবগোষ্ঠী ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে, মাঝখানে একটি সবুজ বৃক্ষ পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে এদের বারণ করছে, মাস্টার সেই সবুজ পত্রশাখা মেলে দিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, চিরদিন যেমন

লিখে এসেছি, আজও ঠিক সেভাবেই লিখেছি, দুটি পথকে পাশাপাশি রেখেছি, এলাহি ভরসার দাবিদার একমাত্র আমি, আমি যেমন এলাহি ভরসা লিখি, তেমনি শ্রীশ্রীহরি বা শ্রীদুর্গাশরণম লিখতে আমার হাত একটুও কাঁপে না, আমার নিজের ধর্মে তাতে ঘা পড়ে না, জীবনে সঠিক শব্দটি শিখতে গিয়ে যেমন বেঠিক বর্ণ বহুবার লিখেছি আর মুছেছি, তেমনি—হঠাৎ তিনি আর এগোতে পারেন না, অনেকেই রে রে করে ওঠে, ওরে জ্ঞান দিচ্ছেরে—মাস্টার অসহায় দাঁড়িয়ে, ওসব জ্ঞান না দিয়ে আগে ওটা মুছে দিতে বলা হচ্ছে আপনাকে আগে মুছুন, এ কথায় মাস্টার ব্যথিত হন, বলেন আমি কোনকিছুতেই অন্যায় আদেশ মেনে নিই না, আদপে এগুলি অক্ষর যা বারবার মোছা লেখা যায়, কিন্তু আপনারা যখন আমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করছেন মুছতে, তখন এগুলি আমার কাছে বিশ্বাস, বিশ্বাসকে আমি মুছতে পারবো না, মুছে দিলে আমার আল্লাহকে মুছে দেওয়া হয়, কেটে দিলে তাঁকেই কেটে ফেলা হয়, ঠিক যেমন জয়দেব গীতগোবিন্দের লাইন কেটে দিয়ে ভগবানেব পিঠে ক্ষত করে দিয়েছিলেন, এও তেমনি, এতবড়ো গভীর ক্ষত আমি করতে পারি না—জনতা উম্মাদ, কে হঠাৎই নামিয়ে আনে লাঠি, কিন্তু তাতে জনতার মধ্যেই গণ্ডগোল শুরু হয়, এভাবে মারাটা ঠিক নয়, ঠিক—এই দুই দলে জনতা বিভক্ত, প্রায় খণ্ডযুদ্ধ হতে যায়,

বিভক্ত জনতার পেছনে বাচ্চাবা, তাদের দেখার কেউ থাকে না, তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, ভয়ে কাঁদতেও পারে না,

রক্ত গড়িয়ে নামে মাস্টারের মাথা থেকে, সাদা দাড়ি ভিজে লাল হয়, মাস্টার পড়ে যান, তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ছিটকে পড়ে খোলা দ্বিতীয়ভাগের পাতায়, ঐক্য বাক্য মণিক্যগুলি এখন ঝাপসা, পরক্ষণে পুলিস বা ই এফ আর নেমেছে বলে জনতা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়, শুধু বাচ্চাগুলি পালাতে পারে না, তারা স্থাণু হয়ে মত্ত মহাকাশে স্নিগ্ধ তারকাপুঞ্জের মতো কিন্তু ম্লান, কিন্তু ক্রমে তারা সক্রিয় সচল হয়, তারা ধীরে ধীবে পড়ে যাওয়া মাস্টারসাহেবের কাছে আসে, একজন ভাঙা শেলেটখানি তুলে ধরে, দেখা যায় এলাহি ভরসা শ্রীশ্রীহরি নিয়ে শেলেটটি তিন-চার টুকরো হয়ে গেছে, বাচ্চাটি এবার কাঁদে, শেলেটটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, একজন তায়েব মাস্টারের গালেব রক্তধারা মুছিয়ে দেয়।

অচেতন হওয়ার আগে মাস্টার এগিয়ে আসা বাচ্চাগুলিকে দেখেন ভালো করে, দেখেন আকাশ থেকে ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত নূর-এর আলোর মতো তারা জ্বলছে, বর্ণগুলি ফুটে উঠেছে জীবন থেকে জীবনান্তরে, ঝরে পড়ছে আলোবীজ উপত্যকা ভরে যাচ্ছে সবুজ ফসলে, মাস্টার আরো দেখতে পেলেন শিশুদের মুখগুলিতে কী এক ঐশ্বরিক কষ্ট, মাস্টার ধীরে ধীরে শিশুদের উদ্দেশে বললেন, হে মহানবীরা, তোমরা এইসব অজ্ঞানদের দেখো, এদের কারুরই যে অক্ষর চেনা হয়নি, তোমরা এদের বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিয়ো।

শিশুরা কী বুঝলো কে জানে।

# ত্রাণ-পরিত্রাণ

## ত্রিদিব সেনগুপ্ত

বেঁকাদা নামটা কী থেকে আসতে পারে—বঙ্কিম? নাকি কোনো কিছুর থেকে উপজাত নয়, বেঁকা নামটাই আদি ও অকৃত্রিম? হয়তো পায়ের একটা আঙুল বেঁকা আছে—হয়তো ছোটবেলায় সোজা হয়ে কিছুতেই বসতে পারত না। এরকম কত কিছুই তো হতে পারে? বেঁকাদা—যাকে বেঁকাদা বলে কখনো ডাকেনি সিরাজুল, পাড়ার কাউকে কাউকে ডাকতে শুনছে, বেঁকাবাবু বলেও ডাকেনি কখনো, কিছু বলেই সম্বোধন করে নি—যখনই দেখেছে সিরাজুলকে তখনই হেসেছে একটু। সংস্কৃত মানুষের পিছুটান থেকে যাওয়া, গালের পেশীতে পলি, চর পড়ে যাওয়া, হাসি নয়। বেশ একটু নৈকট্যের হাসি।

নৈকট্যের হাসিটাকে খদ্দেরগত অর্থাৎ জনসংযোগমূলক বলেও ভাবা যেতে পারে—বেঁকাদার প্রতিযোগী তো বাড়ছেই—এই গলিটা থেকে মোড় অব্দি এর ভিতরেই আরো দুজন প্রতিযোগী—বৃহত্তর কলকাতায় জনসংখ্যা বাড়ছে,তাল মিলিয়ে মুদির দোকানের সংখ্যা, তাদের সঙ্গে চুলচেরা লড়াইয়েব ময়দানে দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরে রাখার চেষ্টায় বেঁকাদার মুখে হাসি তো আসতেই পার। কিন্তু সিরাজুলের, হয়ত সিরাজুল ওরকমই ভাবতে চেয়েছে বলে, বেঁকাদার হাসিটাকে ঠিক খদ্দের-আঁকড়া বলে মনেই হয় নি কখনো। আমাদের চতুর্পার্শ্বে, আমাদের বাতাসে, বৃষ্টিতে, সিঁড়িতে, ল্যাম্পোস্টে, চায়ের দোকানে, শ্মশানে, দুধের লাইনে যেসব প্রাত্যহিক নীরব ভালোবাসাকে আমরা পেয়ে যাই, হয়তো সব সময় নয়, কখনো-কখনো, যাদের ছুঁয়ে যাই, আলাদা করে মনে থাকে না, আলাদা করে মনে থাকার মত নয়ও, সেরকমই একটা ভালোবাসা বলে মনে হয়েছে সিরাজুলের। সবসময়ই।

এখন বেঁকাদার মুখে কোনো হাসি থাকে না। যা থাকে তা হাসির কোনো দূরতম আত্মীয়ও নয়। তা এত বিশ্রী কেন—এভাবে ভেতরটাকে ফোঁপবা করে দেয় কেন? যেন ওই মুখটা, মুখ নয়, মুখের ওই অভিব্যক্তিটা সিরাজুলকে হাতেনাতে ধরে ফেলে—যখন সে একটা বাচ্চা অন্ধ ভিখিবির হাতের থালায় পয়সা দেওয়ার মত করে পযসা তুলে নিচ্ছে। বেঁকাদার মুখটা এরকম কুৎসিত হয় কী করে?

বেঁকাদার এই পুরো প্রসঙ্গটাই গল্প শুরুর আগের, গল্পের আগের। গল্পটা প্রথমে আপনাদের জানা দরকার। তারপর গল্পের পূর্বাপর। এটা একটা মাতলামির গল্প। এক ধরনের মাতলামি, যার সঙ্গে অসহায়তার একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু মাতাল ত স্বয়ম্ভু নয়। এমন ত নয় যে মাতালই এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিমতম ও চরমতম। তাই মাতলামিরও একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকে। নিজস্ব গোলকধাঁধা। অসহায় তার গোলকধাঁধা। সেই গোলকধাঁধাকেও আমরা পেয়ে যাবো। মাতলামিকে পেতে পেতেই।

ছাব্বিশে জানুয়ারি (ওইদিন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস) একানব্বই রাতে ভারতবর্ষের বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম (দৃষ্টি ও শ্রুতি গ্রাহ্য) রাত সাড়ে নটার ইংরাজি সংবাদেব পর (ওদিন দুটো সংবাদেই উপসাগর যুদ্ধেব, তাৎক্ষণিক নয় ধারণকৃত, প্রসার দেখার জন্য বসে প্রজাতন্ত্র দিবসের বক্তৃতা শুনতে বাধ্য হতে হয়েছিল) প্রজাতন্ত্র দিবসের সারাদেশব্যাপী সমাবোহ দেখানো হয়েছিল। যা থেকে জানা গিয়েছিল কেন্দ্রশাসিত ছটি অঞ্চলকে ছেড়ে দিলে ভারতবর্ষের মোট বাজ্যের সংখ্যা বাইশটি এবং (কী আশ্চর্য) সব জায়গারই জাতীয় পতাকা একই রকম দেখতে। এব পরেই ছিল কবিসম্মেলন। সেটাও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে।

এই সময় জয়পুরী লেপেব ভিতর ডুবিয়ে বাখা পা বার করে নিয়ে ত্রিদিবেব বউ অন্য ঘরে চলে গেছিল—শোবে বলে। (বোঝাই যাচ্ছে ওর দেশপ্রেম একটু কম)

যাওয়ার আগে বলেছিল 'হুঃ—কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়লে, সেটাও আজ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে—সত্যি একটা প্রোগ্রামও থাকে না দেখার মতো।'

কবি সম্মেলনের প্রথমেই একজন মুসলিম কবি। আজহার হাসমি। তার কবিতায় গান্ধিজির মনোভূমি নিয়ে, হারিয়ে-যাওয়া রামরাজ্য নিয়ে হাপিত্যেশ ছিল। তারপর একটা হাসির কবিতা ছিল (আগেই বলে দেওয়া ছিল যে সেটা হাসির)। এরপর আরো দুজন হিন্দু কবি। তারপর আবাব একজন মুসলিম কবি। ভাই আবু জাফব, বা ও-ধরনের কিছু একটা নাম। তিনি তাঁর কবিতায় গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন। গঙ্গা জল মুখে দেওয়ায় পুণ্য লাভ হয়, স্বর্গের অমৃত পানের পুণ্য লাভ হয় এ-কথা বলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু গল্পটা এখানে শুরু নয়—শুরু হয়ে গেছে এর দু-মাস আগে। ছাব্বিশে জানুযারি গল্পটা লেখা শুরু হল। গল্প শুরু নভেম্বরের শেষদিকে।

লাইটহাউসে সেদিন সিকরোক্কো দেখতে গিয়েছিল ত্রিদিব আর কেয়া। ঘোড়াব পিঠের উপব বসে-বসেই দুটি অপরিচিত পুরুষ ও মহিলার বিপরীত বিহারের বেশ ডিটেল শট ছিল। আরো অনেক উষ্ণতা। অর্থাৎ বেশ ভালো ছবি। হয়তো সেই ভালো ছবির কেটে না যাওয়া রেশের ভিতরেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সম্ভাব্য চমৎকাব দাম্পত্যেব ছবিটা আগাম দেখছিল ত্রিদিব। তিনতলায় তাদের ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাকালীন বাববাব এক-একটা চৌকো কংক্রিটের ফ্রেমের ভিতর তারার আলোয় নবীন-পিকাসো-নীল আকাশ রোজ রাতের মতই সেদিনও ত্রিদিবের পা টলমলিয়ে দিচ্ছিল। কেন হয় এরকম? পশ্চাৎপটের পুরো ধারণাটা গুলিয়ে যায় বলে?

সিরাজুল দাঁড়িয়েছিল সামনে। প্রায় সিঁড়ির মুখটায় এসে। তার অনেকটা পেছনে রৌশন দাঁড়িয়েছিল—সেখানে অন্ধকারও বেশি—আর দূরেও। তাও রৌশনকেই আগে দেখতে পেয়েছিল ত্রিদিব। রৌশন বলে কেন মেয়ে বলেও যখনও সে বুঝতে শুরু করে নি। শুধু কি-একটা-গরমিল এই বোধসহ রৌশনের সালওয়ারের ছোট ছোট ভাঁজের নিষ্প্রভ উজ্জ্বলতা তার কনীনিকার ভিতর আটকে গেছিল। সিরাজুলের পাশ দিয়েই সে রৌশনকে দেখতে পাচ্ছিল। অথচ সিরাজুলকে খেয়ালই করে নি। কেন? রৌশনের সালওয়ারের একদম নিচের প্রান্তে জরির ছোট কারুকাজটুকুর জন্যে?

'এসে গেছ?' খুব ক্লান্ত অথচ একটা স্পষ্ট আশ্বস্ততা ছিল সিরাজুলের গলায়। 'আরে কী ব্যাপার?' বলার সময় ত্রিদিব চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতর কি একটু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া অনুভব করে নি—সিকরোক্কোর নগ্নতা—ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে অন্তত দুবার এমব্রয়ডারি করা সুইসকটনের প্রচুর ভাঁজের ভিতর ড্রাইভার আর হেল্পারের দিকে চোখ দুটো রেখেই কেয়ার উরুর গভীরে হাতের তালু নিয়ে যাওয়া—ট্যাক্সি থেকে নেমেই টেলিফোনের গর্তের পাশের মাটির ঢিপি পেরনোর সময় কেয়ার পিঠে হাত রাখা—সিঁড়িতে রাতের আকাশের আলোর আভা—এই পুরোটা মিলিয়ে যে ধারাবাহিকতা সেটা হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার কাবণে?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কি ত্রিদিবের মাথায় এসেছিল সকালের কাগজের হেডলাইন: 'করসেবকদের রুখবেনই মুলাযম'। ওদিকে ভি এইচ পি-র অশোক সিংঘল ঢুকে গেছে অযোধ্যায়—পি এ সি-র হাত এড়িয়ে, অথবা পি এ সি-র হাত ধরেই, কারণ প্রভিন্সিয়াল আর্মস কন্সট্যাবুলারি ত মুসলমান মেরে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে আগেই। এই পুরোটাই কি মনে পড়ে গেছিল ত্রিদিবের? এছাড়াও আগের দিন সন্ধ্যায় সিরাজুল আর অভিষেক যখন এসেছিল আড্ডা মাবতে তখনকাব অভিষেকের মন্তব্য : 'আমার ভীষণ ভয় করছে।' (শুধু সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ভয় থেকেই অভিষেকের এ মন্তব্য জন্মায নি। তার সাথে যুক্ত ছিল শুধু ফ্রিল্যান্সিং থেকে অভিষেকের আর টেনে না উঠতে পারা, তার বাবার মোটামুটিভাবে আকস্মিক মন্দা আর প্রেমিকাকে ঘিরে কিছু অনিশ্চয়তা। আবাব এই উপাদানগুলো ত আলাদা আলাদা কিছু নয়—এগুলো ত একই—নাকি—আপনার কী মনে হয?)

সিরাজুল আর রৌশনকে দেখে, বিস্ময়ের সঙ্গেই, ত্রিদিবের পেছন থেকে কেয়া এগিযে আসে এবং গল্পটা শুরু হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবেই, কোনো গুরুত্বপূর্ণতর কাজের অভাবে।

দাঁড়ান গল্পটা গতি পেয়ে যাওয়ার আগেই আমরা ঠিক করে নিই—গল্পটায় কী কী জিনিশ থাকবে। যেমন আমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছি গল্পের দুটো মূল চরিত্র সিরাজুল আব রৌশন। তারা এসে, আদবানি—বিশ্ব হিন্দু পরিষদ—রামরথ-রামমন্দির সব মিলিয়ে দেশজুড়ে দাঙ্গা বাধছে, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় (বা সেরকমই তারা মনে করছিল) আশ্রয় নেয় ত্রিদিব আর কেযার ফ্ল্যাটে। তাদের এই আশ্রয় নেওয়া নিয়েই গল্প। তাদের এই পরবাসের কদিন তারা আর ত্রিদিবরা একসঙ্গে থাকে। ত্রিদিব আর কেযা তাদের প্রতিপ্রাপকতায় আসে। সেই ধরনের চেনাশোনা যা জীবন্ত মুহূর্তের একত্র যাপন ব্যতিরেকে আসতে পারে না, তৈরি হয় তাদের ভিতর। নয়তো, দু-চারজন পাঁচজন মুসলিম বন্ধু থাকা সত্ত্বেও ত্রিদিবের যোগ্যতা কী কোনো মুসলিম চরিত্রকে তার গল্পে রাখার, কোনো মুসলিম চরিত্রকে নিয়ে গল্প লেখার—কতটুকু জানে সে মুসলিমদের? এটুকু ছাড়া যে ঠিক হিন্দুদের মতোই, বিস্ময়কর ভাবে, মুসলিমদেরও সঙ্গম ব্যতিরেকে সন্তান জন্মায় না আর মার্কিন বন্দুকের হাইটেক গুলি সেই একই ভাবে উপমহাদেশের হিন্দুদেরও মারতে পারত যেভাবে মেরেছে ইরাকের মুসলিমদের। তাই এই গল্পটা আসলে

ত্রিদিব আর কেয়ার অর্থাৎ ত্রিদিবেরও গল্প।

আবার এই গল্পটা কি একটুও এল. কে. আদবানির গল্প নয়? সেই লালকৃষ্ণ আদবানির যিনি ত্রিদিবকে একটা অভাবিত সত্যদর্শনে এনেছেন। আদবানিও পারেন বৈকি সত্যদর্শন করাতে—এটা তাদের জেনে রাখা দরকার যারা আদবানিকে নিতান্তই অমানুষ বলে মনে করেন—তিনি ত্রিদিবকে আইডেন্টিটি দিয়েছেন, হঠাৎ তার, আদবানিরই চোখের আলোয় ত্রিদিব আবিষ্কার করেছে যে সে হিন্দু অর্থাৎ সে মুসলিম নয়। এটা তো ত্রিদিব নিজেই জানত না। শুধু তাই নয়, যারা হিন্দু নয়, অর্থাৎ মুসলমান, তাদের সঙ্গে ত্রিদিবের সম্পর্কটা ঠিক কী হবে এটাও স্থির করে দিয়েছেন লালকৃষ্ণ আদবানি স্বয়ং। এই গল্পটা আসলে শ্রদ্ধাঞ্জলি—ট্রিবিউট টু আদবানি। এই আলোচনা পরেও আসবে। আপাতত আমরা গল্পের শেষ প্যারাটা লিখে নিই :

সিরাজুল ব্যাগটা রাখে চেয়ারের পাশে। জামাটা সুঠামভাবে ঢুকিয়ে নেয় চারদিক থেকে বেল্টবদ্ধ প্যান্টের কোমরের ভিতর। আগেই ঢুকিয়েছিল। কোথাও কোথাও একটু অসমান ছিল। ঠিক করে নেয়। প্রায় দেড়মাসের একত্রবাসের পর বিদায়জনিত একটু শূন্যতা ঘরেই ঘুরছিল। সেটার প্রকোপেই হয়তো, সিরাজুলের হাত একটু শ্লথ ছিল। সে ঘাঁড় বেঁকিয়ে সামান্য উপর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রৌশনের এখনো একটু বাকি। খাওয়ার ঘরেব দেওয়ালে ঝোলানো বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রৌশন চুল আঁচড়াচ্ছিল। কেয়াব একান্ত নিজস্ব, গোলাপির উপর হালকা নীল ঢেউ, বড়ো চিরুনিটা দিয়ে। যেটা কেয়া নিজের দিদি ছাড়া, আর দু-একদিন ত্রিদিবকে ছাড়া এই প্রথম অন্য কাউকে ব্যবহাব করতে দিয়েছিল। গত দেড়মাস ধরে।

এই মুহূর্তের রৌশনে কেয়ার প্রক্ষেপ শুধু এটুকুই ছিল না—রৌশনের কোমরের বাঁদিক থেকে শুরু করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে ঘাড় পেঁচিয়ে পিঠ বেয়ে নেমে গিয়েছে যে সবুজ শিফনের দোপাট্টাটা, সেটা কেয়ার। আসার দিন বৌশন পরে এসেছিল এই সালওয়ারাটাই। কিন্তু বাঁধনির কাজ করা সেই মূল দোপাট্টাটা সেটা আজ কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথাও একটা ঢুকে গেছে আলমারির বা অন্য কোথাও। ত্রিদিব বা কেয়ার জামাকাপড় যেমন যায় মাঝে-মাঝেই। দরকারের দিন কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই শিফনের দোপাট্টাটা, ভাঁজের উপর আলো পড়লে চকচক করে ওঠে, কেয়াই বার করে দিয়েছে। রৌশন কেয়ার মতো অভ্যস্ত নয় বিনা দোপাট্টায় সালওয়াব কুর্তা পরায়।

সিরাজুল হঠাৎ বলে ওঠে, 'এটাই তো—সেই মুখোশটা, ক্যাপস্টান পেপারে শখ করে কেনা বোরকুম বিফ তামাক, ওটা আসলে পাইপে খাওয়ার, পেঁচাতে-পেঁচাতে মুখ তুলে তাকায় ত্রিদিব। তাকে নয় সিরাজুল বলছে রৌশন বা কেয়াকে, পরদা সরানো থাকায় ডাইনিং প্লেসে দাঁড়ানো যে দুজন সিরাজুলের মুখোমুখি। বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে ত্রিদিব ওদের দেখতে পাচ্ছে না। 'আরে ওই যে—তোমায় বলেছিলাম না—ত্রিদিব বলেছিল মুখোশ পরে হাতে ইণ্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট নিয়ে আমাদের বিয়েতে যাবে।' হাসে সিরাজুল। মুখের রেখা একটু গলে যায় ত্রিদিবেরও। ওঘর থেকে রৌশন

আর কেয়ার হাসির শব্দ আসে।

'এই মুখোশটা—এই যে এই দেওয়ালে—দেখ নি? দরজার মাথায়?'

রৌশন হয়তো সায় জানায়। হয়তো জানায় না। ত্রিদিব নিজের মনেই একটু হেসে ফেলে। সিরাজুল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে—হাত বাড়ায—ত্রিদিবের এই মাত্র বানিয়ে কেবল ধবানো সিগারেটেব দিকে—ও ভাল বানাতে পারে না।

'ওঃ তুমি তো ওকে চেনো না—এবার হয়তো চিনলে একটু—ও যা সত্যিই যেতে পারত মুখোশ পবে। ও যে কী পাগল।'

এরপর আরো দু-চারটে কথা বলে ওরা। ওবা সকলেই। চলে যাওয়ার আগেকার শূন্যতার ভার একটু লাঘব হয়। কেয়া ত্রিদিবকে মনে করিয়ে দেয়, ও ঘর থেকে—'তুমি এখনো প্যান্ট পরে নিলে না?' ওঠে ত্রিদিব। প্যান্ট পরে নিতে। গলিয়ে নেওয়া। বাসস্ট্যাণ্ড অব্দি যাবে ওদেব এগিয়ে দিতে।

উপরের প্যারাগ্রাফটাই গল্পের শেষ প্যারাগ্রাফ। এটা আমরা আগেই লিখে নিলাম। একটা সুবিধাও হল তাতে। অনেক কিছু জানা হয়ে গেল আমাদের। যেমন গল্পের বিস্তার ঠিক কতটা? কতটা বাস্তব সময়কে ঘিরে গল্পের বিবৃত সময়টা তৈরি হয়েছে সেটাও আমরা জানতে পারলাম। এছাড়া আরো জানলাম যে সিরাজুল আর রৌশন, তাই ত্রিদিব আর কেয়াও, অর্থাৎ গল্পেব সব চরিত্রই গল্পের শেষ অব্দিও বেঁচে বর্তে আছে। বেঁচেই আছে তারা। এটা আমাদের একটা বাড়তি টেনশনের হাত থেকে বাঁচাল। গল্পের শেষটা আগেই জানা থাকলে ঘটনার নিজস্ব আবেগপ্রবণতার আধিক্য ইয়ে মেলোড্রামার হাত থেকেও বাঁচা যায় বইকি। মেলোড্রামা খুব জটিল বস্তু। একটু ফসকালেই ঋত্বিক থেকে সুখেন। তাই বাদ দেওয়াই ভাল।

ওল্ড বস, ওয়াইন, গোয়াব লোকাল, কাজুবাদাম থেকে তৈরি (সেরকমই লেখা থাকে), পঁচিশ শতাংশ মাত্র ভি বাই ভি, একজন পর্তুগিজ (বোধহয়), হয় সেপাই নয় বাজনদার, বাঁশি মানে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে এমন সোনালি মোটা কাগজে এমবস করা ছবি, যা লেবেল, গ্লাসে নেওয়া আর জল তো মেশানোই ছিল অনেকটা, হয়ত প্রয়োজনের চেয়েও বেশি—স্বাভাবিক ভাবে যে-পরিমাণ মেশালে তাড়াতাড়ি খেয়েও আজাংড়া মাতাল হয়ে পড়া আটকানো যায় তার চেয়েও বেশি, হাতের মধ্যে টলটল করে—অলঙ্করণে বলা হচ্ছে কারণ অল্প কাঁপাটাই পরে লিখতে গিয়ে ত্রিদিবের **'টলটল'** আখ্যানে মানানসই লাগছে, এখনই কার্পেটের পাশে রাখা সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টসের স্টুটগার্ট-এর নিসর্গ আঁকা ট্রে যা ম্যাজিক মাউন্টেন-এর বিরাশি পেঙ্গুইন এডিশনের প্রচ্ছদে 'লে দেঁত দু মিদি' দুপুরের দাঁত ছবির মত লাগে সেই ঝিরিঝিরি পাতার নিঃশব্দ তলে নামিয়ে রাখবে সিরাজুল। রাখবেই। জানে ত্রিদিব। আরো জানে। জানে যে, না সিরাজুল কিন্তু একটুও মাতাল নয়, এরকম একটু-আধটু বেশি কথা, বেশি কথা আর কী এমন, আড্ডা মারাই

তো, রাত জাগলেই, জেগে বন্ধুদের সাথে রাত কাটালেই সে বলে থাকে, তাই সিরাজুল মাথার উপর ঘাড়ের উৎসবিন্দুকে কেন্দ্র করে একটু বাড়তি ঘূর্ণ্যগতিবল একটু বাড়তি ঝাঁকুনিসহ বলে উঠবে 'না—কিচ্ছু না—কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু লেখা হয়নি—সব মিথ্যা প্রচার।' ত্রিদিব একটু চমকে যাবে। সেও তো একটুও মাতাল নয়, এমনকী তার মাথা ঝিমঝিমটাও করছে না, আরে এটা তো ওয়াইন, হুইস্কি বা রাম হলে তবু হত, ত্রিদিব তো অ্যালকোহলে একটুও অ্যাফেক্টেড হয় না, একবার তো সেই অরূপের সাথে ইন নো টাইম সাতশ পঞ্চাশ এম এল ব্ল্যাকনাইট, আর তার আফটার ম্যাথে কিচ্ছু না শুধু হাঁটুর মালাই চাকিটা একটু কেমন, খুবই সামান্য, নড়বোড়ে লাগা, কিন্তু কনসাসনেসের লেভেল কিচ্ছু না, সে তো মাল খেতে পারে না লিভারের কারণে, মাল খেলেই শালা লিভার তো চিত্তির, পাইখানা সাত দিনের জন্যে শাহেব হয়ে গিয়ে সে একটা কেলোর কেচ্ছা, তাই ত্রিদিবও, খুব স্বাভাবিক ভাবেই, ঠোঁটের সামান্য অধিকতর সঞ্চালনসহ একটা ঢোঁক গিলবে এবং একটা ছোট্ট মাখনাভাজা আঙুলের ডগার অনুভূতিবিহীনতায় তুলে নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে না পাবার সঙ্গে মেরুদণ্ডটা টান করে দিয়ে চোখটা টানটান মেলে জিজ্ঞাসা করবে, বা হয়তো বলবে, 'কিচ্ছু হয়নি—কিচ্ছু হয় নি?'—তারপরই, নিজের মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ কান ঘুরে মাথাঅব্দি যেতে খুব কমই সময় নেয় বলেই হয়তো, খুব ঝটপট বলে উঠবে, 'একজনও হিন্দু লেখক মুসলিম চরিত্র নিয়ে—সে কী রে?' এখানটায় একটু ফ্যানের হাওয়ায় দেওয়ালে জনসংযোগের সন্তোষ রোহতগি ডানা ঝটপট করে উঠবে—অর্থাৎ নৈঃশব্দ্য থাকবে। তারপর ফের বলে উঠবে, 'হুঁক' করে একটা হেঁচকিতে যার প্রথম সিলেবলটা ঘুলিয়ে গেলেও পরিষ্কার বোঝা যাবে, এত পরিচিত শব্দটা, 'মহেশ-শরৎচন্দ্রের—কী বলবি-আর মানিককে নয় ছেড়ে দে—বামপন্থী—'। এর উত্তরে সিরাজুল বলবে, 'কিচ্ছু না—কিচ্ছু না—পুরোটাই মিথ্যে—ষাঁড় —মুসলমানের ষাঁড়—কিচ্ছু না'। বাক্যটা কি শেষ হবে সিরাজুলের? যদি হয় তো ঠিক কীভাবে শেষ করবে সিরাজুল?

অনেক বাক্যই তো শেষ করা হয়ে ওঠে না সিরাজুলের—কত কারণে। খুব পরিচিত কারণও তো থাকে তার ভিতর। যেমন ছিল যখন বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে 'আমি বেরুব একবার—বুঝলি—মানে—সাবান—আসলে এত তাড়াহুড়ো—বেরুলাম যেভাবে', বলেছিল সিরাজুল। বাক্য শেষ করতে না পেরে।

কারণটা নিতান্তই চিরাচরিত—যেমন হয় মধ্যবিত্তদের—আসলে ও তো একটা সাবান খুঁজছিল যখন ওর মুখ দেখে দাম্পত্যের অভিজ্ঞতায় ত্রিদিব বুঝতে পেরেছিল যে ওর সমস্যাটা আসলে—রৌশন তো কারুর গায়ে দেওয়া ব্যবহার করা সাবান গায়ে দিতে পারে না, সমস্তটাই তো মানুষের অভ্যাস, আর এ অভ্যাস তো খুব বহুল। কেয়ার আছে। ত্রিদিবের নিজেরও কি নেই? তাই আসলে সিরাজুল জানতে চাইছিল যে ত্রিদিবের কাছে, ত্রিদিব কেয়ার সংসারে এই মুহূর্তে, আনকোরা সাবান একটাও আছে কিনা? সে জিজ্ঞাসা করেনি, শুধু বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেছিল এই আশায় যে ত্রিদিব বুঝেই নেবে। ত্রিদিবের জীবন—দাম্পত্য—নতুন জায়গা— সাবান— সাবান না-হোক টুথপেস্ট— টুথপেস্ট না-

হোক তোয়ালে— তোয়ালে না-হোক বিছানাচাদর— এই বাস্তবতার কোনো-না-কোনো অনুবর্তন এর কারণে নিজেকে সিরাজুলেব জায়গায় বসিয়ে ভাবতে পারার কথা, তাই বুঝতে পারার কথা, সিরাজুলের বাক্য কেন, অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে শেষ হয় না। ত্রিদিব বসাতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, সিরাজুলকে বাক্য শেষ না-করে থাকতে হয়েছে —এই অস্বস্তি কাটাতে ত্রিদিবকে একটু চেঁচাতে হয়েছিল, 'তুমি শালা বেরুনো দেখাচ্ছ —রাস্তা চিনিস? বাজার থেকে ফিরে আসতে পারবি? দাঁড়া কেয়াকে ডাকি— বার করে দিক একটা— মাসের বাজারে আনা আছে।' সিরাজুল আরামে হেসেছিল। যেন আবামটা আসলে তার বাজার চিনতে পারা না-পারা নিয়ে করা রসিকতায়।

হেসেছিল বেঁকাদাও। যেমন হেসে থাকে। তাও হাসিটা এরকম হয়ে যাচ্ছিল কেন বেঁকাদার? হয়ে যাচ্ছিল, নাকি লাগছিল সিরাজুলের? কেন হাসিটা একটা বায়ব বমনেব মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারপাশে, আলোয়, অন্ধকারে, গোধূলিতে?

কেন হাসিটা ঢুকে যাচ্ছিল সিরাজুলেব শরীরে যেন সে ঝাঁঝরা ফোঁপরা হয়ে গেছে —যেন তার কোনো অবয়ব নেই—কোনো অবয়ব নেই—কোনো মেরুদণ্ড নেই—যেন শরীরকে শরীর হিশাবে রাখার জন্যেই লাগবে বাঁধনের পর বাঁধন?

কেন তার সেই মুহূর্তেই মনে এল রৌশনের মুখ—একটা আলোকিত মুখ—হাসিতে উজ্জ্বল—কেন মনে এল রৌশনের কথা—কেন ঘরেব দিকে ধাবমান হওয়ার একটা গতি জন্মাল সিরাজুলের অভ্যন্তরে? কোনো প্রাগৈতিহাসিক অভ্যাসে—যে অভ্যাসে অনাদি অতীত থেকে মানুষ এই পড়ন্তবেলায় ঘবে ফিরে আসে—আশ্রয় থাকে—খাদ্য থাকে —নির্ভয় উজ্জ্বলতা থাকে—ঘরে, ঘরের ভিতর, ঘরনীতে।

বেঁকাদার মুখটা যেন বেঁকে যায়, বেঁকে যায়, মুখের দুপাশে অন্ধকার লাফ দিয়ে ওঠে কালো স্ফুলিঙ্গে।

ঘরে ফিরে যাবে কি সিরাজুল, এখনি? তারপর? তার ঘর কি তাকে বেঁকাদার থেকে, বেঁকাদার হাসির থেকে যথেষ্ট দূবত্ব দেবে—কোথায় পালিয়ে যাবে সে? সে আব রৌশন? বেঁকাদার মুখের হাসিটা মুখ থেকে শরীর—শরীর থেকে দেওয়াল থেকে রাস্তা থেকে মোড় থেকে কলকাতা—সারা কলকাতা দেশ পৃথিবীতে ছেয়ে যায়—কোথায় পালাবে সে বেঁকাদার হাসির থেকে—সে আর রৌশন?

প্রত্যেকদিনের অভ্যস্ত সঙ্গত হাসির থেকে ভয়ানক দূরবর্তী সেই মুখব্যাদানের কারণ বুঝতে পারছিল না সিরাজুল—অথচ ত্রিদিবের রসিকতা হাসির সময় সে হাসির পিছনে মুখ, তার পিছনে মাথা, তার ভিতর মস্তিষ্কের খাঁজগুলোকে দেখতে পায়, দেখতে প্রায় স্নায়ুর জটিল শরীর বেয়ে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়নের গতির রেখা। কেন? কেন সিরাজুল সেই মস্তিষ্ক দেখতে পায় যে মস্তিষ্ক তার নিজের নয়—কেন? অনুবর্তনে? অভিজ্ঞতার অনুবর্তনে? অনুবর্তনের একদেশতায়?

অনুবর্তনই তাই যা বিষাদের গানকে অমল, বিমল, কমল তিনজনের কাছেই বিষাদিত করে পৌঁছে দেয়। নইলে অমলের প্রত্যেকটা মুহূর্তের ইতিহাসই বিমলের থেকে আলাদা, কমলের থেকেও। অমলের মস্তিষ্কের প্রতিটি ভাঁজের প্রতিটি মাইক্রন বিমলের থেকে আলাদা, কমলের থেকেও। তাও তারা তিনজনেই মানুষ—তিনজনেই বিষাদিত হয়। সমস্ত পার্থক্য নিয়েও সেখানে গতিটা থেকে যায় একই। অনুবর্তনের গতি। সিরাজুলের খারাপ লাগাকে, চিন্তাকে বুঝতে পারা ত্রিদিবের ভিতর একটা একদেশতা দেয়। সে সিরাজুলের দাম্পত্যনির্ণীত গোপন অস্বস্তিকে টের পাচ্ছে। সিবাজুল টেব পাচ্ছে যে, সে টের পাচ্ছে। এটা একটা মিল খুঁজে দেয় দুজনের ভিতর। এই মিলটা কি আশা করেনি ত্রিদিব? সিরাজুল মুসলিম, তার ইতিহাস মুসলিম ইতিহাস। ত্রিদিবের হিন্দু ইতিহাস থেকে পৃথক। তাই সেখানে অপরিচয় এত গভীর। তার তো মিলিয়ে উঠতে পারার কথা নয়—এরকমই কি ভেবে রেখেছিল ত্রিদিব? এই গল্পের সময়সীমার রেশ অনেকটা, প্রচুর আগে যখন সান্ধ্য আড্ডায় অভিষেক আর কেয়া আর ত্রিদিব ব্রীড়ায় পৌঁছুতে বাধ্য করছে সিরাজুলকে—সে তার সম্ভাব্য স্ত্রী—যার নামটা—রৌশন—বারবার শোনা সত্ত্বেও গুলিয়ে ফেলছিল ত্রিদিব—রৌশনের কথা যখন গল্প করছে সিরাজুল—ত্রিদিব কি অন্য গ্রহকে টেলিস্কোপে দেখার কৌতূহল পাচ্ছিল নিজের ভিতর—কেন?

কাদার ভিতর পা ডুবে যায়। কাঁটায় শরীরের রক্তপাত হয়। ওই কি গুলির শব্দ? না। তাহলে আগুন? না—তাই বা কী করে হয়? তারা লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছে আগে। অনেক আগে। যার পরও তারা হেঁটেছে দুই দিন একরাত্রি বা দশ লক্ষ বছর। অন্ধকার তার গর্ভের ক্লেদ—মজ্জা—রক্তপাতে চারপাশের বাতাসকে শুষে নিতে থাকে। তারা হাঁটে। হাঁটতেই থাকে। হাঁটতে হয়। কাদার ভিতর পা ডুবে যায়। কাঁটায় রক্তপাত হয় শরীরের। তারা পালায়। কেউ পড়ে যায়। তার শরীরের শেষ বায়ুকণা তখন অন্ধকারে। হয়তো তাকে হেঁচড়ান হয়। হয়তো নয়। শেয়ালের নিজস্ব প্রহরে মিশে যাওয়ার জন্যে তার শরীর পড়ে থাকে জলার পোকাদের কাছে। যুবক স্বামী তার গাভীন স্ত্রীর শরীরের ভার নিতে চায়। আর কত ভার নেবে? একটা মেরুদণ্ড? একটা দেশের একটা যুগের একটা সমাজের আত্মহননের ভার? গাভীন স্ত্রী কাঁদে। তাও হাঁটে। হাঁটতে হয়।

এক জন না দশ জন না হাজার জন হাজার হাজার জন লক্ষ জন পথ হাঁটে। হাঁটতে হয়। তারা সীমান্তের দিকে যায়। সীমান্ত পেরিয়ে যাবে তারা। বধ্যভূমি ছেড়ে যাবে তারা। তাদের প্রত্যেকের শরীরে একটাই অনুভূতি—বাঁচতে চায় তারা। সবাই পারে না। মরে যায় অনেকে। অনেকে বাঁচে—তারা একটা ক্রোধকে বহন করে চলে—দেশভাগের ক্রোধ। তাদের প্রত্যেকের হত্যা বন্ধক থাকে—সেই প্রত্যেকের হত্যা—যারা বধ্যভূমি করেছিল তাদের জন্মভূমিকে।

দরজার গায়ে হেলান খুঁজে নেয় ত্রিদিব। তার উত্তেজনা তার শিরাগুলোয় পাক খেয়ে খেয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। দরজার পাটাতন, তারপর দেয়াল, দেয়াল থেকে মেঝে, মেঝে-ঘর-বাড়ি-পৃথিবীকে থরথর করে কাঁপিয়ে দেয় সব কিছুকে। হিংস্র, প্রায় নিঃশব্দ আস্ফালনে ত্রিদিবের বাবা, 'বেরিয়ে যাও'। এত নিঃশব্দ তিনি কি নিজেও শুনতে পান? তার নিজের বীভৎসা তিনি কি নিজেই দেখতে পান, যখন চেঁচিয়ে ওঠেন 'বেরিয়ে যাও' বলে, দেখতে পান কি ত্রিদিবের বীভৎসাও? দরজা ঘর বাড়ি পৃথিবী কেঁপে চলে।

তখন মাতাল নেই, মাতলামো নেই, শুধু বাক্যের মধ্যে মধ্যে দম ফুরিয়ে যাওয়া থাকবে। সেই দম ফুরিয়ে যাওয়ার ভিতর সিরাজুল শেষ করবে ঠিক এইভাবে, 'শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরেব বাচ্চারে, মুসলমানে ষাঁড় পোষে না।' আবার গ্লাস, তাতে অনেকটা তখনও বাকি থাকে, গাঢ় বাদামি থেকে হালকা হয়ে এসেছে, জল তো হালকা করে দেয়, মদ রক্ত সব কিছুকেই। এরপরই, শেষ চুমুক, গ্লাসের শেষ তাই নতুন গ্লাসের শুরু, গ্লাসে ঢেলে নেবে, ভরে নেবে ওল্ড বস, কাজু থেকে তৈরি ওয়াইনে, কি টলটলে হালকা হলদে লাল রং যেন জীবন যেন যৌবন, কি উচ্ছল বর্ণে—প্রাণশক্তিতে, আর মজার জন্যেই একদিন, বোতল না শেষ করে উঠবেই বা কেন, ওয়াইন তো, রাম নয় যে ক্ষতি হবে খুব শরীরের, হলেই বা কী? 'কোনো শুয়োর, শুয়োরের বাচ্চা—বলল, বলল কেউ —মহেশ—শালার মহেশ—মুসলমানের ষাঁড়?'

নৈশ মদ্যপানের আসরে, মদের ঘোরেই হয়ত, যে প্রশ্ন তুলবে সিরাজুল সেটা নিয়ে, সিরাজুলের সেই প্রশ্নটা নিয়ে কত ভেবেছে ত্রিদিব—কত আলোচনায় তুলেছেও। চমকেছে লোকজন—সত্যি নাকি?—মুসলমানে ষাঁড় পোষে না?—মহেশ গল্পটার গোড়াপত্তনেই অথেনটিসিটি নেই কোনো? বিস্ময়ের সঙ্গে সবাই একটা নৈঃশব্দ্যে ঢুকে গেছে। সিরাজুল তো সেরকমই মুসলিম, মূত্রত্যাগের সময়, কি সঙ্গমের সময়, শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারেই কেবল যে তার মুসলিমত্বে পৌঁছুতে পারে। আর কখনো নয়। ঠিক ত্রিদিবেরই মতো। বা ত্রিদিবের চেয়ে সামান্য বেশি, ত্রিদিব যেমন কখনোই পারে না। কখনোই না। শুধু এই একটা সময় ছাড়া—যখন রামরথের পিছন-পিছন দাঙ্গা ঢুকে আসে। এমনকী ত্রিদিবদের, সিরাজুলদের বাস্তবতার ভিতরেও। যেখানে ধর্মবিহীনতা কত যত্নে লালিত, পরিপোষিত হয়েছে। কী ভঙ্গুর ত্রিদিবের ধর্মবিহীনতা—কী ভঙ্গুর।

আদবানির মাসিডিজ বেঞ্জ তার সমস্ত দাপট নিয়ে ঢুকে এল ত্রিদিবের ব্যক্তিগততম রক্তের ভিতর। ত্রিদিব আর সিরাজুল যে এক নয় কী সহজে সে হিশাব হয়ে গেল। কিন্তু এই হিশাব—এই আলোচনা অনেক পরের সময়ের—অনেক পরের। আপাতত ত্রিদিবের বাবার চিৎকারে ঘরের ভিতর থেকে আরো অন্যরা সবাই আসে বাইরে। পারিবারিক মানুষেরা। কিন্তু তখন তো ত্রিদিব আর তার বাবার অভ্যন্তরীণ রোষের বিষয়টা পারিবারিকতা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সামাজিক হয়ে যায়। ধর্ম, ধর্মের সংস্কার—তার

ভূমিকা কতখানি? গুরুজনদের সম্মানকে কি ধ্বংস করা যায় সংস্কারের বিরুদ্ধ যাত্রায়? এই একই প্রশ্নকে এর বিপরীত দিকনির্দেশে এইভাবেও করা যায়—একজন ব্যক্তিমানুষের, আমন্ত্রিত মানুষের অপমান কি করা যায় সর্বসমক্ষে, ধর্মীয় আচারের যুক্তিতে? ত্রিদিব, ত্রিদিবের ঠাকুমা, ত্রিদিবের বাবা এদের নিজস্ব পারিবারিক ঘটনা গড়াতে গড়াতে বরফ কন্দুকের নিজস্ব গতিতে তখন কংক্রিট থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট, একক থেকে সাধারণ।

ত্রিদিবের ঠাকুমা শশিবালা দেবী যিনি তাঁর টিপ ছাপে নয়, সেই আমলের শিক্ষিত মানুষ তিনি, সই করে স্বামীর কালেক্টরেটের চাকরির মৃত্যুপরবর্তী অবসরকালীন ভাতা নিতেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন, লালপাড় গরদ পরিহিতা ত্রিদিবেব মাকে একটা পিতলের বাসনে কিছু পূজাসামগ্রী দিয়ে যেতে বলেন, বছরের মধ্যে তো এই একটাই উৎসব—বহু বছরের, শশিবালা দাসীব শ্বশুরকুলের আবহমান উৎসব। ফিবে যেতে-যেতে সস্নেহ দৃষ্টিপাত নাতির বন্ধুদের, একটু দূরেই যারা কোলাহলে, জোয়ান বয়সের ছেলেরা সব কোলাহলেই তো থাকবে, একটু পরেই গোগ্রাসে তরমুজ, লুচি, পায়েস খাচ্ছে তারা : এই দৃশ্য শশিবালার মাথায় শরীরে কী আরাম, মানুষ তো বেঁচে থাকে এইজন্যেই —ময়মনসিংহের বাড়িতে এই পূজো হত, এখনও বছব বছর করে চলা হয় —নাতির বন্ধুরা পেটভরে খাবে—ছেলেরা কোলাহলে, তাদের পাশ দিযেই চলে যান শশিবালা—যেতে-যেতেই কিছু শোনেন, শোনেন কি আদৌ, না শোনেন না, আদৌ শোনেন নি তিনি, কী করে শুনবেন, শুনতে তিনি পান না, শুনতে চাননি তিনি, অথচ শুনতে তো হয়ই, কথা যদি বলা হয় কেউ না কেউ তো শুনবেই। শুধু শোনাতেই শেষ হয় না সেই কথা, শুনেই কিছু করে উঠতে হয়। একটা নাম। একটা নামই তো মাত্র। নাতির বন্ধুরা, সেই আবেগপ্রবণ মনোরম সস্নেহ দৃষ্টির ভিতর পৌত্ররা ছিঁড়ে ফেলার কাগজের মতো দলামোচড়া পাকিয়ে যায়, ঘোলাটে হয়ে যায়, ঠাকুরঘরের দরজার সামনে চকচকে কাগজের রঙিন সাজ দুর্গন্ধ তখন ধুনোর ধোঁয়া—কোন দূর অতীতের গন্ধ শবের গন্ধ দেশভাগ মৃত্যু রক্ত শব পচন শবদাহ ধোঁয়া মৃত্যু দেশভাগ।

কেয়া অফিস থেকে ফেরেনি। সিরাজুল, ঢ্যামনা সিরাজুল সারাটা শনিবারের দুপুর কাটা পাঁঠার মতো ঘুমিয়ে চোখ ফোলা, মুখও। অফিস থেকে ফিরে এসেই ওর মুখ কথার জড়তা চোখের পাতা ভালো করে না তুলতে পারা ইত্যাদিতে হিংসা হয় ত্রিদিবের। ঘুমের খোয়ারি কাটাতে ঢ্যামনাটা এতক্ষণ অ্যাসট্রে থেকে পুরোনো পোড়া সিগারেটের টুকরো তুলে তুলে যে ত্রিদিব তো আসবেই অফিস থেকে, সিগারেট থাকবেই সঙ্গে, সেটা রৌশনের নালিশ থেকে জানতে পারে ত্রিদিব। কী যে আরাম পায় ত্রিদিব, হিংসার উল্লাসের আরাম, থপথপ করে বিরক্ত সিরাজুল যখন সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে নামে। যোজন-যোজন পথ পেরিয়ে তাকে সিঁড়ি রাস্তা বড়ো রাস্তা মোড় বড়োরাস্তা আয়ল্যাণ্ড সিগারেটের দোকান যেতে হবে। 'যা শালা যা—আরো ঘুমো মৌজ করে সারাটা দুপুর'। রৌশন তো জানে ত্রিদিব কী ক্যাবলা, ক্যাবলা থাকার আরামেই হয়তো, তাই বারান্দার রেলিঙে গড়িয়াহাট

মোড় থেকে কেয়ার দরাদরির পর চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা ডজনের ক্লিপ খুলে পায়জামাটা এনে দেয়, বদমাইশি হাসি হাসে, জিজ্ঞাসা করে 'জামাটাও দেবো?' ত্রিদিবও হাসে। মাথা উপর নিচে দ্রুততায় নাড়ায়। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বসন্তের ঝিরিঝিরি কাঁপন তিরতির করে সুখসায়রের জলে, কী আরাম বাল্যে, বাল্যের আগেও বাল্যে জসিমউদ্দিন-এর নাকি যতীন্দ্রমোহনের কাজলাদিদি বা আর একটু বাদে বিভূতির পুঁইমাচা, জসিমউদ্দিন না যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত? দেয়াল চেয়ার বুককেস ছাড়া জামাকাপড় ঘরের কোণে কন্ট্রাক্টরের দেওয়ালেব খসে-যাওয়া প্লাস্টার সব কিছুকেই স্বচ্ছ নরম উষ্ণ, যেন গ্রীষ্মের দুপুর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পব পর ঝাঁকড়া গাছের ছায়ার মধ্যে ও শুয়ে, যখন হাতের মধ্যে একটা শাদা খুব শাদা নয় ঘোলাটে শাদা মিষ্টি জামরুল। ত্রিদিব কামড়ায় ঠোঁটে লাগায় নাড়াচাড়া করে কামড়ায় নাড়াচাড়া করে গলার ভিতর দিয়ে জামরুলের রস যা পৃথিবীর অন্তঃস্তল থেকে। ত্রিদিব বসে। পাঁচ বাই আট বারান্দায় ছোট্ট বেতের টুলে। রৌশন চায়ের জল চড়ায়। হিটার অন করার, চায়ের জল ফোটানোর প্যান নাড়াচাড়ার, কাপের ভিতর চামচ ঠুকে ঠুকে সেঁটে যাওয়া চিনি ঝরানোর শব্দ। বারান্দা থেকে দেখা যায় পুরো রাস্তাটাই, যে-রাস্তা দিয়ে ঘুমের সম্পূর্ণ গোলত্ব থেকে হাঁটাহাঁটিতে কিঞ্চিৎ কৌণিক হয়ে ওঠা সিরাজুল ফিরে আসবে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে। রৌশন বাইরে আসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, অফ হোয়াইটের সরু কালো দাগে জংলা ছাপা কাফতান কোমরে বুকের নিচে বেশ আঁট করে বাঁধা, কেয়া দিয়েছে পরতে, ওরা ব্যস্ততায় যথেষ্ট জামাকাপড় আনতে পারেনি, বেশ মেয়েলি আরামে রৌশনের গায়ের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। ত্রিদিবের দিকে মুখ ঘোরায় রৌশন, ফচকেমির হাসির সাথে বলে 'চা ভিজিয়েছি—তিন মিনিট—শিম্পাঞ্জি এক শিম্পাঞ্জি দুই করে একশ আশি গুনছি'। আগের দিনই তো শিখিয়েছিল ত্রিদিব ভালো চা করার জন্যে তিন মিনিট ভেজাতে হয়। মিনিট গোনার জন্যে শিম্পাঞ্জি এক শিম্পাঞ্জি দুই মনে-মনে বলে চলার পদ্ধতিও। হাসে ত্রিদিবও। হাসিটা শুধু মুখের চামড়ার গভীরতাতেই আটকে থাকে না গলে-গলে তরল তরলতর হয়ে ছড়িয়ে যায় চোয়াল গাল গলা বেয়ে বুকে—কী আরাম। ত্রিদিবের নিজের বোন নেই, একটা দিদি, তাও দেখা হয় না প্রায় দু বছর। কিন্তু এই রৌশন এ তো তার বোনেরই প্রতিক্রিয়া। রৌশন বেশ ছেলেমানুষ, ত্রিদিবকে ত্রিদিবদা বলে, এবং হয়তো ছেলেমানুষ থেকেই খুব সহজেই 'তুমি' বলে যা একটা আরাম দেয় ত্রিদিবকে। অথচ প্রথম দিন, প্রথম যেদিন বিয়ের পর রৌশনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ত্রিদিবের আর কেয়ার, অকাদেমিতে নাটক দেখাতে এনেছিল সিরাজুল, তখন চাইছিল বহরমপুরের মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতার ইতিহাসে পুনর্বাসিত হোক রৌশন, সেদিন রৌশন যখন ত্রিদিবকে ত্রিদিবদা বলে ত্রিদিব কি একটু অবাক হয়েছিল? আসলে টেলিভিশনের সিরিয়াল অথবা অন্য-কোনো অনুষ্ঠানের কোনো মুসলিম চরিত্রের অন্দর-ঘর-অভ্যন্তরিকতা যা ত্রিদিবের মুসলিম জীবনবিন্যাস বিশেষত পারিবারিক জীবনবিন্যাস সম্পর্কে একমাত্র সূত্র সেই অভিজ্ঞতাই কি দাদা ব্যতিরেকে অন্য-কোনো সম্বোধন হয়তো ভাইয়া হয়তো অন্যকিছু এরকম একটা সম্ভাবনা, ত্রিদিবের ঠিক সচেতনতায় না তার

আশু গোপনে কোথাও, তৈরি করেছিল—আশাভঙ্গ বা ওই গোছের কিছু একটা হয়েছিল ত্রিদিবের সেই মুহূর্তে,—'ত্রিদিবভাইয়া' গোছের কোনো ডাক বোধহয় টিভি সিরিয়ালের (বা হয়ত 'গরম হাওয়া'র) রকমে প্রচুর উর্দুশব্দ আর জরি বসানো রৌশনের সালওয়ারের উত্তেজক আড়ম্বর পৌঁছে দেবে এই আশার। সেটা একদমই অনুপস্থিত হয়ে যায় 'ত্রিদিবদা' ডাকে। আবার সে-দূরত্বটা কি সম্পূর্ণ অতিক্রান্তও হয়? হয়তো সম্বোধনে বোঝা গেল না, কিন্তু অন্য কোথাও ঠিক জানান দেবে সেই অবাঙালিআনা—মুসলিমরা তো বাঙালি নয়। '**শ্রীকান্ত**' উপন্যাস, খুব স্বাভাবিকতাতেই, শুরু হয় বাঙালি ও মুসলমানদের ভিতর একটি ফুটবল খেলা সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মুসলিমদের অবাঙালিত্বকে অস্বীকার করে ত্রিদিব। কিন্তু অস্বীকারের ক্রিয়ার ভিতরেই তো একটা স্বীকার থেকে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নেই করে দেওয়ার ঘোষণার ভিতরই যেমন ঈশ্বর নামক সেই সিডাক্টিভ যুবকের ছুঁকছুঁককে প্রচণ্ড অস্তিত্ব—সশব্দে জানান দেওয়া অস্তিত্বকে টের পাওয়া যায়। তাই তিন মিনিট চা ভিজিয়ে রাখার ঘোষণার পরে, অন্য অনেক সময়ের মতই, যে প্রতিক্রিয়া ত্রিদিবের স্বতঃস্ফূর্ততা বেয়ে উঠে আসে তাকে তখুনি বার করতে পারে না ত্রিদিব, মাথার ভিতর অন্তত একবার বাজিয়ে দেখে নিতেই হয় যে একটা কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে না তো অপরিচয়ের দূরত্বের দরুন। রৌশন ত্রিদিবের বোন হয়ে গিয়েও হয়ে উঠতে পারে না।

যদিও গল্পটা লেখা শুরু হয় ছাব্বিশে জানুয়ারি একানব্বই—লেখা চলতেই থাকে। থাকছে চোদ্দই জুন একানব্বই অব্দি তাই গল্পের শুরুর সময়েও যে অতীত ঘটে ওঠে নি এখন গল্পে সেই ঘটনাই থাকে। ত্রিদিবের সেই ইউনিভার্সিটির সময়ের এক মাস্টারমশাই, যার সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে আড্ডা মারতে যায় ত্রিদিব, তার সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টার ভিতর বারবার গোঁফে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলে ওঠেন: 'আমি ত এই কদিন আগেই এলাম মালদা থেকে—ওরা এটাকে প্রচারের নির্বাচন হিশেবেই নিয়েছে—কিন্তু জমি ওরা গেইন করছেই।'এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ান—দাড়ি চুলকোন। টাকের উপর, ছোট চৌকো চশমার মোটা কাচে আলো ঠিকরায়। ঠিকরে ওঠা আলোটাই কি ত্রিদিবকে চমকে দেয়? নাকি তার ভিতর চমকে ওঠাটা ছিলই? 'কি ওয়ালিং করেছে? কাশ্মীরের সন্তানহারা মায়ের কান্নার চেয়ে ইরাকের সন্তানহারা মায়ের কান্না কি বেশি করুণ? এটা ত পারে না—আসতেই পারে না এমন কারুর কাছ থেকে যে লেফট ইডিওলজিকে ইন্টারান্ট করে নি।' ঘর পেরিয়ে টেবিলের পাশে দেওয়ালে চারু সচেতন সজ্জায় তিনটি যামিনী রায়ের প্রিন্ট। তার দিকে চোখ ডুবে যায় কারণ মাথার ভিতর দম ফুরিয়ে যাওয়া, ত্রিদিবের লো ব্লাড প্রেসার, এলোমেলো হয়ে যাওয়া মাস্টারমশাই-এরও যা তাঁর শ্বাসাঘাতে এখনই বোঝা যাবে। 'আসলে একটা ব্যাপার আমরা ভুলে যাই—একটা জিনিশ সোশাল লেভেলে ত এত তাড়াতাড়ি উবে যেতে পারে না—', নিজের মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝাতেই যেন, কথার সাথে মাথা নাড়াতে থাকেন মাস্টারমশাই, '—আমি চৌষট্টি সালের দাঙ্গা দেখেছি—এত তাড়াতাড়ি সে জিনিশটা ভ্যানিশ করে গেল —জাতীয়জীবন থেকে?'

মাস্টারমশাই মনোলোগে নয় কথোপকথনে ছিলেন। তাই ত্রিদিবও কিছু বলেছিল। নিশ্চই বলেছিল কিছু। অভিষেকের 'আমার খুব ভয় করছে' মন্তব্যের মতই কোনো কথা। এমন কথার ত আলাদা করে কিছু মানে থাকে না শুধু বলে যাওয়ার তাড়না থাকে, এরকমই কোনো মন্তব্য করেছিল নিশ্চই ত্রিদিব নইলে পরের কথায় পৌঁছবেন কি করে মাস্টারমশাই?

আসলে বি জে পি-কে এবার আটকাবে কে? এক লেফট যদি সাবা দেশ জুড়ে সেই ক্ষমতার জায়গায় থাকত।—কারণ কংগ্রেসের যে জাতীয়তা—ন্যাশনালিজম—সেটা তো হিন্দু ন্যাশনালিজম—অন্তত তার ফবমুলেশানটাই এমন যাতে বি জে পি-র পজিশন ফেস করা তো দূরের কথা—কোনো কাউন্টার পজিশনই তৈরি করা যায না।'

আসন্ন নির্বাচন। সামনেই। এই ধরনের কত কথোপোকথনেই অংশ নিয়েছিল ত্রিদিব। এতৎসত্ত্বেও সেই সমস্ত কথোপকথন মিলে কি ত্রিদিবকে সেই নিরাপত্তা বোধটুকু দিয়েছিল যে নিরাপত্তাবোধ অভিষেক খুঁজেছিল সেই গাঢ় বিভীষিকার অভ্যন্তরে যখন কলকাতা ফুরিয়ে যেতে থাকে, কুঁচকে কুঁচকে দলাপাকানো, এই কলকাতা এখানে, ওই কলকাতা ওখানে, কিন্তু সব মিলিয়ে কোনো কলকাতা নেই—সবার কলকাতা। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায আসে অভিষেক, লেখা দেয় কলকাতার পত্রিকায়, তার কলকাতায়, সেই কলকাতা তখন বিভিন্ন উপজাতির স্বতন্ত্র এলাকা। পূজাভূমি আর বধ্যভূমি। পূজাভূমি তাই বধ্যভূমি। রাজাবাজারের রক্ত জানবাজারে গড়ায়, বড়বাজারের আগুনের দাউ দাউ শিখা বৌবাজারের সংসার পোড়াতে থাকে। সেই বিভীষিকার দিগদর্শন তখন সমস্ত সমিধেই। যে বাসে খবরের কাগজের অফিসে গেল অভিষেক সেই বাস, বাসও ত তখন উপজাতি পূজাবিধিতে, তাকে কী করে নিয়ে যাবে ধর্মতলায় হিন্দুস্থান বিল্ডিঙের ঘুপচি দোতলায়, ভারতের বিদেশনীতি পাক্ষিকের দরবারে জমা দেবে সে? বা কী করেই বা তারপর ধর্মতলা থেকে তারাতলা, সেখানে সিরাজুলের একচিলতে ঘর, একচিলতে ত কী হয়েছে, একটা খাট—আস্ত সর্বাঙ্গসুন্দর খাট ত রয়েছে (এখন একটা নয়, দুটো খাট —সিরাজুলের পোস্টবিবাহ পর্বে), সারা রাত মহিলার থেকে মহিলায় আদিগন্ত মহিলায় বিলাপ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিরাত্রিক ইতিহাস? সে ভদ্রলোক অভিষেকের সঙ্গে একই বাস থেকে নামলেন, ছাতা ঠুকলেন পথের গায়ে, তার ধুতি অসংবৃত ছিল, ঠিক করলেন, কী করেই বা তিনি রিটায়ারমেন্ট তো হয়েই গেছে, তারপরও কোনোক্রমে প্রাইভেট অফিসে হিশাব রাখার কাজটা বাগিয়েছেন, সংসার তো চালাতেই হবে, পৌঁছবেন তার ছশ পঞ্চাশ তংখার চরিতার্থতায়? কী করে কী করে কী ভাবে কলকাতার ধুলো মেখে-মেখে হাঁটবে কলকাতার প্রেমিক প্রেমিকারা। পথও তো তখন উপজাতি অধ্যুষিত উপদ্রুত এলাকা?

নাম, একটা নাম, একটা নামই শুধু শুনতে পেলেন, নাম ধরে ডাকছে, সে ত ডাকবেই,

ডাকতে গেলেই নাম ধরতে হয়, ডাকার জন্যই নাম। যাকে ডেকেছিল তাকে তো ওই নামেই ডাকা হয়, ওই ইনামুল বলেই, ওর নামই তো ইনামুল কবীর। ওর বাড়িতে বাতাবিলেবুর গাছ, দো-ফসলি, আসলে সারাবছর ধরেই ফলে অল্প-অল্প, হাড়ে টক আর টক বলেই তো অন্য কোনো কারণ নেই, ইনামুলের বোন পপির কাছ থেকে অন্যদের নুন চেয়ে নিতে হয় খোসাভাঙা বাতাবিলেবুর নরম গোলাপি শরীব মেখে খেতে, তাই বারবার পপি বলে ডাকতে হয়, পপি নামটায় তো সেটুকু প্রমাণও থাকে না ইতিহাসের ভিন্নতার। যা ইনামুলে থাকে। থাকে বলেই একটা নাম, কেবল একটা নামের উচ্চারণ ত্রিদিবের ঠাকুমাকে, সস্নেহ প্রশ্রয়ের ঠাকুমাকে প্রেতচ্ছায়ে নিয়ে যায়।

ত্রিদিবের বন্ধুরা সকলে, প্রত্যেকেই, স্তম্ভিত মূঢ় চোখে, কী হচ্ছে তারা বুঝতে পাবে না, তাকিয়ে থাকে এ অন্যের দিকে, তাকায়, দাঁড়িয়ে আছে তারা তখন। আর, একটা কদর্য বীভৎসা বাতাসে ঘুরতে থাকে, পাক খায়, ত্রিদিবের বাবাকে মিলিয়ে নেয় ঘূর্ণীতে, ত্রিদিবকেও। কত চিৎকার প্রতিচিৎকার, বাড়িঘব কাঁপতে থাকে, পারিবারিক বিষয় সামাজিক হয়ে যায়, ত্রিদিবের বাবা গলার ভিতর দাঁতের ঘর্ষণে উচ্চারণ কবেন 'বেবিয়ে যাও।'

মাছভাজা, দাগা দেখে দেখে পমফ্রেট মাছের ভাজা তো ছিলই, ওল্ড বস শুধু না জিন খুব ভালো লাগে ওদের দুজনেরই, জিন তো এমন যে নেশাটা খুব ধীরে ছড়ায়? কয়েক ঘণ্টা পরেও, ফোরবেস-এর ঘোলাটে বোতলের জিন লাইম জুস কর্ডিয়ালে মেশে গ্লাসের ভিতর। কমলালেবুর খোসার কড়া তীব্র কটু তাজা গন্ধ ছড়ায়। একটু কি হাত কাঁপে ত্রিদিবের, ধুস হাতে কাঁপা কি, এমনিতে কাঁপে না মানুষের হাত, রাখ তো ধরে দেখি কেমন পার হাতটাকে বাতাসে আনুভূমিক করে নিরালম্ব ত্রিশঙ্কু, এক মিনিট কি না পার তো তারও কম, কাঁপবেই, তাই কাঁপে অল্প যখন এক পেগ কি দেড়ই হবে ঢেলে নেয় ত্রিদিব চৌখুপি কাটা কাচের গ্লাসে। অথবা হয়ত প্রশ্নের আঁচে প্রশ্নটা করার বিস্ময়ে বা এমন প্রশ্ন ত বিস্ময়ের সাথেই করতে হয় ত্রিদিব যে প্রশ্নটা করবে, 'বলিস কী—অর্ধেন্দু মিত্র, মালটা না রবীন্দ্রনাথ সত্যজিৎ সিরিজে শেষ সংযোজন?' একটা জুতসই খিস্তি কাঁচা মুখখিস্তিতে এমন জিনিশ ঠিক আসে না 'ছবি-ফিল্ম-কবিতা-উপন্যাস কী নেই —তার উপরে শালা আবার বাম রাজনীতির প্রোডাক্ট—চল্লিশের পঞ্চাশের দশকের বামকৃষ্টির—বলিস কী?' অকারণেই, অকারণ মানে বলা কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে সিরাজুলের ডান হাতের তর্জনী যার গায়ে পমফ্রেটের দাগা ভাজার গা থেকে অল্প তেলের হলদে লাল, তুলে ধরে, ধরেই থাকে যেন কালের প্রহরী। 'হ্যাঁ—হ্যাঁ অ্যা অ্যা—সেই অর্ধেন্দু মিত্র আমায় বলে বাঞ্চোৎটা তুমি মুসলিম চরিত্র নিয়ে লেখো কেন—হিন্দু চরিত্র নিয়ে লেখো—দেখো না রহমানকে?' আঙুলটা নেমে যায়, মাথাটা উপর নিচে দোলে সিরাজুলের। রাতের, গভীর রাতের বাতাসে জানলার শার্সিতে স্ট্রিট ল্যাম্পের অবয়ব কাঁপতে থাকে। 'আরে শালা রহমান নাকি আমি—আমি সিরাজুল—আমার কি শালার-

শালার-শালার গা থেকে হতাশা, পচা পচা বমির গন্ধ বেরয়? শালার হিন্দু চরিত্র নিয়ে না-লিখলে সাকসেস পাবো না?' একথাও কি ভেসে থাকে ত্রিদিবের মাথায় সবাই তো সিরাজুল না ভাই আবু জাফর আজহার হাসমিও থাকে যারা গঙ্গা—রামরাজ্য—স্বর্গবাস নিয়ে কবিতা লেখে, কেন, কবিসম্মেলনে জায়গা পাবে বলে, টিভির পর্দায়? হয়তো একদিন সিবাজুলও লিখবে।

এখানে আছে সিরাজুল রৌশন, এটাই ত আবাস ওদের, ওদের বন্ধুরাও আসে যারা সঙ্গতভাবেই ত্রিদিব কেয়ারও বন্ধু হয়ে যায়। রেজাক আসে। ওর বউ আয়েষা। রেজাক ভালো কোর্মা রাঁধে। কিভাবে প্রথমে গরমমশলা ফাটিয়ে রেগে-ওটা তেলে দিয়ে ভাজা গন্ধ বেরলে, তাতে পেঁয়াজ ভেজে দই দিয়ে আদা লঙ্কা রসুন পেয়াজ বাটা দিয়ে মেখে রাখা মাংস কড়াইয়ে দিয়ে, কড়াই-এর চেয়েও ভালো হয় প্রেসার কুকার জাতীয় কিছু হলে ঢেকে দিয়ে, যা সত্যিকারেব মার্গিতব্যতার মোক্ষে পৌঁছুনো করাতে হলে লাগে একটু তেলে ভেজে রাখা জিরে, আঃ, বেলনচাকিতে গুঁড়িয়ে নিয়ে, ঠিক নামানোর আগের মুহূর্তে, একটুও কমবেশি হলে চলবে না, মাংসে দিয়ে দেওয়া, সেই বর্ণনা দেয় রেজাক। বর্ণনার আড়ম্বরের উত্তেজনায় ভোজের প্রসঙ্গ ওঠে, হয়ে যাক একটা, চল, চালাও পানসি বেলঘরিয়া, কি বল সিরাজুল রৌশন কেয়া ত্রিদিব হয়ে যাক একটা মহাভোজ। ত্রিদিব যে কিনা সেনগুপ্ত হয়েও কুলীন ব্রাহ্মণ কারণ খাদ্যের গন্ধ কেন প্রসঙ্গেই গলে যেতে শুরু করে, বলে, গতির উৎসাহে, 'চিত্তরঞ্জনের রসোগোল্লা আমি স্পনসর করছি, কোর্মা রেজাকের—আর কে কী বল বলে ফেল চটপট, শুভস্য শীঘ্রম।'

ভোজের প্রসঙ্গ তার নিজস্ব গতিতে বড়ো হয়ে চলে। তখন আয়েষা বলে, এর একটু আগে তো ধর্ম নিয়েই—ধর্ম না মানা—ধর্মটা কেমন ব্যাকডেটেড—আচার পালনের গেঁয়ো অভ্যাস তাদের নাগরিকদের থাকে কী করে, বলে ওঠে যে শুয়োরের মাংস হোক, এটার মধ্যে তো নূতনত্বও থাকে কারণ ত্রিদিব কেয়া হরহামেশাই গরু খায়।

এক পলকেরও কম সময় রেজাক তাকিয়ে থাকে, হয়ত আয়েষার দিকে, হয়ত দেয়ালের, শূন্যতা—বোধহয়—চোখে, ত্রিদিব পর্যবেক্ষণ করে, নাকি তার পর্যবেক্ষণই রেজাকেব খুব সঙ্গত, খুব স্বাভাবিক, বাক্যের অভ্যন্তবে শব্দের ভিতর, কথার অভ্যন্তরে বাক্যের ভিতর, কথা উপকথনের অভ্যন্তরে কথা থেকে কথান্তরে, ফাঁক ত থাকেই, যা বাগধারা, ফাঁককে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। ধর্মের তাৎপর্য, বা পরিচয়ের, পরিচয় ত তখন, এখন, অনুক্ষণই, রামরথ উত্তর যুগে (এবং হয়ত প্রাক রামরথ যুগেও), ধর্ম থেকে আসে রেজাকের, ত্রিদিবের মতই। রেজাক ও ত্রিদিবের পরিচয় পৃথক হয়। রেজাকের কথা উপকথার আভ্যন্তরীণ শূন্যতা কি ছিলই, যা রেজাকের পরিচয় দ্যোতক, নিদেন ত্রিদিব তাই ভেবেছিল, যে ভাবনা হয়ত একই যাত্রায় ত্রিদিবের পরিচয় দ্যোতক। শূন্যতা কি অস্বস্তির, সঙ্কোচের, অনন্বয়ের? এবং শূন্যতা খুঁজে পাওয়ার?

রাগ, হয়ত রাগ নয়, একটা আত্মহনন, আত্মহননের ইচ্ছা ত্রিদিবের, ত্রিদিব চিৎকার করে, বাতাস দুলে যায়, সমস্ত গাঁদাফুলের স্তূপ চালকলা মাখা আর অজস্র পিতলের বাসন জুড়ে লাথির পর লাথি, এটা ত ছেলেমানুষি, হোক, হোক ছেলেমানুষি, যেন গাড়ি, গাড়ি ঝাঁপিয়ে এলে লাফ দিয়ে সরে ত যেতেই হয়, লাফ দিতেই হয়, লাথিব পব লাথি, চিৎকার, লাথি, চিৎকার কবে 'তোমাব রাজলক্ষ্মী ঠাকুরের গলায আমি পেচ্ছাপ করে দি—' রাগ ত জুড়ায় না, ম্লানমুখ টুকরো টুকরো ছবির মত ভাসে পড়ে থাকে ভাসে। বন্ধুরা টেনে নিয়ে যায় ইনামুলকে, বেরিয়ে যায। ছবিটা টুকরো, সেই ছবিটা টুকরো টুকবো হয়ে পড়ে থাকে। আব ত্রিদিবকে ভেঙে ফেলে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেয। হাতড়ায় ত্রিদিব। আর কিছু? আবো কিছু আবো অপমান। লাথি। ডান বাঁ। কেউ কি হাত টেনে ধরে? অনেকে? শিকল দুমড়ে দুমড়ে ওঠে, শিকল বেদি সব, জঙ্গলেব জানোয়ার মাথা চাড়া দেয়, মুচড়ে মুচড়ে পাক খায় শরীর, দুমড়ে যায় শিকল। শিকল ত আগে সে দেখে নি? বাজলক্ষ্মী পুজো বংশগত পুজো সে তো উৎসব—হিন্দু মুসলমান এসব কী —পুজোর ঘরের দাওয়া—ইনামুল—ত্রিদিব তো হিন্দুধর্ম মানে না, বাড়ির সবাই জানে সে গোরুর মাংস খেয়েছে, খায়, ঠাকুমাও জানে, তাহলে হিন্দু তাহলে মুসলমান— ইনামুল—রাজলক্ষ্মী পুজো—এসব কি— যত গোলমেলে হযে যায় ততই গজরায় বুনো জানোয়ারটা আবো আরো হিংস্র ত্রিদিব। তার এই হিংস্রতাই তো বাবাকে টেনে আনবে —এখুনি— উপরেব ঘর থেকে, বাবা তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে।

একটা অবেক্ষণ হ্যাঁ অবেক্ষণই তো ঝুলে থাকে বাতাসে। বুনো জানোয়ার—শিকল —লাথি— লাথি— চালকলা— নৈবেদ্য— লাথি— ত্রিদিব— লাথি জুড়ে একটা অবেক্ষণ। অবেক্ষণ কাব? ত্রিদিবেরই ত। কোন ত্রিদিবের? সেই না এই? ত্রিদিবের অবেক্ষণে ত্রিদিবই, ত্রিদিব নিজেই লাথি মারতে-মারতে লাথি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগয, এই লাথি ডাইনে, এই লাথি বাঁয়ে, এই লাথি রাজলক্ষ্মী ঠাকুরের নৈবেদ্যে, ওই লাথি গাঁদাফুলে, এই লাথি ঠাকুমাব ঠাকুমাময়তায়, ওই লাথি ঠাকুমার সন্তানে—ত্রিদিবের উত্তরাধিকারে, এই লাথি স্কুলের ক্লাস এইট নাইন টেন তিন বছব জুড়ে পরপর একই ক্লাসটিচার হারাধন গাঙ্গুলিকে, ওই লাথি সেই সমস্ত শুয়োরেব বাচ্চাদের যাদের বয়স পঞ্চাশের উপর, যারা নাভির উপরে প্যান্ট পরে, এই লাথি ভারতের সংবিধানে, ওই লাথি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় —কিন্তু দেখুন-দেখুন অবেক্ষণ করুন, ত্রিদিবের সাথে সাথেই অবেক্ষণ করুন লাথি ঘুরে মরে, ঘুরে ঘুরে মরে, শূন্য গর্ভ বৃত্তে, লাথি ডানে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে তবু সব লাথির পরও লাথি রাজলক্ষ্মী ঠাকুরের বেদিতে পৌঁছয় না, কেন? তা বড়ো মর্মান্তিক হবে ঠাকুমার? নয় হতই। বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন অনস্তিষ্ট হয়ে যাবে? নয় যেতই। লাথি পৌঁছোয় না কেন? শুধু ঠাকুমা আর বাবাই কি কারণ—ত্রিদিব নিজে নয়? এমনকী ত্রিদিব যদি লাথিটা মারতও তাহলেও কি অনুপস্থিত হয়ে যেত সেই কারণ? ত্রিদিব থেমে যায় —শূন্যতায়। রেজাক থেমে যায়—শূন্যতায়। রেজাক এক পলকেই বলে ওঠে 'হোক-হোক শুয়োরের মাংসই হোক।' ত্রিদিব গল্প লিখতে শুরু করে। থেমে যাওয়া পেন চলতে

শুরু করে। (পেন কিন্তু চলছিলই—থেমে যাওয়ার বর্ণনাতেও—যেমন ঘটে থাকে—থেমে যাওয়াকে থেমে যাওয়া বলে বোঝাই যায় না, চলাকে চলা বলে)

ইতিমধ্যে তো নির্বাচনও হয়ে যায়। একানব্বুই-এর নির্বাচনও। নির্বাচনের সবচেয়ে চমৎকার ভেট কী? প্রণয় রায়। ম্যান অফ দি ইলেকশন প্রণয় বায়—কী চমৎকার কথা বলে—কী স্মার্ট প্রণয়—আই লাভ ইউ (রসনা নয়) প্রণয়। প্রণয় রায়েরই গরম, গরম্ তো নয় উষ্ণ বোতাম পরদায় আনে ইন্দ্রনীল ব্যানার্জিয়াকে (শেষে ইংরাজি এ আছে), সে ভ্রূদুটোকে একটু পেছনে গোটায়, মাথাটা সামান্য সামনে ঝোঁকায়, গদাটা, গদা নয় মাইক্রোফোনটা এগিয়ে ধরে অটলবিহারী বাজপেয়ির দিকে। ব্যানার্জিয়া প্রশ্ন করেন যে তাঁরা—বি জে পি-রা কি আবার রথযাত্রা করবেন— তাদের ফল ভালোতর করার উদ্দেশ্যে? ত্রিদিবের রক্ত কি হিম হয়ে যায়? এক মুহূর্তের জন্যে? প্রণয় পর্ব ফিরে আসে। বারবার তার দেখা পাওয়া যায়। নতুন নতুন সঙ্গীর সাথে। আসেন ইংরেজি সর্বভারতীয় দৈনিকের সম্পাদক নন্দন সি দত্তরায়। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন বি জে পি তো সাম্প্রদায়িক দল নয়। তাদেব তো অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া। সঙ্গত অর্থনৈতিক ক্ষোভই মূর্ত হয়েছে বি জে পি-র পাওয়া প্রচুর প্রচুব ভোটে। ত্রিদিব একটু চেঁচিয়েই ওঠে 'মার বাঞ্চোতের পোঁদে তিন লাথি'। ত্রিদিব খুবই অন্যায় করে। কারণ প্রথমত, ঘরে অন্য যে উপস্থিত সে ত্রিদিবের বউ তাকে সে 'তুই' বলে না, 'তুমি' বলে। আর দ্বিতীয়ত, একজন সভ্য মহিলাকে, হোন না নন্দন সি দত্তরায়, তাঁর পোঁদের কথা বলার মতো চরম কুরুচিপূর্ণ আর কী হতে পারে? কুরুচিপূর্ণ হোক বা না হোক এসব মন্তব্য তো ত্রিদিবের এসেই যায় যখন ত্রিদিবের বন্ধু মিহির বেশ রসিকতার ছলেই বাইরের একচিলতে ঘরটায় বেমানান রঙ ও আকৃতির গদি পাতা বেতের সোফায় বসে ঘাড় বেঁকায় যেন ফ্ল্যাটের ভিতরটা দেখছে, খুঁজছে কেয়াকে, আসলে তো পুরোটাই ভঙ্গি, বলে ওঠে 'গৃহকর্ত্রীকে দেখছি না কেন এখনো—কেয়া কি পরদানসিন হয়ে যাচ্ছে?'

কেয়া বেরোয় ততক্ষণে তার খুবই সংক্ষিপ্ত ঘরের জামা ছেড়ে শোভনতায় পৌঁছুনো হয়ে গেছে, বেশ খোশমেজাজে, বাইরের লোক এসে গেলে পাঁচদিনের কোষ্টকাঠিন্যের ভিতরেও মানুষ যে খোশমেজাজে জেগে ওঠে, উঠতে হয়, অথবা হয়তো বাস্তবিকই কোনো মজা পেয়ে, বাইরের লোক তো মজাও আনে।

কেয়ার খোশমেজাজ হাস্যোজ্জ্বল মুখের সামনে 'এত তাড়া কিসের মিহির' মন্তব্যের সামনে মিহিরকে রসিকতা করতে হয়, রসিকতা তো এভাবেই এগয় কোনো প্রসঙ্গকে টেনে যা কেবল পেরিয়ে গেছে বা যাচ্ছে, 'ও তাহলে পরদানসিন হওনি—বেগম কেয়া সেনগুপ্ত কি কেয়া খাতুনের মতো।'

সিঁটিয়ে যায় কি ত্রিদিব একটা অস্বস্তিতে? অস্বস্তি শুধু নয়, একটা কামড়ও থাকে,

থাকে বোধহয়, ত্রিদিব তো ধর্মনিরপেক্ষ, ত্রিদিব তো ইয়ে গণতান্ত্রিক, যা রক্ষার দায়িত্ব তো ত্রিদিবেরই, তাই তাব একটা আচরণবিধি আছে, স্বপ্রযুক্ত। সরদারজিদের নিয়ে রসিকতা নয়, মারোয়াড়িদের মেড়ো বলা নয় ইত্যাদি। সেই আচরণবিধি কি আক্রান্ত হয় —না বোধহয়—এখনো আক্রান্ত হয় নি—আর-একটু, সামান্য একটু এগতে পারে মিহির —শুধুমাত্র আক্রান্ত হওযার সম্ভাবনার লাল সঙ্কেত বেজে উঠেছে কেবল। এটা একটা প্রায় মাইক্রোডিসিশনেব প্রসঙ্গ: মিহির যে মন্তব্যটা করেছে সেটা কি ইতিমধ্যেই মুসলমানদের তাচ্ছিল্য, তাই শ্রোতা ত্রিদিবেব ধর্মনিরপেক্ষতাকে আক্রমণ করেছে—নাকি মিহিরের মন্তব্যটা হিস্টোবিসিটি সঞ্জাত—মিহির আসলে একটা সত্যকে, সত্যকে নয় বাস্তবতাকে, বিবৃত করেছে, একটা নিরপেক্ষ আঙ্কিক শান্ত অ্যাকাডেমিক তথ্যকে যে মুসলমানদের ভিতর পরদাপ্রথা আছে। কিন্তু ওই তথ্যও কি নিতান্তই মৃত না কি ওই তথ্য মৃত্যুর আকারে ফিবে-ফিরে আসে, ফিরে আসে অন্যতর একটা যুক্তিতে, জীবনের ইতিহাস বিবৃত করার থেকে সম্পূর্ণ অন্যতর যুক্তিতে?

কেয়ারও ভাল লাগে না, ভাল না লাগারই কথা, মিহিরের কথার ধাক্কার আভাস কেয়াকেও আক্রান্ত করে একই প্রকারে—'ওরকম বোলো না—খাতুন, বেগম মানেই ওই নয়, মিহির', যে কথায় তথ্য প্রায় থাকে না, তত্ত্বও, তবুও কথাটা বিশেষত বাক্যশেষে 'মিহির'—সম্বোধনের উচ্চারণে একটা কামড় রাখে।

মিহির কি একটু টাল খায়? হয়তো, মিহির তো বুদ্ধিমান, বুদ্ধি তো অনেক তথ্যকে একই সাথে ব্যবহার করতে পারা, তার মনে পড়ে যায় অল্পদিন আগেই ত্রিদিবের এক মুসলমান বন্ধু সস্ত্রীক এই ফ্ল্যাটে এসে থেকেছিল তাই মিহির হালকা দুশ্চিন্তিত হয় সে কি কোনো ব্যক্তিগত আঘাত করল কেয়াকে, আর মিহির নিজেও তো সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচিত হতে চায় না, অন্তত ত্রিদিব কেয়ার সাপেক্ষে যারা নিশ্চিত ভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ কারণ ওদের বাড়িতে এসে থেকেছিল একটি মুসলমান দম্পতি আর ধর্মনিরপেক্ষতা তো খুবই ভাল জিনিশ, সবাই জানে, মিহিরও তো মানে সেকথা।

'না না, সে তো বটেই, বটেই ত। আচ্ছা কেয়া একটু কফি হলে কেমন হত?' ত্রিদিবের দিকে মুখ ফেরায় মিহির, 'তোরা যে এই পার্কোলেটরে কফি পাকাস—এটা মাইরি আমাদেরও চালু করতে হবে—কী ফ্লেভার।' ঘরে স্বস্তি নামে। যাক। ব্যক্তি মিহির ব্যক্তি কেয়াকে আঘাত করতে চায়নি।

কিন্তু সবাই তো টলে যায় না। সেই না-টলে যাওয়ার কথা বলেন মাস্টারমশাই। তিনি ত্রিদিবের উশখুশ করা বুঝতে পারেন—কারণটা বুঝতে পারেন না, আসলে ত্রিদিব তো সিগারেট খেতে পারছে না, পাছে সদ্য সিগারেট ছেড়ে দেওয়া মাস্টারমশাই-এর কষ্ট আরো বাড়ে, উনি ভাবেন বসার আরামের কথা, তাই পা দিয়ে একটা বাড়তি টুল এগিয়ে দেন ত্রিদিবের দিকে, যেন পাটা নিচু টুলে রাখতে পারলেই ত্রিদিবের উশখুশ করা বন্ধ হবে। দাড়ি চুলকোতে-চুলকোতে বলে ওঠেন, 'অনেক—অনেকরকম কথা —ওরা চার-পাঁচটা করে বিয়ে করে—এই যে ঝড় হল—বাংলাদেশে— তা ওদের আর চিন্তা কি এক-একজন পাঁচটা করে বিয়ে করবে—জনসংখ্যা ফের দু-বছরেই—আসলে

—আসলে কোনো মানে নেই তো— মুসলমানরা—নেড়েরা সব দখল করে নিচ্ছে—একটা ত্রাস—ত্রাস—বুঝলে।' শেষ অব্দি সিগারেটটা ধরায় ত্রিদিব। 'কালকের আজকালে দেখেছ —দিয়েছে ওবা তথ্যটা—সেরকম বিগরাসলি নয়—সোর্সও দেয়নি বোধহয়—বলেছে যে বহুবিবাহ ভাবতে মুসলিমদেব চেয়ে হিন্দুরা বেশি করে—এই সব। লাভ কী তথ্যে? আসলে ত্রাস, ঘেন্না, বিদ্বেষ—এখানেব মুসলিমরা—কটা আর এসেছে মিডল ইস্ট থেকে? পুরোটাই তো অচ্ছুৎরা, লোযাব কাস্টগুলো ধর্মান্তরিত হয়েছে—ত্রাসটা ছিলই—যায়নি কখনো— আমি আমার, লেখাতেও পয়েন্ট করেছি—সেই ত্রাসটাই কালমিনেট করছে —বুঝলে—ত্রাস।' ত্রাসটা ছড়িয়ে যায়। ত্রিদিবকে ঘেরে। ত্রাস থেকে ত্রাস। ত্রাসের প্রতি ত্রাস।

বেঁকাদা তাকে লক্ষ্য করেছিল সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে মিছিলে? শুধু সে যায় নি—আরো তো অনেকেই ছিল। নাগরিক সভা নাকি নাগরিক সমিতির ডাকা মিছিল। অনেক, বেশ অনেক লোক হয়েছিল মিছিলে। মিছিলে হাঁটার সময় তার বেশ ভাল লাগছিল, নিজেকে বেশ বাজনৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছিল সিবাজুলের। আর সত্যিই তো সাম্প্রদায়িকতার পুরো ব্যাপারটাই খুব ভযঙ্কর। মিছিলটা খুব উচিত বলেই তো অনেক লোক হয়েছিল। এই এলাকায় প্রচুব শ্রমিক থাকে, ডকের, আরও নানা জায়গার। তারাও এসেছিল। অনেকেই। সেই সব লোকের ভিতর বেঁকাদা তাকে লক্ষ করেছিল। তারপবই কি তার সম্পর্কে খোঁজ করেছে। নইলে হঠাৎ জানল কী করে? অবশ্য না জানার কিছু নয়। সে কোনোদিন গোপন করতে চায়ওনি। তবু বেঁকাদা তাকে হিন্দু বলেই ধরে নিয়েছিল। কেন? তার চিবুকে নুব নেই বলে? তার মাথায় টুপি নেই বলে? সে লুঙি পবে না বলে? এই ছবি শুধু বেঁকাদার মাথায় না—পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ইউনিভার্সিটিতে পড়া রাজনীতি করা একটি আধুনিক মুসলিম যুবককে নিয়ে লেখা গল্পের সাথে আর্টরুমের শিল্পী ছবি এঁকেছিল লুঙি-পরা গোঁফ-কামানো অথচ দাড়ি-সম্পন্ন টুপি-পরা একটি লোকের। সিরাজুল আপত্তি পাঠায়নি কোনো। মানে হয় না আপত্তি পাঠানোর।

তার চোখের চশমা, কথায দু-চারটে ইংবেজি শব্দ, শিক্ষিত হাবভাব এসব মিলিয়েই বেঁকাদা তাকে, কিছুতেই মুসলমান বলে ভাবতে পারেনি। বেঁকাদা নিজেই তাকে হিন্দু বলে ধরে নিয়েছিল। সেই ধারণা ভেঙে যাওয়াতেই কি বেঁকাদার মুখের শ্লেষের হাসিটা ওরকম হিংস্র হয়ে গিয়েছিল?

'হাবভাব তো এমন দেখে মনে হয় হিন্দু।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে, অপমানের সঙ্গে কথাটা তাকে বলেছিল লোকটা। শরীরের মধ্যে পাক খেয়ে উঠেছিল সিরাজুলের। এই লোকটা—এর এত সাহস হয় কী করে তার সঙ্গে এভাবে কথা বলার। সে একজন লেখক। তার প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটা। গল্পসংকলন তিনটে। তার গল্পের অনুবাদ ইংরেজি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। কোন সাহসে লোকটা

তার সঙ্গে এভাবে কথা বলছে।

'ওসব মিছিল-ফিছিল করে কিসসু হবে না—বুঝেছেন? সব শালার মুসলমানকে আমরা তাড়াব। এবার শালার একটা পার্টিই থাকবে—পদ্মফুল—বুঝেছেন—পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবো শালাদের।'

সে জানে এই পাড়াটায় বি জে পি আছে প্রচুর। সেই জানাটার জন্যে, নাকি অপমানের অভাবিত আকস্মিকতায়, নাকি রৌশনের মুখ মনে পড়ে, খুব বেশি কিছু তো নেই যা সে বাঁচাতে চায়, নড়বোড়ে হয়ে গেছিল সিরাজুল, গা গোলাচ্ছিল, হাঁটুদুটো কাঁপছিল তাব, হাত কপাল মাথা কাঁপছিল। ত্রাসে? সে কি পালিয়ে যাবে—এই পাড়া ছেড়ে—কোথায় যাবে? নিজের ভয়, আতঙ্কটাকে ছুঁতে পারছিল সিরাজুল—এক্ষুণি রৌশনকে নিযে চলে যাবে সে। আজই। কোথাও একটা। যেখানে ত্রাস নেই।

ত্রাস তখন ছড়িয়ে পড়ছিল সারা দেশ জুড়ে। ত্রাস, ত্রাসের গুজব, তার থেকে ত্রাস, ত্রাসের বিপরীতে ত্রাস। দেশভাগের বিপরীতে ত্রাস। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিপরীতে ত্রাস। কিন্তু সেই ত্রাসের অনেকটাই তো রূপকথা। ত্রিদিবদের যিনি ঠিকা কাজ কবেন, পারুলদি, তিনি একদিন ত্রিদিবকে বলেছিলেন, তাঁর জীবনের গল্প করতে করতে, উৎসাহীও চাই না, অবিরক্ত শ্রোতা পেলেই উনি সেই গল্প করে চলেন ঘন্টার পর ঘন্টা, তার আলসে স্বামীর প্রতি বিস্তব কটু-কাটব্যেব সঙ্গে, 'এপারে আসে তবু আমি তো কিছু কাজ কর্তি পারব।'

সেইজন্যেই তারা চলে এসেছিলেন, বলেন পারুলদি। ত্রিদিব এর আগের পারুলদির একটি বিবৃতির সাথে মেলাতে পারে না কথাটা। জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে যে বলেছিলেন মুসলমানরা আপনাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ওরকম বলতি হয়—লোকরে টানে বেশি।'

এই যুক্তিটা, পারুলদির বুদ্ধিমান হাসির সাথে মিলে ত্রিদিবকে, গল্পলেখক ত্রিদিবকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বাস্তব মানুষকে কতটা বুদ্ধিমান করে দিতে পারে। পারুলদি যাদের ঘরে কাজ করে, তাদের টানবেই বেশি, তারা তো প্রায় সবাই জানেন ভারতবর্ষটা ক্রমশ মুসলমানরা দখল করে নিচ্ছে।

পাটা ছোটো করে গ্লাইড করে ত্রিদিবের। এমন কিছু না, শুধু সিমেন্টের হাতলে ঘষতে থাকা হাতটা টানটান হয়ে গিয়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি, ত্রিদিব ফের থিতু মানে এক-এক পা করে নেমে আসতে থাকে। সিরাজুল ঝাঁকুনিটায় অস্ফুট শব্দ করেও চুপ করে যায়, নামতেই থাকে, কথা বলে উঠতে তার ইচ্ছা করে না, কেন, ক্লান্তিতে, আর কত, কতগুলো বাড়ি পরপর তাকে দেখতে হবে আর ফিরে যেতে হবে হতাশায়? চাপা ঘুপসি সিঁড়িঘরের ভেজা চ্যাটচেটে হাওয়ার পরেই খোলা বাইরের আকাশের নিচে এরকমই তো লাগে, কী আরাম, একটা গতি পেয়ে-যাওয়া আরামের, তাই বলে উঠতে পারা

সিরাজুলের 'এভাবে হবে না জানিস—আমায় ঘর পেতে হলে শুধু রাজাবাজারেই খুঁজতে হবে—বা পার্ক সার্কাস বাইরে পাবো না'।

সিরাজুলের মুখে একটা আলতো হাসি থাকে, ব্যঙ্গের, নাকি অত্যাচারিত দাস যে হাসি হাসতে পারে শুধু, দাসমালিক পারে না কারণ তার আত্মসচেতনা থাকে না, নিশ্বাস ফেলে ক্লান্তিতে, কী ক্লান্তি, এত ক্লান্তি কেন এত হতাশা, ঘর কিছুতেই না মিললে বিয়ে করতে দেরি হয়ে যাবে বলে? শুধু বিয়ের জন্যে?

দখল করে নেবে মুসলমানরা ভারতবর্ষ কী করে, কলকাতারও দু-তিনটে জায়গা বাদ দিলে পুরোটাই তো তাদের বেদখল, এরকম একটা স্ট্রিট কর্নার মিটিং হচ্ছিল, যে বলছিল তাকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না ত্রিদিব হাই মাইনাস পাওয়ার।

উত্তেজনা নেই। একদমই উত্তেজনা নেই এবার। ইলেকশন তো এসে গেল, আর কদিন, আসলে লোকে ফেড আপ বুঝলেন দাদা এই গৌরী সেনের খরচ বছর বছর, তবু দাঁড়ায় কেন ত্রিদিব স্ট্রিট কর্নাবের সামনে, হিন্দু-মুসলমান নিয়ে বলছে বলে, ছেলেটার, গলা শুনে লোক নয় ছেলে বলেই মনে হচ্ছে, ওরেটরি বেশ ভালো।

মুসলিমদের ভিতর মৌলবাদীদের তোয়াজ করেছে তো কেন্দ্রীয় সরকারই নিজের স্বার্থে এসব বলে ছেলেটা, নানাভাবে নানাঢঙে, বলে, বলেই চলে, গলা উঠিয়ে নামিয়ে। পাশ থেকেই হুঁঃ শব্দ করে, তাচ্ছিল্যের বিরক্তির, একজন হাঁটা শুরু করে দাঁড়িয়ে থাকা ভেঙে।

জিনের বোতলও অর্ধেক, যখন রাত অর্ধেক, দানা দানা রাত ছড়িয়ে থাকে বাতাসে, খোলা জানলা বেয়ে ঢুকে আসে ঘরে, মাথার ভিতরে বালি ভরা থাকে কেন এত মানুষের মাথায়—বিজবিজ করে—নুয়ে আসতে চায়।

'আমার শালার লেখক হতে গেলে সাকসেস পেতে হলে হিন্দু চরিত্র নিয়ে, হিন্দু পার্সপেক্টিভ নিয়ে লিখতে হবে? হিন্দু হতে হবে?'

সিরাজুল মাতাল হয়ে যাচ্ছে, টের পায় ত্রিদিব। সে নিজে তো মাতাল নয়, শুধু তার হাতের আঙুল যেন আপনাআপনি এসে চিবুকে ঠেকে, ঠোঁট আর চিবুক আর গাল আর কপাল চেপে পিষে দিতে চায়, সে তো মাতাল নয় একটুও তাই সিরাজুলকে মাতাল বলে বুঝতে পারে।

'মুসলমান শালার একটাও থাকবে না—সব হিন্দু সব হিন্দু হয়ে যাবে—হিন্দু হলেই সাকসেস।'

ত্রিদিব জানে, সেও ছিল সিরাজুলের সঙ্গে যখন সে আর সিরাজুল ঘর খুঁজেছে, সিরাজুলের জন্যে, সে দেখেছে নিজেই যে সিরাজুল ঘর পায়নি, তাকে ঘর পেতে হবে শুধু তিনটে পাড়ায়, সমস্ত কলকাতার ভিতর শুধু সিরাজুলের তিনটি নিজস্ব উপজাতি অঞ্চলে। হঠাৎ, ত্রিদিব মাতাল নয়, কিন্তু পরে, এই গল্প লেখার সময় নিজের কাছে

নিজে সে মাতলামিটাকেও যুক্তি হিশাবে ব্যবহার করবে, খুব চটে যায়। কেন? অসহায় লাগে তার? অভিষেকের আতঙ্কের উত্তর পায় না বলে?

'তোরা মুসলিমরাও শালা ভীষণ—কী বলব— শালা— ইয়ে— অরথোডক্স—বাঞ্চোৎ তোরা গোঁড়া ভীষণ।' ত্রিদিবের সমস্ত রাগ ছন্দ পায় তার হাতের ভিতর, একটু কি বেশি গতি পেয়ে যায়, ত্রিদিবের হাতের গ্লাস, এসে নামে, শব্দ হয়, একটু বেশি শব্দ হয় কি, স্টুটগার্টেব নিসর্গের উপর দিয়ে লাইম জিন গড়ায়। ত্রিদিব আরো কিছু, কত রাগ, বলতে চাইছিল আরো কড়া কিছু, এদিকে স্টুটগার্টের নিসর্গ ঘোলাটে কাঁপনের ভিতর, গাছের পাতাগুলো সত্যিই কাঁপে, মাল গড়িয়ে যাচ্ছে, কার্পেটে পড়বে, সামলানো দবকাব, কি বলবে গুছিয়ে উঠতে পাবে না। 'তোবা তো বাঞ্চোৎ—শরীয়ৎ—শালাব শরীয়ৎ না বললে বৌকেও... না।'

এত রাগ—শুধু কি সিরাজুলেব উপব, সিরাজুলেব উপব এত রাগ কোথায় ছিল ত্রিদিবেব? ত্রিদিব তো জানত, বেদনার সঙ্গেও, কারণ সিরাজুল কষ্ট পেলে তাব বেদনা হয়, সত্যিই, যখন, যখন হয়তো তার মাথায এই তথ্যটা জেগে থাকে না যে সিরাজুল মুসলিম—হয়তো কেন নিশ্চয়ই—নইলে এই মুহূর্তে সে ভুলে যায কি কবে— সে তো জানত যে একথা সত্যি নয়— তাব ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার চেয়েও সিরাজুলের ধর্মনিবপেক্ষ হওয়া কত শক্ত—তাও সিরাজুল, কষ্টের সঙ্গেও তার সত্যকে সত্য বলে ধরে রাখে —একথা তো জানত ত্রিদিব।

'তুই ত্রিদিব—তুই বলছিস—শালা—আমি শরীয়ৎ মানি—বলছিস—মানবই তো—আমি কি শালা ফেলে দেবো—আমার বাবাকে, মাকে—ফেলে দেবো? শরীয়ৎ মানি —শুয়োরের বাচ্চা—তুই বলার কে?'

সিরাজুল একটা পেঁজা তুলোর মতো নরম অথচ নাছোড়বান্দা অন্ধকারের স্রোত ঠেলে ঠেলে, ত্রিদিব তুই তো জানিস সব—আমার লোকজন, আমার গ্রামেব লোকেরা — ত্রিদিব তুই তোর অজান্তেও, সবার অজান্তে হিন্দু থাকতে পারিস—ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও —ক্লান্তি, মাথার ভিতর শিরাগুলো যন্ত্রণার ভারে দপদপ করে, সিরাজুল আর পারে না —সে যদি মরে যেতে পারত—মরা মানে কি—নিঃসীম পতন?

'আমি বলার কে—তুই শালা অর্ধেন্দু মিত্রকে খিস্তি করিস—তুই তো নিজেই কমুনাল'।

ত্রিদিব, ত্রিদিব, আমায় মুসলমান বল, কমুনাল বলিস না ত্রিদিব, ওটা আমার গর্বের জায়গা।

ত্রিদিব জানে, জানবার চেষ্টা করে আজকাল, গল্পে বর্ণিত সময়ের পরেও, শরীয়ৎ বা পুরাণ মানাব বা না মানার কোনোটারই কোনো মানে নেই— তবু তো সে আক্রমণ করতে চায়। কাকে? অভিষেকের ভয়কে? আদবানিকে? পি এ সি-কে? কিন্তু তারা তো সামনে নেই।

'তুই আমায় কমুনাল বলছিস—ত্রিদিব তুই —তুই বাঞ্চোৎ খানকীর ছেলে।'

একটা ঝাঁকুনি। একটা আলোড়ন। দুটো গ্লাস, একটা বোতল গড়ায়। মদ গড়ায়

মেঝেতে। আরো আরো। শ্বাসের শব্দ হয় প্রচুর। জিঘাংসা—হত্যা—দুটো শরীরে মদ মাখে—দুটো শরীরের গোপন জিঘাংসা আর হত্যা মদের গন্ধের সঙ্গে ছড়ায়। দুটো মাতাল—দুটো অসহায় শরীর—মারতেও পারে না—মরতেও পারে না। শুধু আস্ফালন করে। হাত-পা ছোঁড়ে। অসহায়তায়। জানলার বাইরে ঘবের দেওয়ালের বাইরে যোজন-যোজন অন্ধকার পড়ে থাকে।

কিন্তু এ মাতলামি তো গল্পে বর্ণিত সময়ের আগেও না পরেও না, কখনোই না, কখনোই ঘটেনি, বানিয়ে তোলা। গল্পের বাস্তবতায় তখন প্রতীক্ষা—টানটান প্রতীক্ষা। লোড শেডিং চারদিকে। বাতাস এত ঘন যে নিশ্বাস নেওয়া যায় না।

ওরা চারজন, দুই দম্পতি, হিন্দু দম্পতি আর মুসলিম, অপেক্ষা করে থাকে বারান্দায়। এমন আঁশটে একটা গরম এই অক্টোবরেও যে ঘরেব ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। আর কতক্ষণ? বেশিক্ষণ নয় নিশ্চয়ই এখানে বেশিক্ষণ ধরে চলে না লোড শেডিং, দু-ঘন্টার মধ্যে এসে যায় ফের।

রৌশনের মনে হয কি বেহালায় তাদের নিজেদের ঘর ঘরের মধ্যে খাট খাটের পাশেই ছোট টেবিলে সাজিয়ে রাখা ট্রেতে প্রসাধনের কথা? সেখানেও কি লোডশেডিং চলছে এখন একথা কি তার মনে পড়ে, মনে তো পড়তেই থাকে মাঝে মাঝেই, এরা ত্রিদিবদা কেয়াদি যতই ভালো হোক এটা তো তার নিজের ঘর নয়, তার আর ভালো লাগে না যেন। কবে? কবে তারা ফিরে যাবে ওখানে? কী হবে শেষ অব্দি? মসজিদ-টসজিদ সব ভেঙে ফেলবে—তারপর? তারপর কী হবে? সাতটা বড়ো শহরে দাঙ্গা হচ্ছে, কারেন্ট যাওয়ার আগেই খবরে দেখাচ্ছিল, তারপর? সাত সাতে উনপঞ্চাশ? তারপর? কেমন একটা ভয় করে রৌশনের—কী হবে এরপর? ভয় করে তার। সিরাজুলেরও। ত্রিদিবেরও। কেয়ারও।

অপক্ষা করে থাকে তারা অন্ধকারে। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। বারান্দাটা থেকে চারদিকে উপরে-নিচে-বাঁয়ে-ডানে চারদিকে অন্ধকার ঘন বাতাস। দু-একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে কোথাও কোথাও। মোমবাতির কি আগুনের আলো যেমন হয়। এই দেখা যায়। এই যায় না। ওরা অপেক্ষা করে থাকে।

মনে রাখবেন এটা গল্পের শেষ নয়। গল্পটা এখনো শেষ হয় না।

---